সুবোধ ঘোষ
রচনা সমগ্র
২

সম্পাদনা

উত্তম ঘোষ
সমীরকুমার নাথ

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

SUBODH GHOSH
RACHANA SAMAGRA PART II

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ১৯৯৮

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা-৭০০০২৯

প্রচ্ছদপট
চারু খান

অক্ষরবিন্যাস
ওয়ার্ডওয়ার্কস
৭২/৩এফ/১, আর কে চ্যাটার্জী রোড
কলকাতা-৭০০০৪২

মুদ্রক
ট্রায়ো প্রসেস
পি ১২৮ সি. আই. টি. রোড
কলকাতা-৭০০০১৪

ভূমিকা

সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র আরো আগে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। আজ থেকে প্রায় ১৮ বছর আগে সুবোধবাবু (মার্চ, ১৯৮০) আমাদের ছেড়ে হঠাৎ চলে গেলেন। যাবার আগের দিনও আনন্দবাজার পত্রিকায় তিনি তাঁর শেষ সম্পাদকীয় লেখা লিখে রেখে গেলেন : 'ওমর খৈয়াম স্মরণে'।

সুবোধবাবু সম্পর্কে আমি আমার বই 'সম্পাদকের বৈঠকে'—বেশ অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার কথা লিখেছি, যা শুধু লেখক সুবোধ ঘোষকে নয়, ব্যক্তি সুবোধবাবুকেও হয়তো অনেকটা তুলে ধরতে পারে। তাঁর মৃত্যুর পর আমি আনন্দবাজারে লিখেছিলাম ঃ 'একসঙ্গে যোগ দিই, সেই যোগ'।

এ রচনাবলীতে প্রথম খণ্ডে সুবোধবাবুর 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসটি স্থান পেয়েছে। এটা কেন জানি না বহুদিন অমুদ্রিত অবস্থায় ছিল। আমার স্পষ্ট মনে আছে—এর কভার এঁকেছিলেন, প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়। সুবোধবাবু যে সময় 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এই উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেন তখনই পাঠকেরা বুঝে গিয়েছিল, শুধু 'ফসিল' বা 'অযান্ত্রিকে'র মতো অসাধারণ ছোট গল্প নয়, একটি নতুন স্বাদের উপন্যাস রচয়িতা এক বলিষ্ঠ লেখকের আবির্ভাব ঘটলো। সেই সময়কার রাজনৈতিক ডামাডোলের চিত্র—যা তিনি এই উপন্যাসে প্রকাশ করেছিলেন—তা পরবর্তীকালের পুস্তকাকারে বের হবার সময় একটা সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রকাশককে কেউ কেউ ভয় দেখিয়েছিলেন—এই বই প্রকাশ করলে তাকে জেলে যেতে হবে।

সুবোধবাবু তখন অসুস্থ, হাসপাতালে। তিনি প্রকাশককে আমার কাছে পাঠালেন। আমি বললাম—আপনি অনায়াসে প্রকাশক হিসেবে আমার নাম দিতে পারেন। আমি জেলখাটা লোক, জেলে যেতে আপত্তি নেই।

তাই হয়েছিল। প্রথম সংস্করণে প্রকাশক হিসেবে আমার নামই ছেপে বের হয়েছিল। অবশ্য আমাকে শেষ পর্যন্ত তার জন্য জেল খাটতে হয়নি।

১৯৪০ সালের পয়লা জানুয়ারি আমি আর সুবোধবাবু একই সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দিই।.....তার আগে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে প্রুফরিডারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, আর আমি ছিলাম যুগান্তর পত্রিকার একজন জুনিয়র সাব-এডিটর। আনন্দবাজার রবিবাসরীয় বিভাগে মন্মথনাথ সান্যালের তিনি ছিলেন সহকারী আর আমাকে যোগ দিতে হল দেশ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে। সেই সময় বর্মন স্ট্রীটের পূর্ব দিকে দোতলায় একটি ঘরেই ছিল দেশ ও আনন্দবাজারের রবিবাসরীয় দফতর।

আমরা একই ঘরে বসে এই দুই পত্রিকার সাহিত্য সম্পর্কিত কাজে নিযুক্ত ছিলাম। সুবোধবাবুকে সে সময় যেভাবে দেখেছিলাম, সেই স্মৃতি আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিরিশের কাছাকাছি বয়স, কিন্তু দেখে মনে হয় এখনও যেন যৌবনে পা দেননি। অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন তিনি, যাকে বলা যায় রোমান্টিক পুরুষ। কথা তিনি খুবই কম বলতেন। সব সময় দেখতাম, ডাকে আসা পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে পড়ায় মগ্ন হয়ে আছেন। কখনও বিভাগীয় সম্পাদকের নির্দেশে তিনি সেই পাণ্ডুলিপি সংশোধনে নিমগ্ন থাকতেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হত, এ মানুষটি বোধহয় খুবই অভিমানী ও গম্ভীর। কিন্তু দিনের পর দিন একঘরে বসে কাজ করতে করতে যখন মানুষটির হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়ার সুযোগ ঘটল, তখন

দেখলাম যে, মানুষটি আসলে নীরব, নিরহঙ্কার, মধুরভাষী। যাকে বলা যায় অত্যন্ত বন্ধুবৎসল এক আড্ডাবাজ মানুষ।

আমাদের চাকুরী জীবন শুরু একই সঙ্গে। মারকাস স্কোয়ারের সংলগ্ন মারকাস বোর্ডিং-এ একই সঙ্গে পাশাপাশি দুটি ঘরে আমাদের প্রাকবিবাহ যুগের বেশ কয়েকটি বছর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সন্নিবেশে কেটেছে। সেই সময় সুবোধবাবুকে নানা দিক দিয়ে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে জানবার নানা সুযোগ আমার ঘটেছিল।

ওঁর চরিত্রের একটি গুণ যা আমাকে বরাবরই আকর্ষণ করেছে, তা হলো বাঙালী হয়েও 'বাঙালীয়ানা'র কোন ছাপ তাঁর মধ্যে সচরাচর দেখা যেত না। তার একটা কারণ তিনি বাংলাদেশের বাইরে মানুষ হয়েছিলেন। হাজারিবাগ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃঢ়তার প্রভাব তাঁর চরিত্রেও ছিল।'...

সুবোধবাবু বাংলা সাহিত্যকে যে একটি উজ্জ্বলরত্ন দিয়েছেন, সেই 'ভারতপ্রেমকথা' 'দেশ'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর 'শতকিয়া'। অন্য স্বাদের উপন্যাস। তাছাড়া ওঁর বহু গল্প—যা এই রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে—তার মধ্যে অনেকগুলোই দেশ পত্রিকায় বেরিয়েছে। তাঁর অন্যত্র প্রকাশিত রচনাগুলিও বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে চিরকালীন মর্যাদা পাবে।

সুবোধবাবুর একটি গল্পসংকলন 'গল্প মণিঘর' শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল ও আমাকে উৎসর্গ করেছিলেন। লিখেছিলেন ঃ 'ভ্রাতৃপ্রতিম দুই বন্ধু—করকমলেষু...।'

প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আমরা একই প্রতিষ্ঠানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে এসেছি। আমাদের দুজনের সম্পর্ক ছিল অটুট বন্ধুত্বের, প্রগাঢ় সহমর্মিতার। আমাদের দুজনের ভাগ্য ছিল এক সুতোতেই গাঁথা। তাঁর মৃত্যুতে সেই সুতো ছিঁড়ে গেল। গেল কি? সত্যি?

সূচীপত্র

উপন্যাস

বহুত মিনতি

১

অনাদিবাবুর এই বাড়িতে আজ সকাল হতে না হতেই যে সাড়া জেগে উঠেছে, সে সাড়া সত্যিই বড় মধুর। পাঁচ বছর আগে প্রভার বিয়ের দিন এইরকমই এক সকালে সানাই-এর সুরে বাতাস মিষ্টি হয়ে গিয়েছিল। বাড়ির সারা মনপ্রাণ ব্যস্ত করে দিয়ে একটা সাড়া জেগে উঠেছিল। কিন্তু আজ ঠিক সে-রকম [illegible] নয়, হৈ-চৈ নয়, হুড়োহুড়ি নয়। সেই সকালের সানাই-এর সুরে অনেক মধুরতা থাকলেও [illegible] হয়ে গিয়েছিল। এই বাড়িকেই ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক দিয়ে তিন হাজার টাকা যোগাড় করে প্রভার বিয়ে দিতে হয়েছিল। সেই ঋণ আজও শোধ করতে পারা যায়নি। সুদে সুদে ঋণের বোঝা আরও ভারি হয়েছে।

কিন্তু আজ মনে হয় এতদিনে ঋণের বোঝা নামিয়ে দিয়ে এই বাড়িটা তার বুকের ভারও নামিয়ে দেবার সুযোগ পেয়েছে। এই প্রথম সুযোগ। শেখরের একটা চাকরি হয়ে যাবে এতদিনে সত্যিই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে। অনাদিবাবুর বড় ছেলে শেখর, তিন বছর হলো চাকরি খুঁজে খুঁজে যে শেখর শুধু হয়রান হয়েছে, আজ তাকে আর একটু পরেই তৈরী হতে হবে। যেতে হবে সেই মিশন রো। নানারকম যন্ত্রপাতি তৈরী করে এক কারখানা, তারই অফিস। ভারত সরকারের ফিনান্স কর্পোরেশনের কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা সাহায্য পেয়ে এই কারখানা নিজেকে ফলাও করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাই কিছু নতুন কর্মী চাই, এবং একজন ভাল প্রচার অফিসার চাই। এই চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছিল শেখর। দরখাস্তের উত্তরে একটি পত্রে জেনারেল ম্যানেজার শেখরকে একটি ইন্টারভিউ মঞ্জুর করেছেন। আজ সেই ইন্টারভিউ-এর দিন। বেলা একটার সময় অফিসে উপস্থিত হতে হবে।

গত রাতটা সারা বাড়ির প্রাণ ভাল করে ঘুমোতে পেরেছিল কিনা সন্দেহ। আশা, আশা, আশা! বড় স্নিগ্ধ ও সুন্দর আশা। অনাদিবাবু তাঁর পিঠের ব্যথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। রাত দশটা পর্যন্ত শেখরের সঙ্গে গল্প করেছেন।

--আরম্ভে মাইনেটা কত হবে শেখর?

—তিনশো ষাট থেকে আরম্ভ! বছরে দশ টাকা করে বাড়বে। দশ বছরের জন্য কনট্রাক্ট হবে। তারপর কোম্পানির মরজি। ইচ্ছে করলে আরও দশ বছর রাখতে পারে।

—প্রভিডেন্ট ফণ্ড আছে তো?

--হ্যাঁ। মাইনে থেকে টাকা প্রতি এক আনা করে কাটবে। কোম্পানি দেবে দু'আনা।

অনাদিবাবু বুকে হাত বুলিয়ে আনন্দে প্রায় ফুঁপিয়ে ওঠেন--আহা বড় চমৎকার, বড় সুন্দর ব্যবস্থা।

মধু আর বিধু, শেখরের ছোট দুটি ভাই, তারাও পড়ার বই রেখে দিয়ে বড়দার আশে পাশে ঘুর ঘুর করে। বড়দার মুখের দিকে তাকালে ওদের একটু আশ্চর্যও লাগে। তিনশো ষাট টাকা মাইনের চাকরি হবে বড়দার ; কোন রাতে ঘুমের ঘোরেও এমন সুস্বপ্ন ওরা দেখেনি। বড়দাকে নতুন মানুষ বলে মনে হয়। মধু আর বিধুও অনেক রাত পর্যন্ত জেগেছে। যদি বড়দা একবার কোন কাজের জন্য ডাকেন, কপালটা টিপে দিতে বলেন? শেষ পর্যন্ত, এবং বড়দা না বললেও দুই ভাই-এ মিলে পাল্লা দিয়ে বড়দার কপাল টিপেছে, তারপর বড়দারই গা ঘেঁষে শুয়ে পড়েছে।

সকাল বেলায় সবার আগে জেগে উঠে ব্যস্ত হয়েছেন শেখরের মা বিভাময়ী। তিন দিন

থেকে জ্বর চলছে। থাকুক জ্বর। সকালে উঠেই একবার কালীঘাট ঘুরে এসেছেন। মন্দিরে পূজো দিয়ে প্রসাদের ঠোঙা আঁচলে বেঁধে বাড়ি ফিরেছেন। তার পরেই পাশের বাড়ির গয়লাকে অনুরোধ করে এক পোয়া দুধ আদায় করেছেন। মাসটা শেষ হলেই দুধের দামটা দিয়ে দেবেন। মাস শেষ হতেই বা আর কত বাকি? আজ তেইশে। সাত দিন পরেই মাইনে পাবেন চৌরঙ্গীর সব চেয়ে বড় স্টোরের সব চেয়ে পুরনো ক্লার্ক অনাদিবাবু, মাইনে যাঁর পঁচাত্তর টাকা। পিঠব্যথার অসুখের জন্য মাসের মধ্যে কম করেও পাঁচটি দিন অনুপস্থিত থাকতে হয়, এবং মাইনেও কাটা যায়। গত মাসে বেয়াল্লিশ টাকা এগার আনা মাইনে নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন, আর, এক পেয়ালা চা মুখে দেবার আগেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।

সকাল ন'টা পার হয়েছে। অনাদিবাবু বলেন--আমার কাছে এসে একটু বস তো শেখর! একটু গীতাপাঠ করবো।

অনেক দিন পরে বোধ হয় মনের এই নতুন আনন্দের আবেগে গীতা পাঠ করবার জন্য অনাদিবাবুর মনটা ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। গীতা পড়েন। নিজেই বুঝতে পারেন, এমন করে এত আগ্রহ নিয়ে অনেক দিন গীতা পাঠ করেননি তিনি।

বিভাময়ী রান্না ঘরের ভিতর থেকেই চেঁচিয়ে বলেন--আজ আর ঠাণ্ডা জলে স্নান করিসনি শেখর। যা শীত পড়েছে। আমি এখুনি এক হাঁড়ি জল গরম করে দিচ্ছি।

তারপরেই রান্না ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসেন বিভাময়ী। শেখরের কাছে এসে বলেন--এই দুধটুকু গরম গরম খেয়ে নে।

লজ্জা পায় শেখর। হেসে ফেলে।--তুমি আবার এসব কি কাণ্ড করছো মা?

--কাণ্ড আবার কিসের? 'এই তো সামান্য একটু...। কথাটা বলতে গিয়ে বিভাময়ীর গলা কেঁপে ওঠে। মনে পড়ে বোধ হয়, গত দশ বছরের মধ্যে কোনদিন শেখরকে এইভাবে সামান্য এক পেয়ালা দুধ খাবার জন্য সাধবার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। পাঁচ বছর বয়স থেকে শুধু ডালভাত গিলে এত বড়টি হয়েছে ঐ ছেলে। ভগবান সহায় আছেন, দুধ-ঘি ছুঁতে না পেলেও তাঁর ছেলে রুগিয়ে যায়নি। মনে পড়ে বিভাময়ীর, ছেলেবেলায় এক মাইল দৌড়ে ফার্স্ট হয়ে প্রাইজ নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে চেঁচিয়ে উঠেছিল ঐ শেখর--দুধ খাই না, তবু আমার দম দেখছো তো মা!

বিভাময়ীর চোখের কোণে জল এসে পড়ছে। কিন্তু আজকের দিনে, এত বড় একটা আশার দিনে চোখে জল আনা ভাল নয়। বিভাময়ীও হেসে ফেলেন।--কাণ্ডই করছি বটে। যাক গে, আগে এই দুধটুকু খেয়ে ফেল দেখি।

টালিগঞ্জের এক গলির ভিতরে এই ক্ষুদ্র ও জীর্ণ বাড়ি শীতের সকালে রোদের ছোঁয়া না পেয়েও যেন এক মায়ানীড়ের মত আপন বুকের উত্তাপে নিবিড় হয়ে উঠেছে। মধু আর বিধুকে নিয়ে একই থালাতে খাবার খায় শেখর। অনাদিবাবু সামনে বসে চা খান। বিভাময়ীর দুই চোখ অনেকক্ষণ ধরে দেখে দেখেও যেন তৃপ্ত হয় না। আর একবার ব্যস্তভাবে রান্নাঘরের ভিতরে যান ; আরও তিনটে গরম লুচি নিয়ে এসে থালার উপর রাখেন।

টালিগঞ্জের এই ক্ষুদ্র বাড়ির সুদীর্ঘ দীনতার জীবনে এই প্রথম একটা আশার মাত্র আভাসটুকু দেখা দিয়েছে। তাইতেই এত। একটা কাণ্ডই বটে। অনাদিবাবুও হেসে ফেলেন-- ব্যাপারটা কি জানিস শেখর? সারা জীবন ধরে শুধু অভাবে ভুগতে ভুগতে মনের এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। আশা দেখেও যেন বিশ্বাস করবার সাহস হয় না। নইলে, তোর মত কোয়ালিফাইড ছেলে একটা তিনশো ষাট টাকা মাইনের চাকরি পাবে, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে?

এই সত্য শেখরও মনে মনে স্বীকার করে। এক এক সময় হতাশ মনের যন্ত্রণায়, তীব্র বিষাদের জ্বালায় শেখরের চিন্তাগুলিও যেন জ্বলে উঠেছে। ঠিকই তো, গুণ থাকাটাই যেন

অগুণ। শেখরের সহপাঠী যারা ছিল, তাদের অনেকে তো তিনশো ষাট টাকা মাইনেকে দস্তুরমত ঘৃণাই করে। এই কলকাতা সহরেই তারা কেউ হাজার টাকার এবং কেউ বা আরও বেশি মাইনেতে অখুশি হয়ে অফিসারী করছে। ভবানীপুরের ইন্দুপ্রকাশ প্রায় সারাদিন বাড়িতেই থাকে আর রেডিওর গান শোনে। শুধু বিকেল হলে গাড়ি নিয়ে হাওড়ার এক জুট মিলের অফিসে দেখা দিয়ে ফিরে আসে। এই তো ইন্দুর কাজ। শেখর জানে, গাড়ির খরচ ছাড়া ইন্দু বারশো টাকা মাইনে পায়। ইন্দুর বাবা ইনকাম ট্যাক্সের একজন বড় অফিসার।

শেখর যে লেখাপড়ার ব্যাপারে এতদূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পেরেছে, তাই তো একটা অষ্টম আশ্চর্য। যে ছেলের ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফী দেবার সময় বাড়ির পিছনের জমিটাকে বেচে দিতে হয়েছিল, তাকে এম-এ পাশ করিয়েছে পঁচাত্তর টাকা মাইনের কেরানি বাপ। অনাদিবাবু যেন তাঁর জীবনের এক ভয়ংকর আশার নেশায় পাগলই হয়ে গিয়েছিলেন। নইলে এমন করে নিজেকে শূন্য করে দেবেন কেন? বিভাময়ীর হাতে শাঁখা আর লোহাটি ছাড়া আর কিছু নেই। সোনা-রূপা যা ছিল, তার সবই ঐ এক আশার সাধনায় উৎসর্গ করে দিতে হয়েছে। ছেলে বিদ্বান হোক, তাহলেই সব হয়ে যাবে। সব ফিরে আসবে। এমন কি দশগুণ হয়ে ফিরে আসতেও পারে।

বিভাময়ী জানেন, এবং শেখরও আজ বুঝতে পারে, অনাদিবাবুর শরীরের এই ব্যথাকাতর অবস্থা ঘটিয়েছে কিসের আঘাত?

সময় কত হলো? ঠিক বেলা একটার সময় মিশন রো-এর সেই অফিসে উপস্থিত থাকতে হবে। শেখর জানে, এখনও অনেক সময় আছে। ঘরের ভিতর এক কোণে সেই পুরনো চেয়ারে বসে পুরনো টেবিলের উপর রাখা বই-এর স্তূপের দিকে তাকিয়ে এখন আরও অনেকক্ষণ ভাববার সময় আছে। ভাবতে থাকে শেখর। কি প্রশ্ন এবং কোন্ বিষয়ে প্রশ্ন করবেন জেনারেল ম্যানেজার? সায়েন্সের কোন দুরূহ প্রশ্ন? পলিটিক্স? ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধেও হতে পারে। কিংবা নিউক্লিয়ার ফিজিক্স সম্বন্ধে জটিল কোন প্রশ্ন? মনে মনে তৈরী হয় শেখর।

অনাদিবাবু ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালে বোঝা যায়, এইবার রোদ চনচন করে উঠেছে। বেলা হয়েছে নিশ্চয়। ঘর থেকে বের হয়ে তারপর একেবারে গলি পার হয়ে মল্লিকদের বাড়ির হলঘরে উঁকি দিয়ে ঘড়ি দেখে আসেন অনাদিবাবু। বেলা দশটা।

আর দেরি করা উচিত নয়। মধু আর বিধুও ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সকাল হতেই শেখরের একটা পাঞ্জাবি ও ধুতি সাবানকাচা করেছিলেন বিভাময়ী। সেগুলি এতক্ষণে শুকিয়েছে। মধু আর বিধু, দুই ভাই সেই ধুতি আর পাঞ্জাবি তুলে নিয়ে উৎসাহের সঙ্গে ইস্তিরি করতে থাকে।

শেখরের স্নান সারা হয়ে যায়, এবং ভাত খাওয়া সারা হতেও বেশি দেরি হয় না। বাড়ি থেকে বের হবার জন্য শেখর তৈরী হতেই অনাদিবাবু আর বিভাময়ী সামনে এসে দাঁড়ান। বাপ আর মা'র পা ছুঁয়ে মাথায় হাত ঠেকিয়ে শেখর এগিয়ে যাবার আগে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। মধু আর বিধুও হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে বড়দার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে।

অনাদিবাবুর চোখ দুটো হঠাৎ বড় বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ঘরের ভিতরেই দেয়ালের গায়ে কুলুঙ্গির ভিতরে রাখা লক্ষ্মীঘটের দিকে তাকিয়ে উল্লাসের সঙ্গে বলে ওঠেন—শুভ লক্ষণ, খুবই শুভ লক্ষণ। কি? সকলেই চোখভরা বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে লক্ষ্মী-ঘটের আমপাতার উপর সুন্দর একটা প্রজাপতি এসে বসেছে। রওনা হয় শেখর। ঘরের দরজা পার হয়ে গলির সরু পথ ধরে এগিয়ে যায়। অনাদিবাবু বিভাময়ী আর মধু, বিধু, চারটি মানুষের স্নিগ্ধ দৃষ্টি দরজার কাছে ভিড় করে দেখতে থাকে।

—শিব! শিব! আস্তে আস্তে হাঁপ ছেড়ে শিবনাম উচ্চারণ করেন অনাদিবাবু। তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে ঘরের ভিতর ঢোকেন।

মধু ও বিধু আজ আর স্কুলে যেতে চায় না। বড়দা ফিরে না আসা পর্যন্ত এই গলির ভিতর ঘুর ঘুর করতে ইচ্ছা করে। কত বড় একটা ভাগ্যের ঘটনা, বড়দা আজ সেই ঘটনার নায়ক। তিনশো ষাট টাকা মাইনের চাকরি নেবার জন্য পরীক্ষা দিতে গিয়েছে বড়দা, ওদের মনের ভিতর একটা সুস্বপ্নের নাচ শুরু হয়ে গিয়েছে।

বিভাময়ী বলেন—থাক, আজ আর নাই বা স্কুলে গেলি।

অনাদিবাবু বলেন--বিকেল চারটের আগে ফিরে আসবে না শেখর। ততক্ষণ আমিই বা কি করি বুঝতে পারছি না।

বিভাময়ী বলেন—তুমি এত অস্থির হয়ো না। খেয়ে দেয়ে ঘুমোও ভগবান মাথার ওপরে আছেন।

২

নিবারণ সরকারের সম্পর্কে তাঁরই আত্মীয়-স্বজনদের মনে বিশেষ একটা অভিযোগ আছে। এই যে এত সাঙঘাতিক একটা আর্থিক কষ্ট এই ক'বছর ধরে সহ্য করছেন নিবারণ সরকার, সেটা তাঁর নিজেরই একটা খামকা জেদের পরিণাম। আরও দুঃখের কথা, তাঁর এই জেদটাও ঠিক তাঁর নিজের জীবনের কোন জেদ নয়। আসলে এই জেদ হলো তাঁর বড় মেয়ে অবন্তীর।

কোন আত্মীয়, কোন নিকট সম্পর্কের মানুষ সামান্য কোন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলে এবং সামান্য একটু উপকারের প্রস্তাব করলেই নিবারণবাবু সেই একই কথা আজও উচ্চারণ করেন—অবন্তীকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখি!

অবন্তী যদি রাজি হয়, তবেই রাজি হবেন নিবারণবাবু। নইলে নয়। মেয়ের ইচ্ছা আর অনিচ্ছার শাসন মাথায় তুলে নিয়ে দিন পার করে দিচ্ছেন নিবারণবাবু। কাশীপুরের গলিতে ক্ষুদ্র একটা বাড়িতে থাকেন। এক মেয়ে আর তিনটি ছোট ছোট ছেলে নিয়ে নানা অভাবের টানে হয়রান হয়েও কারও কাছে সাহায্য চাইবার জন্য ছুটে যান না। এখন তো ছুটে যাবার সামর্থ্যও নেই। রোগে অক্ষম হয়ে বিছানায় ঠাঁই নিয়েছেন। মাসের মধ্যে বড় জোর তিন চারটে দিন ভাল থাকেন। তখন লাঠি ভর দিয়ে হয় ঘরের ভিতরে, নয় গলির পথে দু'চার মিনিট পায়চারি করে এসে আবার দাওয়ার উপর বসে পড়েন।

মাইনে পান পঁয়ষট্টি টাকা। তাছাড়া অবন্তীও এই ক'বছর ধরে একটা চাকরি করে। বরানগরের এক মেয়ে স্কুলে ইতিহাস পড়ায়, মাইনে পায় আশি টাকা। এই তো সর্বসাকুল্যে নিবারণ সরকারের সংসারের আয়। ছোট ছোট তিনটে ছেলে, ঐ চারু হারু আর নরু বড় হয়ে উঠেছে, এবং ওদের এখন স্কুলে ভর্তি না করে দিলেই নয়। কিন্তু খরচের কথাটা ভাবতে গিয়ে চোখে অন্ধকার দেখেন নিবারণবাবু, এবং অবন্তীও ভেবে কূল পায় না, কি করে দিন চলবে, যদি একটু ভাল মাইনের একটা চাকরি না পাওয়া যায়?

আত্মীয়েরা জানেন, এবং অবন্তীও স্কুল থেকে ফিরে এসে শুধু এক পেয়ালা চা ক্লান্ত হাতে টেনে নিয়ে ভাবতে থাকে, নিবারণবাবুর কেষ্টনগরের সম্পত্তি বলতে যা ছিল, তার শেষটুকুও আজ আর নেই। বাড়ি বাগান আর ধানজমি, সবই অনেক আগেই গিয়েছে। বাকি ছিল জলঙ্গীর গা ঘেঁষে একটা ডুবো জমি, সেটাও বেচে দিতে হয়েছে সে বছর, যে বছরের একটি দিনে অবন্তীর মা এক যক্ষ্মা-হাসপাতালের বিছানায় চিরকালের মত চোখ বুঁজে নীরব হয়ে গেলেন।

সে-দিনের কিছুদিন পরেই কাশীপুরের গলির এই বাড়িতে এসেছিলেন ভাগলপুরের মাসিমা। খুব ভাল অবস্থার এক জমিদার পাত্রের খবর এনেছিলেন। অবন্তীর সঙ্গে অনায়াসেই

সেই জমিদারের বিয়ে হতে পারে, যদি নিবারণবাবু রাজি হন, এবং অবন্তীর আপত্তি না থাকে।

তখনও অবন্তীর কলেজের পড়ার পালা শেষ হয়নি, ফোর্থ ইয়ারের সবটাই বাকি। ভাগলপুরের মাসিমা জানিয়েছিলেন, যদি অবন্তী বিয়ে করতে রাজি থাকে, তবে সেই জমিদার পাত্র আরও এক বছর বিয়ের জন্য অপেক্ষা করতে রাজি আছে। অবন্তীর পড়ার সব খরচ দেবে সেই পাত্র। এমন কি কাশীপুরের এই অভাব সংসারের ভরণপোষণের সব দায় নিতেও সে প্রস্তুত আছে।

কিন্তু রাজি হয়নি অবন্তী। অবন্তী বলেছিল--ওভাবে বিক্রি হয়ে যেতে ইচ্ছে করে না মাসিমা।

মাসিমা রাগ করে চলে গিয়েছিলেন। মাসিমার সেই রাগ দেখে খুশি হয়েছিল অবন্তী। এবং একবেলা উপোস করেও খরচ বাঁচিয়ে আর একটা বছরের মত কলেজের পড়ার খরচ যোগাড় করবার জন্য মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল।

মিথ্যে হয়নি অবন্তীর সেই প্রতিজ্ঞা। প্রায় একবেলা উপোস করার মতই, অনেক রিক্ততা সহ্য করে, নিবারণবাবুর সামান্য পেনসনের টাকার মধ্যেই সব খরচ কুলিয়ে পরীক্ষার ফী পর্যন্ত দিতে পেরেছিল অবন্তী।

অভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করে জীবনের এতগুলি বছর পার হয়ে গিয়েছে যে মেয়ের, তার মনের গভীরে একটা গর্ব আছে। সেই গর্ব হলো একটা প্রতিজ্ঞা। এই অভাবের জীবন থেকে নিজের চেষ্টার জোরে মুক্তি পেতে হবে। কারও সাহায্যের দরকার নেই। কারও মুখের সহানুভূতির কথা শোনবার দরকার হয় না। আর, সহানুভূতি ও উপকারের প্রতিশ্রুতিগুলির ঐ তো ছিরি! ভাগলপুরের মাসিমার প্রস্তাবের মতো। একবার উপকার করে পাঁচবার কৃতজ্ঞতা দাবি করবে। সম্মানটুকু কেড়ে নিয়ে শুধু করুণার পাত্র করে রাখবে। কোন দরকার নেই।

নিবারণবাবুও বলেন, তুই যদি মনে করিস অবন্তী, কারও উপকারে ও সাহায্যে কোন দরকার নেই, তবে আমিও মনে করি, কোন দরকার নেই।

মনের এই জেদ, এই প্রতিজ্ঞা, আর এই গর্বের আবেগটুকু জিইয়ে রাখতে গিয়ে অবন্তী সরকারের মত আশি টাকা মাইনের এক মেয়ে-টিচারকে এবং পঁচিশ বছর বয়সের একটা মেয়েলি পুরুষকে আরও যে একটা কঠোর পরীক্ষা সহ্য করতে হচ্ছে, তার ইতিহাস এই পৃথিবীতে এখনও অবন্তী ও নিখিল ছাড়া আর কেউ জানে না। এবং বোধ হয় সেই কল্পনা করতেও পারবে না যে, একটা গরীবের বাড়ির মেয়ের প্রাণেও এত অহংকার থাকে! নিখিল মজুমদার আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে, এভাবে এতবড় জেদ নিয়ে কোন মেয়ে কি কখনও কাউকে ভালবেসেছে?

নিখিল মজুমদার তার আশ্চর্যের কথা অবন্তীর কাছে কতবার মুখ খুলে বলেও ফেলেছে। শুনে অবন্তীর দু'চোখের দৃষ্টিতে যেন শান্ত প্রদীপের আলোর মত একটা নিবিড় তৃপ্তির আভা ফুটে ওঠে।

নিখিল বলে—ভালবাসতে পারে তো অনেকেই, কিন্তু তোমার মত এমন করে নিজের সর্বনাশ করে কেউ ভালবাসতে পারে বলে আমার ধারণা ছিল না।

অবন্তী—বড্ড বেশি বাড়িয়ে প্রশংসা করছো নিখিল। তোমার দরকারের জন্য সামান্য কয়েকটা টাকা দিতে পারছি, এর মধ্যে কোন অদ্ভুত মহত্ত্ব নেই। ওসব কথা শুনলে আমি লজ্জা পাই।

সকাল বেলা শ্যামবাজারে গিয়ে ডাক্তার রায়ের মেয়ে ডলিকে এক ঘণ্টার মত অঙ্ক শিখিয়ে আসতে হয়, ত্রিশটা টাকা পাওয়া যায়, এবং সেই টাকাটা প্রতি মাসে নিখিল মজুমদারের হাতে তুলে দেয় অবন্তী। টাকাটা পরিমাণে সামান্য হলেও নিখিলের কাছে সে

টাকা একটা সৌভাগ্যেরই মত। কারণ সেই টাকাতেই নিখিলের মেসের অর্ধেক খরচ কুলিয়ে যায়।

নিখিলের জীবনও প্রতীক্ষায় আছে। একটা ভাল সার্ভিসের আশায় দিন গুনছে নিখিল। শুধু বসে বসে দিন গোনা নয়। বেচারা প্রাণপণে চেষ্টাও করছে। ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসের ভিড়ের ভিতর ঠেলাঠেলি করে উঠে রোজই সকালে চলে যেতে হয় অনেক দূরে, পটলডাঙ্গা থেকে সেই বেহালায়। সেখানে এক ফারমাকিউটিক্যাল ল্যাবরেটরিতে অ্যাপ্রেন্টিস কেমিস্ট হয়ে রোজ অন্তত দশটা ঘণ্টা কাজ করতে হয়। এই কাজের মাইনে নেই, শুধু প্রসপেক্ট আছে। আর আছে সামান্য অ্যালওয়েন্স, পঞ্চাশ টাকা।

অবন্তী বলে, তোমাকে আমি সামান্য একটু সাহায্য করতে পারছি, এটা যে আমারই তৃপ্তি।

হ্যাঁ তৃপ্তি। বোধ হয় অবন্তী সবকারের জীবনের সুন্দর একটা জেদের তৃপ্তি। নিজের ভালবাসার অদৃষ্টকেও নিজের হাতে গড়ে তুলবার তৃপ্তি। গরীব বলেই কি জগতের কাউকে উপকার করবারও ক্ষমতা থাকবে না, সুযোগ থাকবে না, অধিকার থাকবে না? স্বীকার করে না অবন্তী। স্বীকার করতে চায় না অবন্তীর জীবন। ডলিকে অঙ্ক শিখিয়ে যে ত্রিশটা টাকা প্রতিমাসে পাওয়া যায়, সেই টাকা চারটে মাস ধরে জমালে একটা হাতঘড়ি কিনতে পারা যায়, এবং সত্যিই একটা হাতঘড়ি অবন্তীর খুব দরকার হয়ে পড়েছে! কিন্তু দরকার নেই কিনে ; তার চেয়ে বরং মনটা অনেক বেশি খুশি হয়ে যায়, যখন মনে পড়ে অবন্তীর, ঐ টাকাটা নিখিলের জীবনে সামান্য একটু উপকারে সার্থক হতে পারছে।

প্রাণ দিয়ে ভালবাসলে বোধহয় এইভাবে প্রাণেরই খানিকটা ভালবাসার মানুষের সুখের জন্য ক্ষয় করে দিতে পারা যায়। অস্বীকার করে না অবন্তী, নিখিলকে এভাবে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে ভাল লাগে। অথচ এক বছর আগে এই নিখিলকে চিনতোও না অবন্তী, নিখিলের নাম পর্যন্ত শোনেনি।

অবন্তীরই স্কুলের বান্ধবী, যার নাম যমুনা, তারই দাদা হয় নিখিল। যমুনার আপন কাকার বড় ছেলে নিখিল।

যমুনার কোন কাকা আছে, এবং সে কাকার ছেলে নিখিল নামে এরকম সুন্দর চেহারার একটা মানুষও পৃথিবীতে আছে, এসব খবর অবন্তীর কোনদিন জানা ছিল না। জানতে পেরেছিল প্রথম সেদিন, যেদিন হঠাৎ ট্রামের মধ্যে যমুনার সঙ্গে অবন্তীর দেখা হয়ে গেল। অনেক দিন পরে দেখা। সেই যমুনা, যার শরীরটা একেবারে হালকা লতার মত ছিপছিপে ছিল, আর স্কুলের প্রাইজের দিনে ফুলের মঞ্জরী খোঁপায় দুলিয়ে ফুরফুর করে নাচতো। সেই যমুনার চেহারাটা কী গম্ভীর আর কী ভারিক্কী হয়ে গিয়েছে!

কিন্তু সেই রকমই ছটফটে হাসি হেসে অবন্তীর হাত ধরেছিল যমুনা, এবং ট্রাম থেকে নেমে অবন্তীকে হাত ধরে সোজা নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে চা আর পাঁপড় খাইয়েছিল।

যমুনার ঘরের চেহারা দেখেই বুঝে ফেলতে দেরি হয়নি অবন্তীর, যমুনার অবস্থা বোধ হয় অবন্তীর অবস্থার চেয়েও রিক্ত। একটি ছোট ঘর, এক ফালি বারান্দা। পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সেই ঘরে থাকে যমুনা। যমুনাই বলে—সত্তর টাকা মাইনের ভদ্রলোকের ঘর এর চেয়ে বেশি ভাল হয় না অবন্তী।

সেই যমুনার বাড়িতে, সেই এক ফালি বারান্দার এক কোণে একটি সুন্দর চেহারার মানুষকে গম্ভীর ভাবে বসে থাকতে দেখে অবন্তীই প্রশ্ন করেছিল, কে ঐ ভদ্রলোক?

যমুনা : আমার দাদা, আমার দিনাজপুরের কাকার ছেলে।

অবন্তী আর কোন প্রশ্ন করেনি। কিন্তু অবন্তীর মনের নীরব প্রশ্নগুলির উত্তর যমুনারই একটানা যত অবোধ গল্পের আক্ষেপের ভাষাগুলির মধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল। চুপ করে, এবং

খুবই গম্ভীর হ'য়ে শুনেছিল অবন্তী।

যমুনা বলে--আমার দিনাজপুরের কাকার অবস্থা প্রায় আমার এই স্বামীর বাড়ির অবস্থারই মত। আরও দুঃখের কথা কি জান? এত বিদ্বান হয়েও নিখিলদা বেচারা আজ পর্যন্ত একটা চাকরি যোগাড় করতে পারলেন না।

একটু চুপ করে থেকে যমুনা বলে--তোমার কাছে দুঃখের কথাই বলতে ভাল লাগছে, তাই বলছি। মেসে হোটেলে থাকবার মত টাকা নেই বলেই নিখিলদা আমার এখানে এসে উঠেছেন। কিন্তু এসেই তো ভগ্নীপতির অবস্থা দেখে চক্ষু চড়ক গাছ। তাই....।

অবন্তী--কি?

যমুনা--তাই চলে না যেয়ে আর উপায় কি বল? আজই দিনাজপুরে চলে যাবেন নিখিলদা।

অবন্তী--চাকরির চেষ্টা করবেন না?

যমুনা—কলকাতার মত খরচে জায়গায় দুটো মাস থাকতে পারবেন, তবে তো চাকরির চেষ্টা করবেন?

চোখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে যমুনা।—আমারও সাধ্যি নেই যে, নিখিলদাকে এখানে থাকতে বলি। সত্তর টাকা মাইনের জীবন, আমি যে বাচ্চাগুলিকে মাঝে মাঝে না খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখি অবন্তী!

অবন্তীও রুমাল তুলে চোখ মুছেছিল, এবং অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে চুপ ক'রে বসেছিল। তার পরেই, যমুনার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময়, কে জানে কেন, অবন্তীর মুখের চেহারাটা হঠাৎ অদ্ভুত রকমের হয়ে গেল। এক ঝলক রক্তের আভা চমকে উঠেছে সারা মুখে। আর, চোখ দুটোর কালো নিবিড়তা যেন আরও নিবিড় হয়ে গিয়েছে। থমকে দাঁড়ায় অবন্তী, এবং নিজেরই মনের গভীরে একটা দুঃসাহসের নির্লজ্জতাকে সব নিঃশ্বাস দিয়ে জোর করে চেপে স্তব্ধ ক'রে দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না বোধ হয়। তাই হঠাৎ বলে ওঠে--তোমার নিখলদার সঙ্গে আমার একটু আলাপ করিয়ে দাও যমুনা।

অতীতের এই ইতিহাস রোজই একবার স্মরণ করা অবন্তী সরকারের প্রতিদিনের জীবনের একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। স্কুলে যাবার সময় যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ হাতের কাছে বই টেনে নিয়ে যার কথা ভাবে অবন্তী, সে হলো নিখিল। আর, এই ভাবনারই ঘোরের মধ্যে হঠাৎ চমকে উঠে এক একদিন দেখতে পায় ; সকাল বেলার আকাশের সব উজ্জ্বলতা যেন নিজের মুখের হাসির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে নিখিল এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রায়ই আসে নিখিল, এবং আজও আসবার কথা। কারণ অবন্তী জানে, আজকের দিনটা হলো নিখিলের ছুটির দিন।

অবন্তীরও আজ স্কুলে যাবার তাড়া নেই। আজকের মত ছুটি নিয়েছে অবন্তী, কারণ আজ অবন্তী সরকারেরও অদৃষ্টের একটা পরীক্ষার দিন, যদিও সে পরীক্ষার কথা নিখিলও জানে না।

ভাবনার মধ্যেই হঠাৎ একবার হেসে ওঠে অবন্তীর চোখ। না, আজই নিখিলকে এই পরীক্ষার কথাটা বলে দিয়ে লাভ নেই। পরীক্ষাটা হয়ে যাক, এবং যদি সেই পরীক্ষায় সত্যিই সফল হওয়া যায়, তবেই নিখিল মজুমদারকে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য ক'রে দিতে পারবে অবন্তী।

সকাল দশটাও যখন বেজে গেল, তখন একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে অবন্তী। না, আর তো নিখিলের অপেক্ষায় বসে থাকবার মত সময় নেই। এখনি যে একবার ঘরের বাইরে গিয়ে, কাশীপুরের এই গলি থেকে বেশ কিছু দূরে এক সৌভাগ্যের সম্ভাবনার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

দরজার কাছে পরিচিত পায়ের শব্দ শোনা যায়, এবং অবন্তীর ভাই হারু চেঁচিয়ে জানিয়ে দেয় –নিখিলবাবু এসেছেন দিদি।

নিখিলের মুখের দিকে তাকালেই অবন্তী সরকারের দুই চোখে যে হাসির অভ্যর্থনা জেগে ওঠে, সে হাসি আজ যেন আরও একটু বেশি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। কিন্তু দেখে আশ্চর্য হয় অবন্তী, এবং ওর চোখের হাসিও মুছে যায়। অবন্তীর মুখটাও সেই মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে ওঠে বড় বেশি গম্ভীর ও বিষণ্ণ মূর্তি নিয়ে এবং যেন ব্যথিত অপরাধীর মত করুণ হয়ে অবন্তীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে নিখিল।

--তোমার কি কোন অসুখ করেছে? প্রশ্ন করে অবন্তী।

নিখিল বলে--না। ..আমি এসেছি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে।

--কি বললে? বিদায় নিতে? প্রশ্ন করতে গিয়ে অবন্তীর চোখের তারা দুটো শিউরে ওঠে।

নিখিল বলে--হ্যাঁ।

অবন্তী--কেন? আমার কি অপরাধ হলো?

নিখিল হাসে--আমি অপরাধী, তুমি কেন মিছে নিজেকে নিন্দে করছো অবন্তী?

অবন্তী--তুমি অপরাধী কেন হবে?

নিখিল--আমার ভাগ্যটাই অপরাধী।

অবন্তী--তার মানে?

নিখিল--আর কলকাতায় থাকা সম্ভব নয়।

--কেন?

--বেহালার পারফিউমারি জানিয়ে দিয়েছে, পঞ্চাশ টাকা অ্যালওয়েন্স দিয়ে সখের কেমিস্ট পুষবার ওদের আর দরকার নেই। স্তব্ধ হয়ে শুধু শুনতে থাকে অবন্তী। অবন্তীরই ভালবাসার জীবনকে হতাশ করে দিয়ে সুখী হবার জন্য একটা নিষ্ঠুর চক্রান্ত যেন নিখিলের পঞ্চাশ টাকার একটা অ্যালওয়েন্সকেও ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়েছে। সত্যিই তো, নিখিলের পক্ষে আর কলকাতায় থাকা সম্ভব নয়। মেসে থাকতে হলে প্রতি মাসে যে ষাট-সত্তর টাকা দরকার হয়, সে টাকা আসবে কোথা থেকে? অবন্তী সরকারের পক্ষেও যে নিখিলের দরকারের সব টাকা যোগাড় ক'রে দেওয়া নিতান্তই অসম্ভব? নিজে একবেলা উপোস ক'রে থাকলেও সম্ভব নয়।

অবন্তীর চোখ দুটোও যেন স্তব্ধ হয়ে একটা দুঃসহ বেদনার জ্বালা সহ্য করতে থাকে। ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে অবন্তীরই সেই স্বপ্ন; আজ না হোক কাল, না হয় আর কয়েক মাস পরে, বড় জোর আর এক বছর পরে নিখিল মজুমদারের একটা ভাল চাকরি হয়েই যাবে। তারপর, আর কি? নিবারণবাবুকে কিংবা বান্ধবী যমুনাকে একেবারে স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা করবে না অবন্তী। অবন্তী আর নিখিলের এক বছরের ভালবাসার দাবি এক শুভ সন্ধ্যার উৎসবে এসে সবাকার চোখের সামনেই ফুলের মালা হয়ে যাবে। কিন্তু অবন্তীর আজ মনে হয়, সে মালার ফুলগুলিকেই যেন একটা নির্মম দুর্ভাগ্যের হাত এসে সরিয়ে দিতে চাইছে।

অবন্তী--তাহ'লে তুমি এখন কোথায় যাবে? দিনাজপুর?

নিখিল--না। আমি যাব কানপুর!

অবন্তী--কেন?

নিখিল--কানপুরের ট্যানারিতে একটা কাজ পেয়েছি। মাইনে একশো টাকা। তার মানে শুধু বেঁচে থাকতে পারবো।

মাথা হেঁট করে অবন্তী, মাথাটা ভার ভার বোধ হয়। নিখিলের কানপুর যাওয়া বন্ধ করতে পারে, আশি টাকা মাইনের টিচারের জীবনে সে ক্ষমতা কোথায়? ভালবাসতে পারে

কিন্তু ভালবাসার মানুষকে ধরে রাখতে পারে না, তাকেই বোধ হয় বলে নারীর জীবন। এই জীবনের হাসিগুলিও যে মুখচোরা কান্না, এই সত্য কল্পনাতেও কখনও এভাবে বুঝতে পারেনি অবন্তী।

নিখিল বলে—তোমার কাছে ফিরে আসবার জন্যই আজ বিদায় নিচ্ছি অবন্তী।

--তার মানে? অবন্তীর মুখের প্রশ্নটা যেন অভিমানে তপ্ত হয়ে বেজে ওঠে।

নিখিল বলে--তার মানে তোমার ভালবাসার কাছ থেকে তো বিদায় নেবার আমার সাধ্যি নেই অবন্তী।

উত্তর না দিয়ে কিছুক্ষণ কি-যেন নীরব হয়ে ভাবতে থাকে অবন্তী। তাকের উপর রাখা ছোট টাইম-পীসের দিকে তাকায়। এগারটা বেজে গিয়েছে।

চমকে উঠে, এবং চোখের চাহনিতেও উতলা করে হঠাৎ প্রশ্ন করে অবন্তী--আজও তোমার কানপুর রওনা না হলেই কি নয়?

নিখিল—একটা দিনই বা দেরি ক'রে লাভ কি?

অবন্তী--লাভ আছে। তুমি মাত্র একটি দিন আমাকে সময় দাও। মাত্র একটি দিন। দেখি, কি বলে আমার ভাগ্য।

নিখিল আশ্চর্য হয়--তুমি এসব কি বলছো অবন্তী?

অবন্তী--বিশেষ কিছুই বলছি না। শুধু তোমাকে আর একটি দিন কলকাতায় থাকতে বলছি। তারপর এস, যদি দুর্ভাগ্য হয়, তবে তোমাকে বিদায় দেব।

সকালে মাত্র এক পেয়ালা চা খাওয়া হয়েছে, এবং এখন ঘরের বাইবে যেতে হলে যে সামান্য একটু ডাল-ভাত মুখে না গুঁজে চলে যাওয়া উচিত নয়, সে কথা স্মরণ কবিয়ে দেবার মত মানুষ আজ আর এই বাড়িতে নেই। এবং অবন্তীও আর এক মুহূর্ত দেরি না ক'রে, শুধু শাড়ির আঁচলটাকে সামান্য একটু গুছিয়ে কাঁধের উপর ফেলে দিয়ে তৈরী হয়।—আমাকে এখনি একবার বাইরে যেতে হবে নিখিল।

নিখিল বলে--আমিও এখন তাহলে আসি।

অবন্তী বোধ হয় শুনতেই পায়নি। এবং বোধ হয় বুঝতে পারে না যে, নিখিলও অবন্তীর পাশে পাশে হেঁটে চলছে। নিজেরই উতলা মনের আবেগে ছটফট ক'রে, এবং একটা নতুন প্রতিজ্ঞার মত্ততা নিয়ে পথ চলতে থাকে অবন্তী।—দেখি ভাগ্য আমাকে ঠকাতে পারে, না আমিই ভাগ্যকে ঠকিয়ে...।

স্টপের কাছে বাস এসে থেমেছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে নিখিল। বাসের ভিতরে উঠে পড়ে অবন্তী। ছুটে চলে যায় বাস।

৩

মিশন রো'র সাততলা বাড়ির তিনতলার বিরাট এক প্রকোষ্ঠে দি এগ্রি-মেশিনারি লিমিটেডের অফিস। কারখানাটি আসানসোলে। অফিসের বিরাট প্রকোষ্ঠ মেহগনির পার্টিশন দিয়ে সারি সারি কামরায় ভাগ করা। সব চেয়ে বড় কামরাটির স্প্রিং-ডোরের ওপারে রঙীন সার্টিনের পর্দা ঝোলে। পাশেই কাঠের পার্টিশনের গায়ে পিতলের নেমপ্লেট ঝকঝক করে--জেনারেল ম্যানেজার।

বাইরে বারান্দার উপর এক সেট সোফা। তকমা পরা চাপরাসি ঘোরাফেরা করে। বারান্দার দেয়ালঘড়িতে তখন বারটা বাজে। লিফটের খাঁচা থেকে বের হয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে যায় শেখর।

নোটিস বোর্ডের দিকে তাকায়। হ্যাঁ, দেখা যায়, জেনারেল ম্যানেজার যথারীতি নোটিস

দিয়েছেন। বেলা ঠিক একটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত ইন্টারভিউ-এর জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। দেখে খুশি হয় শেখর, সাক্ষাৎপ্রার্থীর সংখ্যা বেশি নয়। মাত্র দু'জন। এক, শেখর মিত্র। দুই, অবন্তী সরকার।

কে এই অবন্তী সরকার? কোন মহিলা বলেই মনে হয়। মিস বা মিসেস কিছুই লেখা নেই। যাক গে, এগিয়ে এসে সোফার উপর বসে থাকে শেখর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ মনটা বিমর্ষ হয়ে যায়। অবন্তী সরকার নামে প্রার্থীটি শেখরের তুলনায় যদি বেশি শিক্ষিত হয় আর বেশি যোগ্য হয়, তবে?

বিশ্বাস হয় না। অবন্তী সরকারের কি দু'বছর ধরে ফিজিক্সে রিসার্চের রেকর্ড আছে? অবন্তী সরকার কি শেখরের মত কোনদিন লণ্ডনের কোন পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছে আর প্রশংসা পেয়েছে? শেখরের মত ইন্টারভার্সিটি ডিবেটে মেড্যাল পেয়েছে কি অবন্তী সরকার? বিশ্বাস হয় না। মনের বিমর্ষতা মনের জোরেই মুছে ফেলতে চেষ্টা করে শেখর।

মনের জোর আছে শেখরের। ভাগ্যের কৃপা নামে কোন বিচিত্র বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না শেখর। সংসারের কাছে সুবিচার আর ন্যায় পাওয়া যায়, এটাও একটা অবাস্তব বিশ্বাস বলে মনে করে শেখর। তার ত্রিশ বছর বয়সের এই জীবন বলতে গেলে একটা মোহভঙ্গের জীবন। যোগ্য হলেই সেই যোগ্যতার মূল্য পাওয়া যাবে, এমন মোহ পোষণ করে না শেখর। দি এগ্রি-মেশিনারি লিমিটেডের প্রচার অফিসারের চাকরিটাকে পাওয়া যাবে বলে শেখরের মনের ভিতর যে আশা দেখা দিয়েছে, সে আশা হলো সংসারের খামখেয়ালের উপর একটা আশা। কে জানে, জেনারেল ম্যানেজার হয়তো মনের ভুলে, কিছু না ভেবে-চিন্তে, শুধু একটা হঠাৎ খেয়ালের বশে শেখরকেই কাজের উপযুক্ত বলে মনে করে ফেলতে পারেন। মনে পড়ে ইন্দুপ্রকাশের সেই কথাটা। ইন্দু অনেকবার হেসে হেসে বলেছে, তোর সবচেয়ে বড় ড্র-ব্যাক হলো তোর ঐ মেরিট। তুই সব দিক দিয়ে যোগ্য, তাই তুই অযোগ্য! তোর ভাল চাকরি হতে পারে না, শেখর ; অসম্ভব।

ইন্দুর কথাগুলি তখন বিশ্বাস করতে পারেনি শেখর। কিন্তু গত তিন বছরের চেষ্টার ইতিহাস স্মরণ করলে ইন্দুকে বাস্তবিক ভূয়োদর্শী ঋষি বলে মনে হয়। কত জায়গায় কত রকমের সার্ভিসের জন্য দরখাস্ত করেছে শেখর, কিন্তু দরখাস্তের একটা উত্তর পর্যন্ত আসেনি। সেদিক দিয়ে বিচার করলে দি এগ্রি-মেশিনারি লিমিটেডকে অনেক সভ্য বলে মনে হয়। সাক্ষাৎ দেখা করবার জন্য একটা পত্র দিয়েছে। শেখরের জীবনে এই বোধ হয় পৃথিবীর কাছ থেকে প্রথম ভদ্র ব্যবহার লাভের সৌভাগ্য।

বার বার মনে পড়ে, ঐ অবন্তী সরকার নামটা। শেখরের সৌভাগ্যের পথে কাঁটার মত ঐ অবন্তী সরকার, যার মূর্তি এখনও দেখা দেয়নি। এগ্রি-মেশিনারি লিমিটেডকে নয়, জেনারেল ম্যানেজারকে নয়, অবন্তী সরকারকেই শেখরের আজকের এত বড় আশার সব চেয়ে বড় শত্রু বলে মনে হয়। টালিগঞ্জের সেই ছোট বাড়ির রাতজাগা চোখের স্বপ্ন এবং সারা সকালের আশার উৎসব মিথ্যে করে দিতে পারে ঐ অবন্তী সরকার, আর কেউ নয়।

লিফট উঠছে উপরে, শব্দ শোনা যায়। শেখরের নিঃশ্বাসের ছন্দও হঠাৎ কেঁপে ওঠে। অবন্তী সরকার এল নাকি?

হ্যাঁ, এই বোধ হয় অবন্তী সরকার। ঐ যে অদ্ভুতভাবে সেজে, কিংবা না সেজেও অদ্ভুতরকমের সুন্দর হয়ে এক তরুণী লিফটের খাঁচা থেকে নেমে এই অফিস ঘরেরই দেয়ালের গায়ের নেম-প্লেটগুলি পড়তে পড়তে এদিকে আসছে। সিঁথিতে সিঁদুর নেই, মাথার উপর কাপড় টানাও নয়। নিশ্চয় উনি মিস, মিস অবন্তী সরকার।

দেখতে থাকে শেখর, আগন্তুকা তরুণী হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে, আর একাগ্র দৃষ্টি তুলে নোটিস বোর্ডের সেই নোটিসটাকেই পড়ছে। আর কোন সন্দেহ নেই, উনিই হলেন শেখরের

এত আশার চাকরিটার প্রার্থিণী, শেখরের একমাত্র প্রতিদ্বন্দিনী। তরুণীর চোখ দুটোর চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, চকচকে বুদ্ধির আভা খেলছে সেই দু'চোখের দুই তারার আশে পাশে। ঐ দুই চোখ যদি একটু সজল হয়ে জেনারেল ম্যানেজারের মুখের দিকে তাকায়, তবে সত্য-মিথ্যার বিপ্লব ঘটে যেতে পারে। সন্দেহ করে শেখর। ঐ দুটি সুন্দর কালো চোখের জোরেই চাকরিটা পেয়ে যাবে বলে একটা ধ্রুব বিশ্বাস নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অবন্তী সরকার।

অবন্তী সরকার এতক্ষণে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। সোফার দিকে এগিয়ে আসতেই শেখরের চেহারাটাকে দেখতে পায় ; এবং সেই দুই কালো চোখ যেন হিংসুক সাপিনীর চোখের মত তাকিয়ে থাকে নোটিস বোর্ডের লেখা পড়েই বুঝতে পেরেছে অবন্তী সরকার, শেখর মিত্র নামে লোকটাই সোফার উপর বসে রয়েছে।

সোফার দিকে আর এগিয়ে আসে না অবন্তী সরকার, যদিও দুটো সোফা খালি পড়ে আছে। যেন শেখর মিত্রের ছায়ার কাছে আসতেও ঘৃণা বোধ করছে অবন্তী সরকার। দূরে সরে গিয়ে বারান্দার রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে পথের জনতার স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকে। কি দেখছে, দেখবার কি আছে, তা সে-ই জানে। শেখর দেখতে পায়, জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রুমাল দিয়ে কপাল মুছলো অবন্তী সরকার। মনে হয় শেখরের, অবন্তী সরকারের সেই কালো চোখের চকচকে বুদ্ধি হঠাৎ যেন নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকায় শেখর। একটা বাজতে আর পনের মিনিট বাকি। জেনারেল ম্যানেজারের কামরা থেকে আহ্বান আসবার সময় নিকট হয়ে এসেছে। অফিস-ঘরের ভিতর থেকে হঠাৎ এক কেরানিবাবু এগিয়ে এসে প্রশ্ন করেন--আপনি শেখর মিত্র? ইণ্টারভিউ আছে?

শেখর বলে--আজ্ঞে হ্যাঁ।

কেরানিবাবু--আর অবন্তী সরকার?

ছুটে আসে তরুণী। কেরানিবাবুর সামনে এগিয়ে এসে বলে--আমি অবন্তী সরকার।

কেরানিবাবু বলেন--ব্যস্, তাহ'লে আর পনের মিনিট অপেক্ষা করুন।

কেরানিবাবু চলে যেতেই অবন্তী সরকার আর কোন দিকে না তাকিয়ে একটা সোফার উপর বসে পড়ে। হাতের ছোট ব্যাগটিকে কোলের উপর রেখে আর দুহাতে জড়িয়ে চুপ করে বসে থাকে। শেখর মিত্র অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। অস্বস্তি বোধ করে শেখর। অবন্তী সরকারের এই সান্নিধ্য একটা অভিশাপের মত মনে হয়।

দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আর একবার রুমাল দিয়ে কপাল মোছে অবন্তী সরকার। তারপর আনমনা শেখর মিত্রের ভাবনাগুলিকে একেবারে চমকে দিয়ে হঠাৎ বলে ওঠে--আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

শেখর অপ্রস্তুতভাবে বলে--তা হয় তো দেখেছেন।

বলতে গিয়ে শেখরও যেন অবন্তী সরকারের মুখের দিকে অতীতের একটা স্মৃতির আবছা চোখের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে থাকে ; তারপর বলেও ফেলে--আপনাকেও যেন কোথায় দেখেছি।

তরুণী প্রশ্ন করে--আচ্ছা, আপনি কি অনসূয়ার বউদি প্রভার কেউ হন?

আশ্চর্য হয় শেখর--হ্যাঁ, প্রভা আমার বোন।

অবন্তী সবকার বলে--হ্যাঁ ঠিকই অনুমান করেছি। প্রভার শ্বশুর বাড়িতে, তার মানে অনসূয়াদের 'বাড়িতে আপনাকে একবার দেখেছি। অনেকদিন আগে। বোধ হয় চার বছরেরও আগে।

শেখর--তাই বলুন। আমারও এখন মনে পড়ছে। প্রভার ননদ-অনসূয়াদের বন্ধু আপনি। তাই না?

অবন্তী সরকার হাসে--হ্যাঁ। আপনার দেখছি খুব স্পষ্ট মনে আছে।

শেখর—মনে থাকবারই কথা। আপনি ভূতের গল্প বলে সন্ধ্যাবেলা প্রভাকে ভয় দেখাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই আমি উপস্থিত হয়েছিলাম। অবন্তী সরকার এইবার স্বচ্ছন্দে হেসে ফেলে—আসল ব্যাপারটা তো জানেন না। অনসূয়া বলেছিল তার বউদি প্রভা নাকি ভয়ানক সাহসী মেয়ে। তাই আমি অনসুয়ার সঙ্গে বাজি রেখে প্রভাকে ভূতের গল্প বলে ভয় দেখিয়েছিলাম, আর বাজি জিতেছিলাম।

একটা বাজতে আর দশ মিনিট। হঠাৎ অবন্তী সরকার মুখ গম্ভীর করে। চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকায়। বোধ হয়, শেখর মিত্রের উদ্দেশ্যটাকেই আবার মনে পড়ে গিয়েছে। এই লোকটাই তো অবন্তী সরকারের আশায় বাদ সাধতে এসেছে। শেখর মিত্র যে অবন্তী সরকারের ভাগ্যের শত্রু।

গম্ভীর মুখ ঘুরিয়ে, আস্তে আস্তে দুচোখের দৃষ্টির তিক্ততা যেন কোন মতে হাসিয়ে একটু মিষ্টি করে নিয়ে অবন্তী সরকার বলে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, কিছু মনে করবেন না।

শেখর—বলুন, মনে করার কি আছে?

অবন্তী—আচ্ছা, আপনি হঠাৎ এই চাকরিটা নেবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন?

শেখর—তার মানে?

অবন্তী—এই তিনশো ষাট টাকা মাইনের একটা চাকরি, একটা কারখানার পাবলিসিটি অফিসারের কাজ ছাড়া অন্য কত ভাল কাজ তো আছে।

শেখর হাসে—আছে তো, কিন্তু থাকলেই বা কি?

অবন্তী—আপনি সেই ভাল কাজের জন্য চেষ্টা করুন না কেন? আপনার যা কোয়ালিফিকেশন, তাতে ইচ্ছে করলে আপনি তো অনায়াসে ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টের কোন বড় দপ্তরে একটা ভাল সার্ভিস পেতে পারেন।

শেখর হাসে—ইচ্ছে করলেই পেতে পারি না। যদি দেয়, তবে নিতে পারি।

অবন্তী—যাই বলুন, আপনার মত মানুষের পক্ষে এ রকম একটা সাধারণ চাকরি নেওয়া সাজে না।

শেখর আশ্চর্য হয়—না জেনে আমাকে বড় বেশি প্রশংসা করেছেন আপনি। আমার পক্ষে কি সাজে বা না সাজে সেটা আমি জানি।

অবন্তী—আমি আপনার বোনের ননদ অনসূয়ার কাছে সবই শুনেছি। আপনি ফিজিক্সে রিসার্চ করেছেন। আপনার ইউনিভার্সিটির রেকর্ড চমৎকার। আপনি ইংরেজী ও বাংলা কাগজে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন।

শেখর—কি আশ্চর্য, চার বছর আগে প্রভার ননদ আপনাকে যে সব কথা বলেছে, সেসব আজও এত স্পষ্ট করে মনে করে রেখেছেন?

অবন্তী—মনে থেকে গেছে। তাই বলছি...আপনি এই কাজটা নেবেন না।

চমকে ওঠে শেখর। অবন্তী সরকারের আবদার প্রলাপের মত মনে হয়। কোথা থেকে এসে অভিভাবিকার মত উপদেশ দিয়ে শেখর মিত্রের হিতাহিত বোঝাতে শুরু করে দিয়েছে। অবন্তী সরকারের বুদ্ধির দুঃসাহস তো কম নয়!

শেখর বলে—এই চাকরিটা নেওয়া বা না নেওয়া আমার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে না। হ্যাঁ, যদি দেয়, তবে নেবই। আপনি ওরকমের অদ্ভুত অনুরোধ করবেন না।

অবন্তী সরকারের মাথাটা যেন হঠাৎ একটা অদৃশ্য বোঝার ভারে ব্যথিত হয়ে ঝুঁকে পড়ে। অনুরোধটা অদ্ভুতই বটে। এমন অদ্ভুত অনুরোধ করবার অধিকার কোথা থেকে পেল অবন্তী সরকার? বোকা নয় শেখর মিত্র। বুঝতে তার একটুও দেরি হয়নি। অবন্তী সরকারের কালো চোখের চকচকে বুদ্ধি শেখর মিত্রকে স্তুতির ছলে দুর্ভাগ্যের ধুলোয় বসিয়ে দিয়ে নিজের জন্য এই চাকরির পথটাকে স্বচ্ছন্দ করে নিতে চায়।

একটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট বাকি। হেঁট মাথা তুলে শেখরের দিকে তাকায় অবন্তী সরকার। এইবার বুদ্ধিমান শেখর মিত্রেরই চোখ দুটো একটু ব্যথিতভাবে চমকে ওঠে। কারণ, ছলছল করছে অবন্তী সরকারের চোখ। অবন্তীর কপালের একটা দিক ঘামে পিছল হয়ে গিয়েছে। ঠোঁট দুটো থরথর করছে।

--কি হলো আপনার? প্রশ্ন করে শেখর মিত্র।

অবন্তী সরকার বলে--আপনি আমাকে চিনতে পারলে আমার অনুরোধটাকে অদ্ভুত বলতে পারতেন না।

শেখর--আপনার কথার অর্থ বুঝলাম না।

অবন্তী--আপনি জানেন না, আমি কেন, কিসের জন্য, কি অবস্থায় পড়ে এই চাকরিটা নেবার জন্য তৈরী হয়েছি।

শেখর--না জানলেও বুঝতে পারছি, চাকরিটা পেলে আপনার সুবিধা হয়।

অবন্তী--সুবিধা? শুধু সুবিধা নয় শেখরবাবু। পেলে বেঁচে যাই। শুধু আমি নই, আরও অনেকে।

শেখর--আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?

অবন্তী--বাবা আছেন। তিনটি ছোট ছোট ভাই আছে।

শেখরের বুকের ভিতর একটা যন্ত্রণাক্ত নিঃশ্বাস হাঁসফাঁস করে।--আপনার বাবার কি কোন চাকরি নেই?

অবন্তী--না, এখন তিনি সামান্য কয়েকটা টাকা পেনসন পান। রোগে শয্যাশায়ী। মা আজ তিন বছর হলো যক্ষ্মা হাসপাতালের বিছানাতেই শেষবারের মত চোখ বুঁজে চলে গিয়েছেন। আর, বাবা তাঁর সর্বস্ব বেচে দিয়ে আমাদের এতদিন বাঁচিয়েছেন। কিন্তু আর না। আর তাঁর সম্বল নেই, শক্তিও নেই।

অবন্তী সরকারের জীবনের দুঃখের যন্ত্রণা শুনে শেখরের বুকের ভিতরে একটা করুণ বিদ্রূপ নীরবে হেসে ওঠে। এ আর কি এমন নতুন কথা বলছে অবন্তী সরকার? ঐ-সব দুঃখ যে শেখর মিত্রের বুকের পাঁজরে পাঁজরে চেনা। শেখর মিত্রের জীবনটাকে একটুও চেনে না, কোন খবরও রাখে না অবন্তী সরকার, তাই অনায়াসে তার নিজের জীবনের বেদনাগুলিকেই সংসারের সব চেয়ে বড় দুঃখের ইতিহাস বলে মনে করে একজন অপরিচিতের কাছে বর্ণনা করতে পারছে।

দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকায় শেখর। অবন্তী সরকারও তাকায়। একটা বাজতে আর এক মিনিট মাত্র। বোধ হয় কোন কথা বলবার জন্য মনে মনে তৈরী হতে থাকে শেখর, কিন্তু অবন্তী সোফা থেকে উঠে এসে সোজা শেখরের একেবারে কাছে এসে আস্তে আস্তে বলে--আপনি অনুগ্রহ করুন।

অবন্তী সরকারের চোখের কোণে ছোট একটা জলের ফোঁটা চিকচিক করছে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে, জোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে শেখরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বিব্রত হয়ে, ভয় পেয়ে, আশ্চর্য হয়ে, আর সারা মুখটা বেদনার্ত করে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় শেখর--এ কি বলছেন আপনি?

অবন্তী--ঠিকই বলছি। আপনার যা কোয়ালিফিকেশন, তাতে আপনি এর চেয়ে অনেক ভাল সার্ভিস পেতে পারেন। কিন্তু আমার পক্ষে এর চেয়ে ভাল সার্ভিস আশা করা দুরাশা।

শেখর--কিন্তু, আমি কি করতে পারি?

অবন্তী--আপনি যদি ইণ্টারভিউ না দেন, এখনি চলে যান, তবে আশা আছে আমিই কাজটা পেয়ে যাব। কারণ, আর কোন ক্যানডিডেট নেই।

শেখরের মনের ভিতর যেন বিচিত্র এক বেদনার উষ্ণ বাতাস ছটফট করতে থাকে।

পৃথিবীর একটি মানুষের অদৃষ্ট আজ করুণভাবে শেখরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ইচ্ছে করলেই শেখর আজ এই মুহূর্তে অবন্তী সরকারের ঐ বিষণ্ণ মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারে। চেষ্টা করলেই শেখর আজ অবন্তী সরকার নামে এক নারীর দীনতাদীর্ণ গৃহনীড়ের সব উদ্বেগ দূর করে দিতে পারে। জীবনে এই প্রথম একটা মানুষের উপকার করবার ক্ষমতা পেয়েছে শেখর। একটা মানুষকে সুখী করবার অধিকার ; একটা মানুষের জীবনের আশার আবেদন ধন্য করে দেবার মত সৌভাগ্যের অহংকার।

অবন্তী বলে—কাজটা যদি না পাই, তবে বাড়ি ফিরে গিয়ে বাবার মুখের দিকে আমি কি করে যে তাকাবো, বুঝতে পারবেন না শেখরবাবু! বাবা যদি কেঁদে ফেলেন, কি করে সহ্যই বা করবো বলুন?

চুপ করে দাঁড়িয়ে অবন্তী সরকারের আবেদন শুনতে থাকে শেখর। বুঝতে পারে শেখর, হ্যাঁ ঠিকই, অবন্তী সরকারের বাবার চোখ ঠিক অনাদি মিত্র নামে আর একজন বৃদ্ধের চোখের মতই ছলছল করে উঠবে। জানে না অবন্তী সরকার, টালিগঞ্জের এক গলির ভিতরে ক্ষুদ্র একটি গৃহ যে মুহূর্তে শুনতে পাবে যে, চাকরি না পেয়ে শূন্য হয়ে ফিরে এসেছে শেখর, সেই মুহূর্তে সেই গৃহের চারটি মানুষের প্রাণে হতাশার পাঁজরভাঙা আঘাতের বেদনা শিউরে উঠবে। কিন্তু কি আশ্চর্য, যাই হোক না কেন, যে-ই এই কাজটা পেয়ে যাক না কেন, অবন্তী সরকার অথবা শেখর মিত্র, উভয়ের মধ্যে যারই সৌভাগ্য আজ প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, এই পৃথিবীর কোন না কোন ঘরের প্রাণকে কাঁদতে হবে। অবন্তী বলে—আপনি আমাকে নিশ্চয়ই খুবই স্বার্থপর আর ছোট মনের মানুষ বলে মনে করছেন শেখরবাবু। কিন্তু একটু ভেবে দেখুন। যদি আপনার বাড়ির অবস্থা আমার বাড়ির অবস্থার মত হতো, আর আমি আপনার চেয়ে বেশি যোগ্য ক্যানডিডেট হতাম, তাহলে আজ আপনি কি...।

চেঁচিয়ে ওঠে শেখর—না, কখ্খনো না। আমি তবুও আপনার কাছে এরকম অদ্ভুত অনুরোধ করে বসতাম না।

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে, এতক্ষণের এত মুখরতার সব শক্তি হারিয়ে, দাঁড়িয়ে থাকে অবন্তী সরকার। দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকায় শেখর। থর থর করে কেঁপে ওঠে শেখরের দৃষ্টি। ঠিক একটা বেজেছে।

আর এক মুহূর্তও বাকি নেই। এই মাত্র, হয়তো কেরানিবাবু কিংবা চাপরাসি এসে হাঁক দেবে। জেনারেল ম্যানেজারের আহ্বান এসে পড়বে। ঐ আহ্বানের পরিণামে, আর কয়েকটি মিনিটের মধ্যে এই পৃথিবীর একটি দুঃখী সংসার সুখী হয়ে যাবে, এবং আর একটি দুঃখী সংসার আরও দুঃখী হয়ে যাবে।

একটা আর্ত দীর্ঘশ্বাসের মত শব্দ টেনে লিফট উপরে উঠে এসেছে। দু'জন আগন্তুক লিফ্‌টের খাঁচা থেকে বের হয়ে হন্তদন্ত হয়ে অন্যদিকে চলে গেল। লিফটের ভিতরে অনেক জায়গা। এখনি নীচে নেমে যাবে ঐ লোহার দোলনা। খাঁচা বন্ধ করবার জন্য হাত তুলেছে লিফটম্যান।

লিফটের দিকে ছুটে চলে যায় শেখর। শেখরের চোখের দৃষ্টিটা উতলা, মুখটা করুণ, যেন নিজেরই ইচ্ছার নাগাল থেকে পালিয়ে যাওয়া একটা অসহায়ের মূর্তি। একটা লাফ দিয়ে, নিজেরই বুকের একটা নিষ্ঠুরতাকে ভয় পেয়ে, লিফটের খাঁচার ভিতর ঢুকে পড়ে নিজেকে যেন রুদ্ধ করে শেখর।

টালিগঞ্জের গলির ভিতর সেই ক্ষুদ্র গৃহের দরজা আর জানালার কাছে এখন আশাদীপ্ত কতগুলি চক্ষুর দৃষ্টি আকুল হয়ে আছে। শেখরের পায়ের শব্দ শোনবার জন্য বাড়িটা উৎকর্ণ হয়ে আছে। বার বার সেই একই দৃশ্য মনে পড়ে। টালিগঞ্জের গলির একটা ক্ষুদ্র বাড়ির প্রকাণ্ড লোভের আর আশার স্বপ্নটার দৃশ্য। চেষ্টা করেও আনমনা হতে পারে না শেখর।

কিন্তু এখনই সেই উজ্জ্বল চোখগুলির সামনে ফিরে যাওয়া উচিত নয়। পথে পথে ঘুরে আর পার্কের বেঞ্চিতে বসে কয়েকটি ঘণ্টার মত সময় পার করে দিতে হবে। বিকেল হোক, সন্ধ্যা পার হয়ে যাক, রাতটাও একটু গভীর হোক, অপেক্ষায় থেকে থেকে দীপ্তিহীন হয়ে যাক টালিগঞ্জের গলির সেই ঘরের চারটি মানুষের চার জোড়া চোখ। মধু বিধু ঘুমিয়ে পড়ুক। দেরি দেখে বাবা আর মা আগেই বুঝে ফেলুক যে, তাদের গীতাপাঠ আর কালীঘাটের পূজা ব্যর্থ হয়েছে।

আবার একটা আর্ত দীর্ঘশ্বাসের মত একটানা শব্দ। নীচে নেমে গেল লিফট।

৪

সত্যিই যে অনেক রাত হলো। শেখর এখনও ফিরছে না কেন? অনাদিবাবুর প্রশ্নের মধ্যে শুধু সন্দেহ নয়, একেবারে স্পষ্ট হতাশার আক্ষেপও যেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। পিঠের ব্যথা এইবার বেশ জোর করে উঠেছে। আর ভুলে থাকবার শক্তি পাচ্ছেন না অনাদিবাবু।

বিকেল হবার আগেই বড়দার জন্যে পাঁউরুটি কিনে এনেছিল মধু আর বিধু। তাছাড়া সুজির হালুয়া তৈরি করে রেখেছেন বিভাময়ী। বিকেল হতেই তো ফিরে আসবে শেখর। ক্লান্ত ছেলেটা যেন বাড়ি ফিরেই কিছু মুখে দিতে পারে, ব্যবস্থা করে রাখতে কোন ভুল করেননি বিভাময়ী।

লক্ষ্মীঘটের আমপাতার উপর থেকে সেই প্রজাপতিটা কখন পালিয়ে গেল কে জানে? বিকেল পর্যন্ত ঠিক ওখানেই বসে ছিল। বিভাময়ী বলেন, কে জানে, ছেলেটা এত রাত করছে কেন বুঝতে পারছি না।

বিছানার উপর কাঁথার আড়াল থেকে হঠাৎ জাগা-চোখ বের করে বিধু প্রশ্ন করে--বড়দা ফিরেছে মা?

বিভাময়ী--না। তোরা ঘুমো।

বুকের বাঁ পাশে হাত বুলিয়ে অনাদিবাবু একবার দেয়ালের একটা তাকের দিকে তাকান, যেখানে নিঃশব্দে পড়ে আছে তাঁর জীবনের অনেক প্রিয় সেই বইটা, সেই শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। অনাদিবাবুর চোখের চাহনির ভঙ্গীটাও অদ্ভুত। যেন তাকের উপর রাখা একটা বাজে আবর্জনার দিকে তাকিয়ে আছেন।

বিভাময়ীর গায়ের জ্বর একটুও কমেনি। বেড়েছে কিনা তাও বোধ হয় বুঝতে পারেন না। শুধু বুঝতে পারেন, পা দুটো বড় বেশি ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, কনকন করছে।

অনাদিবাবু বলেন--যা কপালে ছিল তাই হয়েছে বিভা।

বিভাময়ী--কি?

অনাদিবাবু--শেখরের চাকরি হয়নি।

কোন উত্তর দেন না বিভাময়ী। জ্বরের শরীরটা শুধু একবার সিরসির করে ওঠে। তার পরেই আঁচল তুলে চোখ মোছেন বিভাময়ী।

ধড়ফড় করে বিছানার উপরেই শায়িত শরীরটাকে কাত করে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন অনাদিবাবু--তুমি কি সত্যিই ভগবানে বিশ্বাস কর বিভা?

বিভাময়ী--বিশ্বাস না করে উপায় কি?

অনাদিবাবু--তার মানে?

বিভাময়ী--ভগবান যদি না থাকে, তবে মানুষকে মিছিমিছি এত ভয়ানক দুঃখটা দেবে আর কে বল?

অনাদিবাবু—ছিঃ, তাকে কি ভগবান বলে?

বিভাময়ী—জানি না।

আবার চেঁচিয়ে ওঠেন অনাদিবাবু—না জানলে চলবে কি ক'রে? চোখের উপরেই দেখতে পাচ্ছ তো, কত চোর-ডাকাত মহাসুখে আছে, আর নিরীহ মানুষ জ্বলে পুড়ে মরছে! তবু ভগবানের উপর ভরসা যদি কর, তবে কোন কালেই কিছু হবে না।

বিভাময়ী--আর কারও ওপর ভরসা করি না।

এইবার একটু শান্তভাবে হাঁসফাঁস করেন অনাদিবাবু--তাই বল।

অনেকক্ষণ চুপ করে পড়ে থাকেন অনাদিবাবু। পিঠের ব্যথাটাও যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। বিভাময়ী প্রশ্ন করেন--ঘুমিয়ে পড়লে না কি?

অনাদিবাবু--না।

বলতে বলতে উঠে বসেন অনাদিবাবু। তারপর ঘরের চারদিকে তাকিয়ে, রুক্ষ ও শুষ্ক দৃষ্টিটাতে যেন জ্বালা ধরিয়ে দিয়ে আবার বিড়বিড় করতে থাকেন--ভাবছি, কী অদ্ভুত দুর্ভাগ্য! চোর-ডাকাত হবার মতও শক্তি আর নেই। বয়স হয়েছে, তার ওপর এই দুর্বল পাঁজরা।

বিভাময়ী উঠে দাঁড়ান। আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে যান। অনাদিবাবুর একটা হাত ধরে বলেন--আশ্চর্য, তুমি আবার এসব কি বলছো? তোমার মুখে এসব কথা সাজে না।

অনাদিবাবু--কেন সাজে না?

--না। চেঁচিয়ে ওঠেন বিভাময়ী। বিভাময়ীর গায়ের সব জ্বরের জ্বালা যেন তাঁর চোখের উপর গিয়ে লুটিয়ে পড়ে। চোখ দুটো অদ্ভুতভাবে জ্বলে উঠেছে।

অনাদিবাবু বলেন--কি হলো? তুমি কার ওপর রাগ করছো?

বিভাময়ী--রাগ করে নয়, গর্ব করে বলছি, তোমাকে চোর ডাকাত করবার সাধ্যি ভগবানেরও নেই।

গর্ব? ঠিকই তো। অনাদিবাবুর মনে হয়, সত্যি কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে বিভা। এত অভাব, এত দুঃখ, এত ক্লেশ, তবু আজও এই বাড়িটা ভণ্ড কপট চোর আর মিথ্যুক হয়ে যেতে পারেনি। দুঃখ-অভাব সহ্য করে করে শুধু নিজের প্রাণটাকেই ক্ষতাক্ত করেছে এই বাড়িটা, অন্য কারও সুখ লুঠ করতে চেষ্টা করেনি, পৃথিবীর কোন মানুষকে এক বিন্দু দুঃখ দেয়নি। ঐ শেখর, লেখা-পড়া শিখে এত বড়টি হয়েছে যে ছেলে, তাকে কখনও একটি মিথ্যা কথা বলতে শোনেননি অনাদিবাবু। আর ঐ মধু ও বিধু, রথের মেলার দিনেও একটি পয়সা পাওয়ার জন্য লোভী হয়ে কোন বায়না ধরে না ওরা। ছেলেমানুষ হয়েও কত শক্ত হয়ে গিয়েছে ওদের প্রাণ। এই তো ভাল, ঠিকই বলেছে বিভাময়ী। এক বেলা খেয়ে, কিংবা উপোস করে থেকেও এই গর্ব নিয়ে একদিন চোখ বন্ধ করতে পারা যাবে যে, ভাগ্য আর ভগবান এক সঙ্গে মিলেও পঁচাত্তর টাকা মাইনের একটা সামান্য মানুষকে চোর করতে পারেনি।

বাইরের দরজাটা শব্দ করে ওঠে। চমকে ওঠেন বিভাময়ী আর অনাদিবাবু।

হ্যাঁ, শেখরই এসেছে। আস্তে আস্তে হেঁটে এসে বারান্দার উপর উঠে জুতো খোলে শেখর। তারপর কলতলায় গিয়ে হাত-পা ও মুখ ধুয়ে ঘরের ভিতর এসে ঢোকে।

অনাদিবাবু স্বচ্ছন্দে প্রশ্ন করেন--মিছিমিছি এত দেরি করলি কেন রে?

গম্ভীর অথচ শুকনো স্বরে শেখর বলে--মিছিমিছি বলেই তো এত দেরি হলো।

বিভাময়ী--তার মানে, কাজটা হলো না?

শেখর--না।

মধু আর বিধু একসঙ্গে গায়ের কাঁথা ফেলে দিয়ে বিছানার উপর উঠে বসে। দু'হাতে চোখ ঘষে, যেন ব্যর্থ স্বপ্নের মোহটাকে মুছে দিয়ে বড়দার মুখের দিকে তাকায়।

টালিগঞ্জের ক্ষুদ্র বাড়ির সব কৌতূহলের চরম অবসান এতক্ষণে হয়ে গেল। আর প্রশ্ন করে জানবার কিছু নেই। শেখরই বলে—আমার নিজেরই ভুলে কাজটা হলো না।

শেখরের কথার শব্দ শুনেও ঘরের প্রাণটা অচঞ্চল হয়ে থাকে নীরব স্তব্ধ ও শান্ত। অনেকক্ষণ। তার পরেই বিভাময়ী বলেন—চল, খাবি চল।

শেখর বলে—খেতে পারবো না।

বিভাময়ী—কেন?

শেখর—ভাল লাগছে না।

শুধু মধু আর বিধু খেয়েছিল। অনাদিবাবু আর বিভাময়ী শেখরের অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁদেরও যে খাওয়া হয়নি, সেটা শেখর জানে না, এবং জানলে বোধহয় অন্য কথা বলতো।

শেখর শুয়ে পড়তেই অনাদিবাবু আবার বিছানার উপর গড়িয়ে পড়েন এবং অসাড় শবের মত পড়ে থাকেন। বিভাময়ী ঘরের দরজা বন্ধ করে মেজের উপর মাদুর পাতেন। তারপরেই বাতি নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েন! অন্ধকার ঘরের ভিতর শুধু কয়েকটা বড় বড় দীর্ঘশ্বাসের শব্দ কিছুক্ষণ ছড়িয়ে ছড়িয়ে বাজতে থাকে। তার পরেই নিঝুম হয়ে যায় টালিগঞ্জের গলির ক্ষুদ্র বাড়ি। যেন দুঃসহ এক লজ্জার জ্বালায় মুখ লুকিয়ে আর উপোস করে নীরবে প্রায়শ্চিত্ত করছে কতগুলি অপরাধী জীবন।

৫

অবন্তী সরকারের বাবা নিবারণবাবু তাঁর পক্ষাঘাতের দুঃখ ভুলে গিয়ে এক হাতে ভর দিয়ে বিছানার উপর উঠে বসতে চেষ্টা করেন, এবং সেই সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠেন—ভগবান আছেন, সত্যিই ভগবান আছেন অবন্তী।

অবন্তী হাসে—তোমার কি কোনদিন সন্দেহ হয়েছিল?

নিবারণবাবু—হয়েছিল বৈকি। দুঃখ দুর্দশার জ্বালায় পড়ে খুবই সন্দেহ হয়েছিল অবন্তী। ভুল করে ভগবানের দয়াতেই অবিশ্বাস জন্মেছিল। কিন্তু ভগবানই আজ সেই ভুল ভেঙ্গে দিলেন।

এই বাড়িও একটা গলির মুখের কাছে ছোটখাট বাড়ি। কাশীপুরের গঙ্গা এই গলির কাছে দাঁড়িয়ে দেখা যায়। আজ সূর্য অস্ত যাবার আগে, গঙ্গার বুকের জলে যখন পশ্চিমের আকাশ থেকে রঙীন আভা ঝরে পড়েছে, তখন এই বাড়ির তিনটি কিশোর মানুষের কণ্ঠে জয়ধ্বনির মত একটা আনন্দের রব বেজে উঠেছে—দিদির চাকরি হয়েছে বাবা।

অবন্তী সরকারের চাকরি হয়েছে। অবন্তী সরকারের সঙ্গে আলাপ করে জেনারেল ম্যানেজার খুশি হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট-পত্রও দিয়েছেন। আগামী কাল সকাল দশটাতে অফিসে গিয়ে অবন্তী সরকার তার নতুন চাকরি-জীবনের যাত্রা সুরু করবে। মনে হয়, একটা অপার্থিব রঙীন আভা ঝরে পড়েছে কাশীপুরের গলির মুখে এই পার্থিব সংসারের এতদিনের যত দুঃখ ও দীনতার ধোঁয়া আর ধুলোর উপর। এক মুহূর্তের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দীর্ঘদিনের দুঃসহ পীড়নে ক্লান্ত একঘর মানুষের বিষণ্ণ জীবন।

নিবারণবাবু তাঁর জীবনের হারিয়ে যাওয়া সব চেয়ে প্রিয় বিশ্বাস হঠাৎ আবার মনের কাছে ফিরে পেয়েছেন। জোরে চেঁচিয়ে কথা বলতে ভুলে গিয়েছিল, হাসবার সাহস হারিয়ে ফেলেছিল যারা, সেই সব ছোট ছোট মানুষের চোখেও—হারু চারু আর নরুর চোখে যেন নতুন সূর্যোদয়ের আভা এসে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই এত কলরব।

দরজার বাইরে একটা ভিখারী এসে দাঁড়িয়ে কর্কশ স্বরে কৃষ্ণনাম গাইতে শুরু করেছে। আজ তাকে ধমক দিতে ভুলে গেলেন নিবারণবাবু। আর, চারু দৌড় দিয়ে বাইরে গিয়ে

ভিখারীটার ঝুলিতে এক বাটি চাল ফেলে দিয়ে চলে আসে।

অবন্তী বলে—আর এই বাড়িতে নয় বাবা।

হ্যাঁ, এটা ভাড়া বাড়ি। মাসে ত্রিশ টাকা ভাড়া, এবং সেই ভাড়া নিয়মমত ও যথাসময়ে দিতে না পারায় বছরের পর বছর বাড়িওয়ালার কথা আর আচরণে যে অপমান সইতে হয়েছে, সেই অপমানের জ্বালাকেই অপমান করবার জন্য অবন্তী সরকারের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে।

অবন্তী বলে—পার্ক সার্কাসে একটা নতুন বাড়িতে সুন্দর একটা ফ্ল্যাট খালি আছে, একশো টাকা ভাড়া।

নিবারণবাবু বলেন—বেশ, সেখানেই উঠে যাওয়া যাক।

অবন্তী বলে—চৌরঙ্গিতে একটা বড় দোকান আছে, ফার্নিচার সাপ্লাই করে। দাম কিস্তিতে নেয়।

চারু আর হারু একসঙ্গে চেঁচায়—আমাদের জন্যে একটা নতুন টেবিল।

নরু বলে—আমার জন্যে একটা ক্যারম বোর্ড।

নিবারণবাবু—বেশ তো, ঘর সাজাবার জন্য যা যা দরকার, তাছাড়া কিছু কিছু কাজের জিনিসও কিনে ফেলতে পারলে ভালই হয়।

চারু আর হারু বলে—একটা রেডিও না হলে ভাল লাগে না দিদি। অবাধ হাওয়ার ঝড়ের মত ইচ্ছাগুলি যেন হুহু করে ছুটে আসছে। যেমন প্রৌঢ় নিবারণবাবু, তেমনি প্রায়শিশু নরু, সবারই জীবনের দাবি একসঙ্গে মুখর হয়ে উঠতে চাইছে। মুখর হয়ে উঠতে ভাল লাগছে। অবন্তী সরকারের দু'চোখের উজ্জ্বলতার মধ্যেও যেন একটা স্বপ্নময় নিবিড়তা। ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে, এং সেই প্রসন্নতাকে একেবারে মনে প্রাণে আপন করে নিতে হবে।

ভাইদের মুখের দিকে তাকিয়ে অবন্তী সরকার হেসে ওঠে।—আজ একটা পিকনিক করলে কেমন হয়?

চারু—খুব ভাল হয় দিদি।

নিবারণবাবু বিছানার উপর কাত হয়ে বসে হাসতে থাকেন।—সন্ধ্যা হয়ে এসেছে অবন্তী। আজ আর কোথায় গিয়ে পিকনিক করবি? চারু আর হারু বলে—ছাদের ওপরে।

টাকা বের করে চারুর হাতে দিয়ে হাসতে থাকে অবন্তী—লুচি, চিংড়ি-কপি আর পায়েস হোক, কেমন?

উল্লাসে লাফিয়ে আর উৎফুল্ল ভাবে চেঁচিয়ে বাজার করবার জন্য ছুটে বের হয়ে যায় চারু আর হারু।

কাশীপুরের গলির মুখে ছোট একটা বাড়ির জীবনে সুখের প্রতিষ্ঠার উৎসব সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত গল্পে হাস্যে আর কলরবে মুখর হয়ে উঠতে থাকে। নিবারণবাবু বিছানার উপর কাত হয়ে শুয়ে শুয়েই চারটি গান গাইলেন। তাঁর জীবনের অনেক দিনের আগের প্রিয় ভজনগুলি যেন ভাঙ্গা সেতারের মত তাঁর মনের ঘরের এক কোণে ধুলোয় ঢাকা হয়ে পড়েছিল। রোগ আর অভাব এক সঙ্গে মিলে নিবারণবাবুর গলা রুদ্ধ করে রেখেছিল। কিংবা এমনও হতে পারে যে, নিবারণবাবুর গলা ঐ সব ভজনের অসার আশ্বাসগুলিকে ঘৃণা করে এবং ইচ্ছে করেই নীরব করে রেখেছিল। আজ হঠাৎ ভুল ভেঙ্গে গিয়েছে, তাই গলা খুলে চার চারটে গান গাইতে পারলেন নিবারণবাবু।

রাত যখন নিঝুম হয়, নিবারণবাবু যখন পায়েস আর কোকো খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন, এবং হারু, চারু ও নরু বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ে ঘুমন্ত চোখে নতুন নতুন অঢেল স্বপ্ন দেখতে শুরু করে, তখন অবন্তী সরকারের আত্মাটা যেন একটু একলা হবার সুযোগ পায়।

আরও অনেকক্ষণ জেগে বসে থাকে অবন্তী। গঙ্গার ঘাটে মোটর বোটের কোন শব্দ

শোনা যায় না। ঘুমন্ত ঘরের দেয়ালে আয়নাটার উপর অবন্তী সরকারের মুখের ছবি ভাসে। সত্যিই, অবন্তী এতক্ষণ পরে একলাটি হয়ে নিজেকে এইবার বড় স্পষ্ট দেখতে পায়। নিজের মুখের ঐ ছবিটিকেই দেখতে আজ নতুন করে ভাল লাগে, কারণ ছবিটি দেখতে খুবই সুন্দর। স্নো রুজ পাউডার আর লিপস্টিকের ধার ধারে না অবন্তী। কিন্তু অবন্তী জানে, এবং আজ আরও ভাল করে দেখতেই পায়, অবন্তীর ঐ দুই চোখের মধ্যেই কাজলমাখা একটা ছায়া-ছায়া কালো আপনি ফুটে রয়েছে। কাজলের দরকার হয় না। ঠোঁট দুটিও যে আপন রক্তের গর্বে রঙীন হয়ে আছে। লিপস্টিকের দরকার হয় না। রুমাল দিয়ে আস্তে একটু ঘষা দিলেই সারা মুখটা ঝকঝক করে ওঠে, স্নো ঘষবার কোন দরকার নেই।

আস্তে আস্তে খোঁপার বাঁধন খোলে অবন্তী। সে বাঁধনেও বিশেষ কোন স্টাইলের ছাঁদ ছিল না। দরকার কি? নরম নরম রেশমের স্তবকের মত ঐ একরাশ কালো চুলের বোঝাকে সামান্য একটু চিরুনি বুলিয়ে ছেড়ে দিলে, কিংবা তিনপাক দিয়ে গুটিয়ে ঘাড়ের উপর তুলে দিলেই তো যথেষ্ট।

একেবারে সাদা প্লেন শাড়ি। সরু পাড়ের রেখা চোখেই পড়ে না। সে পাড়ের রং আছে কিনা, তাও বোঝা যায় না। আজ যে শাড়িটা পরে চাকরির জন্য ইণ্টারভিউ দিতে গিয়েছিল অবন্তী, সে শাড়িটা একটা সাদা ভয়েল, পাড়টা ক্রিম রং-এর সরু লেস। এই সাদাটে সাজের মধ্যে অবন্তী সরকারের কালো চোখ আর এলোমেলো খোঁপার কালো স্তবক অদ্ভুত এক রূপের অভিমান নিবিড় করে তোলে। গলায় হার নেই, কানে কিংবা হাতেও কিছু নেই, অবন্তীর সেই মূর্তির মধ্যে অদ্ভুত একটা সাদাটে গর্ব যেন কঠোর মার্বেলের মত হাসে। অবন্তীও জানে, তার ঐ রূপের দিকে যার চোখ পড়ে, তারই চোখে যেন একটা লোভের বিস্ময় চমকে ওঠে। যে হঠাৎ তাকায় সে হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না।

কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। অবন্তী সে-সব চোখের দৃষ্টিকে কোন দিন মনের ভুলেও শ্রদ্ধা করতে পারেনি। বরং, মনে মনে নিজেই একটা অস্বস্তিকর লজ্জার বেদনা অনুভব করেছে। পৃথিবীর এই সব হতভম্ব বিস্মিত আর লোভী চোখগুলি যেন কতগুলি বিদ্রূপ। ওরকমের চোখ নিয়ে অবন্তীকে চিনতে পারা যায় না। ঐসব দৃষ্টি কোন নারীর জীবনের সম্মান নয়। ঐসব দৃষ্টিকে ঘৃণা করতেই বরং ভাল লাগে।

জীবনে শুধু একজনের চোখের বিস্মিত দৃষ্টিকে ঘৃণা করতে পারেনি অবন্তী। ঘৃণা করা দূরে থাকুক, মনে-প্রাণে ভালই লেগেছে, এবং বার বার সেই দুটি চোখেরই দৃষ্টিকে চোখের কাছে দেখতে ইচ্ছা করে। নিখিলের চোখের মধ্যে যেন অদ্ভুত একটা কৃতজ্ঞতার বিস্ময় সব সময় জ্বলজ্বল করে। কারণ, নিখিলের চোখের সেই বিস্ময় যে অবন্তীরই জীবনের সম্মান গর্ব আর অভিনন্দন। নিখিল কাছে এসে দাঁড়ালেই মনে হয় অবন্তীর, সে তার ভালবাসার ভাগ্যকেও নিজের হাতে গড়ে তুলতে পারছে।

টাকা-পয়সা দিয়ে তৈরী অদৃষ্টটা অবন্তীকে গরীব করে দিতে অবন্তীর জীবনের প্রথম ভালবাসার ইচ্ছাটাকেই ভয় দেখিয়ে দমিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই অদৃষ্টকেও নিজের জেদের জোরে তুচ্ছ করেছে অবন্তী। গল্পে শোনা যায়, মানত সফল করবার জন্য অনেকে বুক চিরে রক্ত দিয়ে ব্রত করে। অবন্তীর ভালবাসার কাণ্ডটাও প্রায় সেইরকম ; অবন্তীর মত গরীব মেয়ের পক্ষে তার ভালবাসার মানুষের জন্য মাসে ত্রিশটা টাকা খরচ করা বুক চিরে রক্ত দিয়ে ব্রত করার চেয়েও কি কম কঠোর ব্রত?

নিখিলকে চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যাবে না, অবন্তীর জীবনের সেই রিক্ততার চেয়ে ভয়ানক রিক্ততা আর কি হতে পারে? এই রিক্ততা কল্পনাতেও সহ্য করতে পারে না অবন্তী। বিশ্বাস করে অবন্তী, নিখিলের জন্য সে সবই করতে পারে। সে জন্য আগুনে ঝাঁপ দেবার মত ব্রত করবার যদি দরকার হয়, তা'ও করতে বোধ হয় এক মুহূর্তও দেরি করবে না

অবন্তী। আজ মনে হয়, হ্যাঁ, সেই রকমই একটা ব্রত আজ পালন করতে পেরেছে অবন্তী। দরকার হয়েছিল এবং অন্য কোন উপায়ই যে ছিল না। একেবারে মাথা নীচু করে, চোখ ঝাপসা করে, আবেদন জানিয়ে, অভিমান করে এবং ইচ্ছে করেই এই কালো চোখের ছায়া-ছায়া নিবিড়তা আরও নিবিড় করে একটা লোকের চোখের বিস্ময়কে লুভিয়ে দিয়ে, এবং লোকটার পাথুরে আপত্তিকে অনেক চেষ্টায় গলিয়ে দিয়ে অবন্তী তার মানত আজ সফল করতে পেরেছে। আজও ভাগ্যটা অবন্তীকে ঠকাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু অবন্তী সত্যিই, শুধু একটা সুন্দর অভিনয়ের জোরে সেই ভাগ্যকেই ছলিয়ে ভুলিয়ে আর নিজে জয়ী হয়ে ফিরে আসতে পেরেছে। নিজেকে ওভাবে ছোট করতে গিয়ে অবন্তীর এত দিনের এত প্রিয় অহংকারের গায়ে একটা আগুনের জ্বালাও লেগেছিল। কিন্তু সে জ্বালাকেও তুচ্ছ করেছে অবন্তী। নিখিলের জন্য সবই করতে পারে অবন্তী।

কানপুরে চলে যাবার দুঃখ থেকে নিখিলকে বাঁচাতে পেরেছে অবন্তী। নিখিল এখন কলকাতাতেই ভাল চাকরির চেষ্টা করতে পারবে। নিখিলের হাতে প্রতি মাসে একশো টাকা তুলে দিতেও অবন্তীর কোন অসুবিধা নেই। সে সুযোগ, সে শক্তি নিজেই আজ অর্জন করেছে অবন্তী।

এতদিনে অবন্তীর জীবনের সেই জেদের তপস্যা সফল হয়েছে। নিজের হাতে নিজের ভাগ্য গড়বার আশা এইবার একেবারে উপহার হাতে নিয়ে দেখা দিয়েছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খোঁপা খুলতে খুলতে জীবনের এই সফল গর্বের আনন্দকেই যেন দুচোখে ধারণ করে আরও সুন্দর হয়ে ওঠে অবন্তী।

আর একটা আনন্দ। কালই সকালে এই শুভ খবর শুনে কত খুশি হয়ে উঠবে সেই মানুষটি, যার নাম নিখিল মজুমদার! পৃথিবীর মধ্যে এই তো একমাত্র মানুষ, যার মুখ থেকে আজ এক বছর ধরে ভালবাসার কথা শুনে আসছে অবন্তী। পৃথিবীর কোন ধূর্ত ও সজাগ চক্ষুও আজ পর্যন্ত বুঝে ফেলবার সুযোগ পায়নি যে, অবন্তী সরকার ঐ নিখিল মজুমদারের গরীব ভাগ্যটাকেও সুখী করবার জন্য প্রাণপণে একটা ভাল চাকরি খুঁজছে।

আজকের আনন্দের মধ্যে আরও অনেক কথাই মনে পড়ে। অবন্তীরই মুখ থেকে যে আশ্বাস পেয়ে মুগ্ধ হয়ে আছে নিখিলের মন, এবং যে আশ্বাসের প্রেরণায় প্রাণপণে একটা ভাল চাকরি খুঁজছে নিখিল। সেই আশ্বাসের ভাষাও যেন অবন্তীর এই সুখী ভাবনার নিভৃতে নীরবে গুঞ্জন করে।

—যেমন করেই হোক, আগে অবস্থার উন্নতি করে নিতে হয় নিখিল। আমি চাই, যেমন আমাব তেমনই তোমার অবস্থা আগে সচ্ছল হোক, নইলে অভাব আর কষ্টের মধ্যে বিয়ের উৎসবও বড় কষ্টের মনে হবে নিখিল।

খুব সত্যি কথা! নিখিলও স্বীকার করে। দু'জনেই রোজগার করবে, কেউ কারও কাছে ভাতকাপড়ের প্রার্থী হয়ে থাকবে না অথচ একই ভালবাসার ঘরে দু'জনে থাকবে।

গঙ্গার ঘাটের দিক থেকে ফুরফুরে বাতাস ভেসে আসছে। ভোরের বাতাস নাকি? এতক্ষণে বুঝতে পারে অবন্তী, শরীরটা বেশ ক্লান্ত হয়েছে। চোখ দুটোও নিঝুম হয়ে আসছে। কাল সকালে উঠেই প্রস্তুত হতে হবে। সৌভাগ্যের পথে প্রথম যাত্রা শুরু হবে। বাতি নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে অবন্তী সরকার।

প্রথম তন্দ্রার মধ্যে আবছায়ার মত একটা স্মৃতির ছবি হঠাৎ একবার যেন অবন্তীর চোখের উপর দিয়ে ছায়া বুলিয়ে দিয়ে চলে যায়। বড় বড় কয়েকটা সোফা, প্রকাণ্ড একটা নোটিস বোর্ড, দরজার গায়ে ঝকঝকে পিতলের নেমপ্লেট আর দেয়ালের গায়ে ঘড়িতে প্রায় একটা বাজে। এক ভদ্রলোক অবন্তী সরকারের মুখের দিকে হঠাৎ একবার অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে লিফটের দিকে ছুটে চলে গেলেন। কি যেন সেই ভদ্রলোকের নাম? অনসূয়ার বৌদি

প্রভার দাদা হন সেই ভদ্রলোক। হ্যাঁ, অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছিলেন সেই ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের চোখ দুটোও বারবার বড় বিশ্রী রকমের মুগ্ধ হয়ে উঠেছিল। তন্দ্রার মধ্যেই হেসে ফেলতে চেষ্টা করে অবন্তী।

৬

টালিগঞ্জের গলির ভিতর ক্ষুদ্র একটা বাড়ির উঠানে পেঁপে গাছের ডালে বসে সকাল বেলার কাক বড় বিশ্রী ডাক ছাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দরজায় আরও বিশ্রী শব্দ করে একটা আঘাত বাজতে থাকে। প্রচণ্ড ভাবে কড়া নাড়ার কর্কশ শব্দ। বুঝতে পারে শেখর, বাড়িওয়ালার দারোয়ান ভাড়ার তাগিদ দিতে এসেছে।

বিছানার উপর বসে অনাদিবাবুও হাঁক দেন ; সেই হাঁকের স্বরও আর এক রকমের কর্কশতায় বিশ্রী হয়ে বেজে ওঠে--ওহে সুযোগ্য ছেলে, শুনতে পাচ্ছ?

শুনতে পেয়েছে, এবং বুঝতেও পেরেছে শেখর। অনাদিবাবু আজকের সকালের এই প্রথম সম্ভাষণেই শেখর নামে তাঁর এক অতিশিক্ষিত ছেলের অপদার্থ জীবনটাকেই আক্রমণ করেছেন। বাড়িওয়ালার দারোয়ান বুড়ো বাপকে অপমান করতে এসেছে, এবং ত্রিশ বছর বয়সের ছেলে ঘরের ভিতর চুপ করে বসে সেই অপমানের কর্কশ শব্দ শুনছে। জীবনে এর চেয়ে বেশি ঘৃণার ব্যাপার আর কি হতে পারে?

এখনও মেঝের মাদুরের উপর পড়ে আছেন বিভাময়ী। কাল সকালে কালীঘাটে পুজো দিতে গিয়ে অনেকটা পথ হেঁটে হেঁটে যাওয়া-আসা করতে হয়েছিল। কোমরে মচকানির মত একটা ব্যথা ধরেছিল তারই জের চলছে। সকাল হয়ে গেলেও এবং ঘুম ভেঙ্গে গেলেও আজ আর উঠতে পারছেন না।

মধু আর বিধু কাঁথা মুড়ি দিয়ে দুটো পুঁটলির মত পড়ে আছে। আজ আর জেগে উঠবার কোন তাড়া নেই। কিন্তু জেগে উঠতে হলো। অনাদিবাবু আরও জোরে চেঁচিয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন--লজ্জা পাওয়া উচিত। মান-সম্মান বোধ থাকলে তুমি এতক্ষণ ওভাবে বসে থাকতে পারতে না। রোজগার করতে না পার, চুরি-ডাকাতি করতে তো পার।

বিভাময়ী উঠে বসে আর্তনাদ করেন--ভগবান!

অনাদিবাবু--রাখ তোমার ভগবান। ভগবানের এমনই দয়া যে, শিক্ষিত ছেলে ত্রিশ বছর বয়স পার করে দিয়েও একটা পয়সা রোজগারের সামর্থ্য পেল না।

শেখর বলে--মধু, একবার বাইরে যা তো।

মধু--কেন?

শেখর--যদি বাড়িওয়ালার দারোয়ান এসে থাকে, তবে...।

মধু--তুমি গিয়ে দেখে এস। আমার ভয় করে।

শেখর হাসে। তার পরেই উঠে দাঁড়ায়, দরজা খুলে বাইরে গিয়ে বাড়িওয়ালার দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলে। চলে যায় দারোয়ান।

অনাদিবাবুর গলার স্বরের উত্তাপ শান্ত হয় না। বিভাময়ীর দিকে তাকিয়ে সেইরকমই কর্কশ স্বরে আর একটা নির্দেশ ঘোষণা করেন--আজ আর যেন উনুনে আগুন না দেওয়া হয়। কোন দরকার নেই। উপোস করে সবাই শেষ হয়ে যাও, এই আমি চাই।

উনুনে আগুন দেবার দরকার আছে ঠিকই। কিন্তু বিভাময়ী জানেন, আগুন দিয়েও কোন লাভ নেই। কারণ, যা দরকার হবে, তার কোন চিহ্ন নেই ভাঁড়ারে। না চাল, না ডাল। দুর্দশাটা একেবারে নিখুঁত হয়ে এই সংসারটাকে সব কাজের দায় থেকে আজ একেবারে মুক্ত করে দিয়েছে।

অনাদিবাবু চিৎকার করেন--সুযোগ্য ছেলেকে বলে দাও বিভা, ভাঁড়ার ঘরের ভিতরে বসে যেন ধ্যান করে। তা হলেই কর্তব্য পালন করা হয়ে যাবে।

শেখর মিত্রের মনের উপর যেন একটা চাবুক আছড়ে পড়েছে, মুখটা হঠাৎ লালচে হয়ে ওঠে। কিন্তু ছটফট করে না শেখর। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে ভাঁড়ার ঘরের ভিতরে ঢোকে। তার পরেই চটি পায়ে দিয়ে বাড়ির বাইরে গিয়ে গলির পথে দাঁড়ায়। বিধু একটা লাফ দিয়ে উঠে দরজা দিয়ে উঁকি দেয়। তার পরেই চেঁচিয়ে ওঠে--দাদা কোথায় চলে গেল মা।

অনাদিবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন--যাক, চলে যাক। তাই ভাল। তোরাও চলে যা। আমাকে মরবার আগে একটু হালকা হতে দে।

পেঁপে গাছের কাকটা অনেকক্ষণ ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে এবং বোধ হয় কলতলার দিকে তাকিয়ে একটু হতাশ হয়ে চলে গিয়েছে। বিভাময়ী উঠলেন। স্নান করলেন। এবং লক্ষ্মী-ঘট তুলে নিয়ে গিয়ে তুলসীতলায় জল ঢেলে দিয়ে আবার নতুন জল ভরে ঘরের ভিতর ফিরে এলেন।

অনাদিবাবুর চোখে ভ্রূকুটি দেখা দেয়। আস্তে আস্তে বিড় বিড় করেন--অসহ্য! তোমার কাণ্ডও অসহ্য।

বিভাময়ী--কি বললে?

অনাদিবাবু--ঐ লক্ষ্মী-ঘট এইবার সিকেয় তুলে রেখে দাও। আমি মরবার পর যখন সৌভাগ্যে সোনার সংসার জমে উঠবে, তখন আবার নামিয়ে এনে পূজো করো। অনেক হয়েছে, এবার একটু ক্ষান্তি দাও।

বিভাময়ী যেন শুনতে পাননি, কিংবা শুনেও বিচলিত হননি। কিংবা অদ্ভুত এক নির্বিকার অহংকার নিয়ে এই সংসারে সব দুর্ভাগ্যকেই তুচ্ছ করতে চাইছেন। তাই, যেমন রোজ সকালে তেমনই আজও সকালে ঘরের কোণে লক্ষ্মী-ঘট রাখলেন। তারপর বিধুর দিকে তাকিয়ে বললেন--মল্লিকবাবুদের বাগান থেকে আমপাতা নিয়ে আয় তো বাবা।

বিধু বলে--আমি পারবো না। মধু তুই যা।

মধু--আমিও পারবো না। আমি কাল নিয়ে এসেছি। তাছাড়া, আমার ওসব আর ভাল লাগে না।

বিভাময়ী--ভাল লাগে না মানে কি রে?

মধু--ওতে কিচ্ছু হয় না। একেবারে মিছিমিছি, শুধু সময় নষ্ট।

আর কোন কথা বলেন না বিভাময়ী। জ্বরের গায়ের উপর আঁচল ঢাকা দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে যান। খুব কাছে নয় মল্লিকবাবুদের বাগান। হেঁটে যেতে কষ্টও হচ্ছে। তবুও কয়েকটা আমপাতা এনে লক্ষ্মী-ঘটের চেহারা সাজাতেই হবে।

অনাদিবাবু বলেন--আশ্চর্য, তবু শিক্ষা হয় না। মানুষও মিছিমিছি নিজের জীবনকে এমন করে ঠকাতে পারে?

মধু আর বিধু ঘরের বাইরে গিয়ে গলির রোদের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। অনাদিবাবুও উঠলেন, আর এভাবে পড়ে না থেকে অফিসে চলে যাওয়াই ভাল। যে ঘরে আজ উনুন জ্বলবে না, হাঁড়ি চড়বে না, দুটো ছোট ছেলেও উপোস করে থাকবে, সেই ঘরকে লক্ষ্মী-ঘট দিয়ে সাজাবার কাজ ছাড়া আর কোন কাজ করবার উপায় নেই। বিদ্রূপ, কী ভয়ানক বিদ্রূপ!

বিছানা থেকে নেমে মুখ ধোওয়ার জন্য জলের ঘটি হাতের কাছে টেনে নিতেই অনাদিবাবুর বুকের ভিতরটা কনকন করে ওঠে। নিঃশ্বাসটা ফুঁপিয়ে ওঠে। চোখের কোণ থেকে টুপটাপ করে জলের ফোঁটা ঝরে পড়ে। ব্যস্তভাবে ডাক দেন অনাদিবাববু--ওরে মধু,

ওরে বিধু!

ডাক শুনে মধু আর বিধু ব্যস্ত হয় না। এবং নিতান্ত অনিচ্ছায় মুখ গম্ভীর করে আস্তে আস্তে হেঁটে দু'জনে ঘরের ভিতরে ঢোকে।

অনাদিবাবু প্রশ্ন করেন--শেখর কি সত্যিই চলে গেল?

মধু--বড়দা অনেকক্ষণ হলো চলে গিয়েছে।

অনাদিবাবু--দেখ তো, কোন্ দিকে গেল?...আর বিধু, তুই একটু দেখ তো বাবা, তোর মা কোন্ দিকে গেল। মানুষটা কাল থেকে জ্বরে ভুগছে।

মধু আর বিধু বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বিচলিত হয়। চোখ ছল ছল করছে তারই, যে মানুষটা এই এক মিনিট আগেও কঠোর ভাবে সবাইকে সরে যেতে আর মরে যেতে বলেছিলেন।

মধু ভয়ে ভয়ে বলে--তুমি কাঁদছো কেন বাবা?

বিধু বলে--তুমি আজ আর অফিসে যেও না বাবা।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে, তারপর ব্যস্তভাবে চোখ মুছতে থাকেন অনাদিবাবু, এবং শান্তভাবে বলেন--যাক গে, তোরা একটা কাজ কর। আমার চিঠি নিয়ে রাধানাথের দোকানে একবার যা। মনে হয়, পাঁচ টাকার মত বাজার ধারে দিতে রাজি হবে রাধানাথ।

এক টুকরো কাগজের উপর অনেক মিনতি জানিয়ে রাধানাথের কাছে প্রতিশ্রুতি লেখেন অনাদিবাবু, আগেকার বাকি তেইশ টাকা আসছে মাসের মাঝামাঝি নিশ্চয়ই শোধ করে দেব, আজ যেন অন্তত পাঁচ টাকার চাল-ডাল পাঠিয়ে দেয় রাধানাথ।

চিঠি হাতে নিয়ে মধু আর বিধু বাইরে যাবার জন্য তৈরী হতেই ঘরের দরজার কাছে হাঁক-ডাকের শব্দ শোনা যায়। ঘরে ঢোকে শেখর সঙ্গে দুজন ঝাঁকা মুটে। ঝাঁকার উপর নানারকম ছোট বড় কাগজের ঠোঙ্গায় ভারি-ভারি সামগ্রী।

আস্তে হাঁপ ছেড়ে শেখর বলে--মা কোথায় গেল মধু?

বিধু বলে--এখুনি ডেকে আনছি।

অনাদিবাবু তেমনই শান্তভাবে বসে দেখতে থাকেন, এই নিরন্ন সংসারের ক্ষুধা মেটাবার জন্য যা প্রয়োজন, অন্তত এক মাসের মত যা প্রয়োজন, সবই নিয়ে এসেছে শেখর। ছোট এক কৌটা ঘি-ও আছে। ঝাঁকার জিনিস নামাতে নামাতে শেখরই অনাদিবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে--তুমি তো পোস্ত খুব ভালবাস বাবা?

অনাদিবাবু--হ্যাঁ, কিন্তু এসব কি ব্যাপার শেখর?

শেখর--তোমার জন্য এক পো পোস্ত এনেছি।

বোধ হয় আবার অনাদিবাবুর দুচোখে একটা তপ্ততা ছলছল করে উঠবে। বারান্দা থেকে উঠে ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতরে চলে যান। এ কি হলো? কোথা থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে এসব কি নিয়ে এল শেখর? অযোগ্য ছেলেকে ভয়ানক কর্কশ ভাষায় ধিক্কার দিয়ে কিছুক্ষণ আগে চুরি-ডাকাতির গৌরব ঘোষণা করেছিলেন তিনি। তবে কি, সত্যিই কি অযোগ্য ছেলে সেই ধিক্কারের জ্বালায় একটা কাণ্ড করে বসলো? দেখা যায়, মস্ত বড় একটা প্যাকেটও নিজের হাতে বয়ে নিয়ে এসেছে শেখর। প্যাকেটের উপর একটা বস্ত্রালয়ের নাম ছাপা রয়েছে। নিশ্চয় অনেকগুলি কাপড় জামার প্যাকেট।

--এ কি হলো? বিড়বিড় করে বলতে বলতে থর থর করে কাঁপতে থাকেন অনাদিবাবু। শেখর যেন আজকের অভিশপ্ত এই সকালের ধোঁয়াভরা বাতাসের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে এই উপোসী সংসারটার জন্য এক গাদা খোরাক লুঠ করে নিয়ে এসেছে। সন্দেহ করতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু সন্দেহ না করেই বা উপায় কি? কোন চাকরি করে না, আজ পর্যন্ত কোন চাকরি পায়নি, এখন শুধু মস্ত বড় একটা কাজ পাওয়ার আশায় মন বড় করে ঘরে বসে

আছে যে ছেলে, সে ছেলে টাকা পেল কোথায়?

শেখরকে শুধু একটা প্রশ্ন করলেই তো অনাদিবাবুর মনের এই সন্দেহ মিটে যায়। কিন্তু প্রশ্ন করবারই সাহস হয় না। কে জানে, কি উত্তর দেবে শেখর? যদি একটা ভয়ংকর উত্তর দিয়ে বসে, যদি সত্যিই বলে দেয় যে, চুরি করেছি, একটা ধাপ্পা দিয়ে এই বাজার নিয়ে এসেছি, খেয়ে খুশি হও তোমরা, তবে? তাহলে যে বলবারই আর কিছু থাকবে না।

অনাদিবাবুর দুর্বল মনের এই বিকার বোধ হয় খুব শিগগির শান্ত হতো না, যদি মধু তখন মহোল্লাসে ছুটে এসে একটা সুখবর না দিত। মধু বলে--দাদা নিজে টাকা দিয়ে জিনিস কিনে নিয়ে এসেছে বাবা। দাদা একটা কাজ ধরেছে, তাই টাকা পেয়েছে।

--সে কি রে শেখর? বলতে বলতে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসেন অনাদিবাবু।

অনাদিবাবুর বিস্মিত স্বরের প্রশ্ন শুনে শেখর হাসে—একটা ছাত্রকে পড়াবার কাজ নিলাম। কাল থেকে পড়াতে হবে। ছাত্রের বাপের কাছ থেকে কিছু টাকা আগাম পেয়েছি।

অনাদিবাবুর মুখটা করুণ হয়ে ওঠে। কিন্তু তুই যে বলেছিলি...।

শেখর--হ্যাঁ, কোনদিন ভাবিনি যে, এরকম ছাত্র পড়াবার কাজ নেবার দরকার হবে। কিন্তু.. !

অনাদিবাবু—কিন্তু আমার কথায় বোধ হয় মন খারাপ করে...!

শেখর হাসে--না বাবা, আমি ইচ্ছে করে আর বেশ খুশি হয়ে এই কাজটা নিয়েছি। মাসে একশো টাকা পাওয়া যাবে।

দেখে মনে হয়, সত্যিই খুশি হয়েছে শেখর। ওর চোখে মুখে কোন অভিমানের ছাপ নেই। এত ভাল একটা চাকরি হতে হতেও হলো না, সে জন্য এপর্যন্ত একটা আক্ষেপও শেখরের কথার মধ্যে বেজে উঠতে শোনা গেল না। অথচ নিজেই স্বীকার করেছে যে, নিজেরই দোষে কাজটা হয়নি। অনাদিবাবু একটু আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেন—কাল যে চাকরিটার জন্য ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল, সে চাকরিটা হলো না কেন রে?

চমকে ওঠে শেখর, এবং আনমনার মত বিড় বিড় করে উত্তর দেয়—বলেছি তো, নিজেরই ভুলে। হঠাৎ একটা ভুল হয়ে গেল।

হ্যাঁ ভুল। শেখরের মনের ভিতরে বিচিত্র এক অনুভবের কপাটে কেউ যেন টোকা দিয়ে আস্তে আস্তে বলছে, ভুল করে ফেলেছো শেখর। শেখরের নিঃশ্বাস ছাপিয়ে যেন একটা অস্পষ্ট মধুরতা গুঞ্জন করে উঠছে, ভুল করে ভালই করেছো শেখর।

ঘরের ভিতরে টেবিলের উপর ছড়ানো বইগুলির দিকে দৃষ্টি পড়ে, এগিয়ে গিয়ে একটা বই তুলে নিয়ে বারান্দার কোণে চেয়ারে বসে পড়তে চেষ্টা করে শেখর। কিন্তু বুঝতে পারে, বই নয়, শেখর যেন তার নিজের মনটাকেই পড়ছে। যে ঘটনাকে ভুলে যেতে ইচ্ছে করছে, সেই ঘটনার ছবিটাই বার বার মন জুড়ে ভেসে উঠছে।

অনেকক্ষণ, নীরব হয়ে গিয়েছে টালিগঞ্জের গলির ভিতর ক্ষুদ্র বাড়িটা। বিভাময়ী ফিরে এসেছেন। লক্ষ্মীর ঘট সাজিয়েছেন। রান্না চাপিয়েছেন। আর মধু ও বিধু ঘরের বাইরে গিয়ে খেলতে শুরু করেছে। ঘরের ভিতরে বিছানার উপর বসা অনাদিবাবুর মুখটাও প্রসন্ন। দেখতে পেয়ে শেখরের মুখটাও প্রসন্ন হয়ে ওঠে।

হাঁপ ছাড়ে শেখর, মনের ভিতর থেকে একটা গ্লানির ভার নেমে যায়। শেখরের ভুলের জন্য এই বাড়ির ক্লিষ্ট অদৃষ্ট যে সুখের প্রতিশ্রুতি থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তারই কিছুটা ফিরিয়ে আনতে পেরেছে শেখর।

ছাত্র পড়াবার কাজ নিতে কত ঘৃণাই না শেখরকে এতদিন বাধা দিয়ে এসেছে! অনাদিবাবুর বিস্ময়টা অহেতুক নয়। শেখর নিজেও আজ নিজের কাণ্ড দেখে একটু বিস্মিত হয় বৈকি। বেশ তো স্বচ্ছন্দে আজ নিজে এগিয়ে যেয়ে রতনবাবুর ছেলেকে পড়াবার কাজটা

নিতে রাজি হয়ে এল। এবং সব অহংকারের মাথা খেয়ে রতনবাবুর কাছ থেকে কিছু টাকা আগাম চাইতে পারলো। উপোস করবো, তবু ছেলে পড়ানো মাস্টারী কখনও করবো না। সেই অহংকারের ঘৃণাটাকে আজ অনায়াসে জয় করেছে শেখর। বুকের আড়ালে নিঃশ্বাসের বাতাসে হঠাৎ এত সাহস এসে জুটে গেল কেমন করে? মনের ঐ ভুলের মধ্যেই কি এই প্রেরণার মায়া লুকিয়ে আছে?

অবন্তী সরকার নামে সেই নারী, যার দুই কালো চোখের তারায় বুদ্ধির দীপ্তি চিকচিক করে, সে নারী কল্পনাও করতে পারবে না যে, তারই সুখের জন্য নিজের সৌভাগ্যের পথ ছেড়ে দিয়ে শেখর নামে একটা মানুষ আজ একটা অতি সামান্যতা আর দীনতার সংসারে চুপ করে বসে আছে। নাই বা জানলো। শেখর যেন তার মনের একটা বেহায়া ভাবনাকে জোর করে থামিয়ে দিতে চেষ্টা করে। মস্ত বড় একটা ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে শেখর, এই তথ্যটা অবন্তী সরকার যদি না জানতে পারে, তাতে কিই বা আসে যায়? অবন্তী সরকারের মনের দশা কি হলো বা না হলো, সে তথ্য না জানলেও চলে। অবন্তী সরকার না হয়ে অন্য কোন নারী, কিংবা কোন পুরুষও যদি শেখরের কাছে ওরকম করুণ আবেদন জানিয়ে উপকার প্রার্থনা করতো, তাহলে শেখর নিশ্চয় ঝোঁকের মাথায় এইরকমই একটা ত্যাগের কাণ্ড করে ফেলতো। কিন্তু...কিন্তু বার বার সেই ব্যক্তিকে মনে পড়তো কি?

ভাবতেও লজ্জা লাগে, অবন্তী সরকারের সেই ছায়া ছায়া দুটো কালো চোখের শোভা দেখতে বেশ ভালোই লেগেছিল! কে জানে উপকার করবার জন্য, কিংবা ঐ ক্ষণিকের অদ্ভুত ভাল লাগার জন্য এই যে কাণ্ড করে চলে এল শেখর, সে কাহিনী লোকে শুনলে শেখরকে মূর্খ বলে উপহাস করবে, কিংবা একেবারে আদেখলা লোভী বলে মনে করবে?

যা হয়ে গিয়েছে, তা তো হয়েই গিয়েছে। কিন্তু মনের ভিতরে আবার এরকমের একটা ঝঞ্ঝাট ঘটে কেন? কেন আশা হয়, অবন্তী সরকার নিশ্চয় একদিন এসে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাবে? কেন মনে হয়, অবন্তী সরকারও বোধ হয় আশ্চর্য হয়ে ভাবছে, একটা অ[illegible] মানুষের জন্য এত বড় ত্যাগ স্বীকারও করে? নিজের চিন্তার এই প্রশ্নগুলিই [illegible] দুর্বলতা। অবন্তী সরকারের মত একটা নারীকে জীবনের কাছে ডেকে এনে ভালবা[illegible] করছে, তাই কি?

সব প্রশ্নের বাড়াবাড়ি এখানেই থামিয়ে দিয়ে শেখর ভাবতে থাকে, যাদবপুরের সেই নতুন ল্যাবরেটরিতে একটা কাজ খালি আছে। আরও খোঁজ নিতে হবে, এবং কাজটা পাওয়ার জন্য চেষ্টাও করতে হবে।

দুপুর হতেই খাওয়াদাওয়া সেরে বের হয়ে যায় শেখর।

৭

কাশীপুরের গলির সেই বাড়ি নয়, এটা হলো পার্ক সার্কাসের একটা নতুন বাড়ির ফ্ল্যাট। প্রতি রবিবারের সন্ধ্যায় এই ফ্ল্যাটের প্রথম ঘরের ছোট টেবিলের উপর ফুলদানিতে টাটকা ফুলের গুচ্ছ হাসে আর সুগন্ধ ছড়ায়। এবং যতক্ষণ নিখিল না আসে ততক্ষণ চুপ করে বই পড়ে অবন্তী।

পর পর কয়েকটা মাস পার হয়ে গিয়েছে, অবন্তী সরকারের তিনশো ষাট টাকা মাইনের চাকরির জীবনেও আরও উন্নতির আশা দেখা দিয়েছে। জেনারেল ম্যানেজার বলেছেন, অবন্তীর কাজ দেখে আর একটু খুশি হবার সুযোগ পেলেই তিনি অবন্তীর মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দেবার জন্য সুপারিশ করবেন।

কিন্তু নিখিলের জীবন এখনও শুধু ভাল চাকরি[illegible] এবং চেষ্টায় দিন রাত ব্যস্ত হয়ে

রয়েছে। নিখিলের সেই চেষ্টায়ও যেন একটা রোগীর প্রাণের ছটফটানির মত। দিন রাত শুধু চাকরির ভাবনাই ভাবছে নিখিল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ছুটোছুটি করে। নিখিলের অমন সুন্দর ফরসা মুখের আভাও যেন মলিন হয়ে গিয়েছে।

অবন্তীও অনেকবার রাগ করে অভিযোগ করেছে—আমি থাকতে তোমার এত চিন্তা করবার কি আছে?

কিন্তু কি আশ্চর্য ; অবন্তীর এই অভিযোগের মধ্যে যে বিপুল সান্ত্বনা আছে, সেই সান্ত্বনাকেই যেন ভয় করে নিখিল। শোনা মাত্র মুখ ফিরিয়ে নেয়, এবং মুখটা আরও নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

অবন্তীও একদিন আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেছিল—আমার কাছ থেকে টাকা নিতে সত্যিই কি তুমি দুঃখ পাও নিখিল?

হ্যাঁ। মনের ঝোঁকে একটা তীব্র আক্ষেপের মত স্বরে কথাটা বলেও ফেলেছিল নিখিল।

সজল হয়ে উঠেছিল অবন্তীর চোখ। কিন্তু আমার যে তাইতেই আনন্দ। তোমাকে সাহায্য করতে পারছি, এই তো আমার সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য।

নিখিল বলে—তুমি আমার দুঃখটা বোধহয় ঠিক বুঝতে পারছো না অবন্তী। আমি আজ পর্যন্ত তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারলাম না, এই আক্ষেপ যে আমার মনের ভিতর কাঁটার মত বিঁধছে।

—ছিঃ। আরও নিবিড় অভিমানে দুই চোখ সজল করে নিখিলের কাছে এগিয়ে এসে আর একটা অভিযোগের কথা বলেছিল অবন্তী—আমার ভাগ্য কি তোমার ভাগ্য নয়? আমার টাকাকে তোমার নিজেরই টাকা বলে ভাবতে তোমার এই লজ্জার কোন মানে হয় না।

নিখিল হেসেছিল—তুমি ঠিকই বলেছ অবন্তী। আমি শুধু ভাবছি, আর কতদিন? কবে তুমিও আমার টাকাকে তোমার টাকা বলে মনে করবার সুযোগ পাবে, আর মনে করতে একটুও লজ্জা পাবে না?

শুনে দুঃখিত হয়ে উঠেছিল অবন্তীর মুখ। ঠিকই বলেছে নিখিল। অবন্তী নামে যে মেয়ের ফটোকে নিখিল তার বুক পকেটের ডায়েরির ভিতরে গোপন রত্নের মত লুকিয়ে রেখেছে, সে মেয়েকে আজও কোন উপকার করতে পারা গেল না, এই দুঃখ সহ্য করতে কষ্ট হয় নিখিলের। এই দুঃখ যে পুরুষের দুঃখ এবং এই দুঃখের লজ্জাও পুরুষের লজ্জা।

যতক্ষণ নিখিল না আসে ততক্ষণ ঘরের এই নীরবতার মধ্যে চুপ করে বসে অবন্তী তার মনের ভিতরের এই সব স্মৃতি, আর এই রকমেরই যত প্রশ্নের নীরব মুখরতা সহ্য করে। আসুক নিখিল, এসে যদি আবার মুখ বিষণ্ণ করে, এবং অবন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে ঠিক সেই আগের মত বিস্ময় আর উজ্জ্বল হাসি ওর দুই চোখে উচ্ছল না হয়ে ওঠে, তবে আজ আবার রাগ করতে হবে। আজ আবার বলতে হবে, আমার মাথার উপর মাথা তুলে একটা মস্ত বড় গর্বুটে পুরুষের মত কথা না বলতে পারলে তোমার মনে কোন আনন্দ হবে না, এ আবার কেমন মন? না হয় আমার কাছে অহংকারে একটু খাটোই হলে নিখিল!

মাঝে মাঝে, নীরব ঘরের ভিতরে এই প্রতীক্ষা আর ভাবনার মধ্যে অবন্তীর চেতনাটাই যেন আনমনা হয়ে যায়। এবং একদিন এমনই আনমনা হয়েছিল যে, ঘুমিয়েই পড়েছিল অবন্তী। নিখিল এসে ঘরের ভিতরে ঢুকে ডাক দিতেই ধড়ফড় করে জেগে চেঁচিয়ে উঠেছিল—অ্যাঁ! কি বলছেন আপনি?

নিখিল হাসে—কার সঙ্গে কথা বলছো অবন্তী? স্বপ্ন দেখছো নাকি?

অবন্তী বিব্রতভাবে বলে—না, ঠিক স্বপ্ন নয়। অন্য কথা ভাবছিলাম। অবন্তীর গম্ভীর চোখে মুখে একটা ভীরু অস্বস্তির ছায়া ফুটে রয়েছে, দেখে সেদিন একটু আশ্চর্যও হয়েছিল নিখিল। যে মেয়ে সর্বক্ষণ হাসতে চায়, এবং নিখিলের গম্ভীর মুখ যে মেয়ে এক মুহূর্তও সহ্য করতে

পারে না, সে মেয়েকে কিসের স্বপ্ন এত গম্ভীর করে দিল?

নিখিল আবার হাসে—অনেকদিন পরে তোমাকে গম্ভীর হতে দেখলাম অবন্তী।

আর একবার চমকে ওঠে অবন্তীর চোখের ছায়া ছায়া কালো। এবং রুমাল দিয়ে চোখ মুছে তারপর যেন দেখতে পায়, না, ভয় করবার কিছু নেই, সত্যিই কোন ভদ্রলোক লিফটের কাছে দাঁড়িয়ে অবন্তীর মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে কোন প্রশ্ন করছে না।

নিখিল যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ বই পড়তে চেষ্টা করেও এক একদিন শুধু হয়রানিই সার হয়। অবন্তী যেন ইচ্ছে করেই আনমনা হয়ে যায়। এবং ভয়ও পায়। কি হবে উপায়, যদি নিখিলের জীবনটা এভাবে মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর শুধু চাকরি খোঁজার হয়রানিতেই হাসি হারাতে থাকে? বাবার কাছেও এখন আর রহস্যটা অজানা নয়। এমন কি চারু হারু আর নরুও কিছু কিছু বুঝতে পেরেছে, নিখিলবাবু একেবারে পর নন, এবং একদিন যে একটা উৎসবের মধ্যে আরও সুন্দর হয়ে দেখা দিয়ে আরও আপন হয়ে যাবে নিখিল, এই বিশ্বাসের ছায়া এই বাড়ির সবারই চোখে মুখে লক্ষ্য করা যায়। অবন্তীর মনের গভীরে একটা ব্যাকুলতা মাঝে মাঝে যেন সব আগ্রহের জোর সঁপে দিয়ে প্রার্থনা করে, নিখিলের ভাগ্য একটু রঙীন হয়ে উঠুক, একটা ভাল চাকরি পেয়ে যাক নিখিল। নইলে অবন্তীর ভালবাসার আশাগুলিই যে শুকিয়ে ঝরে পড়ে যাবে।

চোখ বন্ধ করে আজও বোধহয় নিজের মনের এই নীরব প্রার্থনার ভাষা শুনছিল অবন্তী। ঘরের ভিতর পায়ের শব্দ শুনেই চমকে ওঠে, চোখ খুলে তাকায়, হেসে ওঠে। আজ এতক্ষণ পরে, বেশ একটু দেরি করে নিখিল এসেছে।

নিখিল হাসতে চেষ্টা করে।—বোধহয় অনেকক্ষণ ধরে আমার ওপর রাগ করে বসে আছ।

অবন্তী বলে—না, আর তোমার ওপর রাগ করতে পারছি না। রাগ হচ্ছে নিজেরই ভাগ্যের ওপর।

নিখিল—তার মানে?

অবন্তী—তার মানে তোমারই ভাগ্যের ওপর। কি আশ্চর্য ; আজ পর্যন্ত তোমার একটা ভাল চাকরির চিহ্ন পর্যন্ত দেখা গেল না।

নিখিল হাসে—একটা চিহ্ন দেখা গিয়েছে।

অবন্তীর চোখে হাসি ফুটে ওঠে। তাই বল। এতক্ষণ তাই ভাবছিলাম।

—কি?

—ভাবছিলাম, জীবনে কি এমন ভয়ানক অপরাধ করেছি যে, তোমার এই হয়রানি দিনের পর দিন শুধু দেখে দেখে চোখ ভেজাতে হবে।

ব্যথিতভাবে তাকায় নিখিল, কারণ দেখতে পেয়েছে নিখিল, অবন্তীর চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে উঠেছে।

নিখিল বলে—আমিও তাই ভাবছি অবন্তী। ইচ্ছে করছে, তোমার কাছে চিরকালের ঋণ স্বীকার করে এইবার চলে যাই। সে ঋণ কোনদিন শোধ করবো না। কিন্তু তুমি আর...।

অবন্তীর চোখের ছায়া ছায়া কালো যেন হঠাৎ বিদ্যুতের ছোঁয়ায় জ্বলে ওঠে। কি বলতে চাইছো তুমি? ভালবাসা ভুলে যাব? তোমাকে ভুলে যাব?

নিখিল—ভুলে যেতে পারলে তোমার ভালই হতো অবন্তী।

অবন্তীর মুখ করুণ হয়ে ওঠে। তুমি এত বেশি হতাশ হয়ে পড়লে কেন নিখিল? নিজেই তো বলছো যে...।

নিখিল—হ্যাঁ, একটা ভালো কাজের সন্ধান পেয়েছি। দরখাস্ত করেছি এবং সাড়াও পেয়েছি।

অবন্তী—কিসের কাজ?

নিখিল—যাদবপুরের একটা নতুন ল্যাবরেটরিতে কেমিস্টের কাজ।

অবন্তীর মুখের ছায়াচ্ছন্ন মেদুরতা মুছে যায়। চোখে মুখে যেন আশাময় একটা উৎফুল্লতা হাসি ফুটে ওঠে। ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করে। আমার মন বলছে, এ কাজটা তুমি পাবে।

নিখিল—ভরসা হয় না।

অবন্তী—কেন?

নিখিল—খোঁজ নিয়ে জেনেছি, আমার চেয়ে অনেক বেশি কোয়ালিফাইড আর একজন প্রার্থী আছে। শেখর মিত্র নামে এক ভদ্রলোক, রিসার্চে তার রেকর্ড খুবই ভাল।

চমকে ওঠে অবন্তী—কি নাম ভদ্রলোকের?

নিখিল—শেখর মিত্র। লেবরেটরি ম্যানেজিং ডিরেক্টর জানিয়েছেন, যদি শেখর মিত্র এই কাজটা শেষ পর্যন্ত না নেয়, তবে তোমাকে কাজটা দেবার কথা ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিংএ আলোচনা করা হবে। মনে হয়, তাহলে কাজটা আমিই পেয়ে যাব।

নীরব হয়ে তাকিয়ে শুধু শুনতে থাকে অবন্তী। এবং নিখিলও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে করুণভাবে হেসে ওঠে। কিন্তু এরকম একটা অ্যাকসিডেণ্ট যে হবেই হবে, সেটা কি করে বিশ্বাস করা যায় বল?

অবন্তী বলে—যদি হয়?

নিখিলের গলার স্বরও একটা আশাময় মধুরতার আবেগে টলমল করে ওঠে—যদি হয়, তবে...তারপর...তুমি মিছে কেন জিজ্ঞেসা করছো অবন্তী। যদি হয়, তবে আমাদের স্বপ্নও যে সফল হয়ে যাবে।

ধীরে ধীরে, অবন্তীর সারামুখ জুড়ে অদ্ভুত একটা বিশ্বাসের হাসি ছড়িয়ে পড়ে ঝিকমিক করতে থাকে। দু'চোখের ছায়া ছায়া কালোর মধ্যে বুদ্ধির দীপ্তি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। নতুন একটা প্রতিজ্ঞা যেন ছটফট করেছে অবন্তীর বুকের ভিতরে। অবন্তী বলে—আমার একটা কথা বিশ্বাস কর নিখিল।

নিখিল—বল।

অবন্তী—এই কাজটা তুমিই পাবে।

৮

মাসের পর মাস, পুরোপুরি তিনটি মাস পার হয়ে গিয়েছে। শেখর মিত্রের জীবনের ঘরে কোন আলাদিনের প্রদীপের আলো চমকে ওঠেনি। ঐ সেই রতনবাবুর ছেলেকে পড়ানো, আর কাজের চেষ্টা। টালিগঞ্জের গলির ক্ষুদ্র বাড়ির ভাগ্যের উপর টাকা পয়সার সুখ অবাক হয়ে ঝরে পড়েনি। কিন্তু একটা পরিবর্তন দেখা যায়। বাড়ির মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। এই বাড়ির ক্লিষ্ট প্রাণগুলির সেই বিমর্ষতা আর নেই।

কোন সন্দেহ নেই, এই পরিবর্তন ঘটিয়েছে স্বয়ং শেখর। অনাদিবাবু দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন, তাঁর বড় ছেলের মুখের ভাবটাই বদলে গিয়েছে, চোখের দৃষ্টিটাও বড় সুন্দর হয়ে উঠেছে। টালিগঞ্জের এই ক্ষুদ্র বাড়িটাকেই হঠাৎ যেন বড় বেশি ভালবেসে ফেলেছে শেখর। মধু আর বিধুকে পড়াবার জন্য সারাদিনের মধ্যে অন্তত দুটি ঘণ্টা সময় হাতে রাখে শেখর। নিজের হাতে চা তৈরী করে অনাদিবাবুর হাতের কাছে তুলে দিয়ে গল্প করে শেখর। এমন কি, শখ করে নিজেই এক একদিন বিভাময়ীকে বারান্দায় একটা আসনের উপর বসিয়ে রেখে নিজেই রান্না করে। রান্নার একটা ডিক্সনারি কিনেছে শেখর। বেশ উৎসাহের সঙ্গে, মাঝে মাঝে মধু আর বিধুর সঙ্গে হুল্লোড় জমিয়ে সেই ডিক্সনারি দেখে মাছের নতুন রকমের রান্না রাঁধে। শেখর উঠানের একদিকে রজনীগন্ধার অনেক গুলি চারাও পুঁতেছে। টাকাপয়সার হাসি

নয়, কিন্তু বাড়িটা যেন প্রাণের হাসি হাসে।

আর একটা সত্য, তার খবর আর কেউ না জানুক, শেখর জানে, এবং জেনে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে, তার মনের গভীরে একটি মায়ার ছবি হাসছে। পৃথিবীর একটা সুন্দর মুখের মেয়েকে হঠাৎ উপকার করতে গিয়ে বুকের ভিতরে এরকম অদ্ভুত এক অনুভবের ফুল ফুটে উঠবে, ভাবতেও পারেনি শেখর। কিন্তু কোথায় গেল অবন্তী সরকার?

আজ পর্যন্ত অবন্তী সরকারের আর কোন সংবাদ পায়নি শেখর। ইচ্ছে করলে তাকে তো এখনি গিয়ে দেখে আসতে পারা যায়। ঐ মিশন রো-তে সেই চারতলা বাড়ির ফ্ল্যাটে দি এগ্রি-মেশিনারি লিমিটেডের অফিস। নিশ্চয় সেই অফিসেরই এক কক্ষে বসে এখন কাজ করছে অবন্তী সরকার।

সত্যিই কাজটা পেয়েছে তো অবন্তী? সন্দেহ হয় শেখরের। পেয়ে থাকলে অবন্তীর কাছ থেকে একটা ধন্যবাদের চিঠি শেখরের কাছে এতদিনে পৌঁছে যেত নিশ্চয়। কিংবা কোন অসুখে পড়েছে সেই মেয়ে, যার উপর একটা সংসারের প্রাণ বাঁচাবার দায় চেপে রয়েছে?

প্রভার বাড়িতে একদিন ঘুরে আসতেই শেখরের কল্পনার এই ভয়টা মিটে যায়। প্রভার ছেলের অন্নপ্রাশন ছিল। প্রভার ননদ অনসূয়ার সঙ্গে দেখাও হলো। খুশি হয়ে কত কথাই না বললো অনুসূয়া। অনসূয়া বি-এ পাশ করেছে। অনসূয়া এরই মধ্যে একবার রাজগীর বেড়িয়ে এসেছে। অনেক ছবি এঁকেছে অনসূয়া। ভবানীপুরের এক মেয়ে স্কুলে টিচারের কাজ খালি হয়েছে। দরখাস্ত করেছে অনসূয়া। আশা করছে অনসূয়া, কাজটা হয়েই যাবে।

অনেক কথা বললো অনসূয়া এবং বিশেষ করে যার কথা অনসূয়ার মুখ থেকে শোনবার জন্য শেখরের সারা মন উৎকর্ণ হয়েছিল, তারই কথা বললো সব কথার শেষে।

--আমার ভাগ্য বড় জোর ঐ টিচারি পর্যন্ত। অবন্তীর মত ভাগ্য সবারই হয় না।

শেখরের বিস্মিত চোখের দিকে তাকিয়ে অনসূয়া বলে--অবন্তীকে চিনতে পারছেন তো? সেই যে আমার বন্ধু, প্রভার বউভাতের দিন নেমন্তন্নে এসেছিল। চমৎকার কথা বলতে পারে। বড় ভাল মেয়ে।

শেখর বলে--হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

অনসূয়া--অবন্তী এসেছিল। ওর কাছ থেকেই সব খবর পেলাম। তিনশো ষাট টাকা মাইনের একটা কাজ পেয়েছে অবন্তী। কাজটার জন্য অনেক ভাল ভাল ক্যানডিডেট ছিল। কিন্তু অবন্তীই পেয়ে গেল। সাধারণ গ্র্যাজুয়েট হলে হবে কি? অবন্তী খুবই ট্যালেন্টেড মেয়ে।

ব্যস, এই পর্যন্ত, অবন্তী সরকারের গল্প এখানেই শেষ করে দিল অনসূয়া। মাত্র এইটুকু খবর জানিয়ে গিয়েছে অবন্তী। তার মধ্যে শেখর মিত্র নামে একটা মানুষের নামের কোন উল্লেখ নেই। অবন্তী সরকারের ভাগ্যের কাহিনীর মধ্যে শেখর মিত্র নামে কোন নায়কের ঠাঁই নেই। অবন্তী বলতে ভুলে গিয়েছে। কে জানে কিসের জন্যে? যাক, তাহলে সুখী হয়েছে অবন্তী। এবং অবন্তী তার জীবনের অন্তত একটি ঘটনাকে দুর্লভ সম্পদের মত গোপন করে রেখেছে। শেখর মিত্র নামে একটি মানুষ গোপনে তাকে উপকারের যে উপহার দিয়েছে, সে উপহার অবন্তীর মনের ভিতরে লুকিয়ে রাখা গোপন ঐশ্বর্য। তাই কি? তাই তো মনে হয়। নইলে অনসূয়ার কাছে এত কথা বলেও শুধু ঐ ঘটনার গল্পটাকে নীরব করে রেখে দিল কেন অবন্তী?

তবে কি ভুলেই গিয়েছে অবন্তী? বিশ্বাস হয় না। সেই উপহারের মূল্য বোঝে না অবন্তী, তাকে এত ক্ষুদ্র মনের মানুষ বলেই বা মনে করতে হবে কেন? কিন্তু তবে কি? শুধু এই প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পায় না শেখর। অবন্তী কি শেখরের দু-চোখের দৃষ্টিকে সন্দেহ করলো আর ভয় পেল?

সন্দেহ করলে বড় ভুল করবে অবন্তী। সে তো নিজেই দেখতে পাচ্ছে যে, একটা মাস

পার হয়ে গেল, তবু শেখর মিত্র নামে এক ভদ্রলোক কোন প্রতিদান পাওয়ার দাবি নিয়ে, এমন কি অবন্তীর কাছ থেকে একটা কৃতজ্ঞতার কথা বা প্রশংসার কথা শোনবার আগ্রহ নিয়ে, অবন্তী সরকারের সুন্দর মুখ দেখবার জন্য সামান্য একটা লোভ নিয়েও অবন্তীর চোখের সামনে উপস্থিত হতে চেষ্টা করেনি। তবে ভয় করে কেন অবন্তী?

বাড়ি ফিরে এসেই দেখতে পায় শেখর, একটা চিঠি এসে পড়ে রয়েছে। একটা কেজো চেহারার চিঠি, এবং চিঠিটা পড়তেই বুঝতে পারে, হ্যাঁ একটা কাজেরই চিঠি। যাদবপুরের সেই লেবরেটরিতে যে কাজটা পাওয়ার চেষ্টা এতদিন ধরে করে এসেছে শেখর, সেই কাজটার সম্পর্কেই উপরওয়ালার চিঠি এসেছে। ছটা মাস দু'শো টাকা মাইনেতে কাজ করতে হবে, তারপর পার্মানেণ্ট করা হবে। তখন মাইনে হবে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা। যদি রাজি হয় শেখর, তবে সাতদিনের মধ্যে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করে কথা দিয়ে আসতে হবে।

কাজের চিঠি পড়া শেষ হতেই ডাকপিয়ন এসে একটা রেজিস্টারি করা চিঠি দিয়ে গেল। খুব বেশি আশ্চর্য না হলেও, শেখরের মনের ভিতরটা হঠাৎ একটু চমকে ওঠে, এবং খামের উপর লেখা প্রেরকের নামটা পড়তেই শেখর মিত্রের বুকের ভিতর নিঃশ্বাসের স্তরে স্তরে নিবিড় এক অনুভবের স্মৃতি রিমঝিম করে যেন বাজতে থাকে। অবন্তী সরকারের কাছ থেকেই এই চিঠি এসেছে।

'বাধ্য হয়ে আবার আপনাকেই স্মরণ করছি। আমার অনুরোধ, একবার আমাদের বাড়িতে আসবেন। ঠিকানা দিলাম। হয় আজ, নয় কাল, সন্ধ্যাবেলা আপনারই অপেক্ষায় থাকবো। নমস্কার নেবেন। ইতি—অবন্তী সরকার।'

অবন্তীর চিঠিটা হাত থেকে নামিয়ে টেবিলের উপরে রেখে দিলেও বুঝতে পারে শেখর, বুকের গভীরে অনুভবের সেই রিমঝিম থামতে চাইছে না। বাধ্য হয়ে শেখরকে স্মরণ করেছে অবন্তী। তার মানে, স্মরণ করতে বাধ্য হয়েছে, তার মানে, ভুলে থাকতে অনেক চেষ্টা করেছে অবন্তী, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভুলে থাকতে পারে নি। এই তো, এছাড়া এ চিঠির আর কি অর্থ হতে পারে? ভুলে থাকা নয় সে তো ভালো! এই তিন মাস ধরে অবন্তীর নীরবতাকে একটা নির্মম বিস্মৃতি বলে যে সন্দেহ করেছিল শেখর, সে সন্দেহটাকে একেবারে মিথ্যে করে দিল অবন্তীর এই চিঠি। ঐ বিস্মৃতি বিস্মৃতি নয়, স্মৃতির সঙ্গে একটা নীরব অভিমানের লড়াই। বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছে যে দোলা! অবন্তীর চিঠির অর্থ খুঁজতে গেলে বারবার অনেকদিন আগের পড়া সেই কবিতার কথাগুলিই যে মনে পড়ে। অবন্তীর চিঠি শেখর মিত্রের জীবনে প্রথম মুগ্ধতার প্রতি যেন স্নিগ্ধ আশ্বাসের উপহার।

হয় আজ, নয় কাল। শেখরের মনে হয়, আজই ভাল। শ্রাবণের সন্ধ্যাগুলি রোজই দু'এক পশলা বৃষ্টির জলে ভিজে যায়। আজ কিন্তু মেঘ নেই। এং আজ সন্ধ্যাতেও মেঘ থাকবে না বলেই মনে হচ্ছে। তাহ'লে আকাশ জুড়ে চাঁদের আলোও ফুটে উঠবে। কালের অপেক্ষায় না থাকাই ভাল। কে জানে কালকের দিনটা আজকের মত নির্মেঘ ও রোদে ঝলমল একটা দিন হবে কিনা, এবং কালকের সন্ধ্যাটা চাঁদের আলোয় ঝকমক করবে কিনা।

কিন্তু তারপর? শেখর মিত্রের ভাবনা যেন হঠাৎ জ্যোৎস্নায় ভরে গিয়ে বিহ্বল হয়ে যায়, এবং নিজের জীবনটাকেই ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করে, তারপর কি হবে? অবন্তী সরকারের চোখের কাছে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য এভাবে আকুল হয়ে ওঠার শেষ পরিণাম কি দাঁড়াবে? অবন্তী যদি একেবারে অনায়াস আগ্রহে, একেবারে নিশ্চিন্ত মনে ও স্বচ্ছন্দে হাতটা এগিয়ে দেয়, তবে সেই হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে শক্ত করে ধরে রাখতে পারবে তো শেখর? ভয় করবে না তো?

কিংবা, অবন্তী যদি প্রশ্ন করে ; ভয়ানক শক্ত একটা প্রশ্ন ;—আমাকে ভাল লাগলো কেন?

মাত্র কিছুক্ষণের মত একটা মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কি এমন স্বর্গীয় শোভা দেখতে পেলেন যে মুগ্ধ হয়ে গেলেন? তবে কি উত্তর দেবে শেখর মিত্র?

প্রশ্নগুলিকে নিয়ে যেন ফাঁপরে পড়ে শেখর। সত্যিই তো, কি উত্তর দিতে পারা যায়? এরকম হঠাৎ ভাল-লাগার অর্থ কি? এবং এই ভাল-লাগা কি সত্যিই ভাল মনের কোন মায়া? কিংবা নিতান্তই একটা লোভ?

বললে কি বিশ্বাস করবে অবন্তী, যদি বলা যায় যে, তোমাকে ভালবাসতে ইচ্ছে হয়েছে বলেই শেখর মিত্র তোমার চিঠি পাওয়া মাত্র ছুটে এসেছে? এছাড়া আর কোন কারণ নেই। কেন যে এই ইচ্ছে হলো, সে প্রশ্ন করো না। কারণ সে প্রশ্নের কোন অর্থ হয় না।

কিন্তু অবন্তী কি সত্যিই বুঝতে পেরেছে যে, অবন্তীরও ভাল লেগেছে? শুধু একটা উপকার করেছে শেখর মিত্র, তারই জন্য কি এই ভাল-লাগা? তাহ'লে ভুল করেছে অবন্তী। এরকম ভাল-লাগা কখনও ভালবাসা হয়ে ফুটে উঠতে পারে না। এ শুধু একটা উপকারকে ভালবাসা।

লজ্জা পায় শেখর। বৃথা মনের ভিতর এই সব প্রশ্নের কোলাহল তুলে লাভ কি? আজই আর কয়েকঘণ্টা পরে, পার্ক সার্কাসের সন্ধ্যা যখন আলোয় ভরে যাবে তখন অবন্তীকে চোখে দেখেই এই সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবে।

যদি স্পষ্ট ক'রে বলেই ফেলে অবন্তী, তবে শেখরও স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা করবে না। হ্যাঁ, ভাল লেগেছে তোমাকে। তুমি যেদিন ডাকবে, সেদিনই আবার আমি তোমার কাছে এসে দাঁড়াবো। তুমি যতদিন অপেক্ষা করতে বলবে, ততদিন অপেক্ষায় থাকবো। যদি বল, না আর একটা দিনও প্রতীক্ষা সহ্য করতে পারবো না, তবে বেশ তো, এই মাসেরই কোন দিনে তোমারই মনের মত একটি সন্ধ্যায় বিয়েটা হয়ে যাক। উৎসবের ঘটা দরকার নেই, গভীর রাতে আকাশের তারায় তারায় যেমন চোখে-চোখে কথা বলে মন জানাজানি করে ; তেমনই তুমি আর আমি দু'জনের মনের দাবি স্বীকার করে নিয়ে চিরকালের আপন হয়ে যাই। শালগ্রাম সাক্ষী হতে পারে, রেজিস্ট্রারের সাক্ষাতেও হতে পারে। অবন্তীর নিজের একটা সংসার আছে। রুগ্ন বাপ, আর তিনটি ছোট ছোট ভাই। সেই সংসারের নীড় থেকে অবন্তীকে উপড়ে নিয়ে আসতে পারা যাবে না, এবং উচিতও নয়। কিন্তু এটা কি আর এমন একটা ভয়ানক সমস্যা? থাকুক না অবন্তী, নিজের চাকরির রোজগারে তার বাপ আর ভাইদের জীবনের দিনগুলিকে সুখী করে রাখুক। অবন্তীর জীবনের এই রীতি-নীতির মধ্যে শেখর কোন সমস্যা সৃষ্টি করবে না। একটুও আপত্তি করবে না শেখর। শেখরেরও তো এইরকম একটা মায়ার দায়ে ভরা সংসার আছে। বাপ আর মা, এবং দুটি ছোট ছোট ভাই। অবন্তীও নিশ্চয় এমন কোন অদ্ভুত জেদ করবে না এবং করা উচিতও নয় যে, বিয়ের পর তোমাকে আমারই কাছে এসে থাকতে হবে। এটুকু নিশ্চয় জানে অবন্তী, কোন পুরুষের পক্ষে সে রকম দাবি স্বীকার করে বিয়ে করা সম্ভব নয়।

তাহলে শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ালো? এলোমেলো ভাবনাগুলিকে একটু গুছিয়ে নিয়ে শেখর যেন তার ভালবাসার জীবনের রূপ কল্পনা করতে চেষ্টা করে। হ্যাঁ, ভালই তো, দু'জনের কেউ কারও দায় আর মায়ার নীড় হতে সরে যাবে না। সরে যাবার দরকার হয় না। অথচ, দু'জনের জীবন ভালবাসার রাখী ধারণ ক'রে আর-একটি অদেখা নীড় গড়ে তুলবে, যেখানে যে-কোন লগ্নে আকাশে তারা থাকুক কিংবা চাঁদ থাকুক, শেখর মিত্রের বুকের উপরে লুটিয়ে পড়ে থাকতে পারবে অবন্তী। এবং শেখরও অবন্তীর মুখের হাসির দিকে তাকিয়ে বলতে পারবে, এই তো ভাল অবন্তী। সারাদিনের মধ্যে এই একবার দেখা, এবং তারপরেই অদেখা, এই তো ভাল। আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ভালবাসার জীবন ভাল নয়। ভালবাসা লোহার শিকল নয়, ভালবাসা হলো ফুলডোর।

মা হয়তো মাঝে মাঝে রাগ করবেন, এ কিরকম কাণ্ড শেখর? অবন্তী কি জানে না যে, ওর শ্বশুর শাশুড়ি আছে? বাপের সংসারেই কি চিরকাল পড়ে থাকবে বউ?

সমস্যা বটে। কিন্তু এই সমস্যার একটা সমাধানও মনে মনে খুঁজে পায় শেখর। মা'র মনে কোন ক্ষোভ থাকবে না, যদি অবন্তী এসে মাঝে মাঝে শ্বশুর আর শাশুড়ির কাছে থাকে। অবন্তীরও কোন আপত্তি হবে না নিশ্চয়। আপত্তি কেন, খুশিই হবে অবন্তী।

রতনবাবুর ছেলেকে পড়াতে যাবার কথা যখন মনে পড়ে, তখন প্রায় দুপুর। পড়াতে যাবার সময় হতে এখনও কয়েক ঘণ্টা দেরি। কিন্তু আজ একটু আগে পড়াতে গেলেই তো ভাল হয়। বিকাল শেষ হবার আগেই ছাত্র পড়াবার কাজটা সেরে নিয়ে, তারপর...তারপর ট্রামে চড়ে সোজা ময়দানে গিয়ে খোলা হাওয়ার ভিতর একটা ঘণ্টা পার ক'রে দিলেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠবে। তারপর সেখান থেকে পার্ক সার্কাস পৌঁছে যেতেই বা কতক্ষণ?

৯

পার্ক সার্কাসের বিপুল আকারের একটা নতুন বাড়ির একটা ফ্ল্যাট। প্রথম ঘরটি বেশ সুন্দর ক'রে সাজানো। সোফা আছে, রেডিও আছে, কার্পেট পাতা আছে, রঙীন লেসের পর্দা দরজায় ঝুলছে। প্রকাণ্ড ফুলদানিতে ফুলের স্তবকও আছে।

শেখর মিত্রকে দরজার কাছে দেখতে পেয়ে সন্ধ্যাবেলার আলোর মতই হেসে ওঠে অবন্তী সরকারের কালো চোখের তারা। কিন্তু শেখর মিত্র যেন ক্ষণিকের মত অপ্রস্তুত হয়ে তার নিজের চোখের বিব্রত বিস্ময়টাকে সামলে রাখবার চেষ্টা করে। বোধ হয় ঠিক এইরকমের একটা রঙীন অভ্যর্থনা আশা করেনি শেখর।

হ্যাঁ, রঙীনই বটে। অবন্তী সরকারের মূর্তিটাও রঙীন হয়ে গিয়েছে। সেই মার্বেলের মত সাদাটে গর্বে সাজানো চেহারা নয়। অবন্তীর সিল্কের শাড়িতে রঙীনতা, তার গলার সোনার হারের লকেটটাও একটা রঙীন পাথর।

শেখরকে বসতে অনুরোধ ক'রে অবন্তী ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতরে চলে যায়।

শেখর আশা করে, অবন্তী সরকারের বাবা কিংবা বাড়ির আর কেউ এখনি সামনে এসে শেখরকে দেখে খুশি হবে আর গল্প করবে। শেখর মিত্রের নামটাকে এই বাড়ির কানের কাছেও কি কোনদিন উচ্চারণ করেনি অবন্তী? হতে পারে না।

কিন্তু অবন্তী একাই ফিরে এল। হাতে খাবারের প্লেট এবং চায়ের কাপ। অবন্তী সরকারের কালো চোখে সেই বুদ্ধির দীপ্তি বড় সুন্দর হয়ে আবার চিকচিক করতে থাকে।

—শেখরবাবু! কথা বলেই লজ্জা পেয়ে মুখ ফেরায় অবন্তী।

শেখর বলে—আপনি ভাল আছেন তো?

অবন্তী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে—না। সেই জন্যই আপনাকে ডেকেছি শেখরবাবু।

শেখর—বলুন।

অবন্তী ভ্রূভঙ্গী ক'রে হাসে।—আমি আপনার বোনের ননদ অনসূয়ার বন্ধু, আমাকে 'আপনি' করে বলবেন না।

তার পরেই সোজা শেখর মিত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে অবন্তী বলে—তা ছাড়া, আপনিই একমাত্র মানুষ, যাঁর কাছ থেকে আমি উপকার পেয়েছি। লোকে আমাকে অহংকারী বলে জানে, কথাটা খুব মিথ্যে নয়। কিন্তু আপনিই তো জানেন, আমি আপনার কাছে মাথা হেঁট করেছি। জীবনে আর কারও কাছে মাথা হেঁট করিনি।

বিব্রতভাবে শেখর বলে—একথার কোন অর্থ হয় না। দরকারে পড়ে একটা দাবি করেছিলে তুমি, তাকে মাথা হেঁট করা বলে না।

অবন্তী—জানি না, কেন আপনার কাছ থেকে উপকার চাইবার এত সাহস হঠাৎ মনের ভিতর এসে গেল।

শেখর হাসে—তুমিই জান, কেন তোমার সে সাহস হলো?

অবন্তী—আমি জানি। আপনাকে দেখে কেন জানি মনে হয়েছিল যে, আপনি আমার অনুরোধ রাখবেন।

শেখর—সেটা তোমার মনের গুণ, আমার কোন গুণ নয়।

অবন্তী—যাই হোক, আমার লাভ এই যে, আপনার কাছে আমার জীবনের কোন দুঃখের কথা বলতে আমার মনে কোন লজ্জার বাধা নেই। আপনিই আমার ভয় ভেঙে দিয়েছেন।

শেখরের মনের ভিতরে লুকিয়ে থাকা সেই অদ্ভুত মায়াচ্ছবির হাসিটা যেন আরও নিবিড় হয়ে শেখরের চোখের উপর ফুটে ওঠে।

অলীক স্বপ্ন নয় ; কল্পনাও নয় ; সত্যিই অবন্তী সরকার আজ শেখরের চোখের কত কাছে বসে মুখের দিকে তাকিয়ে গল্প করছে!

শেখর বলে—তোমার কথা শুনে আমারই মনের ভয় ভেঙে গেল অবন্তী।

অবন্তী—কিসের ভয়?

শেখর—আমার ভয় হয়েছিল, আমার কাছে ওরকম একটা উপকার পাওয়ার অনুরোধ ক'রে তুমি লজ্জা পেয়েছ, এবং সেই লজ্জাতে, আর হয়তো আমার মনটাকেও সন্দেহ করে আমার কাছ থেকে একেবারে আড়াল হয়ে লুকিয়ে থাকছো।

অবন্তী—আপনাকে ভুলে যাব, এমন অসম্ভবও আপনি বিশ্বাস করেন শেখরবাবু?

শেখর বলে—না অবন্তী।

অবন্তী—তাই তো বিপদে পড়ে আপনারই কথা মনে হলো, তাই আপনাকে ডেকেছি।

শেখর—বিপদ?

অবন্তী—হ্যাঁ।

শেখর—কিসের বিপদ?

অবন্তী—যাদবপুরের একটা নতুন লেবরেটরিতে নতুন একটা কাজের লোক নেওয়া হবে।

শেখর আশ্চর্য হয়—হ্যাঁ।

অবন্তী—আমারই বান্ধবীর দাদা হন, তাঁর নাম নিখিল মজুমদার, তিনি ঐ কাজের জন্য দরখাস্ত করেছেন।

শেখর—তা জানি না।

অবন্তী—কাজটা এতদিনে তিনিই পেয়ে যেতেন। কিন্তু বাধা দিয়েছে আপনার দরখাস্ত।

শেখর—তার মানে?

অবন্তী—বুঝতেই তো পারছেন, আপনার মত কোয়ালিফাইড লোক পেলে নিখিল মজুমদারের মত সাধারণ একজন বি-এস-সি'কে এরা নেবে কেন? ওরা বলেছে, শেখর মিত্র নামে ক্যানডিডেট যদি ঐ কাজ নিতে শেষ পর্যন্ত রাজি না হয়, তবেই নিখিল মজুমদার কাজটা পাবে।

শেখরের চোখে যেন অদ্ভুত এক কৌতূহলের আগুন জ্বলে উঠতে চাইছে। এ কেমন বিপদ? নিখিল মজুমদার ঐ ভাল মাইনের কাজটা না পেলে অবন্তী সরকারের জীবন দুঃখিত হবে কেন? অবন্তী সরকারের জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যে নিখিল মজুমদার কে? গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করে শেখর—নিখিল মজুমদারের কাজ না হলে সেটা তোমার বিপদ কেন হবে, বুঝতে পারছি না।

উত্তর না দিয়ে মাথা হেঁট করে অবন্তী সরকার। কিন্তু ঐ নিরুত্তর ভঙ্গীই যে ভয়ংকর স্পষ্ট একটা উত্তর। খুব স্পষ্ট ক'রে, কোন কুণ্ঠা না রেখে জানিয়ে দিচ্ছে অবন্তী সরকার,

নিখিল মজুমদার নামে একটি মানুষ সুখী হলে অবন্তী সরকারের জীবনের আশা পূর্ণ হয়।

শেখর—নিখিল মজুমদার কি তোমার অনেক দিনের চেনা?

অবন্তীর মুখ লজ্জায় লালচে হয়ে ওঠে। চোখের চাহনি নিবিড়। লিপস্টিক দরকার হয় না যে ঠোঁটে, সেই ঠোঁটের রক্তাভাও যেন লাজুক হাসি হাসে।

অবন্তী বলে—না। একবছরের চেয়ে কিছু বেশি হবে।

শেখর—তার মানে, তোমার চাকরিটা হবার বছর খানেক আগে।

অবন্তী—হ্যাঁ।

শেখর—তুমি কি নিখিল মজুমদারের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, অর্থাৎ তার সম্মতি নিয়ে আমাকে এই অনুরোধ করছো?

ব্যস্তভাবে আপত্তির ভঙ্গীতে মাথা নাড়ে অবন্তী—না, আপনার নাম তার কাছে কখনও করিনি। সে বড় আত্মসম্মানী মানুষ, শুনলে কখনই রাজি হতো না।

শেখর—নিখিল মজুমদার যদি ঐ কাজটা না পায়, তবে?

অবন্তী—না পেলে চলবে কি করে শেখরবাবু?

শেখর—তার মানে?

অবন্তী—নিখিল যে তাহলে...।

শেখর—নিখিল মজুমদার তাহলে তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে না?

অবন্তী উদাস ভাবে বলে—সে হয়তো রাজি হবে, কিন্তু...।

শেখর হাসে—কিন্তু তুমি কি ক'রে রাজি হবে? তাই না?

অবন্তী—আপনি তো বুঝতেই পারছেন।

শেখর হাসে—আমার বোঝবার আর কোন দরকার নেই অবন্তী সরকার।

আর কোন কথা না বলে, এবং অবন্তী সরকারকে চমকে দিয়ে ঘর ছেড়ে সোজা দরজার দিকে এগিয়ে যায় শেখর।

—শেখরবাবু। প্রায় চেঁচিয়ে ডাক দেয় অবন্তী সরকার। ডাকটা আর্তনাদের মত শোনায়। অবন্তী সরকারের কালো চোখ করুণ হয়ে মেঘলা সন্ধ্যার মত তাকিয়ে থাকে।

অবন্তী বলে—আমি জানি, আপনার উপর বড় বেশি দাবি করছি, অথচ দাবি করবার কোন অধিকার নেই।

বেশ শক্ত স্বরে অথচ শান্তভাবে উত্তর দেয় শেখর—অধিকার ছিল।

অবন্তী—কি বললেন?

শেখর—সত্যিই কি শুনতে পাওনি?

অবন্তী—না।

শেখর—তা হলে আর প্রশ্ন করো না। আমি চলি।

অবন্তী—আপনি কি সত্যিই আমার অনুরোধ শুনে রাগ করলেন?

শেখর—শুনে সুখী হলাম যে তুমি একটা মানুষকে ভালবাসতে পেরেছ।

অবন্তী—সে ভালবাসা ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আপনি...।

অবন্তীর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে শেখর। তারপরেই বলে—কি বলতে চাও তুমি?

অবন্তী—আপনি নিখিলকে ঐ কাজটা নেবার সুযোগ দিন।

শেখর—তার মানে আমি কাজটা নিতে রাজি না হই, এই তো?

অবন্তী—হ্যাঁ।

শেখর—বেশ, তাই হবে।

চলে যায় শেখর। অবন্তী সরকারের সিল্কের শাড়ির আঁচল দুলে ওঠে। তরতর ক'রে

হেঁটে শেখরের পাশে পাশে চলতে চলতে পথের কিনারা পর্যন্ত এগিয়ে আসে অবন্তী।

দূরের ট্রামের মাথায় নীল লাল আলোকের চোখ জ্বলজ্বল করছে। এগিয়ে আসছে ট্রাম। লাইনের তার ঝনঝন ক'রে বাজে। অবন্তী সরকারের হাসিমাখা উজ্জ্বল মুখের দিকে শেষ বিস্ময়ের দৃষ্টি তুলে মুখ ফিরিয়ে নেয় শেখর।

অবন্তী বলে—জানি না, আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ জানাবো শেখরবাবু। আপনি যে উপকার করলেন, তেমন উপকার কোন আপনজনও করে না।

১০

আবার বোধহয় ভুল হলো। হোক ভুল। এই ভুলের স্মৃতি শুধু শেখরের জীবনের গোপন হয়ে আর নীরব হয়ে থাকবে। কেউ জানবে না যে, শেখর মিত্র তার জীবনের প্রথম মায়ার ছবিকে চোখের কাছে রেখে দেখতে গিয়ে চোখভরা জ্বালা আর একটা কৌতুকের দংশন নিয়ে ফিরে এসেছে।

শুধু তাই নয়, সেই নিষ্ঠুর কৌতুককেই আবার একটা উপহার দিয়ে এসেছে। নিজেরই সৌভাগ্যের হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে নিয়ে অবন্তী সরকারের কাছে নিবেদন ক'রে চলে এসেছে।

অবন্তী সরকার কেন নিখিল মজুমদারকে ভালবেসেছে, এই প্রশ্নের কোন অর্থ হয় না। এর জন্য অভিমান করারও কোন অর্থ হয় না। অবন্তী সরকার তার নিজের স্বপ্নের জগতে আছে। নিজের ভালবাসার মানুষের সুখের জন্য যতটুকু করা সাধ্য, তাই করেছে। অবন্তী সরকার কোনদিন বলেনি যে, শেখর মিত্র নামে উপকারী একটা মানুষের জন্য তার মনের পাতায় কোন মুহূর্তেও এক ফোঁটা মায়ার শিশির স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। শেখর মিত্রের ভুল ঘটিয়েছে শেখর মিত্রেরই মন। অবন্তী সরকার নামে একটি মেয়ের কথা দিনের পর দিন মনের ভাবনায় পুষে রাখবার জন্য কেউ তাকে দিব্যি দেয়নি।

অবন্তীকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করতে পারলো না কেন, এবং আজও পারছে না কেন শেখর? বুঝতে পারে শেখর, আসল ভুল হলো নিজেকেই চিনতে না পারা। যার সঙ্গে কোন স্বার্থের সম্পর্ক নেই, তারই জন্য বার বার এভাবে নিজের স্বার্থ তুচ্ছ করা বোধহয় মনেরই একটা রোগ। অতি কোমল দুর্বল ও মেরুদণ্ডহীন একটা পৌরুষ, যার প্রতিজ্ঞার জোর অবন্তী সরকারের মতো মেয়ের কালো চোখের কৌতুকের কাছে বারবার জব্দ হয়ে যায়।

ভালাবাসা কাকে বলে, এই প্রশ্ন নিয়ে জীবনে কোনদিন মাথা ঘামায়নি শেখর। কেন মানুষ ভালবাসে, কিসের জন্য ভালবাসে কে জানে? অবন্তীই জানে, কেন নিখিলকে তার এত ভাল লাগলো, আর শেখর মিত্রের চোখের দৃষ্টিটার মধ্যে সে কোন অর্থই খুঁজে পেল না। কিন্তু অবন্তী সরকারের জন্য শেখর মিত্রের মনের এই যে দশা, সেটা কি একটা মোহ মাত্র? ভালবাসা নয়?

অন্য কারও উপরে নয়, রাগ হয় শুধু নিজের উপর। চোখভরা এই যে জ্বালা, সেটা শুধু একটা আত্মধিক্কার। অবন্তীর কথা মনে পড়লে রাগ হয় না। নিখিল মজুমদার নামে এক ব্যক্তির উপর বিন্দুমাত্রও আক্রোশ জাগে না। বরং, ভাবতে ভাল লাগে যে, অবন্তী সরকারের ভয়ানক অনুরোধের কাছে আজও জয়ী হয়ে ফিরে এসেছে শেখর। শেখর আপত্তি করলে অবন্তী সরকারের পক্ষে শেখরকে একটিও কঠোর কথা বলবার অধিকার ছিল না। তবু অনায়াসে অবন্তীকে অবন্তীর স্বপ্নের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে বলে কথা দিয়ে এসেছে শেখর।

বাড়ি ফিরে এসে প্রথম যে কাজটা করে শেখর, সেটা হলো একটা চিঠি লেখার কাজ। যাদবপুরের নতুন লেবরেটরির ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে যথাসৌজন্যের সঙ্গে জানিয়ে দেয়, ঐ

কাজ নিতে রাজি নয় শেখর মিত্র।

চিঠিটা ডাক বাক্সে ফেলে দিতেই মনটা হাল্কা হয়ে ওঠে। জীবনের একটা সুন্দর উদ্‌ভ্রান্তির নাটক এইখানে সমাপ্ত হয়ে গেল। অবন্তী সরকার নামে একটা গল্প শুধু মাঝে মাঝে মনে পড়বে। এর চেয়ে বেশি কোন বিড়ম্বনার ভয় জীবনে আর রইল না। যাকে ভাল লেগেছিল তারই জন্য শেষ পর্যন্ত ভাল ভাবে একটা ভাল কাজ ক'রে দিতে পারা গেল। কোন ক্ষতি হয়নি, ঠকেওনি শেখর। নিজেরই ত্রিশ বছর বয়সের বুকের ভিতরে ফুটে ওঠা একটা ভালবাসাকে সম্মানিত করেছে শেখর। ভুল নয়, বোকামিও নয়।

উঠানের কোণে রজনীগন্ধার চারা বেশ বড় হয়ে উঠেছে। মধু আর বিধু অনেকগুলি দোপাটি আর গাঁদাও লাগিয়েছে। মা উঠানের উপর মাদুর পেতে বসে একমনে রামায়ণ পড়েন। অফিস থেকে ফিরে আসেন অনাদিবাবু। শেখর বলে—তোমার ও মা'র দুটো অয়েল পেণ্টিং করাবো বাবা।

অনাদিবাবু হাসেন—আপাতত আমাকে এক কাপ চা ক'রে দে দেখি।

১১

চা-এর কাপ হাতে তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ কি-যেন ভাবেন অনাদিবাবু। চা-এর কাপে একটা চুমুক দেবার পর আবার কিছুক্ষণ আনমনার মত তাকিয়ে থাকেন। এই কিছুক্ষণ আগে অনাদিবাবুর যে ক্লান্ত মুখটাকে বেশ প্রসন্ন দেখাচ্ছিল, সেই মুখের উপরে একটা বিষণ্ণতার ধোঁয়াটে ছায়া যেন ঘন হয়ে উঠেছে। সত্যিই অস্ফুট স্বরে আক্ষেপের মত কি-একটা কথাও যেন বলে ওঠেন অনাদিবাবু।

শেখর বলে—কি হলো বাবা? চা-এর চিনি ঠিক আছে তো?

অনাদিবাবু—না।

শেখর—চিনি কম হয়েছে?

অনাদিবাবু—হ্যাঁ।

চামচ ভরে চিনি নিয়ে এসে অনাদিবাবুর চা-এ ঢেলে দেয় শেখর। এইবার চা বেশ মিষ্টি, খুব বেশি মিষ্টি হয়ে ওঠে ঠিকই। কিন্তু দেখে বোঝা যায় না, অনাদিবাবুর মুখের সেই অপ্রসন্নভাব কেটে গিয়েছে কি না, এবং আগের মত প্রসন্নতায় মিষ্টি হয়ে উঠেছে কি না।

বরং দুশ্চিন্তিতের মত ভুরু কুঁচকে একটা কথা বললেন অনাদিবাবু—

বাড়িটা এবার নীলামে চড়বে শেখর।

শেখর—কেন?

অনাদিবাবু—কেন আবার কি? বাড়িটা যে ব্যাঙ্কের কাছে মর্টগেজ আছে, সেটা কি ভুলেই গিয়েছিস?

শেখর—হ্যাঁ...না...ভুলিনি ঠিকই, কিন্তু সব সময় মনে থাকে না।

—মনে না থাকলে চলবে কি ক'রে? সুদ প্রায় মূল ছাড়িয়ে গিয়েছে। আর কতদিন অপেক্ষা করবে ব্যাঙ্ক?

—আমাকে কি করতে বলছো?

—দেনা শোধ কর।

—দেনাটা এখন দাঁড়িয়েছে কত?

—সুদ আর মূল নিয়ে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার।

—এখনি সাড়ে ছয় হাজার টাকা পাব কোথা থেকে বল?

—না পেলে বাড়িও থাকবে না। নীলাম হয়ে যাবে।

কোন উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে ভাবতে থাকে শেখর। এবং অনাদিবাবুর সেই গম্ভীর ও বিষণ্ণ মুখ এইবার বেশ একটু তিক্ত হয়ে ওঠে। অনাদিবাবু বলেন—তার মানে, গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তোমার মত শিক্ষিত ও ইয়ং একটি ছেলে থাকতে বাপ-মা আর ছোট-ছোট দুটো ভাই গাছতলায় গিয়ে ঠাঁই নেবে, ভাবতে তোমার একটু লজ্জা পাওয়া উচিত নয় কি?

লজ্জা? শুধু লজ্জা কেন? বুঝতে পারে শেখর, তার মনের ভিতরে যেন একটা জ্বালা ধরেছে। কোন শব্দ না ক'রে জীবনের একটা অসার উল্লাস যেন পুড়তে শুরু করেছে! সুখী হয়নি এই বাড়িটা, সুখী হতে পারে না। ছাত্র-পড়ানো রোজগারের একশো টাকা দিয়ে ডাহা উপোসের অভিশাপ থেকে যদিও বা বাঁচা যায়, কিন্তু সুখী হওয়া যায় না। শুধু টিকে থাকাই বেঁচে থাকা নয়। এবং গাছতলায় আশ্রয় নিয়ে বেঁচে থাকা মরে যাওয়ার চেয়ে ভাল নয় নিশ্চয়। বাবার আক্ষেপটা অকারণ বিরক্তির চিৎকার নয়। এই আক্ষেপ যে সত্যিই একটা আর্তনাদ।

শেখর বলে—বাড়িটাকে নীলাম থেকে বাঁচাবার কি উপায় হতে পারে বুঝতে পারছি না।

অনাদিবাবু—যদি সুদটা আর বাড়তে না দেওয়া হয়, তবে ব্যাঙ্ক কিছু বলবে না। আপাতত নীলাম থেকে বাড়িটা বেঁচে যাবে। এখন প্রতিমাসে সুদ দাঁড়িয়েছে প্রায় চল্লিশ টাকা। যদি অন্তত এই চল্লিশটা টাকা মাসে মাসে দিয়ে ফেলা যায়, তবে ব্যাঙ্ক আপাতত তুষ্ট থাকবে।

শেখর—তাহ'লে তাই কর।

চেঁচিয়ে ওঠেন অনাদিবাবু—আমি কি করবো? আমাকে একথা বলতে তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত।

শেখর বলে—তার মানে আমিই দেব।

অনাদিবাবু—কোত্থেকে দেবে? তোমার ঐ ছেলে-পড়ানো রোজগার একশো টাকা থেকে?

শেখর—হ্যাঁ।

অনাদিবাবু—তার মানে সংসারের ভাত-কাপড়ের খরচের জন্য এখন থেকে মাত্র ষাটটা টাকার বেশি তুমি দিতে পারবে না।

শেখর হাসে—শেষ পর্যন্ত তাই তো দাঁড়ালো।

অনাদিবাবু—বাপ-মা-ভাইদের ওপর সত্যি সত্যি মনের দরদ থাকলে তুমি একথা বলতে পারতে না শেখর। বলাইবাবুর ছেলে পরেশটা আজ প্রায় চার বছর হলো সন্ন্যাসী হয়ে গিয়ে হরিদ্বারে থাকে। সেই পরেশও বলাইবাবুকে প্রতি মাসে দু'শো টাকা পাঠায়। কিন্তু তুমি...।

অনাদিবাবুর কথাগুলি কাঁটাগাছের ডালের আঘাতের মত শেখরের বুকের ভিতরটাকে যেন আঁচড়ে চিরে ক্ষতাক্ত ক'রে দিচ্ছে। সাধ ক'রে, একটা অতি-চতুর সুন্দর মেয়ের ছলছল চোখের ছলনার কাছে নিজেরই সুস্থ-বুদ্ধিটাকে বলি দিয়ে এসেছে শেখর। যাদবপুরের লেবরেটরির চাকরিটাকে অবন্তী সরকারের অনুরোধের মোহে এভাবে ছেড়ে না দিলে আজ অনায়াসে ব্যাঙ্কের দেনা শোধ করবার প্রতিজ্ঞা অনাদিবাবুর কাছে এই মুহূর্তে ঘোষণা ক'রে দিতে পারতো শেখর, এবং অনাদিবাবুর মুখে অগাধ প্রসন্নতার হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারতো।

হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন অনাদিবাবু—তোমার নিজেরই জীবনের ওপর তোমার কোন দরদ নেই শেখর।

চমকে ওঠে শেখর ; এবং চোখ দুটোও থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে। অনাদিবাবুর অভিযোগ এক বিন্দুও অতিশয়োক্তি নয়। নিজেরই ওপর কোন দরদ নেই শেখরের। শেখর মিত্রের জন্য যে নারীর মনে একফোঁটাও মায়া নেই, সেই নারীকেই ভালবাসতে ইচ্ছা করে, এই ভুলের অভিশাপ চরম হয়ে উঠেছে। গল্পে শোনা যায় ; সুন্দরী নর্তকীর একটি কটাক্ষের ইঙ্গিতে কত রাজা-মহারাজা তার সর্বস্ব সেই নারীর পায়ের কাছে ঢেলে দিয়ে ফতুর হয়ে

গিয়েছে। সেই রকমেরই একটা মূঢ়তা কি শেখর মিত্রের মত বিজ্ঞান-জানা মানুষের যুক্তি-বুদ্ধির শক্তি লোপ করে দিল? শুধু ঠকাবার জন্য, শুধু নিজেকে রিক্ত ক'রে দিয়ে কাঙাল হয়ে যাবার জন্য একটা নেশায় পেয়ে বসলো জীবনটাকে?

জোর ক'রে, যেন নিজেরই উপর মায়া ছড়িয়ে দিয়ে শান্ত হতে চেষ্টা করে শেখরের মন। না, আর নয়। তা ছাড়া আর ভাববার আছেই বা কি? অবন্তী সরকারের ভালবাসার ইতিহাস নিজের কানেই শোনা হয়ে গিয়েছে। সে ভালবাসার পরিণাম প্রায় তৈরী হয়েই গিয়েছে। নিখিল মজুমদার নামে একটি মানুষকে আপন ক'রে নিয়ে ধন্য হয়ে যাবে অবন্তী সরকারের জীবন। রঙ্গমঞ্চের শেষ অঙ্কের শেষ হয়ে এসেছে, ড্রপ সীন পড়তে আর দেরি নেই। শেখরের জীবনেও মনের ভুলে এক নারীকে ভালবাসবার ইচ্ছাটা নিজেরই বিদ্রূপে মরে গিয়ে এইবার কবরের মাটিতে মিশে যাবে।

মিশে গিয়েছে বোধ হয়। বুঝতে পারে শেখর ; এতক্ষণের মনের ভিতরে সেই কামড় শান্ত হয়ে গিয়েছে। এবং মনেও পড়ে রেডিয়েশন সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ অর্ধেক লেখা হয়ে পড়ে আছে। সেই লেখাটা সম্পূর্ণ করলে কেমন হয়? লেখাটা এদেশের কোন কাগজে না নিক, বিদেশের কোন কাগজে নেবে বলেই তো মনে হয়। এবং তাহ'লে অন্তত শ' পাঁচেক টাকা কি পাওয়া যাবে না?

১২

টাইপিস্ট চারুবাবুর কথাগুলি শুনতে বেশ ভালো লাগে অবন্তীর। সাদাসিধা সরল মেজাজের বুড়ো মানুষ। আজকালকার মেয়েদের উপর একটুও রাগ নেই তাঁর মনে। আজকালকার মেয়েরা চাকরি করে, দেশের এই নতুন রীতির হাওয়া খুব পছন্দ করেন চারুবাবু। যখন তখন অবন্তীর কাছে অবন্তীরই প্রশংসা করেন—এই তো চাই মা, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়, মেয়ে হলেই যে ঘরকুনো হয়ে পরের গলগ্রহ হয়ে পড়ে থাকতে হবে, এমন কোন কথা নেই।

সেদিন কথায় কথায় নিজের এক ভাগ্নের নামে একটা গল্প বললেন টাইপিস্ট চারুবাবু, আর সেই গল্প শুনে চমকে ওঠে অবন্তী, তারপরেই মনে মনে হেসে ফেলে। মামা জানেন না যে তাঁর ঐ ভাগ্নে অবন্তী সরকারের ভালবাসার পাত্র হয়ে প্রতি সন্ধ্যায় পার্ক সার্কাসের এক নতুন বাড়ির এক ফ্ল্যাটের একটি সুন্দর ক'রে সাজানো ঘরের নিভৃতে বসে অবন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

চারুবাবু বললেন—আমার এক ভাগ্নে আছে, তার নাম নিখিল মজুমদার, বড় ভাল ছেলে। সেও দেখছি প্রতিজ্ঞা ক'রে বসে আছে যে, রোজগেরে মেয়ে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না।

অবন্তী হেসে হেসে প্রশ্ন করে—আপনার ভাগ্নের মনে এরকম আইডিয়া দেখা দিল কেন? ভদ্রলোক বোধহয় নিজে কোন কাজ না ক'রে ঘরে বসে থাকতে চান?

চারুবাবু—না, মোটেই তা নয়। ভাগ্নে বাবাজীর বক্তব্য এই যে, রোজগেরে স্ত্রীর ভালবাসাই হলো সত্যিকারের ভালবাসা। স্বামী খাওয়ায় পরায় বলে বাধ্য হয়ে যে ভালবাসা বেশির ভাগ স্ত্রী বাসে, সেরকম ভেজাল ভালবাসা নয়।

—বাঃ! ঠাট্টার ভঙ্গীতে অবন্তী কথাটা বললেও ঐ ছোট্ট কথাটা যেন একটা অভিনন্দনের সুরে বেজে ওঠে। নিখিল মজুমদারের মন চিনতে পারা গেল। কী সুন্দর মন!

সেদিনই সন্ধ্যাতে কী সুন্দর একটা উৎসবের মতো সাড়া জেগে উঠলো পার্ক সার্কাসের নতুন বাড়ির ফ্ল্যাটে সুন্দর ক'রে সাজানো ঘরে। চারু হারু আর নরু নিখিলের সঙ্গে ক্যারম খেলায় মেতে ওঠে। নরু হঠাৎ একটা আনন্দের কথা চেঁচিয়ে বলেই ফেলে—আমরা জানি

নিখিলদা, শিগগির আপনি আমাদের কে হবেন? চারু ও হারু হেসে ধমক দেয়—চুপ কর বোকা!

নিখিল মুগ্ধভাবে হাসে, আর অবন্তী সরকার মুখ লুকিয়ে হাসে।

নিবারণবাবুও এই ঘরের ভিতরে এসে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। নিখিলের সঙ্গে গল্পও করলেন অনেকক্ষণ। তিনি জানেন, সবই জানেন, অবন্তী সরকার নিজের মুখে তাঁর কাছে সব কথা বলে দিয়েছে। এবং শুনে খুশি হয়েছেন নিবারণবাবু। ভগবানের অশেষ দয়া। নইলে নিখিলও এত ভাল একটা কাজ এত সহজে পেয়ে যাবে কেন? আর, সেই নিখিল তাঁদের আপনজন হয়ে যাবার জন্য এত আগ্রহই বা দেখাবে কেন?

যখন ঘরে আর কেউ থাকে না, শুধু সোফার উপর পাশাপাশি বসে নিখিল আর অবন্তী গল্প করে, তখন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বোঝা যায়, রাত মন্দ হয়নি।

নিখিল বলে—কি ভাবছো অবন্তী?

অবন্তী বলে—আমার ভাগ্যের কথাটাই ভাবছি। অদ্ভুত!

নিখিল—তা'হলে আমার ভাগ্যের কথাও ধর।

নিখিলের মূর্তিটাকে আজ দেখতে বেশ নতুন রকমের মনে হয়। মুখের হাসিটাও নতুন। চোখের দৃষ্টিও যেন নতুন প্রাণ পেয়েছে। এবং কথা বলবার ভঙ্গীটাও অভিনব। বেশ মাথা উঁচু ক'রে আর অবন্তীর মুখের দিকে সোজা, বড় স্পষ্ট ও বড় স্বচ্ছন্দ একটি আগ্রহের উজ্জ্বলতা নিয়ে তাকিয়ে থাকে নিখিল। অবন্তী সরকারের কাছে কৃতজ্ঞতার ভারে বিনত নিখিলের সেই মূর্তি আর নেই। নিখিলের ভালবাসার অধিকার যেন নতুন-পাওয়া একটা গর্বের জোরে এতদিনে টান হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে। নিখিলের যে মন এতদিন যে আক্ষেপ সহ্য করতে গিয়ে বার বার ম্রিয়মাণ হয়েছে ; সেই মন এইবার একটি সুন্দর আশার দর্প নিয়ে জেগে উঠেছে। অবন্তী সরকারের আশার পথ থেকে যে শেষ বাধা সরে গিয়েছে, সে-কথা এখনও জানে না অবন্তী। যাদবপুরের লেবরেটরির চাকরিটা পেয়েছে নিখিল। আজ অনায়াসে নিজের থেকেই হাত এগিয়ে দিয়ে অবন্তীর হাত ধরে জিজ্ঞেসা করতে পারবে নিখিল—আর দেরি ক'রে লাভ কি অবন্তী? বাবাকে বল, বিয়ের দিনটা স্থির ক'রে ফেললেই হয়।

এতদিন ধরে নিখিলের যে মাথা একটু হেঁট হয়ে থাকতো, সেই মাথাকেই উঁচু ক'রে অবন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে প্রশ্ন করে নিখিল—কি ভাবছো অবন্তী?

কল্পনা করতে পারে নিখিল, শোনা মাত্র কত খুশি হয়ে উঠবে অবন্তী, এবং হয়তো একটু বিস্মিত হয়ে, চমকেও উঠবে। আর, বুঝতে পেরে ধন্য হয়ে যাবে, তার ভালবাসার মানত এতদিনে সফল হলো।

নিখিলের জীবনের একটা উল্লাস যেন বহুদিনের অভিমান থেকে মুক্ত হয়ে দু'চোখের চাঞ্চল্যের মধ্যে বার বার ছটফট করছে। অবন্তীর উপকার গ্রহণ করে এতদিন যে বিস্ময় সহ্য করেছে নিখিল, এইবার অবন্তীকে সেই বিস্ময় সহ্য করতে হবে। যে-কোন উপকার আর যে-কোন উপহার এইবার অবন্তীর কাছে নিয়ে এসে স্বচ্ছন্দে বলতে পারবে নিখিল—এই নাও অবন্তী, আমার দেওয়া উপহার। অবন্তীকে উপহারে আর উপকারে সুখী করবার ক্ষমতা আজ পেয়েছে নিখিল মজুমদার।

অবন্তী হেসে ফেলে—একটা গর্বের কথা বলবো?

নিখিল—বল।

অবন্তী—আমার গর্ব, আমি যা চেয়েছিলাম, তার সবই পেলাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, নিজে রোজগার ক'রে বাবা আর ভাইগুলোর জীবনে একটু আনন্দ এনে দেব। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যাকে ভালবাসবো তাকেও...।

নিখিল হাসে—বলেই ফেল, লজ্জা করবার কি আছে?

অবন্তী—তাকেও আমার নিজের মনের মতন তৈরী ক'রে নেব।

নিখিল আশ্চর্য হয়—তার মানে?

অবন্তী—তাকেও বড় ক'রে তুলবো।

নিখিল—এ যে আরও দুর্বোধ্য হয়ে গেল।

অবন্তী হাসে—তার ভাগ্যকেও আমিই বড় ক'রে দিয়েছি। এই আমার গর্ব।

নিখিল—কিছুই বুঝলাম না অবন্তী।

অবন্তী—তোমার এই সার্ভিসটা আমারই চেষ্টায় পেয়েছ, সে খবর তুমি জান না। কোন দিন তোমাকে বলিনি, বলবোও না ভেবেছিলাম। কিন্তু...।

নিখিলের উঁচু মাথার উল্লাস যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠে। এতক্ষণ মনের ভিতরে উতলা হয়ে ওঠা এত সুন্দর গর্বের বাতাসটা যেন হঠাৎ ধুলোয় ভরে গেল। এ কি বলছে অবন্তী? অবন্তীর চোখ দুটো যেন বিজয়িনী জাদুকরীর চোখের মত জ্বলজ্বল করছে। নিখিলের সৌভাগ্য যেন অবন্তীরই একটা কৌতুকের সৃষ্টি।

নিখিল বলে—কি বলছিলে বল।

অবন্তী—কিন্তু আজ আর বলতে বাধা নেই। আমার সব আশা সফল হয়েছে নিখিল। আমার নিজের জীবনের আনন্দ, আমি যাদের ভালবাসি তাদের জীবনের আনন্দ, সবই আমার নিজের হাতে গড়া। আমার মত একটা সাধারণ মেয়ে, এর চেয়ে বেশি আর কোন্ গর্ব আশা করতে পারে বল?

নিখিল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়—আমি সত্যিই কল্পনাও করতে পারিনি, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না যে, আমার চাকরিটা তোমার চেষ্টায় হয়েছে।

অবন্তী—বিশ্বাস কর নিখিল।

নিখিল—বিশ্বাস করতে চাই, কিন্তু...।

অবন্তী হাসে—হ্যাঁ, এর মধ্যে একটা কিন্তু আসছে ঠিকই। সেটাও একটা গল্প।

নিখিল—শুনি।

অবন্তী—এক ভদ্রলোক। বেশ লোক। অদ্ভুতও বলতে পারা যায়, সে ভদ্রলোক আমার অনুরোধ ঠেলতে পারেন না।

চুপ করে অবন্তী সরকার। নিখিল মজুমদারের চোখের দৃষ্টি দুঃসহ কৌতূহলে জ্বলজ্বল করে। —গল্পটা স্পষ্ট ক'রে না বললে কিছুই বুঝতে পারছি না।

অবন্তী—সে ভদ্রলোক খুব কোয়ালিফাইড। সায়েন্সে রিসার্চ স্কলার। আমি যে কাজটা পেয়েছি, সে কাজটার জন্য সেই ভদ্রলোকও প্রার্থী ছিল। কাজটা তারই ভাগ্যে অবধারিত ছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে...।

অবন্তী সরকারের মুখের হাসিটা হঠাৎ আরও ছটফট ক'রে বেজে ওঠে—ইণ্টারভিউ-এর দিন সেই ভদ্রলোক আমার অনুরোধে ইণ্টারভিউ না দিয়েই সরে পড়লো।

নিখিল—তারপর?

অবন্তী—ঠিক এইরকমেরই কাণ্ড আবার করতে হলো তোমার চাকরিটার জন্য। ঐ ভদ্রলোকই আবার এই কাজটার জন্য দরখাস্ত করেছিল।

চেঁচিয়ে ওঠে নিখিল—শেখর মিত্র?

অবন্তী—হ্যাঁ। তোমার কাছ থেকে যেদিন শুনলাম যে শেখর মিত্র নামে একজন খুব কোয়ালিফাইড ক্যানডিডেট এই কাজের জন্য চেষ্টা করছে, সেদিন আমিই শেখর মিত্রকে চিঠি দিয়ে ডেকে এনে অনুরোধ করলাম। ভদ্রলোক খুশি হয়ে রাজি হয়ে গেল। আমার কথায় শেখর মিত্র কাজটা নেয়নি বলেই তুমি পেয়ে গেলে।

নিখিল মজুমদার দু'চোখের নিথর দৃষ্টি দিয়ে যেন গিলে গিলে অবন্তী সরকারের মুখের

ঐ হাসি আর এই গল্পের শব্দগুলিকে বুঝবার চেষ্টা করে।

অবন্তী বলে—তুমি একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছো বলে মনে হচ্ছে।

নিখিল—একটু নয়, যথেষ্ট হচ্ছি।

অবন্তী—কেন?

নিখিল—দুনিয়াতে এমন বোকা মানুষও আছে।

অবন্তী—তার মানে?

নিখিল—তার মানে, ঐ শেখর মিত্র, এরকম একেবারে নিঃস্বার্থ পরোপকারী একটা বেকুব।

অবন্তী—হ্যাঁ পরোপকারী বলতে পার, বেকুবও বলতে পার। কিন্তু...।

আবার একটা কিন্তু দিয়ে মুখের হাসিটাকে একটু জটিল ক'রে তোলে অবন্তী সরকার। —কিন্তু, ঠিক একেবারে নিঃস্বার্থ বলা যায় না।

নিখিল—কেন?

মুখে রুমাল চাপা দেয় অবন্তী—আর প্রশ্ন করো না নিখিল। উত্তর দিতে বড় লজ্জা করবে আমার।

নিখিল মজুমদারের চোখের কৌতূহল এইবার তীক্ষ্ণ হয়ে আসতে থাকে।—লজ্জার ব্যাপার আছে তাহলে?

অবন্তী—হ্যাঁ।

নিখিল—কি?

অবন্তী—আমার বিশ্বাস, ভদ্রলোক যেন একটা আশা নিয়ে...যাক, আর বলতে পারবো না নিখিল।

নিখিল গম্ভীর হয়ে বলে—তোমার মুখ দেখে মুগ্ধ হয়েও বোধ হয়?

অবন্তী—হ্যাঁ তাই, তাতে কি আসে যায়? আমার কি দোষ বল?

নিখিল—কেমন যেন অদ্ভুত ভঙ্গীতে কটকট ক'রে হাসতে থাকে—সত্যি কথা। তোমার মুখ দেখে কেউ মুগ্ধ হয়ে যদি পাগল হয়ে যায়, তবে তোমার অপরাধ হবে কেন? ভদ্রলোক নিজের মনের ভুলেই নিজেকে পাগল করেছেন।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে অবন্তী—আমিই বা সেই পাগলামির সুযোগ নিতে ছেড়ে দেবো কেন?

হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় নিখিল মজুমদার। আনমনা হয়ে চুপ ক'রে কিছুক্ষণ কি-যেন ভাবতে থাকে। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসে—শেখর মিত্র দেখতে কেমন?

অবন্তী হাসে—দেখতে ভাল বৈকি। দেখতে বেশ চালাকও।

নিখিল—বয়স একটু বেশি হয়েছে বোধহয়।

অবন্তী চেঁচিয়ে ওঠে—না না। তোমার চেয়ে বেশি নয়, বরং একটু কম বলেই মনে হয়।

নিখিল—বাড়ির অবস্থা কেমন?

অবন্তী—সে-সব খবর রাখি না। কিন্তু একটু গরীব বলেই মনে হয়।

নিখিল—আমারও তাই মনে হয়। নইলে পরের উপকার করবার জন্য এরকম মূর্খের মত নিজের ক্ষতি কে আর করে? শক্ত ক'রে চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলি উচ্চারণ করে নিখিল।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় নিখিল মজুমদার—রাত হয়েছে। চলি এবার।

অবন্তী—এমন কিছু রাত হয়নি।

নিখিল—তা ঠিকই ; তবে মিউজিক কনফারেন্সের একটা টিকেট কিনেছি। তাই যেতে হচ্ছে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অবন্তী সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে চেষ্টা করে নিখিল। এবং বোধ হয় ঠিক ভাল ক'রে বলবার মত ভাষা মুখের কাছে পায় না। নিখিলের

চোখের চাহনির ভঙ্গী আর তীক্ষ্ণতা আর একবার দপ্ ক'রে হেসে ওঠে। তার পরেই যেন ভয় পাওয়া মানুষের চোখের মত থরথর করে। অবন্তীর ঐ সুন্দর মুখ, কালো চোখ আর চোখের তারার বুদ্ধির দীপ্তি ভয় করবার মত বস্তু নয়, কিন্তু নিখিলের চোখ দুটো সত্যিই যে বেশি ভয় পেয়েছে। থরথর করে নিখিলের ঠোঁট দুটো।

যাবার আগে একটা কথা বলেই ফেলে নিখিল, আর বলে ফেলেই হো হো ক'রে হেসে ওঠে।--অদ্ভুত গল্প শোনালে অবন্তী। শেখর মিত্র নামে একটা লোক তোমাকে ভালবেসে ফেলেছে অথচ তুমি তাকে ভালবাস কিনা, সেদিকে তার কোন খেয়ালই নেই।

--হ্যাঁ। কথাটা বলে লজ্জা পেয়ে হাসতে থাকে অবন্তীও।

নিখিল বলে--সবচেয়ে অদ্ভুত, আরও মজার কথা, তুমি তাকে ভালবাসতে পারনি।

ভ্রূকুটি করে অবন্তী--আবার আমার কথা বারবার টেনে এনে মিছিমিছি কেন...।

নিখিল মজুমদার হাঁটতে শুরু করে, এবং মুখের হাসিটাও যেন না থেমে সঙ্গে সঙ্গে শব্দ ক'রে চলতে থাকে। অবন্তীর দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে কথা শেষ করে নিখিল--সত্যিই শেখর মিত্র একটা অদ্ভুত...।

কথাটা ঠিক শেষ হলো না, কিন্তু চলে গেল নিখিল মজুমদার।

১৩

অনসূয়া বলে--আপনি যে আমাদের ভুলেই গিয়েছেন?

শেখর--কেমন ক'রে বুঝলে?

অনসূয়া--সেই যে কবে বোনপোর অন্নপ্রাশনের দিনে এসেছিলেন, তারপর এই এতদিন পরে দ্বিতীয় শুভাগমন।

শেখর--একটা শুভ খবরের আঁচ পেলাম এতদিনে, তাই ভাল ক'রে জানতে এসেছি।

অনসূয়া হেসে মুখ ফেরায়। প্রভা এসে বলে--কিন্তু উনি এখন নিজেই শুভ খবরের শত্রু হয়ে উঠলেন। এখনও পর্যন্ত মন স্থির করতে পারছেন না।

শেখর হাসে--তার মানে।

প্রভা--উনি বলছেন, অজানা অচেনা একটা মানুষকে কেমন ক'রে...।

শেখর--ঠিকই তো বলেছে। বেচারা একটু চেনা-জানা না ক'রে একটা কাণ্ড করে ফেলতে রাজি হচ্ছে না, ভালই তো।

অনসূয়া--আপনিই বলুন, আমি বললে আপনার বোন বিশ্বাস করে না।

প্রভা--পাত্র তো বিয়ে করবার জন্য পাগল, কিন্তু উনিই রাজি নন।

শেখর--পাগল হলো কেন?

প্রভা--গান শুনে। মিউজিক কনফারেন্সে অনসূয়ার ঠুংরি শুনে পাত্রমশাই নিজে যেচে অনেক কষ্ট ক'রে ঠিকানা জোগাড় ক'রে একেবারে ওঁর অপিসে হাজির হয়েছে। পাত্র একেবারে অচেনাও নয়। পাত্রের দাদা ওঁরই সঙ্গে দিনাজপুরের কলেজে এক ক্লাসে পড়তেন।

শেখর--পাত্র কি করে?

প্রভা--আগে তেমন কিছু করতো না। কিন্তু এখন খুব ভাল একটা সার্ভিস পেয়েছে। মাইনে চার-পাঁচশো টাকার মত।

শেখর--ব্যস্, তবে আর অসুবিধার কি আছে? পাত্রের সঙ্গে অনসূয়ার একটু ভাব করিয়ে দাও। ওরা নিজেরাই একটু চেনা-জানা ক'রে একেবারে নিঃসন্দেহ হয়ে যাক।

অনসূয়া চেঁচিয়ে ওঠে--কখ্খনো না। ওসব বেহায়াপনা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।

শেখর--তাহলে পাত্রকে বলে দিলেই তো হয় যে, মেয়ে রাজি নয়।

প্রভা হাসে--তাতেও রাজি নয় অনসূয়া।

শেখর--তার মানে?

অনসূয়া--মানে খুব সোজা। এত তাড়াতাড়ি করবার কি আছে? দেখাই যাক না, ভদ্রলোকের মন কতদিন পাগল হয়ে থাকতে পারে।

শেখর--তাই বল। ধীরে সুস্থে এগুতে হবে, এই তোমার বক্তব্য।

অনসূয়া--হ্যাঁ। কিন্তু আপনার কোন বক্তব্য তো আজ পর্যন্ত শুনতেই পাওয়া গেল না। একেবারে ফুল স্টপ দেগে বসে আছেন। হাসি-ঠাট্টার উল্লাসটা যেন শেখর মিত্রের মনের ভেতর গিয়ে হঠাৎ একটা হোঁচট খায়। আনমনার মত চমকে ওঠে শেখর। যেন একটা পুরনো ক্ষতের উপর আঘাত লেগেছে। হ্যাঁ ফুল স্টপ ; অনসূয়া জানে না, শেখর মিত্রের জীবনে একটা আশার কবিতা হঠাৎ ভাষা হারিয়ে মিলের আগেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। অনসূয়া জানে না, তারই বান্ধবী অবন্তী সরকার এখন একটা নিষ্ঠুর কৌতুকের গল্প হয়ে শেখর মিত্রের স্মৃতির আড়ালে পড়ে আছে।

শেখর জোর ক'রে হাসে--আমার বক্তব্য থাকলেও কোন দিন শুনতে পাবে না।

অনসূয়া--তা জানি, মশাই ডুবে ডুবে জল খেতে খুব ওস্তাদ। যাক.. আপাতত চা খান।

চা আনে অনসূয়া। চা খেতে খেতে গল্প করে শেখর। সে-সব গল্প একেবারে ভিন জগতের গল্প। হাইড্রোজেন বোমা থেকে শুরু ক'রে দক্ষিণ মেরুর বরফের রহস্য পর্যন্ত সব কিছুই সেই গল্পের মধ্যে থাকে।

অনসূয়া হঠাৎ মুগ্ধ হয়ে বলে--আপনি বড় সুন্দর বুঝিয়ে বলতে পারেন। অবন্তীটা আজ এখানে থাকলে এই সব গল্প কত মজা ক'রে শুনতে পেত।

বোধহয় মনটা একটু অসাবধানে ছিল, তাই বলে ফেলে শেখর--অবন্তী সরকার কবে এসেছিল?

অনসূয়া--অনেক দিন হলো আসে না। কে জানে ওর কি হয়েছে। মাঝে একদিন মিউজিয়ামের গেটের কাছে আমার সঙ্গে দেখাও হয়েছিল। কিন্তু কী অদ্ভুত, খুব গম্ভীর হয়ে আর শুধু কেমন আছ বলেই তড়বড় ক'রে সরে পড়লো।

প্রভাদের বাড়ির চা-এর আসর থেকে উঠে আবার কলকাতার রাতের পথে একা চলতে চলতে শেখর মিত্রের মনের ভিতর নীরব গল্পটা যেন ছটফট ক'রে ওঠে। অবন্তী সরকার গম্ভীর হয়ে গিয়েছে কেন? ও মেয়ের পক্ষে তো গম্ভীর হওয়া সাজে না।

পথের বাঁক ঘুরতে গিয়ে পিছনের গাড়ির শব্দে চমকে ওঠার পর শেখর মিত্রের মনটাও এই হঠাৎ বিষণ্ণতার ছোঁয়া থেকে মুক্ত হয়ে যেন হেসে হেসে নিজেকেই ঠাট্টা করে, অবন্তী সরকারের কথা ভেবে তোমারও এত গম্ভীর হওয়া আর সাজে না।

১৪

পার্ক সার্কাসের মস্ত বড় নতুন বাড়ির ফ্ল্যাটে সুন্দর করে সাজানো একটি ঘর। সোফার উপর বসে আছে যে সুন্দর মেয়ে নাম যার অবন্তী সরকার, সে আজ সত্যিই বড় গম্ভীর। দুই কালো চোখের তারায় সেই বুদ্ধির দীপ্তি হঠাৎ বোকা হয়ে গিয়েছে, খুব বেশি চিকচিক করে না। অফিস থেকে অনেকক্ষণ হলো ফিরে এসেছে অবন্তী সরকার। সারা বাড়িটার জানালায় জানালায় সন্ধ্যার আলো ফুটেছে। অবন্তী সরকারের এই ঘরেও আলো জ্বলে। কিন্তু এই ঘরের সঙ্গে যেন বেশ একটু বেমানান হয়ে বসে আছে অবন্তী সরকার। এত নীরব, এত স্তব্ধ আর এত গম্ভীর মূর্তি রঙীন কভারে ঢাকা সোফার সঙ্গে ঠিক সাজে না।

শুধু তাই বা কেন? অবন্তী সরকারের ঐ রঙীন সাজের সঙ্গে, গলার হারের লকেটের ঐ

পাথরের ঝিকঝিক হাসির সঙ্গে ওর এত গম্ভীর একটা মুখকেও মানায় না।

নিখিল মজুমদার নিশ্চয়ই এখন আর আসে না। কেন আসবে না, সে রহস্যের কিছুই আজ আর অবন্তী সরকারের অজানা নয়। গত এক মাসের মধ্যে একটি দিন ভুল করেও এখানে আসেনি নিখিল মজুমদার। সেই ভাল সার্ভিসটা পাওয়ার পর থেকে কাজের দায় নিয়ে সারা দিনের অনেকটা সময় ব্যস্ত হয়ে থাকতে হয় ঠিকই। কিন্তু কাজ শেষ হবার পরেও তো অনেক সময় থাকে। বিশেষ ক'রে এই রকমের এক একটি সন্ধ্যার সময়ে। এর আগে প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই ঠিক এইরকমই প্রথম আলো জ্বলবার লগ্নটা এগিয়ে আসতেই নিখিল মজুমদারের মূর্তি এই ঘরের দরজায় দেখা দিয়েছে। হাসিভরা উজ্জ্বল চোখে কৃতার্থতার আনন্দ ভরে নিয়ে এই ঘরের সোফায় বসে অবন্তী সরকারের সঙ্গে গল্প ক'রে চলে গিয়েছে নিখিল। সেই নিখিল কেন এমন উদাস হয়ে গেল, জানতে পেয়েছে অবন্তী।

শেষ কবে এসেছিল নিখিল? খুব স্মরণ করতে পারে অবন্তী সরকার। নিখিল মজুমদারের চাকরি হবার প্রথম সপ্তাহের রবিবারের সন্ধ্যায়। তার পর আর নয়। সেই যে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে চেঁচিয়ে আর হেসে হেসে চলে গেল নিখিল, তারপর আসেনি।

নিখিলের সেই অদ্ভুত চাহনি, সেই উচ্চ হাসি, আর সেই ব্যস্ততার অর্থ সেদিন বোঝা যায়নি। কিন্তু আজ বোঝা যায়। নিখিলের আর এই বাড়িতে না আসার রহস্যটা বুঝতে বেশি দেরি হয়নি অবন্তীর। অফিসের টাইপিস্ট চারুবাবুর সামান্য কয়েকটা কথা থেকেই একটা অসামান্য কাহিনীর মর্ম জেনে ফেলেছে অবন্তী।

আজ এতদিন পরে এই ঘরের সোফার উপর বসে গম্ভীর অবন্তী সরকার স্মরণ করে, কী অদ্ভুত মানুষের মন! সেই রাতেই মিউজিক কন্‌ফারেন্সে গিয়ে ঐ নিখিল মজুমদার অনসূয়াকে প্রথম দেখতে পেয়েছিল। সেই তো নিখিলের চোখে প্রথম অভিশাপ লাগলো। তার জের আজও মেটেনি। অফিসের টাইপিস্ট চারুবাবুর কথায় প্রথম যেটুকু জানতে পেরেছিল অবন্তী, এই কদিনের মধ্যে খোঁজ নিয়ে তার চেয়ে আরও অনেক বেশি কিছু জানতে পেরেছে! মনে পড়ে, চারুবাবু কদিন আগে তাঁর ভাগ্নের নামে যে নতুন গল্পটা বললেন।

—ছেলেদের মনের লীলা দেখে মরে যাই মা। আমার সেই ভাগ্নেই কিনা একটা মেয়ের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে, আর তাকে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

চমকে উঠেছিল অবনী—কি বললেন?

চারুবাবু ভবানীপুরে আমারই বাড়ির পাশে থাকে যে শৈলেশ, তার বোন অনসূয়া নামে মেয়েটি বেশ ভাল গান গাইতে পারে।

--অনসূয়া! চেঁচিয়ে ওঠে অবন্তী।

চারুবাবু—তুমি অনসূয়াকে চেন নাকি?

অবন্তী—চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কিন্তু সে মেয়ে তো রোজগেরে মেয়ে নয়।

চারুবাবু—না, সেই জন্যেই তো আশ্চর্য হচ্ছি। আরও একটা কথা। আমার ভাগ্নে বাবাজি গাইয়ে বাজিয়ে মেয়েদের দস্তুর মত ঘেন্নাই করতো। অথচ দেখ, মাত্র একটিবার গান শুনেই...।

চারুবাবুর কাছ থেকে কথায় কথায় আরও খবর শুনেছে অবন্তী। নিখিলের মা দিনাজপুর থেকে চলে এসেছেন, অনসূয়ার সঙ্গে নিখিলের বিয়ের সম্বন্ধ পাকাপাকি করবার জন্য।

একদিন চৌরঙ্গীর পথের উপর একটু দূরে দাঁড়িয়ে অবন্তী। নিজের চোখেই দেখেছে, অনসূয়ার দাদা শৈলেশবাবু আর নিখিল একই ট্যাক্সি থেকে নেমে সিনেমা হাউসের ভিতরে ঢুকেছে। আজ আর কোন সন্দেহ নেই, কেন নিখিল মজুমদার এই ঘরের দরজার কাছে এসে হেসে হেসে দাঁড়াবার সব দায় ভাল করেই ভুলে গিয়েছে।

নিখিল মজুমদার অবন্তী সরকারের চোখের নাগালে আর আসেনি, কিন্তু অবন্তী সরকার

অনেকবার টেলিফোনে নিখিলের নাগাল পেয়েছে। প্রত্যেক বারই অবন্তীর প্রশ্নের উত্তরে নিখিল সেই একই উত্তর দিয়ে কথা শেষ ক'রে দিয়েছে—নানা কাজে বড় ব্যস্ত আছি। একেবারেই সময় পাই না।

কী সুন্দর সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত মিথ্যা! নিখিল মজুমদার কল্পনাও করতে পারে না যে, তার জীবনের নতুন গল্পের অনেক কিছুই অবন্তী সরকারের জানা হয়ে গিয়েছে। তাই অক্লেশে ওভাবে অত সহজ ও সরল একটা মিথ্যা কথাকে অনায়াসে অবন্তী সরকারের কানের উপর ছুঁড়ে দিতে পেরেছে নিখিল। অবন্তী সরকারের চোখের জ্বালা কখনও নীরব ধিক্কার দিয়ে হেসে ওঠে, আবার কখনও বা আরও তপ্ত হয়ে গলে পড়তে চায়।

অনসূয়ার গানের মধ্যে এমন অভিশাপ থাকতে পারে, কোনদিন স্বপ্নেও সন্দেহ করেনি অবন্তী। আর, নিখিল মজুমদার নামে মানুষটা তার মনের মধ্যে এত বড় পাগলামি লুকিয়ে রেখেছিল? অবন্তী সরকারের এত কল্পনা ও চেষ্টার গৌরবে গড়া সুখের জগৎ থেকে পালিয়ে যাবার ইচ্ছা হয় একটা গানের জন্য?

অপমানের কামড়টা বুকের পাঁজরে পাঁজরে যেন রক্ত ঝরিয়ে দিচ্ছে। অনসূয়ার গান অবন্তী সরকারের ভালবাসার মানুষকে লুঠ ক'রে নিয়ে গিয়েছে। অবন্তী সরকারের এতবড় আশার স্বপ্ন, সব গর্ব যে ব্যর্থ হতে চললো।

সোফা থেকে স্তব্ধ শরীরটাকে তুলে নিয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ায় অবন্তী। কোলাহলময় পথের ধোঁয়াটে কুহেলিকার দিকে তাকিয়ে একটা প্রশ্নের সঙ্গে যেন মনে মনে স.গ্রাম করে অবন্তী। নিখিল মজুমদারকে ফিরিয়ে আনা যায় না?

চোখের সামনে শুধু ধোঁয়াটে কুহেলিকাই ছিল, ঝকঝকে মিরর নয়। নইলে নিজের চোখেই নিজের মুখটাকে এমন দেখতে পেয়ে চমকে উঠতো অবন্তী। ঠোটের উপর দাঁত বসে গিয়েছে, যেন একটা নতুন প্রতিজ্ঞার উল্লাস নিয়ে মনে মনে খেলা করছে অবন্তী।

ধিকধিক করে চোখের তারা। আর, বারবার মনে পড়ে, শেখর মিত্র নামে একটি মানুষের কথা। আজও ডাকলে কি সে মানুষ না এসে পারবে? অবন্তীর অনুরোধকে ভক্তের মত পূজা করে যে মানুষ, সে কি আবার একটু সাহায্য করবে না? ঐ তো এই পৃথিবীতে এক জন মাত্র মানুষ, যার কাছে অনায়াসে দুঃখের কথা বলে দুঃখ থেকে উদ্ধারের দাবি করতে পেরেছে অবন্তী। সে তো একটা মাটির মানুষ, অবন্তীর উপকার করতে পারলেই ধন্য হয়ে যায়। ঐ একটি মানুষ, যার কাছে অবাধে, বিনা লজ্জায়, অসঙ্কোচে সব কথা বলে দিতে পারে অবন্তী। ঐ একটি লোক ; যে ভুল ক'রে মনে মনে অবন্তীকে ভালবেসে বসে আছে।

শেখর মিত্রের বাড়িতে যাবার দরকার নেই। চিঠি দিলেই যথেষ্ট। জানালার কাছ থেকে সরে এসে শেখর মিত্রের কাছে চিঠি লেখে অবন্তী।—আমার বিপদ। বিশ্বাস আছে, এই খবর শুনে নিশ্চয় একবার আসবেন।

১৫

বেশ একটু আশ্চর্য হয়েছে অনসূয়া এবং ভাবতে একটু অস্বস্তিও বোধ করে। নিখিল মজুমদার নামে এক ভদ্রলোক সত্যিই যে পাগলের মত কাণ্ড করছেন। এরই মধ্যে অনসূয়াকে সাতটা চিঠি লিখে ফেলেছে নিখিল মজুমদার। সব চিঠির বক্তব্য প্রায় একই। যদিও তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ চেনা-শোনা নেই, যদিও আমার পরিচয় তুমি অনেক কিছুই জান না, এবং তোমার পরিচয়ও আমি অনেক কিছু জানি না, তবু সেটা কি এমন কোন বাধা যে আমাদের বিয়েই হতে পারে না? একেবারে সব জেনে-শুনে আপন হওয়া যায়, আবার একেবারে আপন হয়ে নিয়ে তারপর সব জানা-শোনা যায়, এই দুটোই কি সত্য

নয়? আপন হবার পরেও কে কার জীবনের সবটুকু জানতে পারে অনসূয়া? আপন হবার আগে তো প্রায় কিছুই জানা যায় না। তুমি শত চেষ্টা ক'রে, এক বছর ধরে অপেক্ষা ক'রে, আর আমাকে চোখে দেখে ও আমার কথা শুনে আমাকে কতটুকুই বুঝতে আর চিনতে পারবে? একটু অজানা এবং কিছুটা না-বোঝা না থাকলে আপন হবার আনন্দ যে মধুর হয় না অনসূয়া।

নিখিলের চিঠি পড়তে খারাপ লাগে না, কথাগুলিকে অবিশ্বাসও করে না অনসূয়া, এবং কথাগুলির মধ্যে কোন ভুল আছে বলে মনে হয় না। চোখে দেখে আর কথা শুনে মানুষকে কতটুকুই বা চেনা যায়?

ঘরের ভিতর একলা বসে অনেকদিন অনেকবার অনেকক্ষণ ধরে এই ভাবনা অনসূয়াও ভেবেছে। আর গম্ভীর মুখটাকে বার বার আঁচল দিয়ে মুছে নিজের মনকেও প্রশ্ন করেছে—কই, প্রভা বৌদির দাদা শেখর মিত্র মানুষটাকে এতদিন ধরে দেখে শুনেও চিনতে পারা গেল কি?

একটা চেনা চিনতে পারা গিয়েছে ঠিকই ; মানুষটা যেন নিখুঁত মানুষ। মনের ভুলেও কোন মানুষকে বোধ হয় একটা টোকা দিয়ে দুঃখ দিতে পারে না শেখর মিত্র। নিজের দুঃখটাকে হাসি দিয়ে ঢেকে রাখে, আর পরের দুঃখটাকে হাসিয়ে দেবার জন্য সব সময় ব্যস্ত হয়ে রয়েছে।

কিন্তু সে চেনা নয়। শেখর মিত্রের মনের ভিতরে কোন ইচ্ছা কি লুকিয়ে নেই? অনসূয়াকে কি শুধু বোনের ননদ বলে মনে করে শেখর মিত্র, তার বেশি কিছু মনে করতে ইচ্ছা করে না?

সকলেই নিখিল মজুমদার নয়। সকলেই মুখ দেখে কিংবা গান শুনে পাগল হয়ে ওঠে না, আর পর পর সাতটা চিঠি লিখে ভালবাসার আশা জানিয়ে দিতে পারে না এমন মানুষও আছে নিশ্চয়, যে তার ভালবাসার আশা আর ইচ্ছাটাকেই সবচেয়ে নীরব ক'রে দিয়ে বুকের গভীরে লুকিয়ে রাখে, আর শত আঘাতেও মুখ খুলে সে আশা ও ইচ্ছাটাকে মুখর ক'রে বাজিয়ে দিতে পারে না। শেখর মিত্র যদি এইরকমই নীরব মনের মানুষ হয়ে থাকে, তবে? এই একটা প্রশ্ন? অনসূয়ার জীবনের একটা বড় কঠিন প্রশ্ন। শুধু জানতে চায় অনসূয়া, প্রভা বৌদির দাদার মনে অনসূয়া নামে কোন মেয়ের নাম কোন ভাবনা ব্যাকুল ক'রে তোলে না। শেখর মিত্র আসে, হাসে, কথা বলে আর চলে যায়—এই মাত্র। এর মধ্যে আর কোন ইচ্ছার ছায়া নেই।

এই প্রশ্নের উত্তর আজও পায়নি অনসূয়া, এবং পায়নি বলেই বোধ হয় নিখিল মজুমদারের চিঠির উত্তরে আজ পর্যন্ত একটা চিঠিও লিখতে পারেনি অনসূয়া। প্রভা কতবার জিজ্ঞেসা করেছে, কিন্তু নিখিল মজুমদারের ইচ্ছাটাকে মেনে নেবার জন্য মাথা নেড়ে একটা সুস্পষ্ট 'হ্যাঁ' জানাতে পারেনি ; অথচ 'না' বলে সব প্রশ্ন থামিয়ে দিতে পারেনি।

অস্বীকার করে না অনসূয়া, এবং নিজের চিন্তার ভাষাটাকে বেশ স্পষ্ট বুঝতেও পারে। নিখিল মজুমদারকে বিয়ে করতে কোন আপত্তি নেই ; শুধু যদি জানতে পারে অনসূয়া, এই বিয়ে শেখর মিত্র নামে একটা মানুষের মনের কোন নীরব আশাকে ব্যথিত ক'রে তুলবে না।

নিখিল মজুমদারের চিঠির মধ্যে আর একটা বড় সুন্দর কথা লেখা আছে। একেবারে অকপট মনের আবেগ নিয়ে স্বচ্ছন্দে লিখেছে নিখিল মজুমদার—তুমি কি কাউকে ভালবাস? এবং তোমাকেও সে ভালবাসে? যদি তাই হয়ে থাকে, তবে আমার কিছু বলবার নেই। আমি খুশি হয়ে তোমার কথা ভুলে যাব।

শেখর মিত্রকে ভালবেসেছে অনসূয়া, একথা বললে বেশি বলা হয়ে যায়। তাই যদি হতো, তবে অনসূয়া এতদিন চুপ ক'রে থাকতো না। মানুষটাকে ভাল লাগে, এর বেশি কিছু নয়। এবং এটাও সত্য যে, শেখর মিত্রকে ভালবাসবার সাহস পেত অনসূয়া, যদি কোন

মুহূর্তে বিশ্বাস করতে পারতো যে, শেখর মিত্র অনসূয়াকে সত্যিই ভালবাসতে চায়। কিন্তু এমন উপলব্ধির মুহূর্ত অনসূয়ার জীবনে কোন দিন কোন বিস্ময় নিয়ে সত্য হয়ে ওঠেনি।

আরও একটা অদ্ভুত কথা আছে নিখিল মজুমদারের চিঠিতে। লেখাটা যেন খুব ভয়ে-ভয়ে আর বড় বেশি করুণ হয়ে মানুষের ভাগ্যের অদ্ভুত একটা জটিলতার বেদনা বলে দিতে চেষ্টা করেছে।--এমন যদি হ'য়ে থাকে অনসূয়া, তোমাকে কেউ একজন ভালবাসে, অথচ তুমি তাকে ভালবাসো না, তবে আমাকে বিয়ে করতে রাজি হওয়া তোমার উচিত কিনা, সেটা তুমি ভেবে দেখবে। কিন্তু আমি রাজি হয়েই আছি। অনসূয়ার চিন্তার সমস্যাটাকে খুব সরল ক'রে দিয়েছে নিখিল মজুমদারের চিঠি। ঠিকই তো, একবার লজ্জার মাথা খেয়ে শেখর মিত্রের মনটাকে যাচাই ক'রে নিলেই তো হয়। যদি শেখর মিত্রের মনে অনসূয়া নামে একটা ভাবনা থেকে থাকে, আর সে ভাবনার মধ্যে ভালবাসবার ইচ্ছা থেকে থাকে, তবে অনসূয়ার কর্তব্য সোজা ও সরল হয়ে যায়। হয়, শেখর মিত্রের ভালবাসার ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য ক'রে নিখিল মজুমদারকে বিয়ে করতে হবে ঃ নয়, নিখিল মজুমদারের ভালবাসার দাবি তুচ্ছ ক'রে শেখর মিত্রকেই বিয়ে করতে হবে। ভাগ্যি ভাল, অনসূয়ার পঁচিশ বছর বয়সের মন নিজে সাধ ক'রে এই পৃথিবীর কাউকে ভালবেসে অন্ধ হয়ে যায়নি। তাই ভালবাসার জন্য এগিয়ে যাবার পথটা এখনও সোজা ও সরল আছে।

এইবার একটা কলম হাত তুলে নিতে পারে অনসূয়া এবং একটা চিঠিও লিখে ফেলে। কিন্তু নিখিল মজুমদারকে নয় ; নিখিলকে চিঠি লিখে উত্তরে দিতে আরও একটু দেরি করতে হবে। প্রভা বৌদির দাদা শেখর মিত্রকেই চিঠি লেখে অনসূয়া।--আপনি একদিন আসুন। কেন আসতে বলছি সে-কথা এই চিঠিতেই জানিয়ে দিচ্ছি। উত্তরটা তৈরী ক'রে নিয়ে আসবেন। আমার প্রশ্ন, হঠাৎ আমার গান শুনে খুশি হয়েছেন যে ভদ্রলোক ; তাঁকে বিয়ে করা আমার উচিত হবে কি? আপনার কোন আপত্তি নেই তো?

১৬

শৈলেশের হাতে একটা চিঠি। চিঠি দিয়েছে নিখিল, আজই সন্ধ্যার সময় এখানে আসবে নিখিল।

প্রভা মুখ টিপে হাসে—পীরিতের দায়। বড় অস্থির হয়ে উঠেছে বেচারা।

শৈলেশ একটু বিরক্ত ভাবে বলে—কিন্তু অনসূয়া এরকম করছে কেন? হ্যাঁ, কিংবা না, একটা কথা স্পষ্ট ক'রে বলে দিলেই তো হয়।

প্রভা আবার মুখ টিপে হাসে—দাদা যে পরামর্শটা দিয়ে গেলেন, সেটা তুচ্ছ করছো কেন?

শৈলেশ--কিসের পরামর্শ?

প্রভা—অনসূয়ার সঙ্গে নিখিলবাবুর একটু ভাব-সাব হবার সুযোগ ঘটিয়ে দাও। নিজেরাই আলাপ ক'রে যতটুকু পারে দু'জনকে বুঝে নিক। শুধু অনসূয়াকে গোঁয়ার বলে বকা দিয়ে লাভ কি?

শৈলেশ--তাহ'লে কি করা যায়? তুমিই একটা পরামর্শ দাও।

প্রভা হাসে--চল, আজ সন্ধ্যায় আমরা দুজন বাইরে চলে যাই, সিনেমায় কিংবা গড়পারের মাধুরীদির বাড়িতে?

শৈলেশ—তা'তে কি হবে?

প্রভা—নিখিলবাবু সন্ধ্যা বেলায় এখানে এসে অনসূয়াকে একা দেখতে পেয়ে...।

খিলখিল ক'রে হেসে উঠে প্রভা তার পরিকল্পনার কৌতুকে ছটফট ক'রে ওঠে।—তার

পর দাদার পরামর্শটাই সত্যি হয়ে যাবে।

তোমার গোঁয়ার বোনের ভয় ভেঙ্গে যাবে, আর ভাবসাব হয়েও যাবে।

সন্ধ্যা হবার আগেই যখন শৈলেশ আর প্রভা সিনেমার ছবি দেখতে চলে গেল, তখন একটু আশ্চর্য হলেও তার মধ্যে কোন চক্রযন্ত্র আছে বলে সন্দেহ করতে পারেনি অনসূয়া। কিন্তু সন্দেহটা একেবারে একটা ভয়ার্ত শিহর তুলে চমকে উঠলো তখন, যখন ঘরের দরজার কাছে পায়ের শব্দ শুনে তাকাতেই অচেনা এক ভদ্রলোকের মূর্তি চোখে পড়লো।

ভদ্রলোক বলেন--শৈলেশবাবুকে আমি একটা চিঠি দিয়েছিলাম। তিনি জানেন, আজ আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবো।

অনসূয়া--শৈলেশবাবু বাড়িতে নাই।

ভদ্রলোক--তিনি কি আপনার দাদা?

অনসূয়া--হ্যাঁ।

ভদ্রলোক--আমি নিখিল।

চমকে, মাথা হেঁট ক'রে আর মুখ ঘুরিয়ে অনসূয়া বলে--বসুন। চেয়ারে বসেই নিখিল বলে--কিন্তু তাই বলে তুমি উঠে যেও না।

সত্যি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল অনসূয়া। নিখিল বলে--বসো অনসূয়া।

চেয়ারে বসেই বুঝতে পারে অনসূয়া দাদা আর বৌদির সিনেমার ছবি দেখতে যাওয়ার ব্যাপারটা কত বড় একটা চক্রান্ত।

নিখিল বলে--আমি আগে জানতুম না যে, আমার মেজদা আর তোমার দাদা শৈলেশবাবু দিনাজপুর কলেজে এক ক্লাসের বন্ধু ছিলেন।

অনসূয়া--হ্যাঁ, আমরা সবাই তখন দিনাজপুরে ছিলাম। তখন বাবাও ছিলেন।

নিখিল হাসে--তাহ'লে হয়তো আজ এই প্রথম নয়, তোমাকে অনেকদিন আগেই দেখেছি।

অনসূয়া হাসে--হতে পারে।

নিখিল--তোমার গানও তখন শুনেছি বোধ হয়।

অনসূয়া মুখ ফিরিয়ে হাসে--হতে পারে।

গভীর কৌতূহলের আবেগে চোখ দুটোকে হঠাৎ অপলক ক'রে অনসূয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে কি-যেন দেখতে থাকে নিখিল। স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে কি-যেন খুঁজছে। তার পরেই ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করে--আচ্ছা, দিনাজপুরে থাকতে তুমি কখনও অভিনয় করেছিলে?

চমকে ওঠে অনসূয়া--হ্যাঁ, একবার স্কুলের প্রাইজের দিনে অভিনয়ে একটা পার্ট নিয়েছিলাম।

নিখিল--জনা সেজেছিলে তুমি!

আর একবার আশ্চর্য হয়ে চমকে ওঠে অনসূয়া--হ্যাঁ, কিন্তু কি ক'রে বুঝলেন আপনি!

নিখিল--সবই মনে আছে,...তাই বুঝতে অসুবিধা হলো না।

বিব্রতভাবে তাকায় অনসূয়া, এবং চোখের চাহনিতে একটা ভীরুভীরু কাঁপুনিও ফুটে ওঠে।--কি মনে আছে?

নিখিল--জনার সেই মুখটা। তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপার মনে আছে।

অনসূয়া আর কোন প্রশ্ন করে না। বরং বুকের ভিতরে একটা অস্বস্তির চাঞ্চল্য লুকিয়ে চুপ ক'রে শুধু নিখিলের স্মৃতির ইতিহাস শোনবার জন্য প্রস্তুত হবার চেষ্টা করে।

নিখিল হাসে--জনার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে একটা ছেলে জনাকে আরও ভাল করে দেখবার জন্য সেই থিয়েটার ঘরের পিছনের কোন দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, মনে পড়ছে তো?

কোন উত্তর দেয় না অনসূয়া।

নিখিল বলে--অভিনয় শেষ হবার পর বাড়ি যাবার জন্য জনা যখন থিয়েটার ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে স্কুলের গাড়িতে উঠতে যাবে, ঠিক তখন...।

অনসূয়া হঠাৎ বিরক্ত হয়ে এবং বেশ একটু রুক্ষ স্বরে বলে ওঠে। একটা পুরনো ঘটনাকে আপনার এত খুশি হয়ে বলবার কোন দরকার ছিল না।

হেসে ফেলে নিখিল--তাহলে নিশ্চয় তোমার মনে আছে, সেই ছেলেটা জনার কাছে এগিয়ে এসে বেফাঁস যে কথাটা হঠাৎ বলে ফেলেছিল।

অনসূয়া নীরবে শুধু শুনতে থাকে, কোন উত্তর দেয় না, এবং চোখের চাহনিতে সেই বিরক্তির ছায়াটা কাঁপতে থাকে।

নিখিল বলে--জনা কিন্তু রাগ করেনি ; ছেলেটাকে ধমক দিতেও পারে নি। শুধু আশ্চর্য হয়ে একবার তাকিয়েছিল জনা, কাজল বোলানো সেই দুটি বড় বড় চোখ তুলে।

অনসূয়া--তের বছর বয়সের জনার পক্ষে সেটা কোন অপরাধ নয়। ও বয়সের চোখ একটুতেই আশ্চর্য হয়।

কিন্তু নিখিল মজুমদারের হাসিটা যেন মাত্রা ছাড়া রকমের বেহায়ার মত আরও মুখর হয়ে ওঠে।--আমিও তো তাই বলছি। আসল অপরাধী ছিল ছেলেটা।

অনসূয়া বলে--দাদা আর বউদির বাড়ি ফিরতে বোধহয় বেশ দেরি হবে।

নিখিল--তা জানি।...কিন্তু সেই অপরাধী ছেলেটার মুখটা কি তোমার একটুও মনে পড়ে না?

অনসূয়া--কি বললেন?

নিখিল--সেই অপরাধী মুখটাকে আজ দেখলে সত্যিই চিনতে পারবে কি?

নিখিলের মুখের দিকে অপলক চোখের কৌতূহল তুলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে অনসূয়া, এবং তার পরেই লজ্জা পেয়ে শিউরে ওঠে। আঁচল তুলে মুখ ঢাকা দিয়ে হেসে ফেলে অনসূয়া।

নিখিল--অপরাধীকে চিনতে পারলে তো অনসূয়া?

অনসূয়া--ওসব কথা থাক্, আপনি এখন আমাকে রেহাই দিন।

নিখিল--তার মানে? প্রশ্নটাই যেন ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় নিখিল, এবং অনসূয়ার মুখের হাসির দিকে আতঙ্কিতের মত তাকিয়ে থাকে।

অনসূয়ার মুখের ধূর্ত হাসিটা এইবার কোমল হয়ে যায়।--তার মানে, সত্যিই আপনাকে ভয় দেখাচ্ছি না। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকুন, আমি চা নিয়ে আসছি।

নিখিল--তুমি বসো অনসূয়া, চা-এর জন্য আমি মোটেই ব্যস্ত নই। আমি কিসের জন্য ব্যস্ত, সেটা তোমার অজানা নয়।

অনসূয়ার পঁচিশ বছর বয়সের শক্ত সতর্ক মনের ভাষা এইবার সত্যিই লজ্জায় বিপন্ন হয়ে ওঠে, এবং সেই লজ্জার মধ্যে যেন একটু করুণতাও আছে। নিখিল মজুমদারকে 'না' বলে দেবার জন্য অনসূয়ার মনে কোন প্রতিজ্ঞা নেই। অথচ হ্যাঁ বলে রাজি হবার জন্যও মনটা তৈরী হয়নি।

অনসূয়া বলে--আপনি কেন এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন নিখিলবাবু?

নিখিল--যে ভালবাসে সে ব্যস্ত না হয়ে পারে না অনসূয়া।

আনমনার মত অন্য দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ কি-যেন ভাবতে থাকে অনসূয়া। রাগ হয় নিজেরই উপর। শেখরবাবুকে ওরকম প্রশ্ন ক'রে একটা চিঠি না লিখলেই ভাল ছিল।

নিখিল--আমার এতগুলির চিঠির একটিরও উত্তর তুমি দাওনি। সেজন্য দুঃখ করি না। আমি শুধু জানতে চাই, সত্যিই কি তুমি...।

অনসূয়া বলে--আর মাত্র দু'টি দিনের মত আমার অভদ্রতা সহ্য করুন নিখিলবাবু।

নিখিল--কি বললে?

অনসূয়া--মাত্র আর দু'টি দিন আমাকে সময় দিন, তার পরেই জানতে পারবেন।

নিখিলের গম্ভীর মুখ আশ্বস্ত হয়ে হেসে ওঠে না, বরং যেন একটা সন্দেহের বেদনায় মেদুর হয়ে ওঠে। নিখিল বলে--কিছু মনো করো না অনসূয়া, একটা কথা বলছি।

অনসূয়া--বলুন।

নিখিল--আমার সন্দেহ হচ্ছে, আমি বোধ হয় তোমার ওপর একটা অন্যায় দাবি করে ফেলেছি।

অনসূয়া ভীতভাবে বলে--কেন এরকম মনে করেছেন?

নিখিল--মনে হচ্ছে, তোমার কোন অসুবিধা আছে ; হয়তো তুমি আর কাউকে।

অনসূয়া গম্ভীর হয়ে বলে--না নিখিলবাবু।

নিখিল--কিন্তু তোমাকেও কি আর কেউ...।

অনসূয়া--না, আপনি ছাড়া আর কেউ নয়। অন্তত আমি জানি না, আর কেউ আমার মত একটা সস্তা মেয়েকে যদি মনে মনে...জানি না, এরকম কাণ্ড সত্যিই মানুষের জীবনে সম্ভব কিনা।

নিখিল--সম্ভব হয় অনসূয়া।

অনসূয়া--কেমন ক'রে বুঝলেন?

নিখিল--নিজের চোখে এমন কান্ড সম্ভব হতে দেখেছি।

অনসূয়া হাসে--নিজের জীবনে নয় তো?

নিখিল--না, শেখর মিত্র নামে এক ভদ্রলোকের জীবনে।

কি বললেন? কা'র জীবনে? প্রশ্ন করতে গিয়ে থরথর ক'রে কেঁপে ওঠে অনসূয়ার গলার স্বর।

নিখিল--শেখর মিত্র নামে এক ভদ্রলোকের জীবনে। সে এক অদ্ভুত মানুষ।

অনসূয়া--কি কাণ্ড করেছে সে ভদ্রলোক?

নিখিল--একজনকে সে ভালবাসে। শুধু ভালবাসে বললে সব কথা বলা হয় না। কবির লেখায় পড়েছিলাম... সাধু কহে শুন মেঘ বরিষার, নিজেরে নাশিয়া দেয় বৃষ্টিধার। ব্যাপারটা সেইরকমই শেখর মিত্র সত্যিই একেবারে নিজেরে নাশিয়া এক মেয়েকে ভালবাসে। তার মানে, ভালবাসতে গিয়ে নিজেকে যে কি ভয়ানক নাশ ক'রে ফেলছে, সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপও নেই।

অনসূয়া--সে মেয়ের নামধামের খবর বোধ হয় আপনি জানেন না?

নিখিল--জানি বৈকি। ভাল মাইনের চাকরি করে সেই মেয়ে ; তার নাম অবন্তী সরকার।

অনসূয়া চমকে উঠতেই নিখিল সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করে--অবন্তীকে তুমিও চেন নাকি?

অনসূয়া বলে--চিনি।

নিখিল আশ্চর্য হয়--শেখর মিত্রকেও চেন?

অনসূয়া--হ্যাঁ। আমার বউদির দাদা হন তিনি।

নিখিল--কি আশ্চর্য!

নিখিলের চোখে শুধু একটা খবর শোনার জন্য আশ্চর্য থমথম করে। কিন্তু অনসূয়ার মনের গভীরে একটা ভয়ানক লজ্জার সেই আশ্চর্য সেই মুহূর্তে একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়। কি ভয়ানক ভুল ! মাথামুণ্ডু নেই! একটা কল্পনার ভুলে শেখর মিত্রের কাছে একটা চিঠি লিখে ফেলেছে অনসূয়া। অবন্তীকে ভালবাসে শেখর মিত্র ; শেখর মিত্রের মনে আর কোন মেয়ের ছবি নেই।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অনসূয়া।--আমি এইবার চা নিয়ে আসি নিখিলবাবু। ততক্ষণ আপনি...।

নিখিল হাসে--বল, কি করবো?

অনসূয়া--ততক্ষণ আমাকে আর সন্দেহ না করে মনে মনে তৈরী করে রাখুন, দাদাকে কি বলবেন।

নিখিল--তুমি যা বলেছ, তাই বলবো।

অনসূয়া--কি বলেছি আমি?

নিখিল--মাত্র আর দুটো দিন পরে তুমি স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দেবে যে...।

অনসূয়া--না, আপনি আজই দাদাকে বলতে পারেন।

চেয়ার থেকে উঠে অনসূয়ার কাছে এসে অনসূয়ার একটা হাত ব্যাকুলভাবে কাছে টেনে নেয় নিখিল--অনসূয়া! স্পষ্ট ক'রে বল।

অনসূয়া বলে--হ্যাঁ।

১৭

অনসূয়ার চিঠি। চিঠিটা পড়ে একটু আশ্চর্য না হয়ে পারে না শেখর। অনসূয়া কোন দিন শেখরের কাছে চিঠি লেখেনি, শেখরও না। অনসূয়ার জীবনের কোন প্রয়োজনে শেখরের ডাক আসতে পারে, এরকম কোন ধারণা কোনদিন শেখরের মনে ছিল না। অনসূয়ার বিয়ে হবে, অনসূয়াকে বিয়ে করবার জন্য এক ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ভালই তো, অনসূয়ার যদি আপত্তি না থাকে, তবে হয়ে যাক এই বিয়ে। এর মধ্যে শেখর মিত্রের আপত্তি করবার কি আছে? শেখর মিত্রের পরামর্শেরই বা দরকার কি?

বার বার কয়েকবার অনসূয়ার চিঠিটা পড়ে শেখর। পড়তে পড়তে অনসূয়া মুখের উপর সেই সব সময় শিউরে থাকা এক টুকরো সুন্দর হাসির ছলটাও মনে পড়ে। অনসূয়ার মনটাও সত্যিই একেবারে সাদা, ভালবাসাবাসি নিয়ে কোন ঝঞ্ঝাট কোনদিন অনসূয়ার জীবনে ঘটেছে বলে মনে হয় না। একজন ভালমানুষের জীবনের সঙ্গিনী হয়ে হেসে হেসে জীবনটাকে ভালভাবে কাটিয়ে দিতে চায়, এর চেয়ে বড় কোন আকাঙ্ক্ষা অনসূয়ার নেই, একথা প্রভার মুখে অনেকবার শুনেছে শেখর।

শেখর মিত্রের সামনেই অনসূয়াকে কতবার ঠাট্টা করেছে প্রভা।--অনসূয়ার ভয়টা কিসের জান দাদা? ওর ধারণা, ওকে কেউ ভালবাসতে পারবে না। যিনি স্বামী হবেন, তিনিও না। অনসূয়ার যুক্তি ; একটা অজানা লোকের কাছে অপমান ভোগ করবার জন্য বিয়ে করবার দরকার হয় না। তার চেয়ে বিয়ে না হওয়াই ভাল।

অনসূয়ার এই ভয়টা সত্যি কোন নকল ভয় নয়। এবং প্রভা ঠাট্টা ক'রে বললেও কথাটা মিথ্যে নয়। বিয়ে করবে না বলে একটা প্রতিজ্ঞা করে এতদিন পার করে দিয়ে এসেছে, একটা মেয়ে স্কুলে চাকরি নেবার জন্যও তৈরী হয়েছিল অনসূয়া। কিন্তু ভাবতে গিয়ে শেখরও মনে মনে হেসে ফেলে। এক ভদ্রলোক অনসূয়ার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, খবরটা শুনতে পেয়েই বেচারার বিয়ে না করবার প্রতিজ্ঞাটা ভেঙে গিয়েছে। ভয়টাও বোধ হয় ভেঙে গিয়েছে।

তবু কেমন যেন খটকা লাগে। নিজের দাদা থাকতে বউদির দাদার কাছে পরামর্শ চায় কেন অনসূয়া? হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই, শেখর মিত্রকে খুব বেশি শ্রদ্ধা করে অনসূয়া। এবং শেখর সুখী হোক, এরকম একটা শুভেচ্ছার ভাষাও প্রায়ই অনসূয়ার কথায় কথায় প্রকাশ হয়ে পড়ে। নিজের কানেই শুনেছে শেখর, প্রভাকে জিজ্ঞেসা করেছিল অনসূয়া, শেখরবাবুর

একটা ভাল কাজটাজ এখনও হলো না বউদি?

হলো না। হচ্ছে না। কপালের লিখন, নইলে আমার দাদার মত মানুষকে এত কষ্ট সহ্য করতে হবে কেন?

অনসূয়া চিন্তিতভাবে বলে--আমার মনে হয়, শেখরবাবুই গা লাগিয়ে কোন চেষ্টা করেন না। ভদ্রলোক কেমন যেন উদাস হয়ে রয়েছেন।

প্রভা বলে--তুমি ভুল বুঝেছ অনসূয়া। একটা ভাল চাকরির জন্য দাদা চেষ্টা ক'রে ক'রে হয়রান হয়ে যাচ্ছে।

শেখরের জন্য অনসূয়ার শুভেচ্ছার আরও কথা অনসূয়ার মুখে নিজেই শুনতে পেয়েছে শেখর। সে শুভেচ্ছা শেখরের জীবনের একটা উৎসবের বাসর দেখবার ইচ্ছা। এবং সেই শুভেচ্ছার কথা বলতে গিয়ে অনসূয়ার মুখের ভাষার লাগাম যেন ভেঙে যায়।--শুনেছি কত সুন্দর সুন্দর শিক্ষিত মেয়ে মনের মত স্বামী পাওয়ার জন্য ছটফট করছে, কিন্তু আমি বলি বউদি, তোমার এই দাদা ভদ্রলোক কি তাদের কারও চোখে পড়ে না?

প্রভা বলে—দাদা সামনে রয়েছেন, তা না হলে তোমাকে এখনি একটা কথা বলতে পারতাম অনসূয়া, যে-কথা শুনলে নিজেই জব্দ হয়ে যেতে।

অনসূয়ার সঙ্গে শেখর মিত্রের ঠাট্টার সম্পর্কটা হাসাহাসির মধ্যেই শেষ হয়ে যায়, সম্পর্ক কোন দিন কোন গম্ভীর চিন্তার ঘনঘটা সৃষ্টি করেনি। অনসূয়ার মত মেয়ের সঙ্গে যদি শেখর মিত্রের বিয়ে হতো, তবে শেখর মিত্রের জীবন অসুখী হতো না নিশ্চয়। কিন্তু অনসূয়ার সঙ্গে শেখরের বিয়ে হোক এমন কোন ইচ্ছার চেষ্টা কারও মনে এবং কোন ঘটনায় সত্য হয়ে ওঠেনি। বিয়ে হতে পারে, এমন সম্ভাবনার ইঙ্গিতও দু'জনের মনের কোন ভাবনার মধ্যে ফুটে ওঠেনি। অনসূয়া চায়, পৃথিবীর কোন ভাল মেয়েকে বিয়ে করে সুখী হোক শেখর মিত্র। এবং শেখর চায়, পৃথিবীর কোন ভাল ভদ্রলোককে বিয়ে ক'রে সুখী হোক অনসূয়া। এই মাত্র, এর বেশি কিছু নয়। অনসূয়ার চিঠিটা আর একবার পড়ে নিয়েই মনে মনে তৈরী হয় শেখর, আজই সন্ধ্যায়, রতনবাবুর ছেলেকে অঙ্ক শেখাবার পালা একটু তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে দিয়ে ভবানীপুরে যেতে হবে। আর, একেবারে মন খুলে, চেঁচিয়ে হেসে হেসে অনসূয়াকে বলে দিতে হবে।--খুব ভাল কথা অনসূয়া। শুনে সুখী হলাম। আর একটুও দেরি না ক'রে বিয়েটা ক'রে ফেল দেখি।

আর একটা চিঠি। সে চিঠি হাতে তুলে নিয়েই বুঝতে পারে শেখর, অনসূয়ার চিঠি নয়, এবং ঠিক অনসূয়ার মত কোন মেয়ের লেখা এই চিঠি নয়। লেখাটা চেনা, মর্মে মর্মে চেনা। অবন্তী সরকারের চিঠি। চিঠি দেখে যতটা আশ্চর্য হয়, চিঠি পড়ে তার চেয়ে বেশি আশ্চর্য হয়। আবার আহ্বান জানিয়েছে অবন্তী, কারণ আবার অবন্তী সরকারের জীবন একটা সমস্যার বেদনায় অসুখী হয়ে উঠেছে। কিসের সমস্যা? কল্পনা করতে পারে না শেখর। কিন্তু যে সমস্যার বেদনা দেখা দিক না কেন, অবন্তী সরকারের এই লজ্জাহীন মিনতির কি অন্ত হবে না কোনদিন? নিখিল মজুমদারকে ভালবেসে মুগ্ধ হয়ে আছে যে নারীর জীবন, সে নারী তার ভাগ্য গড়বার খেলায় শেখর মিত্রকে বারবার আহ্বান করবে, কি ভয়ানক কৌতুকিনী হয়ে উঠেছে অবন্তী সরকার। মনে মনে একটা ধিক্কার দিয়ে চিঠিটা বন্ধ করতে গিয়ে হঠাৎ শেখর মিত্রের মন, এবং সেই সঙ্গে হাতটাও যেন সব কঠোরতা হারিয়ে আবার শিথিল হয়ে যায়। ধিক্কার দিতে পারে না, মনের রূঢ় ভাষাটাকে হঠাৎ সামলে নেয়? এবং চিঠিটা বন্ধও করে না; অলস হাতটা যেন অদ্ভুত এক মায়ার আবেশে কোমল হয়ে চিঠিটাকে আর একবার আস্তে আস্তে খোলে, এবং চোখের সব আগ্রহ ঢেলে দিয়ে লেখাটা পড়তে থাকে শেখর।

বিপদ? বিপদে পড়েছে অবন্তী। বিপদে পড়ে এই পৃথিবীর মধ্যে বেছে বেছে শুধু একজনেরই কাছে, শেখর মিত্রের কাছে রক্ষার আবেদন জানিয়েছে অবন্তী। অবন্তীর চোখের

জলে আর মুখের হাসিতে যে ছলনাই থাকুক না কেন, অবন্তীর এই বিশ্বাস যে শেখর মিত্রের জীবনের একটা গৌরবের স্বীকৃতি। বিশ্বাস করে অবন্তী, তাকে বিপদের ভয় থেকে মুক্ত করবার জন্য চেষ্টা করবার কোন মানুষ পৃথিবীতে যদি থেকে থাকে, সে হলো শেখর মিত্র। অবন্তীর চিঠিকে তুচ্ছ করলে নিজেকেই যে ছোট করে ফেলা হয়।

তবে? তবে আজ সন্ধ্যায় ভবানীপুরে আর যাওয়া হবে না। পার্ক স্ট্রীটের সেই নতুন বাড়ির ফ্লাটে সুন্দর করে সাজানো ঘরে অবন্তী সরকারের জীবন কোন্ বিপদের বেদনায় বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে, একবার শুধু দেখে আসতে দোষ কি?

১৮

অবন্তী বলে--আমার বিশ্বাস ছিল, আমার চিঠি পেয়ে আপনি নিশ্চয় আসবেন।

শেখর--আমার কিন্তু বিশ্বাস ছিল না যে, তোমার চিঠি আবার কখনও পেতে হবে, আর আমিও আবার কখনও এখানে আসতে পারবো।

অবন্তী--একটা বিপদে পড়ে আপনাকে ডেকেছি।

শেখর--কিসের বিপদ?

অবন্তী--বড় অপমান শেখরবাবু। কোন দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে, আমাকে এমন অপমানের মধ্যে পড়তে হবে।

শেখর--কিসের অপমান?

অবন্তী--আমারই অদৃষ্টের। তাই আপনাকে ডেকেছি।

শেখর--আমি তোমার অপমান দূর ক'রে দিতে পারি, এ বিশ্বাস তুমি কোথায় পেলে?

অবন্তী--হ্যাঁ, বিশ্বাস আছে ; আপনি ইচ্ছে করলেই পারেন।

শেখর--তাহলে বল।

অবন্তী--আপনি কি অনসূয়াকে বিয়ে করতে পারেন না?

শেখরের চোখের দৃষ্টি চমকে ওঠে--একি অদ্ভুত অনুরোধ?

অবন্তীর চোখ ছল ছল করে--হ্যাঁ শেখরবাবু। কোন উপায় না দেখে শেষে আপনাকে এই অদ্ভুত অনুরোধ করতে হচ্ছে।

শেখর--অনসূয়ার সঙ্গে আমার বিয়ে হলে তোমার কোন লাভ আছে কি?

অবন্তী--হ্যাঁ। তাহলে নিখিলের ভুল ভেঙে যাবে।

সব রহস্য এইবার একেবারে স্বচ্ছ হয়ে যায়। শেখর বলে--বুঝলাম, নিখিল মজুমদারই তাহলে অনসূয়াকে বিয়ে করবার জন্য তৈরী হয়েছে।

অবন্তী--হ্যাঁ। আমাকে এত চিনতে পেরেও সে মানুষ এত ভুল করলো কেমন করে? আশ্চর্য, যদি জানতাম যে অনসূয়া ওকে ভালবেসেছে, তবে না হয়...।

শেখর--তবে কি?

অবন্তী--তবে আমি চুপ করেই সরে যেতাম, আর আপনাকেও এই অনুরোধ করতাম না।

হেসে ফেলে শেখর--তুমি স্পষ্ট করে একটি সত্য কথা বলবে?

অবন্তী--বলবো, অন্তত আপনার কাছে কিছুই লুকবো না।

শেখর--তুমি কাকে জব্দ করতে চাও? নিখিলবাবুকে, না অনসূয়াকে, না আমাকে?

অবন্তীর মুখটা করুণ হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে বলে--আমি কাউকেই জব্দ করতে চাই না। আমি চাই সকলেই সুখী হোক।

শেখর--ভাল কথা। কিন্তু আমাকে ঐ অনুরোধ আর করো না। বিস্মিতভাবে তাকিয়ে থাকে অবন্তী, এবং অবন্তীর চোখের সেই বিস্ময়ও যেন মৃদু ভয়ে সিরসির করে। অবন্তী

বলে—কেন?

যেন প্রচণ্ড একটা ধিক্কার কোন মতে বিস্ফোরণের আবেগ থামিয়ে শেখর মিত্রের কথাগুলির মধ্যে উত্তাপ ছড়িয়ে জ্বলতে থাকে--তুমি আমার কে? আমিই বা তোমার কে? আমার কাছে এত বড় দাবি করবার সাহস কোথায় পেলে অবন্তী? এত নির্লজ্জতাই বা কোথায় পেলে?

অবন্তী--শেখরবাবু!

শেখর--কি?

অবন্তী--আমি জানি।

শেখর--কি জান?

অবন্তী--আপনি মনে-প্রাণে চান যে আমি সুখী হই।

শেখরের চোখ দপ ক'রে জ্বলে ওঠে—কেন চাই?

অবন্তী--তা'ও জানি। আপনি আমাকে ভালবাসেন।

হঠাৎ একটি আচমকা আঘাতে শেখরের সব মুখরতা বোবা হয়ে যায়। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে অবন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অবন্তীর কালো চোখের তারায় বুদ্ধির দীপ্তি আরও শাণিত হয়ে চিকচিক করছে। সব জানে, সব বুঝে ফেলেছে অবন্তী। অবন্তী সরকারের জন্য শেখর মিত্রের মনের গভীরে আজও যে অনুভবের মায়া মুখ লুকিয়ে পড়ে আছে, তাকে যেন অনেকদিন আগেই দেখে ফেলেছে অবন্তী। তাই বার বার ডাকে, তাই তো শেখর মিত্রকে যত অদ্ভুত অনুরোধ করতে একটুও লজ্জা পায় না অবন্তী। কিন্তু...। কিন্তু কি? কি ভয়ানক একটা কৌতূহল শেখর মিত্রের বুকের ভিতর উতলা হয়ে উঠছে! কিন্তু কিসের জন্য, কেন, শেখর মিত্রের জন্য অবন্তী সরকারের মনে এক বিন্দু মোহ আজও ফুটে উঠলো না? সত্যিই কি তাই? অবন্তী সরকার তার কোন স্বপ্নের মধ্যে ভুলেও শেখর মিত্রের হাতে হাত রাখবার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠেনি? শুধু শেখর মিত্রের জীবন নিংড়ে কতকগুলি উপকার লুঠ ক'রে নিতেই ভাল লাগে অবন্তীর? অদ্ভুত এক দুর্বলতায় অলস হয়ে যায় শেখর মিত্রের নিঃশ্বাসগুলি। অবন্তী সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগে। প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে, তুমি ভালবেসেছ কি?

কিন্তু বৃথা এই প্রশ্ন। শেখর জানে, এই প্রশ্ন একটা কপট ঠাট্টার চেয়েও অসার। অবন্তী সরকার যে তার জীবনের উপকারক শেখর মিত্র নামে একটা লোককে ভালবাসে না, এই ক'মাসের ইতিহাসে, অবন্তী সরকারের জীবনের এই রঙীন উন্নতির ইতিহাসে সেই সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

শেখর মিত্রকে ভালবাসতে কেন ইচ্ছে হলো না অবন্তীর, কেন ভালবাসতেও পারলো না? এই তো একটিমাত্র প্রশ্ন, যার জন্য শেখর মিত্রের জীবনের অনেক মুহূর্তের ভাবনা বিস্মিত হয়েছে, এবং সেই বিস্ময় একটা তীক্ষ্ণ অপমানের কৌতুকে ব্যথিতও হয়েছে।

অবন্তীর সুন্দর মুখের ছবিটা যেন শেখরের দু'চোখ জুড়ে ভাসছে। বড় সুন্দর মুখ, অবন্তীকে এমন সুন্দর কোনওদিন দেখায়নি। ঐ অবন্তী জানে, শেখর মিত্র তাকে ভালবাসে। অবন্তী নিজের মুখে ঘোষণা ক'রে শেখরের বুকের নিভৃতে গোপন করা একটি অনুভবের মায়াকে আজ যেন উৎসবের পতাকার মত বাতাসে মেলে দিয়েছে। এই যথেষ্ট। অবন্তীর মনের কাছে কৈফিয়ত দাবি করবার কোন অর্থ হয় না। শেখর মিত্রকে না ভালবাসবার খুব অধিকার অবন্তীর আছে।

—আচ্ছা, এবার আমি চলি। চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায় শেখর।

অবন্তী বলে তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

শেখর—তার মানে?

অবন্তী—আপনি অনসূয়াকে...।

শেখর—আমি ইচ্ছে করলেই অনসূয়াও আমাকে বিয়ে করতে ইচ্ছা করবে কেন?

অবন্তী—নিশ্চয় করবে? সে বিশ্বাস আমার আছে। আপনি একবার বলেই দেখুন না কেন ; তখন বুঝবেন যে আমার বিশ্বাস মিথ্যে নয়।

শেখর—তুমি এই বিশ্বাস কোথায় পেলে?

কোন উত্তর না দিয়ে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে অবন্তী। শেখরের দু'চোখের কোণে এতক্ষণের স্নিগ্ধতার ছায়া হঠাৎ আবার বিরক্ত হয়ে কঠোর হয়ে যায়। পরমুহূর্তেই চমকে ওঠে শেখর।

অবন্তী সরকারের কালো চোখের তারায় বুদ্ধির দীপ্তি একেবারে নিভে গিয়েছে। অবন্তীর চোখ থেকে ঝরঝর ক'রে জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছে। একটা অসহায় শিশুর মুখ, আদর দাবি করে শুধু দাবির জোরে, যুক্তির জোরে নয়। যেন নিজের ভুলের আর অপরাধের ভয়ে দিশাহারা একটা আত্মার কান্নাভরা মুখচ্ছবি।

শেখর—এ কি করছো অবন্তী?

অবন্তী—নিখিলকে জব্দ করবার জন্য নয়, আপনাকে সুখী করবার জন্যেই এই অনুরোধ করছি শেখরবাবু। বিশ্বাস করুন। অনসূয়াকে আমি চিনি। অনসূয়ার মত মেয়ে আপনার মত মানুষকেই ভালবাসতে চায়, ভালবাসতে পারবেও। আর আপনিও অনসূয়ার মত মেয়েকে জীবনে পেলে সুখী হবেন।

চুপ করে অবন্তী। শেখরও কোন প্রশ্ন করে না। সারা ঘরের নীরবতা যেন বেদনায় কোমল হয়ে অবন্তীর চোখের জলের ফোঁটাগুলিকে বরণ করছে। একেবারে স্বচ্ছ মুক্তার মত, একেবারে খাঁটি চোখের জল। কোন ভেজাল নেই।

অবন্তী বলে—বিশ্বাস করুন। আপনি সুখী হবেন বলেই আমার এই অনুরোধ।

শেখর—সেকথা থাক। বল, তুমি সুখী হবে?

অবন্তী—হ্যাঁ।

শেখর—আচ্ছা।

চলে গেল শেখর।

১৯

দরজা বন্ধ ক'রে সোফার কোণ ঘেঁষে ক্লান্ত পাখির মত যেন সুন্দর চেহারা আর সুন্দর সাজের সব শোভা গুটিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকে অবন্তী সরকার।

যা মনে মনে ভেবে রেখেছিল অবন্তী, তাই করতে পেরেছে। কোন ভুল হয়নি। জীবনের প্রতিজ্ঞা অটুট রাখতে হলে সংসারের সত্য ও মিথ্যার কাছে যে কঠোর অভিনয় করতে হয়, সেই অভিনয়ই নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছে অবন্তী। নিজের স্বার্থ, নিজের কাজ গুছিয়ে নিতে হলে, হাসি-কান্নার মধ্যে একটু নকল মায়া রাখতে হয়। ভালবাসার জন্য, অবন্তী ও নিখিল নামে দুটি মানুষের ভালর জন্য এই অভিনয় করতে হলো। অবন্তীর চোখের জলকে একটুও সন্দেহ করতে পারেনি শেখর মিত্র।

অবন্তী সরকারের জীবনের ভালবাসার পথে কাঁটা হয়েছে অনসূয়া। সেই কাঁটা সরাতে হবে। খুব সুন্দর ক'রে সেই কাঁটা সরিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করতে হবে। ক'রে ফেলেছে অবন্তী। শেখর মিত্র অবন্তীর অনুরোধের মায়া আজও এড়াতে পারেনি। রাজি হয়ে চলে গিয়েছে।

তারপর? তারপর নিখিল মজুমদার আবার সেই ঘরের দরজার কাছে এসে দেখা দিতে আর কতই বা দেরি করবে? ফিরে আসবে নিখিল. অনসূয়ার গানের সুর সব সুধা হারিয়ে নিখিল মজুমদারের কানে বিষের জ্বালা ধরিয়ে দেবে।

শেখর মিত্রকে বিয়ে করতে অনসূয়া রাজি হবেই হবে, কোন ভুল নেই। জানে অবন্তী, নিজের কানেই অনসূয়ার কাছে কতবার শুনেছে অবন্তী, প্রভা বউদির দাদার মত মহৎ মানুষ পৃথিবীতে আর ক'জন আছে জানি না। শেখর মিত্রকে বড় বেশি শ্রদ্ধা করে অনসূয়া।

অবন্তীর মনের কল্পনাগুলিই তন্দ্রার মত আলস্যে শিথিল হয়ে যায়। যেন দেখতে পাচ্ছে অবন্তী, নিখিল মজুমদার আবার তার চোখের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই নিখিল, যাকে নিজের চেষ্টায় ভাল চাকরিতে ভাগ্যবান ক'রে দিয়ে অবন্তী সরকার তাকে জীবনের ঘরে চিরকালের অতিথি করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। এসেছে সেই নিখিল। তার চোখে করুণতা, মুখে অভিমান, মনে আত্মগ্লানি। অনসূয়ার কাছে যাবার পথ রুদ্ধ দেখে আবার এই পথে ফিরে এসেছে।

—ছিঃ। নিজের অজ্ঞাতে, এবং বোধ হয় এরকম একটা ঘৃণার জ্বালাকে সামলাবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত ছিল না অবন্তী, তাই বেশ জোরে একটা ধিক্কারের সুরে কথাটা বলেই ফেলে, এবং সোফার কোণ থেকে অলস দেহটাকে ধড়ফড়িয়ে সরিয়ে নেয় অবন্তী। তন্দ্রাটা যেন চোখের মধ্যে ছটফট করছে।

এই নিখিলকে কাছে ফিরে পাওয়ার জন্য, জীবনের প্রথম ভালবাসার সম্মান রক্ষার জন্য, নিজে সুখী হবার জন্য আজ একটা কঠোর অভিনয় নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছে অবন্তী। অবন্তী সরকারের বুকের ভিতর একটা বিদ্রূপের অসার হাসি ছুটে বেড়ায়। হাসিটা হাহাকারের মত। কি ভয়ানক মিথ্যা কথা! শেখর মিত্র সুখী হবেই বলে নাকি অবন্তী সরকার চায় যে, অনসূয়ার সঙ্গে শেখর মিত্রের বিয়ে হোক। অবন্তী আজ খাঁটি চোখের জল ঝরিয়ে শেখর মিত্রকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছে, অবন্তী সরকার শেখর মিত্রের জীবনের সুখের জন্যই চিন্তা করছে। বিশ্বাস করেছে, ধন্য হয়েছে মানুষটা। একটা অভিনয়ের কথা। কিন্তু কথাগুলি বড় সুন্দর, বড় মিষ্টি। বিশ্বাস না করেই বা পারবে কেন? ঐ মিথ্য কথাগুলি বলতে গিয়ে অবন্তী সরকারের বুকের ভিতরটাও যেন মিষ্টি হয়ে গিয়েছে। অবন্তী সরকারের ভাবনাগুলি আবার একটা অলস তন্দ্রার ভারে যেন অভিভূত হয়ে যায়।

মিথ্যে বলেনি অনসূয়া। শেখর মিত্র মানুষটা সত্যিই মহৎ মনের মানুষ। বোকা হলেও কি মহৎ ঐ বোকামি! যে মেয়েকে মনে মনে ভালবাসে, তারই কাছ থেকে যত আঘাত উপহারের মত বরণ ক'রে নিয়ে খুশি হয়। অদ্ভুত মানুষই বটে। এমন মানুষের ভালবাসাকেও ভয়ও করে। শেখর মিত্রকে ভালবাসতে হলে ওর কাছে যে মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারা যাবে না। ওর ভালবাসাকে মস্ত একটা দয়া বলে মনে হবে। তা না হলে...।

ঘরের ভিতর ঢোকেন নিবারণবাবু।—কি রে, তুই এতক্ষণ এখানে চুপ ক'রে বসে কি ভাবছিস?

অবন্তীর ভাবনার ডোর নিবারণবাবুর কথার শব্দে হঠাৎ ছিন্ন হয়ে যায়। বুঝতে পারে অবন্তী, সত্যি অনেকক্ষণ ধরে এখানে চুপ ক'রে যেন চোরের মত বসে মিছামিছি অনেক ভাবনায় ভুগছে, যদিও অবন্তীর প্রতিজ্ঞাটা বেশ সফল হয়েছে। আর এত ভাবনার কি-ই বা দরকার ছিল?

—শরীর ভাল তো?

নিবারণবাবুর প্রশ্নে হেসে ফেলে উত্তর দেয় অবন্তী—হ্যাঁ ভাল।

নিবারণবাবু চলে যেতেই বুঝতে পারে অবন্তী, একটু মিথ্যে কথাই বলা হলো। মাথার ভিতরে কেমন একটা ভার থমকে রয়েছে। শরীরটাকেও কোনদিন এত দুর্বল মনে হয়নি।

আজকের অভিনয় বেশ নিষ্ঠুর একটা শাস্তিও দিয়েছে, নইলে এই শরীরের ভিতরেও এত যন্ত্রণা এমন ক'রে অস্থির হয়ে ওঠে কেন?

অনসূয়ার ভাগ্যটা মন্দ নয়। পরের ভালবাসার মানুষও ওর গানের টানে কাছে ছুটে গিয়ে ওকে আপন ক'রে নিতে চায়। আবার অন্যের ভালবাসা না পেয়ে ফিরে যাওয়া মানুষ অনসূয়াকে বিয়ে করতে অনায়াসে রাজি হয়ে যায়। বাঃ। আরও ভাগ্য ভাল অনসূয়ার, এত এলোমেলো ইতিহাসের কোন খবর রাখে না অনসূয়া। সাদা মনের অভ্যর্থনা নিয়ে জীবনের সঙ্গী বরণ করবার জন্য তৈরী হয়ে আছে। অনসূয়ার মনের মতন একটা মন থাকলেই তো ভাল হতো।

অবন্তী সরকারের চোখে সুন্দর উৎসবের মত একটা স্বপ্নের আবছায়া যেন আনাগোনা করে। আজ না হোক কাল, কাল না হোক আরও কয়েকটি দিনের মধ্যেই শেখর মিত্রের একটা ইচ্ছার বাণী অনসূয়ার কানের কাছে গিয়ে গানের মত বেজে উঠবে। একটি মহৎ মনের মানুষ, সেরকম মানুষ পৃথিবীতে আর ক'জন আছে জানে না অনসূয়া, সে-ই অনসূয়াকে হাত ধরে তার চিরকালের ভালবাসার ঘরে ডেকে নিয়ে যেতে চায়। শেখর মিত্র বড় সাহসী। বড় লোভী। ছিঃ।

দুহাতে কপাল টিপে ধরে অবন্তী সরকার। আজকের অভিনয়ের আনন্দটা বুকের ভিতর আর্তনাদ ক'রে উঠেছে। আস্তে আস্তে মাথা তুলে বন্ধ দরজার দিকে তাকায় অবন্তী। না, কেউ নেই, অনেকক্ষণ হলো চলে গিয়েছে শেখর।

ছি ছি ছি! কত সহজে হ্যাঁ বলে চলে গেল লোকটা। বলতে মুখের ভাষাটা একটুও বাধলো না। অবন্তী সরকারের চোখের একটা ইশারায় লোকটা বোধ হয় চুরি-ডাকাতি আর মানুষ-খুন করতে পারে। নিখিল মজুমদার যে-মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে, তাকে শুধু নিজের মহত্ত্বের জোরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ভালবাসলে যে ডাকাতি করা হয়, একটা মানুষের আশাকে খুন করা হয়, এই সামান্য সত্যটুকু বুঝবার মত কোন সন্দেহও কি নেই শেখর মিত্র নামে ঐ বিদ্বানের মনে?

জানালা খুলে পথের দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকিয়ে থাকে অবন্তী। শেষ ট্রাম পার্ক সার্কাসের ডিপোর দিকে ফিরছে। অনেক রাত হয়েছে। কে জানে কোথায়, এই পৃথিবীর কেমন একটা ঘরে এখন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছে আর স্বপ্ন দেখছে শেখর মিত্র?

২০

আসুন বৈজ্ঞানিক। শেখরকে দেখতে পেয়েই সম্ভাষণ জানায় অনসূয়া। এবং কথাটা বলতে গিয়ে হেসেও ফেলে।

এই হাসির মধ্যে একটা ঠাট্টার সুর বেজে উঠলেও, হাসিটা যে নিছক ঠাট্টা নয়, সেটা হাসির স্বরেই প্রমাণিত হয়। বেশ মিষ্টি স্বর। প্রীতি আছে, শুভেচ্ছা আছে, অনসূয়ার হাসির সেই মিষ্টি স্বরে। অনসূয়ার শ্রদ্ধার একটা দুর্ভাবনাই যেন এতদিনে নিশ্চিন্ত হয়েছে। শেখর মিত্রের মন জুড়ে অবন্তী নামে এক নারীর ভালবাসার স্মৃতি আর অনুভব ছড়িয়ে আছে। শেখর মিত্রের মনটা একলা নয় ; সেই মনের সঙ্গে একটা স্বপ্ন আছে। ভদ্রলোকের জীবনটাও আর একলা পড়ে থাকবে না। জীবনের সঙ্গিনীকে চিনে রেখেছে শেখর মিত্র। খুবই ভাল সঙ্গিনী। যেমন সুন্দর, তেমনই শিক্ষিত আর তেমনই রোজগেরে। শেখরের মত মানুষের সঙ্গে অবন্তীর মত মেয়েকেই মানায়।

শেখর বলে—কালই তোমার চিঠি পেয়েছি, তবু কাল আসতে পারিনি ; একটু দেরি হয়ে গেল।

শেখরের গম্ভীর মুখের গম্ভীর স্বর শুনে যদি একটু বিস্ময় বোধ করে অনসূয়া, তবুও আর একবার উচ্ছ্বসিত স্বরে হেসে ওঠে--একটু দেরি হয়েছে, তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়নি।

শেখর--ঠিকই বলেছ অনসূয়া ; তোমার চিঠি পাওয়া মাত্র যদি ব্যস্ত হয়ে চলে আসতাম তবে ভয়ানক ভুল হতো। একদিন দেরি করে ভালই হলো।

অনসূয়া--তার মানে?

শেখর--তার মানে, যদি কালই তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসতাম, তবে একটা ভুল কথা বলে দিয়ে চলে যেতাম, আর তুমি আমার সেই ভুল কথাটাকেই বিশ্বাস ক'রে ফেলতে।

অনসূয়ার মুখ এইবার গম্ভীর হয়--কিছুই বুঝলাম না শেখরবাবু।

অনসূয়ার মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে শেখর। শেখরের চোখের এরকম অদ্ভুত দৃষ্টি কোনদিন দেখেনি অনসূয়া। যেন অনসূয়াকে এই প্রথম দেখছে শেখর, এবং এই প্রথম দেখার অনুভবেই অনসূয়ার প্রাণমনের পরিচয় বুঝে ফেলবার চেষ্টা করছে। অনসূয়া আর একবার হাসতে চেষ্টা করে, এবং সেই হাসির মধ্যে একটা চতুর ঠাট্টার মধুরতা মিশিয়ে দেয়।--কিন্তু এত গম্ভীর হবার কি হলো? আমার মুখের দিকে এত কষ্ট করে তাকিয়ে না থেকে যার মুখের দিকে তাকালে কাজ হবে...।

শেখর--ভুল।

চমকে ওঠে অনসূয়া--কিসের ভুল? কার ভুল?

শেখর--তোমার ভুল। তুমি না বুঝে-সুঝে ঠাট্টা করছো অনসূয়া। অনসূয়ার চোখের দৃষ্টি উদাস হয়ে যায়। শেখর মিত্রকেই যেন নতুন ক'রে দেখতে হচ্ছে, এবং শেখর মিত্রও নতুন হয়ে গিয়েছে মনে হয়। এ তো সেই হাসি-ঠাট্টার শেখরবাবু নয়, ভয়ানক গভীর অভিমানের শেখর মিত্র।

অনসূয়া বলে--আমি ঠাট্টা করতে চাই না। কিন্তু আমাকে বুঝিয়ে দিন, যে কোথায় কিসের ভুল হলো।

অনসূয়ার প্রশ্ন শুনেও যেন শুনতে পায়নি শেখর। এবং শেখরের মনটাও যেন নিজেরই চক্রান্তের একটা অদ্ভুত মধুরতার জালে জড়িয়ে পড়েছে। চোখ দুটো যেন ইচ্ছে করে একটা মুগ্ধতা খুঁজছে। অনসূয়াকে দেখে মুগ্ধ হয়ে উঠুক চোখ, মিষ্টি হয়ে যাক বুক। অনসূয়া পৃথিবীর কোন মেয়ের চেয়ে ছোট নয়, কারও চেয়ে কম সুন্দর নয়। অনসূয়া যার জীবনের সঙ্গিনী হবে, তার জীবন সুখী হবেই হবে। এই মেয়েকে জীবনে ভাল লাগিয়ে নেবার জন্য চেষ্টা করতে হয় না, এমন মেয়ে আপনা থেকেই ভাল লেগে যায়।

শেখর--আমি ভুল করেছি ঠিকই, আগে ভুল করেছি। তার মধ্যে একটা বড় ভুল এই যে, তোমাকে দেখেও বুঝতে পারিনি।

অনসূয়া আবার হেসে হেসে একটা ঠাট্টার আবেশ ছড়িয়ে দিয়ে শেখর মিত্রের এই ভয়ানক গম্ভীর কথার কঠোর শব্দগুলিকে লঘু ক'রে দিতে চেষ্টা করে।--আমাকে দেখা মাত্র নয়নবাবুদের কাকাতুয়াটাও বুঝে ফেলতে পারে যে, আমার কোন মতলব নেই...।

একটু থেমে নিয়েই খিলখিল করে হেসে ওঠে অনসূয়া--নয়নবাবুদের কাকাতুয়াটা ভয়ানক সাবধান। মানুষ কাছে এসে দাঁড়ালেই বুঝে ফেলে যে ওর ঝুঁটিতে হাত দেবার একটা মতলব নিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তখনি ঠুকরে দেয়। কিন্তু আমাকে ঠোকরায়নি, কারণ আমার কোন মতলব ছিল না।

হেসে হেসে গল্প বলছে অনসূয়া, কিন্তু শেখর মিত্রের বুকের ভিতরে একটা অপরাধ যেন নিষ্ঠুর ভীরুতায় দপদপ করতে থাকে। মতলব? অনসূয়ার কোন মতলব নেই, কোনদিনও ছিল না। এবং অনসূয়ার কাছে কোনদিন কোন মতলব নিয়ে আসেনি শেখরও। কিন্তু আজ? আজ শেখর মিত্র যে একটা মূর্তিমান মতলব?...না, ঠিক তা নয়। একটা মতলবের দূত,

একটা অভিসন্ধির প্রতিনিধি ; এবং সে অভিসন্ধি আবার নিজের জীবনের অভিসন্ধি নয়। অবন্তী সরকারের জীবনের স্বপ্নকে নিষ্কণ্টক করবার জন্য নিজে আজ কণ্টক বরণ করতে এসেছে শেখর।

না, কণ্টক নয়। অনসূয়াকে কণ্টক বলবার কোন অধিকার নেই। নিজেরই মনের ভাষার ভয়ানক ভুল শুধরে নিয়ে আবার কল্পনা করতে পারে শেখর। সে নিজেই আজ অনসূয়ার জীবনের কণ্টক হবার জন্য একটি গম্ভীর অভিমানের ছলনা নিয়ে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। অনসূয়াকে অন্তত আভাসে এইটুকু আজ এখনি জানিয়ে যেতে হবে যে, আমি তোমারই অপেক্ষায় রয়েছি।

হঠাৎ শেখর মিত্রের চোখ দুটো যন্ত্রণা-কাতর রোগীর চোখের মত করুণ হয়ে ছটফট করে ওঠে। শেখর বলে—তুমি কি সত্যিই তোমার ভুল বুঝতে পারনি অনসূয়া?

অনসূয়া—না।

শেখর—আমার কাছে চিঠিতে কি লিখেছ, ভুলে গেলে?

অনসূয়া—না ভুলিনি। একটা দিন দেরি ক'রে চিঠি লিখলে আপনাকে ওরকম অনুরোধ করতাম না।

আশ্চর্য হয় শেখর—তার মানে?

অনসূয়া—আমি বিয়ে করবো, তাতে আপনার আপত্তি আছে কিনা, একথা জিজ্ঞেসা করবার কোন দরকার ছিল না।

চেঁচিয়ে ওঠে শেখর—দরকার ছিল। দরকার এখনও আছে।

ভয়াতুর চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে অনসূয়া। আস্তে আস্তে কম্পিত স্বরে প্রশ্ন করে—সত্যিই কিছু বুঝতে পারছি না শেখরবাবু।

শেখর—আমার আপত্তি আছে।

--একি বলছেন আপনি? প্রশ্ন করেই স্তব্ধ দুটো চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে অনসূয়া।

ধীরে ধীরে হেঁটে ঘর ছেড়ে চলে যায় শেখর।

প্রভা চেঁচিয়ে ডাক দেয়—দাদা চলে গেল নাকি অনসূয়া?

অনসূয়া—হ্যাঁ।

২১

অনাদিবাবু বলেন—একচল্লিশ টাকা তো ব্যাঙ্কের রাগ থামাবার জন্য সুদ দিতেই চলে গেল।

অনাদিবাবুর কণ্ঠস্বরের রকম দেখেই বুঝতে পারে শেখর, অনাদিবাবুর পিঠের বেদনাটা এইবার বোধ হয় একেবারে বুকের ভিতরে চলে এসেছে। টালিগঞ্জের গলির ক্ষুদ্র বাসাবাড়ির বুকে আবার আর্তনাদ শুরু হয়েছে। উঠানের রজনীগন্ধাকে একটা ঠাট্টা বলে মনে হয়। রতনবাবুর ছেলেকে পড়াবার কাজ ছাড়া টাকা আনবার মত অন্য কোন কাজ করবার সৌভাগ্য এখনও হয়নি।

কাজের জন্য দরখাস্ত করাই একটা কাজ হয়ে উঠেছে। এবং আর একটি কাজ খুঁজছে শেখর। কিন্তু এই খোঁজাখুঁজির পরিণামও মাঝে মাঝে যেন এক একটা নির্মম বিদ্রূপের খোঁচা দিয়ে অনিশ্চিত হয়ে যায়। ছাত্রের অভিভাবক বলেন—আপনার যদি কোন ভাল স্টেটাস থাকতো, তবে ভাল মাইনে দিতে...অর্থাৎ আপনার পক্ষে এক'শো টাকা মাইনে দাবি করবার একটা অর্থ হতো।

স্টেটাস চাই। অদৃষ্টের নিয়মটাকে বুঝতে চেষ্টা করতে গিয়ে মাঝে মাঝে হেসে ফেলে শেখর। স্টেটাস নেই বলে টাকা আসছে না ; না টাকা নেই বলে স্টেটাস হচ্ছে না? ঐ যে

বন্ধু নগেন, যাকে পুরো দুটো মাস ধরে ট্রিগনোমেট্রির মারপ্যাঁচ বুঝিয়ে দিয়ে একটু উপকার করতে পেরেছিল শেখর, সেই নগেন এখন সরকারী কলেজের অধ্যাপক। টায়েটুয়ে পাস নম্বর পেয়েও নগেন যে কেমন ক'রে ওরকম ভাল মাইনের একটা অধ্যাপনার কাজ পেয়ে গেল, সে রহস্য না জানলেও অনুমান করতে পারে শেখর। নগেনও প্রাইভেট ছাত্র পড়ায়, এবং ছাত্রের বাপ খুশি হয়ে নগেনকে দুশো টাকা মাইনে দেয়। শেখর জানে, নগেন তাতে সন্তুষ্ট নয়। শেখরের কাছ অনেকবার রাগ ক'রে আক্ষেপ ক'রেছে নগেন--ছেড়ে দেব ; দুশো টাকায় প্রাইভেট ছাত্র পড়ানো পোষায় না। যেখানে ট্যালেণ্টের সম্মান নেই, সেখানে যাওয়াই উচিত নয়।

অনাদিবাবুর গম্ভীর গলায় আর্তনাদ আবার কর্কশ স্বরে বেজে ওঠে।--তাহলে কথা রইল বিভা, মধু, বিধুর, গরম জামা এই শীতে আর হবে না।

বিভাময়ী--না হলে যে ছেলে দুটো এই শীতে নিউমোনিয়াতে...। চেঁচিয়ে ওঠেন অনাদিবাবু--ওসব মেয়েলি ন্যাকামি দিয়ে যদি আমাকে বিরক্ত কর, তবে মনে রেখ, আমার এই গরম আলোয়ানটাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি ক'রে পুড়িয়ে দেব।

ঘরের ভিতরে বসে চুপ করে এই ধিক্কারের আঘাতগুলিকে শুধু সহ্য করে শেখর ; কিন্তু মনে মনে যেন নিজেকেও ধিক্কার দিয়ে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিতে থাকে। টালিগঞ্জের গলির একটা ক্ষুদ্র বাসাবাড়ির এই কয়েকটা মানুষের জীবনের এই ক্লেশ শেখর মিত্রেরই চোখের একটা কুৎসিত ভুলের সৃষ্টি। একটা মেয়ের সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হওয়ার ভুল। লম্পট ধনী বাজে মেয়েমানুষের খপ্পরে পড়ে লাখ টাকা ফুঁকে দিয়ে আর ফতুর হয়ে ভিখারী হয়ে যায় ; শেখরের জীবনের অনাচারও প্রায় সেইরকম। অথচ শেখর মিত্র ওরকম লম্পট ধনীর চেয়েও বেশি মূর্খ। তবু সে লম্পট কিছু পেয়ে, কোন বস্তুর বিনিময়ে দাম দিতে গিয়ে ফতুর হয়। কিন্তু শেখর মিত্রের প্রাপ্তি যে একেবারে শূন্য। কোন কিছু নয়, কোন কিছুর বিনিময়ে নয়, শুধু ঠকবার আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজেকে দরিদ্র করেছে শেখর।

দেখতে পেয়েছে শেখর, এই কয়েকদিন ধরে দেখে আসছে, রোজই একবার ক'রে পঞ্জিকা ঘাঁটেন বিভাময়ী। উপোস করবার জন্য যেন একটা ছুতো খুঁজছেন বিভাময়ী। যত পবিত্র দিনক্ষণ আছে, সবগুলিকেই কখনও একবেলা এবং কখনও বা দুবেলা উপোস দিয়ে পুজো করছেন। কি আশ্চর্য, পবিত্র দিনগুলি কত ঘন-ঘন দেখা দেয়, এবং এক একদিন প্রায় জ্ঞান হারিয়ে আধমরার মত মাদুরের উপর পড়ে থাকেন বিভাময়ী।

অনাদিবাবু আবার আক্ষেপ করেন, এবং আক্ষেপটাই যেন চাপা কান্নার স্বরের মত গুনগুন করে।--কি ভেবেছিলাম, আর কি হলো! ভেবেছিলাম মধু আর বিধুকে এবছর একটা ভাল স্কুলে ভর্তি করে দেব। ভাল স্কুল দূরে থাক, ঐ চালাঘরের স্কুলও আর ওদের কপালে নেই। এবার নাম কাটিয়ে ঘরে বসিয়ে রাখতে হবে। দরজার কপাটে কড়া-নাড়ার শব্দ শুনে শেখর মিত্রের বিমর্ষ মনের ভয় চমকে ওঠে। কে এসেছে? বাড়িওয়ালার দারোয়ান? ব্যাঙ্কের পিয়ন? রাধানাথ মুদি?

কিংবা হয়তো রতনবাবুর ছেলেটাই এসেছে, এইবার জানিয়ে যেতে যে, বাবা বলেছেন, আপনাকে আর পড়াতে হবে না, প্রফেসার নগেনবাবু এবার থেকে আমাকে পড়াবেন।

দরজা খুলে দিতেই এক অপরিচিত ভদ্রলোককে দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয় শেখর। এবং ভদ্রলোক এক মুহূর্ত দেরি না ক'রে ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করে।--আপনিই কি শেখরবাবু?

--হ্যাঁ।

--আমি আপনার কাছেই এসেছি।

--বলুন, কেন?

--আপনাকে দেখতে।

সত্যিই ভদ্রলোক একেবারে অপলক চোখ নিয়ে শেখর মিত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। যেন দেখে ধন্য হয়ে যাচ্ছেন।

শেখর একটু বিরক্তভাবে বলে--আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে....।

ভদ্রলোকও হেসে ফেলেন--আপনার মনে হচ্ছে, একটা পাগল এসে আপনার সামনে দাঁড়িয়েছে।

শেখর--না, মনে হচ্ছে, আপনার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে।

ভদ্রলোক--তা তো আছেই।

শেখর--বলুন, কি উদ্দেশ্য?

ভদ্রলোক--আমাকে ক্ষমা করুন।

শেখর ভ্রূকুটি করে--তার মানে?

ভদ্রলোক--তার মানে, আমি নিখিল মজুমদার।

চমকে ওঠে শেখর মিত্র। এবং নিখিল মজুমদারের ঐ প্রসন্ন ও কৃতজ্ঞ মুখেরই অদ্ভুত একটা ক্ষমাপিপাসু বেদনার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে যায়। ক্ষমা কেন? কিসের ক্ষমা?

নিখিল বলে--ক্ষমা তো করবেনই, তা ছাড়া আপনার ব্লেসিংও চাই। শেখর জোর ক'রে হাসতে চেষ্টা করে--আমার বয়স বোধ হয় আপনার চেয়ে...।

নিখিল--আমার চেয়ে বোধহয় একটু কমই হবে। তাতে কি আসে যায় শেখরবাবু? আপনি যে আমার চেয়ে অনেক অনেক বড়।

শেখর--ওসব কথা আপনি চেঁচিয়ে বললেও আমি বিশ্বাস করবো না।

নিখিল--না করুন, তাতে আমার বিশ্বাসেরও কোন ক্ষতি হবে না।

শেখর--যাক্ সেসব কথা।

নিখিল--আমিও বলি. যাক্ সেসব কথা। আসল কথা এই যে, আমার স্বার্থপর মনটাকে ক্ষমা করুন।

শেখর--স্বার্থপর মন?

নিখিল--হ্যাঁ। আপনি নিজেকে বঞ্চিত ক'রে আমাকে চাকরি দিয়েছেন। আমার সৌভাগ্য আপনারই কাছে ঋণী।

শেখর--এই কথাটি আপনি বলবেন, এতক্ষণ এই ভয়ই করছিলাম।

নিখিল--না বলে উপায় নেই শেখরবাবু। আমি জীবনে সুখী হয়েছি, একথা মনে করলেই যে আপনার কথা মনে পড়ে।

শেখর হাসে--কিন্তু সুখী হবার একটা ব্যাপার যে এখনও বাকি আছে?

নিখিল--কি বললেন?

শেখর--বিয়েটা।

নিখিল--হ্যাঁ বাকি আছে বটে, কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়েছি।

শেখর--কিরকম?

নিখিল হাসে--আমাকে এখন আপনার কুটুম বলে একরকম ধরেই নিতে পারেন।

শেখর আশ্চর্য হয়--আমার কুটুম? অবন্তী সরকারের সঙ্গে আমাদের তো কোন কুটুম্বিতার সম্পর্ক নেই।

নিখিলও আশ্চর্য হয়ে তাকায়--অবন্তী সরকারের সঙ্গে আপনাদের কুটুম্বিতা নাই বা থাকলো। অনসূয়ার সঙ্গে তো আছে।

--অনসূয়া? চেঁচিয়ে ওঠে শেখর।

নিখিল--হ্যাঁ।

শেখর--অনসূয়ার সঙ্গে আপনার বিয়ে?

নিখিল--হ্যাঁ।

শেখর--অবন্তীর সঙ্গে নয়?

নিখিল--ছিঃ, কি যে বলেন!

শেখর--কিন্তু অনসূয়া কি...।

শেখরের মুখের প্রশ্ন হঠাৎ যেন থমকে চুপ ক'রে যায়। নিখিল বলে--কি বললেন?

শেখর--না, কিছু নয়।

নিখিল মজুমদারের প্রসন্ন মুখের দিকে অপরাধীর মত কুণ্ঠিতভাবে তাকায় শেখর। এবং সেই মুহূর্তে শেখরের সেই কুণ্ঠিত চোখের দৃষ্টি অদ্ভুত একটা বেদনায় যেন বিচলিত হয়ে কাঁপতে থাকে। কী বিপুল আশ্বাসে খুশি হয়ে আছে নিখিল মজুমদার! হয়তো সত্যিই আগে রাজি হয়েছিল অনসূয়া, এবং অনসূয়ার সেই প্রতিশ্রুতির পুলক মনে-প্রাণে গ্রহণ ক'রে খুশি হয়ে রয়েছে নিখিল মজুমদারের জীবনের আশা। অনসূয়াকে ভালবাসে নিখিল ; অনসূয়ার সঙ্গে জীবনের একটি সুন্দর নীড় বাঁধবার কল্পনা যেন নিখিলের চোখে জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু জানে না নিখিল, ওর স্বপ্নকে এই শেখর মিত্রই একটা মিথ্যা হিংসার সাপের মত দংশন ক'রে এসেছে। একটা কপট আগ্রহের অভিনয় ক'রে অনসূয়ার মনে নতুন ভাবনা ধরিয়ে দিয়ে এসেছে শেখর। পৃথিবীর এক ভদ্রলোককে বিয়ে করবে অনুসূয়া, এই সামান্য ও সরল একটা ঘটনা সহ্য করতে শেখর মিত্র রাজি নয় ; আপত্তি আছে শেখরের, এই কথা শেখরের মুখ থেকেই শুনতে পেয়ে কি-ভয়ানক চমকে উঠেছিল অনসূয়া! মনে পড়ে শেখরের, অনসূয়ার সেই বিস্মিত ব্যথিত ও স্তব্ধ চোখ দুটোর করুণ দৃষ্টিটাও মনে পড়ে।

বুকের ভিতরও একটা যন্ত্রণার স্বর যেন ধিক্কার দিয়ে বলতে থাকে।

--ছি ছি, কিসের জন্য, কার জন্য, বেচারা নিখিল মজুমদারের স্বপ্ন ব্যর্থ করবার চক্রান্ত করেছে শেখর?

নিখিল--এবার তাহলে খুশি হয়ে আমাকে চলে যেতে বলুন শেখরবাবু।

শেখর মিত্রের গম্ভীর ও বেদনাক্লিষ্ট চেহারাটা হঠাৎ যেন হেসে উচ্ছল হয়ে ওঠে--খুব খুশি ; এর চেয়ে ভাল খুশির খবর আর কি হতে পারে?

নিখিল চলে যেতেই বোধহয় এক মিনিটের বেশি দেরি করে না শেখর। মনে মনে নিজের মনের একটা ভুলের অভিশাপকে ধিক্কার দিয়ে কয়েকটি মুহূর্ত শুধু ছটফট করে। এই অতি নীচ হীন নিষ্ঠুর ও মূর্খ ভুলটাকে এই মুহূর্তে মিথ্যে ক'রে দিতে হবে।

নিজেরই বুদ্ধি আর কাণ্ডজ্ঞানের উপর ভয়ানক একটা সন্দেহ। মাথাটা বোধহয় সুস্থতা হারিয়েছে, নইলে অবন্তীর ঐ চক্রান্তের প্রস্তাবেও রাজি হয় মানুষ? সন্দেহ করে শেখর, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরই উপর যে ঘৃণা মনের ভিতর শিউরে ওঠে, তেমন ঘৃণা আর কাউকে করবার দুর্ভাগ্য জীবনে কখনও হয়নি।

অবন্তী সরকারের অনুরোধের নিষ্ঠুরতাটা এতক্ষণে যেন শেখরের শান্ত মনের চিন্তায় ধরা পড়ে যায়। অবন্তীর ঐ অনুরোধের অর্থ, নিখিল নামে একটি মানুষের জীবনের স্বপ্নকে হত্যা করা, যে-মানুষ শেখরের জীবনের বিরুদ্ধে কোন শত্রুতা করেনি। অবন্তীর ঐ অনুরোধ রক্ষা করার অর্থ অনুসূয়া নামে একটি মেয়েকে ফাঁকি দেওয়া আর অপমান করা। অনসূয়াকে ভালবেসে নয়, অনুসূয়ার জীবনের কোন ভালবাসার দাবি পূর্ণ হবে বলে নয়, অনসূয়াকে বিয়ে করতে হবে এই উদ্দেশ্যে যে, অবন্তী নামে এক মেয়ের আকাঙ্ক্ষার পথ অবরোধ হয়ে যাবে। কি ভয়ানক, কি ঘৃণ্য এই অনুরোধের হৃদয়টা! অথচ এমনই একটি অনুরোধের কাছে আত্মসমর্পণের সম্মতি ঘোষণা করে চক্রান্তের পথে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে শেখর।

এখনই বের হতে হবে। আর এক মুহূর্তও দেরি করা যাবে না। ভবানীপুরের একটা বাসার কথা শেখরের মনে পড়ে। এখনই রওনা হলে পৌঁছে যেতে বড় জোর আধ ঘণ্টা।

অনসূয়া কি এখন বাড়িতে আছে? আছে নিশ্চয়। যদি না থাকে, তবে অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না অনসূয়া বাড়ি ফিরে আসে। ঐ বোকা মেয়ের স্তব্ধ দুটো চোখের ভুল ধারণা ভেঙ্গে দিতে হবে।

২২

নিখিল মজুমদারকে একটা চিঠি দিতে হবে, এবং সেই চিঠিতে শুধু আট-দশটা কথা লিখতে হবে। না নিখিলবাবু, আমি রাজি নই, ক্ষমা করুন, ইতি অনুসূয়া।

হাতের কাছে কাগজ ও কলম ছিল। এবং লেখবার কথাগুলি মনের ভিতর ছটফটও করছিল। কিন্তু তবু হাত গুটিয়ে চুপ ক'রে বসে ভাবতে থাকে অনসূয়া, এ কি অদ্ভুত কথা বলে গেল শেখর মিত্র! আপত্তি আছে শেখর মিত্রের, কিন্তু কিসের আপত্তি?

চিঠি পেয়ে খুবই দুঃখিত হবে নিখিল মজুমদার ; এবং অনসূয়ার মনের অদ্ভুত রকম দেখে অনসূয়াকে একটা বিশ্বাসঘাতিকা বলে সন্দেহ করবে আর রাগ করবে। করুক, উপায় নেই। অনসূয়াও রাগ করে নিখিলকে প্রশ্ন করতে পারে, তুমিও শেখর মিত্রের নামে যে-সব কথা বলে গেলে, সেসব কথা যে মিথ্যে নয়, তার কি কোন প্রমাণ আছে? কোথা থেকে, কেমন ক'রে আর কি দেখে প্রমাণ পেলে যে, অবন্তীকে ভালবাসে শেখর মিত্র?

ঘরের ভিতরে ঢুকে শেখর হেসে ওঠে—কোন ভয় নেই, তুমি নিশ্চিন্ত মনে চিঠি লেখ, আমি এখনি চলে যাচ্ছি।

অনসূয়া চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলে—বসুন।

শেখর—না, এখনই পেটের ভাবনায় বের হতে হবে।

অনসূয়া—কোথায় যাবেন?

শেখর—প্রথমে যাব ক্লাইভ স্ট্রীট, তারপরেই এলগিন রোডে ছাত্রের বাড়ি।

অনুসূয়া—তা হ'লে চা খেয়ে যান।

—না। অনসূয়ার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার হেসে ওঠে শেখর—আজ কিন্তু তোমাকে একটুও ভাল দেখাচ্ছে না।

শুধু—আজ কেন? কোনকালেই ভাল দেখায়নি, তবু...।

শেখর হাসে—রাগ করো না, কথাটা বলতে একটু ভুল হয়েছে। আজ তোমার মুখে এই গম্ভীরতা একটুও ভাল দেখাচ্ছে না।

অনসূয়া—কেন?

শেখর—যখন ভাবসাব হয়ে গিয়েছে, সব ভয় ভেঙে গিয়েছে, যখন বিয়ের দিনটার কথা ভেবে তৈরী হতে হচ্ছে, তখন...।

অনসূয়া—কে বললে?

শেখর—সবাই জানে! সবই শুনেছি।

অনসূয়া—কিন্তু...।

শেখর—কি?

অনসূয়া—আপনি খুশি হচ্ছেন কেন?

শেখর—তার মানে? আমি যে সবচেয়ে বেশি খুশি।

অনসূয়ার চোখে একটা অস্বস্তি যেন ভ্রূকুটি করে ওঠে। কিন্তু আপনিই যে সেদিন বললেন, আপনার আপত্তি আছে।

হেসে ওঠে শেখর—বলেছিলাম বটে, অস্বীকার করছি না। কিন্তু তখন আপত্তি যে সত্যিই ছিল।

অনসূয়া—কেন?

শেখর—তখন কি জানতাম যে, নিখিল মজুমদারকে বিয়ে করবার জন্য তুমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছো?

মাথা হেঁট করে অনসূয়া। কিন্তু অনসূয়ার গম্ভীর মুখটা ধীরে ধীরে হেসে উঠতে থাকে। যেন একটা বৃথা ভাবনার, একটা ভুল কল্পনার বেদনা থেকে এতক্ষণে হঠাৎ মনটা মুক্ত হয়ে গেল। হাসছে শেখর মিত্র। সত্যিই, অনসূয়ার সঙ্গে হাসাহাসির সম্পর্ক ছাড়া শেখর মিত্রের মনে অনসূয়ার জন্য আর কোন সম্পর্কের ইচ্ছা নেই। শেখর মিত্রের কাছে অনসূয়া শুধু তার বোনের ননদ, এই মাত্র। মুখ তুলে তাকায় অনসূয়া, এবং এইবার অনসূয়ার মুখের হাসিতে চতুর এক আক্রমণের সঙ্কল্প ছটফট করতে থাকে। এবং প্রভা চা নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকতেই চেঁচিয়ে ওঠে অনসূয়া—সায়েণ্টিস্ট মশাই যে ডুবে ডুবে জল খাওয়ার খুব ভাল বিজ্ঞান আয়ত্ত করে ফেলেছেন, সে খবরও অনেকেই জানে।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় শেখর—কটা বেজেছে, একবার ঘড়িটা দেখে বলে দে তো প্রভা।

হ্যাঁ, একটু ছুতো করে প্রভাকে ঘর থেকে সরিয়ে দিল শেখর মিত্র। এবং বেশ একটু বিব্রতভাবে, যেন মনের ভিতর একটা অপরাধের জ্বালা লুকিয়ে প্রশ্ন করে শেখর—অনেকেই জানে, এ কথার অর্থ কি অনসূয়া?

অনসূয়া—নিখিলবাবু জানে।

শেখর—কি জানে?

অনসূয়া—অবন্তীকে আপনি...।

শেখর—কথাটা খুব মিথ্যে নয়। কিন্তু নিখিলবাবু তোমাকে আর একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছেন।

অনসূয়া—কি কথা?

শেখর—অবন্তী আমাকে ঘেন্না করে। কাজেই...।

চুপ করে শেখর। শেখরের চোখ দুটো উদাসভাবে হাসতে থাকে। তারপর ঘরের বাতাসকে যেন একটা মনখোলা ঠাট্টার আমোদে হাসিয়ে দিয়ে হো হো করে হেসে ওঠে শেখর—এবার চলি। কাজেই বুঝতে পারছো অনসূয়া, ডুবে ডুবে জল খাওয়ার বিজ্ঞান আমি একটুও আয়ত্ত করতে পারিনি। শুধু ডুবে গিয়েছি।

২৩

দরজাটা খোলাই ছিল। সেই দরজার সামনে একটা ছায়া এগিয়ে আসতেই ঘরের ভিতর থেকে দু'পা এগিয়ে এসে উঁকি দেয় অনসূয়া। সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে—একি? তুমি এই অসময়ে? হঠাৎ না বলে-কয়ে? কি মনে ক'রে অবন্তী?

অবন্তী—তুমিই বা এত চমকে উঠলে কেন অনসূয়া? কি মনে করে? এর আগে এরকম হঠাৎ না বলে-কয়ে অসময়ে কতবারই তো এসেছি।

দুই বান্ধবী, অনসূয়া আর অবন্তী। জীবনে কোনদিন এমন অদ্ভুত ব্যাপার কখনও দেখা যায়নি যে, অনসূয়া আর অবন্তী হঠাৎ দু'জনে দুজনকে দেখতে পেয়ে এরকম শুকনো চোখ তুলে দুজনের দিকে দুজনে তাকিয়েছে। যে সাক্ষাতে হাসির উল্লাস ফোয়ারা হয়ে উছলে পড়তো, সে সাক্ষাৎ যেন একটা তীব্র অভিযোগের হানাহানি শিউরে তুলেছে।

অবন্তীকে হেসে হেসে অভ্যর্থনা করতে ভুলে গিয়েছে অনসূয়া। অনসূয়ার মনের ভিতরে সত্যিই যে ভয়ানক এক অভিযোগের আক্ষেপ বাজছে। নিজেকে কি মনে করে অবন্তী? শেখর মিত্রের মত মানুষের ভালবাসা পাওয়া যে ওর কত বড় সৌভাগ্য, সেটা বোধ হয় শুধু

ওর ঐ ভাল চাকরির অহংকারে বুঝতে পারছে না অবন্তী? কি সাহস! শেখর মিত্রকে ঘৃণা করে অবন্তীর মত মেয়ে?

অবন্তী সরকারের সেই সুন্দর ছায়া-ছায়া কালো চোখের তারায় একটা অভিযোগের বিদ্যুৎ যেন ঝিলিক দিয়ে ফুটে উঠতে চায়। অনসূয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে কি-যেন সন্দেহ করছে, ভয় পাচ্ছে আর রাগ করছে অবন্তী। শেখর মিত্র নামে একটা লোক হঠাৎ এসে বিয়ে করবার ইচ্ছে জানালেই খুশি হয়ে রাজি হয়ে যেতে হবে, এরকম একটা বাজে মন নিয়েও কত অহংকারী হয়ে উঠেছে অনসূয়া। কত গম্ভীর হয়ে কথা বলছে! কোন মানুষের মনের আসল খবর না জেনে ওভাবে যে রাজি হতে নেই, এটুকু কাণ্ডজ্ঞান আছে কি অনসূয়ার? অনসূয়ার মুখ দেখে মনে হয়, এসেছিল শেখর মিত্র, এবং অনায়াসে শেখর মিত্রের কাছে জীবনের সব হাসি সঁপে দেবার ইচ্ছা জানিয়ে দিয়ে এখন এত গম্ভীর হয়ে উঠেছে অনসূয়া।

অবন্তী বলে—ইচ্ছে ক'রে, তোমার কাছে অপমানিত হব জেনেও একবার আসতে হলো অনসূয়া।

অনসূয়া—এসেছ, ভালই করেছ, কিন্তু এরকম মিথ্যে সন্দেহ ক'রে আমাকে অপমান না করলেই ভাল ছিল অবন্তী।

অবন্তী—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, সন্দেহ না করে পারছি না।

অনসূয়া—মিথ্যে সন্দেহ।

অবন্তী—মিথ্যে কেন? শেখরবাবু কি এখানে আসেননি?

অনসূয়া—এসেছেন বৈকি। আজও এসেছিলেন ; এই তো কিছুক্ষণ আগে চলে গেলেন।

অবন্তী হাসে—কি বলে গেলেন, সেটা কি বলতে পারবে?

অনসূয়া—পারবো বৈকি।

অবন্তী হাসে—তাহ'লে পেরে যাও।

অনসূয়াও হাসে।—আমি যে-কথা স্বপ্নেও বিশ্বাস করতে পারি না, সেই কথাই বলে গেলেন।

অবন্তীর চোখ দুটো থরথর ক'রে কাঁপে, তারপর একেবারে ভিজেই যায়।—স্পষ্ট করে বলেই ফেল অনসূয়া, যদিও জানি ভদ্রলোক কি বলেছেন।

অনসূয়া—জান না বোধ হয়।

অবন্তী—খুব জানি। কিন্তু তুমি কি বলেছ জানি না, বুঝতেও পারছি না।

অনসূয়া হাসে—আমি শেখরবাবুকে আমার বিয়েতে আসবার জন্য নেমন্তন্ন করেছি।

অবন্তী—কি বললে? তোমার বিয়ে?

অনসূয়া হাসে—তোমাকেও কি নেমন্তন্ন করবো না বলে সন্দেহ করছো?

অবন্তী—না, সে সন্দেহ নয়। কার সঙ্গে তোমার বিয়ে?

অনসূয়া—তা'ও জানতে পারবে।

অবন্তী—ভদ্রলোকের নাম?

অনসূয়া—নিখিল মজুমদার। দাদার বন্ধুর ভাই।

অবন্তীর দুই চোখের সন্দেহ যেন অগাধ বিস্ময়ের আবেগ হয়ে শুধু জ্বলজ্বল করতে থাকে। গম্ভীর মুখের সেই ভয়ানক সন্দেহের গুমোট হঠাৎ যেন এই পৃথিবীর একটা মিষ্টি বিদ্রূপের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে। শুধু অনসূয়াকে নয়, মনে মনে এই মুহূর্তে যেন নিখিল মজুমদারের অকৃতজ্ঞ মনটাকেও অভিনন্দিত করতে ইচ্ছে করছে। অনসূয়া যে সত্যিই অবন্তী সরকারকে মুক্তির আশ্বাস শুনিয়ে দিচ্ছে। না, ভুল করেনি শেখর মিত্র, ভুল করেনি অনসূয়া, ভুল করেনি নিখিল মজুমদারও।

অনসূয়া—শুনে খুশি হলে তো অবন্তী?

চেঁচিয়ে ওঠে অবন্তী—তুই আমাকে আর কত অপমান করবি অনসূয়া? তোর বিয়ের কথা শুনে আমি খুশি না হলে এই দুনিয়াতে আর কে খুশি হবে বল দেখি।

অনসূয়াও হাসে।—কিন্তু আমি খুশি হব কবে?

অবন্তী—তার মানে?

অনসূয়া—তুই বিয়ে করবি কবে?

অবন্তী—আমি? আমাকে বিয়ে করবে কে? যমে?

অনসূয়া হাসে—থাক্, এত অভিমান করিস না অবন্তী।

অবন্তী গম্ভীর হয়—না ভাই, অভিমান করবারও জোর নেই আমার।

অনসূয়া—কি বললি? মনে হচ্ছে, সত্যিই কারও ওপর তোর অভিমান আছে।

অবন্তী—না, অভিমান নয় অনসূয়া। তার ক্ষমা চাইবারও জোর পাচ্ছি না।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অবন্তী। পথ হারিয়ে যায়নি। কিন্তু পথটাই যে অদ্ভুত। কেমন করে এগিয়ে যাওয়া যায়? সেই সাহসই বা কোথা থেকে পাওয়া যায়? অবন্তী সরকারের সুন্দর কালো চোখের আশা আর সাহস যেন একটা অবসাদের বেদনায় ডুবে গিয়েছে।

কিন্তু হেসে উঠেছে অনসূয়ার চোখ। আর কোন সন্দেহ নেই অনসূয়ার। মিথ্যে সন্দেহ করেছে শেখর মিত্র। শেখর মিত্রেরই চোখ নেই। আজ এখানে থাকলে নিজেই দেখে লজ্জা পেত শেখর মিত্র। শেখর মিত্রকে ভালবাসবার জন্য কী গভীর ব্যাকুলতা থমকে রয়েছে এই ভয়ানক চালাক অবন্তীরই চোখে।

অনসূয়া বলে—একটু চা খাও অবন্তী।

অনসূয়ার অনুরোধ শোনা মাত্র ছটফট করে ওঠে অবন্তী—না না, আমার সময় নেই অবন্তী। কিছু মনে করো না।

চলে গেল অবন্তী। দেখে বোঝা যায় না, কোথাও পালিয়ে গেল, না কারও কাছে ছুটে চলে গেল অবন্তী।

২৪

রতনবাবুর ছেলে শেখরের চোখের সামনে বসে কঠিন গণিতের ফরমুলা বুঝতে গিয়ে হিমসিম খায়। পাতার পর পাতা অঙ্কে অঙ্কে ভরে যাচ্ছে, তবু কঠিন গণিতের প্রবলেম সমাধান হবে বলে মনে হয় না। টিউটর শেখরও আনমনার মত তার জীবনের সমস্যাটা চিন্তা করে ; কোন ফরমুলাই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সমাধান করবার কোন আশাই দেখা যায় না।

শুধু কঠিন একটা ঘৃণা ছটফট করে নিজের মনের ভিতরে। এ কি অদ্ভুত এক হীনতার চক্রান্তে স্বীকৃতি জানিয়ে অবন্তী সরকার নামে এক নারীকে আশ্বাসে খুশি ক'রে চলে এসেছে শেখর? অদ্ভুত একটা মেরুদণ্ডহীন হিরোইজম ; শেখর মিত্র তার জীবনের পৌরুষ বিসর্জন দিয়ে এক নারীর সুন্দর দুটি কালো চোখের কপট দাস হবার জন্য কথা দিয়ে এসেছে। যত খুশি নিজের ক্ষতি ক'রে অবন্তীর কালো চোখের স্বপ্নের বিলাস-লীলাকে সাহায্য করা যায়, সে অধিকার শেখরের আছে। কিন্তু শেখরের হৃৎপিণ্ডটাই যেন হঠাৎ চমকে ঘুম ভেঙে আর মোহ ছিঁড়ে জেগে উঠেছে, বুঝতে পেরেছে শেখর, অবন্তীকে সুখী করবার জন্য পরের ক্ষতি করবার কোন অধিকার তার নেই। নিখিল মজুমদারের ইচ্ছার পথে কাঁটা ছড়িয়ে দেবার, আর অকারণে বেচারা অনসূয়ার মনের শ্রদ্ধার সুযোগ নিয়ে তার মনে শেখরের সম্পর্কে একটা ইচ্ছা জাগিয়ে তুলবার হীন সঙ্কল্পকে এই মুহূর্তে চূর্ণ ক'রে দিতে হবে। ব্যস্তভাবে, চোখের দৃষ্টি উতলা ক'রে কি যেন খুঁজতে থাকে শেখর। ছাত্র প্রশ্ন করে—আপনার শরীরটা আজ

ভাল নয় বলে মনে হচ্ছে শেখরদা!

শেখর বলে—আমাকে এক টুকরো কাগজ আর তোমার পেনটা দাও। একটা দরকারি চিঠি লেখবার আছে।

কাগজ আর পেন শেখরের হাতের কাছে রেখে দিয়ে ছাত্রও অনুমতি চায়—আজ এখন তাহলে আমিও উঠি শেখরদা।

—এস। ছাত্রকে বিদায় দিয়ে সেই পড়ার ঘরের নিভৃতে একেবারে একলাটি হয়ে শেখর মিত্র তার মনের বিদ্রোহ ছোট একটি চিঠির মধ্যে তিনটি লাইনে একেবারে স্পষ্ট ভাষায় যেন উৎকীর্ণ ক'রে দেয়।

—অসম্ভব অবন্তী। তোমার অনুরোধ রক্ষা করবার সামর্থ্য আমার নেই। তোমাকে মূর্খের মত ভালবাসি ঠিকই, কিন্তু সেই ভালবাসার জন্য মূর্খ হতে পারবো না। নিখিল হোক, অনসূয়া হোক, পৃথিবীর যে কেউ হোক, কারও ক্ষতি করতে পারবো না। তাতে তুমি সুখী হও বা না হও।

চিঠিটার মধ্যে জ্বালা আছে। চিঠিটাকে বেশিক্ষণ পকেটে রাখতেও অস্বস্তি হয়। এই মুহূর্তে ঐ চিঠিকে পার করে দেওয়াই উচিত।

রতনবাবুদের বাড়ির গেট পার হয়ে যখন পথের উপর এসে দাঁড়ায় শেখর, তখন এলগিন রোডের বড় বড় কৃষ্ণচূড়ার উপর দুপুরের রোদ ঝলক দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আর বেশি দূর নয় পোস্ট অফিস। ঐ চিঠিকে এই মুহূর্তে অবন্তী সরকারের কালো চোখের উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দিয়ে মুক্ত হয়ে যাবে শেখর। জানুক অবন্তী সরকার, শেখর মিত্রের মহত্ত্বটা খুব বেশি মূর্খ নয়।

শেখরের এই আসন্ন মুক্তির লগ্নটাকেই যেন একটা ক্ষেপা হাওয়ার আঘাতে হু হু ক'রে উড়িয়ে দিয়ে একটা ট্যাক্সি শেখরের প্রায় গা ঘেঁষে ছুটে চলে যায়, এবং তার পরেই আচমকা থেমে যায়।

সামান্য একটু দূরে গিয়ে গাড়িটা থেমেছে। গাড়ি থেকে নেমেছেন এক মহিলা। চলে গেল ট্যাক্সি। মহিলা চুপ ক'রে ফুট পাতের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। তার পরেই শেখরের চোখের কঠিন দৃষ্টি হঠাৎ চমকে উঠেই বুঝতে পারে, দাঁড়িয়ে আছে অবন্তী সরকার। কোন সন্দেহ নেই, লালচে ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে শেখরের জন্য দাঁড়িয়ে আছে অবন্তী।

শেখর কাছে আসতেই অবন্তী বলে—যাচ্ছিলাম টালিগঞ্জ। আপনারই কাছে।

শেখর হাসে—খুব আশ্চর্যের কথা।

অবন্তী—আরও আশ্চর্যের কথা বলবো?

শেখর—কি?

অবন্তী—এখনি একবার আমাদের বাড়িতে আপনাকে যেতে হবে।

শেখর—কেন?

অবন্তী—কথা আছে।

শেখর—এখানেই বল।

অবন্তী ভ্রূকুটি করে।—এখানে বলা যায় না।

শেখর—খুব বলা যায়। আমার কাছে তোমার বলবার মত এমন কোন কথা নেই, যা এখানে দাঁড়িয়ে বলা যায় না।

অবন্তীর ভ্রূকুটি আরও কঠোর হয়ে ফুটে ওঠে।—শুনে সুখী হলাম। দু'দিনের মধ্যেই একেবারে নতুন মানুষ হয়ে গিয়েছেন।

কোন উত্তর দেয় না শেখর। এবং অবন্তীর মুখের দিকে তাকাতেও ভুলে যায়। মনে হয়, কৃষ্ণচূড়ার ছায়াতলে একেবারে একলা দাঁড়িয়ে আছে শেখর। একটা খোঁড়া ভিখারী লাঠি

ঠুকে ঠুকে কাছে এসে দাঁড়িয়ে সুর ক'রে আবেদন জানায়—ভগবান আপনাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। খোঁড়াকে মুড়ি খেতে পয়সা দিন বাবা।

খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে অবন্তী—খোঁড়াকে দুটো পয়সা দিন তাহলে। ও কি বলছে, শুনতে পাচ্ছেন না?

শেখর বলে—কিছু মনো করো না, আমি চলি।

অবন্তীর চোখ দুটো হঠাৎ গম্ভীর হয়। গলার স্বরটাও অস্বাভাবিক রকমের কঠোর।—একটু দাঁড়ান। সামান্য একটা জিজ্ঞাস্য আছে।

শেখর—বল।

অবন্তীর কালো চোখ এইবার যেন দপ ক'রে জ্বলে ওঠে।

অনসূয়াকে বিয়ে করবার কথা ভাবতে আপনার মনে একটু লজ্জাও হচ্ছে না?

শেখর—কি বললে?

অবন্তী যেন বিকার রোগীর প্রলাপের মত বিড় বিড় করে, অথচ দম বন্ধ ক'রে বলতে থাকে।—আপনি খুব মহৎ। আর, খুব মহৎ বলে আপনার মনে বড় অহংকার আছে। কিন্তু...শুধু আমার একটা অনুরোধের জন্য, আমার একটা বিশ্রী খেয়ালের জন্য আপনি নিজেকে একেবারে বাজে...একটা ছোট মনের লোকের মত...।

শেখর—চুপ কর অবন্তী।

অবন্তী—ধমক দেবেন না। আমাকে ধমক দেওয়া আপনার মত দুর্বল মানুষের একটুও সাজে না।

পকেট থেকে চিঠিটা বের ক'রে অবন্তীর হাতের কাছে এগিয়ে দিতেই যেন ভয়ে চমকে ওঠে অবন্তী। হাত কাঁপে। তারপর সেই কাঁপা হাতেই চিঠিটা তুলে নেয়।

কৃষ্ণচূড়ার ছায়ার কাছে একা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে চিঠিটার দিকে তাকিয়ে থাকে অবন্তী। এবং অন্যদিকে না তাকালেও বুঝতে পারে, হন হন ক'রে হেঁটে চলে গেল শেখর।

২৫

টালিগঞ্জের গলির ভিতরে ক্ষুদ্র বাড়ির জানালায় বিকালের রোদ লুটিয়ে পড়েছে। বাড়ির দরজার কাছে পথের উপর ঘুর ঘুর করছে মধু আর বিধু। বার বার গলির মুখের দিকে ওরা তাকায়, যেখানে বড় রাস্তার এক টুকরো ছবি দেখতে পাওয়া যায়। বড় বড় বাস যায়, ছোট মোটর গাড়ি যায়, আর সাইকেল ও রিক্সা। পথের ভিড়টাও যেন স্রোতের মত গড়িয়ে চলেছে। আজ রেসের দিন। হাঁক দিয়ে, রেসের বই বিক্রি করছে ফেরিওয়ালা ; সেই হাঁকও শোনা যায়।

এগিয়ে আসছে শেখর, দেখতে পায় মধু আর বিধু। সেই মুহূর্তে দুজনে একসঙ্গে ছুটে শেখরের দিকে এগিয়ে যায়, যেন কোন অভিনব বার্তা শোনাবার জন্য এতক্ষণ ধরে এই ভাবে শেখরের আসার আশায় পথের উপর ঘুর ঘুর করছিল ওরা।

মধু বলে—একজন মহিলা তোমার জন্য বসে আছেন, বড়দা।

বিধু বলে—অনেকক্ষণ হলো বসে আছেন।

শেখরের চোখে আতঙ্কের ছায়া শিউরে ওঠে। মধু আর বিধুও বড়দার মুখের ভাব দেখে হঠাৎ অপ্রস্তুতভাবে তাকিয়ে থাকে।

সন্দেহ করে, সুসংবাদটা বোধ হয় ভয়ানক একটা দুঃসংবাদ। নইলে বড়দা অমন ক'রে চমকে উঠবে কেন?

শেখর বলে—মা কোথায়?

মধু—মা ভবানীপুরে দিদির বাড়িতে গিয়েছেন।

শেখর—কেন?

বিধু—অনসূয়াদির বিয়ের কথা শুনতে।

শেখর—বাবা কোথায়?

মধু—অফিসে গিয়েছেন।

শেখর—মহিলা তোমাদের সঙ্গে বোধ হয় অনেক গল্প করেছে?

বিধু—ওঃ, অনেক গল্প!

মধু—আমাকে ভূগোলের বই থেকে কত প্রশ্ন করেছেন, আমি সব ঠিক ঠিক উত্তর দিয়েছি।

শেখর চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কি-যেন ভাবে। তারপরেই দু'চোখের একটা তীব্র দৃষ্টিকে যেন আরও ভয়ানক রকমের তীক্ষ্ণ ক'রে বলে—আমি কি কাজ করি, কত মাইনে পাই, বাবা কি করেন, কত টাকা মাইনে পান, এই সব কথাও নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করেছে?

মধু সন্দিগ্ধ হয়ে, আর একটু ভয় পেয়ে বলে—হ্যাঁ।

বিধু উৎফুল্ল হয়ে বলে—আমি সব ঠিক ঠিক উত্তর দিয়েছি।

সেইরকমই স্তব্ধ হয়ে থমকে থাকে শেখর। তারপর অসার কৌতুকে ধিকৃত নিজের এই ভাগ্যকেই মনে মনে ধিক্কার দিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

বিধু ভয় পেয়ে বলে ওঠে—মহিলা খুব ভাল লোক বড়দা। আমাকে আদর করতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছেন। দু'চোখ থেকে ঝরঝর ক'রে জল ঝরে পড়েছে।

হ্যাঁ, সেই ছল অশ্রুর বিদ্রূপ জোর ক'রে এখানে এসে ঢুকেছে। কি দুঃসাহস! চেঁচিয়ে ওঠে শেখর—কি?

বিধু—হ্যাঁ বড়দা, মহিলা বলেছেন, ভগবান বড় দুষ্টু, নইলে তোমাদের এত কষ্ট দেবে কেন?

শেখর—তোমরাও নিশ্চয় ওর কাছে অনেক বাজে কথা বলেছ?

মধু বলে—আমি বলিনি বড়দা, বিধুই বলে দিয়েছে, বাবা কতবার না খেয়ে অফিসে গিয়েছে, মা'র জ্বরের সময় ওষুধ কেনবার পয়সা ছিল না।

বিধু রাগ ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে।—মহিলাই যে জিজ্ঞাসা করলেন।

স্তব্ধ হয়ে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে শেখর। তারপর কুণ্ঠিতভাবে দরজা ঠেলে বাড়ির ভিতরে চলে যায়।

বারান্দার উপর টুলের উপর বসে বই পড়ছে অবন্তী সরকার। চৈত্রের রোদে ঝলসানো আর ঝড়ে আহত রঙীন পাখীর মত ক্লান্ত বিষণ্ণ ও ছেঁড়া-ছেঁড়া মূর্তি। তবু শেখরকে দেখে সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারে অবন্তী।

অবন্তী বলে—আবার আপনাকে আশ্চর্য ক'রে দিলাম।

শেখর—সত্যি কথা।

অবন্তী—অনসূয়াদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। একটা সুসংবাদও শুনে এলাম।

শেখরের চোখে কৌতূহলের চমক লাগে—কিসের সুসংবাদ?

খিল খিল ক'রে হেসে অবন্তী বলে—অনসূয়ার সঙ্গে নিখিল বিয়ের তারিখও প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছে।

হাসছে অবন্তী। যেন ওর মাথার উপর থেকে ভয়ানক একটা শাস্তির বোঝা নেমে গিয়েছে। বোধহয় একেবারে হালকা হয়ে গিয়েছে অবন্তীর জীবনটাই, তাই অবাধে খিল খিল ক'রে মুক্তির হাসি হাসছে।

শেখর বলে—মধু আর বিধু কি তোমাকে চা খাওয়াবার চেষ্টা করেছে?

অবন্তী হাসে—অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু আমিই রাজি হইনি।

শেখরও হাসে—তাহলে আমি চেষ্টা করি।

অবন্তী—না।

অপ্রসন্নভাবে অবন্তীর মুখের দিকে তাকায় শেখর। দুঃসহ রকমের একটা অস্বস্তিও বোধ করে। এটা এলগিন রোডের ফুটপাত নয়, শেখরেরই গৃহনীড়ের একটি নিভৃত কোণ। এখানে দাঁড়িয়ে অবন্তী সরকারকে কোন সত্য কথা একটু স্পষ্ট ক'রে বলে দিতে হলে শেখরকে এই মুহূর্তে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভদ্র হবার মত শক্তি পেতে হবে। কিন্তু তাও যে সম্ভব নয়।

অবন্তী—আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছেন? নতুন ক'রে কিছু দেখবার নেই।

বলতে গিয়ে অবন্তীর কথাগুলি যেন যন্ত্রণাক্ত স্বরে থর থর করতে থাকে ; এবং শেখরও চমকে ওঠে, হ্যাঁ একটা নতুন জিনিস বটে। অবন্তী সরকারের চোখের দৃষ্টি যেন ক্রুদ্ধ আগুনের শিখার মত জ্বলছে।

অবন্তী বলে—আপনার চিঠি পড়েছি। আপনি মহৎ, আপনি আমার অনুরোধের চক্রান্তে পড়েও সে মহত্ত্বকে একটু খাটো করতে পারেননি। সবই বিশ্বাস করি। আপনি বোকা নন, তাও খুব বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আপনি একটি ভয়ানক...।

শেখর ভ্রূকুটি করে—তুমি অনর্থক রুষ্ট হয়ে...।

অবন্তী—ছি ছি, মানুষ নিজের এরকম সর্বনাশও করে!

শেখর—কার সর্বনাশ হলো?

চেঁচিয়ে ওঠে অবন্তী—তুমি আমার কথার মায়ায় পড়ে কেন নিজের এই দশা করলে?

দু'হাত তুলে মুখ ঢাকা দেয় অবন্তী, আর সারা শরীরটাই যেন ফুঁপিয়ে ওঠে। বুকের ভিতরে গোপন করা একটা গর্বের কৌতুক যেন নিজের ভুলের নিষ্ঠুরতায় ভেঙে চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। অবন্তী সরকারের অন্তরাত্মা অসহ্য যন্ত্রণায় শোণিতাক্ত হয়ে উঠেছে, নইলে চোখের জলে ভিজে যায় কেন অবন্তী সরকারের দুই হাত?

আশ্চর্য হয় শেখর—কি হলো অবন্তী?

অবন্তী—মাপ কর শেখর ; আমি কোন দিন কোন স্বপ্নেও বিশ্বাস করতে পারিনি যে, অবন্তী সরকারের মত একটা মেয়ের জন্য একটা মানুষ অনর্থক এই ভয়ানক শাস্তি নিজেকে দিতে পারে। তুমি যে বুকের রক্ত উপহার দিয়ে আমাকে ভালবেসেছ শেখর।

শেখর বিব্রতভাবে বলে—তুমি একটু বাড়িয়ে ভাবছো অবন্তী।

অবন্তী—নিজের ভাগ্য বলি দিয়ে আমাকে সুখের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে, তুমি উপোস করেছ, নিজের বাপ-মা-ভাইদের সুখের আশা ছিঁড়ে তাদেরও উপোস করিয়েছ...ছি ছি ছি, এরকম একটা পাপও মানুষে করে! আমার কাশীপুরের গলির সেই ত্রিশ টাকার ভাড়াটে বাড়ি যে তোমার এই বাড়ির চেয়ে অনেক বড়লোক ছিল।

অবন্তীর কথার জ্বালাটা শেখরের মনের ভিতরে গিয়ে একটা প্রদাহ ছড়ায় ; অস্বীকার করে না শেখর, কথাটা মিথ্যে বলেনি অবন্তী।

চোখ মোছে অবন্তী—রাগ করো না। আমি জানি, তুমি কেন এই ভুল করলে?

শেখর—কেন?

অবন্তী—আমাকে ভালবাসবার ভুলে।

শেখর—তা সত্যি। কিন্তু...।

—আর কোন কিন্তু নেই শেখর। আস্তে আস্তে শেখরের কাছে এগিয়ে আসে অবন্তী। মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। অবন্তী বোধহয় বুঝতেও পারে না যে, শেখরের একেবারে বুকের কাছে এসে সে দাঁড়িয়েছে। মেঝের দিকে তাকিয়ে কি দেখতে থাকে অবন্তী, তা সে-ই জানে।

শেখর বিব্রতভাবে ডাকে—অবন্তী।

অবন্তী—তোমার এই ডাক শুনেই চলে যাব শেখর। আর কিছু বলো না।

শেখরের চোখ করুণ হয়ে ওঠে—কেন?

অবন্তী—আজ বোধহয় তোমাকে ভালবাসার মত মন পেয়েছি।

অবন্তীর হাত ধরে শেখর। হেঁট মাথা না তুলে আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নেয় অবন্তী।—কিন্তু তুমি আবার ভুল ক'রে আমাকে বিশ্বাস করো না শেখর।

অবন্তীর হেঁট মাথা দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে শেখর। অবন্তী বলে—ভুল করো না।

অবন্তীর এই আত্মধিক্কারের ভাষাকেই অবিশ্বাস ক'রে শেখরের চোখে মুখে আর দুই হাতের আগ্রহে যেন বিপুল এক বিশ্বাসের ঝড় উথলে উঠতে চাইছে। অবন্তীর মুখটাকে তুলে ধরতে চায় শেখর।

—না শেখর। ক্ষমা কর।

জোর ক'রে মুখ নামিয়ে নেয় অবন্তী। দু'পা পিছনে সরে গিয়ে শান্ত ভাবে বলে—পারবো না শেখর। আমার মাথা বড় বেশি হেঁট ক'রে দিয়েছ তুমি। তুমি বড় বেশি মহৎ। তুমি অবন্তীর সব দোষ ভুলে গিয়ে কাছে টানছো, সে তোমার দয়া।

শেখর—তোমার ভুল সন্দেহ অবন্তী।

অবন্তী হাসে—না শেখর, সত্যিই তোমার ভালবাসাকে একটা মস্ত বড় দয়া বলে মনে হচ্ছে। আমার সব অহংকার মিথ্যে করে দিয়ে তোমার দয়া নিতে পারবো না।

শেখর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, পাঁচিলের বাইরে ঐ মাঠের গাছগুলির ভিড় থেকে আরও দূরে এক ফালি খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।—আমার আর কিছু বলবার নেই অবন্তী।

অবন্তী—আমি নিজেকেই সন্দেহ করছি শেখর, তোমাকে নয়। এত সস্তায়, বলতে গেলে বিনা দামে তোমার কাছ থেকে এত দামী জিনিস পেতে চাই না শেখর। অথচ, দাম দেবার সামর্থ্যও নেই তোমার ক্ষতি হবে এই আমার ভয়। তাই...।

আর কোন কথা বলে না অবন্তী। বারান্দা থেকে আস্তে আস্তে নেমে পড়ে। দেখতে পায় শেখর, সেই এক ফালি আকাশের উপর দিয়ে সরু সরু মেঘের কতকগুলি রেখা ভেসে যাচ্ছে। একেবারে সাদা, তুলোব মত হালকা কতকগুলি মেঘের রেখা।

২৬

জেনারেল ম্যানেজার বলেন—বিলেত যাবেন মিস সরকার?

অবন্তী হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে।—এই প্রশ্ন কেন করছেন স্যার? বিলেত যাবার টাকা কোথায় পাব?

হেসে ফেলেন জেনারেল ম্যানেজার—আমি চেষ্টা করলে পাবেন না কেন? কোম্পানিই খরচ দেবে। রাজি থাকেন তো বলুন।

অবন্তী—কোম্পানির কোন কাজে বিলেত যেতে হবে?

জেনারেল ম্যানেজার জোরে হেসে মাথা দোলাতে থাকে।—নো মিস, নো। আপনার নিজের কাজে।

অবন্তী—কোন কাজ শিখতে হবে?

জেনারেল ম্যানেজার—কিচ্ছু না।

অবন্তী—তা হলে?

জেনারেল ম্যানেজার—আমি যাব লণ্ডনে। ছ'টি মাস থাকবো। আমার সেক্রেটারি হয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।

চুপ ক'রে নিজের মনের বিস্ময় ছিন্নভিন্ন ক'রে বুঝতে চেষ্টা করে অবন্তী। আজ হঠাৎ জেনারেল ম্যানেজার বিশেষ এক জরুরি কাজে অবন্তীকে তাঁর প্রাইভেট কেবিনে আহ্বান করেছেন। আজ অফিসে এসেই টাইপিস্ট চারুবাবুর গম্ভীর কথাগুলির ভাষা বুঝতে পেরেছে অবন্তী, জেনারেল ম্যানেজার সকাল আটটায় অফিসে এসেছেন, কিন্তু কোন ফাইল স্পর্শও করেননি। সেই সকাল আটটা থেকে তাঁর প্রাইভেট কেবিনে সোফার উপর এলিয়ে পড়ে আছেন। এখন স্বচক্ষেই দেখতে পায় অবন্তী, ঠিকই, জেনারেল ম্যানেজার জুতো সুদ্ধ পা সোফার উপর তুলে দিয়ে এলিয়ে বসে আছেন ; শরীরটাকে যেন অর্ধেক গড়িয়ে দিয়েছেন।

জেনারেল ম্যানেজার বলেন—এখন আপনি কত পাচ্ছেন?

অবন্তী—তিনশো ষাট।

জেনারেল ম্যানেজার—এক হাজার পেলে খুশি হবেন?

চমকে ওঠে অবন্তী সরকার—খুশি কেন হব না স্যার, কিন্তু কাজটা করতে পারবো কিনা বুঝতে পারছি না।

চেঁচিয়ে হেসে ফেলেন ম্যানেজার। তার পরেই ফিসফিস ক'রে বলেন—কাজ করতে বলছে কে আপনাকে?

অবন্তী—আপনিই যে বললেন, সেক্রেটারির কাজ করতে হবে।

জেনারেল ম্যানেজার—তার মানেই হলো না কাজ। আপনি বড় বেশি ইন্‌নোসেণ্ট মিস সরকার।

অবন্তী—মাপ করবেন আমাকে।

জেনারেল ম্যানেজার আশ্চর্য হন—আপনি কি সত্যিই কোনরকম সন্দেহ করছেন?

অবন্তী—হ্যাঁ, সন্দেহ হচ্ছে, মিছিমিছি বিলেত ঘুরে বেড়াতে পারবো না।

জেনারেল ম্যানেজার—তা হলে একটা কাজ নিয়েই বিলেত যান। আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

অবন্তী—এ বিষয়ে আমার বাবার সঙ্গে আলোচনা না ক'রে আমি কিছু বলতে পারবো না স্যার।

জেনারেল ম্যানেজার—আপনার বাবাকে বলবেন যে...।

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে অবন্তীর মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকেন জেনারেল ম্যানেজার। যেন অবন্তীর কালো চোখের ছায়া-ছায়া রহস্যের মায়াময় শোভার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন। অবন্তীর কপালের উপর বিন্দু বিন্দু ঘামের ফোঁটা হঠাৎ ফুটে উঠে চিকচিক করে।

জেনারেল ম্যানেজার—আপনার বাবাকে বলবেন যে, তাঁর মেয়েকে আন্তরিক ভালবাসে এমন এক ব্যক্তি তার উপকার করতে চায়।...আমি অনেক দিন থেকে...যেদিন প্রথম তোমাকে দেখেছি অবন্তী, সেদিন থেকেই তোমার কোন উপকার করবার জন্য স্বপ্ন দেখছি।

—এ কি বলছেন আপনি? শঙ্কিত হয়ে জেনারেল ম্যানেজারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অবন্তী।

—হ্যাঁ অবন্তী, আমি চাই না যে, তোমার মত মেয়ে তিনশো ষাট টাকা মাইনেতে বিজ্ঞাপন লেখার কাজ নিয়ে এখানে পড়ে থাকবে। পাবলিসিটি সুপারভাইজার নামে একটা নতুন পোস্ট আমি তৈরী করেছি। তুমি বিলেত-টিলেত না গিয়েও এই পোস্টে কাজ করতে পার।

—এ কাজটাই বা কেমন কাজ, আমি এ কাজ করতে পারবো কিনা, কিছুই বুঝতে পারছি না স্যার।

—আবার বুঝতে ভুল করলে অবন্তী সরকার। আমি তোমার জন্যেই এই পোস্ট তৈরী

করেছি। বলতে গেলে কোন কাজ করতেই হবে না, তারই নাম সুপারভাইজারের কাজ। ডিপার্টমেন্টের অন্য লোকগুলোর ভুল-টুল ধরে মাঝে মাঝে এক আধটা হৈ-হুল্লোড় করলেই হয়ে গেল। মাইনে ছ'শো টাকা।

--এই কাজটা নিয়ে শেষে কোন বিপদে পড়তে না হয় স্যার।

--বিপদ? আমি থাকতে তোমার বিপদ? তুমি আমাকে চিনতেই পারলে না অবন্তী সরকার।

--ঠিক আছে স্যার। আমি কাজটা নেব। আপনার কাছে কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো...।

--ছিঃ অবন্তী সরকার, আমি তোমার কৃতজ্ঞতার ক্যানডিডেট নই। আমি..আমি তোমারই ক্যানডিডেট।

--কি বললেন?

--খুব স্পষ্ট করে বলে ফেলেছি অবন্তী। তুমি বোধহয় জান না যে, আমি একটা হতভাগ্য। আমার ছাব্বিশ বছর বয়সে আমার স্ত্রী আমাকে এই পৃথিবীতে একলা ছেড়ে দিয়ে অন্য জগতে চলে গিয়েছে। আজ আমার বয়স একচল্লিশ। এই পনের বছরের ইতিহাসে এমন একটা সুযোগও পেলাম না যে, কাউকে ভালবেসে সুখী হই। ভালবাসবার মত একটা মুখই দেখতে পাইনি। হ্যাঁ, জোর ক'রে বলবো, আজ দেখতে পেয়েছি। সে মুখ হলো তোমার মুখটি।

--স্যার।

--সন্দেহ করো না অবন্তী। আমার টাকার অভাব নেই। আমার ক্ষমতার অভাব নেই। তোমাকে সুখী করবার মত আর একটি জিনিস আমার আছে...আমার এই হার্ট। জানি, লোকে আড়ালে আড়ালে হেসে হেসে নিন্দে করবে, দি এগ্রি-মেশিনারি লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার কিনা অফিসের একটা মেয়ে-কেরানিকে বিয়ে করলো। কিন্তু সেই নিন্দেকে আমি সোনার মুকুটের মত মাথায় তুলে নেব অবন্তী।

--মাপ করবেন স্যার।

--না, মাপ করতে পারবো না। জেনারেল ম্যানেজারের চোখ ধকধক করতে থাকে।

অবন্তী--মাপ করতেই হবে ; আমাকে আর ওসব কথা বলবেন না।

জেনারেল ম্যানেজার কিছুক্ষণ চোখ ছোট ছোট ক'রে অবন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর বলেন--মাপ করতে পারি, সত্যি প্রাণ খুলে মাপ ক'রে তোমাকেই টাকা-পয়সায় সুখী ক'রে দিতে পারি, যদি তুমি...তুমি নিশ্চয় আমার কথাগুলির অর্থ বুঝতে পারছো অবন্তী।

জেনারেল ম্যানেজার হঠাৎ তাঁর অলস শরীরটাকে মোচড় দিয়ে টান হয়ে উঠে দাঁড়ান। অবন্তীর দিকে যেন একটা ঝাঁপ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে অবন্তীর একটা হাত ধরে ফেলেন।--এমন কিছুই দাবি নয় অবন্তী। অফিস ছুটির পর সন্ধ্যেবেলা শুধু আমার সঙ্গে বান্ধবীর মত একটু বেড়িয়ে আসা, সপ্তাহে একটা দুটো সন্ধ্যা শুধু কোন একটা ভাল বারে বসে একটু ড্রিংক, কিংবা কোন ভাল ছবি দেখতে...।

হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে অবন্তী। কিন্তু জেনারেল ম্যানেজার যেন বাঘের থাবার মত কঠোর আগ্রহে অবন্তীর হাতটাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। অবন্তীর মুখের উপর জেনারেল ম্যানেজারের হাপরের মত বুকটার ভিতর থেকে নিঃশ্বাসের বাতাস থেকে থেকে দমক দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই নিঃশ্বাসের বাতাস মদের গন্ধের ঝাঁজে উগ্র হয়ে রয়েছে।

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অবন্তী বলে--হাত ছেড়ে দিন, আমাকে যেতে দিন।

জেনারেল ম্যানেজার--কথা দিয়ে যাও।

অবন্তী--কোন কথা নেই! আমাকে অপমান করবেন না।

জেনারেল ম্যানেজার--লাইফের এত বড় প্রসপেক্ট নষ্ট করো না মিস অবন্তী সরকার।

অবন্তী ভ্রূকুটি করে--প্রসপেক্ট?

জেনারেল ম্যানেজার--হ্যাঁ, শুধু সন্ধ্যেবেলা আমার সঙ্গে এক দুই ঘণ্টার মত বন্ধু হবে, তার জন্য তুমি প্রতি সন্ধ্যার ফী হিসাবে আমার কাছ থেকে নগদ নগদ পঞ্চাশ টাকা পাবে। অন্য ফূর্তির সব খরচ আমার। বল?

কোন উত্তর দেয় না অবন্তী। অবন্তীর সেই কালো চোখের বুদ্ধির দীপ্তি যেন হিংস্র হয়ে জ্বলতে থাকে।

অবন্তী বলে--হাত ছাড়ুন, আমি উত্তর দিচ্ছি।

অবন্তীর হাত ছেড়ে দিয়ে আবার সোফার উপর এলিয়ে পড়েন জেনারেল ম্যানেজার, এবং দেরাজ খুলে গেলাস বের করেন।

অবন্তী বলে--আমি চলি।

চেঁচিয়ে ওঠেন জেনারেল ম্যানেজার--পঞ্চাশ নয়, একশো টাকা ক'রে দেব মিস সরকার। প্রতি সন্ধ্যায় একশো টাকা। থিংক অব ইট।

অবন্তী--আপনার মাইনে তো মাসে আড়াই হাজার টাকা। সন্ধ্যা বেলার ফূর্তির জন্য এত টাকা, এরকম হাজার হাজার টাকা কোথা থেকে পাবেন?

জেনারেল ম্যানেজারের চোখ মুখ একসঙ্গে হেসে ওঠে।--তাই বল। তোমার সন্দেহ হয়েছে, আমি এত টাকা পাব কোথায়? তাই না? অবন্তী--হ্যাঁ।

জেনারেল ম্যানেজার--মহামান্য সরকার উদার হস্তে কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে এই হতভাগা কোম্পানিকে সাহায্য করেছেন। কোম্পানির ভাগ্যের জন্য আই কেয়ার এ ব্র্যাস পেনি। আপাতত টাকাগুলো নিয়ে আমি নিজেকেই ইচ্ছামত সাহায্য করছি...তুমি আর কত পেলে খুশি হবে গুড গার্ল?

জেনারেল ম্যানেজারের এই অভিশপ্ত প্রাইভেট কেবিনের দরজার পর্দাটার দিকে একবার তাকায় অবন্তী সরকার। তার পরেই, চতুর পাখির মত যেন ডানার ঝাপটের মত একটা শব্দ ছড়িয়ে এক নিমেষে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে যায়।

২৭

রতনবাবুর ছেলে পাস করেছে, বেশ ভাল মার্ক পেয়ে পাস করেছে। বড় খুশি হয়ে রতনবাবু তাঁর এলগিন রোডের প্রকাণ্ড বাড়ির বাগানে পায়চারি করছিলেন, এবং মনে মনে ধন্যবাদ জানাচ্ছিলেন, শেখর নামে সেই ইয়ং ম্যানকে, তাঁর ছেলের টিউটর শেখর মিত্রকে।

শেখরকেই সাক্ষাতে একটা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন রতনবাবু। নইলে, এতক্ষণে তিনি শালকিয়াতে তাঁর কারখানায় চলে যেতেন।

শেখরও আসতে দেরি করেনি। এবং শেখরকে দেখতে পেয়েই এগিয়ে এসে মহা খুশির আবেগে বিহ্বল হয়ে কোলাকুলি করলেন রতনবাবু।--তোমার জন্যই, তুমি এত ভাল ক'রে পড়িয়েছ বলেই ছেলেটা পাস করতে পেরেছে শেখর।

শেখর হাসে--আমার ছাত্রও বেশ ইন্টেলিজেন্ট, কাকাবাবু।

রতনবাবু--যাই হোক, আমি কিন্তু তোমার ছাত্রের কাছ থেকে কতকগুলো খবর জানতে পেরে বড় দুঃখিত হয়েছি।

শেখর--কি?

রতনবাবু--তুমি নাকি আজকাল তিন জায়গায় ছেলে পড়াতে শুরু করেছ?

শেখর--হ্যাঁ, এতে দুঃখিত হচ্ছেন কেন কাকাবাবু?

রতনবাবু--তোমার মত এত ব্রিলিয়েন্ট স্কলার শুধু কয়েকটা ছেলে পড়িয়ে দিন পার ক'রে দেবে, ভাবতে আমার বেশ খারাপই লাগছে শেখর।

শেখর--উপায় নেই, তাই বাধ্য হয়ে...।

রতনবাবু--আমি তাই ভেবে দেখেছি, আর আমাদের দেবকীবাবুকে বলেও রেখেছি। তাঁর কেমিক্যাল ওয়ার্কসের লেবরেটরিতে অ্যাসিস্টেন্ট রিসার্চ অফিসার হিসাবে তোমাকে নিতে তিনি রাজি হয়েছেন। শ'তিনেক টাকা মাইনে, ভবিষ্যতে উন্নতিও আছে।

শেখর--আপনার শুভেচ্ছাই যথেষ্ট কাকাবাবু, কিন্তু আপনি আমার জন্য চাকরির চেষ্টা করবেন না।

রতনবাবু--কেন?

শেখর--চাকরি করবার মত আর মন নেই।

রতনবাবু--তাই বা কেন?

শেখর--কেউ যোগ্যতার বিচার করে না কাকাবাবু। কেউ দয়া ক'রে চাকরি দিতে চায়, কেউ বা ঘুস আশা ক'রে চাকরি দিতে চায়। ঐ দুই সর্তের একটিও স্বীকার করবার সামর্থ্য আমার নেই।

রতনবাবু--ঘুসের কথা ছেড়ে দাও, লোকের দয়ার উপর এত ঘৃণা কেন?

শেখর--যোগ্যতার সম্মান না ক'রে দয়া করা মানে অপমান করা। এইরকম দুটো চাকরি অবশ্য পেয়েছিলাম। চাকরি দেবার কর্তারা আমার আবেদন ভেরি কাইণ্ডলি কনসিডার ক'রে ইণ্টারভিউ মঞ্জুর করেছিলেন। ভাগ্যি ভাল যে সে দুটো চাকরিও ভাগ্যে জোটেনি।

রতনবাবু--অদ্ভুত কথা।

শেখর--তা ছাড়া, গত মাসেও একটা চাকরি পেয়েছিলাম। আড়াইশো টাকা মাইনের একটা চাকরি। সাতটা দিন কাজও করেছিলাম। কিন্তু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন যে, তাঁর মেয়ের বিয়ের জন্য ফার্নিচার কিনতে একটি হাজার টাকা চাই। এক মাসের মধ্যেই দিতে হবে, নইলে...।

রতনবাবু--নইলে কি?

শেখর--নইলে তিনি ঐ পোস্টে আরও ভাল লোক নেবার জন্য চেষ্টা করবেন।

হেসে ওঠেন রতনবাবু--এই সামান্য একটা ব্যাপার দেখে তুমি ঘাবড়ে গেলে কেন শেখর? সর্বত্র এই তো নিয়ম। টাকা না ছিল, আমার কাছে চাইলেই পারতে, আমি তোমাকে টাকাটা ধার বাবদ দিতাম।

শেখর--সে কথা মনেই হয়নি কাকাবাবু। বরং চাকরিটাকে ঘেন্না করতেই ভাল লাগলো। সেদিনই ছেড়ে দিয়ে হাঁপ ছাড়লাম।

রতনবাবু শুকনো দৃষ্টি তুলে তাকান--তোমার কথাগুলি একটু দাম্ভিক দাম্ভিক হয়ে যাচ্ছে না কি শেখর?

শেখর--আপনি ঠিকই বলেছে কাকাবাবু, ঐরকমই মনে হয়। যে নিজেকে যথেচ্ছ অসম্মান করতে পারে, লোকে তাকে বিনয়ী বলে মনে করে।

রতনবাবু--তাহলে ছেলে পড়িয়েই জীবন কাটাবে?

শেখর--হ্যাঁ, আর ম্যাথমেটিকস্ নিয়ে রিসার্চ করবো, সেটা কারও দয়া না পেয়েও চালিয়ে যেতে পারবো।

রতনবাবু--অর্থাৎ জীবন সংগ্রামে তুমি ভয় পেয়ে, পিছিয়ে গিয়ে, লুকিয়ে থাকতে চাইছো। তুমি আধুনিক যুগের উপযোগী নও শেখর।

শেখর হাসে--আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না কাকাবাবু।

ড্রাইভারকে গাড়ি বের করবার নির্দেশ দিয়ে রতনবাবু গম্ভীর ভাবে বলেন--যাই হোক, আই উইশ ইওর সাক্‌সেস।

রতনবাবু চলে যাবার পর ছাত্রের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আবার পথের উপর এসে কৃষ্ণচূড়ার মাথার উপর রোদ আর রঙের খেলা দেখতে দেখতে চলতে থাকে শেখর। সাকসেস? কে জানে ঐ অদ্ভুত কথাটার অর্থ কি? রতন কাকাবাবু কাকে সাকসেস বললেন, তা তিনিই জানেন। শেখর শুধু জানে যে, তার জীবনের সব আক্ষেপ মিটে গিয়েছে। অভিযোগগুলিও যেন বেদনা হারিয়ে ফেলেছে। দিন চলে যাচ্ছে। বেশ ভাল ভাবেই চলে যাচ্ছে। আর বুকের ভিতরেও যেন সোনালি রোদে ঝলমল লাল কৃষ্ণচূড়ার রং-এ ভরে গিয়েছে।

তিন বেলা তিন বাড়িতে ছাত্র পড়িয়ে যে টাকা পাওয়া যায়, সেটা যথেষ্ট কি অযথেষ্ট, তার বিচার করতেই ইচ্ছা হয় না। শেখর জানে যে, বাবা আজ তাঁর অনেকদিনের পুরনো একটা শখের কথা বলা মাত্র সেই শখের দাবি পূর্ণ করে দিতে পেরেছে শেখর। একটা সাদা শাল গায়ে দেবার শখ ছিল অনাদিবাবুর। এই পঞ্চাশ ষাট বা আশি টাকার মধ্যে একটা সাদা শাল। সেই শাল গায়ে দিয়ে পৌষের সকালে পার্কের আশেপাশে বেড়াতে ইচ্ছা করে অনাদিবাবুর। তাঁর সেই ইচ্ছা এতদিনে সফল হয়েছে। শেখর মনে করে, এই তো সাকসেস। একটা সামান্য বস্তুর কাছ থেকে অসামান্য প্রসন্নতা পেয়ে যাবার মত মনকে পাওয়া।

নিজেকেও অসামান্য মনে হয়? হ্যাঁ, হোক না দম্ভ। এমন দম্ভ ছাড়া জীবনটা খুশিই বা হবে কেন? শেখরের বুকের ভিতরে যে পরিপূর্ণতার আনন্দ টলমল করে, এবং সেটা যে শেখরের জীবনের এক জয়ী ভালবাসার দম্ভ! চলে গিয়েছে, সরে গিয়েছে অবন্তী। মাসের পর মাস পার হয়ে গিয়েছে, পৃথিবীর কোথাও অবন্তীকে এক মুহূর্তের জন্যও চোখে দেখতে পায়নি শেখর। অবন্তীর নামটাও কোথাও উচ্চারিত হতে শোনেনি। অবন্তীর গল্প কারও মুখে ধ্বনিত হয়নি। ভাবতে একটু অদ্ভুতই মনে হয়। অবন্তী শেখরকে ভালবেসেছে, তাই সরে গেল অবন্তী। শেখর অবন্তীকে ভালবেসেছে, অবন্তীকে তাই ধরে রাখতে পারলো না শেখর। ভালবাসার বন্ধন চরম ক'রে দেবার জন্য চরম ছাড়াছাড়িই শেষে সত্য হয়ে উঠলো। অদ্ভুত বটে! কিন্তু কি আশ্চর্য, মনে হয় শেখরের, শুধু মাঝ রাতের স্বপ্নছড়ানো ঘুমের মধ্যে নয়, এই জেগে থাকা কর্মকোলাহলের প্রতি মুহূর্তের ব্যস্ততার মধ্যে অবন্তী যেন শেখরের বুকের কাছে ঘুরছে অবন্তীর খোঁপার সৌরভ নিজের নিঃশ্বাসের মধ্যেই যেন অনুভব করতে পারা যায়।

অবন্তীর হেঁট মাথা তুলে ধরতে, আর সেই কালো চোখের রহস্যের উপর ভালবাসার একটি তপ্ত ও সিক্ত স্পর্শ চিহ্নিত ক'রে দিতে চেয়েছিল শেখর। কিন্তু রাজি হয়নি অবন্তী, সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি। দম্ভ আছে অবন্তীরও। বেশ তো। এমন দম্ভ অবন্তীর মত মেয়েকেই যে সবচেয়ে ভাল মানায়। ভালই করেছে অবন্তী।

এই তো প্রভাদের বাড়ি। হেঁটে হেঁটে অনেক দূর চলে এসেছে শেখর। ভবানীপুরের প্রভাদের বাড়ির কাছে এসে পড়েছে। এখানেই আজ একবার আসবার কথা ছিল। প্রভা লিখেছে, অনসূয়া আজ শ্বশুরবাড়ি থেকে এখানে আসবে। তুমি এস একবার। বিয়ের দিন তুমি আসতে পারনি বলে বাড়ির সবাই দুঃখিত।

দুঃখিত হবারই কথা। প্রভাদের বাড়ির কেউ যে জানে না, অনসূয়ার বিয়ের দিন শেখরকে বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত সময়টা একটা চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতেই পার ক'রে দিতে হয়েছিল।

শেখর বাড়িতে ঢুকতেই প্রভা চেঁচিয়ে হেসে ওঠে। অনসূয়া এসেছে দাদা।

শেখর—সস্বামিক এসেছে, না একা?

প্রভা—ঐ যে, তোমার কথা শুনেই এসে পড়েছে।

শেখরকে প্রণাম ক'রে অনসূয়া লজ্জিতভাবে হাসে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সাদা মনের মানুষ অনসূয়া ভালবাসাবাসির নামে ঝঞ্ঝাটের কোন ধার না ধেরেও সুখী হয়েছে। ওর মুখের ঐ স্বচ্ছ সুন্দর লাজুক হাসিই বলছে যে...।

শেখরের ধারণাকে প্রভাই চেঁচিয়ে ঘোষণা ক'রে দেয়।--আজ কাল আর অনসূয়া বলে না যে, না জেনে শুনে বিয়ে করতে নেই।

প্রভার দিকে তাকিয়ে শেখর হাসে--তাই নাকি ম্যাডাম?

অনসূয়া বলে--আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার। কিন্তু আপনি যে জেনে শুনেও...। অনসূয়াই যেন হঠাৎ সাবধান হয়ে গিয়ে কথাটা আর শেষ করে না। কিন্তু সেই অসমাপ্ত কথার অর্থটা যেন শেখরের বুকের ভিতরে গিয়ে চৈতী ঝড়ের মত মাতামাতি করতে থাকে।

চা আনতে চলে যায় প্রভা, এবং অনসূয়ার চোখের একটা ধূর্ত ইঙ্গিত লক্ষ্য ক'রে সেই মুহূর্তে ভিতরের ঘর থেকে এই ঘরে এসে প্রবেশ করে যে, যে হলো নিখিল মজুমদার।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে নিখিল--আপনার বোনের ননদের এখন ধারণা হয়েছে যে, বিয়ের পরেই চেনা-জানা হওয়া ভাল। সুতরাং আমিও আমার যত গল্প...।

নিখিলের দিকে তাকিয়ে ভ্রূভঙ্গী ক'রে অনসূয়া বলে--চুপ কর তুমি। অত কথা, আর শুধু নিজের কথা না বললেও চলবে।

কিন্তু অনসূয়ার বাধাকে তুচ্ছ ক'রে এবং আরও মুখর হয়ে নিখিল যেন নিজের মনের আবেগে বলতে থাকে।--আমি অনসূয়াকে না বলে থাকতে পারিনি। সবই বলে দিয়েছি। আমি যে কি পদার্থ, সেটা অনসূয়া ভাল করেই জানতে পেরেছে। কাজেই অনসূয়ার মনে না জানা-শোনার ভয় আর নেই শেখরবাবু।

অনসূয়া আবার বাধা দেয়--আঃ, থাম বলছি।

অনসূয়া আর নিখিলের চোখে-চোখে যেন একটা নীরব চক্রান্তের ইশারা ছুটাছুটি করে। জানে না, কল্পনাও করতে পারে না শেখর, এই চক্রান্তের মধ্যে প্রভাও আছে। আজ এই ঘরের মধ্যে শেখরকে বিশেষ একটি অনুরোধের মায়া দিয়ে ঘিরে ধরবার, এবং শেখরের উদাস মনটাকে বিচলিত করবার জন্য একটি চক্রান্ত আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল, তাই প্রভাও যথাসময়ে চিঠি দিয়ে শেখর মিত্রকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে।

অনসূয়া বলে--আপনি তো এই ভদ্রলোকের আর আমার অনেক উপকার করলেন, কিন্তু এইবার নিজের উপকার একটু করুন।

নিখিল--আমিও তাই বলি।

শেখর বিস্মিত হয়--কি বলছেন, বুঝলাম না।

নিখিলের মুখের হাসি যেন একটা হঠাৎ বেদনায় গম্ভীর হয়ে যায়।--আপনি বিশ্বাস করুন শেখরবাবু, আমি আর অনসূয়া দু'জনেই দুঃখিত, আমরা সত্যিই সহ্য করতে পারছি না যে, আপনি এখনও এরকম একা-একা...।

হেসে ওঠে শেখর--এইবার বুঝলাম, কেন প্রভা আমাকে আসবার জন্য চিঠি দিয়েছে, আর কেনই বা আমার বোনের ননদ আর নন্দাই দু'জনে মিলে এখানে আমাকে বেশ একটু কর্নার ক'রে...।

অনসূয়া--ঠিকই সন্দেহ করেছেন আপনি। কিন্তু আজ আর রেহাই পাবেন না।

শেখর--বল, কি করতে হবে?

অনসূয়া--বলতে হবে।

শেখর--কি?

অনসূয়া--অবন্তীকে আপনি বিয়ে করবেন।

শেখর গম্ভীর হয়।--তুমি সত্যিই না জেনে শুনে, অর্থাৎ কোন খবর জান না বলেই হঠাৎ

এরকম অনুরোধ করতে পারছো অনসূয়া।

অনসূয়া মুখ টিপে হাসে—সব খবর জানি। আপনার গম্ভীর মুখটাকে আর আমি বিশ্বাস করি না।

শেখর আশ্চর্য হয়।—কি জান?

অনসূয়া—জানি যে, অবন্তীর ওপর এত রাগ ক'রে থাকা আপনার আর সাজে না।

শেখর—আমি রাগ করেছি?

অনসূয়া—তা ছাড়া আর কি? আমরা কি কোন খবর রাখি না ভাবছেন? অবন্তী বেচারা আকুল হয়ে ছুটে গিয়েছে আপনার কাছে, আপনারই বাড়িতে, তবু আপনার অভিমান ভাঙলো না?

শেখর—ভুল বুঝেছ অনসূয়া, অবন্তীর ওপর আমার কোন অভিমান নেই।

নিখিল বিষণ্ণভাবে বলে—এবং যদি কোন সন্দেহ থেকে থাকে যে...।

শেখর—অবন্তীর মন আমি জানি, আমার কোন সন্দেহ নেই নিখিলবাবু।

অনসূয়া—অবন্তী আপনাকে মনেপ্রাণে শ্রদ্ধা করে।

নিখিল—ভালবাসেও।

শেখর আনমনার মত বিড়বিড় করে।—আমি তাই বিশ্বাস করি, কিন্তু অবন্তী নিজেই বিশ্বাস করে না।

নিখিল আর অনসূয়ার চোখে চোখে ইশারার চক্রান্ত হঠাৎ করুণ হয়ে যায় ; দুজনেরই কল্পনার উল্লাস হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। কি অদ্ভুত আর কি জটিল একটা মনের অভিশাপে পড়েছে অবন্তী সরকারের জীবনটা। নিজেরই ভালবাসবার আকুলতাকে বিশ্বাস করে না? তবে শেখর মিত্রের বাড়িতে কেন সেদিন ওরকম পাগলের মত অস্থির হয়ে ছুটে গিয়েছিল?

অনসূয়া ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে—কি বলতে চায় অবন্তী।

শেখর—বলতে চায়, আমি রাজি হলেও সে রাজি হতে পারে না?

অনসূয়া—কি আশ্চর্য!

শেখর হাসে—আশ্চর্য হবার কিছু নেই অনসূয়া। অবন্তী কারও কাছে মাথা হেঁট করতে পারে না।

অনসূয়া—আপনাকে বিয়ে করলে অবন্তীর মাথা হেঁট হয়ে যাবে?

শেখর—না, ঠিক তা নয়। আমার কাছে মাথা হেঁট করতে হয়েছে, তাই আমাকে বিয়ে করতে রাজি নয় অবন্তী।

অনসূয়া—অদ্ভুত অহংকার।

শেখর আবার হাসে—তা বটে ; কিন্তু মন্দ কি?

প্রভা চা নিয়ে আসে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ঘরের ভিতর পায়চারি করে ঘুরতে থাকে শেখর। ঘরের গম্ভীরতা দেখে প্রভার মুখের হাসিও নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

—চলি এবার। ছোট্ট একটা কথা বলে শেখর মিত্র ঘরের দরজা পার হয়ে চলে যেতেই নিখিল বলে ওঠে।—বুঝলাম, ইচ্ছে করে নিজেকে ভয়ানক শাস্তি দিল অবন্তী।

২৮

পার্ক সার্কসের একটি নতুন বাড়ির ফ্ল্যাটের একটি সাজানো ঘরের দরজা থেকে চলে গেল যে লোকটা, সে হলো মিশন রো'র সেই অফিসের আরদালি। যাবার সময় আরদালি বলে গেল।—সাহেব বলেছেন, আপনার যদি কিছু বলবার থাকে, তবে আলিপুরে সাহেবের বাড়িতে গিয়ে বলে আসবেন।

অবন্তী বলে--ঠিক আছে, তুমি যাও।

আরদালি বলে--সাহেব আমাকে জানতে বলে দিয়েছেন, আপনি যাবেন কি না, আর গেলে কখন যাবেন?

অবন্তী বলে--সাহেবকে বলে দিও, আমি যাব না, তার কাছে গিয়ে কোন কথা বলবার দরকার আছে বলে মনে করি না।

--বহুত আচ্ছা। চলে যায় আরদালি।

অফিসের চিঠিটা অবন্তীর হাতেই ছিল, আর ছিল একটি চেক। চিঠিটা হলো, অবন্তী সরকারের চাকরি খতম ক'রে দিয়ে একটা রিগ্রেটের চিঠি। আর চেকটা হলো অতিরিক্ত এক মাসের মাইনে। চিঠিতে জেনারেল ম্যানেজারের সই। কোম্পানি সিদ্ধান্ত করেছে যে, পাবলিসিটি অফিসার নামে একটা পোস্ট রাখবার আর কোন দরকার নেই।

সুন্দর ক'রে সাজানো ঘরের চারদিকে একবার তাকায় অবন্তী। কালো চোখের তারা দুটো জ্বলতে থাকে। গম্ভীর মুখটা ধীরে ধীরে কঠোর হয়ে উঠতে থাকে। তার পরেই চোখ জুড়ে একটা শান্ত স্নিগ্ধতা থমথম করতে থাকে। যেন এতদিনে অবন্তীর মাথার উপর একটা দুর্লভ আশীর্বাদের ধারা হঠাৎ ঝরে পড়েছে।

আর মনে হয়, একটা ফাঁকির প্রাসাদ ধুলো হয়ে ঝরে পড়লো এতদিনে। ভালই হলো। মস্ত বড় একটা অভিশপ্ত সৌভাগ্য চূর্ণ হয়ে গেল, এই মাত্র। আবার এই বিরাট সহরের একটা কোণে, মলিন একটা গলির মুখে ছোট একটা বাসার ভিতরে ঢুকে অভাব উপোস আর দীনতার জীবন বরণ ক'রে নিতে হবে। মন্দ কি? বেশ আরাম করে একটা হাঁপ ছাড়া যাবে। নিজেকে আর এত ঘৃণা করবার ভয় থাকবে না।

জেনারেল ম্যানেজারের চিঠি পেয়ে ভয়ে মাথা হেঁট হয়নি, বরং ঘরের ভিতরে ঘুরে ঘুরে মাথাটা বেশ উঁচু করে ভাবতে থাকে অবন্তী। খবর শুনে বাবা আবার দুঃখে মুসড়ে পড়বেন, এবং আবার ভগবানের দয়াতে সন্দেহ করবেন। চারু, হারু আর নরু স্কুল থেকে ফিরে এসে খবর শুনেই আতংকিত হবে। হোক, ওরা জানে না যে, এই সব রঙীন সৌভাগ্য অবন্তী সরকার নামে একটা মেয়ের কালো চোখের নিষ্ঠুর কৌতুকের সৃষ্টি। জানতে পারলে ওরাও বোধহয় বলে ফেলবে যে, ভালই হলো।

ঘরের দরজায় পর্দার কাছে একটা ছায়া এসে দাঁড়িয়েছে বলে মনে হয়। অবন্তী বলে--কে?

--আমি টাইপিস্ট চারুবাবু।

ব্যস্তভাবে এগিয়ে এসে চারুবাবুকে ঘরের ভিতর ডেকে নিয়ে বসতে অনুরোধ করে অবন্তী। চারুবাবু বলেন--খবর শুনে খুবই দুঃখিত হয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি অবন্তী মা।

অবন্তী হাসে--দুঃখ করবেন না।

চারুবাবুর চোখ দুটো যেন রাগে কটমট করে।--দুঃখ করবো বৈকি। আমরা অফিসের সবাই ঠিক করেছি, কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছে গিয়ে তোমার হয়ে সাক্ষী দেব। তুমি এখনই জেনারেল ম্যানেজারের বিরুদ্ধে একটা কমপ্লেন লিখে আমার কাছে দাও আমি যথাস্থানে সেই কমপ্লেন পাঠিয়ে দেব।

অবন্তী--কিসের কমপ্লেন?

চারুবাবু--ওসব প্রশ্ন করো না অবন্তী মা। আমরা সব খবর রাখি। ঐ অসভ্য বর্বর জেনারেল ম্যানেজার কেন তোমার চাকরিটাকে বাতিল করে দিলো, সে রহস্য আমরা জানি। ওকে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

অবন্তী--আমি আর কমপ্লেন করবো না চারুবাবু। চাকরিটা যাওয়াতে আমি খুশিই হয়েছি।

চারুবাবু কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে অবন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তার পরেই হঠাৎ যেন প্রসন্ন হয়ে ওঠেন।—তা একরকম ভালো। আত্মসম্মান বজায় রেখে সরে যাওয়াই ভালো।

অবন্তী বলে—চা আনি?

চারুবাবু—না না, তুমি আর এই অসময়ে আমাকে চা খাওয়াবার চেষ্টা করো না। তা ছাড়া, এই তো আমার সেই ভাগ্নে বাবাজীর বাড়ি থেকে চা খেয়ে আসছি। ভাগ্নে-বউটি সত্যিই বড় সুন্দর। যেমন ভাল স্বভাব, তেমনি ভাল দেখতে।

অবন্তীর কালো চোখের তারা তেমনই স্নিগ্ধ হয়ে থাকে, একটুও চমকে ওঠে না।—আপনার ভাগ্নের বিয়ে হলো কবে?

চারুবাবু—এই তো মাস দেড়েক হলো। কেন? তুমি খবর পাওনি?

অবন্তী—না।

চারুবাবু—ভাগ্নে-বউ যে বললে, তোমার নাম করেই বললে, তুমি তার বন্ধু।

অবন্তী—ঠিকই বলেছে। বোধ হয় লজ্জা ক'রে, কিংবা রাগ ক'রে, না হয় ভুল ক'রে চিঠি দিতে ভুলে গিয়েছে।

চারুবাবু—অদ্ভুত ভুল ! যাক, যদি তোমার কোন দরকার থাকে তবে বুড়োকে একটা খবর দিও অবন্তী।

অবন্তী—একটা দরকারের কথা এখনই বলতে পারি।

চারুবাবু—বল।

অবন্তী—আমার জন্য একটা বাসা খুঁজে দিন। ভাড়া পঁচিশ-ত্রিশের বেশি হলে চলবে না।

—সে কি? আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকেন চারুবাবু। তারপরেই যেন একটু কুণ্ঠার সঙ্গে আর চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করেন।—তোমাকে একটু আধটু সাহায্য করতে পারে, এমন কোন আত্মীয় কি নেই?

অবন্তী—না চারুবাবু।

চারুবাবু—তা হলে চাকরিটা যাওয়াতে তুমি তো খুবই অসুবিধেয় পড়লে। বড় দুঃখের ব্যাপার হলো। তোমার অবস্থা এতটা অসহায় বলে আমি ভাবতেই পারিনি।...যাক, দেখি কি করতে পারি।

২৯

এক অহংকেরে মেয়ের কথায় ওঠেন বসেন, এই অভিযোগ আত্মীয়দের কথায় আলোচনায় ও মন্তব্যে বহুবার শুনতে পেয়েও কোনদিন অখুশি হননি যে নিবারণবাবু, তাঁরই মন যেন এইবার একটা অখুশির প্রকোপে রুক্ষ হয়ে উঠেছে। বেলেঘাটার বসাক বাগান লেনের দুটি ছোট কুঠুরির চেহারার দিকে তাকালে নিবারণবাবু চোখের দৃষ্টিটা যেন কুঁচকে যায়, এবং একটা বোবা বিরক্তি ভ্রূকুটি হয়ে ফুটে ওঠে। এ কি হলো? এত ভাল চাকরিটা হারিয়ে অবন্তী এ কোন্ ভয়ানক একটা জগতের গলির ভিতর এসে ঠাঁই নিল! চারু, হারু, নরু আর গ্রামোফোন বাজায় না, ক্যারম খেলে না। কারণ গ্রামোফোন নেই, ক্যারম বোর্ড নেই। রেডিও সেট বেচে দিতে হয়েছে। পার্ক সার্কাসের ফ্ল্যাটের সেই রঙীন জীবনের শোভাকে যেন ধুলো করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে অবন্তী সবাইকে একটা বনবাসের ক্লেশ ও দুঃখের মধ্যে টেনে নিয়ে এসেছে।

প্রশ্ন করতে গিয়ে নিবারণবাবুর গলার স্বর রুক্ষ হয়ে ওঠে।—এমন ভাল চাকরিটা ছেড়ে দিলি কেন অবন্তী?

—ছাড়িয়ে দিলে।

—কেন ছাড়িয়ে দিলে?

—আমাকে পছন্দ করলো না।

—কেন?

—বোধহয় আমার অহংকারের জন্য।

—অমন অহংকার কি না থাকলেই নয়? ছিঃ, তোর লজ্জিত হওয়া উচিত অবন্তী।

অবন্তী শুধু নীরবে তাকিয়ে থাকে, নিবারণবাবুর আক্ষেপের ভাষা চুপ ক'রে সহ্য করে। এবং আশ্চর্য হয়। মেয়ের অহংকারের জেদ দেখে যে মানুষ জীবনের অনেক বছর খুশি হয়ে অনেক কষ্ট সহ্য করেছে, সেই মানুষেরই কাছে আজ মেয়ের অহংকার অসহ হয়ে উঠেছে!

—ভগবান কি আছেন? বিশ্বাস করতে তো আর ইচ্ছে হয় না। নইলে...।

নিজের মনেই বিড়বিড় করেন নিবারণবাবু, এবং পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট শরীরটাকে টান ক'রে উঠে বসতে চেষ্টা করেন। উঠে বসেন, এবং লাঠি ভর দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে কুঠুরির জানালার কাছে এসে দেখতে থাকেন, ছোট একটা ছাতা আর একটা ঝোলা হাতে নিয়ে কোন্ এক মেয়েস্কুলে পড়াতে চলে গেল অবন্তী। পঁয়ষট্টি টাকা মাইনে পায় অবন্তী। তিনশো ষাট টাকা মাইনের স্বর্গ থেকে তাড়া খেয়ে পঁয়ষট্টি টাকা মাইনের রসাতলে নেমে গিয়েছে তাঁর ঐ অহংকেরে মেয়ে।

ঐ পঁয়ষট্টি টাকা মাইনের চাকরিটা পেতেও কি কম ঝঞ্ঝাট সইতে হয়েছে। ভাগ্য ভাল, চারুবাবু নামে সেই টাইপিস্ট ভদ্রলোক অবন্তীকে বেশ স্নেহ করেন। তিনিই অনেক চেষ্টা ক'রে খোঁজ নিয়ে এসেছিলেন, এবং অনেক মানুষকে ধরাধরি ক'রে ও তোষামোদ করে অবন্তীকে চাকরিটা পাইয়ে দিতে সাহায্য করেছেন।

অবন্তীর ভাগ্যটার উপর রাগ করতে গিয়ে অবন্তীরই উপর রাগ হয়, এবং মাঝে মাঝে নিবারণবাবু তাঁর এই নিষ্ঠুর রাগটার জন্য নিজেই লজ্জিত হন। হঠাৎ চোখ দুটো ছলছল ক'রে ওঠে। না, মেয়েটার উপর রাগ করা উচিত নয়। মেয়েটা নিজেই বা কি কম শাস্তি পাচ্ছে? ওরই শাস্তি যে সবচেয়ে বেশি। মেয়েস্কুলের চাকরি ছাড়া সন্ধ্যাবেলা আরও দু'জায়গায় দুটি ছাত্রী পড়াবার কাজ নিয়েছে। পনর পনর, মোট ত্রিশ টাকা আরও পাওয়া যায় ; এবং এই ত্রিশটা টাকা পাওয়ার জন্য মেয়েটাকে যে খাটুনি খাটতে হচ্ছে, তার ফল ফলে গিয়েছে। চারু, হারু ও নরুর স্কুলের মাইনেটা অবশ্য ঐ ত্রিশ টাকার জোরেই কুলিয়ে যায়, কিন্তু অবন্তীর চেহারাটা যে শুকিয়ে ঝিরঝিরে হয়ে গেল।

টাইপিস্ট চারুবাবু আসেন মাঝে মাঝে। তাঁর কথার মধ্যে একটা উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত মাঝে মাঝে যেন চমকে ওঠে। এবং সেই ইঙ্গিতই যথেষ্ট। বুঝতে পারেন নিবারণবাবু, অবন্তীর জীবনের ভালর জন্য খুব বেশি চিন্তা করেন চারুবাবু।

আক্ষেপ করেন চারুবাবু।—অবন্তী যদি ইচ্ছে করে, তবে এরকম কষ্টের জীবন সহ্য করবার দরকার আর হবে না নিবারণবাবু।

—বুঝলাম না চারুবাবু।

—এমন ভাল ছেলে কি নেই যে অবন্তীর মত মেয়েকে বিয়ে করতে পারলে ধন্য হয়ে যাবে?

—আপনি কি অনুপমের কথা বলছেন?

—হ্যাঁ।

হ্যাঁ, অনুপম নামে একটি যুবকের মনের ইচ্ছার আভাস নিবারণবাবু জানতে পেরেছেন। যে রিফিউজি মেয়ে-স্কুলে কাজ করে অবন্তী, সেই স্কুলেরই কমিটির মেম্বার অনুপম এই বসাকবাগান লেনের কুঠুরির মানুষগুলির জীবনের দশা নিজের চোখে দেখে গিয়েছে।

অনুপমের অনেক খবর জানেন চারুবাবু। চারুবাবুর কাছেই জানতে পেরেছেন নিবারণবাবু, খুবই সদাশয় সৎ প্রকৃতির ছেলে ঐ অনুপম। টাকা পয়সা আছে অনুপমের, ওকালতির পশারও ভাল, এবং বেলেঘাটার বড় রাস্তার পাশে অনুপমের বাড়িটার চেহারাও সুন্দর ও সৌখীন।

যেদিন প্রথম এসেছিল অনুপম, সেদিন অবন্তী হেসে হেসে শান্ত ভাষায় অনুপমকে একটা অনুরোধও শুনিয়ে দিয়েছিল।--এরকম জায়গায় আপনার মত মানুষের আসা উচিত নয় অনুপমবাবু।

কিন্তু অনুপম কোন উত্তর না দিয়ে অবন্তীরই মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল, এবং তারপরেই হেসে ফেলেছিল--আপনি রাগ করলেও আমি আসবো।

--কেন?

--সত্যি কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না।

--বলুন।

--আপনাদের মত মানুষের পক্ষে এত কষ্ট সহ্য করা উচিত নয়।

--উচিত নয় ঠিকই, কিন্তু...।

--কোন কিন্তু নেই। আমি সাহায্য করবো, এবং সে সাহায্য আপনাকে নিতে হবে।

--না। মাপ করবেন।

অবন্তীর কথার মধ্যে রাগের উত্তাপ না থাকুক, খুবই স্পষ্ট ও কঠিন একটা আপত্তির সুর অবশ্যই ছিল। কিন্তু দেখা গেল যে, অনুপম সে আপত্তি গ্রাহ্য করলো না।

তারপর, শুধু একদিন দু'দিন নয়, এই সাত মাসের মধ্যে অনেকবার এসেছে অনুপম। এবং অবন্তীর সঙ্গে সামান্য দু'চারটে কথায় আলাপ শেষ হয়ে গেলেও প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরে এই কুঠুরির নিভৃতে বসে, হয় নিবারণবাবুর সঙ্গে, নয় চারু, হারু আর নরুর সঙ্গে গল্প করেছে অনুপম।

এরই মধ্যে একদিন একটা কাণ্ড করেছিল অনুপম।

অভাবের সংসার ; নিবারণবাবু অনেক চিন্তা করে শেষে ঠিক করলেন, তিনি নিজেই ঘরে বসে ছাত্র পড়াবেন। তাতে যা হয় তাই ভাল। দশ হোক্, কুড়ি হোক্, সামান্য কয়েকটা টাকা পেলেও যে অনেক কাজ হবে। মেয়েটা শুধু একাই খেটে খেটে শুকিয়ে যাবে কেন?

চারুবাবু চেষ্টা করে দুজন ছাত্র জোগাড় করে দিয়েছিলেন। সন্ধ্যাবেলা ছাত্র দুজন এসে নিবারণবাবুর কাছ থেকে পড়া শিখে যাবে। দশ দশ কুড়ি টাকা প্রতি মাসে পাওয়া যাবে। কিন্তু বাদ সাধলো অনুপম। অনুপম এসে নিবারণবাবুকে ছাত্র পড়াতে দেখে যেন রেগে অস্থির হয়ে গেল।--ছি, ছি, এ কি কাণ্ড করছেন আপনি? কি ভেবেছেন? আমি থাকতে আপনাকে এই বয়সে এরকম যাচ্ছেতাই কাণ্ড করতে দেব না। তাতে যাই মনে করুন আপনি।

অনুপমের কঠোর বাধায় ছাত্র পড়িয়ে কুড়ি টাকা রোজগারের সুযোগ পেলেন না নিবারণবাবু। এবং সেদিন নিবারণবাবুর হাতে অনুপম জোর করে একশো টাকা গছিয়ে দিয়ে চলে যাবার পর আবার একদিন এসে অনুরোধ করে।--আমাকে পর মনে করবেন না।

নিবারণবাবু--না, তা কেন মনে করবো? পরই তো আপনজন হয়ে যায়।

অনুপম--আমার কাছ থেকে টাকা নিতে কোনদিন আপনি আপত্তি করবেন না। আপত্তি করলে আমি খুবই দুঃখিত হব।

আর আপত্তি করেননি নিবারণ বাবু। এবং একদিন একটু বেশি উৎসাহিত হয়ে চেঁচিয়েও উঠেছিলেন--শুনেছিস অবন্তী?

--কি?

—অনুপম সত্যিই আমাদের একেবারে পর নয়।

—তার মানে কি?

—তার মানে, আজই অনুপমের সঙ্গে আলাপে আলাপে জানতে পারলাম, তোর মেজ পিসির এক জা-এর ছেলে হলো অনুপম।

অবন্তী হাসে—কিন্তু তাই বলে অনুপমবাবু যখন-তখন টাকা দিতে চাইলে তুমি নিয়ে বসো না।

অপ্রসন্নভাবে তাকিয়ে থাকেন নিবারণবাবু—কি বলতে চাইছিস? অনুপমের টাকা নিয়ে অন্যায় করছি আমি?

অবন্তী—হ্যাঁ।

—কেন?

—ভদ্রলোককে মিছিমিছি ঠকানো হচ্ছে?

—একথারই বা মানে কি! অনুপমের মত ছেলে কি...।

—তিনি খুব ভাল ছেলে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর টাকা নেওয়া আমাদের উচিত নয়।

অবন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে চোখের গম্ভীর দৃষ্টিটাকে একটু কোমল ক'রে নিয়ে নিবারণবাবু বলেন—খুব বেশি অহংকার ভাল নয় অবন্তী। এমন অহংকারের কোন অর্থ হয় না।

নীরব হয়ে শুধু শুনতে থাকে অবন্তী। কোন উত্তর দেয় না। নিবারণবাবু বলেন—বেশ, তাহ'লে অনুপমকে স্পষ্ট ক'রে বলে দেব যে, আর টাকা নেওয়া আমাদের উচিত নয়।

৩০

অবন্তী তখনও বাড়ি ফেরেনি। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। স্কুলের ছুটির পর দু'জায়গায় ছাত্রী পড়িয়ে ফিরতে রোজই সন্ধ্যা পার হয়ে যায়, এবং সন্ধ্যায় বৃষ্টি থামলে ফিরতে বেশ একটু রাতও হয়।

এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। তবু বসাক লেনের অতি ছোট একটা বাড়ির কুঠুরির ভিতরে বেতের মোড়ার উপর চুপ ক'রে বসে থাকে অনুপম। অনুপমের হাতে একটা ফুলের তোড়া।

একটা কথা খুবই স্পষ্ট ক'রে বলেছেন নিবারণবাবু, এবং চমকে উঠে নিবারণবাবুর সঙ্গে সেই মুহূর্তে আলাপ বন্ধ ক'রে দিয়েছে অনুপম। নিবারণবাবুর কথাটা বিশ্বাস করতে পারেনি অনুপম। অসম্ভব! এই আপত্তি নিতান্তই একটা অভিমান। যতই অহংকার থাকুক অবন্তীর, অনুপমের কাছে অকৃতজ্ঞ হবার মত মেয়ে নয় অবন্তী। একদিন দু'দিন নয়, সাত-আট মাস ধরে এই অভাবের সংসারটাকে উপকারে উপকারে ভরে দিয়েছে অনুপম। অবন্তী কি জানে না, নিবারণবাবুর শরীরটা আজ এতটা সুস্থ হয়ে উঠলো কেমন ক'রে? কা'র সাহায্যে? অবন্তীরই বাপ ও ভাইদের জীবনে আনন্দ এনে দিয়েছে যে, তাকেই তুচ্ছ করবে অবন্তী? হতে পারে না।

অবন্তী জানে না, অবন্তীকে মনে-প্রাণে ভালবেসেছে অনুপম। কোনদিন এই ভালবাসার কথা অবন্তীর কাছে বলেনি অনুপম। বলার দরকার কি? অবন্তীর ঐ সুন্দর দুটি চোখ নিশ্চয়ই বোকা নয়। বুঝতে পারেনি কি অবন্তী? ঘরে ঢোকে অবন্তী, এবং অনুপমকে দেখেই চমকে ওঠে। এই ঘরের ভিতরে কোনদিন অনুপম আসেনি। কিন্তু আজ যেন একটা শুভ প্রতীক্ষার ব্রত উদ্‌যাপন করবার জন্য ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে বসে আছে অনুপম।

অবন্তী বলে—বাবা কি বাড়িতে নেই?

অনুপম হাসে--আছেন। কিন্তু আমি আপনারই অপেক্ষায় বসে আছি। আপনারই কাছে কয়েকটা কথা বলবার আছে।

--বলুন।

--আপনার বাবার কাছ থেকে একটা কথা শুনে দুঃখিত হলাম। আমার কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া নাকি আপনাদের উচিত নয়।

অবন্তী হাসে--তার মানে, আমাদের টাকা দিয়ে সাহায্য করা আপনার উচিত নয়।

--কেন অবন্তী?

চমকে ওঠে অবন্তী। এবং অনুপমের সেই শান্ত আশ্বস্ত ও মুগ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে করুণভাবে হাসতে থাকে।--আমি ঠিক এই ভয়ই করেছিলাম অনুপমবাবু।

--ভয়? তোমাকে আমি ভালবাসি, এর জন্য তুমি ভয় পেলে অবন্তী?

--আপনি ভুল করেছেন অনুপমবাবু।

--কিসের ভুল?

--আপনার মনে সন্দেহ থাকা উচিত ছিল যে, আমি আপনাকে ভালবাসি না।

--তুমি ভালবাস না?

অবন্তী আবার হাসে--মাপ করবেন অনুপমবাবু। আপনার সন্দেহ করা উচিত ছিল যে, আমি হয়তো অন্য কাউকে ভালবাসি।

অনুপম--কিন্তু সে কি আমার চেয়ে বেশি ভালবাসে তোমাকে?

অবন্তী--তাই তো মনে হয়।

অনুপম--সে কি আমার মত এরকম প্রাণ ঢেলে দিয়ে তোমাদের উপকার করতে পেরেছে?

অবন্তীর চোখে এক টুকরো বিদ্যুতের ঝিলিক চমকে ওঠে। সে নিজেকে প্রায় প্রাণে মেরে ফেলে আমাদের উপকার করেছে।

স্তব্ধ হয়ে যায় অনুপমের চোখের সব চঞ্চলতা। অপলক চোখে ঘরের আলোটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে অনুপম। তার পরেই চেঁচিয়ে হেসে ওঠে।--বৃষ্টি থেমে গিয়েছে বোধ হয়।

অবন্তী--হ্যাঁ।

অনুপম--নরুকে একবার ডাকুন তো।

অবন্তী--কেন?

অনুপম--ফুলের তোড়াটা নরুকে দিয়ে যাই।

অবন্তীর ডাক শুনে নরু আসে। নরুর হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিয়েই দরজার দিকে এগিয়ে যায় অনুপম।

লাঠি ভর দিয়ে পাশের ঘর থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে যখন এই ঘরের ভিতরে ঢোকেন নিবারণবাবু, তখন অনুপম চলে গিয়েছে। অবন্তীর ক্লান্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বলেন।--এরকম অদ্ভুত কথা তো আগে তোকে কখনও বলতে শুনিনি।

অবন্তী--কি?

নিবারণবাবু--অনুপমকে এইমাত্র যে কথাটা বললি। কথাটা কানে এল তাই আশ্চর্য হয়ে গেছি। আমার ধারণা ছিল না যে, নিখিল কখনও আমাদের উপকার করেছে।

চমকে উঠলেও শুধু চুপ ক'রে শুনতে থাকে অবন্তী। নিবারণবাবু নিজের মনের বিস্ময় আবেগে বলতে থাকেন--কে জানে, কোনদিনও তো বুঝতে পারিনি, নিখিল আমাদের এত উপকার করেছে। বেচারা নিজেকে প্রাণে মেরে...।

চেঁচিয়ে ওঠে অবন্তী--ভুল বুঝেছ বাবা। নিখিল নয়।

নিবারণবাবু ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকেন—তবে কে?
অবন্তী—তাকে তুমি দেখনি। তাকে তুমি চেন না।
নিবারণবাবু অপ্রস্তুতের মত কুণ্ঠিত স্বরে বলেন—সে কোথায়?
—এই কলকাতাতেই আছে।
—আসে না কেন?
—আমাদের ঠিকানা জানে না।
—ঠিকানা জানিয়ে দে।
—না।
—কেন?
—তাকে আর বিরক্ত করতে চাই না।
—তার মানে?
—তার মানে, সে নিজেই কষ্টে আছে।
—তোর কষ্টের চেয়ে বেশি কষ্ট তো নয়।
—বেশি না হোক, কম নয়।
—ছেলেটি খুবই গরীব নাকি?
—ইচ্ছে ক'রে গরীব হয়েছে।
—কিসের জন্য।
—আমাদেরই জন্য।
—কি বললি?
—আমারই জন্য। ওকে ঠকিয়ে ওর চাকরিটা আমিই নিয়েছিলাম।
—মিশন রো'র অফিসের চাকরিটা?
—হ্যাঁ।

স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন নিবারণবাবু। বসাক্ বাগানের সরু গলির ভিতর থেকে ঘুঁটে পোড়া ধোঁয়া এসে সারা ঘরের ভিতর ছড়িয়ে পড়ে। মাথা তুলে ঘরের চালাটার দিকে একবার তাকান নিবারণবাবু। তখনো চালার একটা ফুটো দিয়ে টুপ টাপ ক'রে জলের ফোঁটা ঝরছে। আড়ষ্ট শরীরটাকে টান ক'রে নিয়ে একটা হাঁপ ছাড়েন নিবারণবাবু। ক্ষীণ অথচ তীক্ষ্ণ একটা হাসির রেখা তাঁর বিবর্ণ মুখের উপর ছটফট ক'রে ওঠে। নিবারণবাবু বলেন—ভগবান আছেন মনে হচ্ছে।

৩১

শীত ফুরিয়েছে কবেই, গ্রীষ্মও ফুরিয়ে গেল। কালো কালো আষাঢ়ে মেঘের ছায়া মাঝে মাঝে টালিগঞ্জের গলির তপ্ত ধুলোর উপরেও এসে লুটিয়ে পড়ে।

জটিল গণিতের বই বন্ধ ক'রে মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে আষাঢ়ে মেঘের কালো-কালো শোভার দিকে শেখর মিত্রকেও তাকাতে হয়। অবন্তী সরকার নামে একটি নারীর মুখটাও বেশ ভাল ক'রে এবং বার বার মনে পড়ে।

ডাক পিয়ন এসেছিল বোধহয়। মধু ছুটে এসে একটা চিঠি শেখর মিত্রের হাতের কাছে ফেলে দিয়ে চলে যায়। দেখে বুঝতে পারে না শেখর, এই চিঠি কার চিঠি হতে পারে। এবং চিঠি খুলেই বুঝতে পারে. অনসূয়ার চিঠি।

কিন্তু চিঠিটা অনসূয়ার কোন সুখবর নয়। অবন্তী সরকারেরই খবর। অনসূয়ার চিঠির ভাষাটাও যেন একটা ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ অনুযোগের ঝড়।—এ কি কাণ্ড করছেন আপনি? অবন্তীর

জীবনের জন্য কি আপনার কোন দায়িত্ব নেই? মেয়েটা যে না খেয়ে মরতে বসেছে...।

চমকে ওঠে শেখর। শেখরের চোখে যেন জ্বালাভরা ধোঁয়ার ছোঁয়া এসে লেগেছে। চিঠির লেখাগুলিকেই অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য কতগুলি প্রলাপ বলে মনে হয়। চোখ মোছে শেখর।

--অবন্তী এখন থাকে বেলেঘাটার একটা গলিতে। এগার নম্বর বসাক বাগান লেন। একটা রিফিউজি মেয়ে-স্কুলে ষাট টাকা মাইনের চাকরি করছে অবন্তী। ডাক্তার বলেছে, অবন্তীর বুকের ব্যাথাটা হলো প্লুরিসির ব্যথা।

অনসূয়ার লেখা চিঠিটাকে দুমড়ে বুকের কাছে চেপে ধরে শেখর। মনে হয়, বুকের পাঁজরাটা কাঁপতে কাঁপতে এখনই ছিঁড়ে যাবে। এ কি করলো অবন্তী? কাকে শাস্তি দিচ্ছে ঐ ভয়ানক মেয়ে?

বিধু হঠাৎ এসে ডাক দেয়।--এক ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন বড়দা?

ঘরের বাইরে এসে এক অপরিচিত প্রবীণ ভদ্রলোককে দেখে প্রশ্ন করবার আগে সেই ভদ্রলোকই বলে ওঠেন--আমি আমার ভাগ্নে-বউ অনসূয়ার কাছ থেকে আপনার ঠিকানা নিয়ে বিশেষ একটা অনুরোধ নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।

শেখর--বলুন।

ভদ্রলোক--আমি হলাম টাইপিস্ট চারুবাবু, অবন্তী যে অপিসে কাজ করতো, আমি সেই অফিসেই কাজ করি। কথাটা হলো...।

চারুবাবু একটু বিব্রত ভাবে এবং একটু বিচলিত স্বরে বলেন--অবন্তী আমাকে একটা মিথ্যে কথা বলেছিল যে, তাকে সাহায্য করতে পারে এমন কোন আত্মীয় তার নেই। কিন্তু আমার ভাগ্নে-বউ-এর কাছে শুনলাম যে, আপনি অবন্তীর কাছে আত্মীয়ের চেয়েও আপন জন।

প্রতিবাদ করে না শেখর। আজ যেন সারা পৃথিবীটাই চেঁচিয়ে আর রাগ ক'রে সাক্ষী দিচ্ছে যে, শেখর মিত্রই হলো অবন্তী সরকার নামে এক নারীর একমাত্র আপন জন।

চারুবাবু বলেন--আমি শুধু এই কথাই আপনাকে বলতে এসেছি যে, আপনি যদি অবন্তীর উপর রাগ ক'রে থাকেন, তবে সেটা মস্ত ভুল করা হবে শেখরবাবু। আপনি সব খবর জানেন না, আমিও আপনাকে বলবো না। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, আমাদের অবন্তীর মত এমন খাঁটি মনের মেয়ে আমি আর দেখিনি।

চারুবাবুর চোখ দুটো ছল ছল করছে বলে মনে হয়। শেখর বলে--আপনার ইচ্ছা এই তো, আমি যেন অবন্তীর সঙ্গে একবার দেখা করি?

চারুবাবু--তাই, তাই, তার বেশি কিছু বলতে চাই না।

শেখর--তাই হবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

তবু চারুবাবু আরও একটা কথা বলতে চেষ্টা করেন, এবং চেষ্টা করতে গিয়ে তাঁর দু'চোখে যেন একটা আবেদন নিবিড় হয়ে ওঠে। বোধ হয় আরও নিশ্চিন্ত হতে চান চারুবাবু, এবং শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলেন--তোমরা দুজনে সুখী হয়েছ জানতে পেলেই আমরা সুখী হব।

বলতে বলতে এবং আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যান বুড়ো টাইপিস্ট চারুবাবু।

৩২

এগার নম্বর বসাক বাগান লেন, বেলেঘাটা। বাড়িটা খুঁজে পেতে অনেক হয়রান হতে হয়েছে। সারি সারি অনেকগুলি টিনের শেড, তার মধ্যে মরচে পড়া যত টিনের পিপে পাহাড়ের মত স্তূপ ক'রে সাজানো। এখানেও নয়। এর পরে একটা গরু-মহিষের খাটাল। তারপরে গলি।

সেই গলির মধ্যে যেখানে মস্ত বড় একটা ডাস্টবিন, তারই পাশে এগার নম্বর নিকেতন।

কপালের ঘাম মুছে শেখর দরজার দিকে তাকায়। এখানেই থাকে অবন্তী সরকার। শেখরের মনের ভিতর একটা ক্লান্ত যন্ত্রণা যেন ফিস ফিস ক'রে বলে, বোধ হয় মরেই গিয়েছে তোমার অবন্তী সরকার।

মরিয়া হয়ে ডাকাতের মত দুরন্ত আগ্রহ নিয়ে দরজার কড়া নাড়ে শেখর। এবং সেই মুহূর্তে দরজা খুলে দিয়ে ভিতর থেকে যে মেয়ের দুটি চোখ আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে, সে হলো অবন্তী সরকার। সত্যিই অবন্তী সরকার। দেখে বিশ্বাস করতে পারা যায়। কিন্তু শেখরের মনে হয়, অবন্তী সরকারের জীবন্ত চেহারার ঐ রূপ না দেখে ওর মরা চেহারার রূপ দেখলেই বোধ হয় ভাল ছিল। শেখরের হৃৎপিণ্ডটা তাহলে এমন ক'রে আগুনে পোড়া সাপের মত যন্ত্রণায় ছটফট ক'রে উঠতো না।

অবন্তী সরকার দাঁড়িয়ে আছে। সেই কালো চোখের তারায় বুদ্ধির দীপ্তিটা যেন জ্যোৎস্না হয়ে গলে গিয়েছে। শীর্ণ ও শুকনো একটা মুখ। ঠোঁটের লালচে শোভা যদিও মরে গিয়েছে, কিন্তু অবন্তীর মুখের হাসি মরে যায়নি। শেখরের দিকে তাকিয়ে অবন্তীর রোগা মুখের সব বিষাদ ছাপিয়ে বর্ষায় ধোয়া চাঁদের আলোর মত হাসি ফুটে উঠেছে।

এক হাতে একটা ছাতা। আর এক হাতে একটা ব্যাগ, তার মধ্যে কতগুলি বই আর খাতা। কালোপাড় একটা প্লেন শাড়ি দিয়ে মোড়া একটা সাদা ও রোগা খেলনা-মূর্তির মত স্থির হয়ে রয়েছে অবন্তীর শরীরটা।

শেখর বলে—কোথাও যাবার জন্য তৈরী হয়েছ বোধহয়?

অবন্তী—হ্যাঁ।

শেখর—স্কুলে যাচ্ছ?

অবন্তী—হ্যাঁ।

শেখর—প্লুরিসির ব্যথাটা নেই?

অবন্তী হাসে—আছে, কিন্তু ভুলেই গিয়েছি।

শেখর—আমাকে শাস্তি দেবার জন্যেই কি এই কাণ্ড করলে?

অবন্তী—কিসের কাণ্ড?

শেখর—এই, দুর্দশা।

অবন্তী—কা'র?

শেখর—তোমার।

অবন্তী—না, দুর্দশা নয়।

শেখরের চোখের জ্বালা এইবার যেন আরও মরিয়া হয়ে ছটফট করে।—তবে?

মাথা হেঁট করে না অবন্তী। মুখ তুলে সোজা শেখরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অবন্তীর দুই কালো চোখে যেন বিচিত্র এক গর্বের ছায়া নিবিড় হয়ে রয়েছে।

শেখর—আমার কথার উত্তর দাও অবন্তী!

অবন্তীর চোখের পাতাও হঠাৎ ভিজে গিয়ে কালো চোখের ছায়া-ছায়া রহস্যকে আরও স্নিগ্ধ ক'রে তোলে। অবন্তী বলে—খুব খুশি মনে নিজের এই দশা করেছি। নইলে হেঁট মাথা তুলে তোমার মুখের দিকে তাকাবার জোরই যে পাচ্ছিলাম না।

ঠিকই বলেছে অবন্তী। হেঁট মাথা নয়। অবন্তী যেন আজ তার জীবনের এক ভয়ানক কঠিন গৌরবের জোরে জয় করা ভালবাসার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে। শেখরের প্রাণের সব তৃষ্ণাকে তৃপ্ত হবার জন্য আহ্বান করছে অবন্তী সরকারের ঐ সাদা ও শুকনো দুটি ঠোঁট।

শেখর বলে—স্কুলে যেতে হবে না।

অবন্তীকে আর কোন প্রশ্ন করবারই সুযোগ দেয় না শেখর। শেখরের দুই হাতের ব্যাকুল আগ্রহের মধ্যে বন্দী হয়ে যায় অবন্তীর রোগা চেহারা। ইচ্ছে করে, যেন বুকভরা অগাধ দুঃসাহসের জোরে মুখটাকে শেখরের পিপাসার কাছে এগিয়ে দেয় অবন্তী। চোখের পাতা আরও ভিজে গেলেও চোখ বন্ধ করে না অবন্তী।

শেখর বলে—এই তো চাই। এইভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাক অবন্তী। সরে যেও না।

অবন্তী—সরে যাব না। কিন্তু একটিবার অন্তত মাথা নামাবার সুযোগ দাও।

শেখর—সুযোগ পরে পাবে।

পরে মানে অনেকদিন পরে নয়, আর সামান্য কিছুক্ষণ পরেই মাথা নামাবার সুযোগ পায় অবন্তী।

শেখর বলে—তোমার বুকের ব্যথাটাকে যে শিগগির সারিয়ে তুলতে হবে অবন্তী।

অবন্তী হাসে—মনে হচ্ছে, সেরেই গিয়েছে।

শ্রেয়সী

পুরনো নামটা আজও আছে, যদিও পুরনো রূপটা আজ আর নেই।

জায়গাটার নাম রসিকপুর ; এবং কমল বিশ্বাসের এই বাড়িটা হলো রসিকপুরের সেই রাজবাড়ি ; লোকের চোখে যে বাড়ি দু'শো বছরের একটা করুণ বিদ্রূপের অবশেষ বলে বোধ হয়। গলিত পলিত ও কুশ্রী ; প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপের মত দেখতে এই বাড়িকে রাজবাড়ি বললে ঠাট্টা করা হয়। পুরনো নামের জেরটুকু শুধু মর-মর হয়ে বেঁচে আছে। বাকি সবই প্রায় ধুলো হয়ে গিয়েছে।

ঠাকুরদালানের ভিতের গায়ে কষ্টিপাথরের উপর শ্লোক লেখা আছে, দু'শো বছর আগে বিশ্বাসকুলগৌরবমিহির দেবদ্বিজসেবাপরায়ণ সৌভাগ্য-লক্ষ্মীকরুণা-করচ্ছায়াসেবিত শ্রীঅনিরুদ্ধ বিশ্বাস এই রাজবাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। রসিকপুরের সেই রাজবাড়ির অর্ধেক ইঁট কমল বিশ্বাসের বাপের আমলেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে। ঐ যে যশোর রোড, যার উপর দিয়ে আজ ধাবমান অটোমোবিলের অবিরাম হর্ণের শব্দ শোনা যায়, সেই রোডের উপরের আস্তরণ খুঁড়ে ফেললে আজও দেখা যাবে, রসিকপুরের ভাঙা রাজবাড়ির ইঁট বিছাই হয়ে রয়েছে।

দূরে নয় যশোর রোড। দূরে নয় লোনা বাগজলা, যেখানে আজ কাচড়া দাম ঠেলে জলকরের জেলেরা ডিঙ্গি চালায়, আর জলের উপর লগির বাড়ি মেরে মাছের ঝাঁকগুলিকে খাটিয়ে ছুটিয়ে পুষ্ট ক'রে তোলে। নতুন নতুন অনেক কলোনি গড়ে উঠেছে সেই পুরনো রসিকপুরের আশেপাশে। কলোনির পথে পথে বিজলী বাতি জ্বলে : এমন কি ধানক্ষেতের উপর দিয়ে যে-সব ছোট ছোট রাস্তা চলে গিয়েছে, তারও পাশে পাশে সরু লোহার খুঁটিতে বিদ্যুতের বাতি আলো ছড়ায়। রাতের বেলাতেও সখের মাছধরার দল পথের পাশের জলায় কচুরিপানা সরিয়ে কালো জলে ছিপ ফেলে বসে থাকে। চ্যাং মাছের দল টোপের গায়ে ঠোকর দেয়। কখনও বা বঁড়শি-গাঁথা হয়ে ছোট কেঠো ছিপের এক টানে উপরে উঠে আসে?

বেলগাছিয়া দূরে নয়, দমদমও দূরে নয়, পাতিপুকুরের বাগানবাড়িগুলি তো একেবারেই কাছে। আধুনিক কলকাতার ধোঁয়াটে বাতাসের চক্র থেকে খুব সামান্য দূরে এই রসিকপুরেও আজ তিনটি কারখানার চিমনি থেকে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী সকাল সন্ধ্যা বাতাস কালো করে। তবু পাখির ডাকের সাড়া আজও এখানে আছে। সকালে কোকিল ও কালো ময়না, দুপুরে ঘুঘু, আর শেষরাতে চোখ-গেল। পথের ধারে বুনো ফুলের গন্ধে আজও রাতের বাতাস ঝাঁজাল হয়। দমদমের হাওয়াই বন্দরের মাটিতে নামবার আগে বিমানগুলি ঠিক এই রসিকপুরের ধান ক্ষেতের মাথার উপর এসে কাত হয়ে বাঁ-দিকে মোড় ঘোরে। বিমানের গম্ভীর গুঞ্জন হঠাৎ ছন্নছাড়া হয়ে আর বড় কর্কশ হয়ে রসিকপুরের কানে বাজে। ক্লান্ত মানুষের মাঝরাতের ঘুমের সুখ, কিম্বা অলস মানুষের হালকা দিবানিদ্রার সুখ, বিমানের ঐ কর্কশ শব্দের আঘাতে দুই সুখের আবেশই যখন-তখন ভেঙে যায়।

আষাঢ় মাসের শেষের দিকে যখন আকাশের মেঘ প্রথম গলে গিয়ে অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরায়, আর ঠাণ্ডা বাতাসের ঝড়ে নারকেলের মাথাগুলি বেশ উতলা হয়ে দুলতে থাকে, সেই সময় এই ভাঙা ময়লা ও শ্রীহীন বাড়িটাকেও বড় সুন্দর দেখায়। দিনের বেলায় এই বাড়িটা দেখলে প'ড়ো-বাড়ি বলে মনে হয়। বিশ্বাস হয় না, এই বাড়ির ভিতরে কোন প্রাণ বাস করে। একটা প্রাণহীন জীর্ণতার বিরাট স্তূপের মত পড়ে আছে বাড়িটা। এদিকে-ওদিকে ফাটল-ধরা এক-একটা বারান্দার কিনারার থামগুলি দাঁড়িয়ে আছে। থামের মাথা থেকে ছাদের ভার খসে গিয়ে আর গুঁড়ো হয়ে নীচে ঝরে পড়েছে। ভাঙা ভাঙা ইঁটের সেই সব স্তূপের উপর

আগাছার ভিড় সবুজ হয়ে রয়েছে। সেই সবুজের মধ্যে রঙীন প্রজাপতির শরীর সন্ধান ক'রে বেড়ায় লিকলিকে চেহারার কালো সাপ।

দেখে বোঝা যায় ; ওদিকে একটা নহবতখানা ছিল। নহবতখানার উপরটা একেবারে আধখানা হয়ে ভেঙ্গে গিয়েছে। সিঁড়িরও অর্ধেকটা নেই। সিঁড়ির পাশে আলকুশীর ঝোপ, তার কাছে একটা গভীর গর্ত। ভরা দুপুরে, যখন সব সাড়া শব্দ মরে গিয়ে বেশ একটা নিঝুম গম্ভীরতা চারিদিকে থমথম করে, তখন একজোড়া খাটাসের মুখ ঐ গর্তের ভিতর থেকে বাইরে উঁকি দিয়ে অলসভাবে তাকিয়ে থাকে।

দেউড়িও ছিল, এবং মনে হয়, সেই দেউড়ির পাশে পাহারাদার পাইকদের কুঠুরি ছিল। দেউড়ির ফটকে দরজা নেই ; পলেস্তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। কুঠুরিগুলির ভিতরে ভয়ানক মশার ভিড়, দিনের বেলাতেও সেই মশার ঝাঁকের তীব্র গুঞ্জন শোনা যায়।

বড় বড় ঘরগুলির এক একটা কঙ্কাল শুধু দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যেই মরা মানুষের মুখের হাসির মত হেসে রয়েছে এক একটা রঙীন ইঁটের চিহ্ন। নক্সা আঁকা আর ফুলবাহারের কাজ করা সেই ইঁট, যেগুলি একদিন এইসব ঘরের কার্নিশের শোভা হয়ে ফুটে থাকতো।

বাগানের চেহারাই বা আকারে ও প্রকারে কি কম যায়? নেই নেই ক'রেও অনেক কিছু আছে। শুধু নারকেল আর সুপুরি নয় ; বড় বড় কনকচাঁপা আছে। আছে বড় বড় অর্জুনের সাদাটে ধড় ; এখনও টান হয়ে সোজা দাঁড়িয়ে আছে গাছগুলি এবং সে গাছে প্রথম বর্ষার জলে হাজার হাজার মঞ্জরীও মনের আহ্লাদে ভিজে যায়।

পুকুরটাও প্রকাণ্ড। শালুকের আশেপাশে জলপিপি ঘুরে বেড়ায়, কেয়ার ঝোপে ডাহুক ডাকে। ভাঙা ঘাটের ইঁট দু'পাশের কাদার উপর পড়ে আছে। তবুও কয়েকটা সিঁড়ি আজও বেঁচে আছে। পুকুরের জলে বড় বড় চিতল হাবুডুবু খেয়ে আর ঘাই মেরে বেড়ায়। কুচো মাছের ঝাঁক ভয় পেয়ে ছটফটিয়ে শালুকের পাতার উপর আছড়ে পড়ে। হঠাৎ কোথা থেকে একটা মাছরাঙা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে শালুক পাতার উপর ঠোকর হেনে পালিয়ে যায়।

অনেকগুলি বড় বড় আঙ্গিনা পার হয়ে একটা ছোট আঙ্গিনা, সেই আঙ্গিনার পাশে একটা দোলমঞ্চ আছে, এবং এখনো খুঁজলে এই দোলমঞ্চের কোন ফাটলে পুরনো দিনের আবিরের গুঁড়ো হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে। এখানে এসে দাঁড়ালে বুঝতে পারা যায়, সত্যিই কয়েকটা প্রাণ আজও বাস করে এই বাড়িতে। এই আঙ্গিনার চারিদিকের বারান্দাটা অটুট আছে। ঘরগুলির দরজায় আজও কাঠ আর চৌকাঠ আছে, এবং গৃহস্বামী কমল বিশ্বাস আজও এই আঙ্গিনার এক কিনারায় চৌকির উপর বসে আম-কাঁঠালের ছায়ার দিকে তাকিয়ে তামাক খান ; হুঁকোর নলচে অর্ধেক আছে, অর্ধেক নেই।

ঠাকুরঘর নামে ছোট দালানটা এই বারান্দারই দক্ষিণ দিকে আজও দাঁড়িয়ে আছে, যদিও তার রূপ একেবারে অটুট আর অক্ষত নয়। ঠাকুর-দালানের নাটমণ্ডপটি ভেঙে ঝরে গিয়েছে। কিন্তু বিগ্রহের ঘরটা ভাঙেনি। দালানের মেঝেটা বিক্ষত, পুরনো দিনের রঙীন পাথরের কুচিগুলি কে জানে কবে মেঝের বুক থেকে সরে গিয়েছে। ঠাকুরদালানের থামগুলি বড় মসৃণ, অনেক তেল-সিঁদুরের ছাপ আজও লেগে আছে। জ্যোৎস্নার রাতে এই ঠাকুর-দালানটাকে আজও বড় সুন্দর দেখায়। শুধু সুন্দর নয়, বড় মোহময়।

এই বাড়ির যিনি প্রভু, পঁয়ষট্টি বছর বয়সের ঐ কমল বিশ্বাস, তাঁর চেহারাটা বয়সের ভারে যত চিন্তার ভারে তার চেয়েও বেশি বুড়ো হয়ে গিয়েছে। আগে জ্যোৎস্নার রাতে তাঁর চোখে ঘুম আসতো না ; আজকাল অন্ধকারের রাতেও হঠাৎ ঘুম ছেড়ে উঠে বসেন। নিজের হাতেই তামাক সাজেন। তারপর হয় আঙ্গিনার এক কোণে বসে, কিংবা ঘরেরই জানালার কাছে, কিংবা বাইরের বারান্দার উপরে বসে অপলক চোখ মেলে ঠাকুরদালানের ঐ থামগুলির দিকে তাকিয়ে থাকেন।

আজ কিন্তু সন্ধ্যা থেকেই ছটফট করছেন কমল বিশ্বাস। এবং একটু রাত হতেই ঘরের বারান্দা থেকে নেমে অন্ধকার দিয়ে তৈরী একটা নীরব শ্বাপদের মত আস্তে আস্তে হেঁটে ঠাকুরদালানের বারান্দার উপর এসে বসে পড়েন।

তবে কি তাঁর আহত জীবনের সব ক্ষতের জ্বালা নিয়ে, শেষবারের মত সব আক্রোশ নিয়ে এই ভাঙা-বাড়ির অভিশাপকে একটা থাবা দিয়ে আঁকড়ে ধরে সরিয়ে দিতে চান কমল বিশ্বাস? নইলে আজ হঠাৎ এমন ক'রে রাতের শ্বাপদের মত ওৎ পেতে বসে থাকেন কেন?

কিংবা ঘুমিয়ে পড়তে চান? কমল বিশ্বাসের শ্রান্ত ক্লান্ত জীবনটা সব চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে এইবার জিরোতে চায়?

অথবা জাগা চোখেই একটা স্বপ্ন দেখতে চান কমল বিশ্বাস? ঠাকুর পদ্মনাভ ইচ্ছে করলেই তো আজ কমল বিশ্বাসকে একটা স্বপ্ন দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারেন, ঐ তো ওখানে, যেখানে একটা শক্ত শাবল দিয়ে মাত্র চার হাত গভীর গাঁথুনি উপড়ে ফেললেই দেখা যাবে যে...।

চোখের উপর হাত বুলিয়ে ঠাকুরদালানের থামগুলির দিকে তাকিয়ে থাকেন কমল বিশ্বাস।

পর পর এবং দুই সারি অনেকগুলি থাম। মোট কুড়িটা। যেন পুরনো এক ইতিহাসের কোন প্রতিশ্রুতির দেহরক্ষীর মত নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে থামগুলি। বাড়ির কর্তা কমল বিশ্বাস জানেন, এবং তাঁর স্ত্রী সুধাময়ীও জানেন, বিশ্বাস বংশের সেই বনেদি গর্বের এই ভাঙাচোরা ও শ্রীহীন চেহারার বাড়িটা বাইরের লোকের চোখে যতই মূল্যহীন বলে মনে হোক না কেন, কিন্তু সত্যই মূল্যহীন নয়। এই ভয়ানক জীর্ণতা ও রিক্ততা বাড়িটার একটা ছদ্মবেশ মাত্র। বিশ্বাস বংশের সাতপুরুষ আগের সেই বিরাট সৌভাগ্যের কিছু সঞ্চয়, অন্তত পাঁচ কলস সোনার মোহর এই ঠাকুরদালানেরই কোন না কোন থামের বুকের ভিতর লুকানো আছে। আজ ঐ বিশ্বাসমশাই, কমলবাবু যাঁর নাম, যিনি প্রায় কুড়ি বছর আগে বুকের ব্যথায় কাহিল হয়ে দমদমের স্কুলমাস্টারির কাজটাও ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন, তিনি নিজের কানে তাঁর ঠাকুরদাকে বলতে শুনেছিলেন, এই বাড়ির ইঁটের আড়ালে লুকানো সেই সোনার গল্প। কমলবাবুর বয়স তখন নিতান্তই অল্প. সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরমা'র কোলের উপরে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন সেই দশ বছর বয়সের কমল বিশ্বাস। কিন্তু ঠাকুরদা'র গম্ভীর গলার স্বর শুনে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ঠাকুরমা'র কাছে এসে চাপা গলায় বলেছিলেন ঠাকুরদাদা--গল্প নয় গো গল্প নয়। একেবারে খাঁটি সত্যি কথা। পাঁচটি কলস ভরা সোনার মোহর এই থামগুলির কোন না কোন থামের কাছে মাটির নীচে লুকানো আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে...।

ঠাকুরমা বললেন—কি?

ঠাকুরদা--সেই পুঁথিটাই হারিয়ে গিয়েছে, যে পুঁথিতে লেখা ছিল, ঠিক কোন্ দিকের কোন্ থামের কাছে, মাটির কত নীচে সোনাগুলি লুকনো আছে।

ঠাকুরমা--সত্যিই এরকম কোন পুঁথি ছিল তো?

ঠাকুরদা--নিশ্চয়ই ছিল। আমিও ছেলেবেলায় দেখেছি, সেরেস্তা ঘরে একটা কুলুঙ্গিতে পেতলের তারে জড়ানো ছোট একটা পুঁথি ছিল। তা ছাড়া...।

ঠাকুরমা—কি?

ঠাকুরদা--তা ছাড়া আমি কতবার স্বপ্ন দেখেছি, ঐ বিগ্রহ পদ্মনাভ বলেছেন। চিন্তা করিস না কালিদাস, তোর পাঁচপুরুষ আগের সৌভাগ্যের সোনা ঠাকুরদালানের থামের কাছেই আছে। আমি থাকতে কোন চোরের সাধ্যি নেই যে চুরি ক'রে নিয়ে যেতে পারবে।

আজকের কমল বিশ্বাসের বয়স পঁয়ষট্টি বছর হলেও দশ বছর বয়সে শোনা সেই গল্পটা

আজও তিনি ভুলতে পারেননি। তা ছাড়া, কমল বিশ্বাসের বয়স যখন বাইশ বছর, যখন ঠাকুরদা আর ঠাকুরমা, দুজনেই কেউই আর এই জগতে ছিলেন না, তখন এক সন্ধ্যায় মা'র কান্নার শব্দ শুনে পা টিপে টিপে মা'র ঘরের কাছে গিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে এই গল্পটাকেই আর একবার নিজের কানে শুনেছিলেন।

হঠাৎ বাবাকে চাকরিটা হারাতে হয়েছিল। বড় সাহেব রাগ ক'রে বাবাকে এক মাসের মাইনে দিয়ে হঠাৎ বিদায় ক'রে দিলেন। পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরি, কিন্তু সেই চাকরিটাই যে সেদিনের এই বাড়ির সব প্রাণগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার একমাত্র উপায় ছিল।

মা'র মাথায় হাত বুলিয়ে বাবা কথা বলছিলেন--চিন্তা করবে না, ভাবনা করবার বা ভয় পাবার কিছু নেই। চাকরি গিয়েছে তো কি হয়েছে? তার জন্যে আমরা কঙ্কাল হয়ে যাব না।

--তার মানে? আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন মা।

বাবা উত্তর দিলেন, আস্তে আস্তে চাপা গলায় গভীর বিশ্বাসের এক অদ্ভুত কাহিনী শোনালেন। ছ'পুরুষ আগের সৌভাগ্যের একটা কাহিনী, পাঁচ কলস সোনা ঠাকুরদালানের কোন থামের কাছে মাটির নীচে লুকিয়ে আছে।

এই গল্প গল্প নয়। তার প্রমাণ আছে। বাবা নিজের চোখে কতবার মাঝরাতের অন্ধকারের মধ্যেই দেখেছিলেন, ছায়ার মত কে যেন একজন মস্ত বড় বল্লম হাতে নিয়ে ঠাকুরদালানের বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

--যদি অবস্থা সেইরকমই হয়, যদি দেখি টাকার অভাবে ছেলে মেয়েগুলোর পেটের ভাত যোগাড় হচ্ছে না, তবে...। বলতে বলতে বাবার চোখ দুটো যেন দপ ক'রে জ্বলে উঠেছিল।--তবে ঠাকুরদালানের ঐ থামগুলিকে উপড়ে ফেলে...।

বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গিয়েছিলেন বাবা। কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। তারপর নিজের মনেই বিড়বিড় করেছিলেন--হ্যাঁ, একটা অসুবিধা অবশ্য আছে। ঠিক কোথায় যে সোনাগুলি লুকনো আছে তা তো জানা নেই। ঠাকুরদালানের সব থাম ভাঙতে আর মাটি খুঁড়তে কম ক'রেও হাজার টাকা খরচ করতে হবে।

আরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ভেবেছিলেন বাবা। তারপরেই আবার উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলেন।--তার জন্যও ভাবনা করি না। দক্ষিণ দরজার বাগানটাকে বেচে দিয়ে অন্তত হাজার দু-এক টাকা পাওয়া যাবে। তাই দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করবো। সব থাম ভেঙে ফেলবো।

মা আশ্বস্ত হলেন কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু কমল বিশ্বাস দেখতে পেয়েছিলেন, বাবা তাঁর মনের পরিপূর্ণ বিশ্বাসের আবেগ তাঁর দু' চোখের উপর ঢেলে দিয়ে ঠাকুরদালানের থামগুলির দিকে তাকিয়ে আছেন।

দক্ষিণ দরজার বাগানটা বেচবার জন্য চেষ্টা করবার আগেই মরে গেলেন বাবা। সেদিনের সেই বাইশ বছর বয়সের কমল বিশ্বাস তাঁর বাবার ঐ চোখের দৃষ্টি দেখে সত্যিই কোন বিশ্বাসের আবেগ গ্রহণ করতে পেরেছিল কি না, সে-কথা আজ আর মনে পড়ে না। কিন্তু আজকের কমল বিশ্বাস সন্দেহ করেন, হতেও পারে তো, একেবারে অবিশ্বাস করা উচিত নয়। বরং, জোর ক'রে বিশ্বাস করতেই চেষ্টা করেন, সাতপুরুষ আগের সৌভাগ্যের সোনা আজও হাতের কাছেই আছে। ভাবনা করবার কিংবা ভয় পাবার কিছু নেই। গল্পটা বোধহয় শুধু গল্প নয়।

অন্ধকার রাতে অনেকবার ঠাকুরদালানের দিকে তাকিয়েছেন বিশ্বাস মশাই, আজকের কমলবাবু। কোন জায়গায় প্রহরীর দেহ দেখতে পাননি ঠিকই, কিন্তু অনুভব করছেন, চারিদিকের বাগানটাই যেন কেমনতর একটা আবেশে থমথম করে। জোনাকীর দল ভুলেও ঠাকুরদালানের কাছেও উড়ে আসে না। মাঝরাতে যদি ঝড় আসে, তবে একগাদা আমের মঞ্জরী কিংবা বকুলের কুঁড়ি শুধু ছিটকে এসে ঠাকুরদালানের বারান্দায় ছড়িয়ে পড়ে। মনে

হয়, চারিদিকের গাছপালাগুলিও জানে, ঠাকুরদালানের এই বারান্দাটা হলো বিচিত্র এক সৌভাগ্যের কিংবদন্তী দিয়ে গাঁথা একটা স্বপ্নের বেদী।

এমন একদিন ছিল, যেদিন এই গল্পটাকে সোজা অবিশ্বাস করতেই কমল বিশ্বাসের ভাল লাগতো। বয়স তখন ত্রিশের বেশি নয়, সামান্য কিছু পুঁজি নিয়ে একটা রপ্তানি কারবারে নেমেছিলেন। এক বছরেই হাজার দশেক টাকা লাভ হয়েছিল। কী দুরন্ত খাটুনিই না খাটতে হয়েছিল! কিন্তু তবু জীবনটা একটুও ক্লান্তি অনুভব করেনি। বরং আরও বড় আশার জোর পেয়ে বুকের দম যেন বেড়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, ঐ সব সোনার কিংবদন্তী হলো দুর্বল মানুষের দুর্বল কল্পনার ছলনা।

যাক, সেদিন আর নেই। অতীতের সেই অহংকেরে অবিশ্বাস মরে গিয়েছে। আজ বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে কমলবাবুর, বাপ-পিতামহের সেই বিশ্বাস অলীক নয়, অবাস্তবও নয়।

কিন্তু সাতপুরুষের জীবনের স্মৃতি আর সৌভাগ্যের কিংবদন্তী নিয়ে আজও এই ধ্বংসের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ঐ যে ঠাকুরদালানের থামগুলি, তারা কি কমল বিশ্বাসের অদৃষ্টকে কোন দিন অনুগ্রহ করবে না? অনেকবার ইচ্ছা ক'রে স্বপ্ন দেখতে চেষ্টা করেছেন কমল বিশ্বাস, এবং বেশ সুন্দর একটা আশ্বাসের স্বপ্ন একবার দেখেও ছিলেন। যদি টাকার অভাবে এই বাড়ির অদৃষ্টে কোনদিন কোন অপমানের আশঙ্কা ঘনিয়ে আসে, তবে সেইদিন বিগ্রহ পদ্মনাভ করুণা করবেন। কোথায় লুকিয়ে আছে সাতপুরুষ আগের সঞ্চয় সেই সোনার মোহর ভরা কলস, তার সন্ধান পেয়ে যাবেন কমলবাবু, সন্ধান পাইয়ে দেবেন ঠাকুর পদ্মনাভ। ঠাকুরঘরের ভিতরে আজও রয়েছে, ঐ যে, সাতপুরুষের সেই গৃহদেবতা, আট ইঞ্চি লম্বা কষ্টিপাথরের ছোট মূর্তিটি।

আজ রাত জেগে ঠাকুরদালানের বারান্দার উপরে বসে এই কথাই ভাবতে থাকেন কমলবাবু ; সেই আশঙ্কা কি সত্যিই আজও ঘনিয়ে ওঠেনি? ঠাকুর পদ্মনাভ কি দেখতে পাচ্ছে না, টাকার অভাবে এই বাড়ির সাতপুরুষের কঠিন গর্বের উপর যে একটা অপমানের আঘাত আছড়ে পড়বার জন্য উদ্যত হয়েছে?

ভাবনাগুলি মাথার ভিতরে বাজতে থাকে। চোখ দুটো অলস হয়ে মুদে আসতে থাকে। কমল বিশ্বাসের প্রাণটাও যেন সাড়া হারিয়ে এই রাতের স্নিগ্ধ অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যায়।

রাজবাড়ির ভাঙ্গা ইঁটের স্তূপের উপর আলকুশীর ঝোপের আড়ালে তখন ঝিঁঝির ডাক চড়া সুরে মুখর হয়ে উঠেছে। যশোর রোডের উপর দিয়ে মোটরগাড়ির চোখের আলোকের ছুটাছুটিও অনেক কম হয়ে এসেছে। রাত এগারটা বোধ হয় বেজে গিয়েছে। দত্তবাগানের ব্রিজের উপর দিয়ে একটা মালবাহী ট্রেনের মন্থর ঘর্ঘর ধীরে ধীরে টেনে-টেনে চলে গেল আর মিলিয়ে গেল।

ধড়ফড় ক'রে নড়ে বসেন কমল বিশ্বাস। তন্দ্রাটাই হঠাৎ ছটফট ক'রে ভেঙে গেল। দু হাতে চোখ ঘষে আতঙ্কিতের মত গলার স্বর কাঁপিয়ে কমলবাবু ডাকেন—শিগগির এস সুধা। একটা কথা শুনে যাও।

ঘরের ভিতর থেকে আতঙ্কিতের মত উত্তর দেন সুধাময়ী—আসছি।

কমলবাবুর স্ত্রী সুধাময়ী, মোমের মত সাদা যাঁর শরীরের রং, এবং মোমের পুতুলের মত হালকা যাঁর চেহারা। সিঁথিতে বড় বেশি চওড়া করে সিঁদুর লেপে দেন এবং চওড়া লালপেড়ে শাড়ি পরেন। কমল বিশ্বাসের বাপ চার বছর ধরে সারা নদীয়া আর যশোর টুঁড়ে ছেলের জন্য পাত্রী সন্ধান করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত এই সুধাময়ীকেই পেয়েছিলেন, কারণ সত্যিই দুধে-আলতা রং বলতে যা বোঝায়, সেই রকম রং ছিল সুধাময়ীর। আজ অবশ্য সুধাময়ীকে দেখে মনে হয় যে, দুধে আলতায় যেন প্রচণ্ড একটা ঝগড়া হয়ে গিয়েছে। দুধের

সাদাটুকু মোমের মত সাদা হয়ে গায়ে ধরে আছে, এবং আলতার লালটুকু পালিয়ে গিয়েছে। সুধাময়ীর চুলেও পাক ধরেছে, কিন্তু কমলবাবুর মাথার মত সাদা হয়ে যায়নি। শাঁখা আছে সুধাময়ীর হাতে ; ঢলঢল করে শাঁখা। মনে হয়, সুধাময়ীর রোগা রোগা দুটো হাত একসঙ্গে ঐ শাঁখার ভিতর দিয়ে পার হয়ে যেতে পারে।

ডাক্তার বলেছেন, এনিমিয়া। সুধাময়ীর শরীরে রক্তের ভয়ানক অভাব ঘটেছে। অভিযোগটা ঠিকই। একেবারে রক্তশূন্য নয়। আজই সকালে ঘুঁটেওয়ালি যখন পাওনা পয়সা চাইতে এসে পয়সা পেল না, তখন কেমন যেন মুখ বেঁকিয়ে আর ভুরু পাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে বলেছিল।—সে কি গো রাজবাড়ির বউ, সাত দিনের মধ্যে সাত আনা পয়সা দিতে পারলে না?

ঘুঁটেওয়ালির কথা শুনে সুধাময়ীর সেই মোমের মত সাদা মুখের চেহারাটাও হঠাৎ যেন লালচে হয়ে উঠেছিল, বোধ হয় বুকের ভিতরে এক ঝলক রক্ত লাফিয়ে উঠেছিল। হয় লজ্জা, নয় ধিক্কার, কিংবা নিজেরই উপর একটা অভিশাপের বর্ষণ ; যে কারণেই হোক, আজও সুধাময়ীর সাদাটে চেহারা মাঝে মাঝে যেন একটা আহত অভিমানের ব্যথায় লালচে হয়ে ওঠে। তাই সন্দেহ হয়, এখনও কিছু রক্ত আছে ঐ শরীরের ভিতরে।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এলেন সুধাময়ী, এবং এত রাত্রে কমলবাবুর মুখ থেকে এত গভীর একটা আহ্বান শুনতে পেয়েও কিছুমাত্র বিস্মিত হন না। সব সময় চিন্তা করছে, কপালের রেখা কুঁচকে রয়েছে, একটা বিনিদ্র মানুষের ডাক। প্রায় প্রতি রাত্রেই এইরকমই নিশির ডাকের মত একটা অপার্থিব ডাক শুনতে তাঁর অন্তরাত্মা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কমলবাবুর গলা থেকে এরকম আতঙ্কিত স্বরের আহ্বান কোনদিন শুনতে পাননি সুধাময়ী। কেন ডাকছেন কমলবাবু, কিসের জন্য ভয় পেয়েছেন, অনুমান করতে পারেন না।

কমলবাবু তাঁর শীর্ণ মুখটাকে গম্ভীর ক'রে বলেন—একটা স্বপ্ন দেখলাম সুধা। মনে হচ্ছে, ঠাকুর পদ্মনাভই স্বপ্নটা দেখালেন।

সুধাময়ী চমকে ওঠেন—অলক্ষুণে স্বপ্ন নয় তো?

কমলবাবু—জানি না। মোটর ওপর বোঝা গেল, কমল বিশ্বাসের ওপর ঠাকুরের দয়া আছে।

সুধাময়ীর উদ্বেগ এইবার শান্ত হয়ে যায়। কমলবাবুর কথায় আশ্বস্ত হয়ে, আবার নিজেই কমলবাবুকে আশ্বাস দেন।—সে কথা কি আর বলতে হয়!

কমলবাবু—মনে হলো, কে যেন বলছে, তুই যা করছিস তাই করে যা কমল বিশ্বাস। সোনা-টোনার ভরসায় চুপ ক'রে বসে থাকিস্ না, তাহলেই ঠকবি।

বলতে বলতে হেসে ফেলেন কমলবাবু।—ভেবেছিলাম, রামকানাইকে না ঠকিয়ে অন্য কোন উপায় হয় তো হবে। কিন্তু হবে না সুধা। ঠাকুরের ইচ্ছেই যে তা নয়।

ভীরু চোখ তুলে তাকিয়ে গুণগুণ করেন সুধাময়ী—যা ইচ্ছে হয় কর। আমাকে জিজ্ঞেসা করে লাভ কি?

চেঁচিয়ে ওঠেন কমলবাবু—বেশি ভালমানুষী দেখিও না সুধা। তোমার ছেলে আর মেয়ের মতলবের কাছে আমি হার মানবো না। আমি গরীব বলে আমার সাতপুরুষের সম্মান ওরা এত সহজে লোপাট ক'রে দেবে, সেটি হতে দিচ্ছি না।

ভয় পান সুধাময়ী, এবং সেই ভয় সহ্য করতে না পেরে হাঁসফাঁস ক'রে ভয়ে ভয়ে বলেন—কিসের মতলব? কি করেছে তোমার ছেলে আর মেয়ে? সাতপুরুষের সম্মান লোপাট ক'রে দেবে ওরা, কি ভয়ানক সন্দেহ করছো তুমি!

কমলবাবু—সন্দেহ নয়। আমি জানি।

সুধাময়ী—কি?

কমলবাবু--তোমার ছেলে আর মেয়ে দুজনই সর্বনাশের পথে যাবার জন্য তৈরী হয়েছ।

সুধাময়ী--কখ্‌খনো না। হতে পারে না। তুমি রাগের মাথায়...।

কমলবাবু--চুপ কর সুধা।

চুপ করেন সুধাময়ী। এবং কমলবাবুও তাঁর শীর্ণ মুখের ভিতরে যেন এক ফালি হাসি গিলে ফেলে প্রশ্ন করেন--তুমি সোনার গল্পটাকে সত্যিই খুব বিশ্বাস কর সুধা?

সুধাময়ী--তুমি বিশ্বাস কর বলেই বিশ্বাস করি।

কমলবাবু হাসেন--আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়েছিল, এই মাত্র। কিন্তু এইবার ঠাকুর যেন নিজেই জানিয়ে দিচ্ছেন যে, বিশ্বাস করবার দরকার নেই।

সুধাময়ী নীরব হন। কমল বিশ্বাসের গলার স্বর ঘড়ঘড় করে।--ত্রিশ বছর ধরে যা ক'রে এসেছি, তাই আবার করতে হবে। উপায় নেই সুধা।

সুধাময়ী--আমি বলি, তুমি আর এই ভাঙা-কপাল সংসারের জন্য চিন্তা করো না। কোন চেষ্টাও করতে হবে না। যা হবার হয়ে যাক, তুমি জিরোও।

কমলবাবু--আমার কর্তব্য শেষ হোক, তারপর জিরোব। ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাবার মানুষ আমি নই। তুমি জান, আমার বয়সটাই শুধু বুড়ো হয়েছে, আমার বুদ্ধি একটুও বুড়ো হয়নি।

সুধাময়ী--বুঝলাম না, কি করতে চাও তুমি?

কমলবাবু--ওরা যেন ভাল থাকে, সে ব্যবস্থা করতেই হবে। ওদের ভাল করতেই হবে। যেমন করে পারি। টাকা পয়সা নেই বলে ঘাবড়ে যাবার মানুষ আমি নই।

সুধাময়ী--যা ইচ্ছে হয় কর। কিন্তু এখন শুতে যাও।

কমলবাবু--ভুলে যাচ্ছ কেন, আজই যে এলাহাবাদের পার্থবাবুর আসবার কথা।

হ্যাঁ, আজই সেই ভদ্রলোকের পৌঁছে যাবার কথা। এলাহাবাদ থেকে আসবেন ভদ্রলোক, সোজা আকাশপথে আসবেন, এবং যদি তেমন কোন অসুবিধা না হয়, তবে দমদম থেকে সোজা এসে এই বাড়িতেই উঠবেন। এলাহাবাদের পার্থবাবু ; যার ছেলে অজিতনাথ আজ পাঁচবছর হলো ফিলসফির প্রফেসর হয়ে এখন পাঁচশো টাকা মাইনে পায়। রসিকপুরের বিশ্বাস-বাড়ির অপূর্ব সুন্দরী মেয়েকে ছেলের বউ ক'রে নিতে রাজি হয়েছেন। কোন দাবি নেই, কিন্তু কমলবাবু নিজের ইচ্ছা মতোই যা কিছু দেবেন, তা যেন বিশ্বাস-বাড়ির বনেদি সম্মানের এবং পার্থবাবুর মত কুটুম্বের সম্মানের হানিকর না হয়।

কিন্তু এই দাবিহীন দাবির মূল্য যে অন্তত দশটি হাজার টাকা, এই বাস্তব সত্যটি অনুমান করতে পারেন কমলবাবু। চুপ ক'রে বসে ভাবতে ভাবতে এই বাস্তব সত্যটাও স্মরণ করতে পারেন যে, আজ এক বছরের মধ্যে একসঙ্গে একশো টাকার চেহারা দেখবারও তাঁর সুযোগ হয়নি। এবং ভাবী কুটুম্ব পার্থবাবু যদি সত্যিই এই রাত এগারটায় সোজা এখানে এসে ওঠেন, তবে তাঁকে সাধারণ ভদ্রতার রীতি অনুযায়ী দুটো ভালো জিনিস খাইয়ে আপ্যায়ন করবার জন্য অন্তত যে দশটা টাকা দরকার হবে, তাও হাতে নেই।

সত্যিই কি পার্থবাবু সোজা এখানে এসে উঠবেন? প্রশ্নটার কূলকিনারা করতে পারেন না কমলবাবু। চিন্তার ভারে মাথাটা যেন তাঁর হাতে ধরা হুঁকোর নলের উপর আরও অলস হয়ে নেতিয়ে পড়ে। বুকের ভিতর নিঃশ্বাসটাও ভয় পেয়ে ছটফট করে। আস্তে আস্তে একটা হাত তুলে হাতের পাঁচটা শীর্ণ আঙ্গুল টান ক'রে চিরুনির মত টেনে মাথার সাদা চুলগুলিকে শুধু এলোমেলো করতে থাকেন কমলবাবু। বেলঘরিয়াতে পার্থবাবুর এক ভাগ্নে থাকে, মস্ত বড় তার বাড়ি। সেখানে গিয়ে উঠলেই তো পার্থবাবুর পক্ষে ভদ্রতার পরিচায়ক হয়।

সুধাময়ী--মনে হচ্ছে, পার্থবাবু আজ আর আসবেন না।

কমলবাবু--বেশ তো, না হয় কালই আসবেন। তার পর?

সুধাময়ী--তার পর আর কি? বাসুকে দেখুক, তারপর আশীর্বাদ করুক, তার পর...।

সুধাময়ীর মুখেই কথাটা আটকে যায়, এবং তিনিও বুঝতে পারেন যে, তারপরের সমস্যাটাই হলো আসল সমস্যা। বিয়ের খরচের জন্য অন্তত যে হাজার দশেক টাকার দরকার হবে সে টাকা আসবে কোথা থেকে?

কমলবাবু বলেন—এইবার বুঝতে পারছো তো সুধা, আগে অতীনের বিয়ে না দিলে বাসুর বিয়ে দেবার কোন উপায়ই হতে পারে না। আমার পথে এস এবার।

সুধাময়ী কমলবাবুর কাছে সরে এসে চাপা গলায় বলেন—একটু আস্তে কথা বল। অতীন বোধহয় এখনও ঘুমোয়নি। ওর কানে এসব কথা গেলে শেষে কোন উপায়ই আর করা যাবে না।

অতীনের কানে যেন কথাটা কোনমতেই না যায়। চাপা স্বরে আলোচনা করেন কমলবাবু ও সুধাময়ী। অলোচনাটা যেন ভয়ানক একটা ষড়যন্ত্রের মত ফিসফিস করে।

অনেক দিন থেকে, প্রায় এক বছর হলো অতীনের বিয়ের জন্য এক পাত্রীকে দেখে রাখা হয়েছে, পাত্রীর মামা রামকানাইবাবুর সঙ্গে অনেক আলোচনাও হয়েছে। টাকাপয়সা আছে রামকানাইবাবুর ; সেগুন কাঠের কারবারী, খড়দহ গঙ্গার ধারে মস্ত বড় বাড়ি। এহেন বড়লোকের একমাত্র ভাগ্নী, কেতকী যার নাম, এই বছরেই বি-এ পরীক্ষা দেবে যে মেয়ে, তাকে ছেলের বউ ক'রে ঘরে আনতে বড় লোভ হয়, কারণ রামকানাইবাবু বলেছেন যে, তিনি নগদে ও অলঙ্কারে দশ হাজার টাকা দেবেন। তা ছাড়া আর সব দানসামগ্রী তো আছেই।

সুধাময়ী বলেন—ওরা এত সহজে এরকম খরচ করতে রাজি হয়ে গেল কেন, তাই ভাবছি। ইচ্ছে করলে অতীনের চেয়ে ভাল পাত্র কি ওরা পেতে পারে না?

কমল বিশ্বাস হাসেন—না।

সুধাময়ী—তার মানে?

কমল বিশ্বাস—তার মানে, ওরা বিশ্বাস করেছে যে রসিকপুরের এই ভাঙা রাজবাড়ির সিন্দুকে এখনও নেই নেই ক'রেও দু'লাখ টাকার সোনা আছে, পাঁচ কলস মোহর মাটিতে পোঁতা আছে।

সুধাময়ী—কি আশ্চর্য, এরকম গল্প লোকে এত সহজে বিশ্বাস করে?

কমলবাবু আবার হাসেন। তীক্ষ্ণ হাসি, এবং অন্ধকারের মধ্যেও তার চোখ দুটো যেন ধূর্ত বিড়ালের চোখের মত জ্বল জ্বল করে। গলার একটা রুক্ষ কাশির শব্দ চেপে আস্তে আস্তে বলেন—বিশ্বাস কি করতো? বিশ্বাস করানো হয়েছে। বাগবাজারের ভটচাজ্জিকে দিয়ে গল্পটা ওদের কানে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। বিয়ে যদি হয়, আর নগদে ও অলঙ্কারে সত্যিই দশ হাজার টাকা দেয়, তবে ভটচাজ্জিকে দু'শো টাকা দালালি দিতে হবে। ভটচাজ্জির সঙ্গে এই চুক্তি করতে হয়েছে।

শুনে স্তব্ধ হয়ে থাকেন সুধাময়ী, যেন তার ঐ রোগা ও মোমের সাদা শরীরটা চমকে ওঠবারও শক্তি হারিয়েছে।

কমলবাবু—তা ছাড়া আর একটি খবরও ওদের জানিয়েছি। অতীন শিগগিরই এক বছরের জন্য বিলেত যাবে একটা পরীক্ষা দিতে। ফিরে এসে খুব ভাল মাইনের চাকরি করবে।

সুধাময়ী—এটা তো মিথ্যে কথা।

হঠাৎ রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠেন কমলবাবু—হোক মিথ্যে কথা।

তারপরেই সাবধান হয়ে, এবং গলার স্বর নামিয়ে আস্তে আস্তে বলতে থাকেন কমল বিশ্বাস—ধরে নিলাম, এবাড়ির সোনা-টোনা সবই মিথ্যে। কিন্তু সোনার গল্পটা তো মিথ্যে নয়। আমি সেই গল্পটাকেই কাজে লাগিয়েছি। একটা গল্পের জোরে যদি এত বড় একটা কাজ হাসিল হয়, তবে সেটা কি আমার দোষ হলো সুধা? যারা বিশ্বাস করে তারা দোষী নয়?

সুধাময়ী—ভগবান জানেন।

কমলবাবু—তাছাড়া, অতীন নিজেই একদিন আমার কাছে গল্প করেছে, এক বছরের জন্য বিলেতে থেকে তারপর একটা পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে পারলে ভাল চাকরি পাওয়া যেত। আমি রামকানাইকে ডাহা মিথ্যে কথা বলিনি সুধা।

সুধাময়ী—যাকগে, এখন কি ঠিক করেছ বল?

কমলবাবু—ভাবছি, নগদ আরও এক হাজার দাবি করবো। যদি আপত্তি করে আর কিছু বলবো না। রামকানাইবাবুর ভাগ্নীর সঙ্গে অতীনের বিয়েটা চুকিয়ে দিতে চাই।

সুধাময়ী আবার হঠাৎ বোবার মত নীরব হয়ে কি যেন ভাবতে থাকেন। তার পরেই মনে হয়, তাঁর বুক ঠেলে ক্ষীণ পাঁজরগুলিকে কাঁপিয়ে একটা ফোঁপানির শব্দ ঠেলে ঠেলে উঠতে চাইছে।

কমলবাবু বিচলিত ভাবে প্রশ্ন করেন--কি হলো সুধা? ওরকম করছো কেন?

সুধাময়ী—মেয়েটি কি খুব কালো?

কমলবাবু—হ্যাঁ...কিন্তু...তেমন কিছু নয়...কিইবা এমন কালো?

সুধাময়ী—নাক মুখ চোখ দেখতে কেমন?

কমলবাবু—ভালই তো...তার...মানে কিই বা এমন খারাপ?

সুধাময়ী—স্বাস্থ্য?

—ও, চমৎকার স্বাস্থ্য। বলতে গিয়ে কমলবাবুর শীর্ণ গলার স্বর উল্লাসে যেন লাফিয়ে উঠে প্রশংসা করে।—এমন স্বাস্থ্য কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়।

রাত দুপুরের নীরবতা আর অন্ধকারের মধ্যে ফাটলধরা বারান্দার এক কোণে বসে রসিকপুরের রাজবাড়ির এক অদ্ভুত চক্রান্তের পিতা ও মাতা তাঁদের রিক্ত ও নিঃস্ব সংসারের একটা অসহায়তার নিষ্পত্তি করবার মত একটা উপায় খুঁজে বের করেন। রাজি হয়েই আছেন কমলবাবু, রাজি হন সুধাময়ী। আগে অতীনের বিয়ে দিয়ে টাকা যোগাড় কর হোক, তারপর সেই টাকা দিয়ে বাসুর বিয়ের খরচ মেটানো যাবে। যদি কাল আসেন পার্থবাবু, আসবেন নিশ্চয়, তবে একেবারে দিন ঠিক করে ফেলতে হবে।

সুধাময়ী বলেন—যাক, সমস্যা মিটে গেল, এবার শুতে যাও।

কমল বিশ্বাসের গলার স্বর রুষ্ট সরীসৃপের নিঃশ্বাসের মত ফোঁস ক'রে বেজে ওঠে—না।

সুধাময়ী—কেন?

কমলবাবু—সমস্যা মিটে যায়নি।

সুধাময়ী—কিন্তু এখানে শুধু বসে থেকে....

কমল বিশ্বাস—হ্যাঁ, এখানেই আজ আমাকে শ্মশান-পিশাচের মত জাগা চোখ নিয়ে বসে থাকতে হবে।

রসিকপুরে ভাঙা রাজবাড়ির চারিটি প্রাণের মধ্যে দুটি প্রাণ এই মাঝরাতের প্রহরে জাগা চোখে ষড়যন্ত্র করে, এবং আর দুটি প্রাণ তখন অন্য দুটি ঘরের ভিতরে গভীর ঘুমে স্বপ্ন দেখছে! কমলবাবু আর সুধাময়ী, বাপ ও মা, দুজনেই জানেন, কেমন ওদের স্বপ্ন। এবং জানেন বলেই আবার দু'জনের কপালে চিন্তার রেখা কুঁচকে ওঠে।

আজেবাজে কোন মেয়েকে বিয়ে করত রাজী নয় অতীন। এবং বাসনা অর্থাৎ বাসুও সে-রকম মনের মেয়ে নয়, যে-মেয়ে একটা আজবাজে মানুষকে স্বামী হিসেবে পেলে সেই অদৃষ্টকে শান্তভাবে মেনে নেবে কিংবা সুখী হবে। কমলবাবু জানেন, সুধাময়ী জানেন, তাঁদের ছেলে আর মেয়ে দু'জনেই তাদের জীবনের সব চেয়ে বড় যে সাধের স্বপ্ন পুষে রেখেছে, সে স্বপ্নের মধ্যে কোন নিঃস্ব রিক্ত দরিদ্র ও কুশ্রী মানুষের ছায়াও নেই। মনের মত না হলে ঐ দু'জনের কেউই বিয়ে করবে না। ওদের শিক্ষা, ওদের রুচি, ওদের আশা আর স্বপ্ন, সবই

এমন কাউকে বরণ ক'রে নেবার জন্য তৈরী হয়ে আছে, যাকে বরণ করতে পারলে, ওরা মনে করে, ওদের রূপের গুণের আর স্বপ্নের অসম্মান হবে না।

বাসনা দেখতে সুন্দর, বেশ সুন্দর। লেখা-পড়ার দিকে ঝোঁকও আছে খুব বেশী। থাকলে হবে কি? ঐ ম্যাট্রিক পাস করবার পর মাত্র পাঁচটি দিনের মত কলেজে পড়বার সুযোগ হয়েছিল। তারপর আর নয়।

একদিন কলেজ থেকে ফিরে এসে, এবং মনে মনে নিজের জীবনটাকেই ধিক্কার দিয়ে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়েছিল বাসনা। সেদিনই কলেজে পড়বার আশা মন থেকে উপড়ে ফেলে দিতে হয়েছিল। কারণ? কলেজে যাবার মত সাজ করবার, অর্থাৎ ভাল একটা রঙীন শাড়ি পরবারও সামর্থ্য নেই যে মেয়ের, সে মেয়ের পক্ষে কলেজে পড়া উচিত নয়। ক্লাসেরই কোন্ এক বান্ধবী একটা ঠাট্টা করেছিল, এবং সেই ঠাট্টা সহ্য করতে পারেনি বাসনা।

—শুনেছি, তুমি নাকি রসিকপুর থেকে পড়তে আস?

বাসনা বলে—হ্যাঁ।

—এত দূর থেকে?

—হ্যাঁ, তবে মোটর বাসে এলে সামান্য দূরে কিই বা আসে যায়?

—বাসে চড়ে আস নাকি?

—হ্যাঁ।

—কি আশ্চর্য, আমি মনে করেছিলাম, নিজেদের মোটর গাড়িতে আস?

—ভুল মনে করেছিলে।

—তাই তো...।

—কি?

—এখন বুঝতে পারছি, রসিকপুরের রাজবাড়ির মেয়ে কেন এরকম একটা...।

—কি?

—সত্যি ভাই, এরকম একটা বাজে, তা'ও আবার আধময়লা শাড়ি, তোমাকে একটুও মানায় না।

এই ঘটনার বয়সটাও প্রায় সাত বছর। আজ বাসনার সুন্দর চেহারাটা পঁচিশ বছর বয়সের সীমানা পার হয়ে ছাব্বিশে পা দিয়ে যেন আরও সুন্দর হয়ে আর ভরাট হয়ে রূপের জ্যোৎস্না ছড়ায়। ভাঙা রাজবাড়ির পুকুরের ভাঙা সিঁড়ির কাছে যখন একলা বসে কাপড়-চোপড় সাবানকাচা করে বাসনা, তখন ওর চেহারাটাকে আরও অদ্ভুত দেখায়। হঠাৎ মনে হয়, যেন পুরাকালের কোন রাজপুত্রীকে কেউ চুরি ক'রে নিয়ে এসে এখানে দাসী করে রেখেছে।

শুধু মনে হবে কেন? এইরকম একটা কথা একদিন মুখ খুলে বলেই ফেলেছিলেন মনুমাসি, সুধাময়ীর বড়দি। পূজার সময় একদিনের জন্য এই রসিকপুরে বেড়াতে এসে বোনের একমাত্র মেয়ে বাসনার দশা দেখে আক্ষেপ করছিলেন মনুমাসি, এত রূপ, এমন সুন্দর মেয়েটা, সত্যিই সুধা, তোদের ঘরে এই মেয়েকে পাঠিয়ে বড় ভুল করেছেন ভগবান।

মনুমাসির কথা শুনে চমকে উঠেছিল বাসনা, এবং ঘরের ভিতরে এসে দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ ধরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের এই চেহারাটাকেই দেখেছিল। এবং মনুমাসির কথাগুলিকে স্মরণ করতে গিয়ে বুঝতে পেরেছিল বাসনা, ভগবানও অবিচার করেন।

মনে মনে অস্বীকার করেন না সুধাময়ী, যদিও বড়দির অভিযোগটা সহ্য করতে গিয়ে তাঁর মোমের মত সাদা চেহারাটা থর থর করে কেঁপে ওঠে আর মুখের উপর একটা লালচে জ্বালা ফুটে ওঠে। কিন্তু বড়দি তো অন্যভাবেও কথাটা বলতে পারতেন। যদি মেয়েটাকে এতই সুন্দর করেছিলেন ভগবান, তবে এই বাড়ির সিন্দুকে বিশটা হাজার টাকাও জমতে

দিলেন না কেন? তা হলেই তো বাসনাকে আজ আর পুকুরঘাটে বসে কাপড় কাচতে হতো না। এইখানেই তো অবিচার হয়েছে। এরকম ভয়ানক একটা দারিদ্র্য দিয়ে এই সংসারটাকে এত বড় শাস্তি ভগবান কেন যে দিচ্ছেন, এবং তাতে ভগবানের কি যে লাভ হচ্ছে, এই প্রশ্ন না ক'রে বড়দি সোজা এই বাড়ির দারিদ্র্যকেই ধিক্কার দিয়ে বসলেন।

বড়দির কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, তিনি এই বাড়ির দীনতা আর রিক্ততার উপর যত খুশি ইচ্ছে রাগ করতে পারেন, কারণ তিনি নিজে শুধু তার টাকার জোরেই তাঁর পাঁচটি কালো-কালো, রোগা-রোগা আর বেঁটে-বেঁটে মেয়েকে বড়-বড় ঘরে বিয়ে দিতে পেরেছেন। তাঁর পাঁচটি জামাই যেমন ভাল রোজগেরে, তেমনি দেখতে সুন্দর। কিন্তু...কিন্তু সুধাময়ী জানেন, এবং কমলবাবুও তাঁর এই জীবনটাকেই চোরের মত অপরাধী বলে মনে করেন, কারণ তাঁদের ছেলে আর মেয়েও যে এই বাড়ির দারিদ্র্য এবং এই শ্রীহীন ভাঙা-চোরা অদ্ভুত দশার উপর রাগ আর অভিমান করতে একটুও দ্বিধা করে না।

শ্রাবণের ধারায় স্নান ক'রে রসিকপুরের এই রাজবাড়ি যতই স্নিগ্ধ হয়ে উঠুক না কেন, এই বাড়ির মেয়ের নতুন চোখে এই বাড়ির জন্য কোন স্নিগ্ধতার আবেশ জাগে না। ভাঙা ইঁটের কতগুলি স্তুপের জন্য কতটুকুই বা মায়া থাকতে পারে? এই ভাঙাবাড়িটা যে অহরহ একটা দীনতার জীবন, মন্দ ভাগ্য আর রিক্ততার দুঃখ স্মরণ করিয়ে দেয়। ক্ষমা করতে পারে না, সহ্য কবা দূরে থাক ; চলে যেতে হবে, আর বেশি দিন এই অভিশপ্ত সংসারের কুঠুরির মধ্যে পড়ে থাকতে হবে না, এই আশা নিয়ে বড় হয়ে উঠেছে, এই বাড়ির মেয়ের জীবন। কিন্তু এই আশাটাও যে একটা ছলনা। মেয়ের বিয়ে দেবার সাধ্য নেই এই বাড়ির বাপের।

ছেলেবেলার কথা ধরতে নেই, তখন এই আলকুশীর ঝোপের কাছে কাদা ভরা গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকা গোসাপটাকেও দেখতে কত ভাল লাগতো। চৈত্র মাসের সন্ধ্যায় কনকচাঁপা ঝরে পড়তো মাটিতে, খুবই ভাল লাগতো সেই ফুল কুড়িয়ে নিয়ে পুজো পুজো খেলা করতে। আজও তো সেইরকম সবুজ টিয়ার ঝাঁক এসে বাগানের পেয়ারা খেয়ে চলে যায়, এবং দেখতে যদিও আজ একটুও ভাল লাগে না, কিন্তু একদিন দু'চোখ ভরে দেখে দেখেও যে মনের সুখ পূর্ণ হতো না। কিন্তু এই সবই শৈশবের একটা বোকা মনের ভালোলাগার ব্যাপার। সত্যি কথা হলো, আজ বেশ একটু ঘৃণাই হয়। গান এত ভালবাসে যে বাসনা, এবং ছেলেবেলাতে গলা খুলে কতই না গান এই ভাঙা বারান্দায় বসে যে মেয়ে গেয়েছে, সে মেয়ে আজ আর ভুলেও কোন গান গায় না। আকাশে সোনার থালার মত চাঁদ জেগে উঠলেও না, কিংবা হেমন্তের ভোরে আকাশে সিঁদুরে রং সোনালী হয়ে উঠলেও না। বাসনার চেহারা, বাসনার বয়স, বাসনার নিঃশ্বাসগুলিও যেন অভিমানে ও অভিযোগে ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছে।

বাসনার মুখ থেকে এমন কথাও হঠাৎ এক-এক সময় যেন রুষ্ট ধিক্কারের মত ফেটে পড়েছে—শুনেছি আগে নাকি মেয়েকে আঁতুড় ঘর থেকেই নিয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেবার নিয়ম ছিল মা?

সুধাময়ী ভীতভাবে বলেন—হ্যাঁ, গল্পে পড়েছি, ঐ রকম কুসংস্কার অনেক মানুষ মানতো।

বাসনা বলে—তোমাদের কালে নিয়মটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কেন?

সুধাময়ী—তার মানে?

বাসনা—নিয়মটা থাকলে ভাল ছিল।

সুধাময়ী বলেন—বলে নে, যা মন চায় তাই বলে নে বাসু, ভিখিরীর মত গরীব বাপ-মা পেয়েছিস ; কথাগুলি এত সহজে বলতে পারলি।

এহেন অভিমানিনী মেয়েকে যোগ্য পাত্রের হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার মত একটা উপায় এতদিনে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। তবু কমল বিশ্বাস ছটফট করছেন কেন? এবং রাত

জেগে বসে থাকেন কেন?

সুধাময়ী বলেন—রাত হয়েছে, এবার শুতে যাও। আর চিন্তা করবার কিছু নেই।

কমলবাবু হাসেন—তুমি অনেক কিছু জেনেও অনেক কিছু জান না সুধা, তাই তোমার পক্ষে আমার মত রাতজাগা পিচাশের মত প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসে থাকবার আর চিন্তা করবার দরকার হয় না। তাই ওকথা বলতে পারছো।

সুধাময়ী আতঙ্কিতের মত তাকান—কি জানি না?

কমলবাবু—আমার বিশ্বাস, আজই রাত্রে তোমার বড় ননদের সেই সুপুত্রটি, সেই রতন এখানে চুরি করবার জন্য গাড়ি নিয়ে হাজির হবে।

ভয় পেয়ে ডুকরে ওঠেন সুধাময়ী—রতন কেন আসবে? এখানে এসে কি চুরি করবে রতন?

কমলবাবু—তুমি কি স্বপ্নেও ভাবতে পার যে, একবছর ধরে রতনের কাছ থেকে তোমার মেয়ের কাছে চিঠি আসছে, আর তোমার মেয়েও খুশি হয়ে রতনের চিঠির উত্তর দিচ্ছে?

আরও আতঙ্কিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন সুধাময়ী—রতন? কি সর্বনাশের কথা! রতন যে বাসুর আপন পিসতুত দাদা হয় সম্পর্কে ; ছাব্বিশ বছরের ধিঙ্গি মেয়ে কি তা জানে না?

চোখ ছলছল করেন সুধাময়ী এবং একই সুরে আবার আক্ষেপ করেন—রতনকেও বলিহারি, পাগলেরও এমন চরিত্র হয় না। ছি ছি।

কমলবাবু—ছি ছি কর তোমার মেয়েকে, যে মেয়ে পাগল হয়েছে ; প্রতিজ্ঞা ক'রে রতনকে চিঠি দিয়েছে যে, রতন যদি ওকে বিয়ে করতে রাজি না হয়, তবে আত্মহত্যা ক'রে ভালবাসার অপমানের জ্বালা দূর করবে।

—ছি-ছি-ছি। বলতে বলতে আঁচল তুলে চোখ মোছেন সুধাময়ী।

কমলবাবু—রতন কি করে জান তো?

সুধাময়ী—না।

কমলবাবু—চা-বিস্কুটের একটা দোকান করেছে। তাতে কি রোজগার হয় জানি না। কিন্তু রেস খেলে মাঝে মাঝে টাকা পায়, আর সাহেবী সাজ সেজে একটা সাইকেলে ঘুরে বেড়ায়।

সুধাময়ী—এত অহংকারের মেয়ে, গরীব লোককে এত ঘেন্না করে যে মেয়ে তার মনের এ দশা হলো কেমন ক'রে, আশ্চর্য।

কমলবাবু—আমি একটুও আশ্চর্য হইনি সুধা। আমার চেয়ে একটু কম গরীব হলেই বড়লোক হয়ে গেল। অন্তত তোমার মেয়ে বোধ হয় তাই মনে করে। তা না হলে...।

সুধাময়ী—কি?

কমলবাবু—একটা চিঠিতে বাসুকে ভালবাসা জানিয়ে রতন লিখেছে, তোমার জন্য একটা উপহার কিনেছি বাসনা। এক শো ছাপ্পান্ন টাকা দাম, একটা সোনার হেয়ারপিন, সুন্দর দুটি বর্মা রুবি বসানো। আমি চাই নিজের হাতে এই হেয়ারপিন তোমার খোঁপায়...বল কবে আসবে আমার উপহার নিতে।

সুধাময়ী—আবার গলার স্বর চেপে গুন গুন ক'রে কাঁদতে থাকেন।

কমলবাবু বলেন—এখানে থেকে আমাকে বিরক্ত না ক'রে তুমি বরং শুতে যাও।

সুধাময়ী বলেন—না।

ছেলে অতীন বিশ্বাসও কি তার এই সাতপুরুষের ভিটাকে কোনদিন ভাল চোখে দেখতে পেরেছে? কোনদিনও না, ছেলেবেলার কথা অন্য কথা, তখন এই ভাঙা বাড়ির একটা কাঠবিড়ালীকেই কত বড় সম্পদ বলে মনে হতো। কিন্তু আজ এই প্রকাণ্ড ও প্রায় ধ্বংসস্তূপের মত দেখতে, আধ-মরা ও আধ-বাঁচা বাড়িটাকে একটা শ্মশানের টুকরো বলে

মনে হয়। যেন একটা অপমানের কুণ্ড, আর বেশি দিন এখানে থাকলে অতীন বিশ্বাসের মত শিক্ষিত ও সুন্দর চেহারার জীবন যেন জোঁক আর শেওলার কামড়ে পচে যাবে। রসিকপুরের রাজবাড়ির ছেলে, এই পরিচয়টা কারও কাছে প্রকাশ করাই একটা অপমান। শুনলেই চোখে যেন একটা ঠাট্টার আমোদ চমকে ওঠে। লোকে জানে, রসিকপুরের রাজবাড়ির বর্তমান মালিক যিনি, তিনি হলেন দমদমের এক স্কুলের প্রাক্তন মাস্টার, যিনি বেশ মোটা একটা ফাণ্ডের হিসেব গোলমাল ক'রে দিয়ে, আর বুকের ব্যথার ছুতো ক'রে কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। দমদম আর ব্যারাকপুরের আদালত মহলে ঐ কমল বিশ্বাসকে কে না চেনে? এমন চমৎকার মিথ্যে সাক্ষী আলিপুরের বটতলাতেও পাওয়া যায় না। পুরো পনেরটা বছর শুধু এই চমৎকার মিথ্যে সাক্ষীর কারবার ক'রে বেশ দু'পয়সা রোজগার করেছেন। কিন্তু এখন আর পারেন না, কারণ বয়সের জন্য লোকটার স্মরণশক্তি ঢিলে হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তা বলে দমে যান নি। আজও শুধু ধার আর ধূর্ততা করে পেট চালিয়ে যাচ্ছেন।

কমল বিশ্বাসের ছেলে বলে নিজের পরিচয় দিতেও বাধে, এবং অতীনের মত ছেলের মনের এই বাধাটাকে নিন্দা করা যায় না। সত্যিই দু'টো টাকা বাগাবার জন্য কি না করতে পারেন কমল বিশ্বাস? এত বয়স হয়েছে, বয়সের ভারে জীর্ণ হয়ে গিয়েছে শরীরটা, মাথার সব চুল সাদা, তবু যে-কোন মিথ্যে কথা অক্লেশে বলে দিতে বুড়ো মানুষটার বিবেকে একটুও বাধে না। বিবেক আছে কি? সন্দেহ করে অতীন। লজ্জা অনুভব করতে হয়, এবং মাঝে মাঝে একলা ঘরের নিভৃতে যখন নিজের জীবনের আশা-ভরসাগুলির হিসেব নেবার চেষ্টা করে অতীন, তখন লজ্জা পায়। তার শিক্ষা বিদ্যা ও ত্রিশ বছর বয়সের এই শরীরটাও যে এই বাড়ির ত্রিশ বছরের ধূর্ততা নীচতা ও দীনতার কাছে ঋণী। এম-এ পাশ করেছে অতীন এবং আজ একটা চাকরিও করছে। কিন্তু মাঝে মাঝে গভীর ক্ষোভের জ্বালায় মনের ভিতর যেন একটা বিদ্রোহ জ্বলে ওঠে—এমন লেখাপড়া না শেখাই উচিত ছিল।

অতীনের পড়ার খরচ যোগাড় করবার জন্য ঐ কমল বিশ্বাস কি না কাণ্ড করেছেন! শুধু প্রতিবেশীদের কাছে নয়, দূর-সম্পর্কের আত্মীয় আর কুটুম্বদের কাছে গিয়েও একটা মস্ত গল্পের ফাঁদ পেতে কিছু টাকা হাতড়ে নিয়ে এসেছেন। ঐ যে, যে মনুমাসি সেদিনও একবার এসে ঘুরে গিয়েছেন, তিনিও রেহাই পাননি। অতীনের ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় ফী যোগাড় করবার ধান্দায় এদিক-ওদিক দুদিন ঘোরাঘুরি ক'রে আর ব্যর্থ হয়ে সোজা মনুমাসির কাছে গিয়ে একটা গল্প ফেঁদেছিলেন কমলবাবু—ব্যারাকপুরের এক সাহেবের সুন্দর একটা বাড়ি বড় অল্প দামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বড়দি। বাজার দর অনুসারে ষোল হাজার টাকা দাম হয়। কিন্তু সাহেব আমাকে বলেছেন মাত্র পাঁচ হাজার পেলেই তিনি খুশি। বাড়িটা আপনার জন্য ধরে রাখবো নাকি বড়দি?

মনুমাসি চেঁচিয়ে ওঠেন—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

—তাহলে কিছু বায়না করুন ; অন্তত শ' পাঁচেক টাকা।

মনুমাসির কাছ থেকে সেই যে পাঁচশ' টাকা হাতে নিয়ে চলে এলেন কমলবাবু, তারপর থেকে এই সাত বছরের মধ্যে মনুমাসি তাঁর টাকা আর ফেরৎ পেলেন না। সাহেবটাই ঠগ, টাকাটা বাগিয়ে নিয়ে হঠাৎ বিলেত চলে গেল, এই মিথ্যা গল্পের জোরে এবং সাত বছর ধরে শুধু আক্ষেপ ক'রে ক'রে মনুমাসিকে ভুলিয়ে রেখেছেন কমলবাবু।

এই রসিকপুরের রাজবাড়ির বাপ। এহেন মানুষের উপর অতীনের মত ছেলের পক্ষে কতটুকুই বা শ্রদ্ধা থাকা সম্ভব?

শ্রদ্ধা দূরে থাক, আজ যে সত্যিই এহেন মানুষকে বেশ ভয় করতে হচ্ছে। কারণ, আজ অতীনের জীবনটাই কমল বিশ্বাসের দাবির সম্মুখে এসে পড়েছে। বড় কঠোর দাবি। এতদিনে ধরে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করেছি, এখন ঋণ শোধ কর, দাবিটা সোজা কথায় এই রকমেরই।

বড় হয়েছে, চাকরি করছে অতীন, এই সবই যে এই ভাঙাবাড়ির একটা ধূর্ত অন্তরাত্মার স্বার্থপর করুণার কীর্তি। এবং সত্যিই, অতীনের চাকরির দুটো মাস পার হতে না হতে সোজা দাবি করে বসে আছেন কমলবাবু, এইবার যেমন করে পার বাসুর বিয়ের খরচটা যোগাড় কর অতু। আমার বুকে আর দম নেই।

মাত্র একশ' দশ টাকা মাইনের একটা চাকরিকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করেছে অতীন। এই চাকরি তার জীবনের কাম্য নয়। এই ভাঙা রাজবাড়ির ক্ষুধিত অন্তরাত্মার সব দাবি মেটাবার জন্য এই চাকরি ধরেনি অতীন। মানুষের মত সেজে বাইরের সভ্য সংসারে ঘোরা-ফেরা করতে হলে যা না হলেই নয় সেই দু-চারটে ভাল পোশাক, দু-চারটে ক্লাবের চাঁদা, ক্রিকেটের সীজন টিকিট, মাঝে মাঝে চীনা রেস্তরাঁতে লাঞ্চ, তাও যে এই একশ' দশ টাকায় কুলোয় না।

তবে আশা আছে, ভাল একটা সার্ভিস পাবার সুযোগ দেখা দিয়েছে এবং এক বছরের মত বিলেতে গিয়ে একটা পরীক্ষা দেবার দরকারও হতে পারে। যদি সে আশা ব্যর্থ হয়, তবেই বা কি আসে যায়? কাজরী চৌধুরীর মত মেয়ের ভালবাসা অতীনের টাকা থাকা বা না-থাকার উপর নির্ভর করে না। সে মেয়ে অতীনের জন্যই অতীনকে ভালবাসে। অগর ফিরদৌসে বা রুয়ে জমিনস্ত, যদি ভূলোকে কোথাও স্বর্গ থাকে, তবে সে স্বর্গ হলো বিনা সর্তে ভালবাসাবাসির একটি ঘর। অতীন জানে, তার জীবনটা আর রসিকপুরের এই রাজবাড়ির ভাঙা ইঁটের কারাগারে বন্দী হয়ে থাকবে না। নিজের মনের মত একটি ভালবাসার ঘর নিজের হাতে গড়ে নিতে পারবে অতীন।

কিন্তু সে সুযোগ দেবে কি এই বাড়িটা? কমল বিশ্বাস আর সুধাময়ী? এরা সে সুযোগ দেবে না, দিতে পারে না। অতীনকে নিজেরই মনের জোরে এদের নাগাল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যেতে হবে। কাজরী চৌধুরী যদিও চিরকাল অপেক্ষা করতে রাজি আছে, কিন্তু কোন সন্দেহ নেই, অতীনের সঙ্গে একটি ভালবাসার ঘরে ঠাঁই নিতে পারলে নিশ্চিন্ত হয়ে আরও সুখী হবে কাজরী, এবং অতীনও নিশ্চিন্ত হবে। কাজরী চৌধুরী সব সময়েই প্রস্তুত, শুধু অতীন যে-কোন একটি দিনে প্রস্তুত হলেই হয়, তবে সেদিনই বিয়ে হয়ে যেতে পারে।

কয়লাঘাটের জাহাজ অফিসে যে চাকরিটা করে কাজরী, সে চাকরিটা মাইনের দিক দিয়ে অতীনের ঐ সেলসম্যানগিরির চেয়ে ভাল। মারোয়াড়ির অটোমোবিল শো-রুমে নতুন সেলসম্যান অতীনের মাইনের প্রায় দু'গুণ মাইনে পায় জাহাজ অফিসের সেকেণ্ড ক্লার্ক কাজরী চৌধুরী। সুতরাং দু'জনে যদি এক ঠাঁই হয়, তবে দু'জনের রোজগারের টাকাও এক ঠাঁই হবে, এবং চলে যাবে দিন ; টাকায় বড়লোক হবার জন্য যারা স্বপ্ন দেখে না, যারা শুধু ভালবাসায় বড় হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, তাদের পক্ষে ঐ টাকাতেই সুখী হতে কোন অসুবিধা নেই।

চন্দননগর থেকে প্রতিদিন সকাল ন'টা পঁয়ত্রিশের লোকাল ট্রেনের একটি মেয়ে-কামরার জানালা দিয়ে সুন্দর একটি মুখ উঁকি দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে, সে মুখ হলো কাজরী চৌধুরীর মুখ। সে মুখের সুন্দরতাও একটা রহস্য। কেন যে কাজরী চৌধুরীর মুখটা দেখতে এত সুন্দর বলে মনে হয়, বোঝা যায় না। ঐ চোখ, ঐ নাক, ঐ ঠোঁট, কোনটিই নিখুঁত নয়। ঐ মুখের রং ফরসা হলেও সেটা অসাধারণ রকমের কিছু নয়। কিন্তু সব মিলিয়ে বেশ একটু অসাধারণ সেই রূপ, জ্যোৎস্না রাতের বনের ঝড়ের মত। কিছু নেশা, কিছু পিপাসা, কিছু বেদনা, সব একসঙ্গে মিলে মিশে হেসে উঠলে যেমন হয়, প্রায় তেমনই। কাজরী চৌধুরীর মুখের সুন্দরতা যেন তপ্ত শোণিতের আবেদন। ছোট একটা হাসির শিহর সব সময় থমকে থাকে সেই মুখে, স্নিগ্ধতার প্রলেপের মত। কাজরী চৌধুরীর সুন্দর মুখের এই স্নিগ্ধতার

প্রলেপ মিথ্যা ক'রে দিয়ে গনগনে আগুনের আভার মত একটা রক্তিম বিহ্বলতা যেদিন প্রথম ফুটে উঠেছিল, সেদিন আর কেউ নয়, ঐ অতীন বিশ্বাসই কাজরীর চোখের সামনে একা দাঁড়িয়েছিল।

পার্ক স্ট্রীটের সেই মারোয়াড়ীর অটোমোবিল শো-রুমের পাশেই যে বিরাট একটা বারান্দা সেই বারান্দায় ছবির প্রদর্শনী খুলেছিল কলকাতার এক শিল্পোৎসাহী সমিতি, গ্রেট আর্ট সোসাইটি। সে সমিতির পেট্রন অসিত দত্ত ছিলেন কাজরীদের চন্দননগরের বাড়ির নিত্য সন্ধ্যায় চা-এর অতিথি। তিনিই খুব পীড়াপীড়ি করেছিলেন, তাই কাজরী চৌধুরীকে ঐ প্রদর্শনীর অরগ্যানাইজিং সেক্রেটারি হতে হয়েছিল।

প্রদর্শনী যেদিন শেষ দেখা দিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে, সেই দিন প্রদর্শনীতে দর্শকের সমাগম ছিল না। সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠতেই একজন মাত্র দর্শক আনমনার মত হেঁটে হেঁটে প্রদর্শনীর ভিতরে ঢুকতেই একটু কৌতূহলী হয়ে আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়েছিল অর্গানাইজিং সেক্রেটারি কাজরী চৌধুরী।

—আসুন, কাছে এগিয়ে যেয়ে ভদ্রতা করতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায় কাজরী চৌধুরী। অপলক চোখে আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। লজ্জা, হ্যাঁ লজ্জাই বটে, কিন্তু অদ্ভুত এক পিপাসাতুর লজ্জা কাজরী চৌধুরীর মুখটা গনগনে আগুনের আভায় রঙীন হয়ে ওঠে। সেই আগন্তুক হলো অতীন বিশ্বাস।

অ্যাপোলোর ছবি নয়, অ্যাপোলোর জীবন্ত যৌবন যেন প্রদর্শনীর ঘরে ঢুকেছে। দেখতে কী ভয়ানক সুশ্রী এই ভদ্রলোক! কাজরীর সেই তপ্ত মুখচ্ছবির দিকে তাকিয়ে অতীন বিশ্বাসেরও মনে হয়েছিল, তার ত্রিশ বছর বয়সের সবচেয়ে বড় আশা আজ ধন্য হয়ে গেল।

আলাপ হতে দেরি হয়নি, এবং সে আলাপ একেবারে নিবিড় ও মধুর হয়ে উঠতে একঘণ্টারও বেশি সময় লাগেনি। কাজরীই অনুরোধ করেছিল, তবে চলুন, যদি সন্দেহ না করেন, আমাকে একেবারে চন্দননগর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

কাজরীদের চন্দননগরের বাড়ি, বাড়ির উপরতলার যে বারান্দায় বসলে কনভেন্টের গির্জাটাকে স্পষ্টই দেখা যায়, সেই বারান্দায় বসে চা খেয়ে ফিরে চলে এল অতীন।

বাড়ি ফিরতে রাত হয়েছিল অতীনের ; ঘুমোবার জন্য অনেক চেষ্টা করলেও সে-রাতে ঘুম আসেনি। রসিকপুরের ভাঙাবাড়ির একটা ছোট ঘরের বদ্ধতা বড় দুঃসহ মনে হয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে, প্রায় রাতদুপুর পর্যন্ত পুকুরঘাটের সিঁড়িতে বসে আর দূরের কারখানার সারি সারি চিমনির ছায়াময় লম্বা লম্বা শরীরগুলির দিকে তাকিয়ে থেকেও চোখ দুটো ক্লান্ত হয়নি। বুঝতে পেরেছিল অতীন, ঘুমোতেই ইচ্ছে করছে না। কাজরী চৌধুরীর খোঁপার গন্ধ বুকের কাছে লেগে রয়েছে। অদ্ভুত, কাজরী চৌধুরীর প্রাণ যেন যুগ যুগ ধরে অতীনেরই প্রতীক্ষায় ছিল! একটি দিনেই, পরিচয়ের পর তিনটি ঘণ্টাও পার হয়নি, চা-এর আসর থেকে অতীনকে বিদায় দিতে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই আলোর সামনেই অনায়াসে একটি পরম উপহার আশা ক'রে অতীনের মুখের কাছে মুখ তুলে তাকিয়েছিল কাজরী।

—কাল আবার দেখা করবেন, প্রতিজ্ঞা করুন অতীনবাবু। কাজরীর সেই অনুরোধের ভাষা অতীনের বুকের ভিতরে ঝংকার দিয়ে বাজে, তাই ঘুম আসে না। মনে পড়ে অতীনের, কথা দিয়ে এসেছে অতীন—দেখা করবো। আপনি না বললেও দেখা করতাম।

বাপের এই জীর্ণ ও রোগা চেহারাটাকে দেখে করুণা হলেও বাপের চোখের দৃষ্টিকে যেমন ঘৃণা তেমনই ভয় করে অতীন। এবং এই তো, এক মাসও পার হয়নি, সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছে অতীন। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এবং বড় বেশি খুশি মনে একটা চিঠি লিখতে মাত্র কলম তুলেছিল অতীন, কমলবাবু এসে বললেন—এইবার আর দেরি করতে পারি না অতু।

অতীন—কিসের দেরি?

কমলবাবু—বাসুর বিয়ে দিতে আর দেরি করা উচিত নয়।

অতীন—বিয়ে দিন তা হ'লে। দেরি করতে বলছে কে?

কমলবাবু তাঁর রোগা গলাটাকে টান ক'রে দুটি চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে অতীনের মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলেন—তুমি খরচটা দিতে দেরি না করলেই হয়।

অতীন—আমি খরচ দেব কোথা থেকে?

কমলবাবু—যেখান থেকে পার।

অতীন—এরকম কথার কোন মানে হয় না।

কমলবাবু—খুব হয়। তোমাকে মানুষ করার জন্য আমি যেখান থেকে পারি আর যেমন ক'রে পারি টাকা যোগাড় করিনি?

কমল বিশ্বাসের চোখ দুটো জ্বলছে বলে মনে হয়। ছেলের কাছ থেকে সুদ সুদ্ধ ঋণ আদায় করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে দাঁড়িয়েছেন সেই মানুষ, যে মানুষ এর আগে কোনদিন এক গেলাস জল চেয়েও ছেলেকে খাটাননি। অতীনও বোধ হয় ভুলে যায়নি যে, এই কমল বিশ্বাসই একদিন জ্বর গায়ে নিয়ে তার ছেলের ময়লা ধুতি পুকুর ঘাটে নিয়ে নিজের হাতে কাচাকাচি করেছেন, তবু ছেলেকে ময়লা ধুতি পরতে বাধ্য করেননি। অতীন নিজের হাতে ময়লা ধুতি কাচতে গেলে অতীনের সময় নষ্ট হবে, সেই সময়টুকু পড়লে কাজ দেবে, এই নীতি যে মানুষের জীবনে সেদিনও সজীব ছিল, তিনিই আজ কঠোর মহাজনের মত সুদ সুদ্ধ পুরনো ঋণের শোধ দাবি করছেন, এটা বোধ হয় অতীনের কল্পনাতেও ছিল না। তাই আশ্চর্য হয় অতীন, ভয় পায় এবং ঘৃণাও করে। যে বস্তুকে এই বাড়ির স্নেহ বলে মনে হয়েছিল, এবং একেবারে ন্যায্য প্রাপ্য বলে মনে হয়েছিল, সেই বস্তু যে একটা আগাম দাদন মাত্র, এত স্পষ্ট ক'রে এই সত্য আগে উপলব্ধি করতে পারেনি অতীন।

সেদিনের সেই ঘটনাকে সেখানেই থামিয়ে দিয়েছিলেন সুধাময়ী, আর বেশি গড়াতে দেননি। বাপের দাবির উত্তরে আর কোন কথা বলতে পারেনি অতীন। সুধাময়ীও ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়েছিলেন। বাপের কথা শুনে ভয় পেয়ে আর আশ্চর্য হয়ে কিরকম কালো হয়ে গিয়েছে ছেলের মুখটা। এরকম চাপ দিলে ঐ ছেলে কি আর এই বাড়িতে টিকে থাকতে পারবে?

কমলবাবুকে আড়ালে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সুধাময়ী বলেছিলেন—এরকম একটা অত্যাচারীর মত শক্ত ক'রে কথা বল কেন? ছেলেটা যে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে।

ভুরু কুঁচকে চিন্তা করেছিলেন কমলবাবু। হ্যাঁ, তাইতো, ছেলেটা যদি পালিয়ে যায়, এবং এই বাড়ির ছায়ার কাছেও আর ফিরে না আসে, তবে তো কোন উপায়ই থাকবে না। কিছুই আদায় করা যাবে না। উলটো চিরকালের মত নিজেই জব্দ হয়ে যাবেন।

এই সবই চিন্তা করা আছে, এবং সমস্যাটাকে ভাল করেই বুঝে রেখেছেন এই ভাঙা রাজবাড়ির কমল বিশ্বাস ও তাঁর স্ত্রী সুধাময়ী। ছেলেকে ক্ষেপিয়ে রাগিয়ে আর বিগড়ে দিয়ে নয়, বেশ বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাগে আনতে হবে, যেন এই বাড়ির দাবিকে একটু মায়ার চোখে দেখতে শেখে অতীন এবং সাহায্যও করে।

রাত ভোর হতে এখনও বাকি আছে। এলাহাবাদের পার্থবাবু হয়তো ভোর হতেই দেখা দেবেন, এবং বাসনার বিয়ের তারিখটাও ঠিক ক'রে ফেলা হবে। হয়তো বাসনাকে আশীর্বাদ করে যাবেন পার্থবাবু। কিন্তু তারপর?

সেই প্রশ্ন। তারপর টাকা আসবে কোথা থেকে? সুধাময়ী বলেন—তুমি যে সেদিন ছেলেটার ওপর মিছামিছি জুলুম করলে...।

কমলবাবু—মিছামিছি কেন?

সুধাময়ী—এইতো এক বছর হয়নি, একটা চাকরি মাত্র ধরেছে এরই মধ্যে বাসুর বিয়ের খরচ যোগাবার মত টাকা কোথায় পাবে অতীন?

কমলবাবু—তা কি আমি আর জানি না। ওর সে সাধ্যি নেই জানি। সেই জন্যেই তো চাপ দিয়েছি।

সুধাময়ী—বুঝলাম না।

কমলবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন—বুঝতে এত দেরি কর কেন?

আস্তে আস্তে, প্রায় ফিসফিস ক'রে সুধাময়ীর কানের কাছে কথা বলতে থাকেন কমল বিশ্বাস। একটা কঠোর চক্রান্তের ভাষা সেই শেষ রাতের অন্ধকারে গোপন সাপের উল্লাসের মত যেন হিসহিস করে। সুধাময়ী একবার ফুঁপিয়ে উঠতে ,চেষ্টা করেন। কমলবাবু প্রায় ধমকের মত শক্ত স্বরে সাবধান ক'রে দেন—উপায় নেই সুধা, একটু শক্ত হতেই হবে।

সমস্যার সমাধানের পথ বোধ হয় এতক্ষণ খুঁজে পাওয়া গেল। পুকুরের দিক থেকে নারকেলের বাগানের মাথার উপর দিয়ে খুব জোরে হাওয়া ছুটতে শুরু করেছে। তারা আছে আকাশে। তবু অনেক দুরে একটা কাকও যেন ডাকছে। সুধাময়ী বলেন—তুমি এবার শুতে যাও।

কমলবাবু—কেন?

সুধাময়ী—সবই তো ঠিক হয়ে গেল। আর চিন্তা করবার, এরকম রাত জেগে বসে থাকবার দরকার কি?

কমলবাবু ভ্রূকুটি করেন—দরকার আছে। তোমার ছেলে আজ এই ভোরে পালিয়ে যাবার জন্য তৈরি হয়ে আছে।

আতঙ্কিতের মত তাকিয়ে থাকেন সুধাময়ী—সে কি?

কমলবাবু—হ্যাঁ, আজই কলকাতার কয়লাঘাটের এক জাহাজ অফিস থেকে মেয়েলি হাতের লেখা একটা চিঠি অতীনের কাছে এসেছে। একজন তাকে আজই চন্দননগরে গিয়ে দেখা করতে বলেছে, তারপর সেখান থেকে দুজনে মিলে...কি যেন কথাগুলি...কিরকম একটা কাব্যি ক'রে লিখেছে যে,...তারপর দুজনে এই জগতের এক গোপন নীড়ের ভিতরে গিয়ে স্বর্গ রচনা করবে।

সুধাময়ীর মুখটা করুণ হয়ে কাঁপতে থাকে। সেই সঙ্গে বুকের ভিতর থেকে যেন একটা আর্ত ধিক্কার ঠেলে ওঠে—ছি ছি, এমন কথাও শুনতে হলো।

কমলবাবু হেসে ওঠেন—কিছু ভেব না সুধা। আমি তোমার ছেলেকে আটকে রাখতে পারবো। আমি জানি, এসব ছেলেকে কোন্ মন্তরে আটকে রাখতে হয়। তুমি শুধু বসে দেখ।

ভাঙা রাজবাড়ির চেহারাটা শেষ রাতের অন্ধকারে কেমন যেন বীভৎস রকমের দেখায়। পূবের আকাশটা মাত্র সামান্য একটু ফিকে হয়েছে। কিন্তু সারা বাগান জুড়ে অন্ধকারটা আরও নিরেট হয়ে রয়েছে। ঠাকুরদালানের থামগুলিকেও কালো কালো অন্ধকারের দানবের মত দেখায়।

আজই অতীনের ঘরের টেবিলের উপর থেকে একটা চিঠি তুলে নিয়ে পড়তেই যে রহস্যটা আঁচ ক'রে ফেলেছেন কমলবাবু সেই রহস্যেরই উপর যেন প্রতিশোধ তোলবার জন্য তৈরী হয়ে রাত জাগছেন। এই ভাঙাবাড়ির উপর এই বাড়িরই ছেলের মনে কোন মায়া নেই কেন? এই বাড়ির একটা বুড়ো আর বুড়ি, যারা এই বাড়িরই বাপ ও মা, তাদের জন্য অতীনের মনে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই কেন, সেটা কমল বিশ্বাসের জানা আছে; তিনি মর্মে মর্মে জানেন। বুড়ো বাপ ও মা এদের কাছে আবর্জনা মাত্র, যদি সেই বাপ ও মায়ের সিন্দুকে কিছু সোনা রূপো না থাকে, যদি কোন ব্যাঙ্কের খাতায় সেই বাপ ও মায়ের নামে কিছু জমা না

থাকে। বাড়িটাও যদি আস্ত থাকতো, এবং উঠানের আশেপাশে ঐ আলকুশীর জঙ্গল না থেকে একটা টেনিস লন থাকতো আর বাতি জ্বলতো, যদি ঐ দিউড়িটা পচে গলে না গিয়ে তার দরজার কাছে কমল বিশ্বাস নামে এই বাপ মানুষটার একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতো, তবে অতীনের মত ছেলে এই বাড়ির ধুলোয় মাথা ঠেকাতে একটুও দেরি করতো না।

কিন্তু রাগ করলেও মনে মনে যেন একটা ধূর্ত হাসি হাসেন কমলবাবু। আজ একটি মন্তরে ঐ ছেলের মাথার ভিতরে এমন শ্রদ্ধার উৎসাহ ঢুকিয়ে দেবেন যে, এই ভাঙ্গা দালানের সিঁড়িটাকে ঢিপ ক'রে প্রণাম ক'রে ফেলবে অতীন। এবং আশ্চর্য নয়, কমল বিশ্বাসের এই জীর্ণ চেহারাটার দিকে ভক্তিভরা চোখ তুলে তাকিয়েও থাকবে। পালিয়ে যাবার সাধ্য হবে না।

আসছে একটি ছায়া। আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে সে ছায়া হনহন ক'রে অনেকখানি এগিয়ে এসে ঠাকুরদালানের বারান্দার উপর দাঁড়ায়। সিগারেট ধরায়। সেই ছায়ার হাতের দেশলাই ফস ক'রে জ্বলে উঠতেই দেখতে পান কমলবাবু, হ্যাঁ অতীন দাঁড়িয়ে আছে, হাতে ছোট একটা ব্যাগ।

কিন্তু সেই মুহূর্তে অতীনের হাতটাও যেন ভয় পেয়ে চমকে উঠে জ্বলন্ত সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দেয়। চেঁচিয়ে ওঠে অতীন—কে? কে ওখানে বসে?

কমলবাবু বলেন—কাছে এসে শুনে যা অতীন।

কমলবাবুর কাছে এগিয়ে এসে অতীন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন প্রেত দেখা ভয়ের আবেশে অভিভূত একটা মূর্তি। কমলবাবু বলেন—এভাবে জুতো পায়ে দিয়ে ঠাকুরদালানের বারান্দার উপর হাঁটাহাঁটি করিস না বাবা। ক্ষতি হবে, তোরই ক্ষতি।

ক্ষতি হবে? তার মানে পাপ হবে বলে ভয় দেখাচ্ছেন বাবা। বিগ্রহ পদ্মনাভ বিরূপ হবেন। অতীনের মনের ভিতরেও একটা ক্রুদ্ধ তুচ্ছতা যেন ধিক্কার দিয়ে ওঠে। কমল বিশ্বাস নামে এই লোকটা জীবনে কোন্ মিথ্যার সাহায্য না নিয়েছে? ঠাকুর পদ্মনাভের উপর লোকটার কী গভীর শ্রদ্ধা! এবং এই ঠাকুরের দয়ার ওপর বিশ্বাস রেখে মানুষকে ঠকাতে এক মুহূর্তও বিচলিত হয় না যে লোক, সেই লোকই অতীনকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, ঠাকুরদালানের বারান্দায় জুতো পায়ে দাঁড়ালে পাপ হয়।

কমলবাবু বলেন—কোনদিন তোকে যে-কথা বলিনি, সে-কথা আজ বলে ফেলাই ভাল, কারণ আমার যে আর বেশি দিন নেই।

চুপ করলেন কমলবাবু ; শেষ রাতের আবছায়াময় স্তব্ধতা আর নারকেল বাগানের অদ্ভুত এক বিলাপের মত ঝড়ের শব্দ যেন দুঃসহ রহস্য হয়ে অতীনের কৌতূহল শিউরে তোলে।

কমলবাবু গলার স্বর চেপে, ধীরে ধীরে ভাবাবেশে বিভোর সাধকের মত বিড়বিড় করে বলতে থাকেন—এই রাজবাড়ি আজও সত্যিই রাজবাড়ি। এই ঠাকুরদালানের থামের ভিতর তোর আট পুরুষ আগের যত সোনা লুকানো আছে।

—কে বললে? চেঁচিয়ে ওঠে অতীন।

কমলবাবু—তোর ঠাকুরদা। এই বংশের নিয়ম, ঐ পদ্মনাভের আদেশ, এই সোনার সন্ধান ঠিক সময় বুঝে বংশের বড় ছেলেকে জানিয়ে যেতে হয়।

অতীন—তুমি কি সত্যই বিশ্বাস কর যে...।

কমলবাবু—বিশ্বাস? বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা তুলছিস কেন অতীন? বিশ্বাস করলেই আছে ; অবিশ্বাস করলে নেই।

থরথর করে অতীনের বুকের ভিতরটা, কানের পাশে ঘামের বিন্দু ফুটে ওঠে। গলার কাঁপুনি থামাবার চেষ্টা ক'রে অতীন বলে—আশ্চর্য, অদ্ভুত কথা বলছো তুমি!

কমলবাবু—যা বলবার বলছি, এখন বিশ্বাস করা আর না করা তোমার দায়িত্ব। আমার

মনে হয়, সাতপুরুষের কোন কাজে লাগলো না, সেই সোনা আটপুরুষের একজনের জীবনে কাজে লাগবে।

হেঁট মাথা হয়ে কি যেন ভাবে অতীন। তারপর কমলবাবু ঐ শান্ত মুখটাকে ভাল ক'রে দেখবার চেষ্টা করে। তারপর আস্তে আস্তে ঘরের দিকে ফিরে যায়।

ফিরে যেতে যেতে একবার থমকে দাঁড়ায় অতীন। মুখ ফিরিয়ে তাকায়, এবং বেশ একটু উদ্বিগ্ন স্বরে বলে—তুমি এভাবে রাত জেগে বড় অন্যায় করছো। এরকম করলে তোমার ঐ রোগা শরীর আর ক'দিন টিকবে?

চলে যায় অতীন। কমল বিশ্বাসের বুকের পাঁজরগুলিই যেন কেঁপে কেঁপে হাসতে থাকে। কিন্তু ঠিকই বলেছে অতীন, আর এইভাবে বসে থাকবার দরকার নেই। এইবার ঘরের ভিতরে গিয়ে একটু গড়িয়ে নেওয়া দরকার। কারণ, এতক্ষণে সত্যিই নিশ্চিন্ত হবার সুযোগ পাওয়া গেল।

কমলবাবু ওঠেন, কিন্তু চলতে গিয়েই পা দুটো যেন টলতে থাকে, মাথা ঘোরে। সারা জীবনের যত ফন্দী ফিকির কৌশল আর মিথ্যার বোঝাটা যেন মাথার উপর বড় বেশী ভারী হয়ে জমে রয়েছে, ঘাড়টা টনটন করছে। একটুখানি হাঁটতেই হাঁপাতে থাকেন কমল বিশ্বাস, এবং ঘরের ভিতরে গিয়েই চেঁচিয়ে ওঠেন—তুমি কোথায় গেলে সুধা? শিগগির এস।

সুধাময়ী ব্যস্তভাবে ছুটে কাছে দাঁড়াতেই কমলবাবু ক্লান্তস্বরে বলেন—আমাকে একটু বাতাস কর সুধা। একটু সাহস দাও।

কমল বিশ্বাসের মাথায় পাখার বাতাস দিয়ে সুধাময়ী বলেন—ভয় কি? ঠাকুর সহায় আছেন।

নিঝুম হয়ে বসে থাকেন কমল বিশ্বাস, তারপরেই যেন কঠিন দুঃসাহসে দীপ্ত হয়ে জ্বলতে থাকে তাঁর কোটরগত চক্ষু।—এখুনি একবার অতীনকে আসতে বল সুধা।

সুধাময়ীর ডাক শুনে প্রায় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে অতীন। এসেই ব্যস্তভাবে বলতে থাকে—আমি আগেই বলেছিলাম, ওরকম রাত জেগে বসে থেক না। রোগা শরীরে এরকম অত্যাচার সইবে কেন?

কমলবাবু বলেন—আমার জীবনের দু'টি কর্তব্য এইবার সেরে দিয়ে যেতে চাই অতীন।

অতীন আশ্চর্য হয়—কর্তব্য?

কমলবাবু—হ্যাঁ, তোর বিয়ে আর বাসুর বিয়ে। বাস্, তারপরেই আমার ছুটি।

চমকে ওঠে অতীন—আমার বিয়ের ভাবনা ছেড়ে দাও। হ্যাঁ, বাসুর বিয়ের জন্য আমার যা সাধ্যি...।

কমলবাবু—আগে তোর বিয়ে। আমি পাত্রীও ঠিক ক'রে ফেলেছি।

অতীন—ভুল করেছ তুমি...আমি এখন ওসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যেতে রাজি নই।

কমলবাবু—কোন ঝঞ্ঝাট নয়। খড়দহ'র রামকানাইবাবু, সেগুন কাঠের মস্ত বড় কারবারি, বছরে এগার হাজার টাকা ইনকাম ট্যাক্স দেন, এবং তাহলেই বোঝ, কত হাজার টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দেন এবং কত বড়লোক।

শুনতে খুব ভাল না লাগলেও খুব খারাপও লাগে না। নীরব হয়ে শুনতে থাকে অতীন।

কমলবাবু—তাঁরই ভাগ্নী, একমাত্র ভাগ্নী, মেয়েটির নামটিও বড় সুন্দর ; কেতকী। যেমন শিক্ষিতা, তেমনই কাজের মেয়ে। তা ছাড়া রামকানাইবাবু দরাজ হাতে খরচ করতে রাজি আছেন। ভাল বরপণ, ভাল দানসামগ্রী দেবেন। ঠিক করেছি, এই মাসেরই একটা শুভদিনে এই মেয়েটিকে ঘরের বউ ক'রে নিয়ে আসবো।

সুধাময়ী যেন তাঁর বদ্ধ নিশ্বাস ছাড়তে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলার মত একটা শব্দ করেন, এবং কমলবাবুর এত সাজানো গোছানো ও চক্রান্তসুন্দর প্রস্তাবটাকে প্রায় ধরা পড়িয়ে দিয়ে

বলে ফেলেন--আমার বড় শখ ছিল অতীন, সুন্দর বউ ঘরে আনবো, কিন্তু ঠাকুর যদি না করেন, তবে...।

অতীন যেন চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে তার মনের ভয়ানক সন্দেহটাকেই প্রকাশ ক'রে দেয়--তাহলে বল যে, অত্যন্ত কুৎসিত একটা মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করেছ, কিছু টাকা পাওয়ার জন্য।

কমলবাবুর মুখে অদ্ভুত একটা হিংসুক হাসি শিউরে ওঠে--হ্যাঁ ঠিকই বুঝতে পেরেছ।

অতীন--কিন্তু এর ফল কি হতে পারে জানো?

কমলবাবু--জানি, তোমারই বংশের মান-সম্মান বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তোমার বোনটিকে একটি ভাল ঘরে বিয়ে দেবার মত টাকা হাতে আসবে। টাকা দেবার মুরোদ যখন তোমার নেই, তখন এরকম একটা উপায় ছাড়া তুমিই বা বোনের বিয়ের টাকা আমাকে যোগাড় ক'রে দেবে কেমন করে?

অতীন--তারও কি ফল হতে পারে, ভেবে দেখ।

কমলবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন কি--? আর কোন্ ফলের ভয় দেখাচ্ছিস?

অতীন--বেছে বেছে পৃথিবীর একটা কুৎসিত মেয়েকে আমার পক্ষে...।

আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠেন কমলবাবু--জানি, তোমার পক্ষে তাকে মেনে নেওয়া, আর তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়।

অতীন--তাহ'লে?

কমলবাবুর গলার স্বর অকস্মাৎ অত্যন্ত কোমল হয়ে যেন একটু সান্ত্বনার মত গলে পড়ে।--আমিও যে তাই চাই। সম্পর্ক রাখবে না। টাকা চাই, তাই এই বিয়ে। আমাদের শুধু কিছু টাকা পাওয়া নিয়ে কথা। এছাড়া বাসুর বিয়ে দেবার যে আর কোন উপায়ই নেই অতু।

সুধাময়ী মুখ ঘুরিয়ে এবং মুখটাকে আরও সাদা ক'রে নিয়ে কি-যেন ভাবেন। আর, অতীনের চোখের দৃষ্টি যেন গভীর ভয় আর উদ্বেগের গ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হয়ে উঠতে থাকে। এবং কমলবাবু তার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বেশ শান্ত স্বরে টেনে টেনে, যেন একটা ভক্তির আবেগে বলতে থাকেন--তুই হয় তো বিশ্বাস করবি না, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি অতু, স্বয়ং ঠাকুরই কৃপা ক'রে আমাকে এই উপায়টি দেখিয়ে দিয়েছেন।

অতীন--দেখ তাহ'লে। আমার কোন আপত্তি নেই।

চলে গেল অতীন। বাগানের পথের দিকে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে কমলবাবু বলেন--এলাহাবাদের পার্থবাবুর আসবার সময় হয়ে এল।

সুধাময়ী বলেন--সবই তো হলো, কিন্তু বাসু কি রাজি হবে?

আশ্চর্য হন কমলবাবু--তার মানে?

সুধাময়ী--তুমিই বা মানে বুঝতে পার না কেন? সেটা কি ভুলেই গেলে, যে কাণ্ড করে বসে আছে মেয়ে?

হো হো ক'রে হেসে ওঠেন কমলবাবু--জানি, খুব জানি, কিন্তু ওসব কোন সমস্যাই নয় সুধা। ঠাকুর সহায় থাকলে তোমার ক্ষতি কেউ করতে পারবে না।

সুধাময়ী--ঠাকুর যদি সহায় থাকেন, তবে তো? নইলে..।

কমলবাবু--ঠাকুরের ওপর বিশ্বাস হারিও না সুধা।

সুধাময়ী--হারাতে চাই না। কিন্তু এই তো এক্ষুনি নিজের চোখে দেখে এলাম, একগাদা চিঠি হাতের কাছে রেখে চুপ ক'রে বসে আছে বাসু। মনে হলো সারা রাত জেগে কেঁদেছে মেয়েটা।

কমলবাবু কটমট ক'রে তাকান--তা তো বুঝতেই পারছি। রতন আসবে বলে আশা ক'রে আর তৈরী হয়ে বসেছিল তোমার মেয়ে।

সুধাময়ী—রতনের লেখা চিঠিগুলি নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে যে মেয়েটা এখনও হেসে-কেঁদে পাগল হয়ে যাচ্ছে, সে কি আজ তোমার কথাতে বুঝ মেনে এই বিয়েতে রাজি হয়ে যাবে?

কমলবাবু—রাজি না হবার তো কোন কারণ নেই। কোথায় রতনের মত একটা রেসুড়ে ছোকরা, আর কোথায় পার্থবাবুর ছেলে অজিতের মত একটি গুণী শিক্ষিত ও সুশ্রী প্রফেসর, যার মাইনে পাঁচশো টাকা আর বাপের সম্পত্তি অঢেল!

বোধ হয় সুধাময়ীর মনের ভয় সন্দেহ আর উদ্বেগগুলিকে একটা কৌতুকের খেলায় একেবারে ধুলো ক'রে দেবার জন্য উৎসাহিত স্বরে ডাক দেন কমলবাবু—বাসনা, বাসনা কোথায় আছিস, শিগগির একবার শুনে যা।

আসতে দেরী করে না বাসনা। সেই সুন্দর মুখের উপর ভোরের রোদের আভা এসে লুটিয়ে পড়ে, এবং সত্যিই মেয়েটাকে অভিশপ্তা রাজপুত্রীর মত দেখায়। বাসনার চোখের দৃষ্টি যেন দুঃসহ একটা বিরক্তির বেদনায় বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে। হাতের আঙ্গুলে কালো ছোপ, কালির দাগ, তবে কি রাত জেগে বসে বসে শুধু চিঠি লিখেছে বাসনা? কিংবা এখনই লিখছিল, ডাক শুনে লেখা ছেড়ে দিয়ে উঠে এসেছে।

কমলবাবু বলেন—মিছিমিছি রাত জেগে কেন এত লেখা-পড়া করিস বাসু, কোন দরকার নেই, মিছিমিছি শুধু স্বাস্থ্য নষ্ট করা।

কমলবাবুর ধূর্ত চোখ দুটোকে ভয় পায় বাসনাও, যদিও বাসনা জানে যে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জোরে একটা কথা বলবারও সাহস নেই এই মানুষটার, যে মানুষ নিজের মেয়েকে কলেজে যাবার মত চারটে ভদ্র চেহারার শাড়ি কিনে দিতে পারেনি, যদিও তিনি রসিকপুরের বিখ্যাত রাজবাড়ির মালিক। বাসনাই উল্টো প্রশ্ন করে—কি বলছিলে বল?

কমলবাবু—শুভ সংবাদ বাসু। আজ আমরা যেমন আনন্দে মন খুলে হাসবো, তেমনি মন চেপে কাঁদবো। তোর বিয়ের সম্বন্ধ পাকাপাকি ক'রে ফেলেছি মা। ঠাকুর কৃপা করুন, ভালয় ভালয় বিয়েটা হয়ে যাক।

চুপ ক'রে এবং স্তব্ধ হয়ে শুনতে থাকে বাসনা। দু'চোখের দৃষ্টি যেন হঠাৎ দিশাহারা হয়ে গিয়েছে। বুঝতে পারছে না বোধ হয় বাসনা, কেন এরকমের একটা গল্প বলছে ধূর্ত কমল বিশ্বাস?

কমলবাবু বললেন—তুই চলে যাবি, আমাদের কাঁদিয়ে দিয়ে তোকে এইবার চলে যেতে হবে, তবু তো এটা শুভ সংবাদ। তাই বলছিলাম, তৈরী হয়ে নে। এখনি পাত্রের বাপ, এলাহাবাদের পার্থবাবু তোকে আশীর্বাদ করতে আসবেন।

বাসনার গলার স্বর যেন হঠাৎ বিরক্তির আঘাতে ঝংকার দিয়ে বেজে ওঠে—অসম্ভব!

কমলবাবু—অসম্ভব নয় বাসু, পার্থবাবু এই এলেন বলে। এলাহাবাদের বাঙালীদের মধ্যে সম্পত্তিতে ইনিই হলেন সেকেণ্ড। বড় ছেলে অজিত, যেমন বিদ্বান তেমনি সুশ্রী, এখন পাঁচশো টাকা মাইনেতে প্রফেসর হয়েছে। আমরা জানি, ঠাকুর জানেন, তোর মত মেয়ের সঙ্গে অজিতকে কি সুন্দর মানায়।

সুধাময়ী হাঁ ক'রে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা অনর্থের আশঙ্কায় বুকের দুরুদুরু কাঁপুনি নিয়ে ভয়ানক বিব্রত বোধ করতে থাকেন। কি-রকম তীব্র দৃষ্টি তুলে বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বাসনা!

কমলবাবু বলেন—আমার ধারণা, পার্থবাবু অন্তত আট ভরির একটা সাতনরি দিয়ে তোকে আশীর্বাদ করবেন, নয়তো আট ভরির একটা চিক।

চমকে ওঠেন সুধাময়ী—এরকম কোন কথা দিয়েছেন কি পার্থবাবু?

কমলবাবু—কথা না দিন, জিনিসটা দিতে বাধ্য হবেন। আমিই বা দাবী করতে ছেড়ে দেব

কেন, মেয়ের বাপ হয়েছি বলে ইঁদুর হয়ে গিয়েছি নাকি?

নিজের মনের আহ্লাদেই হেসে হেসে বলতে থাকেন কমল বিশ্বাস—তা ছাড়া, আমিও মরা হাতি লাখ টাকা। কিছুই নেই, তবু কি একমাত্র মেয়েকে গা ভরে সাজিয়ে দিতে পারবো না?

সুধাময়ী ডাকেন—কি ভাবছিস বাসু?

কমলবাবু বলেন—কিছু ভাবিস না বাসনা। ঠাকুর যাকে সুখী করতে চান তাকে এইভাবেই হঠাৎ সুখের পথে এগিয়ে দেন।

বাসনা মাথা হেঁট করে। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে সুধাময়ীর গা ঘেঁষে বসে পড়ে। সুধাময়ীও মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে যেন সান্ত্বনার ভঙ্গীতে বলেন—মুখ ভার করিস না বাসু। তোকে হাসতে না দেখলে আমরা হাসবো কেমন ক'রে?

এক ঝলক লাজুক হাসির আভা চমকে ওঠে বাসনার মুখে। মুখ লুকোতে চেষ্টা করে বাসনা। সুধাময়ী বলেন—যা এখন ভেতরে চলে যা। পার্থবাবু এলে এদিকে আর ঘোরাঘুরি করিস না।

চলে যায় বাসনা। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ ক'রে আর গম্ভীর হয়ে থেকে তারপর সুধাময়ীর মুখের দিকে তাকান কমলবাবু। কমলবাবুর কোটরগত চোখের তীব্র দৃষ্টিটা অদ্ভুতভাবে হাসছে। কিন্তু পাখা হাতে নিয়ে ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসেন সুধাময়ী—ওকি, ওরকম হাঁসফাঁস করছো কেন?

শীর্ণ শরীরটাকে আরও একটু কুঁকড়ে দিয়ে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলতে থাকেন কমলবাবু—বুকের ব্যথাটায় যেন হঠাৎ একটা চাড় লাগলো যাকগে, সেজন্য নয়, বড় ক্লান্তি বোধ করছি সুধা।

অল্প অল্প ক'রে রোদ উঠছে। অর্জুন আর কনকচাঁপার মাথায় পুরনো মৌচাকের কাছে এসে নতুন মৌমাছির ঝাঁক গুনগুন করে। কমল বিশ্বাস আর সুধাময়ী, এই ভাঙাবাড়ির বুড়োবুড়ির প্রাণও যেন এইবার নিঝুম হয়ে বসে মুক্তির গুঞ্জন শুনছে।

কমলবাবু অপলক চোখ তুলে সুধাময়ীর সেই সাদা ও রোগা মুখটারই দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তার পর আস্তে আস্তে ডাকেন-কি ভাবছো সুধা?

সুধাময়ী—তুমি যা ভাবছো।

কমলবাবু—হ্যাঁ সুধা, ঠিকই ধরেছ তুমি। কাজ ফুরিয়ে এসেছে, এইবার ভালয় ভালয় চলে যেতে পারলেই ভাল। কিন্তু...।

সুধাময়ী—কি?

কমলবাবু—আমার ইচ্ছে নয় যে, আমি তোমার আগে যাই।

সুধাময়ী—কেন বল তো?

কমলবাবু হাসেন—সারা জীবনটাই তো তোমাকে দুঃখ দিলাম।

সুধাময়ী বাধা দিয়ে বলেন—মিছে ওসব কথা কেন তুলছো?

কমলবাবু—না সুধা। তুমিই বরং হেসে হেসে আমার আগে চলে যাও, অন্তত শেষটায় আর তোমাকে দুঃখ দিতে চাই না।

সুধাময়ী হাসেন—সে তো ভাগ্যির কথা ; কিন্তু...।

কমলবাবু—কিন্তু আবার কি?

সুধাময়ী—তুমিই বা কেন একা পড়ে থাকবে? বুকের ব্যথায় কাতরাবে আর আমার ওপর রাগ ক'রে আরও কষ্ট পাবে বলে?

চেঁচিয়ে হাসতে থাকেন কমলবাবু—তবে কি আমাকে সঙ্গে নিয়েই যেতে চাও?

সুধাময়ীর চোখ দুটো করুণ হয়ে ওঠে—একসঙ্গে কি সত্যিই যাওয়া যায় না? ঠাকুর তো জীবনে কিছুই দিলেন না, মরণে অন্তত একটু কৃপা করুন।

কমল বিশ্বাস—ঠাকুরকে বল, আমাকে বলে লাভ কি?

সুধাময়ী—তাই তো বলছি, দিনরাত বলছি।

জীবন ঠকেছে ; প্রাণ ক্লান্ত ; এবং কাজও ফুরিয়ে এসেছে। তাই এইবার যেন সহমরণের আশীর্বাদ প্রার্থনা করছে এই বাড়ির বুড়ো আর বুড়ি।

কমল বিশ্বাস আবার হেসে ওঠেন—তাই ভাল সুধা। যখন বাঁচাটাই সুখের হলো না, তখন মরণটাই সুখের হোক।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকেন কমলবাবু। একটা গাড়ি এসে বাগানের পথে থেমেছে। পার্থবাবু এসেছেন।

কমল বিশ্বাসের কপাল কুঁচকে দিয়ে একটা উদ্বেগ ছটফট ক'রে ওঠে।—এখন তাহ'লে ভদ্রতা রক্ষা করবার একটা ব্যবস্থা করতে হয় সুধা।

সুধাময়ী—তা তো করতেই হবে। বল কি করবো?

কমলবাবু—রূপোর একটা থালা ঘরে আছে বলে মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ আছে। বলতে গিয়ে সুধাময়ীর চোখ দুটো ছলছল ক'রে ওঠে। ঐ থালাটা তো চল্লিশ বছর আগের একটা স্মৃতি। বিয়ের পরদিন, কুশণ্ডিকা শেষ হবার পর বরভোজনও হয়ে গিয়েছিল যখন, তখন একা ঘরের ভিতর চুপ ক'রে বসেছিল পঁচিশ বছর বয়সের কমল বিশ্বাস। তিনজন খুড়িমা আর আটজন জেঠিমার ধমক খেয়ে শেষে বাধ্য হয়ে ঘোমটা টেনে মুখ ঢেকে আর থরথর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে ঐ রূপোর থালাতেই পান সাজিয়ে নিয়ে কমল বিশ্বাসের কাছে প্রথম এসে দাঁড়িয়েছিল সেদিনের আঠার বছর বয়সের সুধাময়ী। মনে পড়ে, আজও যে ভুলতে পারা যায় না, রূপোর থালার দিকে না তাকিয়ে সুধাময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে কমল বিশ্বাস বলেছিলেন—তুমি নিজের হাতে তুলে না দিলে ও পান আমি ছোঁব না।

কমলবাবু ব্যস্তভাবে বলেন—এখনি পাঁচুকে ডেকে পাঠাও সুধা। থালাটাকে জীবনবাবুর দোকানে বেচে দিয়ে আসুক পাঁচু। যা পাওয়া যায়, তাই লাভ। পার্থবাবুর জন্যে কিছু ভাল খাবার-টাবার আনিয়ে...।

হঠাৎ কথা বন্ধ ক'রে সুধাময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন কমল বিশ্বাস। থরথর ক'রে কেঁপে ওঠে কমল বিশ্বাসের চোখ। তাঁর সেই চক্রান্তময় প্রচণ্ড অন্তরাত্মা এতগুলি বাধা এত সহজে জয় ক'রে এইবার শেষ বাধার রূপ দেখে ভয় পেয়েছে। সব ফন্দির সাহস মুসড়ে পড়েছে, সব কথার ধূর্ততা বোবা হয়ে গিয়েছে। দুই চোখের কোটর দু'হাত তুলে তাড়াতাড়ি মুছে নিয়েই সুধাময়ীর হাত ধরেন—একটা রূপোর থালার জন্য মিথ্যে দুঃখ করছো কেন সুধা? যে হাতে জীবনে প্রথম আমাকে পান দিয়েছিলে, তোমার সেই হাতটা তো আর মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে না।

প্রথমে ফাল্গুন মাসের একটা দিনে, তারপর চৈত্র পার হয়ে বৈশাখ মাসের একটা দিনে, রসিকপুরের রাজবাড়ির জীবনের সমস্যা দুটি সন্ধ্যায় উৎসবে যেন সানাই-এর সুরের খেলা হয়ে আলোর মেলা হয়ে তারপর মিলিয়ে গেল।

ছেলের বিয়ে দিয়েই তারপর দুটি মাস যেতে না যেতে মেয়ের বিয়ে ; বেশ বড় ঘরের সঙ্গে কাজ করলেন কমলবাবু। রাজবাড়ির বনেদি মেজাজ যেন শ্মশানের ধুলো থেকে আবার জীবন্ত চাঙ্গা হয়ে উঠে একটা কীর্তি ক'রে রসিকপুর থেকে পাতিপুকুর পর্যন্ত অঞ্চলটার অনেক মানুষের মনে অনেক চমক লাগিয়ে দিল। মেয়ে বিদায়ের দিনে এলাহাবাদের কুটুম্বদের চোখের সামনেই এক হাজার কাঙালী ভোজন করালেন রসিকপুরের কমল বিশ্বাস। কুটুম্বরাও স্বীকার করলেন, কমলবাবুর অবস্থা পড়ে গেলেই বা কী? সাতপুরুষের সেই বনেদি

স্বভাব তো যাবার নয়।

যাবার দিনে অনেক কান্না কেঁদেছিল বাসনা। সুধাময়ী তো সারাটা দিন না খেয়েই আর চোখ মুছে মুছে পার করে দিলেন। মেয়ে জামাই প্রণাম ক'রে যখন বাগানের পথে এগিয়ে যেয়ে মোটর গাড়ীতে উঠলো, এবং কুটুম্বরাও বিদায় নিয়ে গেল, এবং সব গাড়ির উল্লাসের শব্দ আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে গিয়ে যশোর রোডের দিকে ছুটে চলে গেল, তখন কে জানে কি মনে করে, বোধ হয় নিজেরই মনের আগোচর একটা ভুলের আবেগে, কেতকীর হাতের কাছে ভাঁড়ারের চাবিটা ফেলে দিয়ে নিজের ঘরের ভিতরে এসে ঢুকলেন, আর মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করলেন সুধাময়ী।

কিন্তু সুধাময়ীর কাছে দাঁড়িয়ে বেশ শান্ত ও প্রসন্ন মনে একটা হাঁপ ছাড়লেন কমলবাবু। কমলবাবুর চোখে এক ফোঁটাও জল নেই। বরং তাঁর দৃষ্টি যেন একটা কৃতার্থতার আনন্দে হাসছে। যেন একটা ভার নেমে গেল। অতি দুঃসহ একটা বোঝার পাঁজর-ভাঙা চাপ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এতদিনে হালকা হতে পেরেছেন। আঃ, হাঁপ ছাড়লেন কমলবাবু, এবং সুধাময়ীর দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমার মত বোকা হলে আমিও আজ কাঁদতে পারতুম সুধা।

আস্তে আস্তে পায়চারি করে যেন এই হালকা হয়ে যাবার আনন্দটুকু মনেপ্রাণে উপভোগ করতে থাকেন কমলবাবু। এবং সুধাময়ীকে ঐ বোকামির মায়াকান্না থেকে মুক্ত করবার জন্য সান্ত্বনার সুরে যে-সব কথা বলতে থাকেন, সেই কথাগুলিকেও শুনতে ঘুমন্ত মানুষের ভাষার মত মনে হয়।—ভাগ্য আমাকে পিষে মারতে চেয়েছিলো, কিন্তু পারলো না। কিন্তু আমাকে দমিয়ে দিতে পারলো কি কেউ? দেখলে তো সুধা, একে একে সব ঝঞ্ঝাট কেমন ক'রে ঠাণ্ডা ক'রে দিলাম। কারও দয়া মায়া ও অনুগ্রহের ধার ধারতে হলো না। একটি পয়সাও যার সিন্দুকে ছিল না, সেই মানুষ রাজার মত বড়লোকের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিতে পেরেছে, এ কি চারটিখানি ব্যাপার? এ কি যে-সে মানুষের ক্ষমতা? আমি বলেই পেরেছি, এবং ঠাকুর আমার সহায় আছেন বলেই পেরেছি।

সুধাময়ী যে স্বামীর মুখে এই ধরণের কথা এই প্রথম শুনছেন, তা নয়। কিন্তু এত তৃপ্ত একটা ভাব নিয়ে, এত উল্লাসের সঙ্গে কমল বিশ্বাসকে গর্ব করতে কোনদিন দেখেননি।

কমলবাবু তেমনি পায়চারি ক'রে যেন আপন মনে বিড়বিড় করেন।—ছেলে আমাকে মনে মনে ঘেন্না করে, মেয়ে আমাকে মনে-প্রাণে ঘেন্না করছে। আমার মত মানুষ যে ওদের বাপ, এই কথাটা মনে করতেও ওরা কত না দুঃখ পেয়েছে। আমি কিন্তু একটুও দুঃখ করিনি সুধা। এ তো হবেই। ওরা যে জানে, ওদের খাওয়াতে-পরাতে আর লেখাপড়া শেখাতে টাকা যোগাড়ের জন্য ওদের বাপটা যে কাণ্ড ক'রে ফিরেছে, তা কোন চোর ডাকাতের পক্ষেও দুঃসাধ্য। কাজেই...।

সুধাময়ী হঠাৎ বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন।—কেন মিছামিছি নিজেকে এত গালমন্দ করছো। যা হবার তা হয়ে গিয়েছে, তুমি এবার জিরোও। ছেলে-মেয়ের ভালমন্দের জন্য আর মাথা ঘামাতে যেও না।

কমলবাবু শান্তভাবে একটা আরামের নিশ্বাস ছাড়েন—না, আর না। আর তো আমার কোন কাজও নেই সুধা। আর কাউকে কিছু বলবার, বাধা দেবার, পীড়াপীড়ি করবার আর ধরে রাখবার কোন ব্যাপার নেই। এবার যে যার নিজের ভাল বুঝে নিক। আমার কর্তব্য আমি ক'রে দিয়েছি।

চুপ করেন কমলবাবু, সুধাময়ীও চুপ ক'রে বসে থাকেন। দেখে মনে হয়, দুটি চক্রান্তের প্রাণ যেন এতদিনে তাদের সব চেষ্টার উপসংহারে এসে শ্রান্ত ক্লান্ত অথচ তৃপ্ত হয়ে গিয়েছে।

অনেকক্ষণ পরে ; এই নীরব বাড়ির স্তব্ধতাকে যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে চমকে ওঠেন

সুধাময়ী। বোধ হয় মনে পড়েছে তাঁর, এই ভাঙা বাড়ির জীবনটাকে ঘৃণা করে, ভয় পেয়ে আর রাগ ক'রে আরও যে একজনের চলে যাবার কথা আছে, সে'ও এইবার চলে যাবে। অতীন তো তার বিয়ের তিনদিন পরে ফুলশয্যার রাত্রি ভোর হতেই সুধাময়ীকে জানিয়ে দিয়েছে যে, শুধু কর্তব্য হিসাবে বাসনার বিয়ের দিনটা পর্যন্ত সে এই বাড়িতে থাকবে, এবং তারপর একটি দিনও না।

সুধাময়ী ভয়ে ভয়ে বলেন--অতু বোধ হয় কালই চলে যাবে।

কমলবাবু—যাবেই তো। ওর যাওয়াই ভাল।

সুধাময়ী--কিন্তু কেতকী এখনও জানে না যে, অতু চলে যাবে।

কমলবাবুর চোখের দৃষ্টি যেন হঠাৎ আতঙ্কিত হয়, এবং ভ্রূকুটি ক'রে বুঝতে চেষ্টা করেন কমলবাবু—কেতকী? কেতকী কে?

সুধাময়ী--কি আশ্চর্য, কেতকী কে, তাও এরই মধ্যে ভুলে গিয়েছ?

কমলবাবু—ও হ্যাঁ. রামকানাই-এর ভাগ্নী কেতকী?

সুধাময়ী—ওরকম ক'রে বলতে নেই। শত হোক, সে তো তোমারই ছেলের বউ।

বোধ হয় খুব জোরে চেঁচিয়ে একটা কথা বলতে যাচ্ছিলেন কমলবাবু। কিন্তু হঠাৎ সেই ঝোঁক জোর করে চেপে রেখে কাঁপতে শুরু করেন। পাগলের মত চোখ ক'রে সুধাময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তার পরেই বিড়বিড় করেন—তুমি ওসব বাজে কথা বলে আমার মন নরম করতে চেষ্টা করো না সুধা। তোমার ছেলে আমাকে বাপ বলে না, তোমার ছেলের বউ আমাকে জানোয়ার বলে মনে করবে ; ওসব কেতকী এখান থেকে যত শিগগির সরে যায়, ততই ভাল।

হ্যাঁ কেতকী, রামকানাইবাবুর ভাগ্নী কেতকী নামে যে মেয়ে এই দু'মাস হলো এই চক্রান্তের বাড়ির মধ্যে জীবন যাপন করছে, তার কথাই মনে পড়ে সুধাময়ীর, কমলবাবুরও। কমলবাবুর বুঝতে আর কিছু বাকি নেই, কোন সন্দেহ নেই যে, কেতকীও আর একটি দিন এই বাড়িতে থাকতে চাইবে না। কেতকীরও সব বুঝে ফেলতে কি আর কিছু বাকি আছে? যেটুকু বাকি ছিল, সেটুকু আজই সন্ধ্যায় বুঝে নিয়েছে কেতকী।

মেয়ে বিদায়ের সময় ; অর্থাৎ বাসনা যখন রঙীন সাজে সেজে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়েছে, অজিতের চাদরের সঙ্গে বাসনার আঁচলটাতে একটা গিঁট যখন বেঁধে দিল বাড়ির বউ কেতকী নামে ঐ মেয়ে, তখন কুটুম্বদের মধ্যে কেউ কেউ আপত্তি তুলেছিলেন—কনের হাত দুটো খালি-খালি দেখাচ্ছে।

কেতকীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে কমলবাবু বললেন—হাতের জিনিস তোমার বাক্সে আরও কিছু আছে নিশ্চয়।

কেতকী বলে—আছে।

কমলবাবু—যা যা আছে, সব বাসনার হাতে পরিয়ে দাও।

সেই মুহূর্তে বাক্স খুলে হাতের অনেকগুলি জিনিস, একজোড়া কঙ্কন, একজোড়া ব্রেসলেট ও একজোড়া বালা নিয়ে এসে বাসনার হাতে পরিয়ে দিল কেতকী। কমলবাবুও হিসেব ক'রে দেখলেন, কেতকীর কাছ থেকে আর নেবার মত বিশেষ কিছু নেই বোধ হয়। গলার সাত ভরির হার, ষোল গাছি চুড়ি, টায়রা আর আর্মলেট, কেতকীর গা থেকে নামিয়ে সবই বাসনার গায়ে তুলে দিয়ে বিয়ের সময়েই বাসনাকে সাজানো হয়েছিল। সেগুলি বাসনার গায়েই থেকে গিয়েছে। ভুলেও সেগুলির দিকে তাকিয়ে একটা প্রশ্নও করেনি কেতকী। বাকী যা ছিল, তা'ও বাক্স থেকে বের ক'রে দিল। কমলবাবু হিসেব ক'রে দেখলেন, হ্যাঁ, সত্যিই কেতকী তার কানের ঐ একজোড়া দুল ও হাতের দু'গাছি চুড়ি ছাড়া আর সবই ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু বুঝে তো ফেলেছে। এই ভাঙা বাড়ির যে চক্রান্ত এত স্পষ্ট ক'রে বলতে গেলে

একেবারে হাত তুলে খাবলা দিয়ে কেতকীর সব অলঙ্কার লুট ক'রে নিল, সে চক্রান্তকে এখনও চিনে ফেলতে পারবে না, এত বোকা নয় বি-এ পড়া ঐ মেয়ে।

অতীনকেও চিনে ফেলতে কি কিছু বাকি আছে কেতকীর? নিশ্চয়ই না। সুধাময়ীই বলেছেন, এই দু'মাসের মধ্যে কেতকীর সঙ্গে অতু দু'বার কথা বলেছে কিনা সন্দেহ। কমলবাবুও খবর রাখেন, রাত্রি হলেই অতু একটা চাদর আর বালিস নিয়ে ছাদের উপর ঐ ভাঙা ঘরটারই ভিতরে একটা খাটে শুয়ে পড়ে থাকে, আর রাত জেগে বই পড়ে। কেতকী যে ঘরে থাকে, সে ঘরের বাতি ঠিক রাত দশটায় নিভে যায়। কোন আকুলতা, কোন প্রতিবাদ আর কোন অভিযোগের শব্দ কেতকীর মুখের ভাষায়, কেতকীর কোন আচরণে আজ পর্যন্ত ছটফট করে ওঠেনি।

বাসনার কাছ থেকেও এই দু'মাসের মধ্যে অনেক কথা শুনেছেন কমলবাবু এবং সুধাময়ী; কেতকী নিজের মুখে বাসনার কাছে যে-সব কথা বলেছে আর হেসে ফেলেছে, সেই সব কথা।

কি? কি বলেছে কেতকী? বাসনার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন সুধাময়ী।

বাসনা—জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেমন লাগছে বৌদি?

সুধাময়ী—কি উত্তর দিলে কেতকী?

বাসনা—বললে, বেশ ভাল। বলেই হেসে ফেললো।

হ্যাঁ, কথায় কথায় বাসনার কাছে আরও অনেক কিছু বলে ফেলেছে কেতকী, যা থেকে মনে হয়, এই বাড়ির বুকের ভিতর পোষা যত দারিদ্র্য যত তঞ্চকতা যত ধাপ্পা এবং যত ফাঁকির সব কিছুই সে বুঝে ফেলেছে। কে জানে কেমন করে বুঝে ফেলেছে কেতকী, মস্ত বড় চাকরি করে না অতীন, এবং শিগগির বিলেত গিয়ে কোন পরীক্ষা দেবারও ব্যাপার নেই। কিন্তু বাসনাকে চমকে দিয়ে একটা অদ্ভুত কথা বলে ফেলেছে কেতকী—একশো দশ টাকা মাইনের চাকরিই বা খারাপ কিসের?

নামে রাজবাড়ি, কিন্তু রূপে একটা রিক্ততার আড়ত এই বাড়ির সব ঘরেরই ভিতরে চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখেছে কেতকী, কিন্তু চোখের দৃষ্টি একটুও বিচলিত হয়নি। ঘরের মধ্যে আসবাব বলতে যা আছে, সেগুলিকে কোন পুরানো কাঠের দোকান বোধ হয় বিনা দামেও নিয়ে যেতে চাইবে না। বাসনপত্রের চেহারা এবং সংখ্যাও আশ্চর্য রকমের রিক্ত। কাঁসার একটা রেকাবিতে চা খান কমলবাবু, চীনে মাটির একটা পেয়ালাও নেই। ভাত রান্না হয় মাটির হাঁড়িতে, সে হাঁড়ির কানাটা আবার ভাঙা। শ্বশুর বাড়িতে এসে প্রথম দিনেই দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল কেতকী, অমন রোগা শুকনো একটা বুড়ো মানুষ, এই বাড়িরই ছেলে আর মেয়ের বাপ, এই কমল বিশ্বাস বুকের ব্যথায় সারাটা বিকেল আর সন্ধ্যা শুধু কাতরালেন এবং হাঁসফাঁস করলেন, কিন্তু ডাক্তার ডাকা হলো না। মোমের মত সাদা চেহারার এক রুগ্না নারী, এই বাড়িরই ঐ দুটি সুন্দর চেহারার ছেলে আর মেয়ের মা, এই সুধাময়ী শুধু এক ঝিনুক সরষের তেল গরম ক'রে কমল বিশ্বাসের বুকে মালিশ করলেন। রসিকপুরের রাজবাড়ির এই রকমেরই একটা করুণ রাজসিকতার রূপ শুধু চুপ ক'রে শান্ত চোখের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিল কেতকী। কোন বিস্ময় প্রকাশ করেনি। তাই তো বোঝা যায় যে, সবই বুঝে ফেলেছে কেতকী।

শুধু কেতকী কেন, কেতকীর মামা রামকানাইবাবু এই দু'মাসের মধ্যে দু'বার এসে যে-ভাবে কটমট ক'রে কমল বিশ্বাসের কোটরগত চোখের ধূর্ততা আর শীর্ণ চেহারার ইতরতার দিকে তাকিয়ে চলে গিয়েছেন, তাতে বোঝা গিয়েছে, রামকানাইবাবুর অন্তরাত্মা যেন রেগে পাগল হয়ে গিয়েছে। স্পষ্ট ভাষায় মুখ খুলে বলেই গিয়েছেন রামকানাইবাবু—ভয়ানক অন্যায়,

আপনি অমানুষের মত কাজ করেছেন কমলবাবু। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে, আপনি এত বেশি মিথ্যা কথা বলতে পারেন।

কমল বিশ্বাসও তাঁর কোটরগত চোখের তীক্ষ্ণতাকে আরও তীক্ষ্ণ ক'রে উত্তর দিয়েছেন-- আপনার মত মানুষকে কুটুম্ব বলে মনে করতেও লজ্জা পাচ্ছি। সাবধান, যদি ভদ্রভাবে কথা বলতে না পারেন, তবে এখানে আসবেন না।

তবু, এরকম অপমানের পরেও একদিন এসেছিলেন রামকানাইবাবু। এবং ভাগ্নী কেতকীর সঙ্গে আড়ালে দাঁড়িয়ে কি-সব কথা অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা ক'রে চলে গেলেন। কমল বিশ্বাসের বুঝতে বাকি নেই, সে-সব আলোচনা কিসের আলোচনা হতে পারে। ভাগ্নীকে এই শ্বশুরবাড়ির কারাগার থেকে ফিরিয়ে নিতে চান রামকানাইবাবু, এই তো। ভয়ানক গোঁয়ার আর জেদী ঐ রামকানাই, যে লোকটা মামলা ক'রে নিজেরই এক জামাইকে জেলে পাঠিয়েছিল ; মেয়েকে নাকি মারধোর করতো জামাইটা। সে মেয়ে বিধবা না হয়েও বিধবার চেয়েও মনমরা দশা নিয়ে কিছুদিন বেঁচেছিল, তারপর হঠাৎ একদিন মরে গেল। আইনে না বাধলে মেয়ের আর একটা বিয়ে দেবে রামকানাই, এরকম একটা কথাও শোনা গিয়েছিল। সেই রামকানাই কি তার আদরের ভাগ্নীকেও না সরিয়ে নিয়ে গিয়ে চুপ ক'রে থাকবে?

কেতকী নামে ঐ ভাগ্নীটি রামকানাইবাবুর কাছে নিজের মেয়ের চেয়ে কম কিসের? কেতকীর মামী বেঁচে নেই, আপন বলতে রামকানাইবাবুর বাড়ির মধ্যে আর কেউ নেই, শুধু ঐ কেতকী ছাড়া। বড় আদরের, খুব বেশি স্নেহের ভাগ্নী, তাইতো নগদে অলংকারে দশ হাজার টাকা দিয়েও ভাগ্নীকে ভাল ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন রামকানাইবাবু।

চিন্তা করতে গিয়ে একটুও উদ্বিগ্ন হন না কমল বিশ্বাস। তিনি তো এর জন্য প্রস্তুত হয়েই আছেন। মনে-প্রাণে কামনা করেন, এইরকম কাণ্ড হয়ে যাক। চলে যাক এই বাড়ির একটা অনাবশ্যক প্রাণ।

দরজার কাছে একটা ছায়া যেন উসখুস করছে, কেউ বোধহয় ভিতরে আসতে চাইছে। দেখতে পেয়েই ভীতস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন কমল বিশ্বাস—কে? কে? কে ওখানে চোরের মত দাঁড়িয়ে?

ছায়াটা দরজার কাছে একটু এগিয়ে আসে, এবং বোঝা যায়, নিতান্তই ছায়া নয়। একটা শাড়ির আঁচল। তারপর একেবারে ঘরের ভিতরে এসেই দাঁড়ায় সেই মূর্তি, যার শাড়ির আঁচলের ছায়া নড়তে দেখে ভয় পেয়েছেন কমল বিশ্বাস।

আরও ভীত স্বরে এবং একটু কেঁপে উঠে প্রশ্ন করলেন কমল বিশ্বাস—অ্যাঁ, তুমি কি মনে ক'রে? তুমি এখানে কেন? কি বলতে চাও তুমি?

কেতকী বলে—আপনি আজ রাত্রে কি ভাত খাবেন?

কমল বিশ্বাসের চোখ দুটো আতঙ্কিত হয়ে বুঝতে চেষ্টা করে, কেতকীর এই অদ্ভুত কথাটার অর্থ কি? ভাতের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেবার মতলব করেছে নাকি রামকানাই-এর ভাগ্নী? অসম্ভব নয়।

কেতকী বলে—ভাত না খাওয়াই ভাল।

কমল বিশ্বাস—তা...তা কিছু একটা খেতে হবে তো। কিন্তু তুমি সেজন্য কেন ব্যস্ত হয়ে...।

কেতকী বলে—রুটি করে দিই। আমার মনে হয় রাত্রিবেলা শুধু দুধ-রুটি খেলে আপনার শরীর ভাল থাকবে।

—কি বললে? ফ্যালফ্যাল ক'রে কেতকীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন কমল বিশ্বাস। তাঁর কোটরগত চোখের সব ধূর্ততা যেন প্রচণ্ড বিস্ময়ের জ্বালায় পুড়তে আরম্ভ করেছে। জীর্ণ

পাঁজরের হাড়গুলি যেন কাতরে কাতরে শব্দ ক'রে বাজছে। নির্বোধ পাগলের মত চোখ, জ্ঞান হারানো রোগীর মত মুখ, কমল বিশ্বাসের সাদা চুলে ভরা মাথাটা ঠকঠক করে কাঁপে। বিপন্ন মানুষের মত আর্তনাদ ক'রে ওঠেন কমল বিশ্বাস--শুনছো সুধা, কেতকী কি বলছে...আমি যে ওর কথার কোন মানে বুঝতে পারছি না।

কে জানে, এতক্ষণ ধরে কেতকীর ঐ মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছিলেন সুধাময়ী। হ্যাঁ, গায়ের রংটা সত্যি বেশ কালো। সামনের দাঁতগুলি একটু বড়-বড়, নাকটা মোটা, ঠোঁট দুটো ভারি-ভারি, মিথ্যে নিন্দে করেননি মিহিরবাবুর স্ত্রী, বড় বেশি কুৎসিত বউ এনেছেন আপনারা।

--আমার কথার উত্তর না দিয়ে হাঁ ক'রে কি দেখছো তুমি?

কমলবাবুর আর্তনাদের মত স্বরের প্রশ্ন শুনে চমকে ওঠেন সুধাময়ী। এবং তেমনই চমক-লাগা স্বরে উত্তর দেন--তা...ভাল কথাই তো বলেছে কেতকী। রাত্রিবেলা তোমার দুধ-রুটি খাওয়াই ভাল।

একেবারে নীরব হয়ে যান কমল বিশ্বাস। সুধাময়ী বলেন--তাই কর কেতকী। ওঁর জন্যে গোটা তিন-চার রুটি ক'রে দাও। কিন্তু...।

কেতকী--কি?

সুধাময়ী--তুমি চা খেয়েছ?

কেতকী--না।

সুধাময়ী হাসেন--এত লজ্জা করছো কেন গো মেয়ে? নিজের দরকার নিজের হাতে ক'রে না নিলে চলবে কি ক'রে? দেখছো তো আমার অবস্থা, দু'পা হাঁটলে ভিরমি খাই, আর কোন কাজের কথাই মনে রাখতে পারি না। এই দু'টো মাস তবু জোর ক'রে কোন মতে হেঁসেল আর ভাড়ারের দায় নিয়ে খেটেছি, কিন্তু আর তো...।

কেতকী হাসে--আপনি ভাবছেন কেন? আমার দরকার হলে আমি নিজেই চা তৈরী ক'রে নেব।

সুধাময়ী--মনে রেখ ; অতুরও চা খাওয়ার অভ্যেস আছে।

কেতকী--হ্যাঁ, চা দিয়েছিলাম, কিন্তু খায়নি।

সুধাময়ী--ছি ছি!

বোধহয় মনের ভুলে চেঁচিয়ে উঠেছেন সুধাময়ী। এরকম একটা ধিক্কার যে হঠাৎ মুখ থেকে বের হয়ে যাবে, ভাবতেও পারেননি। চেঁচিয়ে উঠেই বোধ হয় ভয় পান এবং লজ্জাও পান সুধাময়ী। নতুন বউ-এর কাছে এই বাড়ির একটা গোপন অভিশাপের রহস্যকে কথার ভুলে ধরা পড়িয়ে দিলেন। এবং এই ভুল ঢাকা দেবার জন্য কথার রকম হঠাৎ নরম ক'রে দিয়ে এবং হাসতে চেষ্টা ক'রে অনুরোধ করেন সুধাময়ী--তা, অতুর ওসব খামখেয়ালের জন্য তুমি কিছু মনে করো না কেতকী। তুমি চা খেয়ে নাও।

চলে গেলে কেতকী। কমল বিশ্বাস যেন বিচিত্র একটা মূর্ছার মধ্যে তাঁর কথা বলবার শক্তিটাকেও হারিয়ে বসে আছেন। সুধাময়ী ডাকেন--শুনছো?

হাঁসফাঁস করেন কমল বিশ্বাস--শুনছি।

সুধাময়ী--মিছিমিছি কি ভাবছো তুমি?

কমল বিশ্বাসের জীর্ণ পাঁজরগুলি যেন ডুকরে কেঁদে উঠবে। কাঁপতে কাঁপতে আর হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন--একটু সাহস দাও সুধা। বড় ঘাবড়ে যাচ্ছি, বড় ভয় করছে। রামকানাই-এর ভাগ্নী চলে যাবে বলে মনে হচ্ছে না।

কমল বিশ্বাসের কোটরগত চোখ ভয় পেয়ে ছটফট করছে, কিন্তু সুধাময়ীর চোখ দুটোতে অদ্ভুত একটা প্রসন্নতা যেন থমকে রয়েছে। ঠাকুরদালানের থামের আড়াল থেকে সেই গল্পের সোনাগুলি যদি হঠাৎ আজ বের হয়ে পড়তো, তবুও বোধ হয় তাঁর চোখে এরকম খুশির

আলো জ্বলে উঠতো না। মনে হয় সুধাময়ীর, এতদিনে ঠাকুর একটা দয়ার মত দয়া দেখিয়েছেন। নইলে...নইলে কেতকীর মুখ থেকে এরকম অদ্ভুত সব কথা শুনতে পাওয়া যাবে কেন?

পাখা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কমল বিশ্বাসের বিষণ্ণ মূর্তিটাকে বাতাস করেন সুধাময়ী। তারপর উঠে গিয়ে, কনকচাঁপার সারির ভিতর দিয়ে আরও এগিয়ে যেয়ে, সন্ধ্যার পুকুরঘাটের ঠাণ্ডা জলে স্নান করলেন। একটা মাটির খুরিকে ঘি-এর প্রদীপ ক'রে জ্বেলে নিয়ে ঠাকুরঘরের ভিতরে ঢুকলেন।

কাজরী চৌধুরীর মত মেয়ের, এবং সেই মেয়েরই ঐ সুন্দর মুখের ছবি যার মন জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে, তার পক্ষে এই পৃথিবীর কোন আধ-সুন্দর মেয়ের মুখের দিকেও তাকাবার জন্য কোন আগ্রহ থাকতে পারে না। তার পক্ষে কেতকীর মুখের মত একটা কুৎসিত মুখের দিকে তাকাবার কোন প্রশ্নই আসে না। এবং সে-মুখ চোখে পড়লে চোখ ঘুরিয়ে নিতে হয়। অতীনের চোখ দুটো লজ্জা পায়।

অতীনের চোখ দুটোও অনেকবার লজ্জা পেয়েছে, কারণ ইচ্ছা না থাকলেও অনেকবার কেতকীর মুখের দিকে তাকিয়ে ফেলতে হয়েছে। কারণ, সকাল বিকাল দু'বেলাই ঠিক সময়ে চা-এর পেয়ালা হাতে নিয়ে অতীনের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কেতকী। কথা বলেনি অতীন, এবং কেতকী কোন কথা শোনাবার আশায় না থেকে নিঃশব্দে চলে গিয়েছে।

এই দু'মাসের মধ্যে দু'বার কেতকীর সঙ্গে কথা বলেছে অতীন। নিতান্তই বলবার দরকার হয়েছিল, তাই বোধ হয়।

ফুলশয্যার রাত্রিতে যতক্ষণ ঘরের ভিতরে বাসনা ও নতুন পাড়ার একদল মেয়ের সঙ্গে কেতকীর হাসাহাসি ও গল্পের বাচালতা বেজে চলেছিল, ততক্ষণ একটি কথাও না বলে শুধু নীরব শ্রোতার মত বসেছিল অতীন। ঘরের সেই বাচালতা শুনতে একটুও ভাল লাগেনি। যেন কতকগুলি অসার বিদ্রূপ আর বেহায়াপনার মধ্যে প্রশ্নোত্তরের পালা চলেছে।

বাসনা বলে—জান তো বউদি, দাদা হলেন ব্যারাকপুর ক্লাবের টেনিস চ্যাম্পিয়ন?

কেতকী—জানি না।

বাসনা—জেনে রাখ তাহলে।

কেতকী—হ্যাঁ, জেনে রাখলাম।

নতুন পাড়ার একটি মেয়ে বলে—অতীনদার সঙ্গে টেনিস খেলতে পারবেন তো?

কেতকী—খুব পারবো।

আর একটি মেয়ে বলে—জানেন বোধ হয়, চন্দ্রশেখর নাটকে অতীনদা কী চমৎকার প্রতাপ সেজেছিলেন?

কেতকী—জানি না।

—তা হলে জেনে রাখুন।

কেতকী—জেনে রাখলাম।

—তাহ'লে বলুন থিয়েটারও করতে পারবেন?

কেতকী—হ্যাঁ।

—প্রতাপের জন্য যদি শৈবলিনী হয়ে ডুবে মরবার দরকার হয় তবে...।

কেতকী—মরবো।

—ভয় করবে না?

কেতকী—একটুও না।

—আপত্তি করবেন না?

কেতকী—প্রতাপ যদি বলেন, তবে একটুও আপত্তি করবো না।

—বাঃ, চমৎকার! খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে বাসনা আর মেয়ের দল।

যখন ঘরের ভিতরে বাইরের কেউ আর ছিল না, বাচাল ঘর স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিল, তখন বিছানাটার দিকে তাকিয়ে অতীনের মনের ভিতরটা যেন জ্বলে উঠেছিল। বিছানা তো নয়, যেন একটা অদৃশ্য হাড়িকাট ওখানে লুকিয়ে রয়েছে। ভয়ানক কুৎসিত একটা স্পর্শের কাছে অতীনের এই সুন্দর শরীরটাকে বলি দেবার জন্য একটা চক্রান্ত ঐ ফুলের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে। দেখতে ঘৃণা বোধ করে অতীন। ওটা যেন অতীনের রক্ত মাংসের আশাটাকে ঠকিয়ে অপমান করবার আয়োজন। তা ছাড়া, ঐ বিছানায় রাত কাটালে অতীনের স্বপ্নটাই যে একজনের কাছে বিশ্বাসহন্তা হয়ে যাবে। তাই কেতকীকে একটা কথা বলতে বাধ্য হয়েছিল অতীন।—আমার ঘুম আসবে না, আমাকে এই চেয়ারে বসেই বই পড়ে রাত কাটাতে হবে। তুমি শুয়ে পড়।

হেসে ফেলেছিল কেতকী এবং সেই হাসির মধ্যে যেন তীব্র একটা চতুরতার বিদ্রূপ ছিল। রাগ হয়েছিল অতীনের।—তুমি মিছিমিছি হাসলে যে?

কেতকী—মিছিমিছি নয়।

অতীন—তার মানে?

কেতকী—বিছানাটাকে তোমার বড় ঘেন্না করছে।

অতীন—কে বললে?

কেতকী—কেউ বলেনি। বাসনা শুধু বলেছে যে, তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তোমার এই বিয়ে হয়েছে।

অতীন বলে—কথাটা সত্যি।

কেতকী—সেই জন্যই বলছি, তুমি শুয়ে পড়। আমি বরং লেস বুনে রাতটা কাটিয়ে দিই। সে অভ্যাস আমার আছে।

হ্যাঁ, যখন ভোরের পাখি প্রথম ডেকেছিল, তখন লেস বোনা থামিয়ে ঘরের দরজা খুলে বাইরে এসে পুবের আকাশের দিকে তাকিয়েছিল কেতকী।

আর একদিন, যেদিন রামকানাইবাবু এসে কমল বিশ্বাসের সঙ্গে রাগারাগি ক'রে কেতকীর সঙ্গে আড়ালে কি-সব কথা আলোচনা ক'রে চলে গেলেন, সেইদিন কেতকীকে একবার প্রশ্ন করেছিল অতীন—কবে যাচ্ছ তাহ'লে?

কেতকী বলে—দেখি কবে যেতে পারি।

তারপর, এই আজ আবার কেতকীর সঙ্গে অতীনের কথা বলতে হলো। এই প্রথম কেতকী নিজে এসে প্রশ্ন করেছে, তাই উত্তর দিতে হলো।

কেতকী বলে—আমি জানতাম, আমারই চলে যাবার কথা। কিন্তু তুমি চলে যাচ্ছ কেন?

অতীন গম্ভীর হয়ে বলে—তোমার এসব প্রশ্ন করবার কোন অর্থ হয় না। তোমার মামা বলে গিয়েছেন, এই ঠগের বাড়িতে তোমাকে আর একটা দিনও থাকতে দেবার ইচ্ছে তাঁর নেই। কিন্তু লক্ষণ দেখে বুঝতে পারছি, তুমি যাবে না। অগত্যা আমাকেই যেতে হচ্ছে।

কেতকী—আমি এখানে থাকলে তুমি এখানে থাকবে না, এই কি তোমার ইচ্ছা?

অতীন—হ্যাঁ।

কেতকীর চোখের তারা দু'টো কিছুক্ষণ অচঞ্চল হয়ে ঝিকমিক করে।—কিন্তু এই বাড়ি যাঁর, তাঁর ইচ্ছা এরকম নয়।

—কি বললে? আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে অতীন।

কেতকী—হ্যাঁ, তোমার বাবা আমাকে চলে যেতে দিতে রাজি নন।

—মিথ্যে কথা।

আবার একটা রুক্ষ সংশয় বেজে ওঠে অতীনের কথায়।

কেতকী বলে—খুব সত্যি কথা। যাঁর বাড়ি তিনি না চলে যেতে বললে তোমার কথায় আমি চলে যাব না।

যেন একটা কালো বজ্র পাথরের মূর্তি, কথাগুলি বলে কিছুক্ষণ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কেতকী, তারপরেই আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যায়।

ছোট একটা বিছানা বেঁধে রেখেছিল অতীন, এবং ছোট একটা চামড়ার বাক্সে কাপড়-চোপড় ভরা হয়ে গিয়েছিল। অতীনের সঙ্গে চলে যাবার জন্য তৈরী হয়ে আছে ঐ বিছানা আর বাক্স। সেই দিকে চকিতে একটা ভ্রূক্ষেপ করেই ছটফট ক'রে ওঠে অতীন। যেন তার আশার মাথার উপর আড়াল থেকে একটা ভয়ানক চক্রান্তের বাড়ি পড়েছে। হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে যায় অতীন, বারান্দা পার হয়ে একটা ছোট ঘরের দিকে তাকায়। হুঁকোর শব্দ শোনা যায়। চোখ-মুখের উগ্রতা আরও হিংস্র ক'রে নিয়ে একেবারে কমলবাবুর চোখের সামনে এসে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে অতীন—এসব আবার কি শুনছি?

কমলবাবু—কি?

অতীন—একেবারে নতুন কথা?

কমলবাবু হাসেন—কে বললে নতুন কথা?

অতীন—কেতকী চলে যেতে চায় ; কিন্তু তুমি নাকি আপত্তি করেছ!

কমলবাবু আস্তে আস্তে হাতের হুঁকোটাকে নামিয়ে রাখেন। শীর্ণ গলার ফোলা ফোলা রগগুলি সাপের বাচ্চার মত আরও ফুলে ফুলে কিলবিল করতে থাকে। অতীনের মুখের দিকে কোটরগত চোখের একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে বলেন—হ্যাঁ, আপত্তি করেছি।

অতীন—কেন?

কমলবাবু—কেন আবার কি? ঘরের বউকে ঘরছাড়া ক'রে পরের বাড়িতে রেখে দেব, এরকম নীচতা রসিকপুরের রাজবাড়ির কমল বিশ্বাসের পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি তোমার বাপকে আজও চিনতে পারনি অতীন।

অতীন—ঠিকই, চিনতে পারিনি।

কমলবাবু—হ্যাঁ, এইবার চিনে নাও।

অতীন—কিন্তু নিজের মুখেই বলেছিলেন, বিয়ের পরে ও মেয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না।

কমলবাবু—হ্যাঁ বলেছিলাম, একটা বাজে কথা বলেছিলাম। কিন্তু তুমি শিক্ষিত সুপুত্তুর হয়ে আমার একটা বাজে কথাকে অত শ্রদ্ধা কর কেন? কোনদিন তো দেখিনি যে, আমার একটা কাজের কথাকে শ্রদ্ধা করেছ।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে অতীন। ঐ ধূর্ততার আর চক্রান্তের সরীসৃপ যে নিজের ছেলেকেও কামড়াতে পারে, এতটা সন্দেহ করেনি অতীন, এবং সন্দেহ না করাই ভুল হয়েছে।

সুধাময়ী এসে উদ্বিগ্ন চোখ নিয়ে ঘরের ভিতর ঢোকেন। কমল বিশ্বাসও হাঁপাতে হাঁপাতে এবং হঠাৎ বেশ শান্ত হয়ে যেন নিজের মনেই বলতে থাকেন—পারবো না। ঠাকুর আমাকে দিয়ে অনেক বাজে কাজ করিয়েছেন, অনেক বাজে কথা বলিয়েছেন। কিন্তু আর না। কেতকী চলে গেলে আমাদের অমঙ্গল হবে।

অতীন—আমি চলে গেলে মঙ্গল হবে?

সুধাময়ী হঠাৎ আবেদনের মত করুণ স্বরে বলে ওঠেন—ষাট, তুই চলে যাবি কেন? কে তোকে চলে যেতে বলছে?

কমলবাবুর গলার স্বর হঠাৎ নরম হয়ে যায়—তুই যাবি কেন অতু? তুই থাকবি, নিশ্চয়

থাকবি। এইবার খেটে খুটে রোজগার ক'রে এই হাভাতে সংসারকে একটু সুখী ক'রে নিজে সুখী হয়ে..।

হাভাতে সংসার? অতীনের শিক্ষিত মনের কঠিন আবরণ যেন একটা আঘাত পেয়ে কেঁদে ওঠে। তাহলে কি সেই সেদিনের গল্পটা নিতান্তই একটা মিথ্যা? কমল বিশ্বাসের সেই সুন্দর বাজে কথাগুলিকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়নি, ঠাট্টা ক'রে আর সন্দেহ ক'রে হেসে ফেলতেও চেষ্টা করেছিল অতীন, কিন্তু কি আশ্চর্য, গল্পটার মধ্যে কি ভয়ানক একটা জাদু আছে যেন। ঠেলে ফেলে দিতে চাইলেও গল্পটা যেন মনের ভাবনাগুলিকে জোর ক'রে জড়িয়ে ধরে। তুতেনখামেনের সমাধিতেও কত সোনা ছিল। এ যে ইতিহাসের সত্য। তবে রসিকপুরের দু'শ বছরের পুরানো রাজবাড়ির ঠাকুরদালানের থামের আড়ালে কয়েক কলস সোনা থাকবে, সেটাই বা কি এমন অসম্ভব? অসম্ভব নয় ; কমল বিশ্বাস নামে লোকটা যতই মিথ্যেবাদী হোক না কেন।

ঐ সোনার ইতিহাস শোনবার পর থেকে অতীন নিজেও অনেকবার রাত দুপুরে ঘর থেকে বের হয়ে এই ঠাকুরদালানের দিকে তাকিয়েছে, শিউরে উঠেছে অতীনের শিক্ষিত মনের সব সংশয়। এবং সেই সোনার গল্পটাই যেন অতীনের শিরায় শিরায় বিচিত্র এক অনুভবের শিহর ছড়িয়ে দিয়েছে। মিথ্যা না'ও হতে পারে। ঐ গল্পটা শোনবার পর থেকেই যে অতীনের জীবনের একটা অভিমান মিটে গিয়েছে। এই ভাঙা বাড়ির ছেলে হয়ে জন্ম নেবার ভাগ্যটাকে ধিক্কার দেবার সেই অভ্যাসটাও যেন আপনি থেমে গিয়েছিল। ভাঙা ইঁটের স্তূপের মত এই কাঙালদশার রাজবাড়িকে ঠাট্টা না ক'রে অতীনের চোখ দুটো যেন একটু শ্রদ্ধা ক'রে তাকিয়ে দেখতে পেরেছিল। ভিতরে সোনা আছে, উপরে যতই ধুলো থাকুক না কেন, অতীনের অহংকারও যে এই কথাটা ভেবে বেশ খুশি হয়ে উঠে দাঁড়াতে পেরেছিল।

সন্দিগ্ধ অতীন বলে--তুমি এত মুসড়ে পড়ছো কেন? আর, সব জেনে শুনেও হাভাতে সংসার বলছ কেন?

ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেন কমল বিশ্বাস--কি বলছিস অতু?

অতীন--রামকানাইবাবু আমাদের যদিও হাভাতে মনে করেন, কিন্তু আমরা তো জানি যে, একদিন রামকানাইবাবুর মত ওরকম পাঁচটা সেগুন কাঠের কারবারিকে কিনে ফেলতেও আমাদের টাকার অভাব হবে না।

যেন স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে আরও উদাস ও শূন্য দৃষ্টি তুলে অতীনের কথাগুলিকে বুঝতে চেষ্টা করেন কমল বিশ্বাস। তারপরেই তক্ষকের মত শুকনো স্বরে খক খক ক'রে হেসে ওঠেন--সেই সোনার গল্পটা?

অতীন ভ্রূকুটি করে...গল্প?

কমল বিশ্বাস--তা ছাড়া আর কি? শোনা গল্প, শুনতে ভাল লাগে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে...কিন্তু তাতে পেট তো চলে না, পেট ভরেও না রে অতু। ওসব গল্প বড় ভয়ানক গল্প, মাথা খারাপ ক'রে দেয়। ওসব নিয়ে মাথা ঘামাসনি বাবা।

কী সুন্দর বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদীর মত কথা বলেছে সেই লোকটা, যে এই কিছুদিন আগে শেষ রাত্রের অন্ধকারে বসে ঠাকুরদালানের বারান্দার দিকে তাকিয়ে অতীনের কানের কাছে চাপা-গলায় সাতপুরুষের আগের সঞ্চয় সেই সোনার ইতিহাস বর্ণনা করেছিল। স্বয়ং ঠাকুর পদ্মনাভ পাহারা দিয়ে আগলে রাখছেন সেই সোনা। লোকটা বোধ হয় নিজের বিশ্বাসকেও বিশ্বাস করে না। কিংবা...।

অতীনের বুকের ভিতর তীব্র বিষের মত যে ব্যর্থতার জ্বালা হঠাৎ উথলে উঠেছে, সেই জ্বালাকে যেন আরও বিষাক্ত ক'রে দিয়ে কমল বিশ্বাস হাসতে থাকেন--তুই সায়েন্স পড়ছিস, ভগবানেও বিশ্বাস করিস না, কিন্তু কি আশ্চর্য, এরকম একটা গল্পকে বিশ্বাস ক'রে বসে

রইলি?

একটা গল্পও বলেন কমল বিশ্বাস। রসিকপুরের এই রাজবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা যিনি ছিলেন, সেই অনিরুদ্ধ বিশ্বাসের পর তিন পুরুষের একজন, তার নাম ছিল বলরাম বিশ্বাস। তিনি এক অমাবস্যার রাতে সোনার স্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠে একটা শাবল হাতে নিয়ে ঠাকুরদালানের একটা থামের উপর কোপ দিয়েছিলেন, আর শাবলটা ঠিকরে গিয়ে তাঁর মাথার ওপর পড়েছিল। তারপর পাগল হয়ে গিয়েছিলেন বলরাম বিশ্বাস।

অতীনের মনে হয়, প্রচণ্ড একটা বিদ্রূপের শাবল তার মাথার উপর এসে পড়েছে। এখনি পালিয়ে না গেলে পাগল হয়েই যেতে হবে। রাগ হয় নিজেরই উপর ; কমল বিশ্বাস নামে ধূর্ততার সাধক একটা চিরকেলে চক্রান্তের মানুষকে মনের দুর্বলতার ভুলে বিশ্বাস করেছিল অতীন। বিদকুটে একটা কুসংস্কারকে মনের ভিতর ঠাঁই দিয়েছিল। ছিঃ!

কিন্তু কমল বিশ্বাসের জীবনের আহ্লাদ যেন উথলে উঠতে চাইছে। গড়গড় ক'রে আর-এক রকমের একটা স্বপ্নের কথা বলতে থাকেন ; সুধাময়ীও মাঝে মাঝে তাঁর মোমের মত সাদা মুখটাকে ছোট ছোট আহ্লাদে হাসির ছোঁয়ায় রঙীন ক'রে নিয়ে সেই সব কথা শুনতে এবং সায় দিতে থাকেন।

কমলবাবু বলেন—আমার বড় ইচ্ছা অতু, দক্ষিণ দরজার বকুল বাগানের ওপাশে কাঠা দেড়েক জমির ওপর নতুন ক'রে দুটো পাকা ঘর তুলি। আর এই ফাটল ধরা ঘরে থাকতে ইচ্ছা হয় না। ভয় হয়, একটা ঝড়ের ধাক্কায় এই ঝুরঝুরে ছাদটা পড়ে যাবে। তা ছাড়া...।

একটু থেমে নিয়ে গলাটা কেশে পরিষ্কার ক'রে নিয়ে কমল বিশ্বাস বলেন—তা ছাড়া ভবিষ্যৎ বলে একটা ইয়ে আছে তো। তুই আছিস, কেতকী আছে, তারপর আমার ভাগ্যে নিশ্চয় নাতির মুখ দেখাও আছে। কাজেই এবার থেকে তোর চাকরির টাকা থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে দুটো নতুন ঘর তোলবার মত...।

বলতে বলতে থেমে যান কমল বিশ্বাস। কারণ, হঠাৎ ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেল অতীন।

বিমর্ষ হয়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলেন কমল বিশ্বাস আর সুধাময়ী। বারান্দার উপর দুটো শালিক আর এক-দল চড়াই ঝগড়া বাধিয়েছে, ঝগড়ার কর্কশ শব্দ শোনা যায়। একটু পরে সেই শব্দও হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল। সারা বাড়িটা একেবারে সত্যিকারের ধ্বংসস্তূপের মত শান্ত।

কেতকী চা নিয়ে এসে সামনে দাঁড়াতেই কমলবাবু হেসে প্রশ্ন করেন—আজও কি চা খায়নি অতু?

কেতকী—না।

সুধাময়ী—অতু কোথায়?

কেতকী—চলে গিয়েছে।

কাজরী চৌধুরীর চোখে ঠিক সেই, সেই অদ্ভুত রকমের দেখতে একটা দৃষ্টি, সেই নিবিড় পিপাসার বেদনা টলমল করে। একে তো দেখতে সুন্দর, তার উপর সারা মুখ জুড়ে ঐ অলস বিহ্বলতা। গনগনে আগুনের আভার মত একটা রক্তিমা যেন সর্বক্ষণ ছটফট করে কাজরী চৌধুরীর ঐ মুখে। এবং আজও অতীন বিশ্বাস সেই কাজরীর একটা হাত কোলের উপর টেনে নিয়ে কানের কাছে একটা কথা আস্তে আস্তে বলতেই সেই আগের মতই একেবারে কুণ্ঠাহীন আগ্রহে অতীন বিশ্বাসের সুন্দর চেহারাটার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে একেবারে স্পষ্ট ভাষায় উত্তর দেয় কাজরী—হ্যাঁ, যেদিন বলবে সেদিন, যখন বলবে তখন।

খুশি হয় অতীন, এবং মনের ভিতর থেকে ছোট একটা উদ্বেগের ছায়াও সরে যায়। এই দু'মাসের মধ্যে মাত্র একটি দিন কাজরী চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ পেয়েছিল

অতীন, এবং চিঠি লিখেছিল মাত্র দু'টি।

এই কাজরী চৌধুরীর মুখে আর একবার সেই কথা শুনতে পেয়ে আরও আশ্বস্ত হয় অতীন বিশ্বাসের অপরাধী মন। কাজরী বলে—আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না অতীন, আমার প্রাণ চায় তোমাকে নিয়ে এই পৃথিবীর এমন এক জায়গায় জীবনটা কাটিয়ে দিই, যেখানে শুধু তুমি আর আমি।

বিশ্বাস করে অতীন, একটু বাড়িয়ে বলেনি কাজরী। এই মেয়ে এক আশ্চর্য মনের মেয়ে। টাকার মানুষকে চায় না, পদ সম্মান ও প্রতিষ্ঠার মানুষকে পরোয়া করে না, চায় শুধু মনের মত সুন্দর একটি মানুষকে, এবং সেই মানুষের হাত ধরে বনবাসে চলে যেতেও ওর আপত্তি নেই।

ভালবাসে কাজরী এবং এই ভালবাসার স্বাদ যেন অতীনের প্রতি রক্তবিন্দুর মধ্যে একটা মায়াময় উষ্ণতা মাতিয়ে রেখেছে। যাকে ভালবাসে কাজরী, তার মাইনে যে মাত্র একশো দশ টাকা, সে-কথা ভুলেও বোধহয় কাজরীর মনে পড়ে না। অতীনের ঐ সুন্দর চেহারাটাই যে একটা সম্পদ, এবং সে সম্পদের স্বাদ লাখ টাকার জোরেও কিনতে পারা যায় না। একথা কাজরী চৌধুরীই নিজের মুখে অনেকবার বলেছে।

চন্দননগরের গঙ্গায় সন্ধ্যার আলোর ছবি তরল সোনার মত দোলে, সেই দিকে তাকিয়ে হাত ধরাধরি ক'রে পথ হেঁটে এগিয়ে যেতে থাকে অতীন আর কাজরী।

কাজরী বলে—তুমি জান, আমার এখন আর ওসব ছাই কালচারাল ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে না। যতদিন মন ফাঁকা ছিল, ততদিন একরকম ভাল লাগতো। আর্ট এগজিবিশন নিয়ে, ড্রামা নিয়ে, গানের জলসা নিয়ে, পলিটিক্সের ছাই-পাঁশ নিয়েও অনেক হৈ চৈ করেছি। কিন্তু তুমি যেদিন থেকে আমাকে ভালবেসেছ সেদিন থেকে...।

হেসে হেসে যেন কাজরী চৌধুরীর কথার একটা ভুল শুধরে দেয় অতীন—তুমি যেদিন থেকে আমাকে ভালবেসেছ।

কাজরী হাসে—হ্যাঁ, একই কথা। সেদিন থেকে শুধু ঐ একটি স্বপ্নই দেখছি, শুধু তুমি আর আমি, দুটো প্রাণের বেঁচে থাকবার মত দুটো ভাত খাবার পয়সা জুটিয়ে নিতে পারলেই হয়ে গেল। পয়সা রোজগারের জন্য বেশি খেটে খাবার সময় নষ্ট করবার কোন দরকার নেই। সেই সময়টুকু বরং তোমার সঙ্গে...।

বড় জোরে শক্ত ক'রে অতীনের হাতটা চেপে ধরে কাজরী। ঠোঁট দুটো থর থর ক'রে কাঁপে। অতীন বিশ্বাসের বুকের বাতাস উতলা হয়ে ওঠে, এবং কাজরীর মুখের দিকে তাকিয়ে পথের সেই মৃদু আলোকেই দেখতে পায় অতীন, বিহুল হয়ে থমথম করছে কাজরী চৌধুরীর চোখ, আর সারা মুখে গনগনে আভা।

যে-কথা বলবার জন্য অনেকক্ষণ ধরে মনে মনে চেষ্টা করছে অতীন, এখনও অবশ্য সে-কথা বলা হয়নি। বলতে গিয়ে বড় করুণ একটা কুণ্ঠা বুকের ভিতরে দুরু দুরু ক'রে ওঠে। কাজরী চৌধুরীর এই উদার মনের এই মত্ত ভালবাসার নিষ্ঠাটাকে আরও একটু পরীক্ষা ক'রে দেখতে চায় অতীন।

অতীন বলে—এমন যদি হয় কাজরী, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হলো না।

কাজরী হেসে ফেলে—তাতেই বা কি আসে যায়? তুমি তো থাকবে। আর, এই পৃথিবীতে একটা ঘরও পাওয়া যাবে। কারও সাধ্যি নেই অতীন, তোমাকে আমার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে। কিন্তু কেন...এরকম অদ্ভুত কথা তোমার মনে হচ্ছে কেন? তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে না হবার মত কোন অভিশাপ কি কখনও দেখা দিতে পারে?

অতীন হাসে—বাধা দেখা দিতে পারে।

কাজরী—কোন বাধা মানবো না। যদি বাধা মানবার মত আমার মন হতো, তবে এতদিনে

অসিত দত্তের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যেত।

বিশ্বাস করে অতীন, একটুও বাড়িয়ে বলেনি কাজরী। কালো মোটা ও খাকি শর্ট পরা ব্যবসায়ী ভদ্রলোক, যিনি চার বেলা গাড়ি বদল ক'রে বেড়াতে যান আর কাজে বের হন, তাঁর নাম অসিত দত্ত। সকাল বেলা একটা টু-সীটার, দুপুরে একটা ইটালীয়ান লিমুজিন, বিকালে বিলাতী ট্যুরার আর সন্ধ্যায় ফরাসী সিডান। অজস্র টাকা আর অজস্র বাড়ি জমি ও শেয়ার। ছ-সাতটা রাইফেল আর শর্ট গান নিয়ে শীতকালে সুন্দরবনে হাঁস শিকার করতে যান, সেই অসিত দত্ত আজও অবিবাহিত, এবং কাজরী চৌধুরীর বাবাকে বাড়ি করবার জন্য এক মারোয়াড়ী মহাজনের কাছ থেকে ঋণ পাইয়ে দিয়েছেন, নিজে জামিন হয়ে। কাজরীর বাবা সাধনবাবুরও ইচ্ছা, অসিত দত্তকেই বিয়ে করতে চেষ্টা করুক কাজরী।

অতীন--কিন্তু অসিতবাবুর ইচ্ছেটা কি?

কাজরী--সে ভদ্রলোককে মিথ্যে সন্দেহ করো না অতীন। অসিতবাবু কোনদিন ভুলেও এরকম ইচ্ছের কথা বলেননি। আমাদের গ্রেট আর্ট সোসাইটির জন্য তিনি অকাতরে টাকা ঢেলে দেন, এই মাত্র।

অতীন—কিন্তু...।

কাজরী—কোন কিন্তু নেই। আমি টাকার মানুষকে বন্ধু বলে স্বীকার ক'রে নিতে পারি, উপকারীকে শ্রদ্ধা করতে পারি ; কিন্তু তাকে স্বামী ক'রে নিতে পারি না। সেই মেয়েই আমি নই।

—বন্ধু? প্রশ্নটা হঠাৎ একটা ছোট আর্তনাদের মত অতীন বিশ্বাসের গলায় চমকে ওঠে।

কাজরী—হ্যাঁ, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু তুমি...।

বলতে গিয়েই অতীনের মুখের দিকে তাকিয়ে কাজরীর কথার আবেগ যেন হোঁচট খেয়ে থেমে যায়। চুপ ক'রে কি-যেন ভাবে কাজরী। তারপরেই দৃপ্তস্বরে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে,—যদি আর কাউকে বিয়ে করবার দুর্ভাগ্য হয় আমার, তবুও জানবে যে আমি তোমার। যখন ইচ্ছে হবে, যখনই ডাকবে, তখনই আমি তোমার। নামে স্বামী না হলেও তুমি আমার জীবনে স্বামী হয়ে থাকবে। এর চেয়ে বড় আর কোন্ প্রতিজ্ঞা আমার কাছ থেকে আশা কর অতীন?

কাজরীর চোখের দৃপ্ত চাহনিটাও সজল হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। অতীন বলে—আমি বিশ্বাস করি কাজরী। তুমিও বিশ্বাস কর, যদি কোন কারণে অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করবার দুর্ভাগ্য আমার হয়, তবুও আমি তোমার।

গঙ্গার একটা ঘাট। নীরব নয়, নির্জনও নয়। অনেকেই বেড়াতে এসেছে। অতীন আর কাজরীও ঘাটের কাছে এসে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে, একটু আরাম করে বসবার মত কোন জায়গা যদি পাওয়া যায়।

জায়গা নেই। কাজরী একটু ক্লান্তস্বরে আনমনার মত প্রশ্ন করে।—এই দু'মাস তুমি কি এমন মহৎ কাজে আটকা পড়ে রইলে যে আমার সঙ্গে মাত্র একটি দিন ছাড়া দেখা করবারই সময় পেলে না?

কাজরীর হাত ধরে অতীন। কথা বলতে গিয়ে গলার স্বরও ব্যথিত অপরাধীর আক্ষেপের মত করুণ হয়ে ওঠে।—মহৎ কাজে নয়, ভয়ানক অন্যায় কাজে...সত্যই একটা ট্রাজেডি ঘটে গিয়েছে কাজরী...কিন্তু আমার দোষ নয় কাজরী...বাধ্য হয়ে...একটা কর্তব্যের খাতিরে...বোনের বিয়ের খরচের জন্য বাবাকে টাকা পাইয়ে দিতে গিয়ে নিজেকে এক মিথ্যে বিয়ের কাছে বলি দিয়েছি।

শুনে চমকে ওঠে কাজরীর চোখ। কিন্তু ঐ একবার মাত্র, তারপর আর নয়। নীরব হয়ে এবং একবারে সুস্থির হয়ে এই গল্পের আরও কিছু শোনবার জন্য অতীনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কাজরী।

অতীন বলে—বাবা ও মা একেবারে ক্ষমাহীন হয়ে দাবি করলেন, বোনের বিয়ের জন্য খরচের সব টাকাই আমাকেই দিতে হবে। কাজেই, বাবারই চক্রান্ত মেনে নিয়ে একটা বিয়ে ক'রে নগদে অলংকারে দশ হাজার পণ নিয়ে বাবাকে টাকা পাইয়ে দিয়েছি।

গল্পের এতখানি শোনা হয়ে যাবার পরেও আরও কিছু যেন বাকি আছে, এবং সেটাই বোধ হয় শেষ তথ্য, যা জানবার পর কাজরী চৌধুরীর চোখের ঐ শান্ত কৌতূহল আরও শান্ত হয়ে যাবে।

অতীন হাসে--তবে আমি আমার প্রতিজ্ঞা রেখেছি কাজরী, সে মেয়ের মুখের দিকে কোন দিন ইচ্ছা ক'রে একবার তাকাইওনি। ভাগ্যি এই যে, সেই মেয়ের মুখটা দেখবার মত নয়। আরও ভাল কথা, এহেন মেয়েও আমাকে ঘেন্না ক'রে দূরে সরিয়ে দিতে চায়।

—কেন? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে কাজরী।

অতীন—তা জানি না। কিন্তু মস্ত এক বড়লোকের ভাগ্নী হলেন তিনি, ঐ কেতকী।

ছলছল করলেও কাজরী চৌধুরীর চোখে গভীর এক প্রসন্নতা সুস্থির হয়ে ফুটে ওঠে। একটুও বিচলিত হয়নি কাজরী। বরং মনে হয়, অতীনের ঐ সুশ্রী বলিষ্ঠ ও সুযৌবনের উচ্ছল মূর্তির দিকে তাকিয়ে কাজরী চৌধুরীর ভালবাসার আশা ধ্রুবজ্যোতির মত ফুটে উঠেছে। কাজরী বলে—তোমার জীবনের এই দুঃখের গল্প বলতে তুমি অত ভয় করছিলে কেন অতীন, ছিঃ, আমাকে বোধ হয় আজও চিনতে পারনি।

অতীন—সত্যি ভয় করছিল কাজরী ; তুমি আমাকে ভুল বুঝবে, এই ভয়।

কাজরী—একটুও ভুল বুঝিনি। আমার কিছু বোঝাবার দরকারও হয় না। আমি শুধু জানি, তুমি আমার। কেতকী নামে সেই মেয়েকে তুমি যদি ভালবেসেও ফেল, তবু তুমি আমার।

শুনে চমকে ওঠে অতীন। অতীন বিশ্বাসের বুকের ভিতরটা যেন এক স্বর্গলোকের ফুলের সৌরভে ভরে ওঠে। এ কি অদ্ভুত আত্মদানের কথা বলছে কাজরী ! কী নির্ভয় ভালবাসা। ঐ তো কাজরীর দুটি ঠোঁট ফোটা গোলাপের মত শোভা ছড়ায়, যে দুটি ঠোঁটের উষ্ণতা অতীন বিশ্বাসের ভালবাসার কাছে কতবার অবাধে মত্ত হয়ে আর প্রাণভরা তৃপ্তি গ্রহণ ক'রে তবে স্নিগ্ধ হয়ে গিয়েছে। সেই প্রথম দিনের প্রতিজ্ঞাটা আজও কাজরী চৌধুরীর অন্তরাত্মার কাছে ঠিক সেই শ্রদ্ধায় বন্দিত হয়ে চলেছে। সবই মনে পড়ে অতীনের। শ্রাবণ মাসের সেই অদ্ভুত একটা সজল সন্ধ্যা কাজরীদেরই বাড়ির সেই ড্রইংরুম, এবং সেই ড্রইংরুমের ভিতর উঁকি দেবার মত চক্ষু তখন বাড়িতে ছিল না। বাড়ির সকলেই কলকাতার এক বিয়ে বাড়ির উৎসবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চলে গিয়েছিল। মনে পড়ে অতীনের কাজরী চৌধুরীর সেই এলোমেলো রূপের অদ্ভুত ছবিটাকেও মনে পড়ে। জলের ঢেউ-এর আঘাতে আহত ব্যথিত ও অবসন্ন হয়েও পদ্মফুলের রূপ যেমন ক'রে হাসে, ঠিক তেমনই হাসি ফুটে উঠেছিল কাজরীর মুখে। কী গভীর কাজরী চৌধুরীর সেই ক্লান্তির আনন্দ, কী সুন্দর সেই মূর্ছা! অতীন বিশ্বাসের একটা হাত সাগ্রহে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলেছিল কাজরী, মরবার সময়েও তোমার কাছ থেকে এই সর্বনাশের সুখ পেতে চাই। অতীন তুমি আমার স্বামী।

আজও আবার, এই সন্ধ্যায় গঙ্গার ঘাটের কাছে আলো-ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে কাজরী চৌধুরীর মুখে দপ ক'রে সেই গনগনে আগুনেব আভা চমকে ওঠে। কাজরী বলে—কাকে স্বামী বলে, কোন্ গুণে স্বামী হওয়া যায়, সে-কথা তোমার কাছে বলে দিতে আমার কোন লজ্জা হয়নি। এর পর তোমার ভয় করবার কোন কথাই থাকতে পারে না অতীন।

অতীন বিশ্বাসের মন বিপুল এক গর্বের উৎফুল্লতায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। কাজরীর কথাগুলি যেন অতীনের সার্থক পৌরুষের প্রতি এক জয়ধ্বনিমুখর অভিনন্দন। এই তো সেই নারী, যার সঙ্গে জীবনে মরণে এক হয়ে মিশে থাকতে পারলে জীবন ধন্য হয়ে যায়। অতীন বলে—না, কোন ভয় করি না কাজরী। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবেই হবে। শুধু একটু সময় লাগবে,

এই মাত্র। কেতকী কোন বাধা হবে না।

কাজরী--তার মানে?

অতীন--তার মানে আইনের সাহায্য নিতে হবে। ততদিন...।

কাজরী--কি?

অতীন হাসে--ততদিন আমাকে শ্যামবাজারের ঐ মেসবাড়ির কুঠুরিতে থাকতেই হবে।

কাজরী--আজকাল কোথায় থাক তুমি?

অতীন--ঐ মেসবাড়িতে। আপাতত বাড়ি ফেরবার উপায় নেই।

কাজরীর চোখ আবার ছলছল করে--আমাকে তুমিও বড় বেশি ভালবেসে ফেলেছো অতীন। দুঃখ শুধু এই যে, আমার জন্য তোমাকে এত ঝঞ্ঝাট ভুগতে হচ্ছে!

অতীন হাসে--এ আর কি এমন ঝঞ্ঝাট? গল্পে পড়েছি, ভালবাসার বিল্বমঙ্গল ঝড়ের রাতে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল, প্রেমিকার কাছে যাবার জন্যে।

কাজরী হাসে--তাহ'লে আমিও তোমার প্রেমিকা, শুধুই প্রেমিকা, কেমন?

অতীন--না, শুধু তাই নয়। তার চেয়ে আরও কিছু বেশি।

কাজরী--কি?

অতীন--আমি অত বোকা নই কাজরী। আর আমাকে ঠকাতে পারবে না।

কাজরী--তবু তো মুখ খুলে বলতে পারছো না।

অতীনের চোখ দুটি বিহ্বল হয়ে ওঠে। কাজরী চৌধুরীর কানের কাছে মুখটা এগিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বলে--স্ত্রী।

কাজরীর চোখে সজল হর্ষ ঝিকমিক করে--সে তোমার দয়া।

রসিকপুরের রাজবাড়ির দক্ষিণ দরজার বাগানের ভিতর যে ছোট পুষ্করিণীটা ছিল, সেটার জল মরে গিয়ে যেদিন একেবারে শুকনো খটখটে হয়ে গেল, সেদিন বুঝতে পারলেন কমল বিশ্বাস, আর একটা বৈশাখ পার হয়ে জ্যৈষ্ঠেরও শেষ হতে চলেছে, কিন্তু অতীন নামে সেই ছেলের মনে বাড়ি ফিরবার মত মায়ার টান দেখতে পাওয়া গেল না। এক বছরের মধ্যে অতীনের কাছ থেকে মোট তিনখানা চিঠি এসেছিল, চিঠিতে অতীনের ঠিকানা পর্যন্ত লেখা নেই। চিঠির বক্তব্য খুবই সংক্ষিপ্ত।--যদি কোনদিন দরকার মনে করি, তবে বাড়ি ফিরবো, নচেৎ নয়। যদি সামর্থ্য হয়, তবে টাকা পাঠাবো, নচেৎ নয়। আমাকে বাদ দিয়ে যদি তোমরা সুখে থাকতে পার, তবে সেটা সুখেরই কথা।

বুকের ব্যথায় ছটফট ক'রে ভাঙা চেয়ারে বসে সারা দুপুর হাঁই তুলেছেন কমল বিশ্বাস এবং সারা দুপুর পাখা হাতে নিয়ে তাঁর মাথায় বাতাস দিয়েছে যে, সে হলো কেতকী। সুধাময়ীকে ঘরের কোন কাজই করতে দেয় না কেতকী, এমন কি কমলবাবুর মাথায় পাখার বাতাস করবার কাজটুকুও না।--আপনিই যদি এই ভাঙা শরীর নিয়ে এসব কাজ করবেন, তবে আমাকে এখানে এনেছেন কেন? শাশুড়িকে এই ধরনের কথা অনেকবার শুনিয়ে দিয়েছে কেতকী। শুনে সুধাময়ীর দু'চোখ ভরে অদ্ভুত এক আনন্দের জ্যোতি হেসে উঠেছে, আর, কমলবাবু হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেলেছেন।

বড় করুণ এই কান্না। কমল বিশ্বাসের চক্রান্তময় ধূর্ত জীবনটা যেন অকল্প্য এক বিস্ময় সহ্য করতে গিয়ে এইভাবে যখন-তখন কেঁদে ফেলে। কে জানে কার আশীর্বাদে তাঁর জীবনের সকল বিষ হঠাৎ মধু হয়ে গেল? কেতকী, কেতকী মা! ডাক দিয়েই ছোট ছেলের মত ককিয়ে ককিয়ে কাঁদতে থাকে পঁয়ষট্টি বছর বয়সের মানুষটা।

কেতকী এসে ধমকের সুরে কথা বলে--আপনি অকারণ এরকম হা-হুতাশ করলে আমি বড্ড রাগ করবো।

কমলবাবু—রাগ কেন, তুমি প্রাণভরে আমাকে ঘেন্না কর কেতকী, তাহ'লে বরং আমি একটু খুশী হতে পারবো।

উত্তর দেয় না কেতকী। নিজের মনের আবেগে ঘুরে ফিরে কাজ করতে থাকে। এবং নিজেও আশ্চর্য হয়ে, মনের অনেক প্রশ্ন চিন্তা সন্দেহ আর যুক্তিগুলিকে খাটিয়ে খাটিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে, কেন, কেন এবাড়ির এই দুটো বুড়ো মানুষের মুখের দিকে তাকালে এত মায়া লাগে? মামা বলেন, এরা হলো ভয়ানক চক্রান্তের বুড়ো-বুড়ি, মানুষের সংসারকে ঠকিয়ে শুধু দু'পয়সা বাগাবার জন্য মতলব ফাঁদছে। কিন্তু কেতকী যে নিজের চোখেই স্পষ্ট ক'রে দেখতে পেয়েছে ; জীবনে কিছুই বাগাতে পারেনি এই বুড়ো-বুড়ি। বরং মনে হয়, মানুষের সংসারটাই ওদের ঠকিয়ে একেবারে কাঙাল ক'রে দিয়ে আর ভেঙে-চুরে একটা কাঁটাবনের ভিতর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

কমলবাবুও উঠে গিয়ে জীর্ণ শরীরটাকে টেনে টেনে ঠাকুরদালানের দরজার উপর গিয়ে শান্তভাবে এলিয়ে দেন। বাবুই পাখির ছেঁড়া বাসা, বুড়ো সাপের খোলস, শিরীষের শুকনো শুঁটি গরম হাওয়ার ঝড়ে ছিটকে এসে বারান্দায় ছড়িয়ে রয়েছে। এই জীর্ণতার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে চুপ ক'রে বুকের অন্য রকমের একটা ব্যথা সহ্য করতে চেষ্টা করেন। না, কাঁদবার দরকার কি? অনেক পুণ্য ছিল জীবনে, নইলে যে মেয়ের সৌভাগ্যকে খুন করা হলো, সে মেয়েই এই বাড়ির সৌভাগ্য হয়ে উঠবে কেন?

—সুধা। ডাক দিতেই সুধাময়ী আসেন।

একটা গল্প বলেন কমলবাবু।

—দক্ষিণ দরজার যে পুকুরটা শুকিয়ে গিয়েছে, তার তলা থেকে ছোট একটা ইঁটের ঘর উঁকি দিয়ে রয়েছে, চোখে পড়েছে তো সুধা?

—হ্যাঁ।

—ঐ ঘরের ভিতর কি আছ জান?

—না।

—এই বাড়ির একটা পুরোনো অভিশাপের চিহ্ন ওর ভিতরে লুকিয়ে আছে।

—অভিশাপের চিহ্ন? ভয় পেয়ে প্রশ্ন করেন সুধাময়ী।

—হ্যাঁ, একটা খড়্গ, যে খড়্গে একবার নরবলি দিয়ে দেবীর তুষ্টি করেছিলেন চার পুরুষ আগের ভৈরব বিশ্বাস।

সুধাময়ী—ওতে কি আর দেবী তুষ্ট হন, কখনই না।

কমলবাবু হাসেন।—দেবী তুষ্ট হয়েছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু সেই ভৈরব বিশ্বাস ঐ খড়্গ দিয়ে এক সুন্দরী বিধবাকে দু'টুকরো ক'রে কেটে ফেলেছিলেন।

শিউরে ওঠেন সুধাময়ী—কেন?

কমলবাবু—সেই বিধবা ছিল পরমা সুন্দরী ; এই বাড়িরই দাসী ছিল। পরম শাক্ত ভৈরব বিশ্বাসের সঙ্গে নির্জনে বসে তন্ত্রমন্ত্র করতে রাজি হয়নি, এই ছিল তার অপরাধ।

সুধাময়ী—তারপর?

কমলবাবু—তারপর আর কি? ফাঁসি থেকে বাঁচবার জন্য লাখ টাকা খরচ ক'রে মামলা লড়লেন, শেষ পর্যন্ত বেঁচেও গেলেন ভৈরব বিশ্বাস। রাজযক্ষ্মায় যেদিন মারা গেলেন ভৈরব বিশ্বাস, সেইদিনই তাঁর ছেলেরা পুজো ক'রে মাটির গভীরে সেই নরবলির খড়্গকে ইঁটগাঁথা ক'রে পুঁতে ফেললেন, আর তার উপরে ছোট একটি পুষ্করিণী বেঁধে দিলেন। কিন্তু বিশ্বাসবাড়ির ভাগ্যে সেই যে ভাঙন ধরলো, তা আর থামলো না। আজও থামেনি সুধা।

সুধাময়ী সান্ত্বনা দেন—এসব গল্প ভুলে যাওয়াই ভাল।

চেঁচিয়ে ওঠেন কমল বিশ্বাস—কি করে ভুলবো? আমিও যে নরবলির মত কাজ করেছি।

সুধাময়ী তেমনি অবিচলিত স্বরে আবার কমল বিশ্বাসের আত্মধিক্কারের জ্বালাগুলিকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন,--তুমি বিশ্বাস কর, কেতকী সব ভুলে গিয়েছে, সে আমাদের একটুও ঘেন্না করে না। নিজের মুখে কেতকী আমাকে বলেছে, আমরা চলে যেতে না দিলে সে কখনও চলে যাবে না।

কমলবাবুর গলার স্বর কুণ্ঠিত হয়ে কাঁপতে থাকে। কিন্তু এইবার বোধহয় চলে যেতে বলতে হবে।

সুধাময়ী--কেন?

কমলবাবু--আর যে দশটা টাকাও হাতে নেই। সব ফুরিয়েছে। বাসুর বিয়ের খরচ কুলিয়ে যা হাতে ছিল তাই দিয়ে একটা বছর চলেছে! কিন্তু আর তো চলবে না।

একটু থেমেই ফুঁপিয়ে ওঠেন কমল বিশ্বাস--কিন্তু আমি তো আর পারবো না সুধা। ভগবান এসে সাহস দিলেও আর আমার পক্ষে মানুষকে কথার চালাকিতে ভুলিয়ে দু'টো টাকা বাগাবার চেষ্টা সম্ভব হবে না। উপোস করে মরে যাবার জন্য তৈরী থাক সুধা, আর, সেজন্য এক ফোঁটা দুঃখ করো না। মরবার আগে ঠাকুরকে বলে যাব, শেষ পর্যন্ত ভালই করলে ঠাকুর।

সুধাময়ী চোখে আঁচল চাপা দেন। কমলবাবু বলেন--শুধু কেতকীকে কোনমতে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওর মামার কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে।

সুধাময়ী বলেন--তা না হয় হলো, কিন্তু কেতকীর জীবনটা কি এভাবে সিঁথিতে সিঁদুর রেখেও বিধবা হয়ে থাকবে?

কমল বিশ্বাসের কোটরগত চোখ থেকে আগুনের আভা ছিটকে পড়ে। গলার রগগুলি আবার হিংস্র হয়ে কিলবিল করে। চেঁচিয়ে ওঠেন কমল বিশ্বাস--যদি সত্যি কথা আমার কাছ থেকে শুনতে চাও সুধা তবে বলতে পারি।

সুধাময়ী--বল।

কমল বিশ্বাস--কেতকীর বিধবা হয়ে যাওয়াই ভাল।

সুধাময়ী চমকে উঠে আর্তনাদ করেন--ঠাকুর!

ঠাকুরদালানের বারান্দার নিভৃতে এই সব অসহায় আক্ষেপ আর আর্তনাদের বেদনাগুলিকেই চমকে দিয়ে একটা হাসিমাখা স্বর ব্যস্তভাবে কাছে এগিয়ে আসতে থাকে। কেতকীর গলার স্বর বলে মনে হয়।--মা আপনি কোথায়? ডাকতে ডাকতে এই দিকেই বোধ হয় এগিয়ে আসছে কেতকী।

এগিয়ে আসে কেতকী, হাতে একটা চিঠি। চিঠিটা খোলা। কেতকীর সেই কালো মুখের উপর ঝকঝক করছে অদ্ভুত একটা প্রসন্নতার হাসি। তবে কি সত্যিই কেতকীর সিঁথির ঐ সিঁদুর জয়ী হয়েছে, সত্যিই কি চিঠি লিখেছে অতীন? সুধাময়ী কমল বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে অনুযোগ করেন--তুমি অকারণে বড় বেশি ভয়ানক কথা বলতে পার। এখন বোঝ।

কমল বিশ্বাস বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন। কেতকী এসে হাসতে হাসতে বলে--এখন আপনি আমাকে অনুমতি দিন বাবা।

কমলবাবু--বল, কিসের অনুমতি চাও।

কেতকী--একটা চাকরী পেয়েছি, পাইকপাড়ার একটা মেয়ে স্কুলে পড়াতে হবে। মাইনে পঁচিশ টাকা। তিন মাস ধরে চেষ্টা করছিলাম। অনেক চিঠি লিখেছি, অনেক কেরামতির সার্টিফিকেট পেশ করছি, তবে স্কুল কমিটি খুশি হয়েছেন। এই মাসেই, আর পাঁচ দিনের মধ্যে কাজে লেগে যেতে হবে।

কমল বিশ্বাসের শীর্ণ বুকের পাঁজরগুলি এখনি কড়মড় করে ভেঙে যাবে। এই বিস্ময় সহ্য করবার শক্তি নেই তাঁর। মানুষকে এত মহৎ হতে দিতে রাজি নন কমলবাবু। এ কি

ভয়ানক সর্বনেশে মহত্ত্ব। চিৎকার করে ওঠেন কমল বিশ্বাস—না অনুমতি দিতে পারি না কেতকী। তুমি আমাদের বড় বেশি নীচ ঠাউরেছ। কিন্তু আমরা তা নই। উপোস করে মরতে রাজি আছি তবু তোমাকে খাটিয়ে বেঁচে থাকবার ভাত যোগাড় করতে রাজি নই। তুমি আজই তোমার মামার কাছে চলে যাও।

চুপ ক'রে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে কেতকী। সুধাময়ীই সমস্যাটাকে সামলাবার জন্য বলেন—তুমি এখন ঘরে যাও কেতকী। পরে কথা হবে। হঠাৎ এরকম একটা অনুমতি চেয়ে বুড়ো মানুষকে চমকে দিতে নেই।

কেতকী চলে যাবার পর সুধাময়ী বলেন—তুমি একটা কথা বুঝতে পারছো না।

কমলবাবু—কি?

সুধাময়ী—কেতকী কেন, কিসের জন্য এখানে পড়ে থাকতে চাইছে, সেটা তুমি বুঝতে পারতে, যদি মেয়েমানুষ হতে।

কমলবাবু—বুঝতে পারছি না ঠিকই।

সুধাময়ী—কেতকীর মনে আশা আছে, ওর স্বামীকে একদিন পাবেই পাবে। শুধু দিন গুনছে কেতকী।

বিদ্রূপ করেন কমল বিশ্বাস—কে ওর স্বামী? তোমার ঐ সুন্দর পশুর মত দেখতে ছেলেটি?

সুধাময়ী বিরক্ত হন।—কিন্তু কেতকীর ইচ্ছাকে বাধা দিও না। ধরে নাও কেতকী নিজেরই মেয়ে। গরীব বাপ-মার সাহায্যের জন্য মেয়ে কি চাকরি করে না?

করুণভাবে হেসে ফেলেন কমল বিশ্বাস—নিজের মেয়েকেও তো দেখেছো সুধা, মিছে আর ওরকম তুলনা করো না। যাক সে কথা। নিজের স্বার্থের বেলায় পরের মেয়েকে আপন মেয়ে ভাবতে বেশ ভালই লাগে। বেশ, কেতকীকে তবে বলে দাও, আমার আপত্তি নেই। আমার আপত্তি করবার শক্তি নেই। উপায় নেই।

বলতে বলতে মাথা হেঁট করেন কমল বিশ্বাস। সুধাময়ী বলেন—দুঃখ করো না।

কমল বিশ্বাস বলেন—দুঃখ করছি না সুধা। আজ যদি কেউ সন্দেহ করে যে, এই ভাঙা বিশ্বাসবাড়ির ভিতরে সোনা আছে তবে সেটা ভুল সন্দেহ হবে না সুধা।

দক্ষিণ দরজার বাগানের ভিতর যে ছোট পুষ্করিণী একেবারে শুকিয়ে খটখটে হয়ে গিয়েছিল, সেই পুষ্করিণী আবার জলে ভরে গিয়েছে। এবছর আসল বর্ষা নেমেছিল ভাদ্রের শেষে। সেই ছোট ইঁটগাঁথা কুঠুরিটা যার ভিতরে বিশ্বাসবংশের অভিশাপের প্রতীক সেই নরবলির খড়্গ সমাধিস্থ হয়ে আছে, সে কুঠুরি আবার জলের আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। ঠাণ্ডা ঘোলাটে জল, সে জলের উপর ব্যাঙের দল অকারণে লাফালাফি করে।

অতীন এসেছে। চমকে উঠেছে সুধাময়ীর আশা, তবে কি সত্যিই এতদিন পরে মনে হয়েছে অতীনের, এই ভাঙা বাড়িতে সোনার মত মনের একটা মানুষ আছে? তাই তো মনে হয়। নইলে হঠাৎ এভাবে চলে আসবে কেন অতীন, এবং এসেই এত শান্তভাবে এই বাড়ির সারা দিনের যত সমাদর আর স্নেহ স্বীকাব করে নিয়ে ঘরের ভিতর বসে থাকবে? কমল বিশ্বাসের কঠোর অবিশ্বাসও অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। তাই তো? তবে কি এই ভাদ্রের জলে বিশ্বাসবাড়ির অভিশাপ গলে পচে মিলিয়ে গেল?

সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হয়েছে কেতকী। কমলবাবুর কাছে গিয়ে বারবার মনের আনন্দ চাপতে না পেরে ফিসফিস করেছেন সুধাময়ী, তাঁর মোমের মত সাদাটে চেহারা যেন আবার রক্তের ছোঁয়া পেয়ে একটু লালচে হয়ে উঠেছে।—কেমন? দেখলে তো, আমার কথা সত্যি হলো কিনা। ঠাকুর অত নিষ্ঠুর হতে পারেন না। যা আশা করেছিলাম, তাই হলো। তুমি

মিথ্যে সন্দেহ করে মিছিমিছি এতদিন নিজেকে মিথ্যে কষ্ট দিলে।

সাতদিনের ছুটির আবেদন করে স্কুলে চিঠি পাঠিয়েছে কেতকী। এবং সারাটা দিন কাজের মধ্যেই ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। সুধাময়ী লক্ষ্য করেছেন কেতকীর এই ব্যস্ততা যেন এক ব্রতিনী মেয়ের উল্লাস আর উৎসাহ, যার মানত সফল হয়েছে এতদিনে। অতীন এসে পৌঁছবার পর দশ মিনিটও পার হয়নি, চা-এর পেয়ালা ও খাবারের ডিস হাতে করে নিজেই অতীনের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কেতকী। এবং অতীনও নিঃশব্দে বসে চা-খাবার খেয়েছে।

অতীনের চোখের সামনে দিয়ে বার বার কতবার যাওয়া আসা করেছে কেতকী ; কেতকীর ঐ শান্ত আর হাসিমাখা মুখটাকে কতবার তাকিয়ে দেখেছে অতীন ; কিন্তু লক্ষ্য করেন সুধাময়ী ; কেউ কারও সঙ্গে একটা কথাও বলে না। বলবেই বা কি করে? দুজনের মাঝখানে যে মস্ত একটা অভিমান জমে রয়েছে। সে অভিমান হঠাৎ ভাঙবার নয়। ভাঙনের মুখে এসে পড়লে অভিমান জিনিসটা এই রকমেই গম্ভীর ও আরও কঠোর হয়ে ওঠে।

সুধাময়ীকে ব্যস্ত হতে হয়নি, কিছুই বলতে হয়নি, কেতকী তার নিজের ইচ্ছা মত রেঁধেছে। এবং দেখে খুশি হয়েছেন সুধাময়ী, রান্নাতেও এই মেয়ের হাতে এত গুণ ছিল। যেন মনের সব সাধ আর হাতের সব যত্ন ঢেলে দিয়ে রকমারি খাবার রান্না করেছে কেতকী। জীবনের এতদিনের একটা সার্থক অপেক্ষাকে, সবচেয়ে বড় আশাকে যেন অভ্যর্থনা করছে কেতকী।

বিকাল হতেই বাগানের চারিদিকে বেরিয়ে এসে কমলবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে প্রথম কথা বলে অতীন--কেতকী একটা কাজটাজ করছে বলে মনে হলো।

অপ্রসন্নভাবে শুকনো চোখ তুলে উত্তর দেন কমলবাবু—হ্যাঁ। কিন্তু...।

অতীন—কি?

কমলবাবু—তুমি খবরটা আগেই জানতে?

অতীন—না। একটা মেয়ে স্কুলের গাড়ি এল আর চলে গেল, তাই দেখে সন্দেহ হলো।

কমলবাবু—সন্দেহ!

আর কোন কথা না বলে চলে যায় অতীন। কমল বিশ্বাসের কোটরগত চোখ আবার জ্বলতে শুরু করে। বৃথা চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করেন কমলবাবু ; ঘুম আসে না। এবং সন্ধ্যা হতেই মস্ত বড় চাঁদের আলো যখন ঘরের জানালায় লুটিয়ে পড়ে, তখন সুধাময়ীকে ডাক দিয়ে কাছে এনে বলেন—আমার সন্দেহ হয় সুধা তুমি বৃথা আনন্দ করছো।

সুধাময়ী—কেন।

কমল বিশ্বাস—তোমার ছেলের গলায় মানুষের স্বর শোনা গেল না। মনে দরদ থাকলে কোন ছেলে ওরকম ক'রে বাপের সঙ্গে কথা বলে না।

সুধাময়ীও হতাশভাবে বলেন—যাই হোক, আমাদের ওপর কোন দরদ থাক বা না থাক, ওর মনে কেতকীর জন্য যদি দরদ দেখা দিয়ে থাকে, তবেই ঠাকুরের দয়া হয়েছে বুঝতে হবে।

কমল বিশ্বাসের গলার স্বরও সব সন্দেহ ঠেলে দিয়ে যেন প্রার্থনার সুরের মত কেঁপে ওঠে।—তাই হোক, ঠাকুর করুন, তাই যেন হয়।

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ভিতরের দিকে অনেক দূরের একটা দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে সুধাময়ীর চোখে আশার আলো আবার ঝিলিক দিয়ে ওঠে। সুধাময়ী বলেন—বেশ তো দু'জনে মুখোমুখি বসে গল্প করছে দেখছি।

কমলবাবু উৎফুল্লভাবে বলেন—করুক, করুক, তুমি আর ওদিকে যেও না সুধা।

ওদিকে ভিতরের বারান্দায় যেখানে প্রকাণ্ড একটা ফাটল-ধরা আয়না দেয়ালের গায়ে

হেলান দিয়ে পড়ে আছে, তারই কাছে একটা চেয়ারের উপর বসে আছে অতীন, আর অতীনের চোখের সামনেই একটা মোড়ার উপর বসে আছে কেতকী। দেয়ালের একটা খোপে একটা মোমবাতি জ্বলে, তারই ছায়া পড়েছে আয়নার বুকে, এবং দেখে ঠিক বোঝা যায় না, আয়নার বুক হাসছে না জ্বলছে?

কেতকীর চোখ দেখেও বোঝবার উপায় নেই, সে চোখ জ্বলছে না হাসছে। নামে স্বামী হয়েও জীবনে স্বামী হয়নি যে সুন্দর চেহারার মানুষটি, সে-ই আজ কেতকীর চোখের কাছে বসে আছে। হাল্কা বাতাসে কেঁপে কেঁপে দুলছে অতীনের মাথার ঢেউখেলানো চুলের এক একটা হাল্কা স্তবক। পাতলা আদ্দির জামা ফুঁড়ে অতীনের সেই চেহারার উচ্ছল স্বাস্থ্যের রক্তিমতা যেন আভা হয়ে ফুটে উঠেছে। কালো চোখ দু'টোও গভীর দীঘির কালো জলের ছবির মত টলমল করে। কেতকীর জীবনের সব ধরা-ছোঁয়ার বাইরে একটা ভিন্ন জগতের মানুষ হয়ে গিয়েছে যে, সেই মানুষকে চোখের কত কাছে দেখতে পাচ্ছে কেতকী। তবু বোঝা যায় না এবং কেতকী নিজেও বুঝতে পারে না, সত্যিই কি কেতকীর চোখ দু'টো মুগ্ধ হয়ে যাবার জন্য ছটফট করছে। কিসের জন্য, কেন ডেকেছে অতীন, অনুমান করতে পারেনি কেতকী। শুধু ডেকেছে অতীন, এবং ডাক শোনা মাত্র কাছে এসে বসেছে।

অতীনের অবশ্য বুঝতে একটুও দেরী হয়নি, কেন ডাক শোনা মাত্র মুহূর্তের মধ্যে কাছে এসে বসেছে কেতকী। আজ সারাদিন ধরে কেতকীর কাজের ব্যস্ততাও লক্ষ্য করেছে অতীন। স্কুল থেকে সাত দিনের ছুটি চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে কেতকী, একথাও জানতে পেরেছে অতীন। আশ্চর্য হয়েছে অতীন, এই মেয়ের মনের লোভ আর আশার রকম দেখে একটু চিন্তিত হতেও হয়েছে। এক বছরেরও বেশি হয়ে গিয়েছে, তবু এই বাড়িতে পড়ে আছে কেতকী, এবং নিশ্চয় আরও অনেককাল পড়ে থাকবার জন্য মতলব করেছে, তা না হলে একটা চাকরিই বা ধরবে কেন? যেন প্রাণপণে একটা লটারী খেলছে এই নারী, অতীনের মত মানুষকে ঘরের ভিতরে বন্ধ করবার আর ওর ঐ কালো কুৎসিত চেহারার একটা দুর্বার ক্ষুধা মিটিয়ে নেবার আশায়। বোধ হয় কল্পনাও করতে পারে না কেতকী, ঐ চেহারা দিয়ে অতীনের মত মানুষকে স্বামী করা যায় না। স্বামী কাকে বলে, তাই বোধ হয় জানে না এই নারী।

ভুল করেছে কেতকী। অতীনের মনের ভিতর কেতকীর জন্য একটা দুঃখের বোধও মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে ওঠে। রামকানাইবাবু যে কথা বলেছিলেন সেই মেনে নেওয়াই তো উচিত ছিল কেতকীর। যে বিয়ে বিয়ে নয়, সেই বিয়েকে ওর ঘৃণা করাই ভাল ছিল। ওর চলে যাওয়াই ভাল ছিল, এবং যার কাছে স্ত্রী হয়ে থাকবার সম্মান পাওয়ার আশা আছে, তেমন একজনকে স্বামী বলে স্বীকার করবার জন্য তৈরী হওয়া ওর কর্তব্য ছিল। যে মানুষের কাছে ওকে মানায়, সেই মানুষকে খুঁজে নেওয়া উচিত ছিল। মিছিমিছি নিজেকে এরকম অসম্মানের কাছে উৎসর্গ ক'রে ভালবাসতে পারে, এমন মানুষ পৃথিবীতে আছেও। তবে কেন...বৃথা একটা চক্রান্তের মত কাণ্ড ক'রে...না কেতকীর দোষ নয় বোধ হয়, এই বাড়ির চিরকেলে চক্রান্ত ঐ কমল বিশ্বাসের পরামর্শে পড়ে এই কাণ্ড করেছে কেতকী। আজও এখানে পড়ে আছে।

কেতকীকে মুক্তি দেবার জন্যই তৈরী হয়েছে। কিন্তু মুক্তি পেতে রাজি হবে কি কেতকী? লক্ষণ দেখে ভরসা পায়নি অতীন, তাই সারা দিন ধরে চিন্তা করতে হয়েছে, একটু উদ্বিগ্ন হতেও হয়েছে। রাগ ক'রে বললে কোন লাভ হবে না। বুঝিয়ে বলতে হবে। কিন্তু বুঝবে কি?

কেতকীর মুখের দিকে তাকায় অতীন, এবং দেখে ভয় পায়, কেতকী যেন একটা রাক্ষুসে প্রতিজ্ঞার মত লুব্ধ হয়ে অতীনেরই মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে।

অতীন বলে—আমার জীবনে মিছিমিছি একটা সমস্যা সৃষ্টি ক'রে রাখা তোমার উচিত নয়, একথা তোমার স্বীকার করা উচিত।

কেতকী—হ্যাঁ।

অতীন—তাহ'লে আমাকে মুক্তি দাও, আর নিজেও মুক্তি নাও।

কেতকী—কি করতে হবে বল।

কেতকীর হাতের কাছে টাইপ-করা কাগজ এগিয়ে দিয়ে অতীন বলে—এটা সই ক'রে দাও।

কেতকী—কি এটা?

অতীন—পড়ে দেখ।

কাগজের টাইপ-করা লেখাগুলি পড়ে কেতকী। পড়তে পড়তে কেতকীর বড় বড় চোখের তারা দু'টোও যেন ঝিকমিক ক'রে হাসতে থাকে। পড়া শেষ করেই হাত বাড়িয়ে অতীনের হাত থেকে কলমটা তুলে নিয়ে সই ক'রে দেয়। কাগজটাকে অতীনের হাতের কাছে এগিয়ে দিয়েই উঠে দাঁড়ায়। তার পরেই আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যায়।

কেতকীর ঐ চলে যাবার ভঙ্গীটারই দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে অতীন। একটুও ছটফট না ক'রে, একেবারে শান্ত ও নির্বিকার একটা মূর্তি হেঁটে হেঁটে ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে। অতীনের সারা দিনের দুশ্চিন্তা ভয় উদ্বেগ আর সন্দেহের বোঝাটাই হঠাৎ যেন একটা ঠাট্টার আঘাতে দুলে ওঠে। লোকেরা মুদির দোকানের একটা ভাউচারেও এত সহজে, এত প্রশান্ত চিত্তে, এত তুচ্ছতার সঙ্গে সই দেয় না। কিন্তু কেতকী নামে ঐ মেয়ে, ঐ বিদঘুটে চেহারার ঐ নারী, বিয়ের বিচ্ছেদ দাবি করবার এই দরখাস্তে যেন হেসে হেসে সই ক'রে দিয়েই চলে গেল। যাক্, মুক্তি পেয়েছে অতীন বিশ্বাস, কাজরী চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ে হবার পথে যে একটি মাত্র বাধা ছিল, সে বাধা সরে গেল।

আর একটা কাজ মাত্র বাকি আছে, সেটা সারা হয়ে গেলেই এই বাধা অতীনের জীবনের দুয়ার থেকে আইনমত সরে যাবে। কেতকীর নিজের হাতে সই করা এই দরখাস্ত রামকানাইবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। এই দরখাস্ত হাতে পেয়ে খুবই খুশি হবেন রামকানাইবাবু ; তিনিও যে ঠিক এইরকমই একটি চেষ্টা করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে রয়েছেন, আদরের ভাগ্নীকে একটা বাজে বিয়ের বন্ধন থেকে উদ্ধার করতে চান। আদালতে গিয়ে এই দরখাস্তের একটা গতি ক'রে ফেলতে একটুও দেরি করবেন না রামকানাইবাবু।

ছাদের উপর সেই ছোট ভাঙা ঘরের ভিতরে বিছানার উপর ধড়ফড় ক'রে উঠে বসে অতীন। ঘুম ভাঙতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছে। সকাল বেলার রোদ ছাদের উপর ছড়িয়ে পড়েছে, আর সারা ছাদ জুড়ে যত জংলা পাখির কিচির-মিচির মত্ত হয়ে উঠেছে। ভোর হলেই চলে যেতে হবে, এই সংকল্প নিয়ে শুয়ে পড়লেও ঘুমের ঘোরটা সংকল্পের ধার ধারেনি। বোধ হয় মনটা বড় বেশি নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল এবং কাজরী চৌধুরীর অনুরোধের কথাগুলি স্বপ্নের মধ্যে বড় বেশি মিষ্টি হয়ে বাজছিল, তাই ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গিয়েছিল।

বাগানের পথের উপর দিয়ে একটা মোটর গাড়ি চলে গেল মনে হয়। টেনে টেনে হর্ন বাজিয়ে চলে গেল গাড়িটা। অতীন বিশ্বাসের নিশ্চিন্ত মনটাই আবার নীরবে চমকে উঠে প্রশ্ন করে, তবে কি রামকানাইবাবুর গাড়ি এসেছিল? চলে গেল কেতকী?

নীচে নেমে একটা কলরব শুনেই বুঝতে পারে অতীন, না রামকানাইবাবুর গাড়ি নয়, বোধহয় একটা ট্যাক্সি এসেছিল। বাসনার গলার স্বর শোনা যায়। মা'র সঙ্গে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছে বাসনা।

ঘটনাটা সুবিধের নয়। বাসনা এসেছে। চক্ষুলজ্জার খাতিরে অন্তত আরও একটা দিন এই

বাড়িতে থাকতেই হবে। অথচ, কেতকীর কাছ থেকে রামকানাইবাবুর কাছে একটা খবর নিশ্চয়ই এরই মধ্যে চলে গিয়েছে। হয়তো আর দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই রামকানাইবাবু উপস্থিত হবেন। এবং চুপ ক'রে ঘরের ভিতর বসে কেতকীর অন্তর্ধানের ঘটনাটা সহ্য করতে হবে। ভুল হলো, অতীনের মত মানুষকে তুচ্ছ ক'রে এবং অতীনের চোখের সামনেই বড়লোক মামার হাত ধরে গটমট ক'রে পরম অবহেলার আবেগে চলে যাবার একটা সুযোগ পেয়ে গেল কেতকী। ভোর হতেই অতীন চলে যেতে পারলে, এরকম দম্ভের একটা দাপট দেখাবার সুযোগ পেত না কেতকী।

কিন্তু কেতকীর ইচ্ছেটাকে বুঝতে কি ভয়ানক ভুলই না করেছিল অতীন? কেতকী চলে যাবার জন্য মনে মনে আগেই তৈরী হয়েছিল নিশ্চয়, তাই তো এত সহজে ঐ দরখাস্তে একটা সই ছুঁড়ে দিয়েছে। লুব্ধ হয়নি কেতকী, মুগ্ধ হবার জন্যও কোন আশা নিয়ে অতীনের মুখের দিকে তাকায়নি। শুধু বোধহয় একটা সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল, এবং সে সুযোগ পাওয়া মাত্র অতীনের ভুয়ো স্বামিত্বকে অনায়াসে বাতিল ক'রে দিয়ে খুশি হয়েছে, এই মুক্তিকে যেন হাত বাড়িয়ে লুফে নিয়েছে।

কে জানে, কেতকীর মত একটা মানুষের মনে কিসের এত অহংকার! এই অহংকারের আড়ালে বোধহয় কোন রহস্য আছে। নইলে ঐ দরখাস্তের দিকে তাকিয়ে ওর চোখের চাহনিতে একটা ক্ষুদ্র বিস্ময়ের, একটা অতি ছোট আর্ত আক্ষেপের শিহরও কেঁপে উঠলো না কেন?

যাই হোক, কোন ক্ষতি নেই, লাভই হোল, বিনা ঝঞ্ঝাটে মীমাংসা হয়ে গেল। শুধু অনায়াসে তুচ্ছতা দেখবার একটা সুযোগ পেয়ে গেল কেতকী, এইমাত্র। কিন্তু প্রতিবাদ করবার কোন অর্থ হয় না। ঐ অহংকারকে জব্দ করবার কোন উপায় নাই। তাই বোধহয় অস্বস্তি হয়। অতীন বিশ্বাসের নিশ্চিন্ত প্রসন্ন ও হালকা মনের গায়ে একটা অসহায় নিঃশ্বাসের রাগ যেন কাঁটার মত বিঁধছে।

কেতকীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না, এবং কাঁচা নিঃসম্পর্কতাই এইবার একেবারে পাকা হয়ে গেল ; অতীনের কাছে কেতকী আজ অচেনা কোন নারীর চেয়ে কম পর নয়। কিন্তু কেতকীর একটা খুঁটিনাটি নিয়ে এত ছাইভস্ম চিন্তা করবারও কোন দরকার হয় না।

সুধাময়ীর ডাক শোনা যায়—বাসনা এসেছে অতু। তুই কোথায় আছিস, এদিকে একবার আয় বাবা।

এগিয়ে যায় অতীন, এবং কমলবাবুর ঘরের দরজার কাছে এসেই দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়, ঘরের ভিতরে কেতকীও দাঁড়িয়ে আছে। স্নান সারা হয়ে গিয়েছে কেতকীর, তাই চুলের ছোঁয়া লেগে মাথায় কাপড়টা স্যাঁতসেঁতে হয়ে সেঁটে আছে। বেশ ঝকঝকে মাজা-ঘষা মুখটা, সিঁদুরের দাগটাও টাটকা। সাজের রকমটাও অদ্ভুত। যেন ষোল বছর বয়সের স্কুলের ছাত্রীটি, একটা রঙীন শান্তিপুরী ডুরে শক্ত ক'রে গায়ে জড়িয়েছে কেতকী ; বোধহয় একটুও সন্দেহও করতে পারে না যে, ওরকম ক'রে শাড়ি পরলে ওর প্রচণ্ড স্বাস্থ্যের শোভাটা বেহায়া হয়ে ধরা পড়ে যায়।

—কখন এলি বাসু? প্রশ্ন ক'রেই চুপ হয়ে যায় অতীন।

—এই তো দশ মিনিটও হয়নি। আর ক'মিনিট থাকতে পারবো জানি না।

—কেন? প্রশ্ন করেন কমলবাবু।

বাসনা বলে—ওর ইচ্ছে। আমি কি আর করতে পারি বল? যখন গাড়ি পাঠাবে তখনই চলে যেতে হবে।

সুধাময়ী করুণ চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন—অজিত এখানে না এসে বন্ধুর বাড়িতে উঠলো, এটা কি ভাল হলো বাসনা?

বাসনার গলার স্বর হঠাৎ বিরক্ত হয়ে কলকল ক'রে ওঠে।--নিন্দে করতে হয় আমাকে নিন্দে কর। ওর নিন্দে করা অন্তত তোমাদের সাজে না। আমিই ওকে এখানে আসতে দিইনি।

সুধাময়ী আশ্চর্য হন--তুই কি বলছিস রে বাসু? তোর মুখেও কি এসব কথা খুব ভাল সাজছে?

বাসনা--তোমাদের ভালর জন্যে, তোমাদের সম্মান বাঁচাবার জন্যে ওকে এখানে আসতে দিইনি। বাড়ির এই চেহারা, আর ঘরের ভিতরের এই ছিরি দেখ'লে মানুষটা কি ভাবতে পারে, সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন?

কমলবাবু বলেন--ঠিক বলেছিস মা, এর পর আমাদের আর কোন কথা বলা সাজে না। কোটরগত চক্ষুর একটা উদাস দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে আনমনার মত চুপ ক'রে বসে রইলেন কমলবাবু।

একবার কেতকীর দিকে তাকিয়ে, আর একবার সুধাময়ীর দিকে তাকিয়ে বাসনা বলে--চিঠিতে একটা কথা লিখিনি, তোমরা দুঃখ পাবে বলে। তোমাদের অন্যায়ের জন্য আমাকে বড় গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে মা। এলাহাবাদের বাড়ির সবাই, এমন কি ঝি পর্যন্ত আমাকে কথা শোনাতে ছাড়েনি।

সুধাময়ী--অপরাধ?

বাসনা--গয়নাগুলি একেবারে বাজে। সব খুলে রাখতে হয়েছে। শ্বশুর নিজে মার্কেটে গিয়ে পছন্দ করে এক সেট নতুন গয়না এনে দিলেন। বউ-ভাতের দিন তাই পরতে হলো।

সুধাময়ী তাকিয়ে দেখেন, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে বাসনা, কেতকীর গা থেকে খুলে যে-সব জিনিস দিয়ে বাসুকে সাজানো হয়েছিল, সে-সব জিনিস নয়। বাসুর গায়ে সবই নতুন জিনিস ঝলমল করছে।

বাসনা বলে--কিছু মনে করো না বউদি, তোমার দোষও ধরছি না। তোমার মামা ভদ্রলোক কিন্তু একটু ঠকিয়েছেন। ওরকম পলকা জিনিস আজকাল কোন ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়েতে কেউ দেয় বলে শুনিনি।

কমলবাবু বলেন--তোমরা অন্য ঘরে গিয়ে কথা বল সুধা।

সুধাময়ী অন্য ঘরে চলে যান, অতীন আর এক ঘরে। আর, বাসনা তার মনের সেই কলকল খুশির আবেগে কেতকীর হাত ধরে টানতে টানতে আর এক ঘরের ভিতর গিয়ে বসে।--তারপর? কি রকম ব্যাপার-ট্যাপার চলছে মিসেস বিশ্বাস?

কেতকী--চলছে, চলে যাচ্ছে।

বাসনা--চলছে তো আমারও। স্বামী-জ্ঞান স্বামী-ধ্যান ক'রে দিন চালিয়ে যাচ্ছি। এই পনের মাসের মধ্যে এই প্রথম একটু ছাড়া পেলাম, তা'ও আবার ক'মিনিটের জন্য কে জানে?

কেতকী--তোমরা কলকাতায় কবে এসেছে?

বাসনা--কাল বিকালে। ওর বন্ধু অশ্বিনীবাবুর বাড়িতে উঠেছি। চেন নাকি অশ্বিনীবাবুকে?

কেতকী--না।

বাসনা--ওঃ, মস্ত বড়লোক। ঝরিয়াতে তিন তিনটে কলিয়ারী আছে।

চা তৈরী করে কেতকী। বাসনা ছটফট ক'রে আপত্তি করে--চা আর রুচবে না বৌদি, ও হাঙ্গামা ছেড়ে দাও। এলাহাবাদে ওরা সবাই কফি খায়, আমারও কফির অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

কেতকী হাসে--তুমি না খাও, এ বাড়িতে চা খাবার অন্য লোক আছে।

বাসনা চোখ বড় ক'রে তাকায়--ও, তোমারও দেখছি আমার মত স্বামী-জ্ঞান স্বামী-ধ্যান।

চুপ ক'রে থাকে কেতকী। কিন্তু বাসনার কথার স্রোত বন্ধ হয় না। এদিকে-ওদিকে

তাকিয়ে, বেশ সাবধান হয়ে, এবং বেশ একটু লজ্জিত হয়ে চাপা-গলায় বলতে থাকে বাসনা।—বাস্তবিক, অনেক পুণ্যি করলে তবে মনের মত স্বামী পাওয়া যায়।

কেতকী হাসে—পুণ্যি?

বাসনা—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

কেতকী—কি-রকমের পুণ্যি?

বাসনা—কুমারী মেয়ের জীবনে যেটা সব চেয়ে বড় পুণ্যি।

কেতকী—সেটা কি?

বাসনা—ভুলেও পরপুরুষের চিন্তাকে মনে ঠাঁই না দেওয়া। আমি ভেবে পাই না বউদি, কোন সাহসে কোন মেয়ে বিয়ের আগে প্রেম করে। ধর, যদি তার সঙ্গে বিয়ে না হয়ে অন্য কারও সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়, তবে? তবে সেটা কি স্বামী বেচারাকে ঠকানো হয় না? তাতে কি পাপ না হয়ে পারে?

বোধ হয় কেতকীর মনটাও ভুল ক'রে একটু অসাবধান হয়ে গিয়েছিল, কোন কথা বলবে বলে তৈরী ছিল না, তবু একটা প্রশ্ন আচমকা মুখ থেকে যেন ছুটে বের হয়ে গেল—মনের মত স্বামী কা'কে বলে?

বাসনা হাসে—আহা, যেন গাঁয়ের মেয়েটি, কিছুই বোঝে না।

কেতকী গম্ভীর হয়—বুঝতে চাই, কিন্তু বুঝতে পারি না।

খিলখিল ক'রে হেসে বাসনা তার সুন্দর গহনা-ঝলমল চেহারাটাকে দোলাতে থাকে—তাহ'লে একেবারে স্পষ্ট করেই বলে দিচ্ছি বউদি। আমার স্বামীর মত স্বামীকে মনের মত স্বামী বলে।

গাড়ির হর্ণ বাজে বাগানের পথে।

চলি বউদি। উতলা হয়ে ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয়ে যায় বাসনা। ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রে কমলবাবু আর সুধাময়ীকে প্রণাম ক'রে নিয়েই গাড়ির দিকে চলে যায়।

আর, চা-এর পেয়ালা হাতে নিয়ে অতীনকে খুঁজতে থাকে কেতকী।

সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে। চলে যাবার অনেক সময় পেয়েছে, তবুও যায়নি। তাড়াহুড়ো ক'রে চলে যাবার কোন দরকার হয় না, কারণ কেতকী নামে ঐ নারীকে ভয় পাবার কোন হেতুও নেই। অতীনের মনের সেই আহত অহংকারের জ্বালাও শান্ত হয়ে গিয়েছে। অতীনের চোখের উপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে হেসে হেসে এই বাড়ির ছায়ার সীমানা পার হয়ে অন্তর্হিত হয়ে যায়নি কেতকী। রামকানাইবাবু আসেননি, রামকানাইবাবুর গাড়িও আসেনি। বরং কেতকী নিজেই এসে চা-এর সময়ে চা দিয়ে গিয়েছে। খাবার সময়ে বারান্দার টেবিলে পাঁচ রকম রান্না থালায় সাজিয়ে রেখেছে। সুধাময়ী ডাক দিয়ে বলেছেন—খেতে যা অতু।

ব্যাপারটা একটা মজার ব্যাপার সন্দেহ নেই এবং অতীনের খারাপ লাগে না। অতীনের মনের সেই বিমর্ষ অহংকারটা আবার মাথা উঁচু ক'রে কেতকীর দিকে তাকিয়ে হেসেছে। বন্ধনহীন গ্রন্থি নয়, এ যে একেবারে গ্রন্থিহীন বন্ধনের ব্যাপার। এই রকমের একটা সম্পর্কের কাছেও দাসী হয়ে থাকতে পারে কোন মেয়েমানুষের প্রাণ? কি আশ্চর্য!

গল্পে শোনা যায়, কোন এক সতী নারী নাকি কুষ্ঠ রোগে অথর্ব স্বামীকে কাঁধে ক'রে স্বামীর প্রিয় এক পতিতার কাছে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। কেতকীর মুখের চেহারা দেখে তাকে তো এত মাটির মানুষ বলে মনে হয় না। কিন্তু ওর কাণ্ড দেখে সন্দেহ করতে হয়, যেন বিয়ের মন্ত্রটাকেই স্বামী বলে ধারণা ক'রে বসে আছে কেতকীর মত বি.এ. পড়া আধুনিকা। স্বামী নামে মানুষটাকে পাওয়া যাক বা না যাক, সেই মন্ত্রটা তো আছে, এবং বোধহয় তারই শাসন বরণ ক'রে নিয়ে সুখী হয়ে আছে কেতকীর অন্তরাত্মা। মন্ত্র পড়ে একবার যার হাত ধরা যায়, তাকেই চিরটাকাল স্বামী বলে স্বীকার করে যারা, কেতকী

বোধহয় তাদেরই মত একজন নিরেট সতী আর সাধ্বী।

নারকেল পাতার ঝালরে পড়ে চাঁদের আলো ঝিলমিল করে। অতীনেরও বুকের ভিতরে যেন একটা উল্লাস ঝিলমিল করে। কেতকী ইচ্ছে করেই এরকম একটা জীবন নিয়ে সুখী হতে চায়, অতীনের আপত্তি করবার কোন অর্থ হয় না। অতীনের জীবনের সুখের পথে কেতকী কোন বাধা নয়। কেতকী এখানে থাকলেও নয়, এখানে না থাকলেও নয়।

ঘর থেকে বের হয়ে বাগানের চারদিকে ঘুরে বেড়াতেও ভাল লাগে। বড় পুকুরের পশ্চিমে বেল আর বাতাবী নেবুর বাগানটা একেবারে জঙ্গল হয়ে গিয়েছে, তারই মধ্যে জীর্ণ ইঁটের গোটা চারেক থাম দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেবেলায় বাবার মুখেই গল্প শুনেছিল অতীন, এই বাগানটার নাম ক্ষেপী বউ-এর বাগান। এই বিশ্বাস বংশেরই চার পুরুষের আগের আনন্দ বিশ্বাস নামে এক ধর্মবাতিক মানুষ তীর্থ করতে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী সে-কথা বিশ্বাসই করেননি। ঐ জঙ্গলের ঐখানে, যেখানে ভাঙা থামগুলি আজ দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে থাকতেন আনন্দ বিশ্বাসের স্ত্রী। সর্বক্ষণ হাসতেন, মাছ খেতেন, পান খেতেন, আলতা পরতেন ; বিধবা হয়েও সারা জীবন সধবার মত সেজে রইলেন সেই ক্ষেপী বউ। মরবার পর তাঁকে নাকি লালপেড়ে শাড়ি আর সিঁদুর আলতায় সাজিয়ে চিতেয় চড়ানো হয়েছিল।

অতীন বিশ্বাসের ভাবনার মধ্যে ক্ষেপী বউ-এর হাসিটাই যেন ফিসফিস সিরসির করে। কেতকীও প্রায় এই রকমেরই একটা কাণ্ড করছে। করুক, সত্যিই তো ক্ষেপী নয় আর সেকেলে গেঁয়ো খুকী নয় কেতকী। ওকে বোঝাবার কোন দরকার হয় না।

রাতের খাবার খাওয়ার সময়েও কেতকীর চোখের দিকে তাকিয়ে খুশি হয়েছে অতীন। বেশ তো শান্ত দুটি চোখ, বেশ তো নিজের খুশির আবেগে ঝিকমিক করছে। সাজটাও সুন্দর। কে জানে, বোধ হয় শাশুড়ির নির্দেশ, তাই নতুন বউটির মত বাহারে সাজে সেজেছে কেতকী। একটা রঙীন বিষ্ণুপুরীকে বেশ কায়দা ক'রে লতানো ভঙ্গীতে গায়ে জড়িয়েছে। শাড়ির জমিটার রং হাল্‌কা নীল। তার উপর খয়েরী রং-এর বুটি, আঁচলাটাতে সারি সারি সোনালী জরির হংসমিথুন। মুখে স্নো মেখেছে কিনা বোঝা যায় না, কিন্তু কালো মুখেরই উপর যেন ভোরের মেঘলা আকাশের মত একটা ঢলঢল বিহ্বলতা থমকে রয়েছে।

একবার নয়, কয়েবার ইচ্ছে করেই চোখ তুলে তাকিয়েছে অতীন। কি দেখে এত আশ্চর্য লাগছে, এবং অতীনের চোখের আশাটাই বা বারবার কেতকীর চেহারার দিকে তাকিয়ে কি খুঁজছে, জানে না অতীন। বোধ হয় জানবার চেষ্টাও করে না।

হঠাৎ আনমনার মত চমকে উঠে চোখ ফিরিয়ে নেয় অতীন। সিগারেট ধরায়, আস্তে আস্তে হেঁটে ছাদে যাবার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

ঝিঁঝির ডাকে কান-ঝালাপালা হয়, এমনই একটি রাত। বিছানার উপর কেতকীর ঘুমন্ত দেহটা ধড়ফড় ক'রে উঠে বসে। রাত হয়েছে অনেক, বাতি নেভানো হয়নি, এমন কি খোঁপার চিরুনিটাও খুলে রাখতে ভুলে গিয়েছে কেতকী। চিরুনির কাঁটাগুলি ঘুমন্ত মাথাটাকে বিঁধছে, জ্বলছে মাথাটা।

ঝিঁঝির ডাকে কান ঝালাপালা শব্দের উপর যেন একটা বেসুরো শব্দ হঠাৎ ঠকঠক ক'রে বেজে ওঠে। চমকে ওঠে কেতকী। ঘরের দরজারই উপর বাজছে একটা আঘাতের শব্দ। তারপরেই মানুষের গলার শব্দ বেজে ওঠে—কেতকী।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে, শুধু কয়েকটি মুহূর্ত কি যেন ভাবে কেতকী। তার পরেই দরজা খুলে দেয়।

ঘরের ভিতরে ঢুকেই অতীন বলে—আমার ধারণা ছিল, তুমি এখনও ঘুমিয়ে পড়নি।

কেতকীর উত্তর শোনবার অপেক্ষা না ক'রে অতীন আবার বলে—আমার আরও একটা ধারণা ছিল, তুমি নিজেই ছাদের ঘরে একবার যাবে।

যেন স্বপ্নের ঘোরে কথা বলছে অতীন। অতীনের কথার অর্থ বুঝতে না পেরে অপ্রস্তুতের মত তাকিয়ে থাকে কেতকী।

অতীনের কথার মধ্যে কিছু সত্য আছে। স্বপ্নের ঘোরে না হোক, নিজেরই চিন্তার একটা স্বপ্নময় আবেশের মধ্যে কেতকীর জন্য অদ্ভুত একটা মায়া হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ছাদের ঘরে বসে, ঝিঁঝি পোকার উল্লাসে অভিভূত এই মাঝ রাতের প্রহরে মনে পড়েছে কেতকীর কথা, অতীনের চোখের কাছে এসে দাঁড়াবার জন্য আকুল হয়ে আছে যে নারীর প্রাণ। রঙীন বিষ্ণুপুরীর লতানো বাঁধনে বাঁধা যে অজস্র কোমলতা আর নিবিড়তার ছবি আজ নিজের চোখে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়েছে অতীন, সে তো কেতকী নামে এক নারীরই দেহের ছবি। সে ছবি যে অতীনের ইচ্ছার কাছে উৎসর্গ হবার জন্য স্বপ্ন দেখছে। অতীনের বুকের ভিতরটা মাতাল হয়ে উঠেছে। কেতকীর আশা মিটিয়ে না দিলে অপরাধ হবে।

অতীন বলে—কথা বলছো না কেন কেতকী?

কেতকী—তুমি তো কোন কথা জিজ্ঞাসা করনি।

অতীনের আবিষ্ট চোখে হঠাৎ একটা রূঢ় বিস্ময়ের চমক কেঁপে ওঠে।—কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্যে তো আমি আসিনি। আমি তোমার কাছেই এসেছি।

কেতকীর চোখ ঝিক ক'রে জ্বলে ওঠে—তার মানে?

অতীন—আমি আজ রাতে এই ঘরেই থাকবো।

কেতকী—কেন?

অতীন—তোমার মনে আমি এই অভিযোগ রাখতে চাই না যে, তোমাকে আমি তুচ্ছ করেছি। তুমি যা আশা কর, আমি তাই...।

কেতকী—না, কখ্‌খনো না। আমি তোমার কাছে কিছুই আশা করি না।

অতীন—মিথ্যে কথা বলো না কেতকী।

কেতকী—একটুও মিথ্যে কথা নয়।

ভ্রূকুটি করে অতীন—তবে কিসের আশায় সেবাদাসীর মত এখানে পড়ে আছ, আর আমাকেই বা পতিব্রতা পত্নীটির মত রকমারি রান্না খাইয়ে সেবা করছো?

কেতকী—সে প্রশ্ন করবার অধিকার তোমার নেই।

অতীন—আছে। এখনও আদালতের রায় বের হয়নি ; আইন বলবে, আমি তোমার স্বামী।

কেতকী—বললেই তুমি আমার স্বামী হয়ে যাবে না।

অতীন—মন্ত্রে বলে, আমিই তোমার স্বামী।

কেতকী—বলুক, তবু তুমি আমার স্বামী নও।

অতীন—তাহলে স্বামী কাকে বলে?

কেতকী—জানি না, যদি বুঝতে পারি কোনদিন, তবে বুঝিয়ে দেব।

অতীন বিশ্বাসের চোখে থরথর ক'রে আহত দর্পের রাগ কাঁপে ; অতীনের এই সুন্দর চেহারার বুকের ভিতর যে প্রচণ্ড পৌরুষের গর্ব মাতাল হয়ে রয়েছে, যে গর্বকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে সুখী হয় কাজরী চৌধুরীর মত নারী, সেই গর্বকে যেন ছিন্নভিন্ন ক'রে ধুলোয় লুটিয়ে দিচ্ছে কেতকী নামে এই কুরূপিনী। অতীন বিশ্বাসকেই মিথ্যা ক'রে দিচ্ছে কেতকীর কুৎসিত দর্প। এই পরাজয় যে অতীন বিশ্বাসের জীবনের সব চেয়ে বড় আনন্দ ধ্বংস ক'রে দেবে। কেতকীর এই ভয়ানক অহংকেরে অবাধ্যতাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে, ঐ কালো চেহারার রক্তমাংসের স্বাদ লুট ক'রে নিতে না পারলে অতীন বিশ্বাসের প্রতি ধমনীর অপমানিত শোণিতকণা অলস ও অচল হয়ে যাবে। অতীনের নিঃশ্বাসে আগুন, চোখে আগুন। ভৈরব বিশ্বাসের অদৃশ্য প্রেতাত্মা অতীন বিশ্বাসের হাতে বোধ হয় সেই নরবলির খড়্গ ধরিয়ে দিয়েছে।

হাত দুটো বিচিত্র এক হিংস্রতার আবেগে দুলে ওঠে। হঠাৎ দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় অতীন বিশ্বাস।

কেতকীর গলার স্বরও দুঃসহ ঘৃণার জ্বালায় জ্বলে ওঠে--দরজা খুলে দাও। সরে দাঁড়াও।

অতীন--কেন? কোথায় যাবে?

কেতকী--অন্য ঘরে।

অতীন--না।

কেতকী প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে--তাহলে এখনি চিৎকার ক'রে বাবা আর মাকে ডাকবো।

অতীন--তোমার ডাক শুনে এখন যদি কেউ এখানে আসে, তবে সে এই মুহূর্তে খুন হয়ে যাবে, বিশ্বাস কর কেতকী।

অতীনের চোখের দিকে তাকিয়েই শিউরে ওঠে কেতকী, তারপরেই আঁচল দিয়ে চোখ ঢেকে একেবারে নীরব হয়ে যায়।

এভাবে চলেই গেল যদি, তবে এসেছিল কেন? ভোর হবার অনেক পরে, খোঁড়া বৈরাগীটা উষাকীর্তন গেয়ে রসিকপুরের নতুন পাড়ার দিকে চলে যাবার অনেক পরে ভাদুরে রোদ যখন তেতে ওঠে, তখনও এই বাড়ির কোথাও অতীনের সাড়া শুনতে না পেয়ে হঠাৎ ভয়ে চমকে ওঠেন সুধাময়ী, আর বার বার মনের এই প্রশ্নটাকেই সহ্য করবার চেষ্টা করেন।

কেতকীও কিছু বলতে পারলো না, কখন চলে গিয়েছে অতীন। এবং দেখে আরও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন সুধাময়ী, কেতকী তার সেই চিরকেলে শান্ত মূর্তিটি যে ঘরের ভিতরে মাদুরের উপর বসে এক মনে স্কুলের খাতা দেখছে।

কেতকীর চোখে-মুখে এক বিন্দু দুঃখের চিহ্ন নেই ; এটাই বা কি কম আশ্চর্যের কথা? ঘুরে ফিরে নিজেরই অবুঝ সন্দেহ আর বেদনার জ্বালায় ছটফট ক'রে বার বার কমলবাবুর কাছে এসে ঐ প্রশ্ন করেন সুধাময়ী--এভাবে চলেই গেল যদি, তবে এসেছিল কেন?

কমলবাবুর কোটরগত চোখ যেন ধিকিধিকি ক'রে জ্বলে--আশ্চর্য হবার কিছু নেই সুধা। তোমার ছেলে চোরের মত একটা লোভ নিয়ে এসেছিল, আর ঠকে গিয়ে চোরের মতই রাগ ক'রে চলে গিয়েছে। ভালোই হয়েছে।

কমলবাবুর কথাগুলিকে হেঁয়ালির মত মনে হয়, তবু সেই হেঁয়ালির একটা ভয়ানক অর্থ আছে যেন। কি যেন অনুমান করেন সুধাময়ী, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রোগা শরীরটা থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে। আধ-মরা মানুষের মত চোখ ক'রে কমলবাবুর রুক্ষ মূর্তির দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন সুধাময়ী--কি ছাই বলছো, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

কমলবাবু--বুঝে কাজ নেই, বুঝলে মরতে ইচ্ছে করবে।

সুধাময়ীর আধমরা চোখ যেন এইবার একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাবে। কমলবাবুর চোখের নিষ্ঠুর চাহনিটা তবুও কঠোর হয়ে থাকে। বিড়বিড় ক'রে বলতে থাকেন কমলবাবু--কেন? কেতকীর বুঝি সম্মান বলে কিছু থাকতে নেই? কেতকীর কোন জেদ থাকতে পারে না? মনে করেছ, তোমার ছেলেকে ঘেন্না করবার অধিকার কেতকীর নেই? ঠিক করেছে, বেশ করেছে কেতকী। না করলে আমিই কেতকীকে অমানুষ মনে করতাম।

মরণময় আগুনের জ্বালা গায়ে লাগলে আধমরা মানুষও মরিয়া হয়ে বাঁচবার জন্য লাফিয়ে ওঠে। সুধাময়ী সেই রকমই একটা কাণ্ড করলেন। ছটফট ক'রে উঠে বসলেন। মরতে ইচ্ছে হয় না, বাঁচতেই চান তিনি। তাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। তাঁর এত সাধের আশার ফুল পুড়ে গিয়েছে, বিশ্বাস হয় না। কেতকী সে মেয়ে নয়, অতীনকে ঘেন্না করবার মত মেয়ে নয় কেতকী। শত হোক অতীন যে কেতকীর স্বামী, এই সত্য অস্বীকার করতে পারে না ঐ মেয়ে, যে-মেয়ে এই বাড়ির মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছে।

ঘর থেকে টলতে টলতে বের হয়ে আসেন সুধাময়ী। চিৎকার ক'রে ডাকতে থাকেন—কেতকী! বউ-মা! কেতকী!

স্কুলের খাতা ফেলে রেখে ব্যস্তভাবে কেতকীও ছুটে আসে। কেতকীর একটা হাত আঁকড়ে ধরে কেতকীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন সুধাময়ী। বড় অলস শিথিল আর করুণ দৃষ্টি। সুধাময়ী যেন নিঝুম হয়ে একটা স্বপ্নের আশ্বাস খুঁজছেন।

যেমন রোজই সকালে স্নান সেরে নেয় কেতকী, তেমনই আজও সকালে স্নান সেরেছে। কেতকীর কালো মুখে এই ধোয়ামোছা শুচিতার আভাটুকু নতুন জিনিস নয়। ঢাকাই তাঁতের যে শাড়িটা গায়ে জড়িয়েছে, সেটাও কোন নতুন সাজ নয়। হাতে দু'গাছি চুড়ি আছে, কানেও দুল দোলে। ঘরের ভিতরেও কেতকীর পায়ে এক জোড়া লাল বনাতের চটি লেগে থাকে। আজও আছে। কোন পরিবর্তন নেই। এই কেতকী ঠিক সেই কেতকী। মনের সব আশা আর স্নেহ ঢেলে দেখতে থাকেন সুধাময়ী, না, কেতকীকে ভয়ানক ভুল সন্দেহ করেছেন কেতকীর ঐ রাগী শ্বশুর।

কিন্তু পর মুহূর্তেই সুধাময়ীর বুক ভেদ ক'রে একটা আর্তস্বর ঠিকরে বের হয়।—একি কাণ্ড করেছ কেতকী? তোমার সিঁথিটা এত সাদা কেন? সিঁদুর নেই কেন?

সত্যিই একটা কণিকাও নেই কেতকীর সেই শূন্য সিঁথির রেখার উপর। থাকবে কেমন ক'রে? কেতকী নিজেই যে আজ তার কঠোর হাতের পীড়নে তেল দিয়ে ঘষে ঘষে আর সাবান দিয়ে রগড়ে রঙিন সিঁথিটাকে একেবারে সাদা ক'রে দিয়েছে।

—ক্ষেপী বউও এমন করেনি কেতকী। সত্যি বিধবা হয়েও সধবা হয়ে থাকবার সাধ ছাড়তে পারেনি। কিন্তু তুমি এ কি করলে? সত্যি সধবা হয়েও বিধবা হয়ে থাকবার সাধ ধরলে? ছি ছি!

কেতকীর চোখের কোণে জলের ফোঁটা দুলতে থাকে। আস্তে আস্তে বলে—মাপ করবেন মা।

—না। সেই মুহূর্তে কেতকীর হাত ছেড়ে দিয়ে আবার তেমনি টলতে টলতে চলে গেলেন সুধাময়ী। সোজা ঘরের ভিতরে গিয়ে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়লেন।

দশ মিনিটও পার হয়নি, সুধাময়ীর বিছানার কাঁছে দাঁড়িয়ে কেতকীই ডাক দিল—বাবা, শিগগির আসুন।

জ্ঞান হারিয়েছেন সুধাময়ী। এবং জ্ঞান ফিরে আসতেও বিকেল হয়ে গেল।

কেতকীর চিঠি নিয়ে নতুন পাড়ার পাঁচু রামকানাইবাবুকে একটা খবরও দিয়ে এল। ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে রামকানাইবাবুর গাড়ি যখন এল, তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। ক্লান্ত কাকের ডাক আর শোনা যায় না। বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে অন্ধকারের শরীরটা যেন কটকট মটমট ক'রে হাড় বাজায়। তার সঙ্গে পেঁচার কর্কশ স্বর।

ডাক্তার বলেন—সেরে উঠতে বেশ সময় লাগবে।

কমলবাবু উদাসভাবে হাসেন—তার মানে শয্যা নিলেন।

শ্যামবাজারের মেসবাড়ির ছোট ঘরের খাটের উপর রোজই ঘুম থেকে যখন জেগে ওঠে অতীন, তখন রসিকপুরের একটি ভোরের ছবি অতীনের চোখ কাঁপিয়ে ছটফট ক'রে ওঠে। রসিকপুরের সেই রাত্রির শেষে, ঠিক ভোর তখনও হয়নি, ভোরের আভাস মাত্র, ঘর থেকে বের হয়ে এবং কোন শব্দ না করেও নীচের ঘরের সামনের সেই বারান্দাটাকে তাড়াতাড়ি পার হবার জন্য এগিয়ে যেতেই একবার থমকে দাঁড়িয়েছিল অতীন। কেতকীর ঘরের ভিতরে আলো জ্বলছে বলে মনে হয়।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল অতীন। একটা চোরা কৌতূহল, ভীরু অথচ লোভী।

কিংবা কেতকীর সেই ক্রুদ্ধ শঙ্কিত ও হতাশ মুখটা আর একবার দেখবার জন্য একটা নির্লজ্জ মায়া। অথবা কেতকীকে একটা কথা একটু ভাল ক'রে বলে যাবার ইচ্ছা।

বলতে ইচ্ছা করেছিল, রাগের মাথায় একটা কাণ্ডই হয়ে গেল, অন্যায় কাণ্ড, না হলেই ভাল ছিল। কিন্তু আমি যে একটা পুরুষ, সেটা তোমারও বুঝতে না পারা ভাল হয়নি কেতকী। যাই হোক, কিছু মনে করো না!

বলে যাওয়াই ভাল। ইচ্ছাটাকে বাধা দেয়নি অতীন, এবং কেতকীর ঘরের দরজার কপাট আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে ও একটু ফাঁক ক'রে আর উঁকি দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল।

চমকে শিউরে উঠেছিল অতীনের সুন্দর চেহারার ভয়ানক কালো ছায়া। চোখের উপর যেন একটা চাবুকের আঘাত আছড়ে পড়েছে। তবু দেখতে থাকে অতীন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভেজা তোয়ালে দিয়ে সিঁথিটাকে কি ভয়ানক আক্রোশে নিয়ে ঘষে মুছে একেবারে সাদা ক'রে দিচ্ছে কেতকী! কেতকীর চোখ দুটো পাগলা শিয়ালের চোখের মত জ্বলছে।

আর এক মুহূর্তও দেরি করেনি অতীন। ঐ কুৎসিত মেয়ের অহংকারের কাছে আরও অপমানের কামড় খাবার দুর্ভাগ্য থেকে বাঁচতে হলে এখনি চলে যাওয়া উচিত।

ভাঙা দেউড়ির পচা গলা ইঁটের ঢিবিগুলির পাশ কাটিয়ে এবং বেশ জোরে জোরে হেঁটে চলে যাবার সময় আর একবার একটু ভয় পেয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল। পথের উপর দাঁড়িয়ে ধুঁকছিল একটা খাটাস। ঢিল মেরে জানোয়ারটাকে তাড়িয়ে দিয়ে, তারপর একটা দৌড় দিয়ে ছুটে এবং একেবারে যশোর রোডের উপর এসে দাঁড়াবার পর হাঁপ ছাড়ে অতীন।

শ্যামবাজারের মেসবাড়ির ছোট ঘরের ভিতরেও পর পর কয়েকটা রাত চোখের সামনে একটা ছায়া দেখতে পেয়েছে অতীন। সেই জানোয়ারটার চোখ-মুখের মত বিশ্রী ভঙ্গী ক'রে চোখের সামনের এই ছায়াটাও যেন ধুঁকছে। তারপর আর নয়। এই ছায়া দেখা ভয়টা ক'দিনের মধ্যেই চোখের উপর থেকে সরে গেল।

কাজরী চৌধুরীর সুন্দর মুখও একটি অনাবিল ও উচ্ছল হাসি হেসে অতীনের এই ভয়টাকে তাড়িয়ে দেয়। একেবারে নিশ্চিন্ত ও নির্ভর হয়ে যায় অতীন বিশ্বাসের মনের সেই গর্বময় পৌরুষ, সেই আত্মগৌরবের মাথা উঁচু করা মূর্তিটা, যাকে কেতকীর মত একটা কুরূপের নারী তুচ্ছ ক'রে আর ধিক্কার দিয়ে একেবারে ধুলোমাখা ক'রে ছেড়ে দিয়েছে।

দেখা হতেই প্রশ্ন করে কাজরী—পর পর দুটো টেলিফোন করেও পাত্তা পেলাম না কেন?

—বাড়ি গিয়েছিলাম।

—কেন?

—একটা উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য সফলও হয়েছে।

পকেট থেকে দলিলের মত একটা বস্তু বের করে অতীন। একটা দরখাস্তের নকল।

—কি এটা? প্রশ্ন করে কাজরী।

—পড়ে দেখ। দরখাস্তটাকে কাজরীর চোখের কাছে এগিয়ে দেয় অতীন।

দরখাস্ত পড়েই কাজরীর চোখে যেন তীব্র একটা চমক কেঁপে ওঠে—আশ্চর্য!

অতীন—কিসের আশ্চর্য?

কাজরী—ঐ মহিলা। তোমার মত মানুষের ওপর কোন ভালবাসার টান নেই, এমন অহংকার তো চারটিখানি কথা নয়। হয় মাথা খারাপ, নয়···যাক্‌গে ওসব নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

সুন্দরতার নারী, কাজরী চৌধুরীর মত নারীর এই কথাগুলিই যে একটা সুন্দর অভ্যর্থনার ভাষা। অতীন বিশ্বাসের বুকের ভিতরে যে বিমর্ষ অহংকার চোরের মত লুকিয়ে বসেছিল, কাজরীর ঐ কথাগুলি সঞ্জীবনী মন্ত্রের মত এক নিমিষে সেই অহংকারকে প্রাণ পাইয়ে দেয়। কি আসে যায় সেই কুৎসিতার একটা তুচ্ছতায়? রূপের রাজার মত অতীনের এই ত্রিশ বছর

বয়সের চেহারাটার জন্য কেতকীর মত মাথা-খারাপ মেয়ের পক্ষে লুব্ধ না হওয়াই তো স্বাভাবিক।

অতীন বিশ্বাস আর কাজরী চৌধুরী, দু'জনের দু'টি মনের মাঝখানে কোন বেড়া নেই। কোন গোপনতা কোন না-বলা সত্য এবং না-জানানো ঘটনা নেই। অনায়াসে বর্ণনা ক'রে বলতে পারে, অতীন, এরই মধ্যে সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলেছে কেতকী। কেতকীর এই ডাইভোর্স দাবির দরখাস্তটা অতীন নিজেই এক উকীলকে দিয়ে তৈরী করিয়েছে। নিজেই কেতকীর কাছে গিয়ে দরখাস্তে সই আদায় করেছে, এবং নিজেই সেই দরখাস্ত রামকানাইবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে।

অতীন বিশ্বাসের চেষ্টার এই জটিল ইতিহাস শুনতে শুনতে ছলছল ক'রে ওঠে কাজরীর চোখ।—তোমার জন্য দুঃখ হয় অতীন।

অতীন—দুঃখ কেন কাজরী?

কাজরী--ভালবাসার জন্য মানুষ যে ভয়ানক ঝঞ্ঝাট সহ্য করে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না।

কেতকী এক মূহূর্তও দ্বিধা না ক'রে এই দরখাস্তে একটা অবহেলার স্বাক্ষর ছুঁড়ে দিয়েছে, এই ঘটনার গল্পটা শুনতে গিয়ে কাজরীকে বেশ একটু কষ্ট সহ্য করতে হয়। তীব্র বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে ওঠে চোখ দুটো।

অতীনের এই অকপট জীবনটার জন্য, এক মুর্খ নারীর কাছে তুচ্ছতায় অপমানিত এই সুন্দর মানুষটার জন্য কাজরীর চোখের মায়াটাই যেন একটা উগ্র ঝিলিক দিয়ে তারপর শান্ত হয়ে যায়। অতীনকে আরও ভাল লাগে।

হু হু ক'রে ছুটে আসছে গঙ্গার বুকের জলো বাতাস। কাজরীর শাড়ির আঁচল পতাকার মত উড়তে থাকে। চন্দননগরের বাড়ির ছোট বারান্দাটার আলো যেন দু'টি আবিষ্ট নিঃশ্বাসের ঝড়ে নিভে যায়। অতীনের হাতে হাত রেখে বসে থাকে কাজরী।

এক এক দিন বেড়িয়ে বাড়ি ফিরবার পথে কেতকীর মনের একটা সংকল্প মৃদুল গুঞ্জনের মত গুনগুন করে।—একটা কথা মনে রেখ অতীন।

অতীন--বল।

কাজরী—কেতকীর মত এত বড় অহংকার আমার নেই। তুমি আমার কাছ থেকে কোনদিন মুক্তি পাবে না।

কাজরীও অকপট মনের মেয়ে। এবং কাজরীর এই অকপট মনটাকেও বড় মায়াময় মনে হয়, বড় ভাল লাগে অতীনের। নভেলী প্রেমের মত কোন সর্বত্যাগী প্রেম বা আত্মত্যাগী প্রেমের কথা ব'লে নিজের মনের মস্ত একটা মহিমার ব্যাখ্যান করে না কাজরী।

দিনের পর দিন ফুরিয়ে যায় এবং বিয়ের তারিখটা ঠিক না হলেও একটি সন্ধ্যাও বৃথা যায় না। দু'জনের ভালবাসার সম্পর্কটা এজন্য উপোস ক'রে বসে থাকে না। প্রতিদিন ঠিক সময়ে এই বিনা রাখীর বন্ধনটাই উৎসবের আবেশে চঞ্চল হয়ে ওঠে। এমন একটি সন্ধ্যাও বাদ যায় কিনা সন্দেহ, যে সন্ধ্যায় কাজরীর খোঁপার সুগন্ধ অতীনের সিল্কের পাঞ্জাবির বুক অভিষিক্ত না করছে। কী তৃপ্তিময় সেই উপহার! ঐ পরশ পরশরতনই বটে। অতীনের সুন্দর চেহারার যত রক্তকণিকা যেন সোনা হয়ে যাচ্ছে।

না, আর ভয় করবার কি আছে? অতীনের চোখে কোন রাতে আর কোন ছায়া দেখা দেয় না। শুধু একটি চিন্তা আছে এবং সেই চিন্তার মধ্যে মাঝে মাঝে অন্যরকমের একটা ভয় চঞ্চল হয়ে ওঠে। দেরি হবে বোধ হয়। কে জানে কোথা থেকে আবার কোন্ আইনের আর প্রমাণের আপত্তি এসে দরখাস্তের দাবিটাকে একটা-দুটো বছরের মত স্থগিত ক'রে রেখে দেবে? শুধু এই একটা আশঙ্কা অতীনের আশার পথে দাঁড়িয়ে যেন সেই খাটাসের ছায়ার

মত দিনের পর দিন ধুঁকতে থাকে।

কিন্তু বেশি দিন নয় ; এই নতুন ভয়টাও শুধু আর কয়েকটা মাস অতীনের মনে অস্বস্তি ঘটিয়ে তারপরেই সরে গেল। কেতকীর দরখাস্তের দাবি মঞ্জুর করেছে আদালত। শুভ বিচ্ছেদের সংবাদটা খবরের কাগজের পাতাকেও চমকে দিয়ে হেসে ওঠে।

চন্দননগরের গঙ্গার জলে আবার একদিন চাঁদের আলো নাচে। ঘাটের কাছে বেড়াতে বেড়াতে অতীন বলে--মুক্তি পেয়েছি কাজরী। ডাইভোর্স মঞ্জুর হয়েছে।

কাজরী হাসে--শুনেছি। আমার সৌভাগ্য।

আর বাধা কোথায়? এইবার কাজরীর সঙ্গে অতীনের, দুটি জীবনের অবাধ ও সর্তহীন ভালাবাসার একটা আইনগত বন্ধন সম্পন্ন হয়ে যেতে বাধা নেই। শুধু চিন্তা করতে হয়, এমন কি মাঝে মাঝে টেলিফোনেও দু'জনে আলোচনা করে, কবে বিয়ে হতে পারে? কোন্ সময় হলে ভাল হয়?

নতুন পাড়ার পাঁচু এবং ওরই মত আর দু'চার জন হাভাতে মানুষ ছাড়া রসিকপুরের আর কোন মানুষ এই ভাঙা রাজবাড়ির ছায়ার কাছেও আসে না। তবে একটা বিষয়ে খোঁজখবর করবার ইচ্ছা অনেকেরই চিন্তায় ও কথায় লক্ষ্য করা যায়। কমল বিশ্বাস তার ঐ প্রকাণ্ড বাস্তু আর বাগান বেচবে কবে? ধ্বংসস্তূপের মত দশা হয়ে গেলেও ওটা ভূ সম্পত্তি হিসাবে মন্দ নয়। সম্পত্তিটা কারও কাছে বন্ধক রেখেছে কি কমল বিশ্বাস? মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স নিয়মিত দিচ্ছে তো? লোকটার বিরুদ্ধে কোন পাওনাদারের মামলা, কোন বডি-ওয়ারেণ্ট, কোন ডিক্রি, কিংবা কোন ক্রোকী পরোয়ানা ঝুলছে কি? কমল বিশ্বাসের মত চিরকেলে ঠগ আর ধূর্ত মানুষের সম্পত্তি কিনতে হলেও খুব সাবধান হয়ে এবং বেশ ভাল ক'রে সার্চ করিয়ে তবে কেনা উচিত। ঐ ভাঙা রাজবাড়ির ঐ জঙ্গলের মত বাগানগুলিতে যত কাঁটা আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি কাঁটা আছে কমল বিশ্বাসের বুদ্ধির মধ্যে। টাকা দিয়ে কিনলেও সে সম্পত্তি বাগিয়ে ধরা যাবে কি? না, কমল বিশ্বাসের বুদ্ধির খোঁচায় হাত সরিয়ে নিতে হবে, ঠকতে হবে?

এই ভর্ৎসনা কমল বিশ্বাসের জীবনে নতুন কোন ভর্ৎসনা নয়। কমল বিশ্বাস জানেন যে, রসিকপুরের ভিতরে ও আশে-পাশের মানুষের সমাজ তাঁকে অমানুষ বলে মনে করে। করুক, সেই ভর্ৎসনা ও নিন্দার মুখরতা তাঁর মনে কোন দাগ ধরাতে পারে নি ; কোন দিনও ব্যথিত ও বিচলিত হয়ে নিজের মনুষ্যত্বকে সন্দেহ করেননি কমল বিশ্বাস। ওদের তুলনায় অন্য রকমের মানুষ হলেই ওরা তাকে অমানুষ বলে। বলুক ; যে অবস্থায় পড়লে যা করা উচিত, তিনি তাই ক'রে এসেছেন। উপায়হীন অবস্থার চাপে অসহায়ের মত গুঁড়ো হয়ে না গিয়ে, নিজের সাধ্যমত চেষ্টার জোরে নিজের স্বার্থ বাঁচিয়েছেন ; সে চেষ্টার মধ্যে দশটা মিথ্যা কথা আর পাঁচটা ভুয়ো সই আর দুটো বাজে গল্প থাকলেই বা কি আসে যায়?

আগে প্রায়ই সুধাময়ীর কাছে একটা দার্শনিক গল্প বলতেন কমল বিশ্বাস, আজকাল অবশ্য আর বলেন না। ভগবান কৃষ্ণকে কাছে পেয়ে কালিয় নাগ বিষ ঢেলে দিয়ে পূজা করেছিল। তা ছাড়া আর কি দিয়ে পূজা করবে কালিয় নাগ? বিষ ছাড়া অন্য কোন সম্বল যে তার ছিল না। আমিও, আমিও আমার ভাগ্যের ভগবানকে আমার যা সম্বল আমার পক্ষে যা সাধ্য, তাই দিয়ে পূজা করেছি। লাখ টাকা থাকলে আমি তোমার বড়দিকে ফাঁকা কথায় ভুলিয়ে সামান্য কয়েকটা টাকা হাত করতাম না সুধা।

দমদমের সেই স্কুল ফণ্ডের টাকা সরাবার ব্যাপারটা? হ্যাঁ, যদিও সে আজ প্রায় পঁচিশ বছর আগের ব্যাপার, তবু এই সেদিনও সুধাময়ীর কাছে গল্প করতে করতে নানা কথার মধ্যে বেশ রাগ ক'রে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন কমল বিশ্বাস--ঠিক করেছিলাম, কোন অন্যায় করিনি, সেজন্য আমি আজও একটুও লজ্জিত নই সুধা।

চুপ ক'রে, এবং হয়তো স্বামীর ঐ দার্শনিক যুক্তি মেনে নিয়ে এই সেদিনও যে রোগা মোমের মত সাদাটে চেহারার, বোকা সরল ও দুঃখে উদ্বেগে জর্জর মানুষটা হাসিমুখে কমল বিশ্বাসের উত্তপ্ত মাথায় পাখার বাতাস দিয়েছিল, সে মানুষটা শয্যা নিয়েছে। এই ভাঙা বাড়ির দুর্ভাগ্যের কদর্যতা সহ্য করতে না পেরে ভয়ানক এক বিদ্রোহ ক'রে বসে আছে সুধা। বোধহয় আর উঠতে চায় না সুধা। চলে যাবার জন্য ছটফট করছে। মাঝে মাঝে যে-রকম অসাড় হয়ে পড়ে থাকে সুধা, দেখে মনে হয় চলেই গিয়েছে। এবং যদিও মুখে বলতে পারেন না কমল বিশ্বাস, কিন্তু মনের ভিতরে একটা অভিমান ডুকরে ওঠে। এ-কি করছো সুধা? তুমিই না বলেছিলে যে, আমাকে একা ফেলে রেখে তুমি চলে যেতে চাও না?

সুধাময়ীর জন্যই ওষুধ আনবার কাজে সেদিন বাইরে যেতে হয়েছিল, নতুন পাড়ার পাঁচুকে পাওয়া যায়নি। নিজেই লাঠি হাতে নিয়ে ঠুকঠাক ক'রে দমদম পর্যন্ত হেঁটে গেলেন কমলবাবু, ওষুধ নিয়ে ফিরে এলেন এবং ঠাকুরদালানের বারান্দার উপর ধপ ক'রে বসে পড়ে ঠকঠক ক'রে অনেকক্ষণ ধরে কাঁপলেন। যে সন্দেহ কোনদিন হয়নি, সেই সন্দেহ তাঁর বুকের ভিতর হিমাক্ত বাতাসের ছোঁয়ার মত সিরসির করছে। অমানুষ, কমল বিশ্বাস সত্যিই অমানুষ। কমল বিশ্বাসের জীবনটাই নতুন ক'রে এই গালি খেয়ে চমকে উঠেছে।

কৈলাসবাবুর বাড়ির সামনের রোয়াকের উপর ভদ্রলোকদের দাবা আর গল্পের আসর মেতে উঠেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার গায়ে জড়িয়ে খুটখাট ক'রে সেই রোয়াকের নিকট দিয়েই পথ হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন কমল বিশ্বাস। শোনা গেল গল্প, কে যেন বলছে—কমল বিশ্বাস তার দুষ্কর্মের জীবন থেকে রিটায়ার করেছে বলে মনে হচ্ছে। আজকাল লোকটার কোন সাড়া শব্দই পাই না।

আর একজন উত্তর দিল--কি যে বলেন মশাই! লোকটা আজকাল একেবারে আস্ত একটা কশাই হয়ে উঠেছে। ভাঁওতা দিয়ে, সাতপুরুষের জমানো সোনা ভিটের নীচে পোঁতা আছে, এই গল্পের জোরে নিজেকে বড়লোক ব'লে জাহির ক'রে কোন্ এক বড়লোকের মেয়েকে ঘরের বউ ক'রে নিয়ে এসে, সেই মেয়েকে দিয়েই আবার চাকরি করিয়ে টাকা বাগাচ্ছে। আজকাল দিব্যি সুখে আছে কমল বিশ্বাস।

দৌড়বার শক্তি নেই, নইলে বোধহয় দৌড়েই চলে আসতেন কমল বিশ্বাস। সারা জীবন ভর্ৎসনা নিন্দা অপমান অপবাদ আর গঞ্জনায় কমল বিশ্বাসের অন্তরাত্মা কোনদিন এরকম শিউরে ওঠেনি, বুকব্যথার আঘাতেও ঐ জীর্ণ শরীর এরকম ঠক ঠক ক'রে কোনদিন কাঁপেনি।

নিজের ছেলে আর নিজের মেয়ে পর হয়ে গিয়েছে ; কিন্তু পরের মেয়ে কেতকীকে আপন মেয়ে বলে ভাবতে যে এত ভাল লাগছে, সেটা কি সত্যিই একটা বাপের মনের মত স্নেহ?

স্নেহ নয়, মায়া নয়, ওটা একটা চমৎকার ধূর্ততা, চতুর স্বার্থ ; তোমার বুড়ো বয়সের বুদ্ধির সব চেয়ে বড় চক্রান্তের আহ্লাদ। মনে হয় কমলবাবুর, তাঁর পাঁজরগুলি ঠক ঠক ক'রে কেঁপে এই ধিক্কার দিচ্ছে।

একেবারে খাঁটি সত্য ঐ ধিক্কারের ভাষা। কেতকীকে চলে যেতে বলতে মন চায় না। কেতকী চলে গেলে যে সুধাময়ীর জন্য এই ওষুধটুকুও কিনবার উপায় থাকবে না। কেউ একটা পয়সাও ধার দেবে না, দয়া করবে না, ধূর্ত কমল বিশ্বাসের উপর নিষ্ঠুর হয়ে রয়েছে সারা জগতের মন। উপায় নেই, কেতকী চলে গেলে উপোস করে মরতে হবে।

এই তো আসল ভয়। নিজের মনটাকে ভুল ক'রে একটু শ্রদ্ধা করে ফেলেছিলেন, নিজেকে আজকের মত এত স্পষ্ট ক'রে চিনতে পারেননি, তাই একদিন, এই বাড়িতেই দেড় বছর আগের এক সন্ধ্যায় কেতকীকে কাছে ডেকে নিয়ে আবেদন করেছিলেন--তুমি রাগ

ক'রে চলে যেও না কেতকী। তুমি চলে গেলে এই বুড়ো বুড়ির দুটো মায়ার বুক উপোস ক'রে মরে যাবে। দু'টো ক্ষুধার পেট উপোস ক'রে মরে যাবে, এই ভয়টাকেই সেদিন ওরকম একটা ভদ্রভাষায় বেশ কৌশল ক'রে কেতকীর কাছে জানিয়ে কেতকীর মন গলাতে পেরেছিলেন।

মনেও পড়ে কমল বিশ্বাসের, কেতকী নামে ঐ মেয়ে এই বাড়ির ভয়ানক চক্রান্তের সব ইতিহাস জানতে পেরেও হেসে উঠেছিল। অনায়াসে কমল বিশ্বাসকে সান্ত্বনা দিয়েছিল, আপনারা যেতে না দিলে আমি যাব না বাবা।

ঐ সেদিন, জীবনে বোধ হয় মাত্র ঐ একটি দিন কমল বিশ্বাসের চোখে সত্যিকারের অশ্রু টলমল ক'রে উঠেছিল। একটা পরের মেয়ের এত বড় আপন-করা মহত্ত্ব দেখবার আনন্দে নয় বোধ হয়, আজ বিশ্বাস করেন নিজেরই জীবনের একটা স্বার্থপর সৌভাগ্যের আনন্দে সেদিন তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন।

আজ এত বেশি ক'রে এই সব কথা ভাবতে হচ্ছে, আর ভয় পেতে হচ্ছে কেন, তা'ও জানেন কমল বিশ্বাস। এইবার কেতকী সত্যিই চলে যেতে পারে, এমন আশঙ্কা একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সিঁদুর মুছে নিয়ে যে-বিধবা সেজেছে, সে মেয়ে তার জীবনের বিদ্রোহ এতদিনে একেবারে স্পষ্ট ক'রে দিয়েছে। ভয়ে ভয়ে এই দু'টি মাস কাটিয়েছেন কমল বিশ্বাস। কেতকীর মুখের দিকে মুখ তুলে তাকাবার সাহস পান নি এবং হঠাৎ রামকানাইবাবুর কাছ থেকে একটা ভয়ানক অভদ্র ভাষার চিঠি এসে গিয়েছে। জানিয়েছেন রামকানাইবাবু, এইবার একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ছাড়বেন। শাসিয়েছেন, মিষ্টি কথার চালাকিতে বোকা মেয়েটার আরও সর্বনাশ করবার মতলব ছাড়ুন মশাই। ভাল চান তো কেতকীকে আটকে রাখবার চেষ্টা করবেন না। এই চিঠি পাওয়া মাত্র কেতকীকে এখানে পাঠিয়ে দিন।

কেতকী সিঁদুর মুছেছে এই খবর রামকানাইবাবু পেলেন কেমন ক'রে? কেতকীই কি চিঠি লিখে জানিয়েছে? নইলে এত রুষ্ট হয়ে হেস্তনেস্ত করবার জন্য প্রতিজ্ঞা ক'রে আর শাসিয়ে চিঠি দেবেন কেন রামকানাইবাবু? ভদ্রলোক মাঝে তো বেশ শান্ত হয়েই গিয়েছেন বলে মনে হয়েছিল।

ঠাকুরদালানের বারান্দার এক কোণে বসে মনে মনে রামকানাইবাবুর রাগের রহস্যটা বুঝতে চেষ্টা করেন কমল বিশ্বাস। হঠাৎ চোখে পড়ে দক্ষিণ দরজার বাগানের পথের উপর যেন একটা মোটরগাড়ি নিঃশব্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জ্বলছে গাড়ির লাল রং-এর একটা আলো।

কা'র গাড়ি? রামকানাইবাবুর? কখন এল গাড়িটা? তাহ'লে চলে যাচ্ছে কেতকী? কমল বিশ্বাসের বুকের ভিতরে একটা বোবা আর্তনাদ চমকে ওঠে। যেন সর্বস্ব লুট হয়ে যাচ্ছে, রসিকপুরের রাজবাড়ির সত্যিকারের সোনা কেড়ে নিতে এসেছে এক দুর্ভাগ্যের ডাকাত।

বাধা দিতে হবে। কিন্তু কেমন ক'রে বাধা দেওয়া যায়? সেই জোর কোথায়? ঠাকুর পদ্মনাভ যে কমল বিশ্বাসের জীবন থেকে সেই ধূর্তটার জোরটুকুও কেড়ে নিয়েছেন, বোধ হয় কেতকী যেদিন এসেছে সেইদিন থেকেই। কি অদ্ভুত দুর্বলতা, চেষ্টা করলেও সামান্য একটা মিথ্যাকথা আর বলতে পারা যায় না! অসহায় শিশুর মত একটা আতঙ্কিত মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে ঘরের দিকে এগিয়ে যান কমলবাবু, এবং শুনতে পান, রামকানাইবাবুর প্রশ্নে আর গর্জনে এই ভাঙা-বাড়ির ঘরের বাতাস কাঁপছে।

—যাবি না মানে? তোর কি সত্যিই মাথা খারাপ হলো কেতকী? নিজেই আদালতে দরখাস্ত ক'রে ডাইভোর্স নিলি, আর দরখাস্তে নিজেই স্বীকার করেছিস যে, স্বামীর সঙ্গে কোনদিন সম্পর্ক হয়নি, স্বামীর উপর কোন অনুরাগ তোর নেই, তার পরেও আবার এসব কি কথা? এর মানে কি?

—রাগ করো না মামা। আমি এখন যেতে পারবো না।

—কবে যাবি?

—তা'ও বলতে পারি না।

—তাহ'লে বুঝলাম, এই বুড়োবুড়ি মন্ত্র-পড়া শিকড়-বাকড় খাইয়ে তোর বুদ্ধিসুদ্ধি তুক করেছে।

কেতকী—ওঁদের কোন দোষ নেই।

রামকানাইবাবু ভ্রূকুটি ক'রে বলেন—হ্যাঁ, অগত্যা আমাকেও তাই বিশ্বাস করতে হচ্ছে। দোষ তোমার, তোমার কপালের।

দরজার বাইরে আড়ালে দাঁড়িয়ে-থাকা কমল বিশ্বাসের মূর্তিটা আরও একটু সরে গিয়ে আরও বেশি আড়াল হয়ে যায়। গটমট ক'রে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসেন রামকানাইবাবু, এবং দুপদাপ ক'রে হেঁটে ভাঙাবাড়ির জিরজিরে বুকের ইঁটগুলিকে কাঁপিয়ে দিয়ে চলে যান। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকেন কমল বিশ্বাস, দক্ষিণ দরজার বাগানের পথটাকেও গম্ভীর গর্জনে চমকে দিয়ে চলে রামকানাইবাবুর গাড়ি।

খালি হাতে চলে গেল ডাকাত, এই ভাঙা-বাড়ির সৌভাগ্যের সঞ্চয় লুট ক'রে নিয়ে যেতে পারলো না। ভীত শিশুর মত করুণ চোখ ক'রে এতক্ষণ তাকিয়ে থেকে হাঁপ ছাড়েন কমল বিশ্বাস এবং চোখের চাহনিও যেন হেসে ওঠে।

আনন্দটা যেন এক বিজয়বন্ত বীরের আনন্দ। চেঁচিয়ে ডাক দেন কমলবাবু—কেতকী! কেতকী মা!

কেতকী সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রশ্ন করেন কমলবাবু—রামকানাইবাবু এসব কি অদ্ভুত কথা বললেন কেতকী?

কেতকী—কোন কথা?

কমলবাবু—ডাইভোর্স।

কেতকী—হ্যাঁ, আমিই দরখাস্ত করেছিলাম, আপনার ছেলেও তাই চেয়েছিল।

কমলবাবু অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। কেতকীর মুখের দিকেও অপ্রস্তুতভাবে বারবার তাকান। কেতকীর মাথার কাপড়টা একটা দমকা বাতাসের আঘাতে পড়ে গিয়েছে। সাদা সিঁথির দু'পাশে ফুরফুর করছে কালো চুলের গুচ্ছ। কিন্তু শাড়িটা তো বেশ রঙীন, কানের দুল জোড়াও ঝিকমিক ক'রে দোলে। পায়ে লাল বনাতের চটি। কমল বিশ্বাসের সংসারে দিব্যি ফুটফুটে একটি কুমারী মেয়ে যেন বাপ-মা'র আদরে নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছে।

কি বুঝতে গিয়ে কি বুঝে ফেলেছেন কমল বিশ্বাস, চোখে বোধহয় ধাঁধা লেগেছে। কেতকী যাবে না, কেতকী যেতে চায় না, কিন্তু কেন? আরও ভাল ক'রে জেনে আরও নিশ্চিন্ত এবং আরও আশ্বস্ত হতে চান কমল বিশ্বাস।

আদরের সুরে প্রশ্ন করেন কমলবাবু—কিন্তু...তবু তুমি চলে যেতে চাও না কেন কেতকী?

মাথা হেঁট করে কেতকী।

সেই মুহূর্তে আতঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে ওঠেন কমল বিশ্বাস—ও কি? কি হলো? তুমি কাঁদছো কেন কেতকী?

টুপটাপ ক'রে এক-একটা বড়-বড় জলের ফোঁটা আজ ঝরে পড়ছে কেতকীর সেই চোখ থেকে, যে চোখে এই বাড়ির সব চক্রান্তের মালিন্যের গ্লানির আর দারিদ্র্যের দিকে তাকিয়েও এতদিন শান্তভাবে ঝিকমিক ক'রে হেসেছে।

যে মেয়েকে কোন মুহূর্তেও উতলা হতে দেখেননি কমল বিশ্বাস, সেই মেয়ে, সেই কেতকী হঠাৎ উতলা হয়ে আর চোখ দুটোকে আঁচল চাপা দিয়ে ছুটে চলে গেল। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকেন কমল বিশ্বাস কেতকীর উপর রাগ ক'রে শয্যা নিয়ে মরবার জন্য

চেষ্টা করছে যে মানুষটা, সেই সুধাময়ীর ঘরের ভিতরে গিয়ে যেন আছড়ে পড়লো কেতকী।

কি যেন সন্দেহ করেন কমল বিশ্বাস, ভয়ানক বিষাক্ত একটা সন্দেহ। ভৈরব বিশ্বাসের লালসার অভিশাপে বিষাক্ত একটা সরীসৃপ কেতকীর জীবন দংশন ক'রে পালিয়ে গিয়েছে। তাই কি? সন্দেহটার সঙ্গে যেন লড়াই করতে করতে, কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েন কমল বিশ্বাস। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপরেই আস্তে আস্তে সুধাময়ীর ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ান।

আর এক বিস্ময়। বিছানার উপর উঠে বসেছেন সুধাময়ী, আর কেতকীর গলা ধরে চুমো খেয়ে আত্মহারা হয়ে যাচ্ছেন, তবু যেন তাঁর তৃপ্তি পূর্ণ হচ্ছে না। চোখের উপর তেমনই শাড়ির আঁচল চেপে নিঝুম হয়ে রয়েছে কেতকী। কিন্তু সুধাময়ী এ কি কাণ্ড করছেন? বোঝা যায় না, কেন কেতকীকে বার বার বুকে জড়িয়ে ধরছেন, মাথায় হাত বুলোচ্ছেন। কোথা থেকে আর কেন এরকম একটা প্রাণশক্তি উথলে উঠলো এই মোমের মত সাদাটে মানুষটার রোগা শরীরে, দু'মাস হলো আধমরা হয়ে বিছানায় পড়ে আছে যে? সত্যিই বুঝতে পারেন না কমল বিশ্বাস ; সুধা কি ক্ষমা চাইছে, না প্রায়শ্চিত্ত করছে, কিংবা কোন নতুন খুশির আবেগে পাগল হয়ে গিয়েছে?

কি ভয়ানক তীব্র স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন সুধাময়ী।—বেশ করেছ কেতকী, ও সিঁদুর মুছে ফেলাই উচিত ছিল। জানলে আমি নিজের হাতে ঐ হতভাগার চোখের সামনেই তোমার সিঁথির সিঁদুর মুছে দিতাম।

চোখ বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে সুধাময়ীর এই ভয়ানক প্রলাপ শুনতে থাকেন কমলবাবু। থামছে না সুধা, ওর মোমের মত সাদাটে চেহারার ভিতর থেকে যেন আগুনের জ্বালা ফুটে বের হচ্ছে, আর কথাগুলিও যেন দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে।—আমি মানুষের মা নই কেতকী, আমি সাপের মা। তবু...তবু...আমাকে ঘেন্না করো না কেতকী। আমি যে স্বপ্নেও ভাবিনি, কোন মানুষ তোমাকে এত অপমান করতে পারে।

বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন সুধাময়ী—এমন কথা শোনার চেয়ে তুমি বিধবা হয়েছ জানলেও যে আমার এত দুঃখ হতো না।

সুধাময়ীকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন না কমলবাবু। প্রলাপ নয়। মেয়ে-জাতের মনের সেই আদিম অভিমান, মেয়ে-জীবনের সবচেয়ে বড় অপমানের জ্বালা সুধাময়ীরই ঐ কান্নার স্বরে ক্ষমাহীন ধিক্কারের সঙ্গীতের মত বাজছে। এখানে কোন পুরুষের মুখের সান্ত্বনা সাজে না, সে সান্ত্বনা দেবার কোন অধিকার নেই কমল বিশ্বাসের।

নিজেই শান্ত হন সুধাময়ী। কেতকীও আস্তে আস্তে উঠে, চোখের উপর তেমনি আঁচল চাপা দিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়।

কমল বিশ্বাস বলেন—আমি সব কথা না জেনেও বোধ হয় ঠিকই সন্দেহ করেছি সুধা।

ক্লান্ত পাগলের মত সুধাময়ীও মৃদুস্বরে বিড়বিড় করেন—হ্যাঁ, কেতকীর ছেলে হবে। তোমারই ছেলে ভয় দেখিয়ে...জোর ক'রে...রাক্ষসের মত...।

—শুনতে চাই না, শুনতে চাই না। বলতে বলতে ঘরের বাইরে চলে যান কমল বিশ্বাস।

সেই মনুমাসি অর্থাৎ সুধাময়ীর বড়দি, যিনি এই দু'বছরের মধ্যে কোন দিন তাঁর এই বোনের বাড়িতে আসবার সময় পাননি, তিনিই এলেন একদিন। সুধাময়ীর চেয়ে দশ বছর বয়সের বড় হলেও চলতে ফিরতে আর বেড়াতে তাঁর ঐ বার্ধক্যের শক্তি দেখলে আশ্চর্য হতে চায়। গাড়িও আছে তাঁর, এবং তাঁর গাড়ি সকাল সন্ধ্যা দু'বেলা সারা কলকাতার পথে দৌড়াদৌড়ি ক'রে যত কুটুমবাড়ি, আত্মীয়ের বাড়ি আর চেনাশোনা পরিবারের বাড়িতে তাঁকে নিয়ে যায়। কা'র ছেলের ভাল চাকরি হলো, এবং কা'র মেয়ের কি-রকম ভাল ঘরে বিয়ে

হলো, শুধু এই রকমের যত সৌভাগ্যের তথ্য জানবার জন্য তাঁর চিন্তার ও ব্যস্ততার যেন অন্ত নেই। অনেকদিন পরে বসিকপুর নামে এই জায়গাটাকে, রাজবাড়ি নামে এই ভাঙা-বাড়িটাকে, এবং এক ভাঙা-কপালের বোনকে হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছে, তাই এসেছেন।

—তোরা তো আমাকে ভুলেই গিয়েছিস সুধা, কিন্তু আমি ভুলবো কি করে তাই এলুম।

তারপরেই কমলবাবুর দিকে তাকিয়ে দাবি করেন মনুমাসি।—এইবার সাহেবের কাছ থেকে আমার সেই পাঁচশো টাকা আদায় ক'রে দাও কমলবাবু। একটা ঠগ সাহেব আমার পাঁচশো টাকা হজম ক'রে দেবে, এ জ্বালা কি আমি ভুলতে পারি বল? তাই এলুম তোমাকে মনে করিয়ে দিতে।

কমল বিশ্বাসের ভীরু চোখ দুটো কিছুক্ষণ অদ্ভুতভাবে ধিকিধিকি ক'রে জ্বলতে থাকে। তার পরেই চেঁচিয়ে ওঠেন কমল বিশ্বাস।—সাহেব নয়, আপনার ঐ টাকা আমিই হজম করেছি বড়দি।

বড়দি হো হো ক'রে হেসে ওঠেন।—তুমি আজও তোমার সেই রগুড়ে স্বভাবটি ছাড়তে পারনি কমলবাবু। কি ভয়ানক হাসাতে পার তুমি! যাই হোক, সাহেবটা কবে আমার টাকা ফেরত দেবে বল?

কমলবাবু—আমিই ফেরত দেব।

বড়দি হাসেন—ঐ একই ব্যাপার হলো। কিন্তু কবে?

কমলবাবু—দেখি কবে পারি।

বড়দি—বেশি দেরি করো না।

কমলবাবু—না, দক্ষিণ দরজার বাগানটা বেচতে যতটুকু দেরি হতে পারে, তার বেশি নয়।

মনুমাসি বড় খুশি হয়ে আশীর্বাদের মত স্বরে বলতে থাকেন—ভগবান তাই করুন। শাস্ত্রে বলেছে, যে মানুষ অঋণী, তার জীবনের শেষদিনে স্বয়ং মহাদেব তার চোখের সামনে এসে দেখা দেন।

উঠলেন মনুমাসি। যেতে যেতে কেতকীর দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়ালেন।—অ্যাঁ, বউ-এর চোখ-মুখ দেখে কেমন যে মনে হচ্ছে সুধা। কোন অসুখ-বিসুখ নয় তো?

সুধাময়ী ভয়ে ভয়ে বললেন—না।

মনুমাসির চোখ দুটো তবু কটকট ক'রে তাকিয়ে থাকে?—তবে পোয়াতি?

চমকে ওঠেন সুধাময়ী—হ্যাঁ।

—ভাল কথা। বলতে বলতে এগিয়ে যান মনুমানি, এবং একটু দুঃখিত স্বরে বলেন—ছেলের আর মেয়ের বিয়ে দিয়েছিস, খবরগুলো সময়মত পেয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্যি যে, বিয়েতে আসতেই পারলুম না। গাড়িটা বিকল হয়ে পড়ে রইল। বাসনাকে আর তোর ছেলের বউকে যে একটু সোনা দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে যাব, ভগবান সে সুযোগও দিলেন না।...তা, বাসনার বিয়ে দিলি কোথায়?

সুধাময়ী—হয়তো চিনবেন, এলাহাবাদের পার্থবাবুর ছেলের সঙ্গে।

মনুমাসি—অ্যাঁ! বলিস কি রে সুধা? বউ আনলি কাদের ঘর থেকে। কার মেয়ে?

সুধাময়ী—খড়দা'র রামকানাইবাবুর ভাগ্নী।

মনুমাসির বিস্ময় যেন ডুকরে ওঠে—অ্যাঁ! একটা কাণ্ডই করেছিস সুধা!

ভাঙা সিঁড়ির উপর একবার দাঁড়ালেন মনুমাসি। তারপর আক্ষেপ করলেন।—রামকানাই-এর বুদ্ধি-সুদ্ধি সুবিধে নয়। টাকার কুমীর, এই একমাত্র গুণ। ঘরে কোন মেয়েছেলেও নেই যে ওকে একটা সুপরামর্শ দেবে। নইলে...নইলে আমার ভাসুর-পো অজয়ের সঙ্গে ওর ভাগ্নীর বিয়ের প্রস্তাবটা তুচ্ছ ক'রে এখানে ভাগ্নীর বিয়ে দিল কি দেখে? দেখা হলে রামকানাইকে মিষ্টি মিষ্টি দুটো কথা না শুনিয়ে ছাড়বো না।

সুধাময়ীর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি ক'রে হেসে উঠলেন মনুমাসি--যাই সুধা।

মাসগুলিও ফুরিয়ে যেতে থাকে কত তাড়াতাড়ি। এক একটা মাস যেন এক একটা রঙীন প্রজাপতির মত ফুরফুর ক'রে উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। ক্যালেণ্ডারের পাতা ছিঁড়তে গিয়ে বুঝতে পারে অতীন, অনেকগুলি মাস পার হ'য়ে গিয়েছে।

অতীনের আশার পথে আর কোন সমস্যাটার খাটাস বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। একটা বেশ ভাল নিরিবিলি জায়গায়, একটা নতুন বিল্ডিং-এ একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে হবে। মনের মত ফ্ল্যাট পাওয়া যায় না। সন্ধান করতে হয়। পেলেই বিয়ের তারিখটা ঠিক ক'রে ফেলা হবে। শোরুমে আর অফিস-ঘরের মধ্যে নানা কাজের ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে অতীনের এই চেষ্টাটাও ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু একেবারে আচমকা, বিনা ঝড়ে ধুলোর আঁধির মত একটা ঘটনা অতীনের জীবনটাকে যেন ধাঁধিয়ে দেবার জন্যই ছুটে এল। হঠাৎ ভয়ে চমকে উঠতে হ'লো, কারণ এ ধরনের একটা ভয়াল খবরের ভ্রূকুটি দেখবার জন্য প্রস্তুত ছিল না অতীন, এবং এরকমটা হবে বলে কল্পনাতেও কোন সন্দেহ দেখা দেয়নি কোনদিন।

ঘরে ফেরার জন্য অফিস-ঘর থেকে বের হয়ে ফুটপাথের উপর এসে দাঁড়াতেই দেখতে পায় অতীন, একটা ট্যাক্সি থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে অজয়। মনুমাসির ভাসুরপো হয়, লোকটা একেবারে বেহেড হয়ে এসেছে।

—হাউ ডু ইউ ডু মাই ডিয়ার বয়? বলতে বলতে কাছে এসে লম্বা একটা ঢেঁকুর তুলে হাসতে থাকে অজয়।

অতীন মুখ সরিয়ে নিয়ে হাসতে চেষ্টা করে।—পথের ওপর আবার এসব কীর্তি কেন?

অজয় বলে--কিন্তু মানুষকে পথে বসাতে তুমি যে কীর্তির ডিউক অব ওয়েলিংটন বাবা!

অজয় মাতালকে খুব ভাল ক'রে চেনে অতীন। ভাল কথা বলে অনুরোধ ক'রে বাধা দিলে ওর মাতলামি আরও মত্ত হয়ে ওঠে, এবং গলা টিপে ধরলে আরও বেশি খিস্তি বমি করে। অজয়ের কথার কোন উত্তর না দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে থাকে। কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হলো। চমকে উঠেছে অতীনের হৃৎপিণ্ডের রক্ত। কি ভয়ংকর একটা কথা বলে ফেলেছে অজয় মতাল!

—ছিঃ, ফাই অতীন ফাই! যে নারী তোমাকে লাইক করে না, তোমাকে হেট করে, সেই নারীটাকেও ভুলিয়ে ভালিয়ে...ছি।

—আস্তে কথা বল অজয়। দাঁতে দাঁত ঘষে হুমকি দেয় অতীন।

এক গাল হেসে আবার যেন গড়িয়ে পড়তে চায় অজয়, এবং আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠে—আরও আস্তে? অ্যাঁ? লজ্জা করছে বুঝি?

লজ্জায় জিভ কাটে অজয় মাতাল। তার পরেই যেন সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে—চিন্তা করো না অতীন।

অতীন ধমক দেয়—আমি কোন চিন্তা করি না। তুমি কি বলতে চাইছো বল।

বুক টান ক'রে অজয় বলে—বলতে চাইছি, এই অবাঞ্ছিত আনহ্যাপি অনর্থক মাদারহুড সহ্য করবার পাত্রী নয় কেতকী। এবং সে বেচারার এরকম একটা ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা আমরাও সহ্য করতে রাজি নই। রামকানাইবাবুর সম্পত্তি বাগাবার জন্য কেতকীর কাছে তুমি একটি বংশধর গছিয়ে রাখবে, সেটি হতে দিচ্ছি না।

বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকে অতীন। অজয় মাতাল ভ্রূকুটি ক'রে বলে—আমরা মানে কারা, সেটা বুঝতে পেরেছেন তো মিস্টার ডন জুয়ান? আমরা হলাম, মনুখুড়ি পুলকমাসি আর আমি। তাই বলছি সাবধান...দোহাই তোমার, তুমি আবার হুট ক'রে হাজির হয়ে

কেতকীর মনে ভাংচি দিয়ে...মাইরি, তোর পায়ে পড়ছি দাদা, ওরকম চেষ্টাটি আর করিসনি।

অতীনের কানের দু'পাশ দিয়ে যেন একটা হিমাক্ত শিহর সিরসির ক'রে গড়িয়ে পড়ছে। কি ভয়ানক সংবাদ! খাটাসের ছায়া নয়, অতীনের জীবনের আশার পথে এইবার একটা বিষধরের ছায়া দেখা দিল। সেই কুৎসিতার শরীরের ভিতরটাও কি ভয়ানক খলতায় উর্বর হয়ে রয়েছে! অতীনের জীবনটাকে মুক্তি দিয়েও একটা অভিশাপের অটুট শিকলে বেঁধে রাখলো কেতকী। বোধ হয় এখন খোরপোষের মামলা করবার জন্য তৈরী হয়ে আর হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ছে কেতকীর হিংস্র ইচ্ছাটা।

না, খোরপোষের মামলাটা অতীনের জীবনের আসল ভয় নয়। দাগটা ধরা পড়ে গেল, দাগী হয়ে গেল জীবনটা। এবং শেষ পর্যন্ত কাজরীর মনও কি এইরকম একটা দাগী জীবনকে ভয় পেয়ে ওর ঐ সুন্দর ভালবাসার মুখ ফিরিয়ে নেবে না?

অজয় মাতাল সিগারেট ধরাতে গিয়ে হাত পোড়ায় এবং হাতে ফুঁ দিয়েই অতীনের মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসে।—এই তো দিব্যি চিন্তা করছো যাদু।

অজয় মাতালকে ধিক্কার দেবার মত কোন সাহস আর বুকের ভিতর খুঁজে পায় না অতীন। অজয় মাতালই চেঁচিয়ে হেসে ওঠে।—ডোণ্ট ঘাবড়াও। কেতকী তোমার বিরুদ্ধে খোরপোষের মামলা করবে না। শী উইল বি ফ্রী। মাত্র দু'তিন মাসের কলঙ্ককে মেডিক্যালি কিওর ক'রে দিতে ক'টাকার ওষুধ লাগে, আর কতক্ষণই বা সময় লাগে বাবা!

কখন এবং কতক্ষণ হলো চলে গিয়েছে অজয় মাতাল, তা'ও বুঝতে পারেনি অতীন। যখন রুমাল দিয়ে কপালের ঠাণ্ডা ঘাম মোছে অতীন, তখন পার্ক স্ট্রীটের দু'পাশে আলোর মেলা জেগে উঠেছে। সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। মনে হয় অতীনের, বুকের ভিতরটা অনেকক্ষণ ধরে টিপটিপ করেছে, আর মাথার ভিতরে তীক্ষ্ণ একটা বস্তু বারবার বিঁধেছে।

অজয় মাতালের সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হলো। সব কথার শেষে যে কথাগুলি বলে গেল অজয়, তাই তো সবচেয়ে বড় সান্ত্বনার কথা। অতীনের বুকজোড়া ভয়ের গুমোট ভেঙে গিয়েছে।

বোকা নয় কেতকী। কেতকীও মুক্তি পেতে জানে। দেহের ভিতর থেকে একটা ঘৃণার পিণ্ডকে আবর্জনার মত দূরে ছুঁড়ে ফেলতে একটুও দ্বিধা করবে, এমন নরম মনের মেয়েই নয় কেতকী।

সব ভাল যার শেষ ভাল। মনে হয় অতীনের, এই নতুন ভয়ের বাধাটাও ভালয় ভালয় সরে যাবে। যাকে স্বামী বলেই স্বীকার করেনি, তারই একটা আক্রোশের স্মৃতিকে আদর ক'রে পুষে রাখতে পারে না কেতকী।

পথে চলতে চলতে দু'বার হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় অতীন। তাই তো, এটা যে একটা অন্য রাস্তা, সোজা দক্ষিণ বালিগঞ্জের দিকে চলে গিয়েছে। কপালের ঠাণ্ডা ঘাম মুছে কপালটাকেই যেন সান্ত্বনা দেয় অতীন। কেতকীর মনটা বেশ কঠোর এবং ঘেন্নাগুলিও বেশ হিংস্র, তাই রক্ষা। তাই কোন সমস্যা দেখা দেবে না।

মেসবাড়ির ছোট ঘরটার ভিতরে ঢুকে আবার বিরক্ত হয় অতীন। সেই ছায়াটা আবার কোথা থেকে এসে অতীনের চোখের সামনে ধুঁকছে। মনেও পড়ে একটা দৃশ্য। একটা কুৎসিত মেয়ে পাগলা শিয়ালের মত চোখ ক'রে ভেজা তোয়ালে দিয়ে তার সিঁথিটাকে ঘষছে।

কিন্তু ভালোই তো, ওটাই যে কেতকীর ইচ্ছার ভয়ানক স্পষ্ট একটা প্রমাণ। বিশ্বাস করতে পারে অতীন, ঐ রকমই হিংস্র চোখ নিয়ে কেতকী তার রক্তের নতুন রং ধুয়ে মুছে সাদা ক'রে দেবে।

না, ঐ ছায়াটা কিছু নয়, চোখের একটা ক্লান্তি মাত্র।

—না না না, কখনই না। একটা বোবা উদ্বেগের ভাষা ঠোঁট কাঁপিয়ে দিতেই অতীনের ঘুম ভেঙ্গে যায় ; বিছানার উপর উঠে বসে অতীন।

তাহ'লে কি এতক্ষণ ধরে স্বপ্নের মধ্যে ঐ বোবা কথাগুলিকে শুনছিল অতীন? হ্যাঁ। স্বপ্ন না হোক, স্বপ্নেরই মত অলীক অসার একটা ভাবনার ঘোর। ভাবনার ছবিটাও অদ্ভুত। কোন বাধা মানছে না কেতকী। কেতকীর হাতটাকে অতীন কত শক্ত ক'রে চেপে ধরেছে, তবুও ওষুধের গেলাস ছেড়ে দিচ্ছে না কেতকী—না না না, কখনই না। এই আবর্জনার বোঝা বইতে পারবো না।

আলো জ্বেলে বিছানার উপর বসে সিগারেট ধরাবার পর অতীনের জাগা চোখ দুটো যেন হঠাৎ শান্ত হয়ে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। মিথ্যে ভয় করছে অজয় মাতাল। কেতকীর প্রতিজ্ঞা আজ অতীনের কোন আবেদনের ভাংচিতে ভাঙবার নয়। এই স্বপ্নালু উদ্বেগের ছবিটা যে অতীনেরই মুক্তির ছবি। অতীনের জীবনের পথে কোন সমস্যার কাঁটা না রেখে সরে যাচ্ছে, একেবারে ফ্রী হয়ে যাচ্ছে কেতকী।

দক্ষিণ দরজার বাগানে, বড় বড় নিম আর অর্জুনের ডালে ও পাতার ঝোপে ছাতারে বুলবুলের দল লাফালাফি করে। বেলা হয়েছে। স্কুলে যাবার জন্য তৈরী হয়েছে কেতকী। সুধাময়ী অলসভাবে কিছুক্ষণ ঘরের দাওয়ার উপর বসে থাকেন, তারপরেই উঠে গিয়ে কমলবাবুকে যেন একটা প্রতিবাদ নিয়ে আক্রমণ করেন।—তুমি, তুমি কোন আক্কেলে বড়দির কথায় রেগে গিয়ে দক্ষিণ দরজার বাগানটাকে বেচে দেবার কথা বললে?

কমলবাবু হাসেন—দেনা শোধ করতে হবে তো, নইলে শেষ দিনে মহাদেবের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না।

সুধাময়ী—পাঁচশো টাকার জন্য অত বড় বাগানটাকে বেচবার দরকার হয় না। গাছের জঙ্গলগুলিকে বেচে দিলেই তো হয়।

আশ্চর্য হয়ে সুধাময়ীর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকেন কমল বিশ্বাস। সুধাময়ীর মনের ভিতর এ আবার কোন্ আশার উৎপাত দেখা দিল? সম্পত্তির জন্য সুধাময়ীর দরদ? কিসের জন্য? কার জন্য? এই বাড়ির অভিশপ্ত অদৃষ্টের যত ঘৃণা আর গ্লানির পঙ্কিলতার মধ্যে কি একটা মুক্তার ঝিনুক দেখতে পেয়েছে সুধা? তাই বোধহয় ঐ রোগা আর রক্তশূন্য চেহারার বুকের ভিতরে একটা সাধ উথলে উঠেছে। এই অদ্ভুত ক্ষতবিক্ষত অদৃষ্টের কোলে নতুন একটা মানুষ আসবে। হাসবে কাঁদবে খেলা করবে। বড় হয়ে উঠবে। বেঁচে থাকবে। তারই সুখের জন্য আজ সম্পত্তি রক্ষা করবার স্বপ্ন দেখছে সুধা। কি নির্লজ্জ স্বপ্ন!

—কি বলছো বল? আমার কথাটা কানে গেল কি? সুধাময়ীর প্রশ্নে চমকে উঠে উত্তর দিলেন কমলবাবু—বেশ, তাই হবে।

সারা দুপুরটা ঘর ও ঘরের বাইরে ঘুরঘুর ক'রে বেড়ালেন কমলবাবু। সুধাময়ীর স্বপ্নটাকে নির্লজ্জ বলে মনে করবার মত শক্তি আর পাচ্ছে না। ওটা স্বপ্ন নয়, নির্লজ্জও নয় ; ওটা যে একটা সুমধুর উপহারের প্রতিশ্রুতি। কেতকীর ছেলে হবে, এই ভাঙাবাড়ির ভাগ্যটাই যে মিষ্টি হয়ে যাবে। বুকব্যথার রোগে কাতর কমল বিশ্বাসের পাঁজরগুলিতে যেন ছোট ছোট দুটি কোমল পায়ের মায়াময় মিষ্টি লাথির ছোঁয়া লুটোপুটি করছে। সাধ উথলে উঠছে কমল বিশ্বাসেরও বুকের ভিতরে। শেষ দিনে চোখ বুজবার আগে চোখের সামনে সাক্ষাৎ মহাদেবকে দেখতে পেলে কি এমন আনন্দ আর কতটুকু আনন্দ হবে কে জানে? কিন্তু কেতকীর ছেলেকে দেখতে পেলে? সে আনন্দটাকে যেন এরই মধ্যে চোখে দেখতে পাচ্ছেন কমল বিশ্বাস।

সারা বিকেলটাও ঠাকুরদালানের বারান্দার উপর বসে রইলেন কমল বিশ্বাস আর সুধাময়ী। ভাঙা অদৃষ্টের এক বুড়ো আর এক বুড়ি যেন আবার এক চক্রান্তের আনন্দে বিভোর হয়ে ফিসফাস করে। দুটো আধ-মরা প্রাণের ভিতর থেকে সব মায়া নিংড়ে বের ক'রে একটা কচি প্রাণকে কোলে তুলে নেবার চক্রান্ত। দু'জনের মুখের ভাষাগুলিও যেন আধ-পাগলের প্রলাপের মত হয়ে যায়। গরু কিনতে হবে, প্রস্তাব করেন কমলবাবু। একটা ঝি রাখতে হবে, পরামর্শ দেন সুধাময়ী। কেতকীকে আর বেশি খাটতে দেওয়া উচিত নয়।

এই প্রসন্নতার মধ্যেও হঠাৎ আচমকা একটা ভয় পেয়ে অন্য সুরে কথা বলেন কমল বিশ্বাস—ভাবতে কেমন যেন ভয়-ভয় করছে, আর একটু আশ্চর্যও লাগছে সুধা। জগতের যত নিয়ম আর অনিয়মের পরীক্ষা করবার জন্য ভগবান যেন এই বিশ্বাস বংশটাকে আর এই ভাঙা-বাড়ির অদৃষ্টটাকে বেছে নিয়েছেন, কিন্তু...।

কমলবাবুর কথা ফুরোয়নি, ঠিক তখনই বাড়ি ফিরলো কেতকী, সঙ্গে একজন প্রৌঢ়া মহিলা।

প্রৌঢ়া মহিলার হাতে একটা ব্যাগ। হাই হিল জুতো পায়ে। ফুলহাতা জ্যাকেট গায়ে। বিনা পাড়ের সাদা সিল্কের শাড়ি আঁটসাট ক'রে পরা।

প্রৌঢ়া মহিলা সোজা টান হয়ে হাঁটেন, মচমচ ক'রে বাজে তাঁর জুতোর শব্দ। কমলবাবু ও সুধাময়ীর চোখের সামনে এগিয়ে এসে পা ঠুকে প্যারেডের হল্টের মত একটা ভঙ্গী ক'রে দাঁড়িয়ে পড়েন মহিলা। শরীরটাকে অস্থিরভাবে এপাশে-ওপাশে দোলাতে থাকেন। তারপরেই চেঁচিয়ে ওঠেন—আমার পরিচয় আমিই সংক্ষেপে সেরে দিচ্ছি। আমি ডাক্তার পুলকিতা দে, কেতকীর মামির খুড়তুতো বোন। ডু ইউ ফলো জেন্টেলম্যান এণ্ড লেডি?

ডাক্তার পুলকিতার মাথায় যদি ঐ অত বড় একটা খোঁপা না থাকতো, তবে বোধ হয় পৃথিবীর কারও বোন বলে সন্দেহ করবার মত অন্য কোন প্রমাণ ওর চেহারার মধ্যে পাওয়া যেত না। ডাক্তার পুলকিতার কাঁচা-পাকা জুলপি প্রায় চিবুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। কর্কশ রোমে ছাওয়া একটা ক্ষীণ গোঁফের রেখাও দেখা যায়। গলার স্বর যেমন মোটা তেমনই খসখসে। ডাক্তার পুলকিতার চোখে কাজলের টান আঁকা আছে, আর ঠোঁটে লাল রং-এর প্রলেপ।

ডাক্তার পুলকিতা বলে—রামকানাইবাবুর একটা মিসফরচুন এই যে ওঁকে একটা সুপরামর্শ দেবার মত ফেয়ার সেক্স ওঁর বাড়িতে নেই। কাজেই শেষ পর্যন্ত আমাকেই ডাকতে বাধ্য হয়েছেন।

একটা হাঁটুকে খুব জোরে বার পাঁচেক দুলিয়ে ডাক্তার পুলকিতা বলেন--থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। মনুদিকে দিয়ে যথাসময়ে রামকানাইবাবুকে সমস্যার খবরটা আপনারা জানিয়েছেন। দেরি করলে ভুল হতো।

--মনুদি কে? প্রশ্ন করেন কমলবাবু।

ডাক্তার পুলকিতা বলেন--মনুদি, যিনি আপনাদের রিলেশন, এবং আমাদেরও।

কমলবাবু—কিন্তু রামকানাইবাবুকে কোন খবর জানাবার জন্য আমরা মনুদিকে বলিনি।

ডাক্তার পুলকিতা—মোটকথা মনুদি জেনেছেন। তাই রামকানাইবাবুও জানতে পেরেছেন।

হাঁটু দোলানো থামিয়ে কেতকীর দিতে তাকিয়ে কাজল পরা চোখ বড় বড় ক'রে ডাক্তার পুলকিতা যেন একটা অর্ডার হাঁকেন।—কুইক কেতকী, কুইক! সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই। যাও, তৈরী হয়ে চলে এস।

ঘরের দিকে চলে যায় কেতকী। কমলবাবু প্রশ্ন করেন--কোথায় যাবে কেতকী?

ডাক্তার পুলকিতা—আমার সঙ্গে আমার ক্লিনিকে যাবে ; আমিই আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব। কোন চিন্তা করবেন না।

সুধাময়ীর গলা ভেদ ক'রে একটি করুণ আর্তনাদ ফুটে ওঠে--কেতকী যাবে না।

গালের মাংস কাঁপিয়ে প্রকাণ্ড একটা হাসি টেনে ডাক্তার পুলকিতা বলেন--নো নো নো, আপনার ভুল ধারনা। কোন চিন্তা করবেন না, কেতকী রাজি হয়েছে. রামকানাইবাবুর কাছ থেকে সমস্যাটা জানতে পেরে, তখুনি, সেই দুপুরেই সোজা ওর স্কুলে গিয়ে ওকে পাকড়াও করেছি। বেশি বোঝাতে হয়নি, মেয়েটার ভেরি স্ট্রং কমনসেন্স।

ক্ষীণ স্বরে আর্তনাদ করেন কমলবাবু--কি বললেন? কেতকী রাজি হয়েছে?

ডাক্তার পুলকিতা--ইয়েস স্যার। রাজি না হবার তো কোন কারণ নেই। এরকম ফুলিশ মাদারহুডের কোন অর্থ হয় না।

সুধাময়ী--কি বিশ্রী কথা বলছেন আপনি?

ডাক্তার পুলকিতা হাসেন--স্বামী ছাড়বে, অথচ সেই স্বামীরই সঙ্গে সম্পর্কের অবাঞ্ছিত পরিণাম আজীবন বোকার মত বইবে, এ তো হতে পারে না দিদি। শী মাস্ট বি ফ্রী।

দেরি করেনি কেতকী। ঠাকুরদালানের বারান্দায় স্তব্ধ হয়ে বসে আর ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে দেখতে থাকে ভাঙা-বাড়ির এক বুড়ো আর বুড়ি, কেতকী আসছে ; যদিও কেতকীর মুখটা বেশ গম্ভীর, কিন্তু কত স্বচ্ছন্দে ও কত সহজে তরতর ক'রে হেঁটে চলে আসছে।

ডাক্তার পুলকিতা বলেন--ব্যবস্থার কথাটা আপনাদের জানাবার ভার আমারই উপর চাপিয়েছে কেতকী। তাই আসতে হলো, নইলে স্কুল থেকেই কেতকীকে নিয়ে সোজা আমার ক্লিনিকে চলে যেতাম।

কেতকীর ইচ্ছা? বুড়ো আর বুড়ির দুটো রোগা গলা কেউ যেন শক্ত ক'রে টিপে ধরে বোবা ক'রে দিয়েছে। একটা আর্তনাদও করবার সাধ্য নেই। আপত্তি করবার কোন অধিকার নেই। অভিশাপ দেবার কোন যুক্তি নেই। বুড়ো আর বুড়ির জীবনের শেষ সাধের স্বপ্নকে রক্তাক্ত ক'রে কোন্ এক হাসপাতালের ডাস্টবিনে আবর্জনার মত ফেলে দেবার জন্য একটা উল্লাস শব্দ ক'রে চলে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, দেখতে থাকেন কমলবাবু আর সুধাময়ী, ডাক্তার পুলকিতার হাত ধরে চলে যাচ্ছে কেতকী। শুনতে থাকেন, ডাক্তার পুলকিতার জুতোর শব্দ মচমচ ক'রে বেজে বেজে চলে যাচ্ছে। কিন্তু নড়তে পারেন না কেউ, এক জোড়া পরম অসহায়তা শুধু স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

চলে গিয়েছে কেতকী, ডাক্তার পুলকিতার জুতোর মচমচ শব্দও আর শোনা যায় না, চটফট করেন, কাঁপতে থাকেন কমল বিশ্বাস। সুধাময়ী মেঝের উপর গড়িয়ে পড়েন। রোগা-রোগা দুটো মূর্তি যেন দুঃসহ শাস্তির ভার সহ্য করতে গিয়ে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে।

কলকাতার চৌরঙ্গি থেকে বেশি দূরে নয় ডাক্তার পুলকিতার ক্লিনিক। ডাক্তার পুলকিতা আদরের সুরে প্রশ্ন করেন--রেডি কেতকী?

সোফার উপর অনেকক্ষণ নিঝুম হয়ে বসেছিল কেতকী। প্রশ্ন শুনেই ছটফট ক'রে উঠে দাঁড়ায়। থরথর ক'রে গলার স্বর কাঁপিয়ে উত্তর দেয়--না পুলকমাসি।

--কেন, এত ভাবছো কি কেতকী?

--ভাবছি, না ভেবে পারছি না, বড় অন্যায় হচ্ছে পুলকমাসি।

--তার মানে?

--আমাকে ছেড়ে দিন, আমি চলে যাই।

--কি আশ্চর্য! চেঁচিয়ে ওঠেন ডাক্তার পুলকিতা।

--আমার একটুও আশ্চর্য মনে হচ্ছে না। আমি যাই।

--ভেবে দেখ কেতকী, বোকামি ক'রো না।

--ভেবে দেখেছি পুলকমাসি।

ডাক্তার পুলকিতার হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় কেতকী। জলে ভরে গিয়ে কেতকীর চোখ দুটো টলটল করতে থাকে।

--ও কি? বিরক্ত হয়ে ধমক দেন ডাক্তার পুলকিতা।

কেতকীর প্রাণটাও যেন এক বিচিত্র নির্লজ্জতার আবেগে চেঁচিয়ে ওঠে।--আমার জিনিস আমি হারাতে পারবো না।

হেসে ফেলেন পুলকিতা--তোমার জিনিস? ছিঃ, এরকম বাজে কথা কোন পাগল মেয়েও বলে না।

কেতকী--আমি পাগলের চেয়ে বেশি পাগল।

পুলকিতা ঠাট্টা করেন--ধর্মভীরুতা দেখাচ্ছো কেতকী?

কেতকী--ধর্ম কাকে বলে জানি না, আর ভীরুতাও কাকে বলে জানি না। আমি শুধু জানি...।

--কি জান?

পুলকমাসির এই রূঢ় প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় কেতকী। বোধ হয় উত্তর দেবার মত ভাষা খুঁজে পায় না। কেতকীর রক্তের যদি ভাষা থাকতো, নিঃশ্বাসের যদি সঙ্গীত থাকতো, মেয়েলি বুকের এই কোমলতার যদি স্তব থাকতো, তবে পুলকমাসিকে বুঝিয়ে দিতে পারা যেত, কেন মুক্তি পেতে চাইছে না মন।

পুলকিতা তাঁর খসখসে গলার স্বর আরও কর্কশ ক'রে কথা বলেন--যে স্বামীকে ভালবাসতে পারলে না, আদালতে দরখাস্ত ক'রে যাকে সরালে, তারই সঙ্গে সম্পর্কের একটা ইয়েকে..।

কেতকী বাধা দিয়ে বলে--স্বামীকে ছাড়িনি। স্বামী হতে জানে না, এরকম একটা লোককে ছেড়েছি।

পুলকিতা--না হয় তাই হলো, কিন্তু স্বামী পেতে কি সাধ হয় না?

কেতকী--না।

পুলকিতা--কেন?

কেতকী--স্বামী কা'কে বলে জানি না, বুঝতে পারি না।

পুলকিতা হাসেন--আমি বলতে পারি।

কেতকী হাসে--আপনি?

পুলকিতা ভ্রূকুটি করেন--কেন, আমি চিরকুমারী বলে কি নারী নই? তুমি কি আমাকে একটা পুরুষ ঠাওরালে কেতকী?

কেতকী--আপনি ভুল বুঝলেন, সেকথা আমি বলছি না।

পুলকিতা--গুরুজনের কথা যদি হেসে না উড়িয়ে দাও, তবে বলতে পারি।

কেতকী--বলুন।

পুলকিতা--স্ত্রীর মুখের দিকে মুখ তুলে তাকাতে ভয়...আই মীন লজ্জা করবে, সব সময় স্ত্রীকে শ্রদ্ধা করবে, স্ত্রী না বললে হ্যাঁ বলবার সাহস...আই মীন অভদ্রতা করবে না, সেই পুরুষকেই স্বামী বলে মনে করা যায়।

হেসে ফেলে কেতকী, কিন্তু ডাক্তার পুলকিতা কেতকীর সেই হাসিকে একবিন্দুও গ্রাহ্য না ক'রে অদ্ভুত উৎসাহিত স্বরে বলতে থাকেন--তুমিও ইচ্ছে করলে এরকম মনের মত স্বামী পেতে পার কেতকী।

কেতকী আরও জোরে হেসে ফেলে--ইচ্ছে করলেই বোধ হয় পাওয়া যায় না পুলকমাসি।

পুলকিতা--ইচ্ছে করলে তবে তো পাওয়া যাবে?

কেতকী হাসে—না হয় ইচ্ছে হলো, তারপর?

পুলকিতা—তারপর অজয়কে বিয়ে কর।

কেতকী—কা'কে?

পুলকিতা—মনুদির ভাসুরপো অজয়কে। তোমার লাইফের সব ট্রাজেডির কথা সে শুনেছে, তবু তোমাকে বিয়ে করতে রাজি আছে। এমন বেশি কিছু টাকা দাবি করেনি অজয়। যা চেয়েছে অজয়, রামকানাইবাবু তারও কিছু বেশি দিতে রাজি আছেন।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে, এবং সব কৌতুকের হাসি যেন এক নিঃশ্বাসে গিলে ফেলে পুলকিতার প্রস্তাবের রহস্যটাকে বুঝতে চেষ্টা করে কেতকী। পুলকিতা নিজেই এই রহস্যকে আরও পরিষ্কার ক'রে দেন—সেই জন্যেই বলছি, একেবারে ফ্রী হয়ে যাও কেতকী, তা'হলে অজয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে যেতে কোন বাধা থাকবে না।

পুলকিতার রোমশ হাতের সমাদরের স্পর্শ হঠাৎ একটা কঠোর ঠেলায় সরিয়ে দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায় কেতকী।—চললাম পুলকমাসি। একাই যেতে পারবো, আপনাকে আর সঙ্গে আসতে হবে না।

দরজার কাছে এসে পর্দা সরিয়ে একবার থমকে দাঁড়ায় কেতকী। তার পরেই ভয়-পাওয়া পাগলের মত দুড়দাড় ক'রে ছুটে চলে যায়।

অতীনের সুন্দর চেহারা আরও সুন্দর হয়েছে। সেই সঙ্গে চাকরির মাইনেটা আর একটু সুন্দর হয়ে উঠলে ভাল ছিল। কিন্তু হয়নি। মালিকের অনুগ্রহে মাইনেটা বেড়েও মাত্র দু'শো টাকা হয়েছে।

এই যে মাইনেটা বেড়ে দু'শো টাকা হয়েছে, এটাও কাজরীর চেষ্টার ফল। একটি মাত্র যে খরিদ্দার পার্টিকে একটা গাড়ি গছাতে পেরেছে অতীন, সে পার্টি হ'লো কাজরীদের পরিবারে উপকারী বন্ধু সেই অসিত দত্ত। কাজরী বেশ জোর তাগিদ দিয়ে চেপে ধরেছিল বলেই অসিত দত্ত খুশি হয়ে পার্ক স্ট্রীটের অটোমোবিল শো-রুমে এসে সেলসম্যান অতীন বিশ্বাসের মারফৎ একটি গাড়ি কিনে নিয়ে চলে গিয়েছে। তাই মালিক খুশি হয়ে অতীনের মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন। কাজরী যদি এই চেষ্টাটা না করতো, এবং অসিত দত্তের মত একটা খরিদ্দার পার্টিকে মালিকের সামনে উপস্থিত করবার সুযোগ না পেত অতীন, তবে চাকরিটাই থাকতো কিনা সন্দেহ। আশ্চর্য, কাজরী চৌধুরী নামে এই নারীর মন এবং সেই মনের ভালবাসা। অতীনের ভালর জন্য সব করতে পারে কাজরী।

কোন ঘিঞ্জি নেই, চারদিকটা বেশ খোলা-মেলা, এদিকে ক্যামাক স্ট্রীট এবং ওদিকে ল্যান্সডাউনের শেষ, যে জায়গাটাকে চোখে দেখলেও মন জুড়িয়ে যায়, সেই জায়গাতেই কাজরীর নামে একটা নতুন বাড়ির একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে অতীন। ভাড়া দেড়শো টাকা। ভাড়ার টাকার জন্য অতীনের দুশ্চিন্তা শান্ত ক'রে দিয়ে কাজরীই বলেছে—ভাববার কি আছে? ভাড়ার টাকাটা আমিই দেব। দেড়শো টাকা ভাড়া দেখে ভয় পাবার কিছু নেই।

মনে পড়ে অতীনের, কয়লাঘাটের সেই জাহাজ অফিসের সেকেণ্ড ক্লার্ক কাজরী চৌধুরীর মাইনে আরও একশো টাকা বেড়েছে। কাজরীর জীবনের এই মাইনে বৃদ্ধির আনন্দকে এই তো ক'দিন আগে কাজরী নিজেই আরও মধুময় ক'রে দিয়েছে। সেদিন মার্কেটে গিয়ে নিজে পছন্দ ক'রে একটা সোনার কাজ-করা আইভরির সিগারেট কেস কিনে নিয়ে এসে অতীনকে উপহার দিয়েছে কাজরী। বনের লতাও তার প্রিয় কোন শাল-পিয়ালকে এমন ক'রে এত একরোখা আগ্রহে জড়িয়ে ধরে থাকে না। কাজরী যেন তার জীবনের পরম-পাওয়া একটা ঐশ্বর্যকে দু'হাত দিয়ে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে রাখছে। মানুষের জীবনে সৌভাগ্য কত সুন্দর হয়ে দেখা দিতে পারে সেটা আজ নিজের জীবনের দিকে আর কাজরী

চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে প্রাণে বুঝতে পারে অতীন। কাজরীও যে অতীনের জীবনের এক পরম-পাওয়া উপহার।

আজ নয়, মাত্র এই একটি দিন পার হলেই কাল চন্দননগরের সন্ধ্যায় যখন আলো জ্বলে উঠবে, তখন পৃথিবীর চোখের সামনে কাজরী চৌধুরীর হাত ধরবে অতীন। কাজরীর বাবা সাধনবাবু নিজেই এসেছিলেন। তাঁর মেয়ের নতুন জীবনের বাসা হবে যে ফ্ল্যাট, সেই ফ্ল্যাটের সুশ্রী চেহারাটা দেখে এবং বেশ একটু খুশি হয়ে এই তো কিছুক্ষণ আগে চলে গিয়েছেন। জানিয়ে গিয়েছেন, তাহ'লে কালই বিয়ের দিন ঠিক করা হ'লো অতীন। আশা করি তা'তে তোমার কোন অসুবিধা হবে না।

—না, কোন অসুবিধা হবে না। তিন দিনের ছুটি নিয়েছে অতীন।

কিছুক্ষণ আগে একটা চিঠি এসেছে। টেবিলের উপর চিঠিটা পড়েছিল। কে জানে কার চিঠি! সাধনবাবু চলে যেতেই চিঠিটার দিকে তাকায় অতীন। কোন সন্দেহ নয়, বিরক্তিও নয়, নিজের মনের আবেশের সঙ্গে যেন নীরবে কথা বলতে বলতে আনমনার মত হাত বাড়িয়ে চিঠিটা তুলে নেয় অতীন।

চিঠি পড়ে অতীন। কিন্তু চিঠিটার মধ্যে বোধ হয় কালো ধোঁয়ার একটা ফোয়ারা আছে। পড়তে পড়তে অতীন বিশ্বাসের সুন্দর মুখের ওপর যেন কালির প্রলেপ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মনে হয়, আগামী কালের সন্ধ্যায় চন্দননগরের সাধনবাবুর বাড়িতে যে আলো হেসে উঠবে বলে তৈরী হয়েছে, সেই আলো নিভিয়ে দেবার চক্রান্ত নিয়ে কালি-ঝুলি ভরা একটা কুৎসিত ঝড়ের ফুৎকারও আড়ালে তৈরী হয়ে উঠেছে। চক্রান্ত এমন ভয়ানক হতে পারে, এর আগে কখনও কল্পনা করতে পারেনি অতীন। কাজরী চৌধুরীর মত নারীর দুঃসাহসময় ভালবাসাকেও ভয় পাইয়ে দমিয়ে দিতে পারে এই চক্রান্ত।

এই ভয়ানক বিষাদের আবেশ থেকে মনটাকে জোর ক'রে ছাড়িয়ে নিয়ে নতুন আতঙ্কটাকেই পালটা প্রশ্ন করে অতীন। কেন? ভয় পাবে কেন কাজরী? কাজরীর ভালবাসার দুঃসাহস এই চক্রান্তকেও অনায়াসে হেসে হেসে তুচ্ছ করতে আর একেবারে ব্যর্থ করে দিতে পারে। এরকম হতাশ হবার কোন অর্থ হয় না।

চিঠিটাকে পকেটে ফেলে সেই মুহূর্তে বের হয়ে যায় অতীন, এবং চন্দননগরের ভরা দুপুরের রোদের মধ্যে পথের উপর এসে দাঁড়াতে দু'ঘণ্টারও বেশি সময় লাগে না।

চিঠিটা অতীনের সিল্কের পাঞ্জাবির বুক-পকেটের ভিতরে খসখস করে। খসখস করে একটা দুঃসহ অস্বস্তি। শুনে চমকে উঠবে কি কাজরী? কেঁদে ফেলবে? কিংবা বজ্রাহত মানুষের মত স্তব্ধ হয়ে যাবে? অতীন বিশ্বাসের সুন্দর পৌরুষের একটা চুরির প্রমাণ পৃথিবীর চোখের সামনে যে একেবারে জীবন্ত ক'রে ধরে রেখেছে কেতকী! সে খবর শুনে সত্যিই কি মুখ ফিরিয়ে নেবে কাজরী?

চিঠি লিখেছেন মনুমাসি—অজয় ভাসুরপোর কাছ থেকে তোর ঠিকানা জানতে পারলুম। কেমন আছিস বাবা? কত মাইনে পাচ্ছিস?

শুধু এই পর্যন্ত লিখে যদি ক্ষান্ত হতেন মনুমাসি, তবে তো ভালই ছিল। অতীন বিশ্বাসের জীবনের স্বপ্ন এত আতঙ্কিত হয়ে উঠতো না।

মনুমাসি আরও লিখেছেন—একটু সময় ক'রে পঁয়তাল্লিশ নম্বর হালদার রোডে একবার আসতে পারবি কি? আমারই এক জায়ের বোনের বাড়ি। বোনঝি অমিয়া বি.এ. পাশ করেছে।

মনুমাসির এই বক্তব্যটাও ভয় পাইয়ে দেবার মত কোন বস্তু নয়। চিঠির শেষ দিকের কথাগুলিতে একটা আক্ষেপ করেছেন মনুমাসি—এ কি-রকম সমস্যা হলো অতীন? যে বউ তোকে ঘেন্না ক'রে আর আদালতে দরখাস্ত ক'রে সম্পর্ক ছাড়লো, সে কেন একটা বাচ্চা কোলে নিয়ে তোদেরই বাড়িতে এখনও পড়ে থাকে? তোদের সম্পত্তির কি গতি হবে?

পাগল কমল বিশ্বাস কি শেষ পর্যন্ত এরকম একটা বে-আইনী নাতিকে অত বড় সম্পত্তিটা লিখে দিয়ে যাবে?

বে-আইনি? মনুমাসির মন্তব্যটা পড়তেই যেন বুকের ভিতর একটা ধাক্কা খেয়েছিল অতীন। ভুল সন্দেহ করেছেন ; বৃথা আক্ষেপ করেছেন মনুমাসি, এবং তাঁর ভয়টাও বড় বেশি কুৎসিত।

যাক ; কিন্তু অজয় মাতাল তাহ'লে একটা মিথ্যা কথার সান্ত্বনা দিয়েছিল সেদিন। সিঁদুর মুছে দিয়ে সিঁথি সাদা ক'রে দিলেও রক্তের রং সাদা ক'রে দেয়নি কেতকী। অতীন বিশ্বাসের সুন্দর চেহারার একটা ক্ষণিকের ভুল, একটা হঠাৎ লোভের মত্ততাকে সেদিন চুপ ক'রে সহ্য করলেও, কেতকীর জীবনের আক্রোশটা চুপ ক'রে থাকেনি। প্রতিশোধ নিয়েছে কেতকী। কাজরী চৌধুরীর মত সুন্দরতার নারীকে ভালবাসে যে মানুষ, সেও যে কেতকীর মত কুরূপার দেহের কাছে পৌরুষ উৎসর্গ ক'রে দিতে পারে, তারই প্রমাণ কোলে নিয়ে বসে আছে কেতকী। আজ না হোক কাল, না হয় এক মাস কিংবা এক বছর পরে কাজরীও শুনতে পাবে। তখন কাজরীর কাছে মাথা হেঁট করার চেয়ে এখনও মাথা হেঁট ক'রে ফেলাই ভাল। ঘৃণা যদি করতে চায় কাজরী, তবে এখনই করুক। কাজরীর কাছে কোন ভুল গোপন ক'রে লাভ নেই।

মানুষের কোন শুভ আশার পথ ফুলছড়ানো পথ নয়। সে পথে কাঁটা থাকে এবং কাঁটার মুখে বিষও থাকে। কিন্তু ভয় করলে এগিয়ে যেতে পারা যায় না। ভয় ক'রে লাভ নেই।

বুঝতে পারেনি অতীন, কখন এতটা পথ হেঁটে পার হয়ে একেবারে কাজরীদের বাড়ির বারান্দার কাছে সে এগিয়ে এসেছে। চোখ তুলে তাকাতেই দেখতে পায় অতীন, সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে হাসছে কাজরী।—তুমি যে আজ এই দুপুরে হঠাৎ এসে দেখা দেবে, আমি ভাবতে পারিনি অতীন!

অতীনের মুখে শুকনো হাসি--আমিও ভাবতে পারিনি যে, হঠাৎ আজ এখানে তোমার কাছে আসতে হবে। কিন্তু না এসে পারলাম না, কারণ...।

কাজরীর পাশে পাশে হেঁটে ঘরের ভিতরে ঢুকেই কাজরীর হাতে মনুমাসির চিঠিটা তুলে দিয়ে চেয়ারের উপর বসে পড়ে অতীন। অতীনের সুন্দর চেহারাটা হঠাৎ অলস ও অবশ হয়ে যায়।

কাজরী চৌধুরী সেই চেয়ারের হাতলের উপর আলগা হয়ে বসে, এবং অতীনের কাঁধের উপর একটি হাতের ভর এলিয়ে দিয়ে চিঠি পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে গম্ভীর হয়ে যায় কাজরীর মুখ, এবং গম্ভীর হতে হতে সেই মুখই আবার ঝিক ক'রে হেসে ওঠে। চিঠিটাকে একটা লঘু অবহেলার আবেগে দুমড়ে মুচড়ে অতীনেরই সিল্কের পাঞ্জাবির বুক-পকেটের ভিতরে গুঁজে দেয় কাজরী।—এ চিঠি আমাকে দেখিয়ে তোমার কি লাভ হলো অতীন?

অতীন--লাভ এই যে, তোমার কাছে আমার কোন ইতিহাস গোপন রইল না।

একটু আশ্চর্য হয় কাজরী--তোমার ইতিহাস মানে? কেতকী যদি লুকিয়ে লুকিয়ে কারও সঙ্গে একটা কীর্তি ক'রে একটা ছেলের বে-আইনী জন্মের জন্যে দায়ী হয়, তবে...তাতে...।

ভীরু চোখ দুটোকে কাঁপিয়ে ক্ষীণ আর্তনাদের মত স্বরে হঠাৎ আপত্তি ক'রে ওঠে অতীন--না না না, বে-আইনী নয় ; তুমি ভুল বুঝেছ কাজরী।

চমকে ওঠে কাজরীর চোখ--তার মানে...সত্যি তোমার সঙ্গে কেতকীর সম্পর্ক হয়েছিল?

অতীন--হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে কি-যেন ভাবে কাজরী, অকারণে হাত দু'টোকে দু'বার ছটফটিয়ে দু'বার খোঁপাটাকে ভাঙে এবং দু'বার নতুন ক'রে বাঁধে। অপলক চোখের গভীর দৃষ্টি দিয়ে অতীনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপরেই কাজরীর সেই ক্ষণচিন্তিত মুখের

গভীরতা গনগনে আগুনের আভা ছড়িয়ে হঠাৎ হেসে ওঠে। কাজরী বলে—এসব ইতিহাস নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার কোন দরকার হয় না অতীন।

অতীনের দু'চোখ ছাপিয়ে এবং বোধ হয় বুক ছাপিয়েও সেই বিস্ময় নতুন ক'রে জেগে ওঠে। এ কি বলছে কাজরী? নির্মেঘ আকাশের মত উদার এমন একটা মন পাওয়া কি কোন মেয়ের পক্ষে সত্যিই সম্ভব? কাজরী যে সেই অসম্ভবকে একেবারে একটা সহজ বাস্তবের মত সত্য ক'রে দিয়েছে।

নিজের মনের আবেগে বলতে থাকে কাজরী—কেতকীর ইচ্ছাকে তুমি তুচ্ছ করতে পারনি, সেটা তোমার ভুল নয়, দুর্বলতাও নয় অতীন। সেটা তোমার এই সুন্দর চেহারার দয়া।

কাজরীর মুখের দিকে তাকায় অতীন। বিহ্বল হয়ে গিয়েছে কাজরীর টানা-টানা কালো চোখ, যেন থমথম করছে কাজরীর বুকের ভিতর একটা নিঃশ্বাসের ঝড় ; বিচিত্র এক বেদনার রসে ভিজে গিয়ে চকচক করছে কাজরীর ঠোঁট দুটি। অতীনের ঐ সুন্দর বলিষ্ঠতার অফুরান দয়ার ঐশ্বর্যকে যেন অভিনন্দিত করছে কাজরী।

কিন্তু অতীনের জীবনের সবচেয়ে বড় গর্বটা আজ কাজরী চৌধুরীর এত বড় অভিনন্দনেও যেন খুশি হয়ে উঠতে পারছে না। কেতকীর ইচ্ছা? এর চেয়ে বড় মিথ্যা যে আর কিছু হতে পারে না। কি ভয়ানক ভুল ধারণা করেছে কাজরী!

কাজরীর ধারণার এই ভুল এখনি ভেঙে দিতে পারা যায়। কিন্তু ভেঙে দেওয়া উচিত হবে কি? কুণ্ঠাভীরু একটা বাধা এসে অতীনের মুখের ভাষা চেপে ধরছে। কেতকী নামে এক কুৎসিতার সেই ভয়ানক অনিচ্ছার গৌরবটাই যেন ঠাট্টা ক'রে অতীনের পাঁজরের আড়ালে কাঁটার খোঁচার মত খচখচ ক'রে বাজছে। যদি সাহস থাকে, তবে তোমার ভালবাসার নারীর কাছে সেই সত্যি কথাটা বলে দাও দেখি? ফাঁকি রাখা তো উচিত নয়।

বলবার জন্য প্রস্তুত ছিল না অতীন, কিন্তু সত্যি কথাটা চেঁচিয়ে বলে দেবার জন্য অতীনের মনের একটা মাতাল দুঃসাহস বোধ হয় সেই মুহূর্তে পাগল হয়ে যায়। কেতকীর এই মিথ্যা অপবাদটাই যেন দুঃসহ জ্বালায় জ্বলে উঠেছে। চেঁচিয়ে ওঠে অতীন—না কাজরী, কেতকীর কোন ইচ্ছা ছিল না।

—সে কি? কাজরীও চমকে ওঠে।

—হ্যাঁ, নিতান্ত আমারই ইচ্ছার ভুলে...হঠাৎ রাগের মাথায়...পাগল হয়ে—কোন আপত্তি গ্রাহ্য না ক'রে...।

মাথা হেঁট করে অতীন। যেন কারও কাছে ক্ষমা চাইছে অতীন।

অনেকক্ষণ কথা বলে না কাজরী, এবং অতীনও অনেকক্ষণ চোখ তুলে তাকায় না। শুধু কল্পনা করতে পারে অতীন, গোপন ইতিহাসের শেষ কথাটা শোনবার পর কাজরী চৌধুরীর মুখের হাসিতে সেই অভিনন্দনের রঙীন আভা এতক্ষণে দুঃসহ ধোঁয়ার জ্বালায় একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে। এই মুহূর্তে কাজরী চৌধুরী তার আহত ভালবাসার শেষ আর্তনাদ শুনিয়ে দিয়ে অতীনের ছায়ার স্পর্শ থেকে চিরকালের মত দূরে সরে যাবে।

চমকে ওঠে অতীন, এবং বিশ্বাসই করতে পারে না, এমন অসম্ভবও সত্য হতে পারে। অতীনের মাথা দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে কাজরী, এবং একেবারে অতীনের চোখের কাছে চোখ এগিয়ে দিয়ে হাসছে। ভয় পায়নি, একটুও ব্যথিত হয়নি ; কোন আতঙ্ক বা বিমূঢ়তার, কোন ঘৃণাহত ধারণার বেদনা ও লজ্জা বা বিরক্তির, কোন কুপিত ধিক্কারের চিহ্ন নেই কাজরীর চোখে।

বিস্মিত হয়ে কাজরীর সেই বিলোড়িত মুর্তির, সেই নর্মাকুল শরীরের অদ্ভুত এক স্পর্শের স্বাদ বরং অনুভব করতে থাকে অতীন। কাজরীর দেহের সকল স্নায়ু ও শিরায় যেন একটা

উল্লাস গুপ্ত হয়ে উঠেছে। শুনতেও পায় অতীন, কাজরী বলছে—ওটা তোমার ভুল নয় অতীন। ওটা তোমার এই বত্রিশ বছর বয়সের সুন্দর ক্ষমতা। তুমি জান, কাজরী চৌধুরী কেন তোমাকে দেবতা বলে মনে করে।

অতীন—তুমি আশ্চর্য করলে কাজরী!

কাজরীও তার উতলা নিঃশ্বাসের সবচেয়ে বড় আশার স্বপ্নকে যেন আরও মাতিয়ে দিয়ে অদ্ভুত এক দর্পবিহুল স্বরে বলতে থাকে—আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তোমার কোন ভুলের গল্প শুনে আমার কোন লাভ নেই। আমার কাছে তুমি নির্ভুল, এই যথেষ্ট। আমার জীবনে তুমি হ'লে তুমি। আর কিছু বুঝি না, জানতেও চাই না।

কাজরীর হাত ধরে অতীন। কাজরী ভ্রূভঙ্গী করে। এবং নিবিড় এক লজ্জার আবেশে অভিভূত হয়ে, অদ্ভুত একটি অভিমানিত সুন্দরতায় রক্তিম হয়ে ছোট একটি সুস্মিত ভর্ৎসনাও ধ্বনি করে—তুমিই তো আমার এই পাগল দশা করেছ।

মনে পড়ে অতীনের, আগামী কালের সন্ধ্যার বুকে সে উৎসবের ছবিটা দেখা দেবে। এইখানে এসে ঠিক এইভাবে কাজরীর হাত আবার ধরতে হবে। হেসে ওঠে অতীন—আপাতত...আসি তাহ'লে কাজরী!

কাজরী হাসে—এস!

যে মামা এই দু'টি বছর ধরে তার বোকা ও একগুঁয়ে ভাগ্নীর উপর বারবার অনেকবার রাগ করেও সে মেয়ের জন্য তাঁর প্রবল স্নেহের আকর্ষণ তুচ্ছ করতে পারেননি, এবং স্নেহের সম্পর্কও ছিন্ন করতে পারেননি, সেই মামা এইবার ঘৃণা ক'রে সম্পর্কটাকে একেবারে ভুলে গেলেন। রাগ করতেন যখন, তখন তবু দু'একটা চিঠি লিখে মাঝে মাঝে খোঁজ নিতেন। কিন্তু আর নয়, রামকানাইবাবুর কাছ থেকে কেতকী আর কোন চিঠি পায়নি। ঘৃণা ক'রে চিঠি লেখাই বন্ধ ক'রে দিয়েছেন।

মামার কথা মনে পড়লে কেতকীর মনের ভিতরটা দুঃসহ ব্যথায় কাতরাতে থাকে ; কিন্তু উপায় নেই, মামার উপর মনের সব শ্রদ্ধা আর মায়া রেখেও, মামার স্নেহের মূল্য একটুও বিস্মৃত না হয়েও কেতকী মামার এই ঘৃণার অর্থ বুঝতে পারে না। কেতকীর ভালর জন্য মনুমাসি রামকানাইবাবুকে একটা উপায় বলে দিয়েছেন, পুলকমাসিও রামকানাইবাবুকে গ্যারেন্টি দিয়ে সেই উপায়ের পথে কেতকীকে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। রহস্যটা এখন আর কেতকীর কাছে রহস্য নয়, বুঝতে কিছু বাকি নেই কেতকীর। কেতকীর ভাল হবে, এই বিশ্বাস ছিল বলেই না মামা দু'জন উপকেরে মাসির পরামর্শে মত দিয়েছেন। কিন্তু এত ঘৃণা করলেন কেন মামা? স্বামীহীনা মেয়ের কোলে একটা শিশুকে দেখতে পাওয়া কি এতই ঘৃণার ব্যাপার!

নারকেল গাছের পাতা ঝুরঝুর শব্দ করে। স্নিগ্ধ বাতাস ফুরফুর ক'রে উড়ে বেড়ায়। ঘরের ভিতর জানালার কাছে একটা চৌকির উপর বসে কেতকী তার নিজেরই মায়ালস নতুন দেহের ভার ঝুঁকিয়ে দিয়ে একটা শিশুর ঘুমন্ত চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এই তো, এই তুলতুলে একটা প্রাণময় কোমলতাকে ভয়ানক একটা সমস্যা বলে কেন ভয় পেলেন আর ঘেন্না করলেন মামা? কেতকীর ছেলে, শুধু এই নামের গৌরব নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না কি পৃথিবীর এই একটা প্রাণ? মামারই বা কিসের ক্ষতি?

সুধাময়ীর মোমের মত সাদাটে চেহারাটা বেশ লালচে হ'য়ে উঠেছে বলে মনে হয়। রক্তশূন্যতার রোগটা কি সেরে গেল? সুধাময়ীর বুড়ো বয়সের চেহারার ভিতর থেকে যেন জোর ক'রে বেঁচে থাকবার একটা আবেগ রঙীন হয়ে উথলে উঠেছে। রান্না-বান্না থেকে সুরু করে কাপড়-কাচা পর্যন্ত, দু'বেলা ঘর-নিকানো এমন-কি কেতকীর জন্য চা তৈরী করার

কাজটা পর্যন্ত নিজের হাতেই সেরে দেন সুধাময়ী। বুড়ো বয়সের ঐ রোগা-রোগা হাড় থেকে যেন নতুন ক'রে শক্ত খাটুনির শক্তি উপচে পড়ছে।

সত্যিই একটা গরু কিনে ফেলেছেন কমলবাবু। দু'টো বাগানের সব বাঁশঝাড় আর গোটা ত্রিশেক নিম আর অর্জুন বিক্রি করে দিয়েছেন। মনুমাসির পাওনা পাঁচশো টাকা মনি-অর্ডার ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছেন।—বাস, আর আপনি দয়া ক'রে এই বাড়িতে আসবেন না, এই কথাটাও মনুমাসিকে চিঠিতে লিখতে চেয়েছিলেন কমলবাবু। কিন্তু আপত্তি করেছেন সুধাময়ী—থাক্, বড়লোককে চটিয়ে লাভ নেই, চটে গেলে আবার কোন্ ক্ষতি করতে উঠে-পড়ে লেগে যাবেন, কে জানে!

শুধু ঐ বড়দিকে নয়, সারা জগৎটাকে আজকাল বড় ভয় করেন সুধাময়ী। ঘেন্না ক'রে সবাই দূরে সরে থাকুক, কেউ যেন এই ভাঙা-বাড়ির স্বপ্নের ঘরে উঁকি দিতেও না আসে। নজর দেবে, নজর দেবে, এই ভাঙা-বাড়ির এত সুখ ওদের চোখে সইবে না। নিন্দে রটছে চারদিকে, ভয়ানক নিন্দে, রসিকপুরের নতুন-পাড়ার ভদ্রলোকেরা সামাজিক বয়কট করবে বলে হরিসভার প্রাঙ্গণে বসে আলোচনা করেছেন, এসব খবর শুনে খুশিই হন সুধাময়ী।

নতুন-পাড়ার পাঁচুর কাছ থেকেও মাঝে মাঝে নানারকম খবর শোনেন কমলবাবু, এবং শুনেই হেসে ফেলেন। পাঁচু বলে—বাবুরা আপনার ওপর বড় রাগ করছেন কর্তা।

—কেন?

—আপনি নাকি সম্পত্তি বেচবেন না?

—না।

—যুধিষ্ঠিরবাবুকে নাকি আপনি ধমক দিয়েছেন?

—হ্যাঁ, সম্পত্তি বেচে দেবার জন্য আমাকে পরামর্শ দিতে এসেছিল যুধিষ্ঠির।

—তাই ওনারা ক্ষেপেছেন।

বাড়িয়ে বলেনি পাঁচু। ভদ্রলোকেরা রেগে ক্ষেপেই গিয়েছেন। তার প্রমাণ, নিকুঞ্জবাবুর মেয়ের বিয়েতে সারা রসিকপুরের মানুষ নিমন্ত্রিত হ'লো, শুধু বাদ পড়লো রসিকপুরের এই ভয়ানক ভাঙাচোরা কুৎসিত বাড়ির মানুষগুলি।

দুঃখের দিনে আর সুখের দিনে যে মস্ত একটা পার্থক্য আছে, সেই সত্য মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন কমলবাবু।—আজকাল দিনগুলি যে দেখতে দেখতে কেটে যাচ্ছে সুধা? বুঝতেই পারিনি যে দাদার বয়স ছ'মাস হতে চললো!

হ্যাঁ, দিনগুলি কোন আঘাত না দিয়ে তরতর ক'রে পার হয়ে যাচ্ছে। টাকা-পয়সার যখনই যা দরকার হয়েছে, কেতকীই দিয়েছে। বাগানের গাছ বেচবার আর দরকার হয়নি। সেজন্যও কোন দুর্ভাবনা নেই। এই ভাঙাবাড়ির সংসারের দায়-দাবি আর ক্ষুধা-তৃষ্ণার জন্য গাদা-গাদা টাকার দরকার হয় না। যেটুকু দরকার, সেটুকু কেতকীই যুগিয়ে যাচ্ছে। নিশ্চিন্ত হয়ে, এই অদ্ভুত সৌভাগ্যের আবেশে বিভোর হয়ে আছেন ক[illegible]ল বিশ্বাস ও সুধাময়ী।

এই নিশ্চিন্ততার আবেশ ঘট ক'রে ভাঙা-পাঁজরের ব্যথার মত বেজে উঠতে পারে কোনদিন, ঐ সন্দেহটা যাদের মনের ভিতর মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, তারাই ভয় পেয়ে চমকে উঠলো সেদিন, যেদিন সারা সকালটা গম্ভীর হয়ে রইল কেতকী, কারও সঙ্গে একটা কথাও বললো না।

বাজারের পয়সা চাইবার জন্য অন্য দিনের মত অক্লেশে, সহজ ও স্বচ্ছন্দে অভ্যাসের আবেগে কেতকীর সামনে গিয়ে সেই সকালেও যখন দাঁড়ালেন কমলবাবু, তখন কেতকীই সেই গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর ক'রে বলে—টাকা নেই! স্কুলের কাজে জয়েন না করলে ছুটির মাসের মাইনেগুলিও পাওয়া যাবে না!

ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করেন কমলবাবু—স্কুল কমিটি কি রাগ ক'রেছে?

কেতকী--হ্যাঁ। প্রথমে যে চার মাসের ছুটি মঞ্জুর ক'রেছিল তার মাইনে দিতে রাজি হয়েছে। তার পরেও চার মাসের বিনা-মাইনের ছুটি মঞ্জুর করেছে। কিন্তু আর ছুটি দিতে রাজি নয়। এইবার কাজে না গেলে চাকরিও থাকবে না, আর ঐ ছুটির মাসের মাইনেও দেবে না।

স্তব্ধ হয়ে, আর সেই পুরনো অসহায়তার দৃষ্টিটাকে একেবারে অপলক ক'রে তাকিয়ে থাকেন কমলবাবু। কেতকী বলে--আমার হাতে যা জমা ছিল, সব ফুরিয়েছে।

কমলবাবু--কবে কাজে জয়েন করতে বলেছে ওরা?

কেতকী--আজই শেষ তারিখ।

কোন উত্তর না দিয়ে চলে আসছিলেন কমলবাবু। কেতকীই বলে--আর একটা কথা।

--কি?

--মামা একটা চিঠি লিখেছেন।

--কি লিখেছেন? দুই চোখের ভীরুতা সামলাতে সামলাতে ক্ষীণস্বরে প্রশ্ন করেন কমল বিশ্বাস।

কেতকী হাসে--মামা আমাকে ক্ষমা করেছেন।

কমলবাবু আতঙ্কিতের মত চমকে ওঠেন--তার মানে?

কেতকী--বেবিকে নিয়ে আমি যেন এইবার তাঁরই কাছে গিয়ে থাকি, এই তাঁর ইচ্ছা। আমাকে আর চাকরি করতে দিতে তিনি চান না।

কমলবাবু--তুমিও কি চাও না?

উত্তর না দিয়ে কেতকী তার চোখ দুটো আরও বিমর্ষ ক'রে একেবারে আনমনার মত আকাশকোণের সাদা সাদা মেঘগুলির দিকে তাকিয়ে থাকে। কমলবাবুর ব্যগ্র ব্যস্ত আর ভীত কৌতূহলের প্রশ্নটা যেন শুনতেই পায়নি কেতকী।

আর কি শোনবার আছে? কোন কথা না বলেও যে একটা স্পষ্ট ও কঠোর উত্তর শুনিয়ে দিচ্ছে কেতকী। মাথা হেঁট ক'রে আস্তে আস্তে চলে যান কমলবাবু।

এবং তার পরেই এই ভাঙা-বাড়ির অদৃষ্টের সেই চিরকেলে দৃশ্যটাই দেখা দেয়। ঠাকুরদালানের বারান্দার উপর এই ভগ্ন বিগলিত ও অভিশপ্ত এক রাজবাড়ির স্বার্থপর দুটি আত্মার চক্রান্তের দৃশ্য। মুখোমুখি বসে থাকেন কমলবাবু ও সুধাময়ী। চাপাস্বরে আলোচনা করেন। কি হবে উপায়, যদি কেতকী চলে যায়? ওকে আটকে রাখবার কি কোন উপায় নেই? কেতকীর ঐ হঠাৎ বিদ্রোহকে শান্ত করবার কি কোন কৌশল নেই?

কমলবাবু--কেতকী অনায়াসে চাকরিটা করতে পারতো সুধা।

সুধাময়ী--ইচ্ছে নেই যখন, তখন আর কি করা যাবে বল?

কমলবাবু রাগ করেন--তুমি না বুঝেসুঝে ওরকম বড় বড় কথা বলো না সুধা। কেতকী চলে গেলে তোমার আমার কি দশা হবে, সেটা বুঝতে পারছো?

সুধাময়ী হাসেন--আমার কথা ছেড়ে দাও, আমার জন্য কোন ভাবনা ভাবতে হবে না, আমার প্রাণ পাথর হয়েই গিয়েছে।

কমলবাবু--কি বললে?

সুধাময়ী--দাদাটার জন্যে কেঁদে কেঁদে তুমি যে নিজের কি দশা করবে, তাই ভেবে...।

চেঁচিয়ে ওঠেন কমলবাবু--আবার একটা বড় কথা, একেবারে মিথ্যে কথা বলে ফেললে সুধা। ওসব কথা নয়।

সুধাময়ী--তবে কি?

কমলবাবু--না খেয়ে মরতে হবে।

নিজেদের চিনতে আর ভুল না করে ভাঙা-বাড়ির বুড়ো আর বুড়ী। এই দুই অক্ষম অসহায় আর নিঃস্ব জীবনের ভিতরে কোন কপট বড়াই আর মুখর হয়ে ওঠে না। নতুন-

পাড়ার হরিসভার প্রাঙ্গণে যে নিন্দা মুখর হয়ে ওঠে, সে নিন্দা শুনে রাগ করবার শক্তি নেই। কারণ নিন্দাকে মিথ্যে বলে মনে করেন না কমলবাবু, এবং তাঁর স্বার্থপর জীবনের চিরকেলে চক্রান্তের সঙ্গিনী ঐ সুধাময়ী। কোন এক ভদ্রলোকের বোকা মেয়েকে নকল আদরে বশীভূত ক'রে, মেয়েটার সকল রকম সর্বনাশ ঘটিয়ে, এবং সেই মেয়েটারই রোজগারে মহাসুখে আছে ঐ বুড়ো ঘুঘু ও তার বুড়ী। অভিযোগটা শুনতে খারাপ, কিন্তু একটুও মিথ্যে তো নয়।

কমলবাবু বলেন--তুমি একবার হাত ধরে কেতকীকে সেধে দেখ সুধা।

সুধাময়ী--যদি তাতে না মানে?

কমলবাবু--তারপর তো আমি আছিই, আমার চোখের জল দেখে কি কেতকী ঘাবড়ে যাবে না?

এই অদ্ভুত চক্রান্তের পরেই চোখ দুটোকে নিংড়ে দিয়ে একটা ছলছল ভাব ফুটিয়ে তোলবার জন্য যখন চেষ্টা করছেন কমল বিশ্বাস, ঠিক তখন, কেতকী কোথা থেকে আচমকা এসে সামনে দাঁড়ায়।--আপনি এবার ঘরের ভেতরে যান মা। বেবি একা আছে।

সুধাময়ী ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে এবং দুঃসহ একটা আতঙ্ক বুকের কাছ থেকে জোর ক'রে ঠেলে দিয়ে প্রশ্ন করেন--তুমি কোথায় চললে!

কেতকী--দশটা প্রায় বাজে, আমি স্কুলে চললাম।

কমলবাবু--তুমি যে এখনই বললে...।

কেতকী হাসে--আমি কিছু বলিনি ; মামা তাঁর চিঠিতে বলেছেন। কিন্তু আমি...আমাকে চাকরি করতেই হবে।

বাসনা এসেছে। শুধু চোখের দেখা নয়, শুধু একটি চরম কথা জানিয়ে যেতে। এই শেষ, আর এই বাড়িতে আসতে পারবে না বাসনা, যদি রামকানাইবাবুর ঐ ভাগ্নী এই বাড়ি থেকে চলে না যায়। এলাহাবাদের পার্থবাবু, বাসনার শ্বশুর একেবারে দিব্যি দিয়ে নিষেধ ক'রে দিয়েছেন, বাপ-মার কাছে গিয়ে শুধু একটা চোখের দেখা দিয়ে আসতে পারো বউ-মা, কিন্তু সাবধান, ভুলেও জলগ্রহণ করতে পারবে না।

কলকাতার সেই অশ্বিনীবাবুর বাড়িতে এসে উঠেছে বাসনা আর বাসনার স্বামী অজিত। বুড়ো শ্বশুর শাশুড়ীর কাছে একবার চোখের দেখা দিতে অজিতের ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু বাসনা বলে, একেবারে স্পষ্ট ভাষায় গলা খুলে এই ভাঙা-বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে কমলবাবু আর সুধাময়ীকে শুনিয়ে দেয়--সে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু আমিই আপত্তি করেছি। রামকানাইবাবুর ভাগ্নী যতদিন এই বাড়িতে থাকবে, ততদিন কোন্ সাহসে ওকে এখানে আসতে দিতে পারি বল?

চা আনে কেতকী। বাসনা চেঁচিয়ে আপত্তি করে--তোমার ছোঁয়া চা খাওয়া দূরে থাক্, এই বাড়ির ঠাকুর ঘরের জল খেতেও আমার মানা আছে।

বাসনার মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু আশ্চর্য হয়ে, বাসনার এই বিদ্রোহের কোন অর্থ না বুঝতে পেরে, দুটো হতভম্ব বোকা চোখ নিয়ে, চায়ের পেয়ালা হাতে তুলে নিয়ে চলে যায় কেতকী।

সুধাময়ী বলেন--এরকম একটা পাগলামি করবার জন্যই কি তুই এতদিন পরে দেখা দিতে এলি বাসু? ছিঃ!

বাসনা চিৎকার করে--ছিঃ কর নিজেকে! ওরকম একটা মেয়েমানুষের ছোঁয়া জল খেতে তোমাদের লজ্জা করে না?

কমল বিশ্বাসের চোখ ধিক ধিক করে।--কিসের রে বাসু?

বাসু--শুনতে পাও না, চারদিকের মানুষ কি বলছে? এলাহাবাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেল যে

কেলেঙ্কারির কথা, সেটা কি তোমরা জান না?

কমলবাবু আশ্চর্য হন—কিসের কেলেঙ্কারি, কার কেলেঙ্কারি?

বাসনা—রামকানাইবাবুর ভাগ্নীর। স্বামীর সঙ্গে কোন দিন সম্পর্ক হয়নি, যে নিজে দরখাস্ত ক'রে এই কথা স্বীকার ক'রে আদালতের সাহায্য নিয়ে স্বামীকে তাড়িয়েছে, সে মেয়েমানুষের কোলে ছেলে আসে কোথা থেকে? তোমরা পাগল হয়ে গিয়েছ, নইলে এত বড় অপমানেরও বোধ নেই কেন? কী অদ্ভুত কাণ্ড! একটা বে-আইনী ছেলেকে নাতি-নাতি ক'রে আদর দিয়ে...ছি ছি...তোমাদের মাথা খারাপ হয়েছে।

সোজা টান হয়ে উঠে দাঁড়ান কমলবাবু। দু'পা এগিয়ে এসে বাসনার মুখের দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে বলেন—তোর এখানে আসাই উচিত হয়নি বাসু। ভুল করেছিস।

বাসনার চোখ ছলছল করে—তা তো জানিই। কিন্তু তোমাদেরই জন্য মায়ায় পড়ে এই ভুল করেছি।

অশ্বিনীবাবুর গাড়িটা বাগানের পথের উপরেই দাঁড়িয়েছিল। বাসনাও আর এক মিনিট দেরি করে না। চোখ মুছতে মুছতে অস্পৃশ্য বাড়ির ভাঙা সিঁড়ি ধরে আস্তে আস্তে নেমে, তারপর প্রায় একটা দৌড় দিয়ে গাড়ির দিকে চলে যায়।

ঘরের ভিতর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল কেতকী, যদিও আধঘণ্টা হলো চলে গিয়েছে বাসনা। বুঝতে পারে কেতকী, তার কান দু'টো একটা আগুনের জ্বালা লেগে পুড়ছে। বাসনার মুখের ঐ কথাটা যেন সারা জগতের চিৎকার হয়ে বাজছে—বে-আইনী ছেলে।

অভিযোগটা মিথ্যা? বাসনা অনেক কিছুই জানে না, তাই ঐ ছেলের প্রাণটাকে বে-আইনী বলে গাল দিয়েছে। কিন্তু সব কিছু জানলেও যে ঐ একই ধিক্কার দিত বাসনা। কেতকীর প্রাণ যাকে স্বামী বলে স্বীকার করেনি, এমনি একটা পুরুষের দেহের দস্যুতাকে ভয় পেয়ে সহ্য করতে হয়েছিল। কেতকীর ছেলে হলো কেতকীর ঐ একটি ক্ষণের আতঙ্কিত ও অসহায় জীবনের সহ্যের সৃষ্টি। মিথ্যে নয়, নতুন-পাড়ার পাঁচুর কোলে চড়ে বেড়াতে চলে গেল ঐ যে বেবি, সে শুধু কেতকীরই ছেলে। বেবির বাপ নেই।

বাসনার ধিক্কারকে নয়, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কেতকী তার নিজেরই মনের একটা কল্পনাকে যেন দু'চোখের যত ভয় নিয়ে দেখতে থাকে, আর মাঝে মাঝে শিউরে ওঠে। বেবিটা যেন অনেক বড় হয়ে উঠেছে, স্কুলে ভর্তি হবে বেবি, ভর্তি হবার একটা ফরম কেতকীর চোখের সামনে পড়ে রয়েছে। ফরমের সব ঘর পূর্ণ করা হয়েছে। শুধু শূন্য হয়ে আছে একটি ঘর। ছাত্রের বাপের নাম কি? কলম হাতে নিয়ে চুপ ক'রে বসে আছে কেতকী, লিখবার মত কোন ভাষাই খুঁজে পাচ্ছে না। আর, বেবিটাও ব্যস্ত হয়ে চেঁচিয়ে বলছে, শীগগির আমার বাবার নামটা লিখে দাও মা।

কি ভয়ানক কল্পনা! ঝরঝর ক'রে ঝরে পড়া চোখের জলের সঙ্গে যেন শাড়ির আঁচল দিয়ে লড়াই করে কেতকী। কিন্তু চোখ দুটো শুকনো হতেই চায় না। কেতকীর ছেলের প্রাণটা বিনা দোষে এত বড় একটা অপবাদের বোঝা নিয়ে এই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে?

বিকাল শেষ হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। সন্ধ্যা হলেই কেতকীকে আজকাল একবার বাইরে যেতে হয়, নতুন একটা কাজের দায়ে ; মাসে চল্লিশ টাকা মাইনের একটা কাজ। রেলওয়ের অ্যাকাউণ্টেন্ট নীহারবাবুর মেয়ে চিত্রাকে গান শেখাতে হয়। পাইকপাড়ার মেয়েস্কুলের গানের টিচার বিরজাদি কেতকীর জন্য এই গান শেখাবার কাজটা যোগাড় করে দিয়েছেন—আমার সময় নেই কেতকী, তুমিই কাজটা নাও, চিত্রাদের বাড়িটাও তোমার রসিকপুরের কাছে। তা ছাড়া মাসে চল্লিশটা টাকা মন্দ কি?

হ্যাঁ, মন্দ নয়, বরং খুবই দরকার। এই রকমই একটা কাজ খুঁজছিল কেতকী। বেবি ছাড়া, এই বাড়ির আর দুটি বুড়ো মানুষও যে একেবারে অসহায় বেবি। পঁচাশি টাকার মাইনেতে

এই সংসারের খরচ কুলোয় না ; শনিবার দিনটাতে স্কুলে অতিরিক্ত একটা কাজের দায় নিয়ে, ড্রইং শেখাবার ভার নিয়ে পঁচিশ টাকা অ্যালাওয়েন্স পাওয়া যায়, কিন্তু তবুও যে খরচ কুলোয় না।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। চিত্রাও বোধ হয় এতক্ষণ এসরাজ হাতে নিয়ে তার কেতকীদির দেরি দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে। হোক আশ্চর্য, চিত্রা এখন কল্পনাও করতে পারবে না যে, তার গানের টিচার কেতকীদির গলার গান এখন বদ্ধ আর্তনাদের মত কেতকীদিরই গলার ভিতরে আটকে রয়েছে।

দরজার বাইরে একটা ছায়া নড়চড় করে। দেখেই বুঝতে পারে কেতকী, সুধাময়ীর ছায়া। একেবারে দরজার কাছে এসে সুধাময়ী বলেন--মন ভাল না থাকলে আজ আর তোমার গান শেখাতে গিয়ে কাজ নেই কেতকী।

কেতকী হাসে--কাজ যখন, তখন যেতেই হবে।

যাবার জন্যই তৈরী হয়ে কেতকী এদিক-ওদিক তাকিয়ে কি-যেন খুঁজতে থাকে। সুধাময়ী বলেন--কি?

কেতকী--পাঁচু কি বেবিকে নিয়ে এখনও ফেরেনি?

সুধাময়ী--না।

কেতকী--রোজই এরকম দেরি করে নাকি?

সুধাময়ী--হ্যাঁ, আমিই তো পাঁচুকে আর বলে বলে পারি না। ফিরতে বড় দেরি করে পাঁচু ; রোজই ভরা সন্ধ্যাটার মধ্যে ঘুমন্ত ছেলেটাকে নিয়ে বাড়ি ফেরে, একটুও আমার ভাল লাগে না।

শুনে কেতকীরও ভাল লাগে না। গাঁজা খাওয়ার অভ্যেস আছে পাঁচুর, তাই বোধহয় দেরি করে। কে জানে কোথায় বেবিকে বসিয়ে রেখে গাঁজা খায় পাঁচু?

গান শেখাবার কাজ থেকে কেতকীর বাড়ি ফিরতে রোজ সন্ধ্যা পার হয়ে যায়। বাড়ি ফিরে কতবার দেখেছে কেতকী, সুধাময়ীর কোলে ঘুমিয়ে রয়েছে বেবি। এবং বেবিকে কোলে নিয়ে জামা ছাড়াতে গিয়েই চমকে উঠেছে। একি কাণ্ড? পাঁচুটা তো গাঁজা খায়, বেবির জামায় সিগারেটের গন্ধ এবং সেই সঙ্গে পাউডার আর সেন্টের একটা মিষ্টি গন্ধ কেন? এ রকমের মিষ্টি গন্ধ তো এই বাড়ির কোন পাউডারে নেই!

--বেবিকে নিয়ে কোথায় গিয়েছিল পাঁচু? কতবার প্রশ্ন করেছে কেতকী। পাঁচুও আশ্চর্য হয়ে ঐ একই কথা বলে রোজ উত্তর দিয়েছে--আর কোথায় যাব বউমা? তুমি কি মনে কর যে, বেবিকে আমি গাঁজার কেলাবে নিয়ে গিয়েছি? কখ্খনো না, সেটি হতে পারে না।

বেবিকে নিয়ে পাঁচু এখন বাড়ি ফিরবে না। কোনদিনই এসময়ে ফিরে আসে না। কিন্তু ছাত্রীকে গান শেখানো হলে আর দেরি করাও যায় না।

রোজই যেমন বের হয়, তেমনি গানের স্বরলিপির একটা বই হাতে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায় কেতকী। রোজ যেমন, আজও তেমনই চিত্রাদের বাড়ির দিকে যেতে যেতে রেলওয়ের নতুন তৈরী কোয়ার্টারগুলির নিকটে এসে ছোট পার্কটার কাছে ডানদিকের রাস্তাটা ধরে আরও এগিয়ে যায় কেতকী। কিন্তু আজ হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। বেবির কথা ভাবতে ভাবতে সত্যিই যেন বেবির মুখটাকে পেয়ে চমকে উঠেছে কেতকী। চুপ ক'রে, অদ্ভুত বিস্ময়ে অবশ একটা মূর্তি নিয়ে চোখেরই সামনে একটা কোয়ার্টারের ছোট বারান্দাটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে। আলো জ্বলছে বারান্দায়। গেঞ্জি গায়ে এক ভদ্রলোক আরাম চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে আছেন। ভদ্রলোকের হাতে একটা পত্রিকা। কিন্তু পত্রিকা পড়ছেন না ভদ্রলোক। পত্রিকা সুদ্ধ হাতটা অলস হয়ে একপাশে ঝুলে রয়েছে। চোখ বন্ধ করে যেন একটা তন্দ্রাসুখ উপভোগ করছেন ভদ্রলোক। আর, ভদ্রলোকের সেই অলস

এলিয়ে-পড়া শরীরের উপর হুটোপুটি করছে দেড় বছর বয়সের একটা শিশুর শরীর। কখনো ভদ্রলোকের পেটের উপর দাঁড়িয়ে মত্ত হয়ে লাফাচ্ছে সেই বাচ্চাটা, কখনো বা ভদ্রলোকের চুল ধরে ঝুলে পড়ছে। কিন্তু ভদ্রলোক একেবারে নিঝুম! যেন শরীরের সঙ্গে মনপ্রাণও এলিয়ে দিয়ে বাচ্চাটার এই দৌরাত্ম্যের স্পর্শসুখ আত্মসাৎ করছেন। বাঃ, দেখতে বেশ ভালই তো লাগে। কিন্তু ঐ বাচ্চার মুখটা হুবহু বেবির মুখটার মত কেন?

এক পা'ও আর এগিয়ে যেতে পারে না কেতকী। কেতকীর চোখ দু'টোও যেন ক্ষণিকের মোহের বশে লুব্ধ হয়ে এই সংসারের বাপের আদরের একটা দৃশ্য দেখছে।

হঠাৎ তন্দ্রা থেকে যেন চমকে জেগে উঠলেন ভদ্রলোক। একটা সিগারেট ধরালেন। তারপরেই বাচ্চাটাকে বুকের উপর দাঁড় করিয়ে চিৎকার করলেন--পাউডারের ডিবেটা একবার দিয়ে যাও তো পিসিমা।

শুনতে পেয়েছে কেতকী। থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে কেতকীর চোখের দৃষ্টি, এবং সেই সঙ্গে একটা রহস্যও। বেবির মত নয়, বেবিই দাঁড়িয়ে আছে ভদ্রলোকের বুকের উপর। কেতকীর ছেলে কেমন ক'রে আর কোথা থেকে পাউডার মেখে শরীরটাকে আরও মিষ্টি ক'রে নিয়ে রোজই বাড়ি ফেরে, সেই রহস্যের ছবি একেবারে স্পষ্ট ক'রে চোখের উপরেই দেখতে পায় কেতকী। বেবিটাও কি ভয়ানক লোভী! নাচতে শুরু করেছে।

রোজই বিকেলে ঠিক এই ভাবে কেন ছটফট ক'রে বাড়ির বাইরে যাবার জন্য কেন নাচতে থাকে কেতকীর বেবি, সেই প্রশ্নের উত্তরও পেয়ে যাচ্ছে কেতকী। ঐ তো, ঐ ভদ্রলোকের বুকের উপর এসে লুটোপুটি করবার জন্য। দেড় বছর বয়সের একটা মানুষ, কিন্তু আশ্চর্য এরই মধ্যে ওর জীবনের নিষ্ঠুর একটা ফাঁকিকে যেন বুঝে ফেলেছে। যে আদরের পাউডার ওর পাওয়ার কথা নয়, সেই আদরের পাউডার পৃথিবীর একটা মানুষের কাছ থেকে আদায় করতে পেরেছে কেতকীর বেবি।

কেতকীর পা দুটোও যেন কাণ্ডজ্ঞান ভুলে বেহায়ার মত রাস্তার ধুলোর উপর অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চায়। আরও কিছুক্ষণ দেখতে ইচ্ছা করে। ঐ কোয়ার্টারের ছোট বারান্দার দৃশ্যটাকে দেখতে কত ভাল লাগছে, তাও বোধহয় মনের অবশ ভাবনার ঘোরে ঠিক বুঝতে পারে না কেতকী। তা না হলে একটু লজ্জা পেয়ে এতক্ষণে এখান থেকে চলে যেতে পারতো।

নিজেই জানে না, বুঝতেও পারেনি কেতকী, কতক্ষণ সে এইভাবে এখানে দাঁড়িয়ে আছে।

—কে দাঁড়িয়ে ওখানে? ভেতরে আসুন। ডাক শুনেই চমকে উঠে দেখতে পায় কেতকী। বারান্দার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেতকীর দিকে তাকিয়ে হাঁক-ডাক করছেন এক মহিলা, ঐ ভদ্রলোকের পিসিমা, যিনি আগে ঘরের ভিতর থেকে পাউডারের ডিবে হাতে নিয়ে বের হয়ে এসেছিলেন।

মাথায় কাপড় দেবার অভ্যাস অনেকদিন আগেই ছেড়ে দিয়েছিল কেতকী। পিসিমার ডাক শুনে মাথার কাপড় তুলে দিয়েই চমকে ওঠে কেতকী এবং লজ্জা পেয়ে সেই মুহূর্তে মাথার কাপড় আবার নামিয়ে দিয়ে সেই বারান্দার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়। দেখতে পায় কেতকী, বেবিটা ঘুমিয়ে পড়েছে ভদ্রলোকের কোলের উপর, এবং ভদ্রলোক হাঁটু দুলিয়ে আস্তে আস্তে বেবির সেই ঘুমের নিঝুম আরামটাকে যেন দোলা দিয়ে আরও নিবিড় ক'রে দিচ্ছেন।

পিসিমা এবং সেই ভদ্রলোক, দু'জনেরই দিকে তাকিয়ে নমস্কার জানায় কেতকী ; সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেলে—আমাকে আপনারা চেনেন না, কিন্তু...।

ভদ্রলোক বলেন—খুব চিনি। আপনাকে আমি অনেকবার দেখেছি। আপনি তো রোজ

সন্ধ্যাবেলা অ্যাকাউন্টেণ্ট নীহারবাবুর মেয়েকে গান শেখান।

কেতকী—হ্যাঁ।

পিসিমা হাসেন—কিন্তু এ বাড়িতে গান শেখাবার মত কোন মেয়ে নেই। হ্যাঁ, পারুলটা যদি আসতো, তবে বোধহয় তোমার খোঁজ নিতে হতো।

ভদ্রলোক—না এসে ভালই হয়েছে। ঘন ঘন বদলির চাকরি, কোথাও গিয়ে পুরো একটা বছরও থাকবার সুযোগ পাই না।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ান, এবং ঘরের ভিতরে ঢুকে একটা দোলনায় বেবিকে শুইয়ে দেন। তার পরেই একটা চেয়ার তুলে নিয়ে এসে বলেন—বসুন আপনি।

চেয়ারে বসে না কেতকী। কি ভেবে পিসিমার মুখের দিকে একবার তাকায়। পিসিমা বলেন—বসো তুমি, আমার জন্য ভেব না। সন্ধ্যার পূজো না সেরে আমি চেয়ারে বসি না।

কেতকী হাসে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার ছিল।

ভদ্রলোক—বলুন।

কেতকী—এখনি যে বেবিকে ঘরের ভেতরে রেখে এলেন...।

ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন—না না, ও নিতান্তই একটা বাচ্চা, ওর গান শেখবার বয়সই হয়নি!

পিসিমা বলেন—তা ছাড়া বাচ্চাটা আমাদের কেউ নয়।

ভদ্রলোক—একটা চাকর ওকে এখানে রেখে দিয়ে রোজই...ঐ দেখুন, পার্কের ঐ কোণে যেখানে কতগুলো লোকের জটলা দেখতে পাচ্ছেন, ওখানে বসে এখন গাঁজা খাচ্ছে চাকরটা।

কেতকী—চাকরটা রোজই এই কাণ্ড করে বুঝি?

পিসিমা—হ্যাঁ ; তার কারণও আছে।

কেতকী—কি?

পিসিমা—সে একটা দুঃখের কথা, লজ্জার কথাও বটে।

কেতকীর চোখ থরথর করে—সে আবার কি?

পিসিমা—অন্য কোন বাড়িতে ঐ বাচ্চাকে এক মিনিটের জন্যও ঠাঁই দিতে চায় না। বলতে গেলে, একরকম দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেয়। চাকরটাও কত দুঃখ করছিল।

কেতকী—কেন? বাচ্চাটার কি জাত ভাল নয়?

পিসিমা—না গো মেয়ে, জাতের কথা নয়, তার চেয়েও খারাপ কথা। লোকের দোষও দেওয়া যায় না।

কেতকী ফ্যালফ্যাল ক'রে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকায়। ভদ্রলোক বলেন—বাচ্চাটি হলো এক আনহ্যাপি মহিলার অবৈধ সন্তান।

কেতকীর চোখ ঝিকঝিক ক'রে জ্বলে—কে সেই মহিলা?

ভদ্রলোক—আমি জানি না, কোন খবরও রাখি না। রসিকপুরের নতুনপাড়ার ভদ্রলোকেরা আর মহিলারা এদিকে প্রায়ই বেড়াতে আসেন। ওঁদের কাছ থেকেই শোনা।

কেতকী—বোধ হয় রসিকপুরের কমল বিশ্বাস...।

ভদ্রলোক—হ্যাঁ হ্যাঁ, কমল বিশ্বাসের পুত্রবধূ ছিলেন সেই মহিলা। যাক্‌গে, এসব আলোচনা করা বোধহয় আমাদের উচিত হচ্ছে না।

কিন্তু কেতকীর বুকের ভিতরে যেন একটা কঠোর ও দুর্বার প্রশ্নের ঝড় গোঁ গোঁ করছে। অপরিচয়ের বাধা, অচেনা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলবার নিয়ম, কৌতূহলের সীমা, ভাষার লজ্জা আর সংযম, সবই যেন ভুলে গিয়েছে কেতকী। কেতকী প্রশ্ন করে—তবে আপনি কেন ঐ ছেলেকে একেবারে বুকের উপর তুলে নিয়ে..।

ভদ্রলোক—ছিঃ ছিঃ, একি কথা বলছেন আপনি, এটা কি একটা প্রশ্ন হলো? বাচ্চাটা হলো

একটা বাচ্চা, ওর সঙ্গে ঐ সব গল্পের কি সম্পর্ক আছে?

পিসিমা বলেন—আমার এই ভাইপোটির কাণ্ডজ্ঞানের বালাই একটু কম, একথা ওর মুখের উপরেই বলে দিচ্ছি। দেখ না, ঐ বাচ্চাটার জন্যই দোলনা কিনে এনেছে। অফিস থেকে ফিরে এসেই ব্যস্ত হয়ে বাচ্চাটাকে খুঁজবে। বাচ্চাটাকে নিয়ে চাকরটা আসতে দেরি করলে গালমন্দ করে। তার ওপর আর এক কাণ্ড...।

পিসিমা চুপ করলেন। ভদ্রলোকও পিসিমাকে একেবারে চুপ করিয়ে দেবার জন্য বলেন—থাক পিসিমা, তুমি আবার যত অবান্তর ঘরোয়া কথা নিয়ে বাইরের এক ভদ্রমহিলার কাছে কেন...।

পিসিমা—তুই চুপ কর নির্মল ; ইনি, ইনি যে একজন বাইরের লোক, ইনিই তোর মতিগতির খবর শুনে বলে দিয়ে যান, এরকমের বাড়াবাড়ি কি ভাল? শেষে ভয়ানক দুর্নামের ভাগী হতে হবে নাকি?

কেতকীর দিকে তাকিয়ে পিসিমা বলেন—বললে বিশ্বাস করবে না তুমি, কলকাতায় হেড অফিসে উঁচু পোস্টে বদলির অর্ডার হয়েছে, তবু ছেলে বদলি নিতে রাজি নয়। বদলি নাকচ করবার জন্য দরখাস্ত করেছে।

কেতকী—কেন?

পিসিমা—ঐ বাচ্চাটার জন্য। বাচ্চাটাকে না দেখতে পেলে ওর নাকি মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

—আঃ, পিসিমার ভাইপো নির্মল যেন বিরক্ত হয়ে আপত্তি করে—এসব প্রসঙ্গ এখন থামাও পিসিমা।

তার পরেই কেতকীর দিকে তাকিয়ে অন্য প্রসঙ্গের সূত্রপাত করে নির্মল।—দুঃখের বিষয়, এ বাড়িতে আপনার গানের ছাত্রী হবার মত কেউ নেই। তবে আমি খোঁজ নিতে অবশ্য ত্রুটি করবো না...দেখি দমদমের সেজদার মেয়েটা গান শিখতে চায় কিনা?

কেতকী উঠে দাঁড়ায়। নির্মলও উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় দেয়—আসুন তাহ'লে।

কেতকী বলে—বেবিকে নিয়ে আসুন।

নির্মল চমকে ওঠে—কেন?

কেতকী—আমার কাছে দিন। নিয়ে যাই।

আতঙ্কিতভাবে তাকায় নির্মল—সে কি? অদ্ভুত কথা? আপনি নিয়ে যাবেন কেন? কে আপনি?

কেতকী—দিন না, আমি চাইছি।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে কেতকী, এবং সেই সঙ্গে যেন ছলাক ক'রে দু'চোখের কোণে বড় বড় দুটো জলের ফোঁটা চমকে উঠেই গলে যায়।

—বুঝেছি, বুঝেছি, আপনিই তাহ'লে...। বলতে বলতে ঘরের ভিতরে চলে যায় নির্মল। এক মূহুর্তও দেরি করে না। ঘরের ভিতর থেকে ঘুমন্ত বেবিকে তুলে নিয়ে এসে কেতকীর কোলে তুলে দেয়।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকেন পিসিমা। এবং এক হাতে কপাল টিপে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে নির্মল, অদ্ভুত এক রহস্যের অন্ধকার থেকে যেন একটা চোরা মমতা এসে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল।

একটু বিস্মিত হয়েছেন কমলবাবু। রসিকপুরের যে ভাঙা-বাড়ির ছায়ার কাছে কোন ভদ্রলোক আসে না, সেই বাড়িরই ফাটল-ধরা বরান্দার উপর এসে বসে আছে এক অল্প বয়সের ভদ্রলোক। ছেলেটিকে সত্যিই ভদ্রলোক বলে মনে হয়। কেতকীর নামটা বলতে

পারেনি, কিন্তু কথা শুনে বোঝা গেল, কেতকীর সঙ্গেই দেখা করতে চায়। 'বেবির মা' বললে কেতকী ছাড়া আর কা'কেই বা বোঝাবে?

দেখতেও ভালই ছেলেটি। নাম হলো নির্মল, রেলওয়ে হিসাব বিভাগে অডিটারের কাজ করে। কিন্তু বড় বিমর্ষ বলে মনে হয়, নইলে অমন ভয়ে-ভয়ে কথা বললো কেন, এবং কথা বলতে গিয়ে মাথাই বা হেঁট ক'রে রইল কেন।

--একটি ছেলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় কেতকী। অনেকক্ষণ হলো এসে বসে আছে।

সুধাময়ী এসে খবর দিতেই কেতকীর হাতের চিরুণী যেন হঠাৎ কেঁপে উঠে চুলের সঙ্গে ফেঁসে যায়। আয়নাতে নিজের মুখের ছবিটাকে দেখতে পেয়ে চোখ দুটোও হঠাৎ লজ্জায় চমকে ওঠে। কালো কুৎসিত মুখটা আবার এভাবে রাঙা হয়ে উঠতে চেষ্টা করে কেন? বুকটাও ভয়ে দুরুদুরু করে কেন? বুঝতে পারে কেতকী, নিজের বুকটাকেই আজ ভয় করতে হচ্ছে।

ভাবতে ভুল করেনি কেতকী। ঘরের বাইরে এসেই দেখতে পায় সেই ভদ্রলোক, রেলওয়ের সেই নির্মল এসে বসে আছে। কিন্তু কি ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গিয়েছে নির্মলের মুখ? বেবিকে কোলের উপর বসিয়ে শরীর এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল যে মানুষটা, তার মুখটা যে সেই ঘুমের মধ্যেও হাসছিল।

নির্মলের কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ায় কেতকী। যদিও বুঝতে পারতো কেতকী, ওর বড়-বড় চোখের তারা দুটোও হঠাৎ বড় বেশি স্নিগ্ধ হয়ে গিয়েছে, তবে বোধ হয় নির্মলের এত কাছে এসে দাঁড়াতে পারতো না। অনেক দিনের অন্তরঙ্গ আপন-জন না হলে কোন মেয়ের পক্ষে কোন পুরুষের এত কাছে এসে এত সহজে হাসিভরা মুখ তুলে তাকিয়ে থাকাও সম্ভব হতে পারে না।

কেতকী বলে--আপনি কেন এসেছেন বুঝতে পারছি।

নির্মল--জানি না, আপনি কি বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু আমি মাপ চাইতে এসেছি।

কেতকীর চোখের হাসি যেন হঠাৎ ব্যথিত হয়ে গম্ভীর হয়ে যায়।--আপনি মাপ চাইছেন কেন?

নির্মল--লোকের মুখ থেকে শোনা একটা বাজে কথা আপনার কাছে বলা আমার খুবই অন্যায় হয়েছে।

কেতকী--বাজে কথা কেন বলছেন?

নির্মল--নিশ্চয় বাজে কথা। অবিশ্বাস্য, নিরেট মিথ্যে কথা।

কেতকী হাসে--এ ধারণা আপনার কেমন ক'রে হলো?

নির্মল--আমাকে খুব বেশি বোকা মনে করবেন না।

কেতকী--এরই মধ্যে এমন কি প্রমাণ পেয়ে গেলেন যে ওরকম ধারণা করে ফেললেন?

নির্মল--প্রমাণ আপনি।

কেতকীর বাচাল প্রশ্নটাই যেন চমকে ওঠে। এবং আবার প্রশ্ন করতে গিয়ে কেতকীর মুখের ভাষাও এলোমেলো হয়ে যায়।--আমার মধ্যেই বা কি দেখে...।

নির্মলের এতক্ষণের মন-মরা ভাষার মৃদুতাও হঠাৎ দুঃসাহসী হয়ে একেবারে প্রচণ্ড স্পষ্ট ভাষায় প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।--আপনার মুখ দেখে।

ভ্রূকুটি ক'রে তাকায় কেতকী--আপনি খুব বেশি ভদ্রতা ক'রে খুব বেশি মিথ্যে কথা বলছেন।

নির্মলের চোখ দুটোও হঠাৎ শিউরে একটু কঠোর হয়ে যায়।--না, আপনি অকারণে সন্দেহ করছেন।

কেতকী--কি দেখলেন আমার মুখের মধ্যে?

নির্মল--অহংকার।

কেতকী--কি বললেন?

নির্মল--ভাল ক'রে কথা বলতে জানি না বলেই ওকথাটা বললাম। কিছু মনে করবেন না। যার চোখ আছে সে তো আপনার মুখ দেখেই বুঝে ফেলবে যে, এ মানুষ মরতে রাজী হবে তবু জীবনের সম্মান খোয়াবে না। যাই হোক...।

কেতকী যেন জোর ক'রে তার বুকের ভিতরে একটা কান্নার স্বর চেপে রাখবার চেষ্টা করছে, গলার স্বরটা তাই ভেঙ্গে যায়।--কি বলছিলেন বলুন?

নির্মল হাসে--তা হ'লে বলুন মাপ্ করে দিয়েছেন। আর, আপনার বেবিকে একবার আমার সামনে নিয়ে আসুন।

কেতকী--কেন?

নির্মল--আমি বদলি চেয়ে আবার উপরওয়ালাকে চিঠি দিয়েছি। এখানে বড় জোর আর দুটি দিন আছি। বেবিটাকে একটু দেখে যাই।

কেতকী হাসে--বদলি চেয়েছেন কেন বলুন তো? বেবিকে আর আপনার কাছে যেতে দেব না, এই ভয় করছেন?

নির্মল--না...ঠিক ভয় নয়...তবে কি না...আমি সত্যিই একটু বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছি।

কেতকী মাথা হেঁট করে।--একটুও বাড়াবাড়ি করেননি। আপনি বদলি নেবেন না।

নির্মলের চোখের বিস্ময় যেন একটা সান্ত্বনার ছায়ায় নিবিড় হয়ে ওঠে।--কি বললেন?

কেতকী--বেবি ঠিক সময় মত রোজই আপনার কাছে যাবে। আপনার সন্ধ্যাবেলার খেলা বন্ধ করতে হবে না। বেবিকে যত খুশি পাউডার মাখাবেন, কেউ আপনাকে বাধা দেবে না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় নির্মল, আর খুব জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে যেন মনের গুমোট হালকা ক'রে নেয়। এবং হঠাৎ খুশির আবেগে আবার হাসতে হাসতে বলে--ধন্যবাদ।

কেতকী--চা খেয়ে যান।

নির্মল--কোথায় চা?

কেতকী--এখনি আনছি।

এই সেই রসিকপুরের রাজবাড়ি, যে বাড়ির নামে ভূতুড়ে গল্পের চেয়েও অবিশ্বাস্য অথচ কুৎসিত এক একটা গল্প কত লোকের মুখেই না শুনেছে নির্মল। কেতকী চা আনতে ঘরের ভিতরে গিয়েছে। চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখতে থাকে নির্মল। সত্যিই, বাড়িটার এই বিধ্বস্ত চেহারার মধ্যে কেমন একটা ভয়াল ভাব আছে। কিন্তু এই ভয়ালতা যেন একটি মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ হয়ে রয়েছে। এই মাত্র চা আনতে চলে গেল যে মানুষটা, তারই মুখ।

চা নিয়ে আসে কেতকী। নির্মল বলে--একেবারে আপনজনের মত খাতির ক'রে চা খাওয়াচ্ছেন, কিন্তু আপনার নামটা তো এখনও আমি জানি না।

--কেতকী।

--তাই বলুন। অনর্থক একটা কথা বলে ফেলেই লজ্জিতভাবে তাকিয়ে থাকে নির্মল। কেতকী হেসে ফেলে--কি বললেন?

নির্মল--তার মানে, এই রকমই একটা নাম আশা করেছিলাম।

গম্ভীর হয় কেতকী। নির্মলও কোন কথা না বলে চা খাওয়া শেষ করে।

নাম শোনার আশা মিটে গিয়েছে। এখন আর একবার হেসে বিদায় নিয়ে চলে গেলেই তো পারে নির্মল। কিন্তু যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেও কে জানে আর ও কি জানবার আশা ক'রে কেতকীর মুখের দিকে তাকায়।

মুখে ভাষা নেই, শুধু দু'চোখে একটা অদ্ভুত আকুলতার বোবা প্রশ্ন, এমন মানুষের মুখের দিকে কেতকীই বা কতক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে? অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে শাড়ির আঁচল তুলে কেতকীও তার গম্ভীর চোখের অদ্ভুত একটা উষ্ণতার মায়া মুছে ফেলতে চেষ্টা করে।

নির্মল বলে—আপনার সঙ্গে কি আর দেখা হতে পারে না?

কেতকী—পারে, কিন্তু কেন?

--দেখতে ইচ্ছে করে।

--আমাকে?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—দেখতে ভাল লাগবে বলে।

—কেমন ক'রে জানলেন?

—ভাবতে ভাল লেগেছে, তাই।

—কবে ভাবলেন?

—কাল, সারারাত।

—কি ভাল লাগলো?

—সব।

চন্দননগরের সাধনবাবুর বাড়ির ফটকে লতাপাতা দিয়ে একটা তোরণ করা হয়েছিল, এবং তোরণের মাঝখানে বাঁশের ফ্রেম আর হরেক রকমের রঙীন ফুল দিয়ে তৈরী মস্ত বড় একটা প্রজাপতিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই পথের লোক শুধু সন্দেহ করেছিল, আজ বোধ হয় একটা বিয়ের ব্যাপার আছে এই বাড়িতে। ভিড় ছিল না, শাঁখ-শানাই-এর মুখরতা ছিল না। লুচি ভাজার গন্ধেও বাতাস থমথম করেনি।

সন্ধ্যা হতেই বিয়ের ব্যাপার একরকম হাসাহাসির মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। রেজিস্ট্রার মশাই তাঁর রেজিস্টার খাতাটা এগিয়ে দিতেই হেসে উঠে মুখে রুমাল চাপা দেয় কাজরী। সই করতে গিয়েও হাসে। অতীনেরও সেই দশা ; এবং সাক্ষী হয়ে সই করলো যারা, সেই জীমূত রায় আর গাঙ্গুলীও হেসে ওঠে। সব চেয়ে আগে মস্ত বড় একটা ফুলের স্তবক কাজরীকে উপহার দিলো যে, সেই অসিত দত্তও হাসতে থাকে।

চন্দননগরের সেই শুভরাত্রির শেষ তারা নিভে গেল যখন, তখনও চোখে ঘুম আনতে পারেনি অতীন। কিন্তু অঘোর ঘুমে অসাড় হয়ে পড়েছিল কাজরী। আজ কত রকমের কথা মনে আসছে অতীনের, এবং কাজরীকেও কত কথাই না বলবার ছিল। কিন্তু বলবার সুযোগ পায়নি অতীন। সেই যে, অতীনের দু'হাতের বাঁধন থেকে শ্রান্ত দেহটাকে আলগা ক'রে নিয়ে সরে গেল কাজরী, তখন থেকেই বালিশ জড়িয়ে কাজরী যেন গভীর ঘুমের সুখের সঙ্গে আপন হয়ে পড়ে আছে।

অতীনের চোখ দুটোও ঘুমন্ত কাজরীকে দেখবার সুযোগ এই প্রথম পেয়েছে। দু'চোখ ভরে দেখেও অতীন। হ্যাঁ, দেখতে একটু নতুন লাগে বৈকি! কাজরীর মুখের হাসিটা ঘুমিয়ে পড়েছে, এবং হাসির ভঙ্গীটা মরেই গিয়েছে মনে হয়। শিথিল ঠোঁটের ফাঁকে দাঁতের সারিটা দেখা যায়, নেহাতই কতগুলি দাঁতের সারি। কাজরী কথা বললেই চিবুকের দু'পাশে দুটি সুন্দর খাঁজ পড়ে, তখন চিবুকটাও হাসছে বলে মনে হয়। চোখে পড়ে অতীনের, কাজরীর চিবুকের দু'পাশের হাড় দুটো কেমন উঁচু উঁচু। নিঃশ্বাসের টানে কাজরীর সেই ভরাট মুখটাই মাঝে মাঝে গালভাঙা একটা রোগাটে মুখ হয়ে কাঁপছে।

এই নতুন জীবন কেমন লাগছে কাজরী? এই কথাটাই বলতে চেয়েছিল অতীন। কিন্তু

বলবার সুযোগ পেল সকাল হয়ে যাবারও অনেকক্ষণ পরে, যখন প্রায় দুপুর, ক্যামাক স্ট্রীটের বড় বড় জারুল গাছের ছায়া যখন বৈশাখী বাতাসে ছটফট করতে শুরু করছে।

চন্দননগর থেকে মোটর করে সোজা কলকাতার ক্যামাক স্ট্রীটের জারুলের ছায়ার কাছে নেমে পড়বার পর, ফ্ল্যাটের ভিতরে ঢুকে বারান্দাতে পা দিয়েই কাজরীর হাত ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে অতীন। তার পরেই প্রশ্ন করে--এ জীবন তোমার বোধ হয় খুবই নতুন লাগছে কাজরী!

কাজরী হাসে--জীবনটা কি আর এমন নতুন হলো যে নতুন লাগবে?

অতীন--তার মানে?

কাজরী--তুমি কি এই প্রথম আমার হাত ধরলে যে নতুন লাগবে? আমরা যা ছিলাম তাই আছি অতীন।

অতীন গম্ভীর হয়--তাহ'লে বেশ পুরনো লাগছে বল?

কাজরী--তাই বা কেন বলবো? আমরা সব সময়েই নতুন।

কথাটা বোধ হয় ঠিকই বলেছে কাজরী, ভাবতে গিয়ে অতীনের মুখের এই ক্ষণিক গম্ভীরতা হঠাৎ মুছে যায়, এবং অতীনও আবার জ্বলজ্বলে হাসির আভায় মুখ রাঙিয়ে নিয়ে, কাজরীর ফুল্ল চেহারার কোমরটাকে একটি হাতের আদুরে বন্ধনে বন্দী ক'রে সোফার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। নতুন নয় ; এই ভঙ্গী, এই বন্ধন, এই ছোঁয়াছুঁয়ির উৎসব দু'জনের জীবনে নতুন কিছু নয়। কিন্তু পুরনো বলেও তো মনে হয় না। এই তো চির-নতুন হয়ে থাকা জীবন। কাজরীর চোখে সেই প্রথম সন্ধ্যার প্রথম বিদ্যুৎ ঠিক সেইরকমই ঝিলিক দিয়ে হাসছে। একটুও পুরনো হয়ে যায়নি কাজরীর প্রাণ আর কাজরীর ভালবাসার আকুলতা।

ক্যামাক স্ট্রীটের এই নতুন বিল্‌ডিং-এর এই ফ্ল্যাটও অতীন আর কাজরীর জীবনের সেই আনন্দের নীড় হয়ে ওঠে, যে আনন্দ চিরন্তন ক'রে রাখবার জন্য ওদের প্রাণ একটা ক্ষান্তিহীন চেষ্টার সাধনা ক'রে এসেছে। ওদিকে কয়লাঘাটের জাহাজ অফিসের চাকরি, আর এদিকে পার্ক স্ট্রীটের অটোমোবিল শোরুমের চাকরি ; দিনমানের দু'টি ব্যস্ততা শুধু ওদের দু'জনকে দু'দিকে সরিয়ে দিয়ে কয়েক ঘণ্টার মত বিচ্ছিন্ন করে রাখে। কিন্তু সন্ধ্যার পর, এবং কখনও বা সন্ধ্যা হতেই কাজরী বিশ্বাস আর অতীন বিশ্বাস যেন প্রতিদিনের এই কয়েক ঘণ্টার অদেখার উপর প্রতিশোধ তুলে তৃপ্ত হয়ে যায়। সব সময়েই নতুন লাগে, এ হেন নতুন জীবনের তিনটে মাসও ফুরিয়ে যায়।

কাজরীর কাজের ছুটি হয় পাঁচটার একটু আগে, এবং অতীনের ছুটি পাঁচটার অনেক পরে। কোনদিন ছ'টা, কোনদিন সাতটা বা আটটা। কাজের জীবনের ব্যস্ততা থেকে ছুটি পেয়ে প্রায় ছুটে ছুটে এই ফ্ল্যাটের নীড়ে ফিরে আসে অতীন। গলার টাই খুলতে খুলতে কাজরীর কাছে এসে অতীন দাঁড়াতেই হেসে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কাজরীর মুখ। তার পরেই হাসিটা যেন হঠাৎ অভিমানের বেদনায় থমথম করতে থাকে। গনগন ক'রে জ্বলতে থাকে কাজরীর চোখের আভা। অতীনের বুকের কাছে মাথাটা এগিয়ে দেয় কাজরী, জীবনের যত ছটফটে নিঃশ্বাসের ভার অতীনের বুকের উপর লুটিয়ে দিতে চায়। কথা বলে কাজরী ; সেই একই কথা, যে কথা, এই তিন মাসের দাম্পত্যের জীবনে রোজই শুনে এসেছে অতীন।--এখনও এভাবে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে তোমার কি একটুও কষ্ট হচ্ছে না অতীন?

অতীনও ভুলে যায় যে, এখন হাত-মুখ ধুতে হবে এবং এক পেয়ালা চা খাওয়া উচিত। কিন্তু না, দরকার নেই। ওসবের চেয়ে কাজরীর চোখের ঐ আশা এবং কাজরীর ভাষার ঐ অভিমান অনেক দামী, অনেক মায়াময়, অনেক আনন্দের অঙ্গীকার।

ঘরের ভিতরে চলে যায় অতীন আর কাজরী। বড় সুন্দর একটি নিভৃত এই ঘর। দরজা বন্ধ করবার দরকার হয় না। দরজার পর্দাটাই যথেষ্ট।

এই ফ্ল্যাটের জীবনের আরও কতগুলি দরকারের কাজ অবশ্যই আছে, কিন্তু সে-সব কাজের দায় নিয়ে ব্যস্ত হবার মত একটা চাকরও আছে। রাতের রান্নাটা সন্ধ্যার আগেই সেরে রাখে চাকর ভাগবত, এবং কাজরী অফিস থেকে ফিরে এলেই ভাগবতের ছুটি হয়ে যায়। সকাল সাতটায় এসে আবার যখন দরজার কড়া নাড়ে ভাগবত, তখন কাজরী বিছানার উপর বসে একমনে খবরের কাগজ পড়লেও, অতীনকে একটু ব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়। ভাগবতের অপেক্ষায় না থেকে নিজের হাতেই স্টোভ ধরিয়ে চা তৈরী করে অতীন।

খবরের কাগজের উপরেই চোখ রেখে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে কাজরী যখন আনমনার মত বলে ওঠে, চা-এ চিনি নেই দেখছি ; তখন অতীনই চামচ ভরে চিনি নিয়ে কাজরীর পেয়ালায় ঢেলে দেয়।

সারা সকালটা, যতক্ষণ না অফিসে যায় কাজরী, ততক্ষণ এই ভাবেই যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা প্রাণ ও একেবারে অন্য একটা মন হয়ে, যেন আর-একটা স্বপ্নের মধ্যে পড়ে থাকে কিংবা কাজ করে কাজরী। চিঠি লেখে। বড় বড় ছবির অ্যালবাম কোলের উপর রেখে দু'চোখের গভীর আগ্রহ যেন উপুড় ক'রে দিয়ে হাসতে থাকে কাজরী। সাদা সিল্কের তোয়ালের উপর রঙীন সুতো দিয়ে পৃথিবীর নানা রূপের নানা বিচিত্রতার ডিজাইন আঁকে ; মানস সরোবর আর মরাল, কিংবা শালবনের ঝড়, অথবা কদমের ছায়ায় ঝুমুর নাচের আসর।

এখানে, কাজরী বিশ্বাসের এই সব স্বপ্নের সঙ্গে অতীন বিশ্বাসের কোন সম্পর্ক নেই। এই সময়টা অতীন বিশ্বাসও বারান্দায় চেয়ারে বসে নীরব মুখ আর অচঞ্চল চেহারাটা নিয়ে শুধু সিগারেট খেয়েই পার ক'রে দেয়। অতীনের কাছে আসবার, কিংবা কোন কথা বলবারও দরকার হয় না কাজরীর। এবং এক এক সময় সত্যিই অতীনের দিকে কাজরীর চোখ পড়লেও বোঝা যায় না, সে চোখে কোন প্রশ্ন আছে কি না। অচেনা মানুষের মুখের দিকেও এতটা অনুৎসুক দৃষ্টি নিয়ে কেউ তাকায় না।

—কি, চিনতে পারছো তো? ঠাট্টার সুরে হেসে হেসে প্রশ্ন করে অতীন।

—অ্যাঁ, কি বললে? কাজরীর প্রশ্ন শুনেই বুঝতে পারে অতীন, তার ঠাট্টাকেও ভাল ক'রে শুনতে পায়নি কাজরী।

ক্যামাক স্ট্রীটের জারুল গাছের পাতার ভার ভিজিয়ে দিয়ে খুব জোর বৃষ্টিটা যেদিন সন্ধ্যার আগেই থেমে গেল, সেই দিনটা ছিল রবিবার। কাজরীও কাজ সেরে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইরের বৃষ্টির ঐ প্রবল উৎপাতের দিকে যেন ভ্রূকুটি ক'রে তাকিয়ে রইল। তারপর বৃষ্টি থামতেই উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে কাজরী—আঃ, বাঁচা গেল!

অতীন--তুমি কি বাইরে বের হতে চাও?

কাজরী—মোটেই না। ওরাই আসছে। আজ আমার অদৃষ্টে অজস্র ধমক আছে।

অতীন—কি ব্যাপার?

কাজরী—আবার একটা ছবির এগজিবিশনের ভার নিয়েছি। তাই আলোচনা আছে। অসিত আসবে, তা-ছাড়া জীমূত আর গাঙ্গুলীরও আসবার কথা আছে।

অতীনের চোখ দুটো কেমন ক'রে তাকিয়ে কতখানি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে তা'ও বোধ হয় দেখতে পায় না কাজরী। নিজেরই মনের একটা উৎফুল্ল আবেগের টানে হেসে হেসে মুখর হয়ে ওঠে কাজরী।—তোমাকে অবিশ্যি এর জন্য কোন দুশ্চিন্তা করতে হবে না অতীন ; তোমাকে কোন ঝঞ্ঝাট ভুগতে হবে না। ওসব আলোচনার মধ্যে মাথা না গলিয়ে তুমি বরং একটু বেড়িয়ে আসতে পার।

হ্যাঁ, নতুন লাগছে কাজরীকে, একেবারে অন্যরকমের নতুন। কাজরীর যে এরকম একটা ছবিময় এগজিবিশনের জীবন আছে, সেটা ভুলেই গিয়েছিল অতীন। কিন্তু...মনে পড়ে

অতীনের, কাজরীও যে একদিন নিজের মুখেই বলেছিল, তোমাকে পেয়ে ওসব সাধ ভুলেই গিয়েছি, ছেড়েই দিয়েছি অতীন।

কাজরী বলে--অসিতের কথা তো তুমি আগেই শুনেছ।

--হ্যাঁ।

--ওরকম মহৎ মনের মানুষ হয় না অতীন। টাকা অনেকেরই থাকে, কিন্তু ক'জন মানুষ বিনা স্বার্থে পরের উপকারের জন্য অবাধে টাকা ছড়িয়ে দিতে পারে বল?

--হ্যাঁ, শুনেছি, তিনি তোমাকে অনেক উপকার করেছেন।

--আজও করছেন। আর একটা কথা...সেটা বোধ হয় তোমাকে বলা হয়নি।

একটু চুপ ক'রে থেকে কাজরী আবার উৎসাহিত ভাবে বলে--পাশের ফ্ল্যাটটাও ভাড়া নিয়েছি।

--সে কি? কি দরকার? প্রশ্ন করতে গিয়েই অতীনের চোখের ভঙ্গী বিরক্ত হয়ে ওঠে।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে কাজরী--অসিতের সাধ। কার সাধ্যি ওকে বাধা দেবে বল? অন্তত আমার তো সে সাধ্যি নেই। ঐ ফ্ল্যাটের এক বছরের আগাম দিয়ে দিয়েছে অসিত। প্রতিজ্ঞা করেছে, নিজে এসে ঐ ফ্ল্যাট নিজের মনের মত ক'রে বেস্ট ফার্নিচারে সাজিয়ে দেবে। আমাদের এভাবে ক্ষুদ্র হয়ে থাকতে দিতে রাজি নয় অসিত।

কাজরীর মুখ থেকে যেন নতুন প্রলাপের ধারা ঝরে পড়ছে। স্তব্ধ হয়ে বসে শুনতে থাকে অতীন। যেন অনেক দিনের অঘোর ঘুমের পর ভয়ানক ভাবে জেগে উঠেছে কাজরী। অতীন ছাড়া এই পৃথিবীতে অন্য মানুষও আছে, এবং কাজরীর কাছে শ্রদ্ধা পায় এমন মানুষেরও অভাব নেই। কাজরীর এই অনর্গল প্রলাপ যেন ওরই জীবনের এক অনর্গল কৃতজ্ঞতার ইতিহাস। মনের আবেগে মুখ খুলে কাজরী আজ কত কথাই না শুনিয়ে দিচ্ছে। জীমূত যার নাম, সে-ও সাধারণ মানুষ নয়। গ্রেট আর্ট সোসাইটির সেক্রেটারী হয়ে কাজরী যে এত বড় একটা প্রেসটিজ পেয়েছে, সে তো জীমূতেরই চেষ্টার ফল। সোসাইটির প্রায় সব মেম্বারদের ভোট কাজরীর জন্য আদায় করা যে-সে মানুষের সাধ্য নয়। আর্টের বিষয় নিয়ে কী সুন্দর আলোচনা করতে পারে জীমূত! আর গাঙ্গুলীই বা কি কম? কাজরীর এত বড় একটা লাইফ স্কেচ, কাজরীর সুন্দর ছবির সঙ্গে অত বড় পত্রিকাতে ছাপিয়ে দিয়ে কাজরীকে লোকের চোখে অসাধারণী ক'রে তুলেছে যে, সে তো ঐ গাঙ্গুলী ; মস্তবড় জার্নালিস্ট, চারটে মার্কিন পত্রিকার স্পেশাল করেসপণ্ডেসও। কলকাতার এলিটদের কোন কক্‌টেল পার্টির উৎসব ফুর্তিময় হয়ে ওঠে না, যদি গাঙ্গুলী সেখানে না থাকে। চমৎকার গল্প করতে পারে গাঙ্গুলী।

ছটফট করে চেঁচিয়ে ওঠে কাজরী--গাঙ্গুলীর কাছে বসে পাঁচ মিনিট ওর গল্প শুনতে তোমারও হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় অতীন। কাজরীর মুখের দিকে তাকায়। কাজরী বলে--হঠাৎ আবার কি ভাবতে আরম্ভ করলে?

অতীন--ভাবছি, এখনি একবার বাইরে যেতে হবে।

কাজরী--তাই ভাল।

অতীন হাসে--হ্যাঁ, তোমার শ্রদ্ধার মানুষ, কৃতজ্ঞতার মানুষ, হাসিয়ে পেটে খিল ধরিয়ে দেবার মানুষ যেখানে এসে ভিড় করবে, সেখানে আমি থেকে কি আর করবো বল? আমি তো...।

কাজরী--কি?

অতীনের মুখের হাসিটা যেন দপ ক'রে জ্বলে ওঠে--আমি হলাম শুধু তোমার ভালবাসার মানুষ।

কাজরী--নিশ্চয়, সে কি আর বলতে হয়?

দরজাটার কাছে একবার শুধু কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থাকে অতীন। তারপরেই দরজা খুলে এবং দরজাটা খোলা রেখেই আস্তে আস্তে সিঁড়ি ধরে নেমে যায়।

চমকে উঠে আতঙ্কিত স্বরে অতীন বলে--না না না, কোন দরকার নেই, যেও না কাজরী।

কাজরী আশ্চর্য হয়ে বলে--কি বলছো তুমি?

অনেক আপত্তি করে অতীন, কাজরীর হাত ধরে অনুরোধও করে, বলতে বলতে গলার স্বরটা প্রায় ফুঁপিয়ে ওঠে, কিন্তু কাজরী ছোট্ট একটি মিষ্টি ভ্রূকুটি হেনে অতীনের এই কাণ্ডটাকেই একেবারে স্তব্ধ করে দেয়।

সমস্যা হলো কাজরীর শরীরের একটা সমস্যা। কাজরী আবার বলে--এত আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছ কেন অতীন?

কোন কথা বলে না অতীন। কাজরীই বলে--ভাগ্যিস বিজয়াটা ডাক্তার হয়েছিল, নইলে লজ্জার মাথা খেয়ে পুরুষ ডাক্তারের সাহায্য নিতে হতো।

কাজরীর বান্ধবী যে বিজয়া, সেই বিজয়াই ডাক্তার হয়েছে। সেই বিজয়ারই কাছে যাবার জন্য তৈরী হয়েছে কাজরী।

এণ্টালি থেকে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের যে নতুন চওড়া রাস্তাটা সোজা পূবে চলে গিয়েছে, সেই রাস্তারই একটি সরু শাখা রাস্তার ধারে লতাবাহারে ঢাকা ছোট একটা একতালা বাড়িতে থাকে বিজয়া। বিজয়ার বাবা আছেন, মা নেই। একমাত্র মেয়ে এবং ছেলে নেই, বিজয়ার বাবা নবগোপালবাবুর জীবনে কোন উদ্বেগও নেই। বাড়িটা নিজের ; তার উপর ভাল পেনশন পান। তার উপর মেয়ে বিজয়াও রোজগেরে মেয়ে। বুড়ো বয়সের দিনগুলি বেশ আনন্দেই পার ক'রে দিচ্ছেন নবগোপালবাবু। শুধু একটি আক্ষেপ তাঁর এই নিশ্চিন্ত আনন্দের জীবনকে মাঝে মাঝে ব্যথা দেয়। বিয়ে করবে না মেয়েটা। এ-বেলা একটা মেয়ে আশ্রমের এবং ও-বেলা একটা অনাথ শিশু হোমের ভিজিটিং ডাক্তার বিজয়া যেন ওর ঐ দু'শো টাকার মাইনের জীবন নিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ে আছে। এর বেশি আর এক পা'ও এগিয়ে যেতে চায় না বিজয়ার জীবন।

বিজয়ার ছাত্রী-জীবনের প্রিয়তমা বান্ধবী কাজরীও জানে, বিয়ে করবে না বিজয়া। বিয়ে করবার কোন ইচ্ছাই নেই। বিয়ে করতে ইচ্ছেই হয় না। অদ্ভুত রকমের একটা শুকনো ও ঠাণ্ডা ক্যারেক্টার। জীবনে কোন দিন কোন পুরুষ মানুষের হাত ছুঁতে হবে, ভাবতেও শিউরে ওঠে বিজয়া। বিজয়া নিজেই কাজরীর কাছে হেসে হেসে একেবারে স্পষ্ট ক'রে কতবার বলেই দিয়েছে--তোর হাতটা ধরতে তবু লোভ হয়, কিন্তু...সত্যিই বিশ্বাস কর কাজি, কোন ভদ্রলোকের হাত ধরতে...ইস্, ভাবলেও গা ঘিন ঘিন করে।

অতীনের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে আক্ষেপ করে কাজরী—। বিজয়াটা একটা অদ্ভুত ইয়ে।

—কি বললে? প্রশ্ন করে অতীন।

—বিজয়াটা যেন বুঝতেই পারে না যে, ও একটা মেয়েমানুষ।

—তার মানে?

--পুরুষের ওপর ভয়ানক ঘেন্না। নিজেই বলে ; হোমের বাচ্চা মেয়েগুলোকে কোলে নিতেও ওর খারাপ লাগে না ; কিন্তু বাচ্চা ছেলেগুলোকে একটু ছুঁতেও ইচ্ছে করে না।

—একেবারে আইডিয়াল মেয়েমানুষ! কথাটা তিক্তস্বরে বলে ফেলেই অন্য দিকে মুখ ফেরায় অতীন।

কাজরীও ব্যস্ত হয়ে বলে--আচ্ছা, চলি এবার।

আবার চমকে ওঠে অতীন--কোথায় যাবে?

কাজরী—কি আশ্চর্য! কতবার বলবো? বিজয়ার কাছে যাচ্ছি। আমি দু'দিন ছুটি নিয়েছি।

অতীন--ছুটি নিয়েছ ভালই করেছ, কিন্তু বিজয়ার কাছে গিয়ে বিশ্রী কাণ্ডটা না করলে ভাল ছিল কাজরী।

কাজরী—ছিঃ কি যে বল!

হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে অতীনের বিমূঢ় ও অলস চোখের শ্রান্ত দৃষ্টিটা—এর মধ্যে ছিঃ করবার কিছু নেই।

কাজরী—অবশ্যই আছে। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, তাই নিজের জীবনের আনন্দটাকেও আনসেফ ক'রে দিতে তোমার ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু তোমার পাগলামির জন্য আমি তো একটা আবর্জনা পুষে রাখতে পারি না।

--আবর্জনা? অতীনের বুকের ভিতর থেকে প্রশ্নটা যেন কর্কশ বিস্ময় নিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে। কাজরীর মুখের ঐ নির্মম কথাটা অতীনের রক্তের সব উষ্ণতা আর উচ্ছলতাকে অপমানে পঙ্কিল ক'রে দিয়েছে। কিন্তু বুঝতে পারে না কি কাজরী, নির্মম কথাটা যে ওর নিজেরও ঐ এত সুন্দর ক'রে সাজানো-গোছানো যৌবনের অপমান?

কাজরী বলে—কথাটা একটু বেশি স্পষ্ট ক'রে বলেছি, কিন্তু মিথ্যে বলিনি অতীন। আমার জীবনে ও-জিনিস একটা বিশ্রী বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি হতে পারে?

অতীন—কিছুই বুঝলাম না কাজরী।

কাজরী—তুমি কি চাও যে আমি এই বয়সেই বুড়ী হয়ে যাই? তুমি কি চাও যে, তোমার কাজরীর চেহারাটা সব ছন্নছাড়া হয়ে যাক্। তুমি কি চাও যে আমাদের জীবনটা একটা নার্সারি হয়ে উঠুক?

শুনতে গিয়ে বোধহয় অতীনের কানে জ্বালা ধরে যাচ্ছে। রুমাল দিয়ে আস্তে আস্তে কপাল আর কান দু'টোকে মুছতে থাকে অতীন। কিন্তু কাজরী তার মনের অবাধ অভিযোগের আবেগে বলতেই থাকে—আমি কি চাকরি খোয়াবো? সোসাইটির এত বড় একটা কাজের দায় ছেড়ে দিয়ে আঁতুড় ঘরে গিয়ে ঢুকবো? গবর্নমেন্টের কালচারাল ডেলিগেশনের মেম্বার হয়ে একবার বিদেশে ঘুরে আসবার অনুরোধ পেয়েছি, সেটাও কি তুচ্ছ করবো?

একটু চুপ ক'রে থেকে তার পরেই জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ে কাজরী, নিঃশ্বাসের শব্দটাও রুষ্ট আক্ষেপের মত।—এই জন্যে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি অতীন, আর এরকম একটা দশা জীবনে আনবার জন্যও তোমাকে আমি ভালবাসিনি।

অস্বীকার করতে পারে না অতীন, তাই উত্তরও দিতে পারে না। কেন ভালবেসেছিল কাজরী এবং আজও ভালবাসে, এই প্রশ্নের উত্তর অতীন আজ তার এই সুন্দর চেহারার একটা তৃপ্তিহীন ক্লান্তির মধ্যেই পেয়ে গিয়েছে। আজও, এই তো কিছুক্ষণ আগে, বিজয়ার কাছে যাবার জন্য তৈরী হবার আগে, মেঘে ঢাকা দুপুরের রোদটা হঠাৎ মেঘ ছিঁড়ে ঠিকরে বের হয়ে ছড়িয়ে পড়লো যখন, তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আর হেসে হেসে অতীনের গলা জড়িয়ে ধরেছিল কাজরী ; এবং অতীনের গলা ছাড়েওনি কাজরী, যতক্ষণ না কাজরীর চোখের সেই বিহ্বল ইচ্ছার বেদনা শান্ত হয়েছিল। কাজরীর জীবনের শুধু এই একটি প্রয়োজনের আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য এবং ইঙ্গিত মাত্র উৎসর্গ হয়ে যাবার জন্য অতীনের এই সুন্দর চেহারাটা কাজরীর কাছে পড়ে থাকবে, এই তো ছিল কাজরীর ভালবাসার দাবি।

কিন্তু কি ভয়ানক দাবি! অতীনের স্নায়ু মজ্জা আর পেশীগুলি যেন কাজরীর কটাক্ষে ক্রীতদাসের খাটুনি খাটছে। কাজরীর স্বামী হলো কাজরীর মুখের ঐ গনগনে আভার মত রক্তিমতাকে শান্ত করবার মত একটা যান্ত্রিক পৌরুষ। তার বেশি কিছু নয়। এক বিন্দু শ্রদ্ধারও আস্পদ নয় ভাবতে গিয়ে রুমাল দিয়ে নিজের এই কপালটাকে যেন খিমচে ধরে অতীন।

মনে-প্রাণে আজ নিজের এই শরীরটাকে ঘেন্না করে আর একেবারে ছাই ক'রে দিতে ইচ্ছা করে।

--চললাম। বলতে বলতে অতীনের কাছে এগিয়ে এসে, আর গম্ভীর মুখটাকে সুস্মিত ক'রে আদুরে ঠাট্টার ভঙ্গীতে অতীনের গলা জড়িয়ে ধরে কাজরী।--কিচ্ছু ভেব না, সন্ধ্যা হবার আগেই ফিরে আসবো।

বিদায় নেবার আগে অতীনের চোখের কাছে হেসে হেসে দুলে উঠেছে কাজরী। শানিত ইস্পাতের একটা হাস্যোজ্জ্বল পুতুল। স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে শুধু বুঝতে চেষ্টা করে অতীন, কাজরীর এই শরীরের ভিতরটা কি শুধু শক্ত শক্ত হাড়ে ভরাট হয়ে আছে? রক্ত নেই, নাড়ি নেই, এক বিন্দু তপ্ততা, তরলতা আর কোমলতা নেই?

একমনে গভীর আগ্রহ নিয়ে এই ঘরের ভিতরে বেতের মোড়ার উপর বসে একটা ফাইল হাতে নিয়ে চিঠি পড়ছে কাজরী। অজস্র চিঠি এসে জমেছে এই ফাইলের ভিতর। এগজিবিশনের আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে কাজরীর চিন্তা।

কিন্তু আর বোধ হয় বেশিক্ষণ নয়, সন্ধ্যাটা ঘনিয়ে উঠতে আর বেশি দেরি নেই। অন্তত দু-তিনটি গাড়ি আর কিছুক্ষণ পরেই দুরন্ত উচ্ছ্বাসে ছুটে এসে এই পথের উপর থামবে। হর্নের মত্ত চিৎকার শুনেই উতলা হয়ে উঠবে কাজরী। হয় এক এক ক'রে, নয় একসঙ্গেই কলরবের তুফান তুলে, ক্যামাক স্ট্রীটের এই শান্ত সন্ধ্যাটার বুক একেবারে চঞ্চলিত করে এই ফ্ল্যাটের দিকে এগিয়ে আসবে কাজরীর জীবনের শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা আর পেটে খিল ধরিয়ে দেওয়া হাসির এক একজন আস্পদ।

না, ঠিক এই ফ্ল্যাটের ভিতরে ওরা আসবে না। পাশের ফ্ল্যাটে, যে ফ্ল্যাটকে পাঁচ হাজার টাকার ফার্নিচারে সাজিয়ে দিয়েছে অসিত দত্ত, সেই ফ্ল্যাটের ভিতর গিয়ে ওরা একটা প্রীতিময় মেলামেশা এবং অজস্র সুন্দর-সুন্দর চিন্তা ও কথার উৎসব হয়ে ফুটে উঠবে। কাজরীও আর এক মুহূর্ত এখানে সময় নষ্ট না ক'রে সেই উৎসবের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াবে। হয়তো দু'একবার ফিরে এসে এই ঘরের ভিতরে ছুটোছুটি করবে। কয়েকটা ফাইল, দু'টো জরুরী চিঠি, তিনটে রসিদ বই, টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে চলে যাবে। কিংবা নতুন রকমের পোস্টারের একটা ডিজাইন, বিজ্ঞাপনের প্রুফ আর বিলেতের বিখ্যাত আর্ট ক্রিটিকের প্রশংসাপত্র।

এই ক'মাস ধরে যে নিয়মে চলছে কাজরীর জীবন, আজও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না। কিন্তু সেজন্য অতীনের মন আর আক্ষেপ করতে চায় না। পাশের ফ্ল্যাটের প্রতি সন্ধ্যার ঐ প্রীতিময় উৎসবটাকে হিংসে করতেও আর ইচ্ছা করে না। ঠিকই করেছে কাজরী। অতীনের মত স্বামীর কাছে স্ত্রী হবার জন্য যেটুকু সময় লাগে, শুধু সেইটুকু সময় অতীনের কাছে থাকতে চায় কাজরী, তার চেয়ে এক মুহূর্তও বেশি নয়। এবং যখন মানুষ হতে চায়, তখনই মানুষের খোঁজে পাশের ঐ ফ্ল্যাটের মত মানুষী আসরের দিকে ছুটে চলে যায়। কাজরী যে শুধু একটা শরীর নয়, একটা প্রাণও বটে, সে সত্য স্বীকার করতে অতীনের মনে আজ আর কোন ভীরুতা, কোন কুণ্ঠা আর হিংসার বাধা নেই।

কাজরী যেন নিজেকে টুকরো টুকরো ক'রে ভাগ ক'রে দিয়েছে। একটা টুকরো শুধু অতীনের স্বামিত্বের কাছে ছেড়ে দিয়েছে কাজরী ; বাকিগুলি সবই ঐ ওদের কাছে, যেখানে শ্রদ্ধা আছে, কৃতজ্ঞতা আছে আর প্রাণভরা খুশির তুফানী হাসি আছে। তবু তো বেঁচে আছে। কাজরী। কিন্তু...।

চোখ বন্ধ করে, যেন মনে মনে ছুরি চালিয়ে একটা হেঁয়ালির বুক চিরে দেখতে থাকে অতীন, এ কেমন স্বামিত্ব? কাজরীর মুখের একটা উত্তপ্ত হাসির আভার কাছে অতীনের

জীবন শুধু একটা পুরুষ হয়ে পড়ে আছে! কাজরীকে দোষ দিয়ে লাভ কি? কাজরীই তো কতবার অতীনকে অনুরোধ করেছে, বাকি সময়টা ঘরের মধ্যে পড়ে থাক কেন? যাও না, বাইরে একবার বেড়িয়ে এস। তুমি তো টেনিস খেলতে ভালবাস, তবে সাউথ ক্লাবের মেম্বার হতে দেরি করছো কেন?

কাজরীর মুখটা চোখে পড়বে, বোধ হয় এই ভয়ও ছিল, নইলে এতক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে থাকবে কেন, এবং চোখ না খুলেই সিগারেট ধরাবে কেন অতীন?

রুমাল দিয়ে কপাল মুছে, জোরে গলা কেশে, চোখ মেলে তাকায় অতীন, এবং কাজরীর সুন্দর মুখটা চোখে পড়তেই হেসে ফেলে।

কাজরী আশ্চর্য হয়--কি হলো?

অতীন--কি?

কাজরী--হঠাৎ হেসে উঠলে কেন?

অতীন--কাল বিকেলবেলা আমাদের মারোয়াড়ী মালিক মশাই-এর বাচ্চা নাতিটাকে একটা লিচু কিনে দিয়েছিলাম। এক আনা দাম, দেখতে দিব্যি পাকা টুসটুসে একটা মাটির লিচু। লিচুটাকে হাতে নিয়ে একটা কামড় দিয়েই কেঁদে ফেলেছিল বাচ্চাটা।

কাজরী আরও আশ্চর্য হয়--কেন?

অতীন হাসে--বুঝতে পারলে না? শাঁস নেই, টেস্ট নেই, মাটির তৈরী একটা লিচু। বাচ্চাটার দাঁতে ভয়ানক ব্যথা লেগেছিল।

হেসে ওঠে কাজরী--হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় অতীন। না, আর এই ঘরের ভিতর থাকা উচিত নয়, আটটা প্রায় বাজে ; পাশের ফ্ল্যাটের উৎসবের চিৎকার বেজে ওঠবার আগেই বাইরে চলে যাওয়া ভাল।

জ্বলন্ত সিগারেটের শেষ টুকরোটা ঘরের ভিতরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায় অতীন। চেঁচিয়ে ওঠে কাজরী--কি সর্বনাশ, সিগারেটের আগুনটা বিছানার উপর পড়েছে অতীন। চাদরটাও পুড়তে শুরু করেছে।

--ইচ্ছে থাকে তো নিভিয়ে দাও। মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে শুধু দেখতে থাকে অতীন।

--তোমার মাথা খারাপ হলো নাকি? পোড়া বিছানার ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে আতঙ্কিত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে কাজরী। অতীনও হাসতে হাসতে ফিরে এসে জুতোসুদ্ধ পা-এর তিনটে লাথি দিয়ে বিছানার আগুনটাকে থেঁতলে নিভিয়ে দেয়।

ব্যস্তভাবে আবার ঘর ছেড়ে চলে যাবার জন্য দরজার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায় অতীন। দরজার কাছে এক অপরিচিতা আগন্তুকার মূর্তি।

আগন্তুকার মুখের দিকে তাকিয়ে খুশি হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে কাজরী--কী সৌভাগ্য! কী সৌভাগ্য! এ যে দিনে চাঁদ উঠলো দেখছি!

যেমন আগন্তুকা তরুণীর মুখটা, তেমনি সাজটা, দুই-ই যেন দু'টি চাঁদ-চাঁদ সুন্দর ও ঠাণ্ডা ছবি। তরুণীটির মুখটি দেখতে বেশ, কিন্তু যেন নিরম্বু উপবাসে অভ্যস্ত আর জপ-তপ করা একটা শুকনো বৈরাগ্যে মাখা। দেখলে সন্দেহ হয়, মহিলা বোধ হয় বেশ অল্প বয়সে বিধবা হয়েছেন। সাজটাও একেবারে সাদা। ফিনফিনে সাদা ভয়েলের শাড়ি, সাদা লেসের পাড়। জামাটা সাদা। জুতোও তাই। কোথাও কোন রং-এর ছিটেফোঁটাও নেই। শুধু চোখ দু'টি কুচকুচে কালো।

তরুণীর কুচকুচে কালো চোখের দৃষ্টিটাই যেন হঠাৎ আহত হয়ে থমকে গিয়েছে। ঘরের ভিতরে অতীনকে দেখে অপ্রস্তুত হয়েছে তরুণী। অতীনের মুখের দিকে চোখ পড়তেই চোখ ফিরিয়ে নেয়।

কাজরী বলে--তোমার কি কোন অসুখ করেছিল? চেহারাটার এরকম দুর্দশা করেছো

কেন?

আগন্তুকার চেহারার মধ্যে দুর্দশার কোন চিহ্ন দেখতে পায় না অতীন। হ্যাঁ, চেহারাটা একটু উতলা হয়েছে বলে মনে হয়। শাড়ি পরবার রকমটাই কেমন এলোমেলো। খোঁপাটাকে যেন অর্ধেক বেঁধে ছেড়ে দিয়েছে। বোঝা যায় না, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সত্যিই কিছু দেখছে এবং শুনছে কিনা এই মহিলা।

কাজরী ডাকে—ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে এস!

আস্তে আস্তে হেঁটে ঘরের ভিতরে ঢোকে তরুণী, এবং একটা খালি চেয়ারের কাঁধ ছুঁয়ে চুপ করে আনমনার মত দাঁড়িয়ে থাকে।

কাজরী বলে—প্রতিমাদির কাছে শুনলাম, তুমি নাকি ডাক্তারী ছেড়ে দিয়েছ বিজয়া?

বিজয়া! নামটা যেন একটা সাপিনীর রক্তমাখা মুখের হিসহিস উল্লাসের শব্দের মত বেজে উঠছে। সেই মুহূর্তে ঘর ছেড়ে চলে যায় অতীন।

কাজরী হাসে—ভদ্রলোককে কিন্তু অভদ্র মনে করো না ভাই। খুব কাজের তাড়া আছে ; দুশ্চিন্তাও আছে। তাই এত ব্যস্ত হয়ে চলে গেল।

বিজয়া আনমনার মত বিড়বিড় করে—তা তো যাবেনই।

কাজরী—সত্যিই ডাক্তারী ছেড়ে দিয়েছ?

বিজয়া—হ্যাঁ।

কাজরী হাসে—তা তোমার আর ভাবনা কিসের? বাপের একমাত্র কন্যারত্ন, আর বাবা বেচারার সম্পত্তিও যথেষ্ট।

বিজয়ার গম্ভীর ও বোকা-বোকা মুখটার দিকে তাকিয়ে কাজরী ভ্রূকুটি ক'রে হাসে।—তা ছাড়া, তোমার ডাক্তারীর যা ছিরি দেখলাম, ওরকম ভীতু ডাক্তারী ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

বিজয়া—কি? কিসের ছিরি?

কাজরী—সামান্য একটু ট্রিটমেণ্ট করতে হাত কাঁপিয়ে, ঢোঁক গিলে, ঘামে নেয়ে আর ককিয়ে-ককিয়ে...ছি ছি...কি কাণ্ডই না করেছিলে! আমাকে সেদিন তুমি বড্ড ভূগিয়েছিলে বিজয়া।

বিজয়া—অ্যাঁ? কি বললে? কি হয়েছিল?

কাজরী আশ্চর্য হয়ে হাসে—আমি কি চীনে ভাষায় কথা বলছি যে বুঝতে পারছো না?

বিজয়া যেন ভয়ে ভয়ে হাসে।—চীনে ভাষা কি খুব শক্ত?

কাজরী—যাকগে ; সত্যি, সেদিন তোমার ওপর খুব রাগ হয়েছিল।

বিজয়া—রাগ কেন?

কাজরী—মনে ক'রে দেখ তো, কি ভয়ানক সাধতে হয়েছিল তোমাকে?

বিজয়া—মনে আছে ; কিন্তু...।

কাজরী—কি?

বিজয়া—ভদ্রলোকও কি খুব রাগ করেছেন?

কাজরী—হ্যাঁ। কিন্তু ওর রাগ হলো উলটো রাগ।

বিজয়া ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকায়—তার মানে?

কাজরী—তার মানে, অতীনের একটুও ইচ্ছা ছিল না যে, আমি তোমার কাছে যাই।

বিজয়ার চোখ থরথর করে কাঁপে—অতীনবাবুর আপত্তি ছিল?

কাজরী হাসে—আপত্তি বলে আপত্তি! তোমারই মত কেঁদে ককিয়ে আমার হাত ধরে বার বার...।

উঠে দাঁড়ায় বিজয়া—আমি যাই।

কাজরী রাগ করে।—চা খেয়ে যাবে না?

বিজয়া—না।

কাজরী অভিমানের সুরে বলে—তবে এসেছিলে কেন?

বিজয়া হাসে—সত্যি, কেন যে হঠাৎ চলে এলাম বুঝতেই পারছি না।

দরজার দিকে এগিয়ে যায় বিজয়া। কাজরীও সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে প্রশ্ন করে—আবার কবে হঠাৎ চলে আসবে বল?

বিজয়া—দেখি।

কাজরী—দেখি নয়, কবে আসবে বল?

বিজয়া—আসবো, নিশ্চয় আসবো।

কাজরী—একটা ছুটির দিন দেখে সকালের দিকে এস।

কোন দিন মুখ লুকিয়ে কথা বলবার অভ্যাস ছিল না যে মেয়ের, সেই মেয়েই আজকাল কেমন যেন ভয়ে ভয়ে এবং গোপন অপরাধের মানুষের মত মুখ লুকিয়ে কথা বলে। নিজের চোখেই দেখেছেন সুধাময়ী, স্কুলের খাতা সামনে খোলা রেখে আনমনার মত কি যেন ভাবছে আর ভেবেই চলেছে কেতকী।

কমলবাবুও কয়েকবার প্রশ্ন করেছেন—আজকাল স্কুলের খাটুনি কি খুব বেড়েছে কেতকী? তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

কেতকী—না।

কমলবাবু—তবে?

মুখ লুকোয় কেতকী—আপনি মিছে ভাবছেন কেন?

কমলবাবুকে মুখ লুকিয়ে একটা কথা বলে সান্ত্বনা দিলেও মনে মনে স্বীকার না করে পারে না কেতকী, এই বাড়ির বুকের ভিতরটাকে ভাবিয়ে দেবার মত কাণ্ড ক'রে তুলেছে নির্মল।

নিজের কাণ্ডটাই বা কি কম? কাণ্ডটা যে গানের ছাত্রী চিত্রার চোখের সামনে, চিত্রার মা আর জেঠিমা'রও চোখের সামনে ঘটে গিয়েছে। একটা ভজনের শেষের লাইনটা, তার মধ্যে এমন কোন দুঃসহ বেদনার কথাও ছিল না, ছিল শুধু প্রীতমের আওয়ন কি আওয়াজ। কিন্তু গানটাকে লয়ে নিয়ে যাবার আগেই হঠাৎ যেন গলা ধরে গেল কেতকীর, এবং দু'চোখ জলে ভাসিয়ে বোবার মত চুপ ক'রে বসে রইল।

—কি হলো কেতকীদি? আতঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে ওঠে চিত্রা। চিত্রার আতঙ্কের কথা শুনে মা ও জেঠিমা ছুটে আসেন। পাখা হাতে নিয়ে কেতকীর মাথায় বাতাস করে চিত্রা।

—কি হলো? শরীর খুব খারাপ লাগছে? প্রশ্ন করেন চিত্রার জেঠিমা।

কেতকী—হ্যাঁ। মাথার যন্ত্রণা।

—ডাক্তার ডাকবো?

কেতকী—না।

—তবে?

কেতকী—বাড়ি যাব।

চিত্রা আপত্তি করে—না না, একা একা এভাবে বাড়ি যেতে পারবেন না কেতকীদি। কেউ সঙ্গে যাক।

কেতকী বলে—তাহ'লে নির্মলবাবুকে একটা খবর দাও চিত্রা।

এসেছিল নির্মল, এবং চিত্রাদের বাড়ির এতগুলি বিস্মিত চোখের সামনেই কেতকীকে হাত ধরে তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

সেদিন বাড়ি ফিরতে বেশ রাতও হয়ে গিয়েছিল, কারণ নির্মলের সেই শক্ত হাতের মুঠো

থেকে হাত ছাড়াতে পারেনি কেতকী। নির্মলের ইচ্ছাটার মধ্যেও একরকমের ডাকাতিপনা আছে। পৃথিবীর চোখের সামনেই কেতকীর হাত ধরে টানাটানি করতে এক ফোঁটা লজ্জার বাধাও নির্মল অনুভব করে কিনা সন্দেহ, নইলে, কেতকীকে একেবারে নিজের বাড়িতে ওভাবে নিয়ে গিয়ে চেয়ারের উপর বসিয়ে দিতে পারতো না।

দৃশ্যটা নির্মলের পিসিমাও স্বচক্ষে দেখলেন। শিশি থেকে আরকের মত কি-একটা ওষুধ ঢেলে তুলো ভিজিয়ে, পিসিমার চোখের সামনেই অনায়াসে ব্যস্ত হয়ে, কেতকীর কপালের উপর পটি বেঁধে দিল নির্মল।

পিসিমা যখন ঘরের ভিতরে নেই তখনও চোখ তুলে নির্মলের মুখের দিকে তাকাতে পারে না কেতকী। একটা অস্বস্তি ; সে অস্বস্তির মধ্যে একটা লজ্জাও যেন মুখ লুকিয়ে ছটফট করে। যেন নির্মলের হাতে ইচ্ছে করে এইভাবে ধরা পড়বার জন্য মাথার যন্ত্রণার দোহাই দিয়ে চতুর একটা চোখ-ছলছল বেদনার অভিনয় করেছে কেতকী। নিজেকে সন্দেহ করবার এত বড় প্রমাণ আর কখনো পায়নি কেতকী। কে জানে কেন নির্মল নামে এই সেদিনের চেনা মানুষটাকে এত ভাল লেগে গেল। কত তাড়াতাড়ি! ভোরের মৌমাছি যেমন প্রথম দেখা ফুলের উপর একেবারে ঝাঁপ দিয়ে লুটিয়ে পড়ে, কেতকীর প্রাণটাও প্রায় সেই রকমেরই একটা কাণ্ড ক'রে বসে আছে। সত্যিই তো, এই ক'মাস ধরে মনের ভিতরটা যেন একটা সৌরভের লোভে গুনগুন করেছে। এই তো সেই সৌরভ, কেতকী আজ আর অস্বীকার করে না, আরকে চোবানো যে তুলোর পটি কেতকীর কপালের জ্বালা স্নিগ্ধ ক'রে দিচ্ছে, সেটা যে নির্মল নামে এই মানুষটির হাতের স্পর্শে সুরভিত হয়ে রয়েছে। ভাল লাগে, নির্মলকে ভাল লাগে, একটুও মিথ্যে নয়, নির্মলের মুখের দিকে চোখ তুলে না তাকালেও এই সত্য মিথ্যে হয়ে যাবে না।

বেশ একটু উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করে নির্মল—হঠাৎ মাথার ভেতর এরকম একটা যন্ত্রণা কেন হলো কেতকী?

কেতকী চোখ তুলে তাকায়—নিজেরই ওপর রাগ ক'রে?

—কেন?

কেতকী হাসে—ভয় পেয়েছিলাম বলে।

নির্মল আশ্চর্য হয়—ভয়? কাকে ভয়?

কেতকী—আপনাকে।

আরও আশ্চর্য হয় নির্মল—আমাকে? কেন?

কেতকী—মাত্র একদিনের দেখার ,পর কোন মেয়েকে যে মানুষ ওসব কথা বলতে পারে, তাকে ভয় না পেয়ে উপায় কি বলুন?

নির্মল—তাই বল। সেই জন্যেই বোধ হয় আর এ-বাড়িতে একটা দিনও আসবার সময় পেলে না। শুধু সন্দেহ ক'রে দূরে সরে রইলে।

এটাও একটা কঠোর সত্য কথা। রোজ সন্ধ্যায় শুধু এই রাস্তাটাকেই ভয় ক'রে অনেক ঘুরে অন্য রাস্তা ধরে কেতকী তার গানের ছাত্রী চিত্রাদের বাড়িতে গিয়েছে।

কেতকীর কাছে এগিয়ে এসে অতি শান্ত কিন্তু যেন বড় শক্ত স্বরে আস্তে আস্তে বলে নির্মল—যা বলছি তোমাকে, তার মধ্যে একটুও মিথ্যে নেই কেতকী। আজও বলছি তোমাকে, তোমার সব কিছুই ভাবতে ভাল লাগে। কিন্তু...।

কেতকী—কি?

নির্মল—কিন্তু তোমার যদি ভাল না লাগে, তোমার যদি অনিচ্ছা থাকে তবে...।

কেতকীর চোখের দৃষ্টিতে যেন জীবনের একটা দুঃসহ ক্ষতের জ্বালা ফুলকি ছড়িয়ে হঠাৎ চমকে ওঠে। চেঁচিয়ে ওঠে কেতকী—তবে কি? জোর করবেন?

অপ্রস্তুত হয়ে বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে বিড়বিড় করে নির্মল--তার মানে?

কেতকীর চোখের জ্বালা আরও প্রখর হয়ে যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে।--কমল বিশ্বাসের ছেলের মত জোর ক'রে...শুধু একটা মেয়েমানুষের অহংকার ভাঙবার গর্ব নিয়ে হাসতে হাসতে চলে যাবেন, এই তো?

কেতকী বোধহয় জানতে পারেনি, কতক্ষণ ধরে চোখে রুমাল চেপে ধরে সে এই চেয়ারে বসে ফুঁপিয়েছে, এবং রুমালটাও ভিজে চুপসে গিয়েছে কখন!

চোখ তুলতেই চোখে পড়ে কেতকীর, মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে আছে নির্মল, মুখটা যেন পুড়ে পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে। কমল বিশ্বাসের পুত্রবধূর অপমানিত জীবনের জটিল বেদনার রহস্যটা এইবার একেবারে স্পষ্ট হয়ে যেন নির্মলের চোখেও একটা নতুন বিস্ময়ের জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে।

কেতকী উঠে দাঁড়ায়--আমি যাই।

নির্মল বলে--আমার একটা কথা শুনে চলে যাও।

কেতকী--বলুন।

নির্মল--তোমার যদি ভাল না লাগে, যদি বিন্দুমাত্র অনিচ্ছা থাকে, তবে তোমাকে ছোঁয়া দূরে থাক, আমি তোমার মুখের দিকে তাকিয়েও তোমাকে অপমান করবো না।

চোখ ফেরায় না কেতকী, যেন বিপুল এক সম্মানের মন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে কেতকীর সারা শরীরটাই। নির্মলের মুখের দিকে অপলক চোখের সব বিস্ময় উৎসর্গ করে দিয়ে কেতকী বলে--যদি বলি ভাল লাগে?

আরও কাছে এগিয়ে এসে নির্মল বলে--যদি নয়, একেবারে স্পষ্ট ক'রে মুখ খুলে আমারই মত বেহায়া লোভ নিয়ে বলতে হবে।

কেতকী--হ্যাঁ, ভাল লাগে।

মুখ ঘোরায় না, সরেও যায় না কেতকী। দরকার কি? দু'টি ঠোঁটের উপর একটা আকুল আদরের ছোঁয়া বরণ ক'রে নেওয়া, এই তো। কেতকীর হৃৎপিণ্ডের ভিতর যেন অঢেল শ্রদ্ধা ঢেলে দিয়েছে নির্মল, ঐ একটি ছোঁয়া দিয়ে বুকের উপর জড়িয়ে ধরে।

ভিতরের ঘরের দিকে ঠুং-ঠাং ক'রে চা-এর বাসন শব্দ করে। পিসিমা বোধ হয় তৈরী ক'রে ফেলেছেন।

নির্মল বলে--চা খেয়ে একটু জিরিয়ে নাও কেতকী। তারপর যেও। আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবো।

ঠাকুরদালানের থামগুলি আর একটা কালবৈশাখীর ধাক্কা এবং আর একটা বর্ষার গলানি সহ্য করতে পারবে কি? মাকড়সার ঝুলের ভিড়ে ঢাকা পড়ে গেলেও ছাদের ফাটলটা বোঝা যায়। তিনটে থাম বেশ আলগা হয়ে এক দিকে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আবার এই ভাঙা-বাড়ির কমল বিশ্বাস আর সুধাময়ী, দু'টি চক্রান্তের বুড়ো-বুড়ির মত গম্ভীর হয়ে ঠাকুরদালানের বারান্দার উপর মুখোমুখি বসে থাকেন। দু'টি শীর্ণ ও ভীরু মনুষ্যত্ব, যেন ফিসফিস করবারও আর শক্তি নেই। আবার নতুন একটা ভয়ের ছায়া দেখতে পেয়ে ভয়ানক সাবধান হয়ে গিয়েছে ঐ দু'টি চক্রান্তের কারিগর। দু'জনে চোখে-চোখে কথা বলেন।

দু'জনের দু'জোড়া চোখ একটা নতুন দৃশ্য দেখতে পেয়েছে। সেই অল্পবয়স্ক ভদ্রলোক, নির্মল যার নাম, সেই ছেলেটি রোজই সন্ধ্যার পর কেতকীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায়।

ক্ষেপী বউ-এর বাগানটা জঙ্গল হয়ে গেলেও তার ঐ বাঁশ তেঁতুল আর ময়না-কাঁটার ঝোপঝাড়ের আড়ালে আজও আশ্বিনে ফুল ফোটে, সে ফুলের নাম সধবা শিউলি। এই

শিউলির প্রায় সবটাই লাল, সাদা শুধু পাপড়ির প্রান্তটুকু। ঐ ফুলের খবর আর ঐ ফুলের এই নামের খবর আজ আর কেউ রাখে না, পাঁচুর দিদি-বুড়ীর মত দু'একজন পাতা-কুড়োনো মানুষ ছাড়া।

শুকনো পাতা আর ঝুরি কাঠের প্রকাণ্ড একটা বোঝা মাথায় নিয়ে পাঁচুর দিদি-বুড়ী মাঝে মাঝে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উঠানের উপর দাঁড়ায়, চেঁচিয়ে হাঁক দেয়--জ্বালানি নিবে কি গো দিদি?

সুধাময়ী সাড়া দেবার আগেই কেতকী ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে। চারটে পয়সা পাঁচুর দিদি-বুড়ীর হাতে ধরিয়ে দেয়। জ্বালানির বোঝা রেখে দিয়ে চলে যায় পাঁচুর দিদি-বুড়ী।

পাঁচুর ঐ দিদি-বুড়ীও আজ একটা কাণ্ড ক'রে চলে গেল। কোঁচড়ের ভিতর থেকে পদ্মপাতায় মোড়া একগাদা ফুল বের ক'রে কেতকীর হাতের কাছে এগিয়ে দেয়—নাও দিদি, পাতা কুড়ুতে গিয়ে পেয়ে গেলুম, তাই তোমার জন্য চারটিখানি সধবা শিউলি নিয়ে এলুম।

অদ্ভুত চেহারার আর অদ্ভুত নামের একগাদা ফুল কেতকীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে পাঁচুর দিদি-বুড়ী যেন ঠিক সময় বুঝে কেতকীর মনের কল্পনাকে একটা রঙীন শাসানি দিয়ে চলে গেল। আজ বোধ হয় নির্মলের মনের আশা আর মুখচোরা হয়ে থাকবে না। একেবারে স্পষ্ট ভাষায় দাবি ক'রে বসবে নির্মল, এবং স্পষ্ট ভাষায় উত্তর না দিয়ে রেহাই পাবে না কেতকী। নির্মলের পিসিমা আজ সকালে কেতকীকে চা খেতে নিমন্ত্রণ করেছেন। কোন সন্দেহ নেই, এই নিমন্ত্রণই হলো একটা দাবি শোনাবার আয়োজন। পিসিমা ও তাঁর ভাইপো, দু'জনেই আজ বোধ হয় একেবারে প্রতিজ্ঞা ক'রে তৈরী হয়েছেন। জানতে চান দু'জনেই, কেতকীর মনে কোন আপত্তি আছে কি; যদি কেতকীর জীবনটাকে তাঁরা এই রকম সধবা শিউলির মত রঙীন ক'রে দিতে চান।

আপত্তি? সত্যিই যে একটুও আপত্তি করতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু কেন? বুকের ভিতরে এরকম একটা ইচ্ছার উৎসব জেগে উঠলো কেন? ভুল করছে না তো জীবনটা?

পিসিমার চা-এর নিমন্ত্রণে যাবার জন্য অনেকক্ষণ আগেই তৈরী হয়েছিল কেতকী। আর সময় নেই, এইবার যেতে হবে।

নিজের সাজটারও দিকে চোখ পড়ে। এটাও একটা কাণ্ড! কেতকীর হাত দুটো যেন স্বপ্নের ঘোরে কেতকীকে এরকম রঙীন সাজে সাজিয়ে দিয়েছে। লজ্জা পেয়েই বা আর লাভ কি?

তবু লজ্জা পেতে হয়। ঠাকুরদালানের দিকে চোখ পড়তেই লজ্জা পেয়ে চমকে ওঠে কেতকী, মুখ ফিরিয়ে নেয়। কমল বিশ্বাস আর সুধাময়ী চুপ ক'রে মুখোমুখি বসে কেতকীরই দিকে তাকিয়ে আছে। বেবিটা শুয়ে আছে দু'জনের মাঝখানে। বেবির মাথাটা সুধাময়ীর কোলে, আর পা দুটো কমল বিশ্বাসের কোলে। দুরন্ত বেবিটা শুয়ে-শুয়েই পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে বুকব্যথার রোগী ঐ বুড়ো মানুষটার বুক আর পাঁজরের উপর লাথালাথি করছে।

পথের উপর এসে দাঁড়াতেই আর একবার লজ্জা পেয়ে মাথা হেঁট করে কেতকী ; কেতকীর হাতে বেবির একটা ফটো। আজই বেবির এই ফটোটা নির্মলকে উপহার দিতে হবে, একথাই বা কেতকীর কানে-কানে কে বলে দিয়ে গিয়েছে?

পথ চলতে লজ্জা করে না, কিন্তু নির্মলের বাড়ির বারান্দায় উঠেই আর একবার চমকে ওঠে ও লজ্জা পায় কেতকী। পদ্মপাতায় মোড়া সধবা শিউলিকেও যে কেতকী হাতে নিয়ে চলে এসেছে। সব-ই কি ভুলো মনের ভুল? না ইচ্ছে করে তৈরী করা যত ভুল?

পিসিমা হাসছেন। নির্মল মুখ ফিরিয়ে হাসছে। কেতকীর হাতের দুই উপহার যে কেতকীর জীবনের একেবারে পূর্ণ উৎসর্গের অঙ্গীকার হয়ে এরই মধ্যে ধরা পড়ে গিয়েছে।

ওরাও বোধ হয় আর কোন প্রশ্ন করবে না, এবং কেতকীরও আর কোন কথা মুখ খুলে স্পষ্ট ক'রে না বললেও চলবে। ঢিপ ঢিপ করে কেতকীর বুক। রুমাল দিয়ে বারবার চোখ-মুখ মোছে কেতকী ; কিন্তু বুকটা যেন এই হঠাৎ অস্থিরতা শান্ত করতেই চায় না।

পিসিমা বলেন—যাক, নিশ্চিন্ত হলুম কেতকী। আশীর্বাদ করি।

পিসিমা ঘরের ভিতর চলে যেতেই রুমাল দিয়ে চোখ চেপে ফুঁপিয়ে ওঠে কেতকী। নির্মল ব্যথিতভাবে বলে—কি হলো কেতকী? তোমার কি কোন আপত্তি আছে?

কেতকী—একটুও না।

নির্মল—বিয়ের পর আমার সঙ্গে চলে যেতে আপত্তি আছে?

কেতকী—না।

নির্মল—তবে? দুঃখ করছো কেন?

কেতকী—একটুও দুঃখ করছি না।

চোখের উপর থেকে রুমাল সরিয়ে নির্মলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কেতকী। ঠাট্টার সুরে হাসতে থাকে নির্মল—আবার কোন সন্দেহ করছো না তো?

কেতকী—সন্দেহ মিটে গিয়েছে, তাই দু'চোখ ভরে দেখছি।

নির্মল—কি দেখছো?

কেতকী—নতুন জিনিস।

নির্মল—জিনিসটা কি?

কেতকী—স্বামীর মুখ।

নির্মল হাসে—এখনই ওকথাটা বললে যে, একটু বে-আইনী কথা হয়ে যাবে কেতকী?

কেতকী—একটুও না।

নির্মল—কেন?

কেতকী—বিয়ে না হলেও তুমি আমার স্বামী।

নির্মল—তাই বা কেন?

কেতকী—তোমাকে স্বামী বলে মনে ক'রে ফেলেছি।

নির্মল—মনে ক'রে ফেললেই বা কেন?

কেতকী—বিশ্বাস করতে পেরেছি বলে।

নির্মল—আমি তোমাকে সত্যিই ভালবাসি, এই বিশ্বাস?

কেতকী—না, সে বিশ্বাসের জন্য নয় ; তুমি আমাকে ভাল না বাসলেও তোমাকে স্বামী মনে করতাম।

নির্মল—তাহ'লে বল, তুমি আমাকে ভালবাস, এই বিশ্বাস তোমার আছে বলেই আমাকে...।

কেতকী—না, তা'ও নয়। তোমাকে যদি একটুও ভাল না লাগতো, তবু তোমাকে স্বামী বলে মনে মনে মেনে নিতাম।

নির্মলের চোখের এতক্ষণের প্রশ্নব্যাকুল হাসিটা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। কেতকীর ঐ চোখ আর মুখের মধ্যে তো বিন্দুমাত্র কৌতুক নেই। যেন ব্যাকুল হয়ে ওর বুকের ভিতর থেকে জীবনের সব সুখ-দুঃখ ভয় আর আনন্দের অনুভবে মাথা হয়ে এই অদ্ভুত কথাগুলি ওর এক অদ্ভুত বিশ্বাসের কলরবের মত বেজে উঠছে।

মুখ ফিরিয়ে, এবং যেন ভয়ে ভয়ে কুণ্ঠাহত স্বরে প্রশ্ন করে নির্মল—তাহ'লে স্বামী কাকে বলে কেতকী?

কেতকী চেয়ার ছেড়ে নির্মলের কাছে এগিয়ে আসে। যেন দু'চোখের একটা দুর্বার ক্ষুধাতুর দাবী নিয়ে আস্তে আস্তে বলে—আগে আমার একটা কথার উত্তর দেবে বল?

নির্মল—বল!

কেতকী—যদি বিয়ে না হয়, যদি আমি এই মুহূর্তে মরে যাই, যদি কাউকে না বলে কোথাও চলে যাই, তবে বেবি কি তোমার কাছে থাকতে পারে না?

নির্মল--নিশ্চয় পারে।

নির্মলের বুকের উপরে মাথা লুটিয়ে দিয়ে ছটফট করে কেতকী—আমার ছেলেকে ভালবেসে বাঁচিয়ে রাখবে যে, সে-ই তো আমার স্বামী। ভয়ানক স্বার্থপরের মত কথা বললাম নির্মল ; জানি না, ভুল বলছি কি ঠিক বলছি ; জানি না, একথা শুনতে পেলে পৃথিবীতে কেউ আমাকে আশীর্বাদ করবে কি না।

পুরুষের বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে একটা মেয়েমানুষের আত্মা যেন ভালবাসার সব চেয়ে বড় ভয় ভেঙে নিচ্ছে। দৃশ্যটা নির্মলের মত পাকা অডিটারের মনের যত অঙ্ক আর হিসাবেও ধাঁধা ধরিয়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণ মাত্র, আধ মিনিটও হবে না, চোখ বন্ধ ক'রে কি-যেন ভাবতে থাকে নির্মল। চোখ খুলতেই হেসে ওঠে নির্মলের চোখ। কি আর এমন অদ্ভুত কথা বলেছে কেতকী? সত্যিই তো, ও বিশ্বাস না পেলে মেয়েমানুষের জীবন মেয়েলি হবে কি করে?

কেতকীর মাথায় হাত রেখে নির্মল বলে—তুমি ঠিকই বলেছ কেতকী।

পিসিমার হাতের নাড়া-চাড়া খেয়ে চা-এর বাসন খুব জোরে শব্দ ক'রে উঠেছে। সরে গিয়ে চেয়ারের উপর বসে কেতকী।

পিসিমা ঘরের ভিতর থেকেই চেঁচিয়ে বলেন--তাহ'লে কথাটা নিয়ে সেইসঙ্গে বিয়ের দিনটাও ঠিক করবার জন্য কমলবাবুর কাছে যাবে কে নির্মল? তুই না আমি?

নির্মল উত্তর দেয়--আমি যাব।

কেতকী মুখ ঘুরিয়ে হাসি লুকোয়। নির্মলও গলার শব্দ লুকিয়ে হাসতে থাকে—যাব তো নিশ্চয়, কিন্তু বুড়োমানুষ শেষকালে চুরির চার্জ না ক'রে বসেন।

কেতকী—ভয় নেই, আমিই বাঁচিয়ে দেব।

নির্মল—কেমন ক'রে?

কেতকী হাসে—আমি বলবো, আমিই চুরি করেছি।

বিছানাটার বেশ খানিকটা জায়গা, অর্থাৎ তোষকটার একটা কোণ, আর চাদরের একটা কিনারা পুড়ে গিয়েছে। চাকর ভাগবতও বুঝতে পারে না, যেখানে দুই ফ্ল্যাটেরই ঘর-জোড়া এত ভাল ভাল আসবাব পর্দা আর গদির শৌখিন ঘটা, সেখানে শুধু বাবু আর মা'র এই বিছানাটারই বিরুদ্ধে এত অবজ্ঞা কেন? না বাবু, না মা, দু'জনের কেউ কোন দিন বলেন না যে, চাদরটা বদলে দাও ভাগবত। আলমারি থেকে একটা ভাল চাদর বের করতেও কেউ বলেন না। ভাগবত নিজের বুদ্ধি মতো এই পোড়া-ছেঁড়া চাদরটাকেই ধুয়ে কেচে পোড়া-ছেঁড়া তোষকের উপর পেতে রাখে, তাই বিছানাটা বেঁচে আছে বলে মনে হয়।

সন্ধ্যার অন্ধকার একটু ঘনিয়ে উঠলেই আর ঘরের ভিতর নয় ; ঘর থেকে বের হয়ে যায় অতীন। এবং ফিরতে প্রায়ই মাঝ রাত হয়ে যায়। বাড়ির কাছে এসেই একবার পথের উপর থমকে দাঁড়ায়। ঐ যে, বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটে একটি ঘরের খোলা জানালা দিয়ে এখনও আলো ছড়িয়ে পড়ছে বাইরে, এবং নীল রঙের পর্দাটা কাঁপছে, সেই বাড়ির কাছে পথের উপর কোন গাড়ি এখনও দাঁড়িয়ে আছে কি? না, নেই। নিশ্চিন্ত হয়, তবে বাড়ির গেটের দিকে এগিয়ে যায় অতীন।

কে জানে কখন ওরা চলে গিয়েছে, কাজরীর ঐ কালচারের আর আর্টের জীবনের এক এক জন সুহৃদ্? কাজরীর কাছ থেকেই এই তিনটি মানুষের আরও পরিচয় জানতে পেরে আরও আশ্চর্য হয়েছে অতীন। তিনজনেই বড় ব্যবসায়ী, তিনজনই মস্ত বড় টাকার মানুষ।

এবং তিনজনই টাকার জীবনে তৃপ্তি পান না। অসিত দত্ত টাকা ছড়িয়ে মানুষের উপকার করেন, ওটা বলতে গেলে তাঁর জীবনেরই একটি আর্ট। জীমূতবাবু ছবির এগজিবিশনের জন্য অনায়াসে এক কথায় পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে ফেলেন, আর্টের প্রতি ওঁর এতই ভালবাসা। আর, গাঙ্গুলীর ঐ জার্নালিজম, সেটাও তাঁর জীবনের একটা সাধের আর্ট। বিদেশের কাগজে দেশের কোন প্রতিভার পাবলিসিটি করিয়ে দিতে তাঁর মতন দক্ষতা ক'জনের আছে? প্রায় প্রতি মাসে কলকাতার কোন না কোন গণ্যমান্য বিদেশীকে পার্টি দিয়ে বছরে কয়েক হাজার টাকার হোটেল বিল শোধ করেন। কাজরী কতবার মুগ্ধ হয়ে বলেছে—একে তো টাকা, তাতে শৌখিন রুচি, তাতে ট্যালেন্ট, তার উপর আর্ট ও কালচারের ওপর এত শ্রদ্ধা, ওরা ইচ্ছে করলে কিনা করতে পারে অতীন!

ক্যামাক স্ট্রীটের মাঝরাতের অন্ধকারে আর জ্যোৎস্নায় পুরো দু'টি মাস ধরে জারুল গাছের পাতার আড়ালে কোকিল ডেকেছিল ; আজকাল মাঝে মাঝে মেঘ ডাকে, এবং তাড়াতাড়ি পথ চলতে গিয়েই বুঝতে পারে অতীন, অতীনেরই ছায়া দেখতে পেয়ে মিস্টার সিনহার বাড়ির গ্রেট ডেন ভয়ানক রাগ ক'রে চিৎকার করছে।

মাঝরাতের নীরবতার মধ্যে চুপি-চুপি হেঁটে ঘরের ভিতরে ঢুকে রোজই দেখতে পেয়েছে অতীন, অঘোরে ঘুমিয়ে আছে কাজরী। শুধু তোষকের পোড়া জায়গাটা যেন জেগে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

ঘুমোক কাজরী। বিছানার দিকে এগিয়ে যাবার কথাও মনে পড়ে না অতীনের। বারান্দার চেয়ারের দিকে এগিয়ে যায়। ঘাড় কাত ক'রে বসে বসে ঘুমনো অতীনের প্রায় একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, বিশেষ কিছু কষ্ট হয় না।

হ্যাঁ, কষ্ট হয়, আতঙ্কিত হয়, অস্বস্তি বোধ করে অতীন, যখন হঠাৎ ঘুম-ভাঙা চোখে বিছানার উপর উঠে বসে ডাক দেয় কাজরী—অতীন।

এই ডাক যেন দুর্মর একটা আক্রোশের ডাক। কাজরীর সেই অবিকার অক্ষয় একরোখা ভালবাসার ডাক। কাজরীর সেই ডাকের কোন সাড়া না দিয়ে বরং স্নান করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাড়া না দিয়ে পারে না অতীন। এবং তার পর, কাজরী যখন আবার ঘুমিয়ে পড়বার জন্য অলস শরীরটাকে এলিয়ে দেয়, তখন উঠে গিয়ে স্নান করে অতীন।

সেদিন বাড়িতে ঢুকেও কেমন যেন মনে হয় অতীনের, পাশের ফ্ল্যাটের ঘরে মেলামেশার উৎসব কি আজকাল আর মেতে ওঠে না? ওরা কি আসা বন্ধ করেছে? ছাইদানিতে সিগারেটের ছাই জমছে না কেন?

ঘরের ভিতরে ঢুকে কাজরীকে দেখতে পেয়েই চমকে ওঠে অতীন। কোন দিন তো এত রাত পর্যন্ত জেগে বসে থাকে না কাজরী।

তবে আজ জেগে বসে আছে কেন? হাতে আর্ট আর কালচারের সরকারী চিঠির ফাইল নেই। সিল্কের তোয়ালেতে রঙীন সুতোর তাজমহলও আঁকে না কাজরী। শুধু চুপ ক'রে বসে ভাবছে। সারা মুখ জুড়ে যেন একটা দুশ্চিন্তার ছায়া স্তব্ধ হয়ে রয়েছে।

অতীনকে দেখতে পেয়ে কাজরীর সব দুশ্চিন্তার রুদ্ধ জ্বালা যেন চমক দিয়ে ফুটে ওঠে। —তুমি তো বেশ আছ, কারণ তোমার কিছুই অভাব হচ্ছে না।

অতীন—একথার মানে?

কাজরী—মনের মত স্ত্রীটিকে নিয়ে ইচ্ছে মত স্বামীটি হয়ে দিব্যি দিন কাটিয়ে দিচ্ছ।

অতীন—কিন্তু কি?

কাজরী—কিন্তু আমার কি উপায় হবে, যদি ওরা এভাবে সবাই একসঙ্গে আমার ওপর রাগ ক'রে দূরে সরে থাকে?

অতীন—রাগ করবার কারণ?

কাজরী—তা'ও যে কিছুই বুঝতে পারছি না। অসিত আজকাল গাড়িও পাঠায় না, অফিস থেকে ট্রামে বাড়ি ফিরতে হয়। গাঙ্গুলির কাছে চিঠি লিখেছিলাম আমার বিদেশে যাবার নিমন্ত্রণ পাইয়ে দেবার চেষ্টাটার কতদূর কি হলো? কিন্তু কোন উত্তর নেই। জীমূতবাবুকে ফোন করে হয়রান হচ্ছি, নাগালই পাই না। ছবির এগজিবিশন হবে না, তাই তো এখন সন্দেহ হচ্ছে।

হয় অতীনের চোখ দুটো, কিংবা মনটাই, কে জানে কোন্ মমতার ভুলে মেদুর হয়ে ওঠে। যে নারীর সুন্দর মুখটাকে শতবার অধরস্পর্শে উল্লসিত করেছে অতীন, সেই মুখের বিষাদ দেখতে কষ্ট হয়। সান্ত্বনার স্বরে বলে অতীন—তোমারই ভুল, ওদের কাছ থেকে তুমি এত বেশি উপকার আশা কর কেন কাজরী?

কাজরী আশ্চর্য হয়—তুমি তো ভয়ানক অদ্ভুত কথা বলতে পার! উপকার করবার মত ক্ষমতা ওদের আছে। ওরা অতীন বিশ্বাস নয়, ওদের কালচার আছে, পার্সোন্যালিটি আছে।

—টাকাও আছে ; অনেক টাকা। রুক্ষস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে অতীন।

অতীনের চোখের চাহনিতে যেন ডানার আগুন-লাগা একটা যন্ত্রণাক্ত পাখির ছানা ছটফট ক'রে ওঠে। কাজরীর কথাটা খাঁটি আগুন, একটুও মিথ্যে তার মধ্যে নেই। এবং এটাও মিথ্যে নয়, এই তো এক মুহূর্ত আগে অতীনের মনে হঠাৎ একটা আশা যেন হঠাৎ আবেগে ডানা দুলিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। অতীনের আশা আর ঐ সান্ত্বনার শখ কাজরীর একটি ধিক্কারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে অতীন। এই নারীর জীবনের আশা প্রচণ্ড মাতাল হয়ে পা পিছলে খানায় পড়ে রক্তাক্ত হয়ে যাবে, এই তো অতীনের ভয় ; তাই অতীনের মনে এক টুকরো মমতার আবেশ। তাই হাত বাড়িয়ে দিতে চেয়েছে অতীন, যেন সে হাত ধরে ফেলতে পারে কাজরী ; যেন কাজরীর জীবনটা টাল সামলাতে দাঁড়িয়ে যেতে পারে ও পিছিয়ে আসতে পারে, এবং সত্যিই খানার ভিতরে পড়ে গিয়ে রক্তাক্ত না হয়।

—এ তোমার হিংসে, বড় বিশ্রী হিংসে। কিন্তু ওরা টাকার জন্য বড় নয় অতীন। আর আমিও ওদের টাকার জন্য ওদের শ্রদ্ধা করি না। সুন্দর সুন্দর কাজে টাকা ঢেলে দেবার মত রুচি ওদের আছে। ঘরের ভিতরে ঘুরে-ফিরে এবং ছটফট করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকে কাজরী।

অতীন—শেষ পর্যন্ত ঐ একটি কথায় এসে পৌঁছতে হচ্ছে ; টাকা, টাকার জোর!

কাজরী হাসে—ভুল। তোমার নিতান্তই ভুল ধারণা।

কাজরীর ধারণাটাই ভুল। চুপ ক'রে, একেবারে স্তব্ধ হয়ে ভাবতে থাকে অতীন, এবং সেই সঙ্গে চোখের তারা দুটোও স্তব্ধ হয়ে একটা স্বপ্ন দেখতে থাকে। টাকা অঢেল টাকা ; অতীনের দুহাতের মুঠোর কাছে লক্ষ লক্ষ টাকার শব্দ ঝন্ ঝন্ ক'রে বাজছে। দেখে শুনে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে কাজরী। এ কি? চমকে মুখ ফিরিয়ে হেসে উঠেছে কাজরী ; তারপর ছুটে এসে অতীনকে জড়িয়ে ধরেছে...এতদিন কেন বলনি অতীন? কেন আমাকে জানতে দাওনি যে, এত টাকা তোমার আছে? কে বলে তোমার পার্সোন্যালিটি নেই, কালচার নেই।

দেখতে পায় অতীন, কাজরী একেবারে অতীনের চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যেন ওর জীবনের একটা প্রতিজ্ঞার গান গাইছে, এবং কাজরীর গলার স্বরটা মাতালেরই গলার স্বরের মত।—কাল আর অফিস যাওয়া হবে না। সকাল হলেই বের হয়ে পড়বো। ওদের ধরতেই হবে। দেখি, কেমন ক'রে কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে ওরা।...কেন লুকিয়ে থাকবে? কি এমন অপরাধ করেছি যে, ওরা এত রাগ ক'রে সরে থাকবে?

অতীনের বুকের ভিতরেও যেন একটা পাল্টা প্রতিজ্ঞা সাপের মত কিলবিল করে আর মাঝে মাঝে একেবারে ফণা তুলে দুলতে থাকে। মনে পড়ে রসিকপুরের এক কমল বিশ্বাসের

কথা, চমৎকার চক্রান্তের সেই কমল বিশ্বাস। মনে পড়েছে অতীনের, শুধু একটা সোনার গল্পের জোরে কি-না কাণ্ড করা যায়!

টাকা নেই, কিন্তু একটা গল্পের জোরে যদি মিথ্যে টাকার ভয়ানক শব্দ এখনি কাজরীর কানের কাছে ঝনঝনিয়ে বাজিয়ে দেওয়া যায়, তবে? তবে কি কাজরীর ঐ প্রতিজ্ঞার গান হঠাৎ লজ্জা পেয়ে বন্ধ হয়ে যাবে না? কাজরীর আশার এই দিশাহারা অভিযান যদি একটা ছলনার জোরে থামিয়ে রাখা যায়, তবে দোষ কি, ক্ষতিই বা কোথায়? অতীনের জীবনের আশা একেবারে মরে যাবার আগে যেন শেষবারের মত মরিয়া হয়ে ওঠে। থামাতে হবে, ধরে রাখতে হবে, কাজরীকে ওদের কাছে যেতে দেওয়া চলবে না। কোনমতেই না। কমল বিশ্বাসের ছেলের চোখের স্বপ্ন যেন সুন্দর এক ধূর্ততার প্রদীপের মত দপদপ ক'রে জ্বলতে থাকে।

বেশ জোরে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে অতীন। কাজরী বলে—কি হলো?

অতীন—আমাকে চিনতে তুমি কত ভুল করেছ, সেটা যদি বুঝতে চাও, তবে একটা গল্প বলতে পারি।

কাজরী—গল্প?

অতীন—শুনতে গল্পের মতই মনে হবে, কিন্তু সেটা গল্প নয়, আমাদের সাতপুরুষ আগের সৌভাগ্যের একেবারে একটা বাস্তব সত্য, যেটা আজও বাবার চার্জে আছে।

কাজরী ভ্রূকুটি ক'রে হাসে—তোমাদের সৌভাগ্য?

অতীন—হ্যাঁ, রসিকপুরের রাজবাড়ির সাতপুরুষ আগের সৌভাগ্যের সব পুঁজি, সব সোনা ঠাকুরদালানের থামের ভিতরে লুকনো আছে। কমল বিশ্বাস যখের মত আজও সেই সোনা পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু...কিন্তু আর কতদিন পাহারা দেবে? তারও যে যাবার সময় হয়ে এল?

কাজরী বিড়বিড় করে—কি বললে?

অতীন হাসে—ঠাকুর পদ্মনাভ নাকি স্বপ্ন দেখিয়ে সাবধান করে দিয়েছেন, ঐ সোনা যেন সাত পুরুষের মধ্যে কেউ ভোগ করতে চেষ্টা না করে।

কাজরী হাসে—তুমি কোন্ পুরুষ?

অতীন উৎফুল্ল হয়ে বলে—আমি আট পুরুষ। কাজেই বুঝতে পারছো কাজরী, ঐ সোনা আমারই ভোগে আছে।

খিল-খিল ক'রে হেসে ওঠে কাজরী।—গল্পটা সত্যিই চমৎকার, ওদেরও একদিন শোনাতে হবে।

অতীন বিশ্বাসের সুন্দর ধূর্ততার প্রদীপ এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিয়ে খিল-খিল ক'রে হাসছে কাজরী। শুনতে শুনতে বোধহয় বধির হয়ে গিয়েছে অতীন ; কতক্ষণ হেসেছে কাজরী, তা'ও বুঝতে পারেনি। অনেকক্ষণ পরে, যেন সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে চমকে ওঠে অতীনের চোখ। কাজরী মুখটা একেবারে অতীনের চোখের কাছে এনে হাসছে। অতীনের গলা জড়িয়ে ধরেছে কাজরী।

কাজরী বলে—এত গম্ভীর কেন অতীন? আমার কাছে তুমিই তো সোনা। গল্পের সোনা না পেলেও কিছু আসে যায় না।

কাজরীর মুখের হাসিটাকে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে দেখতে থাকে অতীন। হাড়ি-কাঠের মধ্যে গলা আটক হয়ে গেল কোন পশুও এত ভীত অসহায় ও করুণভাবে তাকায় না। অতীনের জীবনের কোন ক্লান্তি শ্রান্তি অবসাদ ও অনিচ্ছাকে ক্ষমা করবে না কাজরীর এই অগ্নিময় নিঃশ্বাসের ভালবাসা। কিন্তু অতীনের এই ঠাণ্ডা শরীরটার গলা জড়িয়ে এখনও কেন বুঝতে পারে না কাজরী, অতীন বিশ্বাসের বুকের ভিতরের সব রক্ত যে বরফ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু উপায় নেই ; নীরব হলেও নিথর হয়ে থাকতে পারে না অতীন। এই অনিচ্ছার শরীরটাকেই খাটিয়ে কাজরীর দাবিকে ঘুষ দিয়ে খুশি করতে হবে।

জারুল গাছের পাতার আড়ালে কোকিল ডাকেনি, মাঝরাতের অন্ধকারের মাথার উপরে মেঘও ডাকেনি। যখন ডেকে উঠলো সিনহা সাহেবের রাগী গ্রেট ডেন, তখন এই বোবা ঘরেরও অনেকক্ষণ নীরবতা আবার ভেঙে যায়।

কাজরী গম্ভীর হয়ে বলে--তোমার শরীরটা যে মাটি হয়ে গিয়েছে।

অতীন ভ্রূকুটি ক'রে বলে--হয় তো হয়েছে।

চেঁচিয়ে ওঠে কাজরী--কেন হবে?

অতীন--তুমিও যে তোমার শরীরটাকে মাটি ক'রে দিয়েছ।

কাজরী--তার মানে?

অতীন--তার মানে তুমি জান।

কাজরী--স্পষ্ট ক'রে বল, কি বলতে চাইছ?

অতীন--স্পষ্ট ক'রে বলছি। শুধু একটা মেয়েলি শরীর থাকলেই মেয়েমানুষ হয় না, প্রাণটাও মেয়েলি হওয়া চাই।

কাজরী--তার মানে, আজ আমাকে একটুও ভাল লাগলো না?

অতীন--একটুও না।

কাজরী--আমার কথাটাও তাহ'লে শোন।

অতীন--বল।

কাজরী--তোমাকেও আজ আমার একটুও ভাল লাগেনি।

অতীন--শুনে সুখী হলাম।

কাজরী--এখনও গা ঘিনঘিন করছে।

অতীন--তাহ'লে যাও স্নান ক'রে এস, আমি রোজই স্নান ক'রে ঘেন্না দূর করি।

কাজরীর দাঁতে-দাঁতে শব্দ বাজে--এই কথা?

অতীন--হ্যাঁ।

কাজরী--এটা স্বামীর মত কথা হলো?

অতীন--স্বামী কা'কে বলে জানি না।

কাজরী--স্ত্রী কা'কে বলে, সেটা জান কি?

অতীন--জানি।

কাজরী--কাকে বলে?

অতীন--আমার ছেলেকে ভালবেসে বাঁচিয়ে রাখবে যে মেয়ে।

কাজরী--তার মানে কেতকী?

অতীন--ইচ্ছে করলে এ সন্দেহ করতে পার। আমার আপত্তি নেই।

কাজরী--তাহ'লে বল তুমি কেতকীরই স্বামী?

অতীন--একেবারে মিথ্যে কথা। এরকম সন্দেহও করো না। আমি তোমার স্বামী।

কাজরী--কি-রকমের স্বামী?

অতীন--তুমি যে-রকমের স্ত্রী।

সিনহা সাহেবের গ্রেট ডেন আরও রেগে চিৎকার করতে থাকে। অতীন বিশ্বাস আর কাজরী বিশ্বাস একেবারে নীরব হয়ে যায়।

আজ আসবে নির্মল। এই বাড়ির ছায়ায় কাছাকাছি এসে যে মানুষ অনেকবার এসেছে আর চলে গিয়েছে, সেই নির্মল। কমল বিশ্বাস আর সুধাময়ীর কাছে এসে আজ যে-কথা

বলবে নির্মল, তারপর...।

আনমনার মত যে হাসি মুখে ছড়িয়ে দিয়ে ঘরের ভিতরে চুপ ক'রে বসে এই কথা ভাবছিল কেতকী, সেই হাসিটাই হঠাৎ একটা প্রশ্নের আঘাতে ব্যথিত হয়ে ওঠে এবং তারপরেই ভয় পেয়ে কাঁপতে থাকে। তারপর, নির্মলের সেই ইচ্ছার কথা শুনতে পেয়ে হেসে উঠতে পারবে কি ঐ দু'টি বুড়ো মানুষের প্রাণ, যারা এখন ঠাকুরদালানের বারান্দায় বসে বেবিকে কোলে নিয়ে, বেবির সব দুরন্তপনার লাথি বুকের উপর বরণ ক'রে, বসে বসে গল্প করেছে?

এই কয়েকটা মাস কেতকীর চোখ দু'টো একটা নতুন স্বপ্নের দিকেই অপলক হয়ে তাকিয়েছিল, তাই এই দিকের বেদনার ছবিটা চোখেই পড়েনি। কান দু'টোও বধির হয়ে গিয়েছিল, তাই ঐ দুই বুড়ো মানুষের যত উদ্বিগ্ন প্রশ্নের ভিতরে লুকানো একটা আর্তনাদকে শুনতে পায়নি। কেউ এসে পরের মেয়েকে এবাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে চলে যাবে, সেটা এবাড়ির বুড়ো-বুড়ীর জীবনে খুব বড় দুঃখের ব্যাপার নয়। নিজের মেয়েকেও এভাবে ছেড়ে দিতে হয় ; কিন্তু নিজের নাতিকে ছেড়ে দিতে কি বুড়ো-বুড়ীর মায়ার পাঁজর পটপট ক'রে ভেঙে আর্তনাদ ক'রে উঠবে না? মুখে না বলুক, মনে বলবে বুড়ো আর বুড়ী ; শেষে এবাড়ির সোনা চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেল রামকানাইবাবুর ভাগ্নী।

কেন যে এই দু'টি বুড়ো মানুষের জন্য অদ্ভুত একটা মায়ার আবেশ এসে মন ভরে দিয়েছিল, কে জানে? আজও বুঝতে পারে না কেতকী।

মনে পড়ে কেতকীর সেই কবে, অনেকদিন আগে, এই ঘরের ভিতরে মামার ধমক শুনেও সেদিন যেতে পারেনি কেতকী। সেদিন কিসের মায়া কেতকীর প্রাণে আকুল হয়ে উঠেছিল? জীবনের একটা জেদের মায়া? হ্যাঁ, তা'তো ছিলই। দুর্ভাগ্যের আর অপমানের সঙ্গে হাসিমুখে লড়াই করবার জেদ। কিন্তু, সেই সঙ্গে আর একটা কল্পনার মায়া। মনে হয়েছিল, কেতকীর নিজেরই বাপ আর মা যেন কোন অভিশাপের কোপে এই ভাঙা রাজবাড়ির যত ভয়ালতার মধ্যে ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে রয়েছে। নিরুপায় ও অসহায় দুটি প্রাণ। কেউ শ্রদ্ধা করে না, কেউ ভালবাসে না, ওদের সারা জীবনের স্নেহগুলিও ওদের নিষ্ঠুরভাবে ঠকাতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করে না। একটা কাঙাল বাপ আর একটা কাঙাল মা।

কিন্তু আজ একি হতে চলেছে? কেতকী যে ঐ বুড়ো কমল বিশ্বাসকে একটা কাঙাল দাদু ক'রে দিয়ে চলে যাবার জন্য তৈরী হয়েছে। বিয়ে হয়ে গেলেই যে কলকাতার অফিসে বদলি নেবে নির্মল।

এর চেয়েও কঠোর প্রশ্ন যে আছে। কেতকীর ভীত মনের পাঁজর ঠেলে এই কঠোর প্রশ্নটাও কেতকীর ভাবনায় যেন কান্না ধরিয়ে দিচ্ছে। শুধু বুড়ো-বুড়ীর কোল থেকে ঐ বেবিকে উপড়ে নিয়ে নয়, এই সংসারের খাওয়া-পরার শান্তিটাকেই ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়ে চলে যেতে হবে। আজও যে কেতকী টাকা দেয় বলেই এই সংসারের চাল ডাল আর কাপড় আসে।

কে এসেছে? নির্মল? ঘরের ভিতরে আতঙ্কিতের মত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ঘরের বাইরের কলরবের ভাষা বুঝতে চেষ্টা করে কেতকী।

না নির্মল নয়। বাসনা এসেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, এ কি কথা বলছে বাসনা? এ বাড়িতে জল গ্রহণ করতেও শ্বশুরবাড়ির নিষেধ আছে যে মেয়ের ; সেই মেয়েই যে চেঁচিয়ে বলছে— আগে এক গেলাস জল দাও মা।

সুধাময়ী বলেন—একটু জিরিয়ে নে বাসু।

বাসনা—না, আর বেশি জিরোবার সময় নেই।

সুধাময়ী—কেন?

বাসনা—এখনি মধুপুর রওনা হতে হবে, এখান থেকে সোজা মোটর গাড়িতেই গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরে...।

সুধাময়ী—মধুপুর কেন?

বাসনা—এখন তো আমাকে মধুপুরেই থাকতে হচ্ছে।

কপালে হাত ছুঁইয়ে বাসনা যেন বিব্রতভাবে আক্ষেপ ক'রে ওঠে—ওঃ, তাই তো! তোমরা বুঝবেই বা কি ক'রে? এর মধ্যে কত ওলট-পালট যে হয়ে গেল সে খবর তোমরা তো কিছুই জান না বোধ হয়।

সুধাময়ী—জানবো কেমন করে? একটা চিঠিও তো দিস না!

বাসনা—শ্বশুর মারা গিয়েছেন। কিন্তু লজ্জার কথা, তোমার জামাই সম্পত্তির একটি পয়সাও পায়নি।

সুধাময়ী—কেন?

বাসনা—শ্বশুরই উইল ক'রে বড় ছেলেকে বঞ্চিত ক'রে গিয়েছেন। কেনই বা করবেন না? মামলাতে বাপের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে যে ছেলে, সে ছেলের ওপর বাপের স্নেহ থাকবে কেন বল?

সুধাময়ী—অজিত এরকম কাণ্ড করলে কেন?

বাসনা—তোমার জামাই-এর স্বদেশী তেজ। মিথ্যে কথা বলবে না, এই প্রতিজ্ঞা। তাই সত্য কথা বলে সাক্ষী দিয়ে একটা সম্পত্তির মামলায় বাপকে হারিয়ে দিয়ে ধন্যি হয়ে গিয়েছেন।

সুধাময়ী—মধুপুরে কি করছে অজিত?

বাসনা হেসে ফেলে—সে নয়, সে নয়। মধুপুরে আমার দেওর রমেশ থাকে। রমেশকেই সব সম্পত্তি আর টাকা উইল ক'রে দিয়ে গিয়েছেন শ্বশুর। মধুপুরেও মস্ত বড় অভ্রের ব্যবসা খুলেছে রমেশ ঠাকুরপো।

সুধাময়ী—অজিত কোথায়?

বাসনা—সে তো সেই এলাহাবাদেই আছে।

সুধাময়ী—কেমন আছে?

বাসনা—শুনেছি একটা অসুখে পড়েছে।

সুধাময়ী ভ্রূকুটি করেন—শুনেছি কি রে? তুই তাহলে থাকিস কোথায়?

বাসনা—আমি তো মধুপুরেই থাকি।

কমল বিশ্বাসের কোটরগত চোখ মরা মানুষের চোখের মত নিষ্প্রভ হয়ে যায়, এবং সুধাময়ী তিক্তস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন।—তোর মাথা খারাপ হয়েছে, ছি ছি! ভগবানও এত নির্দয় হন!

বাসনাও বিরক্ত হয়ে ঝংকার দেয়—ওর জন্যে চিন্তা করবার কিছু নেই। এলাহাবাদে ওর কত ছাত্র-ছাত্রী আছে, ওকে দেখবার লোকের অভাব কোথায়? কিন্তু রমেশ ঠাকুরপোকে দেখবার কেউ নেই। আমি না থাকলে, আর শুধু ঠাকুর-চাকরের হাতে রমেশ ঠাকুরপোকে ছেড়ে দিলে মানুষটা যত্নের অভাবে মরেই যাবে।

উঠে দাঁড়ায় বাসনা। বাগানের পথের উপর থমকে থাকা গাড়িটার দিকে তাকিয়ে বলে—রমেশ ঠাকুরপোর সঙ্গেই এসেছি। গাড়িতে বসে আছে। সাহেব মানুষকে এখানে আর নিয়ে এলাম না।

বোবা হয়ে গিয়েছেন, এবং বোধ হয় অন্ধ হয়ে গিয়েছেন সুধাময়ী আর কমল বিশ্বাস। কথা বলেন না, বাসনার মুখের দিকে তাকানও না।

বাসনাই চেঁচিয়ে ওঠে—কই, জল দিলে না মা?

সুধাময়ী—না। ইচ্ছে হয়, নিজে নিয়ে খা।

বাসনা আক্ষেপ করে—তোমরা যেন কেমন হয়ে গিয়েছ। নিজের মেয়ের সঙ্গে একটু মায়া ক'রে কথা বলতেও...যাক্ গে, কিন্তু আমাকে তো মায়া করতেই হবে।

হাতের ব্যাগ থেকে চার-পাঁচটা এক'শো টাকার নোট বের করে বাসনা।—এই নাও মা।

কমল বিশ্বাস চেঁচিয়ে ওঠেন—বাসু!

বাসনা—কি বলছো?

কমল বিশ্বাস—তোর টাকা তোর ব্যাগের ভেতরে রেখে চুপ ক'রে জল খেয়ে চলে যা।

বাসনা আশ্চর্য হয়—টাকা নেবে না? এতগুলো টাকা?

কমলবাবু—না।

বাসনা—কেন?

কমলবাবু—এগুলো যে তোর টাকা।

বাসনা—নিজের মেয়ের টাকা নিতে কেন যে তোমাদের এত লজ্জা, বুঝতে পারছি না। অথচ রামকানাইবাবুর ভাগ্নীর রোজগারের টাকা নিতে তো বেশ—।

কমলবাবু—হ্যাঁ, নিতে বেশ আনন্দ লাগে, একটুও লজ্জা পাই না।

—বেশ! ঘরের কোণের দিকে এগিয়ে যেয়ে কলসী থেকে নিজের হাতেই গেলাসে জল ঢেলে ঢকঢক ক'রে খেয়ে হাঁফ ছাড়ে বাসনা। তারপরেই দুঃখিত স্বরে আক্ষেপ করে।—কিন্তু রামকানাইবাবুর ভাগ্নী যদি কোনদিন তোমাদের পথে বসিয়ে দিয়ে সরে পড়ে, তবে...।

কথা শেষ করবার সুযোগ পায় না বাসনা। বাগানের পথের দিক থেকে গাড়ির হর্ন পরিত্রাহি ডাকছে।

—তাহ'লে আসি। মধুপুর পৌঁছেই চিঠি দেব। হন্তদন্ত হয়ে চলে যায় বাসনা।

সেই মুহূর্তে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে প্রায় ছুটে এসে সুধাময়ী আর কমলবাবুর চোখের সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় কেতকী। হাঁপাচ্ছে কেতকী, দু'চোখ ছাপিয়ে তখনও ঝরে পড়ছে অফুরান জলের ধারা, যেন সারা মন-প্রাণের জোর দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রচণ্ড একটা যন্ত্রণার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে কেতকী।

সুধাময়ী চমকে ওঠেন—এ কি কেতকী?

কেতকী—আমি আপনাদের পথে বসিয়ে দিয়ে সরে যাব না, যেতে পারি না। বিশ্বাস করুন।

কমলবাবু—সে কথা কি আর বলতে হয় কেতকী মা।

কেতকী—তাই বলছিলাম, যদি কেউ এসে আপনার কাছে কোন কথা বলে, তবে বলে দেবেন, না, কেতকী যাবে না।

সুধাময়ী বলেন—অমন উতলা না হয়ে, একটু স্পষ্ট ক'রে বল কেতকী?

কেতকী—নির্মলবাবুর আসবার কথা আছে।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ান কমল বিশ্বাস। জীর্ণ চেহারা আর কোটরগত চোখ, সেই চিরকেলে কমল বিশ্বাস। কেতকীর কাছে এগিয়ে এসে কেতকীর একটা হাত শক্ত ক'রে ধরে, তেমনই শক্ত স্বরে প্রশ্ন করেন—একবার স্পষ্ট করে বল তো মা? নির্মল তোমাকে বিয়ে করতে চায়?

কেতকী মাথা হেঁট করে—হ্যাঁ।

কমলবাবু—তুমিও চাও?

কেতকী—হ্যাঁ, কিন্তু...।

কেতকীর মাথাটাকেই বুকে জড়িয়ে ধরে কেতকীকে এক মুহূর্তের মধ্যে বোবা ক'রে দেন কমল বিশ্বাস। তারপরেই কেঁদে চেঁচিয়ে ওঠেন—কোন কিন্তু-টিন্তু শুনতে চাই না কেতকী।

এই তো, শুধু তোমার মুখ থেকে এই কথাটি শোনবার আশায় বেঁচে আছি কেতকী। আমার জীবনের শেষ চক্রান্ত তুমি ধরতে পারনি কেতকী।

কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েন কমল বিশ্বাস। এবং বসে পড়েই যেন পরম বিশ্রান্তির আনন্দে হাঁপ ছেড়ে বলেন--আঃ!

কেতকী বলে--আপনি আমার মাথায় একটু হাত রাখুন মা। বড় কষ্ট হচ্ছে।

কেতকীর মাথায় হাত রেখে সুধাময়ী বলেন--ছিঃ, তুমি মিছে ভেবে কষ্ট পাচ্ছ কেতকী। ঠাকুরের কাছে এই মানতই করেছিলাম যে...।

কেতকী--কি?

সুধাময়ী--তুমি যেন তোমার মনের মত স্বামী পাও।

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে কেতকী--কিন্তু...।

কমলবাবু--আবার কিন্তু কেন কেতকী? এমন আনন্দের মধ্যে আবার চোখের জল কেন?

কেতকী--আপনাদের কি উপায় হবে বুঝতে পারছি না।

কমলবাবু--তোমার কথাও আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কেতকী।

কেতকী--আপনাদের দিন চলবে কি ক'রে? এতদিন না হয় আমি ছিলাম, আর আমার চাকরিটা ছিল বলে...।

--তাই বল। হো হো ক'রে হেসে আর চেঁচিয়ে ওঠেন কমল বিশ্বাস। তাঁর চক্রান্তময় জীবনের সবচেয়ে ধূর্ততার আনন্দটাই যেন গর্ব ক'রে চেঁচিয়ে উঠেছে। কমল বিশ্বাস দুর্বল নয় কেতকী। সে জানে কেমন ক'রে দিন চালাতে হয়। তোমার রোজগারের টাকায় ভাত খাবার লোভে নয় ; শুধু তোমাকে কাছে রাখবার লোভে দুর্বল সেজেছিলাম। আমার ভণ্ডামি ধরবার সাধ্যি তোমার হয়নি কেতকী।

কেতকীর চোখের বিস্ময় ছলছল করলেও তার মধ্যে একটা সন্দেহের ছায়াও যেন আছে। কমল বিশ্বাসের কথাগুলিকে একটা অভিমানের, একটা দুর্বলতা অহংকারের মুখরতা বলে মনে হয়। এই বাড়ির এই দুটি রোগা-রোগা ক্লান্ত মানুষের প্রাণে কেতকীকে কাছে রাখবার জন্য মায়ার টান নিশ্চয় ছিল ; কিন্তু কেতকীকে কাছে রাখবার দরকারও ছিল। সে সত্য আজ অস্বীকার ক'রে কেতকীর বিষণ্ণ জীবনের একমাত্র তৃপ্তিকে তুচ্ছ ক'রে কি লাভ হচ্ছে কমল বিশ্বাসের? বাধ্য হয়ে অভাবে পড়ে অসহায় হয়ে যেতে হয়েছে বলে কেতকীর রোজগারের টাকা হাত পেতে নিতে হয়েছে ; কিন্তু সেটা ভণ্ডামি হবে কেন?

কেতকীর মনের প্রশ্ন আর চিন্তাগুলিও যেন কতগুলি অভিমান। সে অভিমান ঢাকতে গিয়ে মনের ভিতরে একটা ব্যথাও বাজে। বুড়ো-বুড়ীর কষ্টের জীবনে অন্তত খাওয়া-পরার অভাবটাকে দূরে সরিয়ে দিতে পেরেছিল কেতকী ; কেতকীর জীবনের এই কৃতার্থতা যে এই বাড়ির কৃতজ্ঞতা আশা করে ; এবং সে আশা একটুও অন্যায় আশা নয়। কেতকীর কাছে কোন ঋণ নেই, কেতকী এই ভাঙা-বাড়ির কোন উপকারে লাগেনি, এই কথাই কি বলতে চাইছেন কমল বিশ্বাস? এমন কথা বললে যে নিষ্ঠুর কপটতা করা হয়।

কেতকী বলে--আমি আপনাদের কেউ নই, পর হয়েও কাছে ছিলাম, এই মাত্র। কিন্তু তবু আমার সাধ্যমত আমি যা পেরেছি...।

কমল বিশ্বাস হাসেন--তুমি তা করেছ কেতকী মা। তুমি আমাদের বাঁচিয়েছ।

কেতকী--তা হলে বলুন...।

কমল বিশ্বাস--তোমার কাছে আমরা যে কি ঋণে ঋণী ; তা শুধু ঠাকুরই জানেন।

কেতকীর প্রাণটাই যেন এইবার লজ্জা পেয়ে চমকে ওঠে। কুণ্ঠিতভাবে বলে--সেই জন্যেই বলছিলাম...।

কেতকীর কথা শেষ হবার আগেই ছোট একটা কাঠের বাক্স খুলে দলিলপত্রের মত

চেহারা একটা কাগজ বের ক'রে কেতকীর হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে প্রাণখোলা প্রবল খুশির উচ্ছ্বাসে হেসে ওঠেন কমল বিশ্বাস—এই বাড়ির বাগান জমি ও পুকুর, সবই তোমার নামে লিখে দিয়েছি কেতকী। নাও, তোমার যাবার আগে তোমাকে এটা দেব, এই চক্রান্ত করেছিলাম।

কেতকী স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। সুধাময়ী বলেন—বুড়ো মানুষের জীবনের শেষ সাধ, নাও কেতকী।

আবার দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে কেতকী। কি ভয়ানক চক্রান্ত! এবং মানুষকে কি ভয়ানক জব্দ করতে পারে এবাড়ির চক্রান্তের এই বুড়ো-বুড়ী। জীবনে কোন দিন পুজো-টুজো করার বাতিক ছিল না কেতকীর ; দেবতা-টেবতা আছে কি নেই এ প্রশ্ন নিয়েও কোনদিন মাথা ঘামাবার দরকার বোধ করেনি। কিন্তু আজ যেন বুকের ভিতরটা ভয়ে বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করতে থাকে, এই দু'টি চক্রান্তের মানুষ দু'টি দেবতার ছদ্মমূর্তি নয় তো?

চোখ মুছে নিয়ে কেতকী বলে—ঠিক কথাই বলেছেন, আপনাদের বোঝবার সাধ্যি আমার হয়নি। আমার সাধ্যির কথা ছেড়ে দিন, কারও সাধ্যি হয়নি। যাই হোক...আমাকে মেরে ফেললেও ও দলিল আমি নেব না।

কমল বিশ্বাসের চোখ করুণ হয়ে ওঠে।—কেন কেতকী, তুমি কি সত্যিই আমাদের পর মনে করলে?

কেতকীর চিরকেলে শান্ত চোখ দুটো কঠোর হয়ে কটকট ছটফট করতে থাকে—আমাকে কোন প্রশ্ন করবেন না। মোটকথা, আপনাদের বাড়ি বাগান জমি আর পুকুর কেড়ে না নিয়ে গেলেও আমার চলবে। শুধু আপনাদের একটি যে জিনিস কেড়ে নিয়ে যাচ্ছি, তাই নিয়ে চলে যেতে দিন।

—কি? শঙ্কিত ভাবে প্রশ্ন করেন সুধাময়ী।

—কি জিনিস কেতকী? আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেন কমল বিশ্বাস।

কেতকী কেঁদে ফেলে—বেবিকে ছেড়ে দিতে যে আপনাদের বুক ভেঙে যাবে বাবা। আমাকে ক্ষমা করুন।

হো হো ক'রে হাসতে গিয়ে হাউমাউ ক'রে কেঁদে ওঠেন কমল বিশ্বাস।—সত্যি কথা, খুব সত্যি কথা কেতকী। তুমি এই ভাঙা-বাড়ির সোনা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছ। খালি হয়ে গেলাম, একেবারে শূন্য হয়ে গেলাম। ভালই হলো...কি বল সুধা? তুমি কথা বলছ না কেন?

সুধাময়ী বলেন—ভালই হলো। এবার চল, সবাইকে আশীর্বাদ ক'রে সরে পড়ি।

কমল বিশ্বাস বলেন—তা'হলে শর্মাজীকে একটা চিঠি দিতে হয়।

আতঙ্কিতের মত তাকিয়ে প্রশ্ন করে কেতকী—কিসের চিঠি? শর্মাজী কে?

কমলবাবু আবার চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন, এবং সুধাময়ীর মুখেও একটা শান্ত হাসি মিটমিট করে। কমলবাবু বলেন—আমাদের আর-একটা চক্রান্ত ; তোমার শুনে কাজ নেই কেতকী।

আশ্চর্য হয়েছে, একটু উদ্বিগ্ন হয়েছে, বেশ একটু অসুবিধায় পড়েছে চাকর ভাগবত। দু'জায়গায় খাবার বয়ে নিয়ে যেতে হয়। একবার এই ফ্ল্যাটেরই ঐ ঘরে, যেখানে বাবু চুপটি ক'রে চেয়ারের উপর বসে থাকেন আর সবসময় কি যেন ভাবেন। আর-একবার পাশের ঐ সাজানো ফ্ল্যাটের ঘরে, যেখানে সোফার উপর চুপটি ক'রে মা বসে থাকেন, আর কি-যেন ভাবেন।

সন্ধ্যার সময় বাইরে থেকে ফিরে এসে বাবু যখন এই ঘরের ভিতরে ঢুকে আবার ঐ চেয়ারের উপর চুপটি ক'রে বসে থাকেন, তখন ভাগবতেরও ছুটি হয়। বাবুর হাতের কাছে এক পেয়ালা চা এগিয়ে দিয়ে, আর দুই ফ্ল্যাটের দুই ভিন্ন ঘরের টেবিলে খাবার ঢাকা দিয়ে

বাড়ি চলে যায় ভাগবত। তারপর, অর্থাৎ সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত বাবু আর মা'র এই নীরব বিচ্ছেদের জীবন কিভাবে চলে, সেটা অনুমান করতে পারে না। কিন্তু সকাল হলে, ক্যামাক স্ট্রীটের এই বাড়ির কাজের দায় হাতে তুলে নেবার আগে রোজই একবার আশ্চর্য হয় ভাগবত। এসেই সবার আগে এই ঘরের মেঝের উপর থেকে একটা সতরঞ্চিকে গুটিয়ে তুলে রাখতে হয়। একটা বালিশকেও। বুঝতে অসুবিধা নেই ভাগবতের ; বাবু আজকাল মেঝের উপর এইভাবে শুধু একটা সতরঞ্চির উপর একা-একা শুয়ে থাকেন, আর ঘুমিয়ে বা না ঘুমিয়ে রাত ভোর ক'রে দেন।

ঐ ফ্ল্যাটের সাজানো ঘরের সোফার উপর থেকেও একটা বালিশ তুলে নিয়ে সরিয়ে রাখতে হয়। বুঝতে অসুবিধা নেই ভাগবতের, ভয়ানক রাগ করছেন কিংবা দুঃখিত হয়েছেন মা। তা না হলে এই সোফার উপর শুয়ে রাত ভোর করবেন কেন?

মনে হয় ভাগবতের, সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে এসেও ঘরের মধ্যে বোধ হয় বেশিক্ষণ থাকেন না বাবু। বার বার ঘড়ির দিকে তাকান। এবং এক-একদিন ভাগবত নিজেই দেখতে পায়, হঠাৎ ছটফট ক'রে উঠলেন আর বাইরে চলে গেলেন বাবু।

এইরকম অবস্থা যেদিন হয়, সেদিন সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়ে ভাগবত। ঘর তালাবন্ধ ক'রে চলে যাওয়া যায় না, এবং দরজা খোলা রেখেও চলে যাওয়া যায় না ; কারণ মা এখনও ফেরেননি।

সেদিনও অন্য দিনের মত সন্ধ্যাটা যখন বেশ ঘনিয়েছে, আর ক্যামাক স্ট্রীটের পথের সব আলো জ্বলে উঠেছে, তখন ফ্ল্যাটের দরজার কাছে সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে সেই কথা ভাবে ভাগবত, যে-কথা এই ক'দিন ধরে রোজই ভাবে। এই চাকরি বোধ হয় আর বেশি দিন করা চলবে না।

একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো। গাড়ি থেকে নামলেন মা, এবং সেই তিন সাহেব। পাশের সাজানো ফ্ল্যাটের ঘরের দরজার পর্দা সরিয়ে সকলে ভিতরে ঢুকে পড়তেই খুশি হয় ভাগবত। এবং এতক্ষণে বাড়ি যাবার সুযোগ পায়।

সাজানো ফ্ল্যাটের ঘরটাই হেসে ওঠে। সত্যিই হাসিয়ে পেটে খিল ধরিয়ে দেবার মত গল্প করতে শুরু করে দিয়েছে গাঙ্গুলী।

ইণ্ডিয়া না ঈজিপ্ট? কোন্ দেশের সভ্যতা আর কালচার বেশি পুরনো? এই দুই প্রাচীন সভ্যদেশের মধ্যে কোন্ দেশের সভ্যতা কার তুলনায় কত বেশি উন্নত ছিল? বলতে পারেন কাজরী বিশ্বাস?

কাজরী হাসে—অসম্ভব।

অসিত দত্ত বলেন—ঈজিপ্টের সভ্যতা।

গাঙ্গুলী—আপনি কি বলেন জীমূতবাবু?

জীমূত বলে—ইণ্ডিয়া।

গাঙ্গুলী—রাইট্।

অসিত ও কাজরী—কেন? কেন? ইণ্ডিয়ার সভ্যতা বেশি পুরনো, তার প্রমাণটা কি?

গাঙ্গুলী—একবার অক্সফোর্ডে এক ইজিপশিয়ান ছাত্র আর-এক ইণ্ডিয়ান ছাত্রের মধ্যে ভয়ানক তর্ক বেধেছিল। ইজিপশিয়ান ছাত্রটি বললে—কায়রোর কাছে একটা বাগানে কুয়ো খুঁড়তে খুঁড়তে সাতশো ফুট গভীরে পাথরের স্তরের মধ্যে কি পাওয়া গিয়েছিল জান?

ইণ্ডিয়ান ছাত্র—কি?

ইজিপশিয়ান ছাত্র—তামা আর ইস্পাতের একগাদা তার।

ইণ্ডিয়ান ছাত্র ভ্রূকুটি করে—তাতে কি প্রমাণিত হলো?

ইজিপশিয়ান ছাত্র—ঈজিপ্টের পুরনো সভ্যতা কত উন্নত ছিল, তাই প্রমাণিত হচ্ছে না

কি?

ইণ্ডিয়ান ছাত্র—তার মানে?

ইজিপশিয়ান ছাত্র—আমাদের সেই অতি প্রাচীন ঈজিপ্টে টেলিগ্রাফ ছিল।

ইণ্ডিয়ান ছাত্র—আমাদের দেশেও বেনারসের কাছে একবার একটা কুয়ো খোঁড়া হয়েছিল। হাজার ফুটেরও বেশি গভীরে গিয়ে পাথর ফাটিয়ে কিছুই পাওয়া গেল না।

ইজিপশিয়ান ছাত্র ভ্রূকুটি করে—তাতে কি প্রমাণিত হলো?

ইণ্ডিয়ান ছাত্র—ইণ্ডিয়ার পুরনো সভ্যতা ঈজিপ্টের সভ্যতার চেয়ে কত বেশি উন্নত ছিল, তাই প্রমাণিত হলো।

ইজিপশিয়ান ছাত্র—তার মানে?

ইণ্ডিয়ান ছাত্র—তার মানে, আমাদের সেই অতি প্রাচীন ইণ্ডিয়াতে বেতার ছিল।

সাজানো ফ্ল্যাটের ঘরে হাসির হররা আবার উদ্দাম হয়ে ওঠে। কিন্তু হঠাৎ হাসি থামিয়ে যেন একটু আনমনা হয়ে যায় কাজরী।

কাজরীর হাসির ধরন আজকাল যে একটু অন্যরকমের হয়ে যায়, সেটা আর কারও কানে পড়ুক বা না পড়ুক, কাজরীর নিজেরই কানে অনেকবার ধরা পড়ে গিয়েছে। মুখের এই হাসির ছন্দটাকে যেন থেকে থেকে একটু খোঁচা দিয়ে ছিঁড়ে দিচ্ছে বুকেরই ভিতরের আহত অহংকারের জ্বালা। কাজরীর এই সুন্দর শরীরটাকে গালি দিয়ে অপমান করবার সাহস পেল অতীনের মত মানুষ? ভাল লাগে না কাজরীকে? কথাটা কত সহজে বলে দিল একটা অকৃতজ্ঞতা, একটা ভুয়ো অহংকার, নিজেরই শরীরটাকে মাটি ক'রে দিয়ে অসাড় হয়ে গিয়েছে যে পুরুষ।

কি মনে করছে অতীন, পৃথিবীর চোখ কি ওর চোখের মতই অন্ধ হয়ে গিয়েছে? কাজরীর মুখের দিকে তাকাবার মত, কাজরীর হাতের একটি স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়ে যাবার মত মানুষ কি এই পৃথিবীতে নেই? কাজরীর চোখের দৃষ্টি কোন তৃষ্ণাকে অভিনন্দিত করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠবার মত মানুষ নেই?

এই ক'দিনের ঘুমের মধ্যে ঐ একই স্বপ্ন দেখে ছটফট করেছে কাজরী। স্বপ্নের মধ্যে ঐ একই প্রশ্ন কাজরীর ঘুমটাকেও ভাবিয়েছে। এই মুহূর্তে যদি একবার আভাসে একটা ইচ্ছা জানিয়ে হাত দেয় কাজরী, তবে কাজরীর সেই হাত ব্যগ্রভাবে তুলে নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে না দিয়ে থাকতে পারবে কি অসিত? কিংবা জীমূত, নয়তো গাঙ্গুলী? অতীনের চেয়ে গুণে মানে রুচিতে ও টাকায় অনেক মহৎ এই তিনটি উদার মানুষকে শুধু মুখের হাসি ছাড়া আর কোন উপহারে প্রীত করেননি কাজরী, কিন্তু ওরা যে তাতেই ধন্য। এর বেশী কোন উপহারের প্রতিশ্রুতিকে যদি ওদের কারও কানের কাছে একবার একটু ফিসফিস ক'রেও শুনিয়ে দিতে পারে কাজরী, তবে কাজরীর মত নারীকে বিয়ে ক'রে জীবনের সঙ্গিনী ক'রে নিতে তার বুকের ভিতরে কি পৌরুষের গর্ব অস্থির হয়ে উঠবে না?

জানতে চায়, বুঝতে চায়, আশ্বাস পেতে চায় এবং আরও ভাল ক'রে বিশ্বাস করতে চায় কাজরী, কাজরীর জীবনকে ভালবেসে আর শ্রদ্ধা দিয়ে আপন ক'রে নেবার মত মানুষ কাজরীর চোখের সামনেই আছে। তাহ'লেই আবার প্রাণ খুলে হাসতে পারবে কাজরী, আর সে হাসি একটুও ক্ষুণ্ণ হবে না। অতীনের মুখের সেই ধিক্কারকে একটা ছোটলোকের গালির ভাষা বলে মনে ক'রে অনায়াসে তুচ্ছ করতে আর ভুলে যেতে পারবে কাজরী। এবং যদি মন চায়, তবে করতেও একটুও দ্বিধা করবে না কাজরী। ওদের মধ্যে কার সঙ্গে কাজরীর বিয়ে হওয়া উচিত, সে চিন্তা আজকের চিন্তা নয়। আজ শুধু কাজরীর বিষণ্ণ প্রাণটা জেনে নিতে চায় ; ওদের চোখগুলি অতীনের চোখের মত অন্ধ হয়ে যায়নি।

কাজরী হাসে—আজও কি আপনারা আর্ট এগজিবিশনের কথাটা একটুও চিন্তা করবেন

না? শুধু হাসবেন?

জীমূত হাসে—রাখুন আপনার আর্ট এগজিবিশন! আপনিই তো মূর্তিমতী আর্ট!

কাজরী—বাঃ, বেশ বললেন! রোজই এ রকম ফাঁকির কথা দিয়ে...।

অসিত বাধা দেয়—আপনি কি সত্যিই আজও বিশ্বাস করতে পারলেন না যে, আপনিই হলেন আমাদের...।

কাজরী মুখে রুমাল ছুঁইয়ে আর ভুরু কুঁচকে তাকায়—কি?

অসিত—আপনি হলেন আমাদের আসল ইনস্পিরেশন।

গাঙ্গুলী হাত তুলে অভিনেতার মত আবেগময় একটা ভঙ্গী ক'রে বলে—আপনি কি দেখতে পান না কাজরী বিশ্বাস, আমাদের এই হাসির ভিতরে অশ্রু ঝরঝর করছে?

খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে কাজরী—কিসের অশ্রু?

গাঙ্গুলী—হিংসের অশ্রু?

কাজরী—হিংসে? কার ওপর হিংসে?

গাঙ্গুলী—অতীনবাবুর সৌভাগ্যের ওপর?

হাসতে চেষ্টা ক'রেও গম্ভীর হয়ে যায় কাজরী, এবং চোখের তারা দুটো ঝিক ক'রেও জ্বলে ওঠে—মিথ্যে ঠাট্টা ক'রে লাভ কি?

অসিত হঠাৎ বলে ওঠে।—একটুও মিথ্যে নয়।

জীমূতও গম্ভীর হয়ে বলে—ঠাট্টাও নয়।

এমন কি গাঙ্গুলীও গম্ভীর হয়ে গিয়ে সুন্দর এক প্রশস্তির সুরে গলার স্বর ভরে দিয়ে আস্তে আস্তে বলে—আমি ঠাট্টার ভঙ্গীতে কথা বলেছি বটে ; কিন্তু খুব সত্যি কথা বলেছি।

দেখতে পায় কাজরী, এবং কাজরীর মনের সবচেয়ে বড় কৌতূহলের সব বেদনা সেই মুহূর্তে মুছে যায়। তিনটি মানুষের মত মানুষ। তিনটি শ্রদ্ধার দৃষ্টি গম্ভীর হয়ে কাজরীর জীবনকে অভ্যর্থনা করবার স্বপ্নে যেন বিভোর হয়ে রয়েছে ; আশ্চর্য হয়ে, একেবারে পরিপূর্ণ বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হয়ে যায় কাজরীর মন।

হেসে ওঠে কাজরী—আর একটা গল্প বলুন মিষ্টার গাঙ্গুলী।

গাঙ্গুলী বলে—তার আগে একটা কথা জেনে নিতে চাই।

কাজরী—বলুন।

গাঙ্গুলী—আপনার জন্মদিনটার আর দেরি কত?

অসিত আর জীমূতও একসঙ্গে গলা মিলিয়ে অভিযোগ করে।—হ্যাঁ, গত বছরের মত এবারও আপনি যদি আমাদের তুচ্ছ ক'রে নিমন্ত্রণ করতে ভুলে যান, তবে কিন্তু...।

মাথা হেঁট করে কাজরী। মিথ্যে নয় অভিযোগ। এবং মনে পড়তেই কাজরীর বুকটা দুঃসহ এক ভুলের লজ্জায় ব্যথিত হয়ে ভাঙা-ভাঙা নিঃশ্বাস ছাড়ে। কাজরীর জীবনকে যারা বিনা স্বার্থে এতদিন ধরে নীরবে শ্রদ্ধা ক'রে আর ভালবেসে এসেছে, জন্মদিনের আনন্দে তাদেরই নিমন্ত্রণ করতে ভুলে গিয়েছিল কাজরী।

কাজরী বলে—বেশ তো, এবার নিশ্চয়ই জানতে পারবেন।

অসিত—এবার আমরাই আপনার জন্মদিনের উৎসবের ভার নিলাম। আপনার কোন আপত্তি গ্রাহ্য করবো না।

জীমূত—উৎসবের ভেন্যু হোক...।

গাঙ্গুলী বলে—কাফে মেটকাফ আমার হাতেই রয়েছে। একবার ফোন ক'রে বলে দিলেই সব ব্যবস্থা এক ঘণ্টার মধ্যে হয়ে যাবে।

অসিত—খুব ভাল কথা।

কাজরী হাসে—আমার আর কিছু বলবার নেই!

বুঝতে পেরেছে, এবং দেখতেও পেয়েছে অতীন, যারা রাগ করেছিল, তারা আবার খুশি হয়েছে। মাঝখানে অনর্থক একটি মাস কাজরীকে শুধু উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটোছুটি ক'রে আর চিঠি লিখে লিখে হয়রান হতে হয়েছে। ক্যামাক স্ট্রীটে নতুন বিলডিং-এর একটি ফ্ল্যাটের ঘর একেবারে নীরব হয়ে গেলেও পাশের ফ্ল্যাটের নীড়ে আবার উল্লাসের জীবন জেগে উঠেছে। কাজরীর জীবনের উদ্বেগ ক্ষান্ত হয়ে গিয়েছে।

অতীনের সঙ্গে কাজরীর কোন কথা বিনিময়ের প্রয়োজন হয় না। ওরা শুধু আছে, এই মাত্র। পোড়া বিছানার চাদরটা আজও বদলে দেবার সুযোগ পায়নি ভাগবত, তাই বিছানাটাকে শেষ পর্যন্ত একেবারে গুটিয়ে রেখেছে।

পার্ক স্ট্রীটের অটোমোবিল শো-রুমে এমন কোন নতুন কাজের দায় বিপুল হয়ে দেখা দেয়নি, যার জন্য অতীনের পক্ষে এত তাড়াতাড়ি ভাগবতের হাত থেকে শুধু চা-এর পেয়ালাটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে এক চুমুকেই চা শেষ করে এই সকালে বের হয়ে যাবার কোন দরকার হতে পারে। তবু তাই করে অতীন। এই ঘরের ছায়া থেকে পালিয়ে যাবার জন্য যেন মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে অতীন ; কিন্তু চেষ্টাটা যেন রাত হলেই ক্লান্ত হয়ে যায়। আবার এই ঘরেই ফিরে আসে অতীন। তবে কি শেষ দেখতে চায় অতীন? কিন্তু যা হয়ে গিয়েছে, তার পরেও কি আবার কোন শেষ আছে?

বের হবার জন্য তৈরী হয়ে আর খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে অন্য দিনের মত সেদিনও একবার দরজার কাছে থমকে দাঁড়ায় অতীন। অন্য দিনের মতই গম্ভীর হয়ে ভাবে, কাজরীকে সেই কথাটা বলে দিয়ে চলে গেলেই তো ভাল ছিল। কিন্তু বলতে পারে না। কেমন যেন সন্দেহ হয় অতীনের, এখনও বোধ হয় সময় আসেনি। নিজের মনটাকেও অনেকবার সন্দেহ ক'রে বুঝতে চেষ্টা করেছে অতীন, এখনও কি কাজরী নামে এই নারীর জন্য অতীনের মনের গভীরে কোন মায়া মুখ লুকিয়ে গুনগুন ক'রে কাঁদে?

যাবার জন্য পা বাড়িয়েও হঠাৎ বাধা পেয়ে আবার থমকে দাঁড়ায় অতীন। পাশের ফ্ল্যাটের ভিতর থেকে হঠাৎ বের হয়ে আর কাছে এগিয়ে এসে কি-একটা বলছে কাজরী ; ঠিক শুনতে পায়নি অতীন, কারণ হঠাৎ এভাবে কাজরীর মুখের কোন সরব ভাষা শোনবার জন্য মনটা প্রস্তুতও ছিল না।

অতীন—কিছু বললে?

কাজরী—হ্যাঁ।

অতীন--কি?

কাজরী—আজ আমার জন্মদিন।

অতীনের মনের কপাটে যেন হঠাৎ একটা ধাক্কা লাগে। তাই তো! এই সেই কাজরী, যার জন্মদিনের বাতাস সুরভিত করবার জন্য সারা মার্কেট তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে সবচেয়ে সুন্দর গাজিপুরী গোলাপের স্তবক কিনেছিল অতীন। সেদিনের মত আজও একেবারে মরিয়া হয়ে মনের সব আগ্রহ আর চেষ্টা ঢেলে দিয়ে নিজেকে সুন্দর ক'রে সাজিয়েছে কাজরী।

গলার মধ্যেও একটা দুর্বলতা বোধ করে অতীন। আস্তে আস্তে বলে, এবং বলতে গিয়ে সারামুখ জুড়ে একটা করুণ হাসি ফুটে ওঠে।--তা...সত্যিই...ভুল ক'রে...আমার মনেই পড়েনি কাজরী, আজ তোমার জন্মদিন।

কাজরী—তাতে কোন ক্ষতি নেই। আমি বলতে এসেছি, আজ আমার ফিরতে একটু দেরী হতে পারে।

অতীন অন্য দিকে মুখ ফেরায়—কেন?

কাজরী—যাচ্ছি আমার জন্মদিনের উৎসবে।

অতীন--চন্দননগরে?

কাজরী--না। অন্য জায়গায়।

অতীন--কোথায় তোমার জন্মদিনের উৎসব, বলতে বাধা আছে?

কাজরী--একটুও না। এখন যাচ্ছি কাফে মেটকাফ, তারপর ডায়মণ্ড হারবার পর্যন্ত স্টীমার ট্রিপ আছে।

অতীন--বোধ হয় তোমার কালচারের বন্ধুরা এই উৎসব অর্গানাইজ করেছে?

কাজরী--সেটা আর জিগ্যেস করছো কেন?

অতীন মুখ ফিরিয়ে কাজরীর লাল ঠোঁট, কালো চোখ, পাউডারে চোবানো গলা, আর সিল্কের ফুরফুরে পাতলা শাড়ির রঙিন আঁচলের দিকে তাকায়। চোখ দুটো হিংস্র হয়ে জ্বলে উঠলেও গলাটাকে প্রাণপণে যেন শেষ মায়ার জোর দিয়ে ভিজিয়ে একটু কোমল ক'রে রাখতে চায় অতীন। আস্তে আস্তে গভীর অনুরোধের সুরে বলে--যেও না কাজরী।

কাজরী--সে উপদেশ তুমি দিও না।

চেঁচিয়ে ওঠে অতীন--তবে কেন আমার কাছে এত বড় আনন্দের সংবাদ জানাতে এসেছ?

কাজরী--ফিরতে অনেক দেরী হতে পারে।

অতীন--এ কথাই বা আমাকে জানাবার দরকার কি?

কাজরী--তুমি যেন ফিরতে দেরী করো না।

অতীন--এই আদেশের অর্থও বুঝলাম না।

কাজরী--ঘরে অনেক দামী আর দরকারী জিনিস আছে।

অতীন হাসে--তাই বল। তোমার যত দামী আর দরকারী জিনিস পাহারা দেবার জন্য আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, কেমন?

কাজরী--তোমার মনে কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা বোধ থাকলে এভাবে হাসতে পারতে না, আর এরকম প্রশ্নও করতে পারতে না?

অতীন তবুও হাসে, হঠাৎ বাতাস লেগে আগুনের ধিকিধিকি আলো যেমন দপ ক'রে হেসে ওঠে।--কৃতজ্ঞতা?

কাজরী--হ্যাঁ। তোমারই জন্যে আমাকে অনেক নীচে নামতে হয়েছে ; অনেক অ্যামবিশন অনেক প্রসপেক্ট ছেড়ে দিতে হয়েছে। লোকের চোখে আমাকে ছোট হয়ে যেতে হয়েছে, অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে।

অতীনের চোখের তারা দুটো যেন পুড়তে শুরু করেছে। কাজরীর মুখের দিকে একটা দাউ-দাউ দৃষ্টির হল্‌কা ছুঁড়ে দিয়ে অতীন বলে--সত্যি কথা বলতে গিয়ে একটা ভয়ানক মিথ্যে কথা বলে ফেললে।

কাজরী--কি বললে?

অতীন--সত্যি কথা হলো, তুমি অনেক বড় বড় প্রসপেক্ট ছেড়ে দিয়ে, অনেক নীচে নেমে আর ছোট হয়ে গিয়ে আমাকে বিয়ে করেছ।

কাজরী--সেটা মনে মনে স্বীকার করতে পারছো কি?

অতীন--খুব পারছি ; কিন্তু তোমার ভয়ানক মিথ্যে কথাটা এই যে, আমার জন্যে তুমি নীচে নেমেছ। আমার জন্যে নয় ; নিজের জন্য। তুমি তোমার একটি মাত্র ইচ্ছার তৃপ্তির জন্য নীচে নেমেছ।

কাজরী--কি?

চেঁচিয়ে ওঠে অতীন--তুমি স্বামী চাওনি, শুধু একটা পুরুষ চেয়েছিলে। তুমি শুধু তোমার শরীরটাকে মেয়েমানুষ বলে মনে করতে পারনি।

কাজরী—এরকম অভদ্র কথা আমিও তোমাকে বলতে পারি।

অতীন—বলে ফেললেই পার।

কাজরী—তুমি আর নিজেকে পুরুষ বলে মনে করছো কোন্ অহংকারে?

অতীন—কি বললে?

কাজরী—সোজা কথা সোজা ভাষায় বলে দিয়েছি। তোমার সে অহংকারও যে মাটি হয়ে গিয়েছে, ভুলে যাচ্ছ কেন?

আর কোন কথা বলে না কাজরী। আর এক মুহূর্তও অতীনের সেই স্তব্ধ ও নীরক্ত ফ্যাকাশে মুখের দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে, সিল্কের ফুরফুরে পাতলা শাড়ির রঙীন আঁচলটাকে একটা ধিক্কারের রঙীন উল্লাসের মত দুলিয়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

ঘরের ভিতর নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অতীন। ভাগবত এসে বার বার উঁকি দিয়ে দেখে যাচ্ছে, তাও বোধহয় বুঝতে পারে না অতীন। শুধু বুঝতে পারে, কপালটা ঠাণ্ডা ঘামে একেবারে ভিজে গিয়েছে। আরও বুঝতে পারে, খুব সত্যি কথাই বলে চলে গিয়েছে কাজরী। অতীনের শরীরের রক্তকণাগুলি কাজরীর সেই সত্য কথা শুনতে পেয়ে লজ্জায় জল হয়ে গিয়েছে। এই শরীর কোন নারীর স্বামীর শরীর নয় ; একটা পুরুষেরও শরীব আর নয়। খুনে আসামী দায়রা আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ফাঁসির হুকুম যখন শোনে, তখন তারও মুখটা এইরকম স্তব্ধ নীরক্ত ও ফ্যাকাশে হয়ে যায়। অতীন বিশ্বাসের জীবনের চরম উদ্‌ভ্রান্তির অহংকার এইবার চূড়ান্ত রায় শুনতে পেয়ে রক্তহীন হয়ে গিয়েছে।

পাগলের মত হেসে কেঁদে আর হো হো ক'রে চেঁচিয়ে নিজেকেই বোধহয় একটা ধিক্কার দিত অতীন, কিন্তু ভাগবত হঠাৎ এসে প্রশ্ন করে—আপনি কি এখন বাইরে যাবেন বাবু?

চমকে ওঠে অতীন।—হ্যাঁ।

ভাগবত—সন্ধ্যার আগে ফিরবেন তো বাবু?

—কেন?

—সন্ধ্যাতে ছুটি না পেলে আমার বাড়ি ফিরতে বড় কষ্ট হয় বাবু। অনেক দূরে থাকি, বেহালা ছাড়িয়ে সেই ঘোলসাহাপুর।

কি যেন ভাবে অতীন। কাজরীকে কি যেন বলবার ছিল, কিন্তু বলা হয়নি। বলবার সময় বোধহয় এখনও আসেনি।

অতীন বলে—বেশ, সন্ধ্যার আগেই ফিরবো।

ঘর থেকে বের হয়ে, একটা শ্রান্ত ক্লান্ত অলস ও আহত প্রাণীর মত আস্তে আস্তে হেঁটে সিঁড়ির তিনটে ধাপ নামতেই অতীনের আনমনা চোখ দুটো একটা সাদা শাড়ির ফুরফুরে আঁচলের দোলানো ছায়ার ছোঁয়া লেগে হঠাৎ চমকে ওঠে।

ডাক্তার বিজয়া। এই ঘরেরই দিকে এগিয়ে আসতে আসতে সিঁড়ির কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে বিজয়া।

বিজয়ার মুখের দিকে চোখ পড়তেই জ্বলে ওঠে অতীনের চোখ। বিজয়ার ছায়াটাকেও একটা অস্পৃশ্য ও অশুচি ছায়ার মত ঘৃণ্য বলে মনে হয়। পাশ কাটিয়ে চলে যায় অতীন।

বিজয়া ডাকে—অতীনবাবু।

অতীন মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দেয়—কাজরী বাড়িতে নেই।

বিজয়া—কাজরীর কাছে নয়, আপনার কাছে...।

থমকে দাঁড়ায় অতীন। মুখ ফিরিয়ে তাকায়। কিন্তু কাছে এগিয়ে আসে না। প্রায় সাত হাত দূরত্বের এক কিনারায় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বিজয়ার প্রশ্নটাকে মনে মনে তুচ্ছ ক'রে ও ঘৃণা ক'রে উত্তর দেয়—আমার কাছে আপনার বলবার মত কথা কি থাকতে পারে?

বিজয়ার চোখ দু'টো বিকার রোগীর চোখের মত দেখায়। ছটফট করে না, ফ্যালফ্যালও

করে না। বিজয়া হাসে, এবং হাসির রকমটাও অদ্ভুত, যেন ঘুমের মধ্যে হাসছে। বিজয়া বলে --তাই তো...হ্যাঁ...ঠিকই বলেছেন আপনি। কি যেন বলবো বলে ভেবেছিলাম...সত্যি, কাজরী বাড়িতে নেই তো?

বিজয়ার কথার উত্তর না দিয়ে, আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না ক'রে চলে যায় অতীন।

কাফে মেটকাফের একটি কেবিন। কাজরীর জন্মদিনের উৎসবে মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে হাসিতে আর খুশিতে ভরে দিয়েছে অসিত, জীমূত আর গাঙ্গুলী। কাজরী যাদের পার্সোন্যালিটিকে মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা করে, তারা কাজরীর পার্সোন্যালিটিকেও মনে-প্রাণে অভিনন্দিত করেছে। কেবিনের কটকটে আলো, টেবিলের উপর স্তূপীকৃত খাবারের সৌরভ, আর গেলাসের হুইস্কির ছলছল মাদকতা সব মিলে উৎসবের আনন্দকে উচ্ছল ক'রে দিতে দেরি করেনি। মাথার উপর ফুরফুর করে রঙীন কাগজের ফালির গুচ্ছ-গুচ্ছ ঝালর। আর কাজরীও তার ভেজা ঠোঁট রুমাল দিয়ে আস্তে আস্তে মুছে হুইস্কির গেলাস একপাশে সরিয়ে রেখে হেসে ওঠে।--প্লীজ, আমাকে এসব জিনিস আর দ্বিতীয়বার সাধবেন না।

--এই তো অন্যায় করলেন আপনি। চেঁচিয়ে আপত্তি করে গাঙ্গুলী।

কাজরী হাসে--কোথায় আমাকে একটু প্রশংসা করবেন, না, তার বদলে নিন্দেই করে ফেললেন মিস্টার গাঙ্গুলী?

গাঙ্গুলী--অ্যাঁ?

কাজরী--আপনাদের অনুরোধের জন্য, আপনাদেরই সম্মানের জন্য আমি জীবনে এই প্রথম এ-জিনিস ছুঁলাম।

অসিত জীমূত আর গাঙ্গুলী একসঙ্গে টেবিলের উপর হাতের চাপড় বাড়িয়ে হেসে ওঠে।--লজ্জা দিলেন, আমাদের ভয়ানক লজ্জা দিলেন আপনি।

গাঙ্গুলী বলে--এর পরের প্রোগ্রামটা কি?

জীমূত--স্টীমার ট্রিপ টু ডায়মণ্ড হারবার।

অসিত বলে--এ ট্রিপ টু মুন হলেই ভাল ছিল।

জীমূত--খুব সত্যি কথা। এরকম একটা লাইফের জন্মদিনের উৎসব কি এসব হোটেল-ফোটেলে মানায়?' দরকার ছিল একটা...যাকে বলে কুসুমাকীর্ণ কুঞ্জ।

অসিত--নয় তো কোন সমুদ্রের তালতমালবনরাজিনীলা বেলাভূমি।

জীমূত--কিংবা...সেই মোহনার ধারে। রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে।

সেতারের ঝংকারের মত মিষ্টি শব্দের উল্লাস ঝরিয়ে দিয়ে হেসে ওঠে কাজরী।

তার পরেই গম্ভীর হয়ে যায় কাজরী।--আমি যদি বলি, ডায়মণ্ড হারবার যেতে পারবো না, তাহলে কি...।

অসিত--তাহলে আমি ভয়ানক দুঃখিত হব।

কাজরী--কিন্তু সত্যিই যেতে পারবো না।

--কেন? কেন? জীমূত আর গাঙ্গুলী একসঙ্গে করুণভাবে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

কাজরী--আপনারা কেউ কল্পনাও করতে পারবেন না, আজকের এই উৎসবের হাসিখুশির মধ্যেও আমার মন...।

--কি?

--বলুন।

--ও কি?

--ছিঃ, এ কি করছেন আপনি?

দু'চোখের দু'কোণের দু'টো জলের ছোট ছোট ফোঁটা রুমাল দিয়ে মুছে ফেলে কাজরী

বলে—আমার জীবন একেবারে একলা হয়ে গিয়েছে। ঠকেছি, অপমানিত হয়েছি, আশা ব্যর্থ হয়েছে।

অসিত—অতীনবাবু কি আপনাকে কোন অপমান বা বঞ্চনা বা ইতরোমি...।

কাজরী—হ্যাঁ, তার সঙ্গে সত্যি ক'রে কোন সম্পর্কও এখন আর নেই। আর, আমার পক্ষে কোন সম্পর্ক রাখাও সম্ভব নয়।

জীমূত ব্যথিতভাবে বলে—অগত্যা...তাহলে...।

অসিত গম্ভীর হয়ে বলে—এইরকমই একটা ট্র্যাজেডী আমি আশা করেছিলাম।

গাঙ্গুলী রাগ ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে।—বৃথা এমন হা-হুতাশ না ক'রে ওঁকে একটা পরামর্শ দিন। আর বেশি সাইকো-অ্যানালিসিসের দরকার নেই।

অসিত—পরামর্শ বলতে এখন তো শুধু একটি কথা...অর্থাৎ ওঁর জীবনের হ্যাপিনেস ও সম্মানের জন্য আর সত্যের খাতিরে এখন বাধ্য হয়ে ওঁর পক্ষে...।

জীমূত—হ্যাঁ, ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়াই ভাল।

গাঙ্গুলী—আমিও তাই বলি। একটা মিথ্যা সেন্টিমেন্টকে চিরস্থায়ী ক'রে রাখবার কোন অর্থ হয় না।

আরও গম্ভীর হয় অসিত—তা ছাড়া, ওঁর জীবনটাও তো ফুরিয়ে যায়নি। ওঁকে বেঁচে থাকতে হবে ; এবং আই উইশ, উনি ওঁর রূপগুণের প্রাপ্য যে প্রেস্টিজ, সেই প্রেস্টিজ নিয়ে বেঁচে থাকুন।

জীমূত—অতএব লেট আস্ ক্যানসেল আমাদের স্টীমার ভ্রমণ।

অসিত—ডাইভোর্সের জন্য একটা দরখাস্ত আজই যদি ড্রাফ্ট করিয়ে...।

গাঙ্গুলী—আমার ভাগ্নে অ্যাডভোকেট সত্যকিংকরের উপর এ-কাজের ভার ছেড়ে দিতে পারেন। দাম্পত্য বাদবিবাদের মামলায় ওর বেশ সুনাম আছে।

—তাহ'লে এখন...। কাজরীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে অসিত।

কাজরী—কি? এখনই কি কিছু করতে চান?

অসিত—হ্যাঁ। আর দেরি ক'রে লাভ কি?

গাঙ্গুলী—এখনি সত্যকিংকরের কাছে গিয়ে একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলতে পারা যায়।

জীমূত—হ্যাঁ, এখনই ভাল। এরকম অভিশাপকে ধিকিধিকি ক'রে জ্বলতে না দিয়ে, এক মুহূর্তে নিভিয়ে দেওয়াই উচিত।

কাজরী হাসে—তারপর?

কাজরীর প্রশ্নের অর্থটা ভাল ক'রে বোঝবার জন্য কাজরীর মুখের দিকে তাকায় অসিত ; জীমূত আর গাঙ্গুলীও তাকায়। কাজরীর দু'চোখের আশা সেই মুহূর্তে পরম আশ্বাসে টলমল ক'রে ওঠে। কাজরীকে অফুরান প্রেস্টিজ দিয়ে বরণ ক'রে নিয়ে জীবনের সঙ্গিনী করবার আশায় ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে আছে অসিত ; তাকিয়ে আছে জীমূত আর গাঙ্গুলী!

কাজরী বলে—সত্যকিংকরবাবুর কাছে গিয়ে আমায় কি করতে হবে বলুন।

গাঙ্গুলী—যা বলবার সব আমিই বলবো। আপনি শুধু দরখাস্তে একটা সই দিয়ে দেবেন। ব্যস্।

অসিত—কিন্তু ডাইভোর্স চাইবার একটা কারণ দেখাতে হবে মনে রাখবেন। কি বলবেন ভেবে রাখুন।

কাজরী—ভেবে রেখেছি।

জীমূত—কারণটা সাফিসিয়েন্ট হাওয়া চাই।

কাজরীর চোখ কটকট ক'রে জ্বলতে থাকে।—যা সত্যি, তাই বলবো।

গাঙ্গুলী—তার মানে?

কাজরীর বুক ঠেলে যেন একটা জ্বলন্ত আক্রোশের স্বর ঠিকরে পড়ে।--যে কারণে স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর হাত ধরবার কোনই অর্থ হয় না...সব মিথ্যে হয়ে যায়...সেই কারণে। চোখের উপর রুমাল চেপে ধরে কাজরী।

মাত্র এক মিনিটের মত একটা স্তব্ধতা যেন কাজরীর জন্মদিনের উৎসবের এই কেবিনের ভিতরে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। তারপরই ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় অসিত--চলুন তাহ'লে।

কাজরী বলে--তারপর আমাকে সোজা চন্দননগরে পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

অসিত--নিশ্চয়।

কাজরীর যে-যে কথা বলবার ছিল, সে কথা বলা হয়নি। বলবার সুযোগ কি আর পাওয়া যাবে?

কাজরীর সঙ্গে আর দেখা হয়নি, যদিও অফিসের ছুটির পর রোজই দুর্বার এক অভ্যাসের টানে সেই ক্যামাক স্ট্রীটেরই ফ্ল্যাটের ভিতরে ঢুকে, শূন্য নীড়ের একলা পাখির মত রাতের পর রাত পার করেছে অতীন। সেই যে জন্মদিনের উৎসবের টানে চলে গেল কাজরী, তার পর ক্যামাক স্ট্রীটের অভিশপ্ত নীড়ের কাছেও আর উঁকি দিতে আসেনি। মনে হয়েছিল অতীনের, কাফে মেটকাফের একটি কেবিনের মধ্যে পেটে খিল ধরিয়ে দেওয়া হাসির জোয়ারে ভেসে গিয়েছে কাজরীর জীবন। কিন্তু ভাঁটার টান কি দেখা দেবে না? ভয় পেয়ে, ভুল বুঝতে পেরে ; কোনমতে, অন্তত ওর মেয়েলি শরীরের গর্বটুকু বাঁচিয়ে ফিরে আসতে পারবে না কি কাজরী? না, সত্যিই কাদাজলের মধ্যে নাকানি-চুবানি খেয়ে মরেই গেল কাজরী?

একটা-দু'টো দিন নয় ; পর পর সাতটা দিন আর রাত অতীন বিশ্বাসের শুকনো মনটা যে সত্যিই কাজরী নামে এক নারীর আত্মনিষ্ঠুরতার ভয়ানক রকম দেখে আতঙ্কে কেঁপেছে আর বেদনায় টলমল করেছে। কোথায় আছে কাজরী? নিজের মনের এই প্রশ্নটাকেও ঘৃণা করে অতীন ; এবং নিজেও আশ্চর্য হয়ে লজ্জা পেয়েছে,...বুকের ভিতরে যেন একটা অদ্ভুত বেহায়াপনা চোরের মত মুখ লুকিয়ে এখনও কাজরীর ফিরে-আসা আশা করছে।

হ্যাঁ, সত্যিই যে একটা চোরা আশা এখনও মরে যায়নি। সাতটা দিন ও রাতের যন্ত্রণাময় ভাবনার পর কাজরীর খবর শুনতে পেয়েছে অতীন। সিন্‌হা সাহেবের বেয়ারা এসে ভাগবতকে ডেকে নিয়ে গেল। টেলিফোনে ভাগবতকে কে যেন ডেকেছে। এবং ভাগবত ফিরে এসেই খবর দিল, কয়লাঘাটের অফিস থেকে মা টেলিফোন করলেন। মা এখন চন্দননগরে আছেন, চন্দননগরেই থাকবেন।.

—আর কি বললেন?

—বললেন, চিঠিপত্র যা আসবে, সবই যেন সিন্‌হা সাহেবের মেয়েকে দিয়ে ঠিকানা কাটিয়ে চন্দননগরের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পায় অতীন, সিন্‌হা সাহেবের মেয়ে আশ্চর্য হয়ে এই ফ্ল্যাটের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন আগুন লেগেছে এই ফ্ল্যাটে ; সিন্‌হা সাহেবের মেয়ের চোখে সেইরকমের একটা আতঙ্কিত আশ্চর্য।

চন্দননগরে আছে কাজরী। থাকুক। খবর শুনে অতীন বিশ্বাসের বুকের ভিতরে সেই বেহায়া চোরা আশাটা যেন হঠাৎ খুশি হয়ে ওঠে। এবং অনেকদিন পরে আজ এই প্রথম ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে মনে হয় অতীনের এই শূন্যতা বোধহয় সারা জীবনের শূন্যতা নয়। কাজে যাবার জন্য ফ্ল্যাটের ঘর ছেড়ে বাইরে বের হবার সময়ও মনে হলো, মাথার ভিতর সেই যন্ত্রণার কামড়টা আর নেই। ক্যামাক স্ট্রীটের জারুল গাছের ছায়াগুলিও মন্দ নয়। আর, পার্ক স্ট্রীটের অটোমোবিল শো-রুমের কাছে এসে দাঁড়াতেই কাজ করবার উৎসাহটা আবার

সজীব হয়ে ওঠে।

অটোমোবিল শো-রুমের মালিক অতীনের উপর একটু প্রসন্ন হয়েছেন। কিছু মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন ; সেই সঙ্গে কাজের দায়ও কিছুটা বড় ক'রে দিয়েছেন। আজকাল অতীনকে বেশ কিছুটা হিসাব লেখার কাজও করতে হয়। তাই লেখার খাতাটাকে কাছে টেনে নেয় অতীন, এবং কলম হাতে তুলে নেবার আগে বেয়ারাকে ডাক দিয়ে বলে, এক কাপ চা নিয়ে এস।

এবং চা-এর কাপ হাতে তোলবার আগে টেলিফোনের একটা ডাক ক্রিং ক্রিং ক'রে ওঠে। কে জানে কোন্ কাস্টমারের কমপ্লেন এলো?

টেলিফোনের রিসিভারের চোঙ্গাতে কান পেতে আর মুখ এগিয়ে দিয়ে অতীন বলে—হ্যাঁ, আমি অতীন বিশ্বাস কথা বলছি।

টেলিফোন বলে—আমি সত্যকিংকর চ্যাটার্জি, অ্যাডভোকেট।

—বলুন।

—আপনাদের দাম্পত্য বিবাদটা মিটিয়ে নিন মিস্টার বিশ্বাস। কেন বৃথা আদালতের কাছে এসব অভিযোগ টেনে নিয়ে গিয়ে...।

—একটু স্পষ্ট ক'রে বলুন। বুঝতে পারছি না।

—আপনার স্ত্রী ডাইভোর্স চেয়ে আদালতে দরখাস্ত করতে চান। দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি আমার ওপর তদ্বিরের ভার দিয়েছেন। এবং প্রফেশনের খাতিরে আমি অস্বীকারও করতে পারি না। তবে কি জানেন...।

—বলুন।

—এ তো বুঝতেই পারছি ; বাই অ্যারেঞ্জমেন্ট, অর্থাৎ সহজে ডাইভোর্স পাওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ক'রে আপনারা এমন একটি ছুতো ধরেছেন যে...।

—কি বললেন?

—এমন সাংঘাতিক একটা কারণ দেখিয়ে ডাইভোর্স নেবার দরখাস্ত করা হয়েছে, তাতে ডাইভোর্স মঞ্জুর না হয়েই পারে না।

—আপনার কথার অর্থ কিছু বুঝতে পারছি না।

—আপনার স্ত্রী বলেছেন যে, আপনার পক্ষে স্বামী হবার আসল যোগ্যতাটুকুই নেই।

—এইবার বুঝলাম।

—কিন্তু অভিযোগটা কি সত্যি?

—হ্যাঁ।

—আমার সন্দেহ হচ্ছে ; একটা ছুতো।

—না।

—তাহলে তো আপনি ডিফেণ্ড করবেন না বলে মনে হচ্ছে।

—না, এক্ষেত্রে নিজেকে ডিফেণ্ড করবার কোন অর্থ হয় না।

—তা ঠিক। আচ্ছা, নমস্কার।

মাতালের মত হো হো ক'রে হেসে উঠতে গিয়েই চুপ হয়ে যায় অতীন। যেন বুকে-পিঠে চোখে-মুখে ও মাথায় হাজার চাবুকের আঘাত বর্ষণ হচ্ছে। পেয়ালার গরম চা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা জল হয়ে গিয়েছে ; লেজার খাতার উপর কনুই রেখে মাথাটাকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকে অতীন।

ফ্যান ঘোরে, কপালের ঘাম তবু শুকোতে চায় না। অতীনের সুন্দর চেহারার সেই অহংকেরে পৌরুষ যেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে তপ্ত ধুলোর উপর পড়ে মুখ ঘষছে।

টেবিলের উপরে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। ঘুমিয়ে পড়ে অতীন। এবং

আবার ঘর্মাক্ত কপালটা টেবিলের উপর থেকে তুলে দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকায়। মাত্র দুপুর। বিকেল হ'তে যে এখনও আরও চার ঘণ্টা।

চোখ দুটো স্যাঁতসেঁতে হয়েছে, তবু জ্বলছে, রক্ত ঝরছে না তো? রুমাল দিয়ে চোখ মোছে অতীন। না, রুমালটা লাল হয়ে যায়নি, চোখের জলটা এখনও সাদা আছে।

দারোয়ান এসে খোঁজ নেয়--আপনার তবিয়ৎ খুব খারাপ মালুম হচ্ছে অতীনবাবু।

অতীন--হ্যাঁ।

দারোয়ান--তাহ'লে বাড়ি চলে যান।

বাড়ি? হ্যাঁ বাড়ি নামে একটা অনেক দূরের, জীবনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে একটা অন্য জগতের ছবি চোখের সামনে ভাসে। দারোয়ান চলে যেতেই আবার টেবিলের উপর কপাল নামিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে অতীন।

ঘুম নয়, বোধ হয় একটা স্নিগ্ধ স্বপ্নকে খুঁজছে অতীনের জ্বালাভরা চোখ। কিংবা স্বপ্নের মধ্যে পথ খুঁজছে।

এভাবে মুখ গুঁজে আর চোখ বুঁজে বসে বসে পথ খুঁজে লাভ কি? উঠে দাঁড়ালেই তো হয়। তারপর ঐ তো পথ। একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা এই পথ দিয়েই ছুটে গিয়ে শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়। তারপর ডাইনে ঘুরে বেলগাছিয়ার হাসপাতাল পার হয়ে, যশোর রোডের ধুলো উড়িয়ে দিয়ে, নতুন নতুন কারখানা আর কলোনির অপরাহ্নের ছায়া পার হয়ে আবার ডাইনে ঘুরে যেতে কতক্ষণ লাগে? লোনা বাগজলায় আজও লাল পানা ভাসে নিশ্চয় ; আর খালের জলে খড়ের পাহাড় নিয়ে বড় বড় নৌকা ভেসে যায়। আর, রসিকপুরের রাজবাড়ির দেউড়ির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আলকুশীর ঝোপের ভিতর থেকে সেই খাটাসের সুন্দর মুখটা বোধ হয় আজও উঁকি দিয়ে তাকিয়ে থাকে। দক্ষিণের বাগানে কি এখনও শিমুল ফোটেনি? পুকুরের পাশে কনক চাঁপা?

টিপ টিপ করে বুকটা। টিপ টিপ করে অতীন বিশ্বাসের বুকের একটা সখ। কেমন আছে কেতকীর ছেলে? কত বড় হলো? স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন নয়, চোখ মুছে ছটফট করে অতীন। সত্যিই যে মনে হলো, একটা বাচ্চা ছেলের নরম শরীর এতক্ষণ ধরে গা ঘেঁষে খেলা করছিল।

কেতকীর সিঁথিটা সাদা। কিন্তু অতীনের হৃৎপিণ্ডের ভিতরে কি রক্ত নেই? এখন কি ছুটে চলে যাওয়া যায় না, আর কেতকীর ঐ সাদা সিঁথিটাকে হাজার চুমো দিয়ে রঙীন ক'রে দেওয়া যায় না?

বোধ হয় এই স্বপ্নের ঘোরেই ঘোর মাতালের মত টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায় অতীন। কি যেন ভাবে। ব্যস্তভাবে ঘড়ির দিকে তাকায়। সাতটা বাজে। পার্ক স্ট্রীটের সন্ধ্যা আলোয় ভরে গিয়েছে। আরও ব্যস্ত হয়ে হাতের কাছে কাগজ টেনে নিয়ে একদিনের ছুটি চেয়ে একটা দরখাস্ত লিখে টেবিলের উপর রেখে দেয় অতীন।

ক্ষমা চাইবে অতীন। আশ্চর্য হয়ে যাবে কেতকী। হেসে মিষ্টি হয়ে যাবে কেতকীর মুখ। এক পেয়ালা চা এগিয়ে দিয়ে অতীনের এই শ্রান্ত ক্লান্ত বঞ্চিত মূর্খ ও উন্মাদ জীবনটাকে মিষ্টি করে দেবে। কমল বিশ্বাস আর সুধাময়ী, জীর্ণ শীর্ণ ঐ দুটি মানুষের পা ছুঁয়ে আজ বলে দিতে পারবে অতীন--গল্পটা বিশ্বাস করেছি বাবা। এই ভাঙা-বাড়ির বুকের ভিতরে সোনা লুকিয়ে আছে।

আর পা টলে না। ব্যস্তভাবে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে পথের দিকে তাকিয়ে ট্যাক্সি খোঁজে অতীন বিশ্বাস। ছুটে আসছে। একটা ট্যাক্সি, এ কি আশ্চর্য, ট্যাক্সিটা যেন অতীন বিশ্বাসের জীবনের এই দুর্বার ব্যাকুলতার দাবিটা আন্দাজ ক'রে নিয়ে একেবারে অতীনের চোখের কাছে এসে আপনিই থেমে যায়।

--হাউ ডু ইউ ডু মাই ডিয়ার বয়?

পার্ক স্ট্রীটের সন্ধ্যার এই মধুর-চঞ্চল ও আলোকময় রূপটাকে যেন কলুষিত ক'রে দিয়ে অজয় মাতালের চিৎকার বেজে ওঠে।

--প্যারাডাইস লস্ট! ঢেঁকুর তুলে আবার চেঁচিয়ে ওঠে অজয়।

সিগারেট ধরায় অজয় মাতাল, এবং হাতের ফোস্কায় ফুঁ দিয়ে হেসে ওঠে।--কেতকী ইজ গন উইথ দি উইণ্ড। বুঝতে পারলেন কি স্যার?

অতীন বলে--না।

অজয়--তারে চিনিতে পারনি, তারে বুঝিতে পারনি। সে তোমার চেয়ে অনেক চালাক।

অতীন--কে?

অজয়--কেতকী, তোমার পরিত্যক্তা সেই মহীয়সী।

অতীন--কি হয়েছে কেতকীর?

অজয় হাসে--একটি চমৎকার স্বামী হয়েছে। রেলওয়ের অডিটার শ্রীযুক্ত নির্মলকান্তি রায়।

হঠাৎ যেন একটু দুঃখিত হয়ে যায় অজয় মাতালের হাসিটা।--সবচেয়ে প্যাথেটিক ব্যাপার কি হয়েছে জান?

অতীন--না।

অজয়--স্বয়ং তোমার পিতৃদেব আশীর্বাদ ক'রে বিয়েটা ঘটিয়েছেন। এবং বিচিত্র নাতিটাকেও কৃত্রিম বাবার কোলে তুলে দিয়েছেন। যাক্, তুমি এখন কোন্ অভিসারে যাচ্ছিলে বল দেখি ভায়া?

অতীন--জানি না।

অজয়--সে কি? তোমার মত এমন একটি খাসা মাইডিয়ার মানুষের সন্ধ্যাবেলা কোন এনগেজমেণ্ট নেই, এ কি সম্ভব?

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে অতীন। অজয় বলে--আমার সঙ্গে যাবে?

অতীন--না।

অজয় মাতাল চলে যায়। অনেকক্ষণ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর চোখ মোছে অতীন, এবং ভেজা রুমালের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, রুমালটা লাল হয়ে গিয়েছে। চোখ থেকে কি সত্যিই রক্ত ঝরছে? নইলে চোখের সামনে এই রাস্তাটাকেই বা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

মাসটা অঘ্রান ; কিন্তু হঠাৎ একটা অকাল তুফানের রাগ পথের উপর ধুলোর আঁধি ছুটিয়ে দিয়েছে।

খড়দহতে রামকানাইবাবুর বাড়িতে কেতকীর মাথার সিঁদুরের দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে বিদায় নেবার সময় কেতকীর বেবিকে একবার বড় শক্ত ক'রে বুকের উপর জড়িয়ে ধরেছিলেন বুড়ো কমল বিশ্বাস। দুরন্ত বেবিও বড় বেশি ছটফটিয়ে আর হাত-পা ছুঁড়ে বুড়োমানুষকে নাকাল করেছিল। বেবির জুতোপরা পায়ের ছোট্ট একটা লাথি কমল বিশ্বাসের পাঁজরের উপর খট্ ক'রে বেজে উঠেছিল। বেশ ব্যথাও পেয়েছিলেন কমল বিশ্বাস।

সেই ব্যথাটাকেই যেন একটা দুর্লভ উপহারের মত পাঁজরের আড়ালে লুকিয়ে রেখে আরও খুশি হয়ে হাসতে হাসতে চলে এলেন কমল বিশ্বাস। পাঁজরের উপর ভুলেও একবার হাত বোলাননি।

রসিকপুরে রাত্রির ঘুটঘুটে অন্ধকারে সেই গলিত-পলিত রাজবাড়ির সব কুশ্রীতা ঢাকা পড়ে যায়। জমাট মেঘ ছিঁড়ে ছিঁড়ে বিদ্যুতের জ্বালা ঝিলিক হানে। গরগর করে আকাশটা। ঝরঝর ক'রে বৃষ্টি ঝরে পড়ে। আর, মাঝে মাঝে অঘ্রানের অকাল তুফানের আক্রোশ ছুটে

এসে বাগানের গাছপালার উপর মড়মড় ক'রে ভেঙে পড়ে।

ভাঙা বাড়ির বুড়ো আর বুড়ী তেমনই বারান্দার উপর মাদুর পেতে বসে থাকে, রাত জাগে, আর চক্রান্ত করে। দুটি ক্লান্ত জীবনের চক্রান্ত। সুখ নিয়ে টানাটানি করবার, দুঃখ নিয়ে রাগারাগি করবার চক্রান্ত নয়। শুধু চুপচাপ বিলীন হয়ে যাবার চক্রান্ত। বাঁচাটা যখন সুখের হলো না, অন্তত মরাটা সুখের হোক।

পাঁজরের উপর সেই ব্যথাটা একটু একটু ক'রে ফিকে হতে হতে যেদিন একেবারে ফিকে হয়ে গেল, সেদিনই পাঁজরের উপর হাত বুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন কমল বিশ্বাস।—সব শূন্য হয়ে গেল সুধা। আর কোন বেদনাও নেই যে ভুগি। তবে কেন? এবার সরে পড়লেই তো হয়।

সুধাময়ীও স্বীকার করেন।—হ্যাঁ।

এই চক্রান্তের মধ্যেও একটা সাধ আছে। যেন দু'জনে একসঙ্গে একই সময়ে দু'জনের মুখের দিকে শেষবারের মত তাকিয়ে চিরকেলের মত চোখ বুঁজে ফেলতে পারেন। যেন আগে পরে না হয়। ঠাকুর কি এই সাধ পূর্ণ করবেন?

হঠাৎ হেসে ওঠেন কমল বিশ্বাস--ঠাকুর তোমার সাধ পূর্ণ করবেন, এ সাধ ছেড়ে দাও সুধা। ঠাকুরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করলেই ঠকবে।

সুধাময়ী—নির্ভর করলে ক্ষতি কি?

কমলবাবু—লাভও তো নেই।

সুধাময়ী--এ যে ঠাকুরের ওপর অবিশ্বাসের কথা হলো।

কমলবাবু—অবিশ্বাস নয়, বিশ্বাসও নয়। ঠাকুর হলো তোমার এই রাজবাড়ির মাটিতে পোঁতা পাঁচ কলস সোনার মত। হয়তো আছে, হয়তো নেই। থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি? বিশ্বাস করলে লাভ নেই, অবিশ্বাস করলে ক্ষতি নেই।

সুধাময়ী—থাক এসব কথা। শর্মাজী চিঠির কোন উত্তর দিয়েছেন?

কমলবাবু—দিয়েছেন।

সুধাময়ী—কবে আসবেন শর্মাজী?

কমলবাবু—মনে হচ্ছে, কাল সকালেই আসবেন।

বদরীনাথের পাণ্ডা শর্মাজী প্রতি বছর কলকাতায় এসে তীর্থ যাত্রী যোগাড় করেন। আজ দশ বছর ধরে, প্রতি বছরে একটি দিনে এসে রসিকপুরের কমল বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে ভুলে যাননি শর্মাজী। শর্মাজীর আবেদন শুধু চুপ ক'রে শুনেছেন আর হেসেছেন কমল বিশ্বাস। বদরীনাথ দর্শনের পুণ্য বাখান করে কত কথা বলেছেন শর্মাজী। দেখিয়ে হিমলকি শোভা, করিয়ে স্নান মন্দাকিনী অওর অলকনন্দাকে নীরমেঁ ; কিতনা সাধুসঙ্গ হোবে, কিতনা পুণ হোবে ; নতুন বল পাইবে জীবন!

শর্মাজীর এসব কথার আবেদন কমল বিশ্বাসের মন গলাতে পারেনি। কিন্তু এইবার যে-কথা বলে চলে গিয়েছেন শর্মাজী, সে-কথা শোনবার পর কমল বিশ্বাসের মন লুব্ধ না হয়ে থাকতে পারেনি। সুধাময়ীরও মনে হয়েছে, শর্মাজী যে সত্যিই পরম সৌভাগ্যের কথা বলে চলে গেলেন। মহাশয় বুড়া হোয়েছেন, মহাশয়াভি বুড়ো হোয়েছেন। অওর শরীরভি কমজোর হোয়ে গিয়েছে। এহি তো আঁখ মুদনেকা লগন হ্যায় কমলবাবু। আমার খুব মনে হোচ্ছে, যদি দুইজনে তীরথ করেন, তবে বদরীবিশালজী দুই জনকেই কিরপা করবেন। ফিরনেকা দুর্ভাগ আর হোবে না কমলবাবু।

শর্মাজীর এইবারের আবেদন কমল বিশ্বাসের মনে ধরেছে। সুধাময়ীর শীর্ণ মুখটাও হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তীর্থের পথে যেতে যেতে একদিন দু'জন দু'জনের হাত ধরে ধুলোর উপর লুটিয়ে পড়বে, আর উঠতে হবে না। ভাবতে যে সত্যিই ভাল লাগে।

কমলবাবু বলেন--দক্ষিণ দরজার বাগানের কাঠা পাঁচেক জমি বেচে দিতে হবে ; বাস্, যা পাওয়া যাবে তাই যথেষ্ট। দু'জনের বাবদ শর্মাজী তিন শো টাকা পেলেই খুশি ; হরিদ্বার পর্যন্ত পথের খরচটা অবিশ্যি ঐ তিন শো টাকার বাইরে।

অঘ্রানের অকাল তুফানের আক্রোশ হঠাৎ থেমে গিয়েছে। গাছপালা আর মড়মড় করে না ; আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিকও নেই। বৃষ্টিও নেই।

রাতের অন্ধকার যদিও একটু ফিকে হয়েছে, কিন্তু বোঝা যায় না, রাত ফুরোতে এখন কত বাকি? আকাশের মেঘ কেটে এসেছে, কিন্তু তারার ঝিকিমিকি দেখেও আন্দাজ করা যায় না, মাঝরাত পার হয়ে গিয়েছে কি যায়নি।

কমল বিশ্বাস আবার হেসে ওঠেন--কি-রকম মনে হচ্ছে জান?

সুধাময়ী--কি?

কমল বিশ্বাস--মনে হচ্ছে, দু'জনে হয় মরেও বেঁচে আছি, নয় বেঁচেও মরে আছি।

সুধাময়ীও হাসেন--একই ব্যাপার।

কমল বিশ্বাস--তার চেয়ে এখান থেকে সরে যাওয়াই ভাল নয় কি?

সুধাময়ী--নিশ্চয়। আর কিসের জন্য থাকবো?

দু'জনে আবার যেন একেবারে নিরেট একটা সমাধির মধ্যে একেবারে নীরব হয়ে জাগা চোখের ক্লান্তি নিয়ে বসে থাকেন। গুঁড়ো বৃষ্টিও বোধ হয় ফুরিয়েছে। সারা বাগানের গাছপালা জোনাকীতে ছেয়ে গিয়েছে।

কমল বিশ্বাস বলেন--আমি কোন দিন নিজের জন্য সুখ চাইনি সুধা! বরং চেয়েছি, কে কত ঘা দিবি দে ; ঘা খাওয়াই আমার জীবন। কিন্তু এখন যে সবই ফাঁকা। জ্বালাবার, কষ্ট দেবার, পাঁজরে লাথি মারবারও কেউ নেই।

কমল বিশ্বাসের গলার স্বর ফুঁপিয়ে উঠেছে। সুধাময়ী বলেন--চুপ কর। সব বুঝেও কেন অবুঝপনা কর!

গলা কাশেন কমল বিশ্বাস--ঠিক কথা সুধা। কি নিয়ে বেঁচে থাকবো, এ প্রশ্ন যখন আর থাকে না, তখন বেঁচে থাকবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে বরং মরে যাবার চেষ্টা করাই উচিত।

সুধাময়ী--আগে সরে তো যাই।

কমল বিশ্বাস--ও কি? আবার ওখানে ছায়া ঘুরে বেড়ায় কেন?

অন্ধকারটা বোধ হয় একটু ফিকে হয়েছে। ঠাকুরদালানের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় সুধাময়ী, একবার এদিক আর একবার ওদিকে ঘুরে ঘুরে যেন ছটফট করছে একটা ছায়া। দপ্ ক'রে দেশলাই-এর আলো জ্বলে উঠলো। আবার যেন চমকে তিন পা পিছনে সরে গেল ছায়াটা।

কমল বিশ্বাস বলেন--ঐ দেখ, আবার এগিয়ে আসছে।

সুধাময়ী--কি সন্দেহ করছো তুমি?

কমল বিশ্বাস--সোনাচোর। আশ্চর্য!

আশ্চর্য হবারই কথা। প্রায় এক মাস ধরে রোজই রাতে সোনাচোরের ছায়া ঠাকুরদালানের কাছে ঘুরঘুর করছে। কতবার এই বারান্দাতেই রাত জেগে বসে ছায়াগুলির আনাগোনা লক্ষ্য করেছেন কমল বিশ্বাস। ঠাকুরদালানের ভিতর আর থামের ফাটলগুলির উপর শাবলের আঘাত আছড়ে আছড়ে পড়ে শব্দ করছে, তাও শুনতে পেয়েছেন কমল বিশ্বাস। শুধু দু'টি চোখের শান্ত-ক্লান্ত দৃষ্টি তুলে অন্ধকারের মধ্যে সোনাচোরের ছায়ার ছটফটানি লক্ষ্য করছেন, কিন্তু একটুও বিচলিত হননি কমল বিশ্বাস। একবার একটা ঠাট্টার কাশিও কাশেননি।

যেদিন পাঁচুর কাছে শুনতে পাওয়া গেল, সাপের কামড়ে অজ্ঞান হয়ে হাসপাতালে গিয়েছে যুধিষ্ঠির, সেদিন হঠাৎ একবার হেসে ফেলেছিলেন কমল বিশ্বাস। এবং তারপর

থেকে রাতের অন্ধকারে সোনাচোরের উপদ্রব আর দেখা দেয়নি। কিন্তু, সত্যিই যে আবার সেই উপদ্রব শুরু হলো মনে হচ্ছে।

সুধাময়ী বলেন--ঘরে চল এবার।

কমল বিশ্বাস--না।

সুধাময়ী--কেন?

কমল বিশ্বাস--ছায়াটা এদিকে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

রসিকপুরের ভাঙা রাজবাড়ির ছেলে অতীনেরই ছায়া।

পার্ক স্ট্রীটের সন্ধ্যার আলোকিত পথের উপর দিয়ে বৃষ্টিভেজা বাতাসের ঝড় ছুটতে আরম্ভ করেছে, তখন পথ চলতে শুরু করেছে অতীন। অনেক হেঁটেছে, অনেকবার রিক্সা ধরেছে, কয়েকবার ট্যাক্সি। শ্যামবাজারের চা-এর দোকানে বসে রাত দশটা ক'রে দিয়েও যখন বৃষ্টি থামলো না, তখন আবার পথে নেমেছে অতীন। হেঁটে হেঁটেই নাগের বাজার ; তারপর ডাইনে ঘুরে কাঁচা কাদাটে সড়ক ধরে রসিকপুরের রাজবাড়ির ভাঙা দেউড়ির ইঁটের স্তূপের কাছে এসে যখন দাঁড়িয়েছে অতীন, তখন মেঘ কেটে গিয়ে একটু ফিকে হয়েছে অন্ধকার। আর, আলকুশীর ঝোপের জোনাকীগুলি ছটফটিয়ে উঠতেই বুঝতে পেরেছে অতীন, একটা খাটাসের মুখ উঁকি দিয়েছে।

থামেনি ; এগিয়ে এসেছে অতীন। ফিকে অন্ধকারে দেখতে পাওয়া যায়, পথের উপর ছড়িয়ে রয়েছে আসশেওড়ার সাদা ফুল। কিন্তু ঠাকুরদালানের কাছে এসেই থমকে দাঁড়াতে হয়েছে। পথটা আর বোঝা যায় না, খুঁজেও পাওয়া যায় না।

ঠাকুরদালানের বারান্দার ফাটলধরা থামের মাথা থেকে ধপ্ ক'রে মাটির উপর লুটিয়ে পড়লো সোনা-সোনা রং-এর একটা চকচকে নরম পিণ্ড।

কাতরে উঠলো পিণ্ডটা। দেশলাই জ্বেলেই দু'পা পিছনে সরে গেল অতীন। সাপটা ফণা তুলে তাকিয়ে রইল। সাপটা খুব বুড়ো হয়েছে নিশ্চয়ই ; আঁশগুলি জ্বলছে।

শুধু কি সাপটা? বার বার দেশলাই জ্বেলে দেখতে পায় অতীন, ঠাকুরদালানের বারান্দার বড় বড় ফাটলের ভিতর থেকে আরও কত সোনালী চেহারা রাগ ক'রে উঁকি দিয়ে রয়েছে। এক একটা সোনাগাদা গোসাপ, টাটকা হলুদের মত রং।

হেসে ফেলে অতীন। অতীনের পায়ের শব্দ বোধ হয় ওরা কেউ পছন্দ করছে না।

এত বড় একটা ঝড় হয়ে গেল, তবু কি আরামে পাতায় পাতা জুড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে ভিতরের আঙ্গিনার দিকে যাবার পথের উপর এই আমরুলটা! একটা বুনো লতা কি শক্ত করে আমরুলের ডাল শত শত আঁকড়ি দিয়ে জড়িয়ে ধরে রয়েছে। এত বড় একটা ঝড়ও লতাটাকে কাদার উপর নামিয়ে দিতে পারেনি।

দেশলাই জ্বেলে পথটা ভাল ক'রে ঠাহর ক'রে নিয়ে এগিয়ে যায় অতীন। পথটা যে ঘাসে ছেয়ে গিয়েছে। রসিকপুরের অদ্ভুত রাজবাড়ির মধ্যে কি তবে আর কোন মানুষের প্রাণ বাস করে না? চলে গিয়েছে, সরে গিয়েছে সবাই?

এক রাতের মধ্যে দু-দু'বার বৃষ্টিতে ভিজে চবচবে হয়ে আবার এতক্ষণ পরে একটু শুকিয়েছে অতীন বিশ্বাসের কামিজ আর ট্রাউজার, গলার টাই আর পায়ের জুতো। এগিয়ে যেতে যেতে আর একবার থমকে দাঁড়িয়ে মনে মনে কথা বলে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করে অতীন, কিসের জন্য এভাবে এখানে একটা বদ্ধ পাগলের মত অকারণ মেজাজের আর ইচ্ছার তাড়ায় ছুটে এসেছে অতীন? কি দেখতে?

কোন উদ্দেশ্য নেই, কারও উপর রাগ নেই, কাউকে ধরবার আশা নেই, তবে এত মরিয়া হয়ে ছুটে আসাই বা কেন?

তবে কি পুরনো ফুলশয্যার ঘরটাকে নতুন ক'রে দেখবার লোভ জেগেছে অতীন

বিশ্বাসের বুকের এক কোণে? সত্যিই কি পাগলের মত কল্পনা করছে অতীন, কেতকী চলে গেলেও কেতকীর একটা ছায়া অন্তত ঘুমিয়ে পড়ে আছে সেই ঘরের খাটের উপর? সেই ছায়াতে কেতকীর সেদিনের ঢাকাই শাড়ির গন্ধটাও আছে বুঝি?

বারান্দার উপর উঠে আস্তে আস্তে সেই ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে অতীন, যে-ঘরে একদিন এমনই এক গভীর রাতে কেতকী নামে এক নারীর শরীরের দিকে তাকিয়ে একটা কাঙাল লোভের আবেগে পাগল হয়ে গিয়েছিল, অতীন, আর ভয়ানক এক মুর্খতার ভুলে সেই কাঙাল লোভটাকেই পৌরুষের অহংকার বলে মনে করেছিল। কিন্তু এখন আর মনে মনে এই ভালমানুষী বিলাপ সেধে লাভ কি? অতীনের জীবনে ভালমানুষী বিলাপ শোনবার অপেক্ষায় আশার তপস্বিনী হয়ে এখানে আর পড়ে নেই কেতকী।

—অতু?

রসিকপুরের ভাঙা-বাড়ির বিনিদ্র অন্তরাত্মার অন্ধকারটাই যেন ডেকে উঠেছে। বুক কাঁপে অতীনের, কিন্তু সেই সঙ্গে চোখ দু'টোও যেন ভিজে যেতে চায়। কি আশ্চর্য, সেই দু'টি জীর্ণ-শীর্ণ মানুষ কি আজও রাত জেগে চক্রান্ত করছে? আর কিসের চক্রান্ত?

—কি মনে ক'রে হঠাৎ এভাবে এসময়ে আবার এবাড়িতে ঢুকলি অতু? কমল বিশ্বাসের কোটরগত চোখের কঠিন দৃষ্টিটা দেখা যায় না, কিন্তু গলার ঘড়ঘড়ে স্বরের চাপা ধিক্কারটা শোনা যায়।

অতীন বলে—তোমরা এখনও জেগে বসে আছ কেন বাবা? একটা আলো জ্বেলেও রাখনি কেন? মা কথা বলছো না যে?

আলো জ্বালেন সুধাময়ী। এবং এইবার দেখা যায়, কমল বিশ্বাসের কোটরগত চোখের মধ্যে একটা করুণ বিস্ময়ের চাহনি কোমল হয়ে ঢলঢল করছে। অতীনের মুখে এরকম নতুন ভাষা আর অতীনের গলায় এরকম নতুন স্বর শুনতে পাবেন বলে যে কল্পনাও করেননি কমল বিশ্বাস। কমল বিশ্বাসের পক্ষে আশ্চর্য হবারই কথা।

সুধাময়ী কি যেন বলতে চান, এবং বলতে গিয়ে তাঁর গলার স্বর প্রায় গলে পড়তে চায় —খেয়ে-টেয়ে এসেছিস তো অতু?

অতীন—না। কিন্তু একটুও ক্ষিদে নেই।

সুধাময়ী—শরীর খারাপ নয় তো?

অতীন—না...কিন্তু তোমরা রাত জেগে বসে শরীরটাকে শেষ করছো কেন? যাও, এবার ভিতরে গিয়ে শুয়ে পড়।

কিন্তু ওঘরের দিকে তাকায় কেন অতীন? দেখতে পাচ্ছে না কি, ওঘরের দরজার কড়ায় যে মস্ত বড় একটা বন্ধ তালা ঝুলছে?

তবু সেই ঘরের দিকে এগিয়ে যায় অতীন। বুড়ো কমল বিশ্বাসের শীর্ণ পাঁজরের আড়ালে হঠাৎ একটা প্রচণ্ড মায়ার হৃদপিণ্ড যেন ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠে। চোখের কোটরটাই ছলছল ক'রে ওঠে। ডুকরে ওঠেন কমল বিশ্বাস—ওদিকে যাসনি অতু। ওঘরে কেউ নেই।

হেসে ফেলে অতীন—জানি।

সুধাময়ী আশ্চর্য হন—শুনেছিস তাহ'লে।

অতীন—হ্যাঁ, সবই শুনেছি। খুব ভাল হলো মা। এরকম হওয়াই উচিত ছিল।

কমল বিশ্বাস যেন মুগ্ধ হয়ে অতীনের মুখটাকে দেখছেন। রসিকপুরের এই অভিশপ্ত এক ভাঙা-বাড়ির ছেলের মনটা কি হঠাৎ সোনা কুড়িয়ে পেয়ে বড়লোক হয়ে গেল? কেমন ক'রে পেল?

অতীন বলে—তোমরা আমার জন্যে দুঃখ না করলেই আমার আর কোন দুঃখ নেই।

কমল বিশ্বাস—সত্যি বলছিস তো অতু।

অতীন হাসে—হ্যাঁ বাবা। আর মিথ্যে কিছু বলতে ইচ্ছে হয় না।

সুধাময়ী—কেতকীর কথা ভেবে যদি মনে কোন দুঃখ...।

অতীন—হ্যাঁ, ভাবতে শুধু এই দুঃখ হয় যে, মানুষটা বড় বেশি ভাল ছিল। এত ভাল হওয়া উচিত হয়নি।

কমল বিশ্বাস চেঁচিয়ে ওঠেন—অতুকে আর বেশি কথা বলিও না সুধা। ওকে এখন একটু জিরোতে দাও।

অতীন বলে—ওঘরের চাবিটা দাও মা!

রসিকপুরে মেঘলা অঘ্রানের সকালবেলার কাক ভেজা-ভেজা স্বরে অনেক ডাক ডেকেছে। অতীনেরও ঘুম ভেঙেছে। এবং ঘুম ভাঙতেই ঘরের ভিতরে সব দিকেই দু'চোখের দৃষ্টি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার তাকিয়েছে। তারপর বিছানা থেকে উঠে আলমারিটার ভিতরেও উঁকি দিয়ে দেখেছে।

না, কোন স্মৃতির চিহ্ন রেখে যায়নি কেতকী। কেতকী বড় চালাক। ঘরটাকে যেন একেবারে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার ক'রে রেখে দিয়ে সরে গিয়েছে। আলনাটা শূন্য, আলমারিটা শূন্য, ছোট টেবিলটাও শূন্য। ভুল ক'রে একটা ছেঁড়া রুমালও রেখে যায়নি কেতকী।

কিন্তু একটা বাচ্চা ছেলের ছোট্ট একটা ফটোও কি রেখে যেতে ভুলে গেল কেতকী? কেতকীর কি একবার সন্দেহও হয়নি যে, কেতকীর ছেলের অন্তত ফটোটা দেখবার অধিকার একজনের আছে। এবং সে মানুষটা একদিন এসে এই ঘরের ভিতরে ঢুকে অন্তত সেই ছোট্ট ফটোটা চোখে দেখতে না পেলে মনের দুঃখে ছটফট ক'রে উঠতে পারে।

আলমারির দেরাজটাকে একবার ভাল ক'রে হাতড়াতে গিয়ে অতীনের হাতটা শুধু পুরনো ধুলোয় মাখা হয়ে কাঁপতে থাকে। না, কিছু নেই। কী সুন্দর প্রতিশোধ নিতে জানে কেতকী! মিথ্যা সোনার গল্প বলে যাকে এই বাড়িতে আনা হয়েছিল, যার গায়ের সব সোনা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, তাকেই শেষে এই বাড়ির রক্তের সোনা ঘুষ দিয়ে বিদায় দিতে হয়েছে। ভালই হয়েছে।

পাঁচু এসে দরজার কাছে দাঁড়ায়, আর খুশি হয়ে এক গাল হেসে হেসেই আবার কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অতীনের হতাশ চোখের আক্ষেপটা কি পাঁচুর চোখেও ধরা পড়ে গেল?

পাঁচু বলে—মুখ ধুয়ে নিন আর চা খেয়ে নিন দাদাবাবু!

অতীন হাসে—চা তৈরী করলে কে? তুই?

পাঁচু হাসে—আর কে করবে বলেন?

পাঁচুর হাসিটা হাসি বলে মনে হয় না। হাসতে গিয়ে গেঁজেল পাঁচুর লাল চোখ দুটো যেন মিটমিট ক'রে কাঁদুনি চাপতে চেষ্টা করছে।

চলে গেল পাঁচু। পাঁচুকে আর জিজ্ঞাসা করা গেল না ; কত বড়টি আর দেখতে কেমনটি হয়েছে তোর বউ-দিদির ছেলেটা? তোরই তো কোলে কোলে ঘুরেছে ছেলেটা! খুব দুষ্টু, না খুব শান্ত? ওরা চলে যাবার সময় তোরা কি খুব কেঁদেছিলি, না ওরা কেঁদেছিল? ছেলেটা কাঁদেনি তো?

এই প্রশ্নগুলিও যে অসার বিলাপের বিলাস মাত্র। ঘর থেকে বের হয়ে আর চোখ-মুখ ধুয়ে যখন চা-খাবার খায় অতীন, তখন রসিকপুরের কাকের ভেজা-ভেজা স্বরও বেশ শুকনো আর কর্কশ হয়ে উঠেছে। বেলা হয়েছে মনে হয়।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দেখা যায়, পুকুরটা কানায় কানায় জলে ভরে গিয়েছে। আর এক পশলা বৃষ্টি হলেই জল উছলে পড়ে বাঁশবাগানটাকে ভাসাবে। মাছগুলিও পালাবে। সত্যিই মাছ আছে কি? একটা ছিপ যোগাড় করলে কেমন হয়? পাঁচুটা গেল কোথায়?

পাঁচুকে ডাকবার জন্য বারান্দার দিকে এগিয়ে আসতেই অচেনা গলার স্বর শুনে আশ্চর্য হয় অতীন। মানুষটার ভাষাও অদ্ভুত। ঠিক বোঝা যায় না, কোন বাঙালী ভদ্রলোক হিন্দী বলছে, না হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক বাংলা বলছে।

—কে কথা বলছে পাঁচু?

পাঁচু বলে—শম্মাজী এয়েছেন।

ব্যস্তভাবে হেঁটে কমলবাবুর ঘরের কাছে এসে দাঁড়াবার পর অতীনের ধাঁধা ভাঙে। গেরুয়া রং-এর পাগড়ি, কপালে তিলক বেশ প্রশান্ত ও সৌম্য চেহারার এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক লম্বা একটা খাতা খুলে কি যেন লিখছেন। তারপরেই খাতা গুটিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।—বাস্, এখন শুধু নাম লিখাই হোয়ে রহিল। হামার লোক একেবারে ঠিক-ঠিক পহেলা ফাল্গুনকে পৌঁছছে যাবে। আপনাদিগকে হরিদ্বার তক্ নিয়ে গিয়ে হামার ধরমশালায় পঁহুছাই দিবে। সরকারী পিলগ্রিম অফিস থেকে রাস্তার বরফ গলনেকি বার্তা আসিয়া পড়তেই আপনাদিগকে প্রথম যাত্রী দলের সাথে রওয়ানা করিয়ে দিব। জয় বদরিবিশাল।

চলে গেল শর্মাজী। অতীনও কিছুক্ষণ নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপরেই রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠে।—কি কাণ্ড করছো তোমরা?

কমল বিশ্বাস—কাণ্ড বলছিস কেন অতু?

অতীন—নিশ্চয় বদ্রিনাথ যাবার ব্যবস্থা করছো?

কমল বিশ্বাস—হ্যাঁ।

অতীন—তার মানে মরবার ব্যবস্থা করছো?

হেসে ওঠেন কমলবাবু—তোরও কি তাই বিশ্বাস?

অতীন—নিশ্চয়। এই শরীরে বদ্রিনাথ গেলে যে তোমাদের আর ফিরতে হবে না।

কমল বিশ্বাস—নাই বা ফিরলাম। ফিরে আসবার দরকারই বা কি? আমাদের যে এদিকের কাজ ফুরিয়েছে অতু।

চমকে ওঠে অতীন। ফ্যালফ্যাল ক'রে কমল বিশ্বাসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কমল বিশ্বাসের কোটরগত চোখের চাহনিকে জীবনে এত ভয় কোন দিন পায়নি অতীন। আত্মহত্যার প্রতিজ্ঞাও এত সহজে হেসে হেসে বলতে পারে মানুষ?

সুধাময়ী বলেন—তোর দুঃখ করবার বা রাগ করবার কিছু নেই অতু।

অতীন—আমাকে শাস্তি দেবার জন্যই বোধহয় এই সব কাণ্ড করছো।

সুধাময়ী—ছিঃ, কি বলছিস রে বোকা ছেলে?

অতীন—তা না হলে এরকম কাণ্ড করছো কেন? আমি এলাম আর তোমরাও চললে?

কমল বিশ্বাস হাসেন—আমাদের যেতে হচ্ছে বলেই তুই এসে পড়েছিস অতু। যার থাকা উচিত সে থাকবে ; আর আমরা, যাদের আর থাকবার কোন মানে হয় না, তারা চলে যাবে, এই তো নিয়ম রে বাবা।

অতীন—না, তোমরা যেতে পারবে না।

কমল বিশ্বাস—ওকথা বলিস না, বলতে নেই অতু।

অতীন—কেন? কোন্ দুঃখে চলে যাবে তোমরা?

কমল বিশ্বাস—কোন্ সুখে থাকবো বলতে পারিস?

অতীনের মুখরতার আবেগ হঠাৎ একটা ধাক্কা খায় যেন। কুণ্ঠিত ভাবে বলে—পুরনো কথা ছেড়ে দাও। যা হবার হয়ে গিয়েছে। এখন ইচ্ছে করলেই সুখে থাকতে পার।

কমল বিশ্বাস—কেমন ক'রে?

অতীন—আমার চাকরির মাইনে এখন মন্দ নয়। আমি তোমাদের টাকা পাঠাবো।

তোমাদের কোন অসুবিধে হবে না।

কমল বিশ্বাসের চোখের চাহনিতে একটা করুণ কৌতুক ফুটে ওঠে।—কিন্তু টাকা পাঠাবি কেন অতু? আমরা তো কোন সুবিধা চাইছি না।

অতীন—তবে কি চাইছো?

কমল বিশ্বাস—কতবার বলবো রে বাবা। আর থাকতেই চাই না।

অতীন—কেন চাও না?

কমল বিশ্বাসের কোটরগত চোখে যেন পুরনো আগুনের ছায়া হঠাৎ কেঁপে ওঠে।—কি নিয়ে থাকবো?

কমল বিশ্বাসের রূঢ় প্রশ্নটা যেন হাতুড়ির শক্ত আঘাতের মত অতীনের বুকের উপর আছাড় দিয়ে পড়ে। রসিকপুরের ভাঙা-বাড়ির সেই ভয়ানক বুড়োর জীবনের এই শেষ প্রশ্নের উত্তর দেবার সাধ্যি নেই অতীনের। সত্যিই তো, কি নিয়ে থাকবে মানুষটা?

কিন্তু কি নিয়ে থাকতে চায় মানুষটা? সুধাময়ীর নিরুত্তর মুখেও যেন একটা প্রশ্ন চমকে উঠেছে। যেন বলতে চাইছেন সুধাময়ী, শুধু বাঁচবার জন্য বেঁচে থেকে লাভ কি? কারও জন্য, কিছুর জন্য বেঁচে থাকবার আর আশা আছে কি? দরকার হবে কি?

অতীন বলে—আমার ইচ্ছা এবার বাড়িতেই থাকি, যদিও অফিসটা অনেক দূর হয়ে যাবে. যাওয়া আসা করতে সময় লাগবে অনেক বেশি।

সুধাময়ী—বেশ তো। নিজের বাড়িতে থাকবি। আমরাও তো তাই চাই।

কমল বিশ্বাস—কিন্তু তাই বলে আমাদের যাওয়াটা বন্ধ করবার দরকার হয় না।

কিছুক্ষণ কি যেন ভাবে অতীন। তার পর সন্দিগ্ধ হয়ে তাকায়। হঠাৎ প্রশ্ন করে ফেলে—কেতকী থাকলে বোধহয় চলে যেতে চাইতে না?

কমল বিশ্বাস অদ্ভুতভাবে হাসেন—না, ঠিক তা নয়; কেতকীকে চলে যেতে দিতে আমাদের একটুও কষ্ট হয়নি।

কমল বিশ্বাসের হাসির সঙ্গে যেন একটা জ্বলন্ত বেদনাও হাসছে। অনেকক্ষণ একটা অবুঝ বিস্ময়ে চোখ ভার ক'রে তাকিয়ে থাকে অতীন। তারপর বোধ হয় এতক্ষণে বেশ স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারে বলেই কেঁপে ওঠে অতীনের বুকটা। আস্তে, আস্তে, যেন যন্ত্রণাময় একটা ভীরুতায় কাতর হয়ে অতীনের মুখে আর-একটা প্রশ্ন দুরুদুরু করে।—কেতকীর ছেলেটো থাকলে বোধহয় তোমরা চলে যেতে চাইতে না।

উত্তর দেন না কমল বিশ্বাস। জিরজিরে বুকের ভিতর থেকে তাঁর শেষ জীবনের অভিমানের ভাষা শুধু দু'টো জলের ফোঁটা হয়ে দু'চোখ থেকে একসঙ্গে টপ্ ক'রে ঝরে পড়ে।

সুধামায়ী—এসব কথা তুই না জিগ্যেস করলেই ভাল করতিস অতু।

স্তব্ধ হয়ে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে অতীন। এই ভাঙাবাড়ির জীর্ণ বুকের বেদনা যে অভিশাপের কাঁটা হয়ে অতীনেরই বুকের ভিতর বিঁধছে। কেতকীর ছেলেটা এলই যদি, তবু তাকে ধরে রাখা গেল না কেন? এ যে অতীনেরই জীবনের ভুল, অতীনেরই অপরাধ। কিন্তু...সে জন্য এই দু'টি মানুষ তাদের নিজের নিজের জীবনের উপর এত নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে কেন? বেঁচে থাকবার ইচ্ছাটাকেই মেরে ফেলেছে কেন? যা নিয়ে বেঁচে থাকবার শখ আছে মনে, তাই নিয়ে বেঁচে থাকবার আশা এখনই ছেড়ে দেবারই বা কি অর্থ হয়? এমনও হতে পারে তো...।

অতীনের মাথার জ্বালায় অতীনের মুখের ভাষাও যেন ভুল ক'রে সব লজ্জা ভুলে যায়। সুধাময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলেই ফেলে অতীন।—আমি যদি বলি, তোমাদের এতটা হতাশ হওয়া উচিত নয়? যদি বলি, যা নিয়ে থাকতে চাও, তা একদিন পেয়ে যাবে,

তবে?

সুধাময়ী—একদিন মানে কোন্ দিন? কবে?

সুধাময়ীর মুখের একটা সামান্য প্রশ্ন ; এবং খুবই আস্তে আস্তে ক্লান্তস্বরে কথাটা বলেছেন সুধাময়ী ; কিন্তু এমন সামান্য ও ক্লান্তস্বরে বলা প্রশ্নটাও যেন ঠাট্টার বজ্রনাদ হয়ে অতীনের কানের কাছে বেজে ওঠে। এই প্রশ্নের উত্তর দেবার সাহস অতীনের বুকের নিঃশ্বাসের মধ্যেও আজ আর নেই। অতীন যে আজ তার এই শরীরটাকেই বিশ্বাস করে না। কাজরীর ধিক্কার যে নিতান্ত মিথ্যা ধিক্কার নয়। অতীন আজ শুধু একটা পুরুষের চেহারা মাত্র, পুরুষ নয়। অতীন বিশ্বাসের রক্তের অহংকার মাটি হয়ে গিয়েছে। শাড়ির আঁচলের ছায়া চোখে পড়লে বুক কাঁপে। নারীর মুখের হাসির শব্দ শুনলে কানের দু'পাশে ঠাণ্ডা ঘামের ধারা সিরসির করে। অসম্ভব, অতীন বিশ্বাসের জীবনে নতুন ক'রে বাসরঘরের উৎসব জাগিয়ে তোলা আর সম্ভব নয়। রসিকপুরের ভাঙা রাজবাড়ির বুড়ো-বুড়ী আবার ভয়ংকর এক চক্রান্ত ক'রে অতীনের জীবনের কাছ থেকে যে প্রতিশ্রুতি আদায় করতে চায়, সে প্রতিশ্রুতি দেবার শক্তি হারিয়েছে অতীন বিশ্বাস।

সুধাময়ী বলেন—মনে হচ্ছে, বিয়ে করতে চাইছিস।

অতীন—না।

সুধাময়ী—কেন?

অতীন—অসম্ভব।

কমল বিশ্বাস হেসে ওঠেন—অতুকে আর বিরক্ত করো না সুধা। যার যা সাধ্যি নয়, তার কাছে তাই দাবি করা উচিত নয়।

কি ভেবে কথাটা বললেন কমল বিশ্বাস, এবং কেনই বা বলতে গিয়ে হেসে ফেললেন? রসিকপুরের ভাঙাবাড়ির ইঁট-পাথরের জরাও কি অতীন বিশ্বাসকে ধিক্কার দিতে গিয়ে হেসে ফেলেছে? কেতকীর সেই আর্তনাদের জ্বালা যদি এখনও এই বাড়ির বাতাসের বুকের ভিতরে কোথাও নীরব হয়ে লুকিয়ে থেকে থাকে, তবে সেই জ্বালাও বোধহয় প্রতিশোধের তৃপ্তিতে নীরবে হেসে উঠেছে।

আর-এক মুহূর্ত এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না ; দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না অতীন। শরীরটা যেন নিজেরই অসারতার আর ভীরুতার লজ্জায় বার বার টলে উঠেছে।

অতীন বলে—আমি যাই।

সুধাময়ী—কোথায়?

অতীন—যাই, অফিসে কতগুলি জরুরী কাজ আছে।

সুধাময়ী—এখনই যাবি?

অতীন—হ্যাঁ। সময়মত পৌঁছতে হলে এখনই রওনা হতে হয়।

সুধাময়ী—এবারে কি এখান থেকেই...।

অতীন—না, এখানে থেকে অফিস করতে এখন অনেক অসুবিধে আছে।

সুধাময়ী—তা হলে...।

কমল বিশ্বাস তেমনই শান্তভাবে আর হেসে হেসে সুধাময়ীকেই অনুরোধ করেন—তুমি আবার কোন নতুন কথা বলে অতুকে অসুবিধায় ফেলবে না সুধা। যাচ্ছে যাক, যেতে দাও।

সুধাময়ী—আমরা চলে যাবার আগে অন্তত একবার যদি আসিস, তবে...।

কমল বিশ্বাস—আঃ, তুমি কেন বাজে কথা বলে অতুকে বিরক্ত করছো সুধা?

জোর ক'রে চোখ তুলে, আর মনের আশাটাকে যেন শেষ সাহস দিয়ে একটু সজীব ক'রে নিয়ে কমলবাবুর মুখের দিকে তাকায় অতীন।—তোমরা কি সত্যিই চলে যাবে?

কমলবাবু হাসেন—নিশ্চয়।

অতীন—যেও না।

কমলবাবু—না যেয়ে কি করবো?

অতীন—কি আর করবে? যতদিন বেঁচে আছ ততদিন এখানেই থাকবে।

সেই ভয়ানক জিজ্ঞাসা আবার কমল বিশ্বাসের কোটরগত চোখের হাসিতে ঝিলিক দিয়ে চমকে ওঠে—কি নিয়ে থাকবো?

মাথা হেঁট করে অতীন। আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে যেয়ে বারান্দার প্রান্তে এসে দাঁড়ায়। ভাঙা সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে একবার থামে। তারপর আসশেওড়ার বাসি ফুল মাড়িয়ে বাগানের পথ ধরে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যায়।

দারোয়ান বলে—আপনার চেহারা দেখে মালুম হচ্ছে আপনার তবিয়ৎ আউরভি খারাপ হয়েছে। ছুটি নিয়েও অফিসে আসলেন কেন?

মালিক বলেন—বহুত ধন্যবাদ অতীনবাবু। আমার বড়ো চিন্তা হয়েছিল, আজকের দিনে আপনি গরহাজির হলে এতো কাজ সামলাবে কে? দেখছেন কাস্টমারের র.শ্। আজ সকালবেলাতেই টেলিফোনে ত্রিশ-চল্লিশটা এনকোয়ারী এসেছে। নেপালবাবু একা সামাল দিতে পারছেন না।

হ্যাঁ ; পার্ক স্ট্রীটের এই অটোমোবিল শো-রুমে এত অনুসন্ধানীর ভিড় কোনদিন হয়নি। কালকেই জাহাজ থেকে খালাস করবার কথা ছিল জার্মানীর যে চালান, নিউ মডেলের যে দশটা নানা রং-এর নমুনা গাড়ি, সেগুলি বোধ হয় কালই যথাসময়ে খালাস করা হয়েছে। এবং নিয়ে এসে শো-রুমের ভিতরে ঠাঁই ক'রেও দেওয়া হয়েছে। তাই এত এনকোয়ারী আর দর্শকের ভিড়। নেপালবাবু সত্যিই তাল রাখতে পারছেন না। টেলিফোনের এনকোয়ারীকে শান্ত করতে এলে ওদিকে দর্শকের এনকোয়ারী বিরক্ত হয়ে ওঠে।

নেপালবাবু রাগ ক'রে বলেন—আপনি দয়া ক'রে ঐ মহামানবের সাগরতীরে গিয়ে একটু দাঁড়ান আর ভিড়টাকে তোয়াজ করুন তো মশাই। ও কর্ম আমার হাড়ে সম্ভব নয়। এত আর্য অনার্য দ্রাবিড় ও চীনের সমাগম ; উঃ, শুধু কয়েকটা নিউ মডেল দেখবার জন্য!

শো-রুমের ভিতরে এগিয়ে যায় অতীন। ভিড়টাকে একটা আন্তর্জাতিক সমাবেশের মতই দেখায়। যেমন হরেক রকম বেশভূষার আর চেহারার বৈচিত্র্য তেমনই হরেক রকম ভাষার মুখরতা। পুরুষ আছেন, মহিলা আছেন, দম্পতি আছেন। কেউ কেউ একেবারে সপরিবারে এসেছেন। কেউ দাম জিজ্ঞাসা করেন। কেউ কিস্তি খরিদের নিয়ম জানতে চান। কেউ প্রশ্ন করেন, গ্যালনে কত মাইল যায়?

এক তরুণী চেঁচিয়ে ওঠেন, আঃ, লাভলি! কী সুন্দর সীট আর কুশন!

গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে অতীন হাসে—আপনি কাইণ্ডলি একবার বসে দেখুন। তা হলে আরও ভাল ক'রে বুঝতে পারবেন যে...।

তরুণী খিল খিল ক'রে হেসে নিউ মডেলের সীটের উপর বসেন এবং বসে বসে শরীরটাকে নাচিয়ে স্প্রিং-এর দোলানি টেস্ট করেন।

অতীন বলে—এক একটি সীটের কুশন ত্রিশটা স্প্রিং-এর সেট-এর উপর বসানো।

—হ্যালো সেলস্‌ম্যান। একজন কালো সাহেব ডাক দেন।

এগিয়ে গিয়েই অতীন বলে—দেখুন স্যার, কি অদ্ভুত গীয়ার সিস্টেম আর কী সুন্দর ফুটব্রেক। একটুও জার্ক নেই। ভেরি স্মুথ পিক-আপ, গুড ট্রাকশন, এফিসিয়েণ্ট ব্রেকিং, আর খুব চমৎকার শক অ্যাবজর্পশন।

—ইঞ্জিনের শব্দ?

—ও, নো নয়েস, ইট ইজ সিমপ্লি মিউজিক। আর দেখুন, কী সেনসিটিভ সেল্‌ফ্-স্টার্টার!

গাড়ির ভিতরে ঢুকে সেল্‌ফ্‌-স্টার্টার টিপে ইঞ্জিনটির গুঞ্জন শোনায় অতীন।

এক বাঙালী ভদ্রলোক একটা বাচ্চা ছেলের হাত ধরে এগিয়ে এসে বলেন—পেট্রল কম খায়, আর ইঞ্জিনের জোর ভাল, এরকম একটা নিউ মডেল যদি থাকে...।

অতীন—নিশ্চয় আছে।

কয়েক পা এগিয়ে যেয়েই অতীন বলে—আপনি যা খুঁজছেন, এই ট্যুরারের কাছে তাই পাবেন। গ্যালনে পঁচিশ মাইল যাবে। ফার্স্ট গীয়ারে বড় বড় চড়াই এক দমে পার হয়ে যাবে। তা ছাড়া, বডির ফিটিংসগুলি দেখুন। বেস্ট ওক উড, স্টেনলেস স্টীল, আর আনব্রেকবল গ্লাস।

ভদ্রলোক—হর্নের আওয়াজটা কর্কশ নয়তো?

—টেস্ট ক'রে দেখুন তা হ'লে? বলতে বলতে বাচ্চা ছেলেটাকেই কোলে তুলে নিয়ে স্টিয়ারিং-এর কাছে বসে অতীন ; বাচ্চাটারই হাত দিয়ে একটা প্লাগ চেপে ধরে। মৃদু ও মিষ্টি-গম্ভীর একটা শব্দ বেজে ওঠে। ভদ্রলোক হেসে ফেলেন।—না, আওয়াজটা ভালই।

অতীন আশান্বিত হয়ে বলে—এটা আপনার পছন্দ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

ভদ্রলোক—দামটা জানবার পর পছন্দ হবে।

অতীন—ক্যাটালগ প্রাইজ ষোল হাজার। যদি কিস্তিতে নিতে চান তবে...।

ভদ্রলোক—না, নগদ কিনতে চাই।

অতীন খুশি হয়ে বলে—তা হ'লে তো আর কথাই নেই ; শতকরা দশ টাকা ডিসকাউন্ট অর্থাৎ একহাজার ছ'শো টাকা বাদ যাবে।

ভদ্রলোক—তা হ'লে নিয়ে ফেলি, কি বলুন?

অতীন—নিশ্চয়! আমাকে যদি বিশ্বাস করেন, তবে একটা কথা বলতে পারি।

ভদ্রলোক—কি?

অতীন—আপনি সবচেয়ে খাঁটি জিনিসটি পছন্দ ক'রে ফেলেছেন। এই মডেলের উপরের বাহার কম বটে, কিন্তু ভিতরটা চমৎকার।

ভদ্রলোক খুশি হয়ে বলেন—তা হ'লে কি করতে হবে বলুন?

অতীন—এক হাজার টাকার চেক দিয়ে বুক ক'রে যান। বাকি পেমেণ্ট অন ডেলিভারি। গাড়িটাকে চেক ক'রে সাতদিনের মধ্যেই আপনাকে ডেলিভারি দেওয়া হবে।

ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে অফিস ঘরের ভিতরে ঢোকে অতীন। তারপর চেয়ারের উপর বসতে গিয়ে এতক্ষণ পরে যেন হুঁশ হয় অতীনের বাচ্চাটাকে তখন পর্যন্ত দুহাতে জড়িয়ে বুকের কাছে তুলে রেখেছে অতীন।

ভদ্রলোক বলেন—ওকে ছেড়ে দিন এবার ; আপনার কাজের অসুবিধা হবে।

অতীন বলে—কোন অসুবিধা হবে না।

বাচ্চাটাকে কোলের উপর বসিয়ে রেখে টেবিলের উপরের রেজিস্টার ধরে টান দেয় অতীন। ভদ্রলোকও চেক লিখতে শুরু ক'রে দেন।

কলম হাতে নিয়ে ভদ্রলোকের মুখের দিকে অতীন জিজ্ঞাসুভাবে তাকাতেই ভদ্রলোক বলেন—হ্যাঁ, লিখুন।...নির্মলকান্তি রায়, অডিটর ; রেলওয়ে অ্যাকাউণ্ট অফিস হাওড়া।

কলমের উপরে অতীনের মাথাটা হঠাৎ অবশ হয়ে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু সামলে নিয়েই মুখ তুলে নির্মলকান্তি রায়ের মুখের দিকে একবার তাকায়। তারপরেই কলম নামিয়ে রেখে পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে কপালটাকে জোরে ঘষতে থাকে।

ভদ্রলোক বলেন—ওকে আমার কাছে দিন, কিংবা ঐ চেয়ারে বসিয়ে দিন কিংবা ছেড়ে দিন, একটু ছুটোছুটি করুক।

অতীন বলে—থাকুক না কেন, আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

বলতে বলতে অতীনের সারা চোখে-মুখে যেন হঠাৎ বিদ্যুতের আভার মত অদ্ভুত এক মায়া-জ্বালার হাসি চমকে ওঠে! বাচ্চাটার মুখের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে অতীন—বাঃ, কেমন চুপটি ক'রে বসে আছে। বড় শান্ত মনে হচ্ছে। বাঃ!

হঠাৎ ; যেন একটা আদুরে লোভের চমক লেগে লুব্ধ হয়ে ছটফট ক'রে ওঠে অতীন। বাচ্চাটার মাথা বুকে চেপে ধরে। চোখ দু'টোও যেন অগাধ তৃপ্তির আবেশে অলস হয়ে তারপর একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এবং চোখের পাতা ভিজে যাবার ভয়ে আবার চমকে চোখ মেলে হেসে ওঠে অতীন।—আপনার ছেলে?

ভদ্রলোক—হ্যাঁ...আমারই ছেলে।

—বাঃ, বেশ ছেলে। বলতে বলতে ভদ্রলোকের কোলে বাচ্চাটাকে তুলে দিয়ে আবার কলম হাতে তুলে নেয় অতীন।

লেখা শেষ হয়। রসিদ লেখাও শেষ হয়। চেকটা হাতে নিয়ে ভদ্রলোককে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আবার ব্যস্তভাবে চলে যায় অতীন। শো-রুমের ভিতর গিয়ে মানুষের ভিড়ের যত প্রশ্ন হাসি কৌতূহল আর মুখরতার সঙ্গে ছুটোছুটি করতে থাকে।

ভাগবত চলে গিয়েছে অনেকক্ষণ। ক্যামাক স্ট্রীটের সন্ধ্যার আলো অঘ্রানের কুয়াশায় বেশ ঝাপসা হয়ে উঠেছে। আর সিন্‌হা সাহেবের গ্রেটডেন বোধহয় এই কুয়াশার উপরে রাগ ক'রে চিৎকার ক'রে চলেছে।

ঘরের ভিতরের চেয়ারের উপর অতীনও মাথা তুলে কাত ক'রে আর চোখ বন্ধ ক'রে বসে থেকে প্রায় ঘুমিয়ে পড়ে ছিল। হ্যাঁ, আমারই ছেলে ; বাঃ ; কি অদ্ভুত কি চমৎকার ; কি সুন্দর একটা মিষ্টি ঠাট্টার কথা বলেছে নির্মলকান্তি রায়। তবু এই বাচ্চাটারই মাথা বুকের উপর চেপে ধরতে অতীনের নিঃশ্বাসের স্বাদ যেন হঠাৎ বদলে গেল। অন্তত এক মিনিটের জন্য অতীনের এই ভীরু শরীরের স্নায়ু আর শিরা মুগ্ধ হয়ে বুঝে ফেলেছে ; এই ছোঁয়াটুকু পাওয়ার জন্যই তো পুরুষ হওয়া। নইলে রক্তে আর জলে যে কোন প্রভেদ থাকে না। নইলে...।

অতীনের ঘুমন্ত চোখের পাতা যখন ভিজে ভারি হয়ে যায়, তখন ধড়ফড় ক'রে নড়ে বসে অতীন। চোখ মোছে আর চোখ মেলে তাকায়। আর, সেই মুহূর্তে আতঙ্কিতের মত চমকে ওঠে।

এবং পর মুহূর্তে সেই আতঙ্ক আর সেই চমকের কঠোরতা যেন নতুন বিস্ময়ের ছোঁয়ায় ভিজে গিয়ে নরম হয়ে যায়।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে বিজয়া। জলে ভরে গিয়ে ছলছল করছে বিজয়ার চোখ। হাত জোড় করেছে বিজয়া।—অতীনবাবু, ক্ষমা করুন।

—ক্ষমা কিসের? আমার কাছে আপনার ক্ষমা চাইবার কি আছে?

দুঃসহ অস্বস্তিতে যেন ছটফট ক'রে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অতীন ; আর সন্দেহও করে, দৃশ্যটা স্বপ্নের ঘোরে দেখা একটা দৃশ্য।

বিজয়া—আপনি জানেন, কেন ক্ষমা চাইছি।

অতীন বিব্রতভাবে বলে—জানি, বুঝতেও পারছি ; কিন্তু বুঝতে পারছি না, আপনি এত দুঃখিত হলেন কেন?

বিজয়া—শুধু দুঃখিত হইনি অতীনবাবু ; নিজেকে কেমন যেন পাগল-পাগল মনে হচ্ছে।

অতীন—যাকগে ; ছেড়ে দিন ; ভুলে যান ওসব কথা।

বিজয়া—ভুলতে পারা যায় না যে!

অতীন হাসে—ভুলতে হবে, নইলে যে আরও পাগল-পাগল হয়ে যাবেন।

বিজয়া—তার চেয়ে মরে যাওয়াই কি ভাল নয়?

এইবার ভয় পায় অতীন। না না, আপনি আপনার একটা অপরাধের, তার মানে একটা ভুলের দুঃখকে এরকম ভয়ানক ক'রে তুলবেন না। ওতে কোন লাভ নেই। এবার থেকে ভবিষ্যতে...।

বিজয়া করুণভাবে হাসে—আপনি আদালতের মত প্রথম অপরাধের আসামীকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান ক'রে দিচ্ছেন অতীনবাবু! কিন্তু মনে মনে ক্ষমা করতে বোধ হয় পারলেন না।

অতীন—কি ভাবে ও কি ক'রে ক্ষমা করতে হয় জানি না। শুধু বলতে পারি...।

বিজয়া—কাজরীকে তো বেশ ক্ষমা করেছেন।

চেঁচিয়ে ওঠে অতীন—না। আপনি বাজে তর্ক করবেন না। আপনাকে ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু কাজরীকে ক্ষমা করতে পারবো না।

ভীত ও আড়ষ্ট চোখে তাকিয়ে বিজয়া ভয়ে ভয়ে আবেদন করে—কাজরী আপনার স্ত্রী, তাকে ক্ষমা করাই তো উচিত অতীনবাবু!

অতীন—না, আপনার বান্ধবী আমার স্ত্রী নয়।

বলতে বলতে টেবিলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আজকেরই একটা খবরের কাগজ খিমচে ধরে বিজয়ার হাতের উপর ছুঁড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে অতীন।—আজকের আদালতের রিপোর্ট করে দেখুন দয়া করে; তবেই বুঝবেন, আপনার বান্ধবী আপনার চেয়েও কত বেশি ভয়ানক।

ভয় করে আর হাতও কাঁপে বিজয়ার ; তবু যেন জোর ক'রে চোখ বুলিয়ে খবরের কাগজে আদালতের রিপোর্ট খোঁজে ; এবং তারপরই থরথর করে কেঁপে ওঠে বিজয়ার চোখ। খবরের কাগজটা বিজয়ার শিথিল হাতের ছোঁয়া থেকে খসে ঝুপ ক'রে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে মুখ ঢেকে বিজয়াও ঝুপ ক'রে মেঝের উপর বসে পড়ে। বিজয়ার সাদা সিল্কের শাড়ির আঁচলটাও যেন একটা নির্মম বিস্ময়ের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে একেবারে মাথা লুটিয়ে দিয়ে মেঝের উপর ছড়িয়ে পড়ে।

বিজয়াকে যে সত্যিই পাগল-পাগল মনে হয়। কিসের জন্য কার জন্য এরকম ক'রে মেঝেতে লুটিয়ে বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলো বিজয়া? বিজয়ার কোন্ সর্বনাশ হলো? বিজয়া হঠাৎ এসে যেন একটা থিয়েটারি কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছে। অতীনের মনের অস্বস্তিও এইবার যেন বিরক্ত হয়ে ছটফট করে। অতীন বলে—আপনি এসব কি কাণ্ড আরম্ভ করলেন?

ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় বিজয়া। রুমাল তুলে একটা ঘষা দিয়ে চোখ-মুখ মুছে ফেলে, সিল্কের শিথিল আঁচলটাকে চটপটে হাতের এক টানে টেনে আর কোমরের চারদিকে শক্ত ক'রে একপাক জড়িয়ে নিয়ে গুঁজে দেয়। মনে হয়, বিজয়ার চেহারাটা যেন হঠাৎ একটা স্বপ্নের তাড়া খেয়ে এই পাগল-পাগল অবসাদের ঘুম থেকে জেগে উঠেছে।

শুকনো চোখ, খুবই শান্ত গলার স্বর, শুধু বুকটা যেন একটা তপ্ত নিঃশ্বাসের দৌরাত্ম্যে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কাঁপে, বিজয়া সোজা অতীনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—কি ভেবেছে কাজরী?

অতীন—কি বললেন?

বিজয়া—এরকম একটা ভয়ানক মিথ্যে কথা বলে সরে যাবে কাজরী?

অতীন—মিথ্যে কথা নয়।

বিজয়ার চোখে যেন একটা বিদ্যুতের জ্বালা ঝিক ক'রে ওঠে।—আপনি মিছিমিছি মিথ্যে কথা বলবেন না।

অতীন—তার মানে?

বিজয়া—আমাকে আপনি মিথ্যে কথা বলে কি বোঝাতে চাইছেন? ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমিও যে সাক্ষী! আপনি পুরুষ না হলে কাজরী আমার কাছে যেত না, আর আমাকেও পাগল হয়ে, খুনি হয়ে...ক্ষমা করুন অতীনবাবু...বিশ্বাস করুন, কাজরী আমাকে আগে বলেনি যে আপনার মত ছিল না, নইলে, কাজরী আমাকে মেরে ফেললেও আপনার আশা আমি নষ্ট করতাম না অতীনবাবু।

হয় ক্ষমা চাইবার জন্য, নয় শাস্তি নেবার জন্য বিজয়ার চেহারাটা আবার পাগল-পাগল হয়ে অতীনের কাছে এগিয়ে যায় ; মাথাটা অলসভাবে ঝুঁকে পড়ে।

—ক্ষমা করেছি, বিশ্বাস করুন। আপনার উপর রাগ করবার কোন অর্থ হয় না। বলতে গিয়ে অতীনের গম্ভীর গলার স্বরও যেন অদ্ভুত এক বেদনার আবেশে কোমল হয়ে যায়। ক্ষমা করতে গিয়ে যেন সান্ত্বনা দিয়ে ফেলেছে অতীন।

মুখ তুলে যখন আবার অতীনের মুখের দিকে তাকায় বিজয়া, তখন অতীন আশ্চর্য হয়ে হেসে ফেলে—আপনি সত্যি একটা কাণ্ড করলেন!

বিজয়ার পাগল-পাগল চেহারাটা যেন এক মুহূর্তের মধ্যে মরে গিয়ে আর ভুতুড়ে ছায়া হয়ে কোথায় পালিয়ে গিয়েছে। বিজয়ার সারা শরীরটাই দুর্বার খুশির আবেগে খিল-খিল ক'রে হেসে ওঠবার জন্য ছটফট করছে।

—আর যতই বকুনি দিন আপনি, আর একটুও ভয় নেই। বলতে বলতে ঘরের ভিতরে এদিকে-ওদিকে ছটফটে প্রজাপতির মত ঘুরে-ফিরে বেড়াতে থাকে বিজয়া। হাতঘড়ির দিকে একবার তাকায়। তার পরেই চেঁচিয়ে হেসে ওঠে।...আমার আর-একটা মতলব আছে অতীনবাবু।

অতীন—বলুন!

বিজয়া—আপনাকে এখনি আমার সঙ্গে একবার বাইরে নিয়ে যাব।

অতীন—কোথায়?

বিজয়া—আমাদের বাড়িতে।

অতীন—কেন?

বিজয়া—চা খাওয়াতে, আর বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে।

উত্তর না দিয়ে অপলক চোখের এক নতুন বিস্ময়ের অস্বস্তি চেপে রাখতে চেষ্টা ক'রে বিজয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অতীন।

বিজয়া—আমাকে সন্দেহ ক'রে আপনার কোন লাভ হবে না অতীনবাবু। হ্যাঁ, যদি বলেন, এই ঘরের ভিতরে একটা চেয়ারের উপর মাথা কাত ক'রে আর ভেজা চোখ নিয়ে বসে এখনও আপনার ভালো লাগে, তবে...।

অতীন—কি বললেন?

বিজয়া—যদি এই ঘরের জন্য আপনার মনে কোন মায়া থেকে থাকে...।

চেঁচিয়ে ওঠে অতীন—তার মানে?

বিজয়া—যদি কাজরী আসবে বলে আশা ক'রে অপেক্ষায় থাকতে...।

ভ্রূকুটি ক'রে তাকায় অতীন—আপনি অনর্থক কতগুলি অবান্তর কথা বলে যাচ্ছেন।

বিজয়া—মামলাতে নিজেকে ডিফেণ্ড করবার ইচ্ছা যদি থেকে থাকে...।

—চুপ করুন! চেঁচিয়ে ওঠে অতীন।

চুপ করে বিজয়া। অতীন বলে—আজই উকীলকে দিয়ে আদালতে জানিয়ে দেবার ব্যবস্থা ক'রে এসেছি ; আমি নিজেকে ডিফেণ্ড করবো না।

বিজয়া বলে—তা হ'লে চলুন।

বিজয়ার দু'চোখের চাহনিতে অদ্ভুত এক আবেদন নিবিড় হয়ে ফুটে উঠেছে। গলার স্বরের ব্যাকুলতা আরও নিবিড়। আর, সাজ-পোশাকের এত ধবধবে সাদাও যেন চূর্ণ হয়ে একেবারে সাতরঙা হয়ে ঝলমল করছে।

অতীন বলে—চলুন।

প্রস্তুত ছিল না অতীন, এবং কল্পনাও করতে পারেনি যে, আজই এই রাতে এণ্টালির নিভৃতে লতা-পাতায় ঢাকা একটা শান্ত বাড়ির ঘরে চা খেতে এসে এমন-একটা বিস্ময়ের সম্মুখে পড়তে হবে। এই বিস্ময় সহ্য করতে গিয়ে একটুও খুশি হয়নি, বরং ভয় পেয়েছে অতীন। বিস্ময়টা যেন অতীনের বুকের ভিতরের একটা ভীরুতাকে কঠোর বিদ্রূপের আঘাত হেনে শিউরে দিয়েছে।

চা-খাবার সামনে রেখে দিয়ে বিজয়া সেই যে অন্য ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে, আর এই ঘরে আসেনি। চা-খাওয়া শেষ হবার পর অনেক গল্প করলেন বিজয়ার বাবা নবগোপালবাবু। এবং উঠে যাবার আগে যে কথা বললেন নবগোপালবাবু, সে-কথা শোনবার পর বুঝতে পেরেছে অতীন, আর একমুহূর্তও এখানে না থেকে এবং কাউকে কোন কথা না বলে চুপচাপ ছুটে পালিয়ে যাওয়াই উচিত।

নবগোপালবাবু বলেন--আমার জীবনে আর কোন দুঃখ ছিল না অতীন, শুধু ঐ এক দুঃখ। মেয়েটা বিয়ে করবে না বলে অনর্থক একটা প্রতিজ্ঞা ক'রে বসেছিল।...যাক্, আজ যখন আমার কাছে এসে নিজের মুখে স্পষ্ট ক'রে বলেই ফেলেছে বিজয়া, তখন আমার...দুঃখ তো দূর হয়ে গেছেই, শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছি অতীন। বলতে বাধা নেই, তোমাকে দেখেও বড় খুশি হয়েছি অতীন। আমার কোন আপত্তি নেই। সুখী হও তোমরা।...আচ্ছা আমি এখন উঠি।

নবগোপালবাবু ঘরের ভিতর চলে গেলেন ; এবং হাতঘড়ির দিতে তাকিয়ে অতীন ছটফট ক'রে উঠতেই ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ায় বিজয়া, আর যেন একটা লজ্জাহীন দুঃসাহসের উৎসাহে একেবারে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে এসে অতীনের পাশে একই সোফার উপর বসে।

অতীন বলে—আপনি ভুল ক'রে আপনার বাবার কাছে ভয়ানক একটা অন্যায় কথা বলে ফেলেছেন।

বিজয়া—অন্যায় কথা হলেও সত্যি কথা বলেছি অতীনবাবু।

অতীন—তার মানে?

বিজয়া—আমার মন যা চায়, তাই বলেছি।

অতীন—কি চায় আপনার মন?

বিজয়া—বাবা আপনাকে যা বললেন।

অতীন—আমাকে বিয়ে করতে চান আপনি?

বিজয়া—হ্যাঁ।

অতীন—হঠাৎ এরকম মনে হলো কেন আপনার?

বিজয়া—হঠাৎ আপনাকে ভালবেসেছি বলে।

অতীন—মিথ্যে কথা।

বিজয়া—একটুও মিথ্যে নয়।

অতীনের চোখের দৃষ্টি হঠাৎ কুৎসিত হয়ে ওঠে—সব মিথ্যে ; সব ঠাট্টা।

বিজয়া—এ সন্দেহ কেন করছেন? আমার কথাগুলি বড় স্পষ্ট আর বড় নির্লজ্জ বলে?

অতীন—আপনি ভালবাসবেন কেমন ক'রে। আপনার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়, সেটা সম্ভব হবে কি ক'রে?

বিজয়া শান্ত ও অবিচল স্বরে বলে—এসব কথা কেন বলছেন অতীনবাবু?

অতীন—আমি জানি, আপনি পুরুষের ছায়া ছুঁতে ঘেন্না করেন। আপনি একটা বাচ্চা ছেলেকে কোলে তুলে নিতেও ঘেন্না করেন। আপনি দেবী হতে পারেন, মানবী নন। আপনি নিজেকে মেয়েমানুষ বলেই মনে করেন না। ভালবাসতে জানলে অনেকদিন আগেই বিয়ে করতেন।

বিজয়া—আপনি ঠিকই বলেছেন অতীনবাবু। বিজয়া ডাক্তারের নামে যে-গল্প শুনেছেন, সে-গল্প একটুও মিথ্যে নয়। কিন্তু...।

অতীন—কি?

বিজয়া—সে গল্প আজ আর একটুও সত্য নয়।

অতীন—কেন?

বিজয়া—এতদিন এক পুরুষমানুষের আশা নিজের হাতে নষ্ট ক'রে দেবার পর পাগল-পাগল হয়ে গেলাম, আর নিজের কাছেই ধরা পড়ে গেলাম।

অতীন—কি বললেন?

বিজয়া—মনে-প্রাণে মেয়েমানুষ হতে যেতে ইচ্ছে হলো অতীনবাবু।

অতীন বিরক্ত হয়ে বলে—আপনি ডাক্তার, আপনি ফিজিওলজির রোমান্স বোঝেন। আমাকে বৃথা ওসব বোঝাবার চেষ্টা করবেন না।

বিজয়ার দু'চোখে যেন দুর্মর এক জেদের জ্বালা ঝকঝক করে—আপনাকে না বুঝিয়ে যে আমার উপায় নেই।

অতীন—কি বুঝবো?

ডাক্তার বিজয়ার দু'চোখের জেদের জ্বালা হঠাৎ গলে গিয়ে জল হয়ে যায়, আর ঝরঝর ক'রে ঝরে পড়ে।—আপনার ক্ষতি মিটিয়ে দিতে চাই।

চমকে ওঠে অতীনের বিস্ময়—কি বললেন?

বিজয়া—সত্যিই কি বুঝতে পারছেন না?

অতীন—না।

বিজয়া—আপনার আশার জিনিস আপনাকে পাইয়ে দিয়ে শান্তি পেতে চাই। জানি না, আমার এই অদ্ভুত জেদকে ভালবাসা বলে মেনে নেয় কিনা আপনাদের মনের বিজ্ঞান ; কিন্তু আমি বিশ্বাস করি...

অতীন—কি?

বিজয়া—আমি আপনাকে ভালবেসেছি। জানি না, পৃথিবীতে এভাবে কেউ কাউকে ভালবেসেছে কিনা।

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে অতীন। তারপরেই আস্তে আস্তে মাথা হেঁট করে। অতীনের হৃৎপিণ্ডটা যেন একটা যন্ত্রণার সঙ্গে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে আসছে। অতীন বিশ্বাসের শরীরের ভীরু রক্তমাংস যেন লজ্জার জ্বালায় পুড়ে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাচ্ছে। ভুল করেছে বিজয়া, ভয়ানক ভুল ; নিতান্ত দু'চোখের একটা মায়ার আবেশে মুগ্ধ হয়ে অতীন বিশ্বাস নামে পুরুষের একটা ছবিকে সত্যিই জ্যান্ত পুরুষ বলে মনে ক'রে ফেলেছে। অতীনের জীবনের অভিশাপের খবর রাখে না বিজয়া, তাই অনর্থক পাগল-পাগল হয়ে ভালবেসে...।

চেঁচিয়ে ওঠে অতীন—অসম্ভব! আমাকে মাপ করবে বিজয়া!

বিজয়ার বেদনাহত মুখটা আবার যেন পাগল-পাগল হয়ে ওঠে।—সত্যিই কি আমাকে একটুও বিশ্বাস করলে না অতীন?

অতীন—তোমাকেই বিশ্বাস করছি বিজয়া। নিজেকে বিশ্বাস করছি না, তাই মাপ চাইছি।

বিজয়া—বুঝলাম না অতীন।

পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে চোখ দুটো ঘসে নিয়ে অতীন বলে—তুমি আমাকে

ভালবেসেছ, কেন ভালবেসেছ, সবই বুঝেছি আর বিশ্বাস করেছি বিজয়া। তোমাকে ভালবাসতে ইচ্ছা করে, একথাও জোর ক'রে বলতে পারি। কিন্তু...তবু অসম্ভব বিজ্রয়া। বিয়ে হতে পারে না!

বিজয়া—কেন?

অতীনের সুন্দর মুখের আভা এক মুহূর্তে নিভে গিয়ে যেন কালি হয়ে যায়।—কাজরী আমার নামে আদালতে যে অভিযোগ এনেছে, সেটা কি তুমি ভুলেই গেলে?

বিজয়া—মিথ্যে অভিযোগ। একটা অপবাদ। একটা ছুতো।

অতীন—না। মিথ্যে নয়।

বিজয়া—নিশ্চয় মিথ্যে। একশো বার মিথ্যে। একেবারে নিরেট মিথ্যে।

যেন হঠাৎ একটা পাগল-পাগল ঝড়ের ঝাপটা লেগে বিজয়ার শরীরটা অতীনের বুকের উপর এসে লুটিয়ে পড়ে। ফুঁপিয়ে ওঠে বিজয়ার সিল্কের শাড়ির সাদা। কিন্তু অতীন বিশ্বাসের শরীরটা তবু যেন সেই ভীরুতায় আড়ষ্ট হয়ে আর নিঃস্পন্দ হয়ে থাকে। কথা বলতে গিয়ে অতীনের গলার স্বর কাতর হয়ে কেঁপে ওঠে—ছিঃ বিজয়া! তুমি কেন অনর্থক...কিসের আশায়...।

বিজয়া—তোমার ছেলেকে ভালবেসে বাঁচিয়ে রাখবো, এই আশায়...। দু'হাতে শক্ত ক'রে অতীনের গলা জড়িয়ে ধরে অতীনের মুখের উপর মুখ নামিয়ে দেয় বিজয়া।

হঠাৎ ঢেউ তুলে একটা উত্তাপময় মুগ্ধতার জোয়ার ছুটে এসে অতীন বিশ্বাসের হৃৎপিণ্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কি আশ্চর্য, অতীনের ভীরু বুকের হিমাক্ত গর্ব যেন তরল আগুনের মত উথলে উঠছে। বিজয়া নামে এই নারীর প্রাণটাকে বুকের উপর বরণ ক'রে নেবার জন্য অতীনের হাত দুটো মত্ত হয়ে ওঠে।

সারা ঘর যেন কিছুক্ষণের একটা মূর্ছাময় আবেশে নীরব হয়ে থাকে।

অতীনের কানের কাছে নিঃশ্বাসের বাতাস ভাসিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে কথা বলে বিজয়া —আর মিথ্যে কথা বলবার সাধ্যি নেই তোমার।

অতীন—না, সাধ্যি নেই বিজয়া।

পৌষ গেল, মাঘও যে যায় যায়। চন্দননগরের গঙ্গার বুকে আর কাদাটে জলের ঢেউ দোলে না। ঝকঝক করে পরিষ্কার শান্ত আর ঠাণ্ডা জল। কিন্তু কাজরীর মনের একটা উদ্বেগ আজও শান্ত হতে পারেনি। দিনের মধ্যে অনেকবার এবং বিশেষ ক'রে সন্ধ্যাবেলায় মনের ভিতরে একটা অস্বস্তির জ্বালা ছটফট ক'রে ওঠে। আর কতদিন? আদালত মুখ খুলবে কবে?

চাকরির জীবন যেমন চলছিল, তেমনই চলছে। অসিত দত্তের নতুন গাড়িটা কাজরীকে চন্দননগরের এই বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে কয়লাঘাটের জাহাজ-অফিসে পৌঁছে দিতে এবং আবার ফিরিয়ে দিয়ে যেতে কোনদিন ভুলে যায় না। অসিতের এই নতুন গাড়ির ড্রাইভারও খুব ভদ্র। রোজই তিনবার সেলাম জানিয়ে বলে, আপনার কোন তকলিফ হলো না তো মেমসাব?

কাজরীও হেসে ড্রাইভারের ভদ্রতার উত্তরে ভদ্রতা করে—না, একটুও না।

ড্রাইভার বলে—আমার উপর সাহেবের হুকুম আছে, আপনি যেখানে বেড়াতে যেতে চান সেখানেই আপনাকে নিয়ে যেতে হবে।

কাজরী—না, আজ আর দরকার নেই। দরকার হলে বলবো।

কাজরীদের চন্দননগরের এই বাড়ির ঠিক পিছনের রাস্তার বাঁকের কাছে একটা ল্যাম্পপোস্ট আছে, যেটার মাথাটা ভাঙা, আলো জ্বলে না, জ্বালানো সম্ভবও নয়। এরকম একটা ল্যাম্পপোস্ট রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থেকে শুধু রাতের অন্ধকারকেই সাহায্য করে। এটা

রাস্তারই একটা বাধা। ওটা সরে গেলেই রাস্তার জীবনটা যেন হালকা হয়, মুক্তিও পায়। তা ছাড়া, ওটা সরে না যাওয়া পর্যন্ত ঐ জায়গাতে একটা নতুন ল্যাম্পপোস্ট কেমন ক'রেই বা দাঁড় করায় মিউনিসিপ্যালিটি? একটা মাথাভাঙা অপদার্থ পোস্টের পাশেই একটা ঝকঝকে নতুন পোস্ট ; কোন মানে হয় না, দেখতেও কি কুৎসিত!

কয়লাঘাটের জাহাজ অফিসের এঘরে আর ওঘরে কাজরীর নামে যে সব আলোচনা ফিসফাস করে, তার শব্দ কাজরীর কানে কিছুকিছু পৌঁছেও যায়। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতরতা কাজরীর অকপট জীবনের ইচ্ছাটাকে শ্রদ্ধা করতে পারছে না, শ্রদ্ধা করবার শক্তিও ওদের নেই। কিন্তু একদিন লিফটের অপেক্ষায় দু'মিনিট চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে গিয়ে ক্যান্টিনের একটা উচ্চকিত তর্কের ভাষা নিজের কানেই শুনতে পেয়েছে কাজরী। সে ভাষা অভিনন্দনের ভাষা। কে যেন বেশ জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠেছে—যাই হোক, অঞ্জনা সরকারের ন্যাকামির চেয়ে কাজরী বিশ্বাসের এই সৎসাহস ঢের ঢের ভাল!

ভালই হয়েছে ; আদালতে দরখাস্ত করা একটুও ভুল হয়নি। স্বামীর সঙ্গে সত্যি ক'রে কোন সম্পর্ক নেই, স্বামীর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে ভিন্ন হয়ে থাকতে হয় ; তবু, শুধু একদিন আইন মত বিয়ে হয়েছিল বলেই একটা অকেজো বন্ধনের গিঁট রেখে দিয়ে সিঁথির সিঁদুর নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে, কয়লাঘাটের জাহাজ অফিসের অঞ্জনা সরকার এরকম অদ্ভুত জীবন সহ্য করতে পারলেও কাজরীর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। এমন কপটতার দরকার কি?

অসিত জীমূত আর গাঙ্গুলী আসে মাঝে মাঝে। কয়েকটা রবিবারের সকাল বেলায় এই বারান্দাতেই বসে ওরা চা খেয়ে গিয়েছে। ওরাও বেশ বিরক্ত হয়ে উঠেছে। অনর্থক দেরি করছে আদালত। ওরা খোঁজখবর করছে, চেষ্টাও করছে, যাতে আদালতের রায় একটু তাড়াতাড়ি বের হয়।

কম দিন তো নয় ; দু'মাসেরও বেশি সময় পার হয়ে গেল। ওরা তিনজন যখন এসে গল্প করে, শুধু তখন মাত্র দু'তিন ঘণ্টার জন্য কাজরীর জীবনটা সেই প্রশস্তির কলগুঞ্জন নতুন ক'রে শুনতে পায় আর আশ্বস্ত হয়। কিন্তু তারপর? বিশেষ ক'রে সন্ধ্যা হবার পর এই বারান্দায় যখন চেয়ারের উপর একেবারে একলা হয়ে বসে থাকতে হয়, তখন কাজরীর মনের ভিতরটা যেন কামড়াতে থাকে, সেই সঙ্গে শরীরটাও। যেন একটা শূন্যতা গায়ে জড়িয়ে এখনও বসে থাকতে হচ্ছে। উপোস ক'রে ক'রে মরে যাচ্ছে কাজরীর জীবনের সান্ধ্য নিঃশ্বাসের আশা। কাজরীর প্রাণময় অস্তিত্বের রক্তকণাগুলি যেন অনাদরের বেদনায় ছটফট করে, অভিমান করে।

রোজ যেমন, সেদিনও তেমনি, সন্ধ্যা হতেই বারান্দার উপর একলাটি হয়ে চেয়ারের উপর বসে সেই কথা ভাবতে গিয়ে কাজরীর মনটা বিরক্ত হয়ে ছটফট করতে থাকে। কবে মুখ খুলবে আদালত?

চন্দননগরের সন্ধ্যা শীতের বাতাসে সির সির করে। কিন্তু টকটকে লাল ফ্ল্যানেলের ওভারকোট আর বেশিক্ষণ গায়ে রাখতে ইচ্ছা করে না কাজরীর। কপালটা একটু ঘেমে উঠেছে। টকটকে লাল ফ্ল্যানেলের চেয়ে মনের উদ্বেগটাকেই বেশি গরম মনে হয়।

তারপরেই পর-পর তিনবার টেলিফোনের আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য কাজরীকে পর-পর তিনবার ব্যস্ত হয়ে উঠতে হয়। বারান্দার চেয়ার ছেড়ে ঘরের ভিতরে ছুটে যেতে হয়। দশ মিনিট পর পর তিনটে ডাক। তিনজনের ডাক। সেই আহ্বানে কান পাততে গিয়ে কাজরীর দু'চোখের আলো নতুন হয়ে চমকে ওঠে। কথা বলতে গিয়ে মুখটাও নতুন হাসি হেসে ওঠে আর মনের ভিতর থেকে সব উদ্বেগের ভার নেমে যায়।

প্রথম ফোন এল অসিতের কাছ থেকে। দ্বিতীয় ফোন জীমূতের, তৃতীয় ফোন গাঙ্গুলীর

কনগ্র্যাচুলেশন! অভিনন্দন! আজই আদালত রায় দিয়েছে। এই মাত্র আধঘণ্টা হলো, টেলিফোন ক'রে খবরটা জানিয়েছে সত্যকিংকর।

কাজরীর কানের কাছে প্রথম টেলিফোনের আহ্বানে অসিত দত্তের গলার স্বরের একটা উচ্ছ্বাস হেসে ওঠে। কাল একটা মুক্তিদিবস সেলিব্রেট করতে চাই মিস কাজরী চৌধুরী।

কাজরীও টেলিফোনের উপর মুক্ত ঝরনার মত একটা কলকল স্বরের হাসি লুটিয়ে দিয়ে বলে—মুক্তি দিবসই বটে। কথাটা নেহাত মিথ্যে নয় অসিতবাবু। আপনারও মনের উপর এতদিন ধরে যে উদ্বেগ...।

অসিত—উদ্বেগ বললে কম বলা হয়। বললে বিশ্বাস করবেন কি-না জানি না, আমি এতদিন দস্তুরমত একটা আতঙ্কে কষ্ট পেয়েছি।

কাজরী—যাই হোক, মুক্তিদিবস সেলিব্রেট করুন বা নাই করুন...।

অসিত—না না, ওকথা বলবেন না। মুক্তিদিবস সেলিব্রেট করবোই, আপনি কথাটাকে ওভাবে তুচ্ছ করবেন না।

কাজরী—বেশ তো, কাল না হয় মুক্তিদিবস করবেন, কিন্তু আজ...।

অসিত—বলুন।

কাজরী—আজ কি একবার দেখা হতে পারে না?

অসিত দুঃখিতভাবে বলে—আজ এখনই যে অত্যন্ত জরুরি কাজের ঝঞ্ঝাট আছে। আমাকে একবার আসানসোল যেতে হবে।

কাজরীও দুঃখিত ভাবে বলে—তাহ'লে?

অসিত—আপনার কি বিশেষ কোন দরকারের কথা আছে?

কাজরী—হ্যাঁ, অসিতবাবু।

অসিত—কাল সকালে যদি যাই?

কাজরী—বেশ কাল সকালে ঠিক আটটার সময়। মাত্র আধঘণ্টার জন্য, ন'টার আগেই আপনাকে ছেড়ে দেব। আপনার এক মিনিটও সময় নষ্ট করবো না।

অসিত—বেশ।

কাজরী—নিশ্চয় তো?

অসিত—নিশ্চয়।

জীমূতের টেলিফোনের ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে কাজরীই আগে খিল-খিল ক'রে হেসে ওঠে।—জানি, আপনি কি বলতে চান?

জীমূত—তা হ'লে এরই মধ্যে শুনে ফেলেছেন?

কাজরী—হ্যাঁ, অসিতবাবু এই তো মাত্র দশ মিনিট আগে ফোন ক'রে জানিয়েছেন।

জীমূত—আমার মনটা এতদিনে একটা শাস্তির জ্বালা থেকে মুক্তি পেল।

কাজরী—বাস্তবিক, জ্বালাই বটে।

জীমূত হাসে—সুতরাং, কাল একটা মুক্তিদিবস সেলিব্রেট ক'রে শান্তি পেতে চাই।

কাজরী হাসে—বেশ তো ; কিন্তু তার আগে যে একবার দেখা হওয়া উচিত ছিল।

জীমূত—বলুন, কখন দেখা করবো?

কাজরী—আজ বোধ হয় এতদূর আসতে আপনার অসুবিধে আছে।

জীমূত—হ্যাঁ, মিস চৌধুরী।

কাজরী—কাল সকাল ন'টায় আসুন।

জীমূত—বেশ।

কাজরী হাসে—ন'টার আগে নয়, আর দশটার পরেও নয়।

জীমূত—বেশ বেশ। তাই হবে।

গাঙ্গুলীর টেলিফোনের ডাক শুনে কাজরীই আগে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে।—মুক্তিদিবস সেলিব্রেট করবার ব্যবস্থা করুন।

গাঙ্গুলী—অ্যাঁ? সুখবর পেয়ে গিয়েছেন তাহ'লে?

কাজরী—হ্যাঁ।

গাঙ্গুলী—কিন্তু সত্যিই মুক্তিদিবস সেলিব্রেট করবো ; কথাটা অবিশ্বাস করবেন না। এরই মধ্যে অসিত আর জীমূতের সঙ্গে টেলিফোনে একটা পরামর্শও করেছি, প্ল্যানও করে ফেলেছি।

কাজরী—বেশ ; সে ব্যাপাব তো কাল সন্ধ্যার আগে আর হচ্ছে না?

গাঙ্গুলী হাসে—না, সন্ধ্যার আগে হ'লে বিরস ব্যাপার হয়ে যাবে।

কাজরী—তার আগে আপনার কাছে যে বিশেষ একটা কথা ছিল।

গাঙ্গুলী—বলুন।

কাজরী—কাল সকাল দশটার সময় এখানে একবার আসতে পারবেন কি?

গাঙ্গুলী—খুব পারবো।

কাজরী—তা হ'লে অবশ্যই আসবেন। হ্যাঁ, দশটার পরেই আসবেন। কেমন?

গাঙ্গুলী—তথাস্তু।

ঘন নীল ফ্ল্যানেল গায়ে জড়িয়ে বারান্দার চেয়ারের উপর চুপ ক'রে বসে থাকে কাজরী। শীতের সন্ধ্যার বাতাস কাজরীর কপালের উপর সিরসির করে। কাজবী চৌধুরীর দুই চোখের শাণিত হাসিটাও সন্ধ্যার আলোতে ঝিকঝিক করে।

আর কি? মনে পড়তেই কাজবী চৌধুরীর দু'চোখে একটা স্বপ্নময় আবেশ নিবিড় হয়ে ওঠে। আর মুখটাও হেসে ওঠে। আজকের এই রাতটুকু পার হয়ে যাবে, আর দিনটা কাজরীর জীবনের একটা নতুন দিন হয়ে হেসে উঠবে। কাজরীর প্রাণ যেন এখনই আগামী কালের আহ্বানের ভাষা আর শব্দ শুনতে পেয়ে একটা লাজুক বিস্ময়ের উৎপাত চুপ ক'রে সহ্য করতে থাকে। খুবই সত্যি কথা, অস্বীকার করে না কাজরী, কালকের দিনটাই কাজরীর জীবনের মুক্তিদিবস।

কাজরী আজ ইচ্ছে ক'রে ওদের তিনজনের জন্যই শুভ সুযোগের লগ্ন ভাগ ক'রে দিয়েছে। কাজরীর কাছে একলা বসে মনের কথা বলবার সুযোগ। ওরাও কি না বলে আর থাকতে পারবে?

অসিত আসবে সবার আগে। মনে হয়, অসিতেরই হাতে হাত সঁপে দিতে হবে। তারপর আর...জীমূত আর গাঙ্গুলীর মনের কথা 'শোনবার দরকারও হবে না। বরং ওরাই দু'জনে অসিত আর কাজরীর বিয়ের ইচ্ছার ঘোষণা শুনতে পেয়ে খুশি হয়ে, আর, আরও এক কাপ চা বেশি খেয়ে চলে যাবে।

—আজ তো আর কোন বাধা নেই কাজরী। এবার আমার চিরকালের আপন হয়ে যেতে তোমার কোন আপত্তি করা উচিত নয়। আমি যে তোমার স্বামী হবার সৌভাগ্য এতদিন নীরবে কামনা করেছি।

ধড়ফড় ক'রে নড়ে বসে কাজরী। রুমাল তুলে চোখ মুছে একটা স্বপ্নালু কল্পনার আবেশ মুছতে থাকে। কি আশ্চর্য, অসিতের গলার স্বরটা স্পষ্ট শোনা গেল!

জীবনের শুভদিনে যেমন ক'রে সাজা উচিত ঠিক তেমন করে সেজেছে কাজরী। কিন্তু স্বীকার করতে হয়, জীবনের কোন শুভদিনে এবং এর চেয়েও বেশি সুন্দর সাজে কাজরীর মুখটাকেও এত বেশি সুন্দর দেখায়নি। টকটকে লাল ফ্ল্যানেলের ওভারকোট কাজরীর কাঁধের উপর আলগা হয়ে পড়ে রয়েছে ; সন্দেহ হতে পারে, কাজরীর মুখের রক্তিমতা বোধহয় ঐ

টকটকে লাল ফ্ল্যানেলের প্রতিচ্ছায়া। কিন্তু না, ভুল সন্দেহ। গাড়ির হর্নের শব্দ শুনতে পেয়েই ব্যস্ত হয়ে কাঁধের উপর আলগা হয়ে পড়ে থাকা টকটকে লাল ফ্ল্যানেলের ওভারকোট চেয়ারের কাঁধের উপর ফেলে রেখে দিয়ে যখন ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে যায় কাজরী, তখন কাজরী চৌধুরীর মুখটা যেন তপ্ত হয়ে আরও নিবিড় রক্তিমতায় গনগন করে।

কিন্তু কাজরী চৌধুরীর কল্পনাও যেন হঠাৎ আহত হয়, আর সাদা মুখে একটা সাদাটে বিস্ময়ের প্রলেপ ছড়িয়ে পড়ে। মুখের হাসিটাও একটু ফিকে হয়ে যায়।

ওরা তিনজনেই এসেছে। অসিত, জীমূত আর গাঙ্গুলী।

একই গাড়িতে এই সকাল আটটার প্রথম মুহূর্তে কাজরী চৌধুরীর বাড়ির ফটকের কাছে ওরা একই সঙ্গে দেখা দেবে, এরকম কথা ছিল না। কাজরী চৌধুরীর টেলিফোনের অনুরোধের ভাষা কি স্পষ্ট ক'রে শুনতে পায়নি, কিংবা শুনেও স্পষ্ট ক'রে কিছু বুঝতে পারেনি ওরা? আজকের দিনেও কাজরী চৌধুরীর কাছে একটা ক্লাব হয়ে আসবার সময় ওদের মনে কি এই ছোট্ট খটকাও লাগেনি যে, না, এভাবে এলে ওরাই আজ মনের কথা মন খুলে বলবার সুযোগ পাবে না?

কিন্তু ওদের মুখের অবাধ হাসির উচ্ছ্বাস শুনে মনে হয়, ওরা এখনও বুঝতেই পারেনি যে, ওরা সত্যিই কোন ভুল করে ফেলেছে। যেন সাদা মনে কাদা নেই, রং-ও নেই ; নিতান্ত একটা সাধারণ কৌতূহলের টানে, কাজরী চৌধুরীর বাড়ির মিষ্টি চা-এর স্বাদ নিয়ে সকালবেলার পিপাসাকে একটু মিষ্টি তৃপ্তি দেবার জন্যে ওরা চলে এসেছে।

সত্যিই কি তাই? প্রশ্নটা কাজরীর মনের মধ্যে ছোট একটা ভাবনার ঘোর ঘটিয়ে তুলতো ঠিকই, যদি সেই মুহূর্তে ওরা তিনজনে একই আগ্রহের সুরে একই প্রশ্ন না ক'রে উঠতো।— কি ব্যাপার বলুন তো? কি কথা বলতে চান আপনি? আমরা তো ভেবে একটু উদ্বেগই বোধ করেছি, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না, আজ আর আপনার চিন্তা করবার কি থাকতে পারে?

কাজরীরও আর বুঝতে অসুবিধার কিছু নেই। বিস্মিত হলেও বেশ ভাল ক'রে বুঝতে পারে কাজরী, ওরা আজ কাজরী চৌধুরীরই মনের কথা শোনবার আশা আর আশংকা নিয়ে ব্যস্তভাবে ছুটে এসেছে। ওরা কাজরী চৌধুরীর জীবনের বক্তব্য শুনবে বলে তৈরী হয়েছে, কাজরীর কাছে ওদের কারও মনের গভীরে কোন বিশেষ আশার বক্তব্য নেই।

কাজরী চৌধুরীর নিঃশ্বাসের আশা যেন হঠাৎ লজ্জা পেয়ে এলোমেলো হয়ে যায়। উৎসবের রঙীন ফানুসটা হঠাৎ যেন একটা খোঁচা লেগে চুপসে গেল। ওরা কি তবে সত্যিই কাজরী চৌধুরীর পার্সোনালিটিকে একটু করুণা করবার জন্য ছুটে এসেছে?

ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতরে ঢুকে চা-এর টেবিল ঘিরে যখন বসে পড়ে সবাই, তখন আটটা বেজে এক মিনিট। চন্দননগরের গঙ্গার সাদা জল পুব আকাশের আভায় লাল হয়ে উঠেছে। অসিত বলে—টেলিফোনে আপনার কথার মধ্যে একটা যাকে বলে...অর্থাৎ একটা বিষণ্ণ সুর শুনতে পেয়েই সন্দেহ হলো, আপনি বোধহয় আবার একটা চিন্তার সমস্যায় পড়েছেন।

জীমূত—আমারও তাই মনে হলো।

গাঙ্গুলী—সেই জন্যই তো আমরা তিনজনে শেষে একমত হয়ে ঠিক করলাম, তিনজনে একসঙ্গেই এসে আপনার বক্তব্য শুনবো।

অসিত—কারণ...।

জীমূত—কারণ, আমরা তিনজনে মিলে একমত হয়ে আপনাকে যে পরামর্শ দিতে পারবো, সেটাই ঠিক পরামর্শ হবে বলে আমার বিশ্বাস।

হেসে ফেলে কাজরী।—টেলিফোনে এত চেঁচিয়ে হাসলাম, তবু বিষণ্ণ সুর শুনতে পেলেন?

অসিত খুশি হয়ে বলে—তাই বলুন।

জীমূত—তাহলে আমাদেরই বুঝতে ভুল হয়েছে।

গাঙ্গুলী চেঁচিয়ে হেসে ওঠে।—তাহলে বলুন, আপনার কিছু বলবার নেই, শুধু এটুকু বলবার জন্য আমাদের ডেকেছেন।

কাজরীর হাসিটাও কলকল ক'রে বেজে ওঠে।—তা ছাড়া আর কি?

কাজরী চৌধুরীর বাড়ির সকাল বেলার জীবনটা আজকের দিনেও সুন্দর একটি চা-এর আসর হয়ে গল্প করে। চা-এর কাপে একটু চুমুক দিয়েই অসিত একটা হাঁপ ছেড়ে বলে।—বন্ধন হলো বন্ধন! সুখের বন্ধন বলে কোন বস্তু সত্যিই সম্ভব নয়। বন্ধনের সুখ বললে তেমনিই একটা অর্থহীন হেয়ালির কথা বলা হয়। নয় কি?

কাজরী—আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন?

অসিত—না, বিশেষ ক'রে কাউকেই জিজ্ঞাসা করছি না। আমাদের সবাইকে, আর নিজেকেও এই প্রশ্ন করছি।

জীমূত—এই সোজা সরল সত্যটুকু কোন প্রশ্ন ক'রে বোঝাবার দরকার হয় না। বন্ধন সব সময়েই বন্ধন। সেটা বিয়ে হোক, বা যে-কোন ই'য়ে হোক।

গাঙ্গুলী—আমি তো মনে করি, বিয়ের চেয়ে বেশি নিষ্ঠুর শাসন আর কমপাল্‌শন মানুষের জীবনে আর কিছু হতে পারে না। মানুষের পার্সোন্যালিটিকে পদে পদে বাধা দেয় ; ছোট হয়ে থাকতে বাধ্য করে।

জীমূত—খুব সত্যি কথা। মেয়ে হোক বা পুরুষ হোক, প্রত্যেক জিনিয়াসের বিবাহিত জীবন অসুখী জীবন হতে বাধ্য হয়েছে।

গাঙ্গুলী—জিনিয়াস কখনও বিয়ে সহ্য করতে পারে না ; আর বিয়েও জিনিয়াস সহ্য করতে পারে না।

অসিত—ঋষিরা বলেন, বিয়ে একটা ব্রত। মর্ডানিস্টরা বলেন, বিয়ে একটা কনট্রাক্ট। আমি তো দেখতে পাই, ওটা একটা দাসত্ব।

জীমূত—একটা ড্রাজারি ; মানুষের স্পিরিটকে পোকার মত কুরে কুরে খায়।

অসিত—তবে হ্যাঁ, একটা কথা। বিয়েকে যারা একটা আদর্শ বন্ধুত্ব বলে মনে করে, তাঁদের অভিমত একেবারে যুক্তিহীন বলে মনে করতে আমারও বাধে।

জীমূত—তার মানেই তো এই যে, নারী ও পুরুষের একটা আদর্শ বন্ধুত্বকেই বিয়ে বলে মনে করা যায়।

গাঙ্গুলী—কোন সন্দেহ নেই। তাতে ঋষিরা যতই রাগ করুন, আর আইন যতই ভ্রূকুটি করুন ; কিন্তু মানুষের জীবনদেবতা যে তাই চান।

চা-এর কাপে শেষ চুমুক দিয়ে অসিত তার নিজেরই জীবনের, তার নিজেরই একটা নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রতিজ্ঞার কথা একেবারে সঙ্কোচহীন মুখরতার আবেগে হঠাৎ বলে ওঠে।—আমি আজও বিয়ে করতে পারলাম না বলে আত্মীয়েরা আমার অনেক নিন্দে করে ; কিন্তু আমি কারও নিন্দের ভয়ে বিচলিত হবার মানুষ নই! বিয়ে সম্বন্ধে আমার এই, যাকে বলে, এই ফিলসফিক ঘৃণাকেই আমি ভালবাসি।

জীমূত মুখ টিপে হেসে ঠাট্টা করে।—আঙ্গুর বড় টক ব্যাপার নয় তো?

অসিত—তার মানে?

গাঙ্গুলী—নারীর মত নারীর সাক্ষাৎ পেলে বোধ হয় মত বদলাতে হতো।

অসিত—নারীর মত নারীর অর্থ কি?

জীমূত—যদি বলি, আমাদের সম্মুখে যাঁকে দেখছি, এই কাজরী চৌধুরীর মত নারী।

অসিত—কাজরী চৌধুরীর মত কেন, স্বয়ং কাজরী চৌধুরী হলেও অসিত দত্ত বিয়ে করতে রাজি হবে না।

গাঙ্গুলী—কাজরী চৌধুরীই বিয়ে করবে না।

অসিত—সেটা আমি বিশ্বাস করি। ওঁর মত মানুষের পক্ষে ফ্রী লাইফ হলো বেস্ট লাইফ। কারও স্ত্রী হওয়া ওঁর মত মানুষের পক্ষে সাজে না।

জীমূত—তা ছাড়া, উনি জীবনে যে কঠোর শিক্ষা পেয়ে গিয়েছেন, তার পর আর ওঁর পক্ষে বিবাহ নামক ভুলটির দিকে এগিয়ে যাওয়াও অসাধ্য।

গাঙ্গুলী—খুব সত্যি কথা।

অসিত—সুখের বিষয়, আমরা যে ভুলের বিপদ থেকে মুক্ত আছি উনিও আজ সেই ভুল থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছেন।...একি আপনার চা যে জুড়িয়ে জল হয়ে গিয়েছে ; এক চুমুকও খাননি মনে হচ্ছে!

চমকে ওঠে কাজরী, তারপর হেসে ফেলে—হ্যাঁ, তাই তো দেখছি। আপনাদের কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে যাবার শাস্তি।

অসিত—কথাগুলি অকপটভাবে বলেছি, কিন্তু একটুও মিথ্যে বলেছি কি?

আনমনার মত তাকিয়ে ঠাণ্ডা চায়েই চুমুক দিয়ে ক্লান্তভাবে একটা অলস হাসি হাসে কাজরী—না, ঠিক কথাই বলেছেন।

অসিত—শুনতে খারাপ লেগেছে আপনার?

কাজরী ছটফট ক'রে হেসে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়—একটুও না।

তিনজনেই হাতঘড়ির দিকে তাকায় আর ব্যস্ত হয়ে ওঠে। অসিত বলে—এখন বের হতে হয়। আজ আবার ব্যাঙ্কের হিসেব নিয়ে অনেক বোঝাপড়ার ব্যাপার আছে।

জীমূত আর গাঙ্গুলী বলে—হ্যাঁ, এবার উঠতে হয়।

চা-এর আসর ভাঙে। এবং আর এক মিনিট পরেই অসিত দত্তের গাড়ি চন্দননগরের সকাল বেলার বাতাসে একটা চকিত হর্ষের শিহরণ তুলে চলে যায়।

এই শিহরণ সকাল বেলার বাতাসের বুক থেকে সরে গেলেও কাজরী চৌধুরীর বুকের ভিতরে যেন রিমঝিম ক'রে বাজতেই থাকে। বারান্দার উপরে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কাজরী। তারপর ঘরের ভিতরে ঢুকে সোফার উপর এলিয়ে পড়ে। একটা নতুন মুগ্ধতার আবেশ, না অবসাদ। ভাবতে গিয়ে ভাবনাগুলিই যেন এলোমেলো হয়ে যায়।

তবু সেই শিহরণটা রিমঝিম ক'রে বেজে বেজে, আর নিঃশ্বাসের যত অসার ভয় ভেঙে ভেঙে কাজরী চৌধুরীর প্রাণটাকে যেন এক অবাধ হর্ষের সঙ্গীতে শুনিয়ে দিচ্ছে, মন্দ কি? ওদের কথাগুলিকে একটা ভয়ানক ফিলসফির খেয়াল বলে সন্দেহ ক'রে লাভ কি? ওরা কি সুখী নয়? কাজরী চৌধুরীও কেন সুখী হতে পারবে না?

অনেকক্ষণ বই পড়ে তারপর অনেকক্ষণ ধরে ঘুমিয়ে আবার যখন ধড়ফড় করে জেগে চোখ মেলে শীতের বিকালের রোদের দিকে তাকায় কাজরী, তখন মনে হয়, না ঘুম নয়, যেন একটা মূর্ছার মধ্যে শরীরটা এতক্ষণ অসাড় হয়ে পড়েছিল। কাজরীর চোখ দুটোও যেন নেশাভাঙা বেদনায় লাল হয়ে দপদপ করছে। এই মূর্ছা এখনই ভাঙতো না, যদি মাথাটা একটা প্রচণ্ড রাগের জ্বালায় জ্বলে না উঠতো। রাগটার দাউ দাউ শব্দ যেন কানে শুনতে পাচ্ছে কাজরী। পৃথিবীর একজনের উপর রাগ।

আজ এখন কোথায় আছে সেই লোকটা? আজও কি চলে যায়নি? আজকের খবরের কাগজে এত স্পষ্ট ক'রে ছাপানো সংবাদটা চোখে দেখেও অতীন বিশ্বাস কি এখনও ক্যামাক স্ট্রীটের নতুন বাড়ির ফ্ল্যাটের একটা ঘরের ভিতর বসে আশা করছে যে, কাজরী আবার ফিরে এসে ওকে ক্ষমা করে দেবে? কি নির্লজ্জ আশা?

তাড়াতাড়ি সাজ সারে কাজরী। আর, যেন একটা আক্রোশের ঝোঁকে ছুটে এসে টেলিফোনের রিসিভার তুলে সিন্‌হা সাহেবের মেয়েকে ডাকে ঃ—আমি কাজরী ; আমার

বাসার খবর কি মালতী?

সিন্‌হা সাহেবের মেয়ে বলে—আমি তো কিছু বলতে পারছি না। আপনার চাকর ভাগবতকে ডেকে দিচ্ছি।

ভাগবতের সাড়া শুনতে পেয়েই অদ্ভুত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে কাজরী—তোমার বাবুর খবর কি?

—ভাল আছেন।

—কোথায় আছেন?

—ঘরে। এখনি ফিরলেন।

—কোথায় গিয়েছিলেন?

—তা জানি না।

—কখন বের হয়েছিলেন?

—সকাল বেলা।

—ঘরে আর-কেউ আছে?

—না।

—আচ্ছা, যাও।

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে, দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকায় কাজরী। তারপরেই চেঁচিয়ে ডাক দেয়—হরিদাস—

—আজ্ঞে?

—একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এস। এখন কলকাতায় যেতে হবে।

জারুল গাছের মাথা থেকে শীতের বিকালের শেষ রোদের মুমূর্ষু আভা ঝরে পড়ে গিয়েছে, আর সবেমাত্র সন্ধ্যার ফিকে অন্ধকারে আবছায়াময় ক্যামাক স্ট্রীটের চেহারাও একটু কালো কালো হয়ে উঠেছে।

কাজরীর ট্যাক্সি ছুটে এসে ক্যামাক স্ট্রীটের যে বাড়ির যে ফটকের কাছে শব্দ বন্ধ করে থেমে যায় ; সে বাড়ির সেই ফটকের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাড়ি শব্দ ক'রে স্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করে।

—বিজয়া! চেঁচিয়ে ডাক দেয় কাজরী। চিনতে ভুল করেনি কাজরী, ঐ গাড়িটা বিজয়ারই সেই ধবধবে সাদা বডির গাড়িটা, যার ড্রাইভার হলো চাকর ভাগবতের কাকা দুর্গাপদ।

সাদা গাড়িটা থামে। কাজরীও ট্যাক্সি থেকে নামে। চলে যায় ট্যাক্সিটা। সাদা গাড়ির দরজা খুলে বিজয়াও নামে।

এদিক থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে যায় কাজরী। ওদিক থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে আসে বিজয়া। আবছায়াময় ক্যামাক স্ট্রীটের কালো বুকের উপর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুই বান্ধবীর মুখ যেন হঠাৎ দেখাদেখির খুসিতে হেসে ওঠে।

কাজরী বলে—আমার আসতে আর এক মিনিট দেরি হ'লে তোমার সঙ্গে দেখা হতো না।

বিজয়া—হ্যাঁ, আমি আর এক মিনিট আগে চলে গেলে তোমার সঙ্গে দেখা হতো না।

কাজরী—তুমি বোধ হয় জানতে না যে, আমি আজকাল এখানে থাকি না।

বিজয়া—জানতাম।

কাজরী—জানতে? তবে...তবে তুমি এখানে? কি মনে ক'রে...কি ব্যাপার বিজয়া?

বিজয়া—তুমি যা সন্দেহ করেছো, তাই।

কাজরী—অসম্ভব। বিশ্বাস করতে পারি না। আমি যাকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হলাম...।

বিজয়া হাসে—আমি তাকে নিয়ে চললাম।

কাজরী--কোথায় সে?

বিজয়া--গাড়ির ভেতরে।

কাজরী--ভুল করেছো বিজয়া।

বিজয়া--কিসের ভুল কাজরী?

কাজরী--তুমি কি জান না বিজয়া, কেন আমি...।

বিজয়া--সব জানি কাজরী।

কাজরী--সব জেনেও কি তাকে বিয়ে করতে চাও?

বিজয়া--বিয়ে হয়ে গেছে কাজরী।

কাজরী--কবে?

বিজয়া--আজ।

কাজরী--যে মানুষ কারও স্বামী হ'তে পারবে না, তাকে বিয়ে ক'রে...।

বিজয়া হাসে--স্বামী হয়েই গেছে।

কাজরী--তার মানে?

বিজয়া--তার মানে আমি গিয়ে তার স্ত্রী হ'য়ে গিয়েছি।

কাজরী--বুঝলাম না।

বিজয়া হাসে--একটু বুঝতে চেষ্টা কর।

কাজরী--এইবার বুঝলাম। ক'মাস?

বিজয়া--দু'মাস।

কাজরীর চোখ দুটো দপদপ ক'রে হাসে--কিন্তু এ কি ক'রে সম্ভব? তুমি তো একটা...তুমি যে নিজেকে মেয়েমানুষ বলেই মনে করতে না বিজয়া।

বিজয়া--ঠিক কথা। কিন্তু হঠাৎ একদিন মেয়েমানুষ হয়ে গেলাম।

কাজরী--কেমন ক'রে?

বিজয়া--ইচ্ছে হলো।

কাজরী--কিসের ইচ্ছে?

বিজয়া--একটা মানুষের আশাকে এই শরীরে পুষে রাখতে।

কাজরী--তারপর?

বিজয়া--তারপর তাকে ভালবেসে বাঁচিয়ে রাখতে।

কাজরী--এমন চমৎকার ইচ্ছাটি কবে থেকে হলো?

বিজয়া--সেই যে, যেদিন তুমি গিয়ে আমাকে বিরক্ত করলে...আর জোর ক'রে আমাকে দিয়ে একটা কাণ্ড করালে।

হেসে ওঠে কাজরী--তাই বল।...কিন্তু কোথায় চললে এখন?

বিজয়া--শ্বশুরবাড়ি।

কাজরী--এখন?

বিজয়া--হ্যাঁ।

কাজরী--কেন?

বিজয়া--শ্বশুর-শাশুড়ী অভিমান ক'রে তীর্থ করতে চলে যাচ্ছেন। তাঁদের আটকাতে হবে।

কাজরী--কিসের অভিমান?

বিজয়া--নাতিছাড়া জীবনের অভিমান।

কাজরী--একটা নাতি তো ছিল।

বিজয়া--সে নেই এখন। তার মায়ের সঙ্গে চলে গিয়েছে।

কাজরী--কেন? কেতকী এখন কোথায়?

বিজয়া—চলে গিয়েছে। কেতকীর বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

কাজরীর হাসি আরও তরল হয়ে উল্লাসের ফোয়ারার মত কলকল ক'রে ওঠে।—বাঃ, বেশ ভাল-ভাল খবর শোনালে বিজয়া। বিজয়া ডাক্তারও তাহলে এবার থেকে স্বামী-পুত্র শ্বশুর-শাশুড়ী নিয়ে একেবারে লক্ষ্মী বউটি হয়ে...বাঃ, সত্যি একটা ম্যাজিক কাণ্ড করেছ বিজয়া।

সিন্‌হা সাহেবের ফটকের আলো দপ ক'রে জ্বলে ওঠে, আর কাজরীর চোখ দুটোও একটা ধাঁধার চমক সহ্য ক'রে এইবার স্পষ্ট ক'রে দেখতে পায়। হ্যাঁ, ম্যাজিকই বটে। বিজয়ার সিল্কের আঁচলটা সাদা নয়, পায়ের জুতো ধবধবে সাদা নয়, গায়ের জামাটাও সাদা নয়। সবই রঙীন। কি অদ্ভুত সেজেছে বিজয়া। সাদা সিঁথিটার মধ্যেও সরু একটা লাল রেখা হাসছে। ফুলের মঞ্জরীর মত রঙীন হয়ে, নরম হয়ে আর লাজুক হয়ে বিজয়ার চেহারাটা মৃদু হাওয়ার দোলায় দুলছে।

বিজয়া বলে—চলি।

কাজরী—হ্যাঁ, যাও।

আস্তে আস্তে হেঁটে আবার সাদা গাড়ির দরজা খুলে যেন ভিতরের একটা নিবিড়তর রঙীন ছায়ার মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে বিজয়া। স্টার্ট নেয় বিজয়ার গাড়ি। কিন্তু চলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায়। কারণ...।

কারণ, ক্যামাক স্ট্রীটের আলো আর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হু হু ক'রে ছুটে এসে আর একটা গাড়ি একেবারে কাজরীর ছায়ার কাছে এসে থামে। গাড়ি থেকে নামে অসিত জীমূত আর গাঙ্গুলী।

অসিত বলে—চন্দননগরের বাড়িতে টেলিফোন ক'রে জানলাম, আপনি নেই, আপনি এখানে এসেছেন।

জীমূত—আপনি কি সত্যিই ভুলে গেছেন যে, আজ আপনার মুক্তিদিবস?

গাঙ্গুলী—সেজন্য একটা সুন্দর উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে, সেকথাও তো আপনি জানেন!

কাজরী হাসে—পলাতকা বলে সন্দেহ করছেন?

অসিত—ছিঃ, কি যে বললেন?

কাজরী—কোথায় যাবেন এখন?

অসিত—আমার নতুন বাগানবাড়িতে।

ক্যামাক স্ট্রীটের বুকের কালো পীচের উপর কাজরীর ছায়া ; একটুও কাঁপে না সেই ছায়া। সেই ছায়াকে তিন দিক থেকে ঘিরে আরও তিনটে অনড় ছায়া ; অসিত জীমূত আর গাঙ্গুলীর ছায়া। শুধু গাড়ির খোলা দরজাটা সাগ্রহ অভ্যর্থনার ইঙ্গিত হয়ে ঝকঝক করছে যে দিকে সেই দিকটাই খোলা ; সেদিকে কোন বাধা নেই, কোন ছায়া নেই।

কাজরী বলে—উৎসব মানে?

অসিত—উৎসব মানে, আমরা তিনজন আর আপনি। চলুন।

তরতর করে হেঁটে আর এগিয়ে যেয়ে গাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে কাজরী।

স্টার্ট নেয় অসিতের গাড়ি। চলন্ত গাড়ির চকিত হর্ষের সঙ্গে গলার স্বরের উল্লাস মিশিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে অসিত। বেশি দূরে নয়, যেতে বেশি সময়ও লাগবে না। এই তো...ল্যান্সডাউন পার হয়ে, থিয়েটার রোড ধরে এগিয়ে যেয়ে, বেলভিডিয়ার হাউসের প্রায় কাছাকাছি এসে একটু বাঁয়ে ঘুরে...।

বিজয়ার ড্রাইভার দুর্গাপদ বলে—এবার স্টার্ট করি দিদিমিণি?

বিজয়া—হ্যাঁ।

দুর্গাপদ--কোথায় যাবেন?

অতীন বলে—সার্কুলার রোড ধরে সোজা শ্যামবাজার ; তারপর বেলগাছিয়া আর পাতিপুকুর পার হয়ে, যশোর রোড ধরে নাগের বাজার...তারপর একেবারে ডাইনে ঘুরে...।

একটি নমস্কারে

"সুমি, লক্ষ্মী মেয়ে আমার, এ চিঠি পাওয়া মাত্র চলে আসবে। অবাধ্য হয়ো না। চাকরি করবার কোন দরকার নেই....।"

চিঠি লিখছিলেন সোমার মা। মাত্র তিনটি দিন হলো, সোমা চলে গেছে, যেখানে চাকরিটা পাওয়া গেছে সেখানে। এখান থেকে ঠিক কতদূরে বা কত কাছে, সোমার মা হয়তো সেটা হিসাব করতে পারেন না। কিন্তু যেখানেই হোক, সেটা তো তাঁর চোখের বাইরের পৃথিবী। সোমা পড়ে থাকবে সেখানে, আর সোমার মা পড়ে থাকলেন এখানে? এই শাস্তি সহ্য করা যায় না। বাইশ বছরের মধ্যে যে-মেয়েকে একটি দিনের জন্যেও কাছ ছাড়া করতে পারেননি, তাকে আজ বিভূঁইয়ে ছেড়ে দেবেন কোন্ প্রাণে? শুধু একটা চাকরির জন্যে? ঘরে দুটো টাকা আসবে বলে? এ যে সত্যিসত্যি গঙ্গাসাগরে মেয়েকে ভাসিয়ে দেওয়ার মত ব্যাপার।

তবে এই নিষ্ঠুরতা কেন করলেন তিনি? এরকম কঠোর মানত তো তাঁর ছিল না। কোনদিন কোন দুঃস্বপ্নেও এরকম কোন নিষ্ঠুর ভবিষ্যতের আভাস তাঁর মাঝরাতের ঘুম ভেঙে দেয়নি। কিন্তু আজ মাঝরাত পর্যন্ত তিনি জেগে আছেন। সোমা চলে গেছে। চুনি আর পান্না, দুটি যমজ মেয়ে, সোমারই বোন, সোমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, এই গরমের মধ্যেও মাদুরের ওপর পড়ে অঘোরে ঘুমোয় আর ছটফট করে। চক্রবেড়ের বাঁকা গলির কোণে একটা একঘরে বাসা। খোলা জানলা দিয়ে মাঝে মাঝে দত্তবাবুদের বেলবাগানের মাথা থেকে একটা গন্ধমাখা বাতাস হঠাৎ করুণার আবেগে ঘরে এসে ঢোকে। আরও বেশী করে আসতো, কিন্তু দত্তবাবুরা ক'মাস হলো পাঁচিলটা অনেক উঁচু করে তুলে দিয়েছেন, তাই গলিটা আরও বেশী করে আলোহীন ও বাতাসহীন হয়েছে। টাকার জোরে উঁচু হয়ে নীচের মানুষের আলো-বাতাস লুট করে নিতে কোন আইনের ভয় নেই। সোমাদের ভয়ার্ত ও সঙ্কুচিত বাসাটার জানলা খোলা থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি?

"আমার মন মানছে না সুমি, তুমি আর মিছামিছি চিঠির উত্তরে চিঠি লিখে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করো না, সোজা চলে এসে যা বলতে হয় বলো। তারপর আমি বুঝবো...।"

সত্যিই, সোমার মা'র মন আজ আর কোনমতে বুঝ মানতে চায় না। মাঝরাতের চক্রবেড়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে আছে, শুধু গলির তিনতলা বাড়িটার সব আলো এখনো জ্বলছে। অন্যদিন এরকম ব্যাপার দেখা যায় না। তিনতলার একটা ঘরের জানলা থেকে সেতার-ছেঁড়া বেদনার্ত নিক্বণের মত একটা শব্দ মাঝে মাঝে বাইরের অন্ধকারের বুকে গিয়ে বিঁধছে—মা মা মা গো।

সোমার মা সব খবরই রাখেন, ওটা নিশীথদের বাড়ি। নিশীথের বোন চারুর জ্বর বেড়েছে। বাড়ির চল্লিশটা বিদ্যুৎপ্রভ বালব আজ চারুর অসুখে কেমন যেন রাতজাগা বিষণ্ণতায় কাতর হয়ে রয়েছে। সিঁড়িতে সিঁড়িতে পদশব্দের ব্যস্ততা, আধঘণ্টা পর পর ডাক্তারের গাড়ি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসে গেটের কাছে থামে আর চলে যায়। দারোয়ান জেগে আছে, সরকার মশায় জেগে আছেন। চাকরের দল বারান্দার ওপর হুকুমের ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে। চারুর বাবা আর মা হাতপাখা নিয়ে চারুর বিছানার পাশে বসে থাকেন। নিশীথ দশ মিনিট পর পর টেলিফোন করে—হ্যালো ডাক্তার! রাত্রিটা এত নিঃশব্দ বলেই নিশীথের গলার স্বর এত স্পষ্ট শোনা যায়। সোমার মা উতলা হয়ে ওঠেন।

চারুর জন্যে নয়, নিজের মেয়ের জন্যই। সোমার মা'র চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে ওঠে, নিজের ওপর রাগ হয়, অশান্ত মনের ভাবনা নানা রকম ভয়ে শিউরে ওঠে। সেখানে

সোমারও যদি এমনি জ্বর হয়? ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেবারও যে কেউ নেই। জ্বরের ঘোরে শতবার মাকে ডাকলেও যে সে-ডাক স্বজনহীন দেশের অন্ধকারে মাথা খুঁড়ে ব্যর্থ হয়ে যাবে। সোমা তো চারুরই সমবয়সী, এমন কিছু সেয়ানা নয়। চারুর মত সোমার মনটাও তো ঘরের আদরে বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য, এই বয়সেই মেয়েটার আপন ঘর শুধু বইবার বোঝা হয়ে উঠলো। তাও আবার ঘরছাড়া হয়ে।

অথচ সোমা এমনি মেয়ে যে কষ্টের জীবনকে মনেপ্রাণে ঘৃণাই করে। গরিব হওয়ার লজ্জাটাও মর্মে মর্মে অনুভব না করে পারে না। এ পাড়ার সবাই জানে ওদের অবস্থা কত খারাপ। সোমা তাই এ-পাড়ার কোন বাড়িতে কোন আহ্বান নিমন্ত্রণ ও বন্ধুত্বের সূত্রেও যায় না। সোমার মনে সব সময় এ-সন্দেহ হয়েই আছে, পাঁচজনে ওর দিকে যেভাবে তাকিয়ে থাকে, সেটা ঠিক মানুষের দৃষ্টি নয়। চারু, চারুর মা, দত্তবাবুর স্ত্রী, নিরুর মাসী, ওপরতলার লীলা আর লীলার বৌদি, আশেপাশে আর ওপরে, সবাই এরা কেউ লোক খারাপ নন। কিন্তু তবু সবারই আচরণে কেমন একটু ভেজাল আছে বলে মনে হয়। প্রীতির সঙ্গে একটু করুণা, সম্মানের সঙ্গে একটু সমবেদনা, আর উপদেশের সঙ্গে একটু অহংকার।

যদি কারও সঙ্গে মিশতেই হয়, কোথাও যেতে হয়, তবে সোমা একমাত্র যায় চক্রবেড়ে থেকে অনেক দূরে শ্যামবাজারে, ভদ্রাদের বাড়ি। ভদ্রারা বড়লোক না হলেও গরিবলোক নয়। অবস্থা যতখানি সচ্ছল, তার চেয়ে বেশী সচ্ছল ওদের হাসি। সোমাকে দেখতে পেলে শুধু ভদ্রা কেন, ভদ্রার ভাইবোনেরা পরীক্ষার পড়া ফেলে সাড়া দিয়ে ছুটে আসে। এই হাসিমুখের অভ্যর্থনায় কোন মাত্রা নেই। ভদ্রার মা রান্নাঘরে বসেই চেঁচিয়ে অনুযোগের সুরে বলেন—এত অহংকার কেন গো মেয়ে? তিন তিনটে চিঠি দিয়েও একবার সাড়া পাওয়া যায় না!

শুনতে ভাল লাগে সোমার। হয়তো এই অনুযোগের মিষ্টি আস্বাদের লোভেই ভদ্রাদের বাড়িতে সে আসে। চা খেতে বসলে ভদ্রা কোন কথা না বলেই সোমার ডিশে আরও দুটো সিঙাড়া তুলে দেয়। সোমা আপত্তি করে না, আপত্তির কথা মনেও আসে না, ব্যাপারটাকে বিশেষ করুণা বলে কোন সন্দেহও হয় না।

ভদ্রার মা কখনো হয়তো ধমক দেন- কি রে সোমা, চুলগুলোকে ভাল করে আঁচড়ে একটা বিনুনি করতেও পয়সা খরচ হয় বুঝি?

এই ধমকে ক্ষুণ্ণ হওয়া দূরে থাক, সোমা মনে মনে খুশী হয়। এখানে বরং অভিযোগ অনুযোগ ধমক আর নিন্দে আছে, কিন্তু তার মধ্যে ভেজাল নেই। ভদ্রার ছোট ভাইবোনেরা সোজাসুজি নিন্দেই করে—সোমাদি তুমি এক নম্বরের কিপটে, একদিনও চার পয়সার লজেন্স পর্যন্ত খাওয়ালে না!

এখানে লোকের কথাবার্তা সমবেদনায় টনটন করে না, উপকার করবার জন্যে কেউ মাথাব্যথায় ছটফট করে না। যেমন ভদ্রা, তেমনি ভদ্রার মা, আর তার চেয়ে ভাল ভদ্রার বাবা হিতেনবাবু।

হিতেনবাবু ব্যবসা করেন, কিন্তু ঠিক ব্যবসায়ী হতে পারেননি বোধ হয়। কখন লাভ হয় আর কখন লোকসান যাচ্ছে, হিতেনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে সেটা কখনই অনুমান করা যাবে না। কারণ, সব সময়েই তিনি খুশী হয়ে আছেন। ব্যবসাটা তাঁর ধর্ম হয়ে উঠতে পারেনি, একটা শখের শখ।

তাঁর স্বদেশিয়ানাও তেমনি একটা শখের শখ, কিন্তু এই দুটো শখের মধ্যে কোনটা তাঁর কাছে বেশী প্রিয়, তাও সঠিক বলা কঠিন। যে-কোন জাতীয় কাজের কমিটি তাঁর কাছে একবার প্রস্তাব নিয়ে এলেই হলো। তিনি তখনি এবং নির্ঘাত সে কমিটির সদস্য হবেন এবং কিছু চাঁদাও দিয়ে ফেলবেন। যে-কোন সভা-সমিতির আমন্ত্রণ আসুক না কেন, একটু স্বদেশী ব্যাপার থাকলেই হলো, তিনি অসময়ে দোকান বন্ধ করে দিয়ে ঠিক সময়মত অনুষ্ঠানে

উপস্থিত হবেন। তিনি সাতকড়িবাবুদের তৈরী জনসেবা কমিটিতে আছেন, আবার ধনঞ্জয়বাবুদের তৈরী ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী কমিটি অল বেঙ্গল রিলিফেও আছেন। কিন্তু এর জন্য দুপক্ষের কেউ হিতেনবাবুর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয় না। কোন কমিটিতে, কোন পার্টিতে ও কোন সঙ্ঘে তাঁর উচ্চাসন অবশ্য নেই। সবার মধ্যে একটা স্থান পেলেই তিনি ধন্য। তাঁর মতবাদ কি, এই প্রশ্নও বড় কেউ তাঁকে করে না। করলেও তিনি উত্তর দিতে পারবেন না, কারণ মতবাদ না থাকাটাই তাঁর আদর্শ।

ভদ্রাদের বাড়িটাকে বড় ভাল লাগে সোমার। মনে হয়, সমস্ত পৃথিবীতে বোধ হয় এই রকম একটিমাত্র বাড়ি আছে, যেখানে মনে-প্রাণে কথায় চিন্তায়, ধমক অনুরোধ অভিযোগ আর নিন্দেয়, কঠোরতা ও রূঢ়তা বলে কিছু নেই। ভদ্রাদের সংসার ও স্বার্থ যেন ধূপের ধোঁয়ার মত হালকা হয়ে সব কঠিনতার ঊর্ধ্বে ভাসছে, কারও সঙ্গে সংঘাত লাগে না, না কারও কাছ থেকে আঘাত পায়। অভাব থাকলেই বা কি, সেটা এত নীরব যে আছে কি না বোঝা যায় না। আর বাড়ি গাড়ি ও বড় হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকলেই বা কি, তার জন্যে কোন উচ্চবাচ্য নেই। এরা যেমন আছে, বেশ আছে, এটাই বড় সত্য।

সোমার মনের গোপনে একটা চিন্তা মাঝে মাঝে প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে। যদি তার নিজের বাড়িটা ভদ্রাদের বাড়ির মতই হতো। ঠিক এই ধরনের, এর চেয়ে বেশী কিছু নয়। এর চেয়ে বেশী শান্তি নয়, এর চেয়ে বেশী হাসিও নয়।

কিন্তু তা হবার নয়। অনেক পার্থক্য। ভদ্রা এখনও পরীক্ষার পড়া পড়ছে, আর সোমা টাকার অভাবে পড়াই ছেড়ে দিয়েছে। ভদ্রার বাবা সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে ছাদে বসে গান করেন। আর সোমার বাবার ফটোটা শুধু জীর্ণ ফ্রেমে বন্দী হয়ে ঘরের দেয়ালে ঝুলছে, বাবাকে শুধু মনে পড়ে সোমার। অনেক তফাত। ভদ্রা আর কদিন পরে পাস করবে, তারপর হয়তো একটি শঙ্খঘণ্টামুখরিত উৎসবের পর স্বামীর ঘরে এমনি হাসিমুখে চলে যাবে। আর সোমাকে খুঁজতে হবে চাকরি, চক্রবেড়ের এক গলির কোণে একটা একঘরে বাসার প্রাণ আর সম্ভ্রম বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই।

"সুমি মা, অবুঝ হয়ো না। স্বদেশী চাকরির জন্যে ঘরছাড়া হয়ে এত দূরে থাকতে নেই। ফিরে এসো, চেষ্টা করলে কলকাতাতেই একটা না একটা স্বদেশী চাকরি পাওয়া যাবে...।"

স্বদেশী চাকরি আবার কি জিনিস? অর্থাৎ এই চাকরিতে দেশসেবা আছে, আবার মাইনেও আছে।

সোমা দুদিনের জন্যে কলকাতাতেই একটা যুদ্ধমার্কা স্টোরের অফিসে কাজ করেছিল। আর অফিসে যায়নি। ভদ্রা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—কাজটা ছেড়ে দিলি নাকি? আর অফিসে যাবি না?

সোমা বলে—না।

ভদ্রা—কেন?

সোমা—এসব অফিসে যাওয়া সোজা, ফিরে আসা ফ্যাসাদ।

ভদ্রা—তার মানে?

সোমা হেসে ফেলে—অফিসের গেটের বাইরে চিতেবাঘের মত এক একটা মোটর ওৎ পেতে থাকে, আর দেখতে পেলেই তেড়ে আসে।

ভদ্রা—কেন?

সোমা—গিলে খেতে।

ভদ্রা—কি ছাই বলিস, কোন মানে হয় না।

সোমা—যেচে লিফট দিতে আসে।

ভদ্রা লজ্জায় জিভ কাটে—কে ভাই?

সোমা—কে নয় ভাই, তাই বল? সুট-পরা, পাইপ-মুখো, পান-খেকো, বাঙালী, অবাঙালী...।

সমস্যাটা এতক্ষণে বোধ হয় ভদ্রার বোধগম্য হয়। কিছুক্ষণ অপ্রস্তুতের মত চুপ করে ভাবে, তার পরেই একটু ভয়ার্ত স্বরে বলে—কখখনো যাসনি সোমা।

যুদ্ধমার্কা অফিসের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক। একটা দেশী মার্চেন্ট অফিসে চাকরির জন্যে একবার ইন্টারভিউ দেবার সৌভাগ্য হয়েছিল সোমার।

নানা কথার পর অফিসের ম্যানেজার প্রশ্ন করেছিলেন—আপনি গান গাইতে পারেন?

এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই চলে এসেছিল সোমা। দু'একটা ঝাঁঝালো উত্তর মনে এলেও মুখে আনতে পারেনি। সোমার মত মেয়েদের পক্ষে এটাই তো সবচেয়ে বড় বাধা। জীবন খোঁজে ভদ্রতা, কিন্তু জীবন নির্ভর করে চাকরির ওপর, আর চাকরি হলো অভদ্রতার জঞ্জালে ভরা জীবন।

অথচ চাকরি না করলেও চলবে না। সোমার সেজকাকা হাজিপুরের কন্ট্রাক্টর, এতদিন তাঁরই চল্লিশটি টাকা মূল্যের দয়া প্রতি মাসে মনিঅর্ডারযোগে নিয়মিত এসেছে, তবেই চক্রবেড়ের গলির একটা একঘরে বাসায় চারটে অসহায় নারী-প্রাণের আয়ু রক্ষা পেয়েছে। চারটে নিরুপায় প্রাণ—সোমা, সোমার মা, সোমার দুটি বোন চুনি ও পান্না।

সোমা যদি মায়ের বড় মেয়ে না হয়ে বড় ছেলে হতো! সোমার মা প্রায়ই দুঃখ করে এই কথাটা বলেন। যা নেই, তাকে কল্পনায় সত্য করে নিয়ে, আর যা রয়েছে তাকে দুঃখের অভিমানে একেবারে মিথ্যে করে দিয়ে সোমার মা একটি বড়ছেলের অভাব মর্মে মর্মে অনুভব করেন। বাইশ বছর বয়স হয়েছে মেয়ের, লেখাপড়াও কিছু শিখেছে, কিন্তু সোমা যেন মাঝে মাঝে মায়ের দৈন্যগ্রস্ত মনের ক্ষোভে ও অভিমানে ছিন্নভিন্ন হয়ে মিথ্যে হয়ে যায়।

কোন্ এক দার্শনিক বলেছেন, মেয়েদের আত্মা নেই। মা'র মুখে বড়ছেলে থিওরির আদর দেখে সোমা দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকে। জোর করে চোখ দুটোকে ঝাপসা হতে দেয় না। মনে হয়, দার্শনিক সত্যি কথাই বলেছেন।

সোমা একটু পরেই শান্তভাবে মাকে অনুরোধ করে—তুমি রাগ করছো কেন মা! ধরে নাও না, আমি তোমার বড়ছেলে।

সোমার মা মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভেবে একেবারে চুপ করে যান।

আজ সোমা কিন্তু মা'র ইচ্ছা পূর্ণ করেছে। সত্যি সত্যি সব মায়ের বড়ছেলের মত চাকরি নিয়ে বাইরে চলে গেছে। তবু আজ মাঝরাতের চক্রবেড়ের গলিতে একটি মেয়ের মায়ের আত্মা জেগে বসে থাকে, ঘুমোতে পারে না। বার বার এক কথাই চিঠিতে লেখেন—"সুমি, চলে এসো...।"

দেয়ালে জীর্ণ ফ্রেমে বন্দী সোমার বাবার ফটো। একটা টিকটিকি সোমার বাবার কাঁধের ওপর চুপ করে বসে থাকে। দীপালোকের প্রতিবিম্ব ফটোর কাঁচের ওপর কখনো স্থির হয়ে থাকে, কখনো কাঁপে, কখনো ছটফট করে। কিন্তু সোমার বাবা চিরকালের মত নিস্পন্দ, মরণসাগরের ওপার থেকে চুপে চুপে দেখছেন, একটা অসহায় দৃষ্টি, কিছু বলবার নেই, কিছু করবার নেই।

সোমার মা আর এক ছত্র লেখেন—"সুমি, তোমার বাবা বেঁচে থাকলে সে কি তোমাকে এভাবে বাইরে চাকরি করতে ছেড়ে দিত? আমিই বা দেব কেন? পত্রপাঠ চলে এসো...।"

পিতৃহীনা মেয়েকে মা আজ যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন—হলামই বা মা, বাপের কাছে তুমি যে-আদরের মেয়ে হয়ে ছিলে, আমার কাছেও তাই হয়ে থাকবে। কটা টাকার জন্যে সংসারের নিয়মকে ওলটপালট করে দিতে পারবো না। তুমি চলে এসো।

কিন্তু সোমা কি সত্যিই ফিরে আসতে পারে? আর এলেও কি মা'র এই মাঝরাতের

স্নেহবিধুর প্রতিশ্রুতি প্রতিদিনের দৈন্যের আঘাতে এক সপ্তাহও অটুট থাকতে পারবে?

তা হয় না। সোমা সেটা মর্মে মর্মে জানে বলেই চলে গেছে, ভদ্রার মত বা চারুর মত বাড়ির বড় মেয়ে হয়ে ঘরে বসে থাকার নিয়ম সোমার জীবনে সাজে না। কারণ হাজিপুরের কন্ট্রাক্টর সেজকাকার দয়া ক্রমশ সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। যুদ্ধটা যেমন বাড়ছে, সেজকাকার কন্ট্রাক্টের বড় বড় টেণ্ডার তত বেশী মঞ্জুর হচ্ছে, আর তাঁর মোটর গাড়ির সংখ্যাও বেড়ে উঠছে সেই অনুপাতে। কিন্তু কি আশ্চর্য, সোমাদের জন্য সেজকাকার মাসিক দয়ার বরাদ্দ ঠিক সেই অনুপাতে দিন দিন কমে আসছে। চল্লিশ থেকে ত্রিশ, তারপর পঁচিশ। ও মাসে এসেছিল কুড়ি আর এই মাসে মাত্র পনর টাকা।

সেজকাকা তো আগে এরকম ছিলেন না। বরং আগে যখন তাঁর উপার্জন সত্যি করেই কম ছিল, যখন তাঁকে নিজেরই সংসারের জন্য দেনা করে দিন চালাতে হয়েছে, তখন টাকা পাঠাতেন আজকের চেয়ে বেশী। চিঠি দিয়ে খোঁজখবরও নিতেন বেশী। সোমার বিয়ের জন্য ভাবনার কথাও মাঝে মাঝে জানাতেন। দূরে থাকলেও নিজের অভাব দিয়ে যেন অসহায় বড় বৌঠান ও তাঁর তিনটি মেয়ের বিষণ্ণ মুখের ছবিটা হৃদয় দিয়ে ধরতে পারতেন। আজ যুদ্ধের কৃপায় আকস্মিক প্রাচুর্যে তিনি ঊর্ধ্বলোকে উঠে গেছেন। আকাশকুসুম হয়ে গেলে ঘাসের ফুলকে আর আপন বলে চিনতে পারা যায় না, ব্যাপারটা তাই। হঠাৎলব্ধ টাকার থলির আভিজাত্যে এখন আর পরলোকগত বড়দার দুঃখী পরিবারকে নিজের জাত বলে ভাবতে পারা যাচ্ছে না। ভাবতে কেমন কুণ্ঠা হয়। যেন একটা অপয়া সংস্পর্শ, সম্পর্ক রাখতেই ভয় করে, হঠাৎ হয়তো পিছু ডেকে যে-কোন মুহূর্তে সেজকাকাকে তাঁর কাঞ্চনাকীর্ণ ঊর্ধ্বলোকের পথ থেকে টেনে নীচে নামিয়ে দেবে।

সেজকাকা শেষবারের মত একটা চরম উপকারের প্রস্তাব করে চিঠি লিখেছেন। তিনি আর সাহায্য করতে অসমর্থ। তবে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন। অর্থাৎ সোমার বিয়ে দেবার দায়িত্ব তিনি ভুলতে পারেননি। তিনি একটি পাত্রও স্থির করেছেন, এক পাঞ্জাবী হিন্দু ভদ্রলোক, বেশ বড় কনট্রাক্টর, বাংলা ভাষায় মোটামুটি রকমের কথাও বলতে পারেন। সুতরাং, সোমার যা চেহারা আর যা গুণ, তাতে এর চেয়ে ভাল পাত্র স্বপ্নেও আশা করা যায় না। সেজকাকা বলেছেন, এটা তাঁর খামখেয়াল নয়, তিনি অনেক দূর পর্যন্ত ভেবে নিয়ে এই পাত্রকেই পছন্দ করেছেন। এতে শুধু সোমারই সৌভাগ্য খুলে যাবে তা নয়, সৌভাগ্যবতী সোমা দু হাতে পয়সা ছড়িয়ে তার মা ও দুটি বোনকেও সব দিক দিয়ে সুখে রাখতে পারবে।

চিঠি পেয়ে সোমার মা কেঁদেছেন--তোর সেজকা শেষ পর্যন্ত আমাদের জাতটাও ভুলে গেছে রে সোমা?

সোমা কোন কথাই বলে না, কোন মন্তব্য সমালোচনা আপত্তি কিছুই না। কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকে। তার পরেই উঠে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ায়।

মা বলেন--কোথাও বেরুচ্ছিস নাকি?

সোমা উত্তর দেয়--হ্যাঁ, ভদ্রাদের বাড়ি একবার ঘুরে আসি।

মা বলেন--যাচ্ছিস যদি, শাড়িটা বদলে রঙীন একটা পরে নে।

রঙীন শাড়ি আছেও হয়ত দু'একটা। কিন্তু সোমাও অনেকদিন হলো রঙীন শাড়ি পরা ছেড়েই দিয়েছে। মা অনেকবার রাগ করে বলেছেন--এটা কী একটা মতিচ্ছন্ন। ভদ্রলোকের মেয়ে না যোগিনী?

সোমা তবু সাদা প্লেন শাড়িই পরে। কালো পাড় না হোক নীল পাড়। মা'র অনুযোগ গ্রাহ্য করে না।

চুনি হঠাৎ কাছে এগিয়ে এসে বলে--দিদিভাই দাঁড়াও, একটা টিপ পরিয়ে দি।

সোমা ধমক দেবার জন্যে তাকায়। চুনি কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে বলে--খয়েরের টিপ,

কালো মেয়েদের খুব ভাল দেখায়।

চুনি একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে সোমার কপালে ধীরে ধীরে খয়েরের টিপ এঁকে দিতে থাকে ; সোমা আর রূঢ় হয়ে চুনিকে বাধা দিতে পারে না। কিন্তু ঘরের বাইরে বেরিয়েই আঁচল দিয়ে টিপটা মুছে ফেলে।

ভদ্রাদের বাড়ি। ঘরে ঢুকতেই ভদ্রার বাবা হিতেনবাবু ছেলেমানুষের মত উল্লাসে চিৎকার করে অভ্যর্থনা জানান—আসুন সোমা রায়!

সোমা খিল খিল করে হেসে ওঠে—এরকম বিরক্ত করলে আমি কিন্তু আর আসবো না কাকাবাবু।

এই তো একটা পরের বাড়ি, আর হিতেনবাবুও সোমার সত্যিই কাকাবাবু নন। কিন্তু এখানে প্রবেশ করা মাত্র একটি আহ্বানের আদরে গলে গিয়ে সোমা যেন ছোট্ট মেয়েটির মত হয়ে যায়। মনের ভেতর যত অভিমানের গুমোট যেন একটি খোলা হাওয়ার পুলকে মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়।

ভদ্রা পড়া ছেড়ে দিয়ে গল্প করতে বসে। সোমার কপালের দিকে সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে দুষ্টুমিভরা হাসি হাসে—টিপ পরা হয়েছিল বুঝি?

সোমা অপ্রতিভ হয়ে কপালটা আঁচল দিয়ে ভাল করে ঘষতে ঘষতে বলে—চুনিটা পরিয়ে দিয়েছিল।

ভদ্রা—মুছে ফেললি কেন?

সোমা—রাখ, যে না রূপের ছিরি!

পাশের ঘর থেকে ভদ্রার মা কথাটা শুনতে পেয়েছেন। পান সাজার কাজ ফেলে দিয়ে হাসতে হাসতে প্রায় দৌড়ে এসে সোমার সামনে দাঁড়ান।—আমি সব শুনতে পেয়েছি মেয়ে।

হিতেনবাবুও যেন নাটকীয় আবির্ভাবের মত হঠাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান—কি হয়েছে, আমিও শুনতে চাই।

ভদ্রার মা চেঁচিয়ে বলেন—সোমা আর ভদ্রার মধ্যে তফাত কি জান?

হিতেনবাবু বলেন—জানি, ভদ্রা হলো আমার মেয়ে আর সোমা হলো তারকদার মেয়ে।

ভদ্রার মা বলেন—না। সোমার যা রূপ, নিজেকে তার চেয়ে কুৎসিত বলেই ও মনে করে। আর ভদ্রার যা ছিরি, ও তার চেয়ে দুগুণ রূপসী বলে নিজেকে মনে করে।

হিতেনবাবু আর ভদ্রার মা মেয়েদের সামনেই উচ্চ হাসির রোল তুলে যেন আত্মহারা হয়ে যান। এই বাড়িতে গুরুজন লঘুজন বলে কোন পার্থক্য বোঝা যায় না। বাপ মা ছেলে সবাই যেন একটা খেলার সাথীর দল।

ভদ্রা আর সোমা দুজনে নীচের তলায় নেমে যায়। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শোনে, হিতেনবাবু আর ভদ্রার মা তখনো খুশির আবেগে হেসেই যাচ্ছেন।

কিছুক্ষণ পরেই সোমা নীচতলা থেকে আবার ওপরে উঠে হিতেনবাবুর কাছে এসে দাঁড়ায়। মাথা নিচু করে, ঢোক গিলে খুব আস্তে আস্তে যেন ধরা গলায় বলে—কাকাবাবু!

হিতেনবাবু জিজ্ঞাসুভাবে বলেন—কি মা?

সোমা—একটা চাকরি।

ঘরের বাতাসে ফুর্তির চাঞ্চল্য কয়েক মুহূর্তের মত স্তব্ধ হয়ে যায়। এই ধীর শান্ত ও অস্পষ্ট উচ্চারিত অনুরোধের এক মুহূর্ত আগেও হিতেনবাবুর চোখ দুটোতে হাসির ছটা লেগে ছিল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সেই চোখ একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে আসে। হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ কাঁটা বিঁধে যেন তাঁর সব খেলার আনন্দ নিঃশেষ করে দিয়েছে।

পাশের ঘর থেকে এই কথাটাও শুনতে পেয়েছেন ভদ্রার মা। আর ব্যস্ত হয়ে নয়, শান্তভাবে আস্তে আস্তে এসে ঘরে ঢুকলেন। সোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন—তুই

এখন ভদ্রার কাছে গিয়েই গল্পসল্প কর সোমা, যা।

সোমা আবার ঘর ছেড়ে নীচের তলায় চলে যায়।

বুঝতে কিছু বাকি নেই হিতেনবাবুর। সোমার অনুরোধের ভাষায় যতটুকু বোঝা যায়, তার চেয়ে ঢের বেশী বোঝা যায় ওর অভাষিত অনুরোধের মধ্যে এবং সেটুকু উপলব্ধি করার মত হৃদয়ের শক্তি তাঁর আছে। কিন্তু এই অনুরোধ বড় কঠিন। উপেক্ষা করা যায় না, কারণ সোমা কেন চাকরি চায় তা তিনি জানেন। আর অনুরোধ রক্ষা করতে পারলেই কি তিনি সুখী হবেন? হিতেনবাবু ভাবেন, আজ যদি তাঁর মেয়ে ভদ্রাকে চাকরি করতে হতো? ভদ্রার বেলায় যেটা নির্মম বলে মনে হয়, সোমার বেলায় তারই ব্যবস্থা করে দিতে হবে?

ভদ্রার মা সমস্যাটাকে একটু সহজ করে দেন--ওসব কথা চিন্তা করে লাভ নেই। মায়া দিয়ে এসব জিনিস বিচার করা যায় না। বাঁচতে হলে সোমাকে চাকরি করতেই হবে। আর কোন উপায় নেই।

হিতেনবাবুও জানেন, কথাটা একশো বার সত্যি। একটা পরিবার, তার সবাই হলো মেয়ে। দেশের আইন এদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে দায়ী নয়, ওরা না খেয়ে মরে গেলে দেশের শাস্ত্র কাউকে শাস্তি দেবে না, কোন প্রতিবেশীরও জরিমানা হবে না। ওরা যেন শুধু তারকদারই জিনিস ছিল, পৃথিবীর নয়। তারকদা মারা গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে ওরাও ফালতু হয়ে দুনিয়ার মায়ার বাইরে চলে গেছে।

হিতেনবাবু নিজে কিছু যে আর্থিক সাহায্য করতে পারেন না তা নয়, কিন্তু এই বিষয়ে হিতেনবাবু আর ভদ্রার মা দুজনেই একমত—না, ওভাবে সাহায্য করে ওদের ছোট করে দেওয়া উচিত নয়। সোমা মেয়েটাও একটু অহংকারী ও অভিমানী ; আজকালকার দিনে তাই হওয়া ভাল।

আবার যে-কোন রকমের চাকরিই যে সোমা সইতে পারবে তাও সত্যি নয়। হিতেনবাবুর কাছে অজানা নেই, কেন সোমা কলকাতার কয়েকটা অফিসে চাকরি পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে।

শুধু তাই নয়। হিতেনবাবু ভাবতে দুঃখ বোধ করেন, মা-বোনের মুখের অন্ন যোগাতে গিয়ে মেয়েটার জীবনে হয়তো চাকরিই শুধু সর্বস্ব হয়ে থাকবে, গোধূলি বেলার আলো কখনো দেখা দেবে কিনা কে জানে। এখন তো শুধু ধুলোই দেখা যায়। কিন্তু অন্নোপার্জন ছাড়া আর দুটো ভাল সাধ সাধনা বা আদর্শ ওর জীবনে কি অপ্রাপ্য হয়েই থাকবে? সোমা কি শুধু চাকরি করারই যোগ্য? হিতেনবাবু নিজেই স্বকর্ণে শুনেছেন, মেয়েটা কী গভীর শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সঙ্গে ভদ্রাকে সিস্টার নিবেদিতার জীবনী পড়ে পড়ে শোনায়। গত বছরেও স্বাধীনতা দিবসে এই বাড়ির ছাদের ওপরে জাতীয় পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে মন্ত্রপড়ার মত নিষ্ঠার সঙ্গে সংকল্পবাক্য পাঠ করেছে। তাই, শুধু যে-কোন একটা চাকরি হলেই চলবে না। সোমার মত মেয়েকে মানায়, এমন একটি মনোমত ও রুচিসঙ্গত চাকরি চাই।

সোমাও জানে, ওর ভবিষ্যতের পথ দূরপ্রসারিত নয়। সে পথের বাঁকও নেই, উত্থানও নেই। শুধু একটা চাকরি ধরার মত যতটুকু এগিয়ে যাওয়া দরকার, এই পথের সীমা ততটুকুই। কিন্তু মনের গোপনে ইচ্ছাগুলি কোন বাঁধন যে স্বীকার করতে চায় না। তাই নিজের হাতে আঁকা গান্ধীজীর ছবিটাকে প্রতি সপ্তাহে একটা ফুলের মালা দিয়ে সাজায়। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিদিবসে ঘরে বসেই চুনি আর পান্নাকে গান গেয়ে শোনায়—জীবন যখন শুকায়ে যাবে, করুণাধারায় এস। বড় ইচ্ছে করে, এই বৈশাখী মধ্যাহ্নে একবার কবির আশ্রমে তরুবীথিকার গাছের ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে আসতে।

সাধ আর শখগুলি তো হিসেব করে আসে না। আরও কত কি ইচ্ছে হয়। কবিতা

লিখতে ইচ্ছে করে। যমুনার নীল জলের ধারে সাদা তাজমহলের রূপ স্বচক্ষে দেখতে ইচ্ছে করে বৈকি। গ্রামোপান্তে এক নির্জন শুক্লা রাতে, জলটলমল কালিদীঘির কিনারা দিয়ে মাত্র একটি সঙ্গীর হাত ধরে নীরবে বেড়িয়ে আসতে। হঠাৎ লজ্জা পায় সোমা। বেশী কল্পনা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা ইচ্ছের কাছে হাতে হাতে ধরা পড়ে যায় সোমা।

"সুমি, চাকরি করা তোমার মত মেয়ের শোভা পায় না। তোমার সেজকাকা টাকা না দিক, আমি ভিক্ষে করে টাকা যোগাড় করবো আর তোমার বিয়ে দেব। কটা টাকার জন্যে মেয়েকে চিরকাল আইবুড়ো রেখে আমি পাপের ভাগী হতে চাই না...।"

মনের ভেতর পুঞ্জীভূত যত অসম্ভবের সাধগুলিকে যেন লিখে লিখে সার্থক করছিলেন সোমার মা। চক্রবেড়ের মাঝরাত্রি অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। চারুর আর্তনাদ আর শোনা যায় না, বোধহয় এতক্ষণে শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। পান্না একবার জেগে উঠে জল খায়। দুহাত দিয়ে চোখ ঘষে নিয়ে একটু অবাক হয়ে মা'র চিঠি লেখার কাণ্ড দেখে।—দিদিকে লিখে দাও, হয় চলে আসুক, নয় আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাক। ঘুমন্ত স্বরেই কথাগুলি শেষ করে পান্না আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

শেষ পর্যন্ত হিতেনবাবু চাকরিটা যোগাড় করেই ছাড়লেন। ভদ্রার মা বললেন—এটা ঠিক চাকরি নয় সোমা, তোর ভালই লাগবে, তবে একটু শক্ত হতে হবে।

সোমা হেসে ফেলে—যা বলবেন তাই হবে। শক্ত বলুন, দজ্জাল বলুন, মুখরা বলুন, চাকরি করার জন্যে যে যে গুণ চাই, আমি সব তৈরি করে নেব।

ভদ্রার মা—বল্ রাজী আছিস?

সোমা—কাজটা কি?

ভদ্রার মা—একটা চিলড্রেনস হোমের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

সোমা বিস্মিত হয়—সে কি কাকিমা? নামটা শুনেই যে ভয় করছে। এত বড় চাকরি আমার জন্যে কেন?

ভদ্রার মা—বড় চাকরি নয়, কিন্তু কাজটা ভাল। তবুও কেউ এসব কাজে যেতে চায় না।

সোমা—কেন?

ভদ্রার মা—অজ পাড়াগাঁ বলে। কিন্তু উনি বললেন...।

সোমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভদ্রার মা হঠাৎ থেমে যান। সোমা হেঁটমুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা ধীরে ধীরে বড় বিষণ্ণ ও গম্ভীর হয়ে উঠছে। মনের ভেতর একটা আহত অভিমানের চঞ্চলতাকে অতি কষ্টে সংযত করছে সোমা। মনটা যেন একটা আঘাতে ছোট হয়ে গেছে সোমার। তার জীবনে কি এই পরিণামটুকুই অবধারিত হয়েছিল? অজ পাড়াগাঁ, যে কাজে কেউ যেতে চায় না, সেই সর্বলোকের অবহেলিত স্থান তারই জন্যে নির্দিষ্ট? কাকাবাবুর মমতা এর চেয়ে বেশী কিছু যোগাড় করে দিতে অসমর্থ। বেশ, তাই হোক।

সোমা বলে—কবে যেতে হবে?

ভদ্রার মা—বেশী দেরি না করে একটা ভাল দিন দেখে রওনা হয়ে যা। উনি কমিটির প্রেসিডেণ্ট নয়নবাবুকে চিঠি দিয়ে দেবেন।

সোমা রওনা হয়ে গেছে আজ তিনদিন হলো। চক্রবেড়ের গলির কোণে একঘরে বাসার প্রদীপের তেল পুড়ে পুড়ে এতক্ষণে শেষ হয়ে এসেছে।

"সুমি, আশা করি আমার কথার অবাধ্য হয়ে আমার মনে মিছিমিছি কষ্ট দেবে না। পত্রপাঠ চলে এস...।"

সোমার মা যখন চিঠি লেখা শেষ করেছেন, তখন চক্রবেড়ের গলি থেকে একশো মাইল দূরে ঘুটঘুটে কালো অন্ধকারে আচ্ছন্ন এক নিস্তব্ধ গ্রাম্য স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে ঘাসে

ঢাকা ঠাণ্ডা মাটির উপর সোমা দাঁড়ায়। চার দিকে তাকিয়ে কিছু দেখা যায় না। একটা দৃশ্যহীন বর্ণহীন শব্দহীন পৃথিবী। শুধু মাথার উপর এক ঝাঁক কুচি কুচি তারার মধ্যে একটা খুব বড় খুব রকমের তারা দেখা যায়। ওটারই নাম বোধ হয় ব্রহ্মহৃদয়।

এই অন্ধ ও বধির পৃথিবীর গায়ে যেন সাড়া লাগে। একটা লণ্ঠনের আলোক আলেয়ার মত ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। সোমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়ে হঠাৎ শিউরে ওঠে। আলোটাকে রক্তময় ক্ষতের মতন মনে হয়। শব্দও শোনা যায়, কিন্তু মানুষের কলরবের মত নয়। কতগুলি ছায়াময় জীব নিজের ভাষায় কথা বলতে বলতে আসছে। নয়নবাবু বলেছেন, স্টেশনে লোক থাকবে। কিন্তু যারা আসছে, তারা কি সত্যিই কতগুলি লোক?

তবু সত্যিই কতগুলি লোক এসে সোমার সামনে দাঁড়ায। নিঃসন্দেহ হয়ে সোমা আরও ভাল করে দেখে ও আশ্বস্ত হয়। হ্যাঁ নয়নবাবুর কথা মতো স্টেশন থেকে তাকে নিয়ে যাবার জন্যে লোক উপস্থিত হয়েছে। তবে গ্রামের লোক।

একজন বৃদ্ধ, একজন যুবক আর চারটি অল্প বয়সের ছেলে। বৃদ্ধের হাতে একটা ছোট লাঠি, যুবকের হাতে লণ্ঠন, ছেলেদের হাতে কিছু নেই। ছেলেরাই সোমার জিনিসপত্রগুলি একে একে মাথায় তুলে নিয়ে দাঁড়ায়।

গ্রাম্য যুবকটি বলে—আমরা কাঞ্চীপুর থেকে আসছি। আজ সকালেই নয়নবাবুর চিঠিতে জানলাম, আপনি আসছেন।

সোমা—কাঞ্চীপুর কতদূর?

যুবক—তিন ক্রোশ।

সোমা—সর্বনাশ!

বৃদ্ধ উৎসাহিতভাবে বলে—কিছু ভাববেন না, আপনাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাব না। গাড়ি আছে, গরুগুলোও মজবুত আছে। ভোর হতে হতে আপনাকে পৌঁছে দেব।

সোমা নিরুৎসাহ হয়ে বলে—রাত্রিটা স্টেশনে থাকলে ভালো হতো না? এই অন্ধকারের মধ্যে......।

যুবক বলে—দিনের বেলা রোদের মধ্যে এতটা পথ যেতে আপনার কষ্ট হবে। রাত্রির মধ্যেই ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় চলে যাওয়া ভাল।

সোমা বলে—চল।

কোমর পর্যন্ত উঁচু ঘন ঘাসবনের মাঝখান দিয়ে একটা সরু আঁকাবাঁকা পথ। ছেলেগুলো জিনিসপত্র নিয়ে তুড়তুড় করে এগিয়ে হেঁটে চলে গেল, ওরা বোধ হয় সজারুর মত অন্ধকারেই ভাল দেখতে পায়। ক্ষুদ্র লণ্ঠনের আলোয় যেন বন্দী হয়ে সোমা ভয়ে ভয়ে ও ধীরে ধীরে হাঁটে, হোঁচট খায়, চোরকাঁটায় শাড়িটা কণ্টকিত হয়ে ওঠে।

যুবক বলে—আপনি আস্তে আস্তে চলুন।

সোমা বলে—আর কতদুর?

যুবক—কি? কাঞ্চীপুর?

সোমা—কাঞ্চীপুর তো তিন ক্রোশ শুনেই রেখেছি। গরুর গাড়িটা কত দূর?

বৃদ্ধ যেন অপরাধীর মতো একটু কুণ্ঠিত স্বরে জবাব দেয়—হোই যে পাকুড়তলায়, এসে পড়েছি। আর একটু কষ্ট করে নিন।

আর কষ্ট। সোমা মনে মনে হেসে যেন তার নিয়তির এই অদ্ভুত ষড়যন্ত্রকে ধিক্কার দেয়। তার কষ্টের মূল্যই বা কি? কে-ই বা তার খোঁজ রাখে? আর তার জন্য সমবেদনা শুনতে হবে এইখানে এসে? এই সব লোকের মুখে? সোমার কষ্টে সান্ত্বনা দেবার জন্য পৃথিবীতে আর কোন স্থান ছিল না। বেছে বেছে, খুঁজে খুঁজে, সব সুখ সখ যত্ন আর আদরের রঙিন জগৎ থেকে দূর হয়ে এই অন্ধকার আর চোরকাঁটায় ভরা জগতে এসে তাকে সান্ত্বনা মেনে

নিতে হবে। পোড়া কপাল আর কাকে বলে।

পাকুড়তলায় এসে শ্রান্তভাবে সোমা দাঁড়ায়। বৃদ্ধ গাড়ি হাঁকাবার জন্য উঠে বসে। যুবক বলে—গাড়ি চড়ে গেলেও আপনার খুব কষ্ট হবে। কাঁচা সড়ক, তার ওপর খানা গর্ত আছে, একটু ঝাঁকুনি ভুগতেই হবে।

আবার সমবেদনা। সোমা যুবকটির দিকে তাকায়, লণ্ঠনের আবছা আলোতে মুখটা স্পষ্ট দেখা যায় না। কিন্তু পরিচ্ছদটা স্পষ্ট হয়েই চোখে পড়ে। একটা খদ্দরের ফতুয়া গায়, আর খদ্দরের ধুতি, গেঁয়ো মানুষের রুচি অনুযায়ী হাঁটু পর্যন্ত বহর। কিন্তু ফতুয়ার বোতামে বাঁধা একটা চেন ঝুলছে দেখা যায়, বোধ হয় পকেটে ঘড়ি আছে।

সোমা মনে মনে একটা সংকোচের বিপদে জড়িয়ে পড়ে। লোকটা ভদ্রলোক নয় তো! এতক্ষণ যুবকের সঙ্গে তুমি তুমি করেই কথা বলে এসেছে সোমা। এখন হঠাৎ আপনি করে বললেই বা কেমন শোনাবে, আর তুমিই বা কি করে বলা যায়? পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেও ইচ্ছে করে না।

বেশী চিন্তা করার সময় ছিল না। ছেলেরা এরই মধ্যে এসে গরুর গাড়ির ভিতর একটা কম্বল পেতে রেখেছে, কিন্তু সোমা গাড়ির ভিতরটা উঁকি দিয়ে দেখেই অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। বেশ একটু রূঢ়ভাবেই বলে—এইটুকু একটা গাড়ি, তার মধ্যে ঐ সামান্য জায়গা। এতগুলো লোক আর জিনিসপত্র ঢুকলে দম বন্ধ হয়ে মারা যাব যে!

যুবক বলে—গাড়ির ভেতর তো কেউ যাবে না। শুধু আপনি যাবেন।

সোমা—আমার জিনিসপত্র?

যুবক—আমরাই হাতে হাতে নিয়ে যাব।

সোমা তাকিয়ে দেখে, ছেলেরা সত্যি সত্যিই জিনিসপত্রগুলি মাথায় আর হাতে তুলে নিয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি ছেলে, বছর দশেক বয়স হবে, সেও সোমার স্টোভের বাক্সটা মাথায় নিয়ে কৃতার্থের মত দাঁড়িয়ে আছে।

ছোট ছেলেটির দিকে তাকিয়ে সোমা আবার প্রশ্ন করে—এও হেঁটে যাবে নাকি?

যুবক উত্তর দেয়—হ্যাঁ নিশ্চয়, সবাই হেঁটে যাবে।

মনের হঠাৎ বিরক্তি ও অপ্রসন্নতার জন্য লজ্জিত হয় সোমা। সবাই হেঁটে যাবে, ঐ ছোট ছেলেটিও। শুধু সোমাকেই অসাধারণের অভ্যর্থনা দিয়ে সযত্নে নিয়ে যাবার জন্যে এরা নিঃশব্দে তৈরী হয়ে আছে। অন্ধকার একটু বেশী বলেই এই নীরব ও অপরিচিত পৃথিবীর মনটা বুঝতে ভুল করেছিল সোমা।

সোমা কোন কথা বলে না। কথা বলার মত আর কিছু খুঁজেও পায় না। একবার ইচ্ছে হয়, ছোট ছেলেটিকে গাড়ির ভিতর আসতে বলে। কিন্তু চেষ্টা করেও বলতে পারে না। নতুন করে এই একটুকরো ভদ্রতার দরদ দেখাতে গিয়ে হয়তো তার হঠাৎ-ভুলের অভদ্রতা আরও বড় হয়ে ধরা পড়ে যাবে। সোমা গাড়ির ভিতর গিয়ে বসে।

লণ্ঠনের আলোটা আবার আলেয়ার মত এগিয়ে দূরে চলে যায়। পিছনে গরুর গাড়ি চলতে থাকে হেলেদুলে কঁকিয়ে, অন্ধকারের মধ্যে মাথা খুঁড়ে, কখনো বা ছটফট করে।

একটা ঘন বাবলা বনের ভিতর দিয়ে গাড়িটা কিছুটা পথ চলে যায়। গাড়ির ছই কাঁটার আঁচড়ে সশব্দে চিরে চিরে আর্তনাদ করে। হঠাৎ একটা ঢালু ধরে উল্লাসে দৌড়তে থাকে। তারপরেই মন্থর হয়ে জলকাদায় ভরা একটা খানা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে পার হয়।

সোমার দৃষ্টির সম্মুখে কোন পথই ঠাহর হয় না। একটা শ্রান্ত অভিমানের মূর্তির মত নীরবে বসে থাকে। দূরে দেখা যায়—বিরাট একটা জোনাকীর দুর্গ। লক্ষ লক্ষ ভূলুণ্ঠিত নক্ষত্রসন্তান যেন আকাশচ্যুত হয়ে মাটির উপর সংসার রচনা করেছে। আর একটু এগিয়ে গেলেই বোঝা যায়, ওটা একটা আম বাগান।

চোখ বন্ধ করে নিজের মনের ভিতর তাকিয়ে সোমা আজ বুঝতে পারে, সে সত্যিই চাকরি করার টানে এখানে আসেনি। দেশসেবার আগ্রহেও নয়। সব দিক দিয়ে তার মুক্তির পথ অবরুদ্ধ ছিল, তাই স্বেচ্ছায় নিজেকে নির্বাসিত করার জন্যই যাত্রা করে এই অজ্ঞাতলোকে চলে এসেছে। নইলে, কী এমন চাকরি? মাইনে তো ষাটটি টাকা। কিন্তু এই চাকরিতে যেন আত্মহত্যার সুযোগ আছে, এটাই সবচেয়ে বড় লোভ। নইলে এখানে আসবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

একটা মাঠের উপর দিয়ে গাড়িটা চলছিল। সড়কটা এখানে এসে কেমন একটু মসৃণ হয়েছে বলে মনে হয়, কারণ পদে পদে আর অধঃপতন ও উর্ধ্বোৎক্ষেপের ঝাঁকুনি নেই। একটা ছন্দের আবেশে গাড়িটা তালে তালে চলেছে। মেঠো হাওয়াও একটু ঠাণ্ডা, শিয়াল ডাকা রাত্রি, প্রহরগুলি ক্লান্ত। সোমার চোখে আপনা হতেই তন্দ্রা নেমে আসে।

এই তন্দ্রা ক্লান্তি দূর করে না, মনের চিন্তাগুলিকে একেবারে নীরব করেও দেয় না। বরং মনটাকে একেবারে শিশুর মত অসহায় করে আনে, এবং সেই অসহায় মন দু'হাত দিয়ে একটা আশ্রয় আঁকড়ে ধরার জন্য ছটফট করে আর কেঁদে ফেলে। সোমার মনে হয়, তার নিরাশ্রয় প্রাণকে, তার অভিভাবকহীন জীবনকে কতগুলি অন্ধকারের জীব বন্দী করে নিয়ে চলেছে কোন্ এক বধ্যভূমির দিকে।

তন্দ্রা ভেঙে যায়, কিন্তু ভয় ভাঙে না। হাওয়াটা কেমন স্যাঁতসেঁতে। লণ্ঠনের আলোটাও সামনে আর দেখা যায় না।

—আর সবাই কোথায় গেল? সোমা ভয়ার্ত ভাবেই প্রশ্ন করে।

বৃদ্ধ উত্তর দেয়—সবাই আছে আগে আগে।

সোমা নিঃসংশয় হতে পারে না।—কোথায় আছে? কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না।

বৃদ্ধ—সবাই নরসিংহতলায় আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে। নিশ্চয় আছে।

সোমা—আমরা কতদূর এসেছি?

বৃদ্ধ—এটা হলো ঠাকুরপুরের বিল।

সোমা—ঐ আলোটা কিসের?

বৃদ্ধ—চিতা জ্বলছে।

ঠাকুরপুরের বিলের স্যাঁতসেঁতে হাওয়া আর দূরের চিতা-জ্বলা আলোকের দিকে তাকিয়ে সোমা তার জীবনের বিদ্রূপগুলির তাৎপর্য একে একে বুঝতে পারে। কাকিমা বলেছেন—চিলড্রেনস্ হোমের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট! কথাগুলি অলংকারে ঝন্ ঝন্ করছে। কিন্তু হাসি পায়, ঠাকুরপুরের বিল আর জ্বলন্ত চিতার পাশ কাটিয়ে আরও অন্ধকারে এগিয়ে না গেলে এত বড় চাকরির ঠাঁই যেন আর খুঁজে পাওয়া যেত না।

গ্রামসেবা মণ্ডলের প্রেসিডেণ্ট নয়নবাবু তবু বাংলা ভাষাতে চাকরিটাকে একটু গরীব করে দিয়ে বলেছেন—কাঞ্চীপুরের শিশুভবনের অধ্যক্ষা।

অধ্যক্ষা কথাটাও বিদ্রূপের মতো শোনায়। মাইনে তো ষাট টাকা। শিশুভবন কথাটাও অপলাপ ছাড়া আর কি? অন্ধকারের ভিতর ছ'ক্রোশ এগিয়ে গিয়ে চোরকাঁটার মাঠ, বাবলা বন, জলো বিল আর চিতার আলো পার হয়ে যেতে যেতে যে-দেশের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, বিধাতাই জানে সে-দেশের শিশু কেমন আর ভবনই বা কেমন।

নরসিংহতলা। একটা নিরেট চেহারার মন্দির, ইঁটের গাঁথুনি দিয়ে তৈরী ভিৎ খুব উঁচু, কেল্লার বুরুজের মত দেখায়। বট তেঁতুল আর আম গাছের কুঞ্জের মত জায়গাটা। ছোট ছোট কয়েকটা শূন্য চালাঘরও দেখা যায়, বোধ হয় দিনের বেলায় হাট বসে।

লণ্ঠনধারী সেই যুবক ও ছেলেরা সত্যিই নরসিংহতলায় অপেক্ষা করছিল। সোমা গাড়ি থেকে নামে। জিজ্ঞাসা করে—কাঞ্চীপুর আর কতদূর? বাকী পথটুকু হেঁটে গেলে হয় না?

যুবক উত্তর দেয়—মাত্র আর দেড় মাইল, রাস্তাও ভাল, হেঁটে যেতে পারবেন বোধ হয়।

যুবকটি লণ্ঠন নিভিয়ে দিল।

সোমা চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে রাত্রিটা আর তত কালো নেই, ফিকে হয়ে আসছে। নরসিংহ মন্দিরের গায়ে, পদ্মকাটা ইটগুলিও চিনতে পারা যায়। কৃষ্ণপক্ষের শেষ রাত্রি, ফালিচাঁদ ভেসে উঠেছে আকাশে। দূর ঠাকুরপুরের বিলের উপর সাদা কুয়াশা থমথম করে। নরসিংহতলায় অকস্মাৎ লুটোপুটি আলোছায়ায় একটা হাসি-হাসি রূপ ফুটে ওঠে।

সোমা কি কারণে খুশী হয়ে ওঠে, হয়তো সে নিজেই জানে না। ছোট ছেলেটির কাছে এগিয়ে যায়। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে—কি? তোমার ঘুম পায়নি?

ছেলেটি সপ্রতিভভাবে উত্তর দেয়—না আজ্ঞা।

সোমা আদর করে বলে—এবার আর তুমি হাঁটতে পারবে না। গাড়িতে উঠে বসো।

ছেলেটি প্রশ্ন করে—আর আপনি?

সোমা—আমি হেঁটে যাব।

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে আপত্তি জানায়—তাহলে আমিও আপনার সাথে হাঁটবো।

—কিন্তু আর এত বোঝা বইতে হবে না!

সোমার কথামত ছেলেরা জিনিসপত্রগুলি গাড়ির ভিতর তুলে দিতে বাধ্য হয়।

যুবকটি সোমাকে প্রশ্ন করে—আর একটু জিরিয়ে নেবেন, না এখনই রওনা হবেন?

সোমা একটু দ্বিধাবিব্রত স্বরে বলে—এখুনই...আচ্ছা...চলুন।

নরসিংহতলার আলোছায়ার কুঞ্জ ছেড়ে দিয়ে বাইরে আসতেই যেন এক অবারিত আলোকাপ্লুত পৃথিবীর মধ্যে এসে পড়লো সোমা। একটা দুর্ভেদ্য কালো সংশয় আর অবিশ্বাসের ঘেরাটোপে যেন ঢাকা পড়েছিল এই রূপকথার দেশ। নিকটে ও দূরে এক একটা স্বপ্নালু তালবনের মাথা চিকচিক করে, মাঝে মাঝে ঘুমভাঙা পাখির মৃদু কলরব। সড়কটা একটা শীর্ণ নদীর গা ঘেঁষে চলেছে, মাঝে মাঝে জলভরা দহ, কিনারায় বাঁশের খুঁটোয় মাছধরার জাল ঝুলছে।

চলতে চলতে সোমা প্রশ্ন করে—ওটা কি নদী?

যুবকটি উত্তর দেয়—ওর নাম মরাকালিন্দী।

মরাকালিন্দীকে মরা বলে তো মনে হয় না। কে জানে দিনের বেলা দেখতে কেমন! এখন কিন্তু বর্ণে গন্ধে রূপময়। জলটার চেহারা তরল রুপোর মত। আর গন্ধ? তাও পাওয়া যায়, নিশ্চয় একটা কেয়াবন আছে নিকটে। যাই হোক, সেটাও যেন শেষ রাত্রির নিঃশব্দ প্রবাহিনী মরা কালিন্দীর গায়ের সৌরভের মত।

যুবকের মুখটাও এখন স্পষ্ট করে দেখা যায়। মুখের চেয়ে মুখের ছাঁদটাই আরও স্পষ্ট। সোমার মনে হয়, একে যেন কোথাও দেখেছে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও মনে পড়ে না, কোথায়?

সোমা গরুর গাড়ির পিছু পিছু এক হাতে ছইয়ের একটা কোনা ছুঁয়ে আস্তে আস্তে চলছিল। ছেলেরা এবং যুবকটিও নিঃশব্দে চলছিল। কিন্তু এখনও দেড় মাইল পথ হাঁটতে হবে, এই মূক অভিযান ভাল লাগছিল না সোমার। কথা বলতে পারলে শ্রান্তিটা এত ভারি হয়ে সারা দেহ চেপে ধরতো না। কিন্তু কথা বলার কি বা আছে এবং কার সঙ্গেই বা বলা যায়!

সোমা দেখতে পায়, সঙ্গী যুবকও একমনে নিঃশব্দে হেঁটে চলেছে। নেহাৎ ছেলেমানুষের মতোই মুখ, কেমন যেন ছবির মতো লম্বা লম্বা টানা রেখা দিয়ে আঁকা। সোমার এতক্ষণে হঠাৎ মনে পড়ে যায়, চুনি যে মহাভারত বইটা পড়ে, তার মধ্যে এই রকম একটি চেহারার ছবি আছে। একলব্যের ছবি।

মনে মনে হাসি পেলেও একটু নিশ্চিত হয় সোমা—যাক, চেনা কেউ নয়।

কিন্তু লোকটি কে? সত্যিই কি ভদ্রলোক? জানবার জন্য বারবার কৌতূহল হলেও সংকোচের বাধা কাটিয়ে উঠতে পারছিল না সোমা। এটাও খুবই আশ্চর্যের বিষয়। দুঃসাহসিকার মত যে মেয়ে তার জীবন ও জীবিকার ভূমিকাই বদলে দিয়ে একাকিনী এই নির্বান্ধব দেশে চলে আসতে পারলো, তার পক্ষে কথা বলার এতখানি সংকোচ ঠিক শোভা পায় না। কোন অর্থও হয় না।

সোমা প্রশ্ন করে—কাঞ্চীপুরে কত লোক আছে?

যুবক উত্তর দেয়—দুশো ঘর হবে।

সোমা—ভদ্রলোক আছে?

যুবক—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সোমা—কজন?

যুবক—সবাই।

সোমার নিঃসংকোচ প্রশ্নের অভিযান হঠাৎ একটা আঘাত পেয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। কাঞ্চীপুরে সবাই ভদ্রলোক, এর অর্থ যাই হোক, যুবকের মুখের ঐ কাটাছাঁটা ছোট্ট একটি কথার মধ্যে যেন অন্য একটা অর্থ অতিশান্ত অথচ অতি কঠিন প্রতিবাদের মত ধ্বনিত হয়েছে। সবাই ভদ্রলোক! কলকাতার সংস্কার দিয়ে গড়া সোমার ভদ্রয়ানার ধারণা এই কথার আঘাতে যেন একটু মুষড়ে পড়ে। কিন্তু কি ভাবে কোন্ কথা বললে এই কথার ভুল শুধরে দিতে পারা যাবে, তাও ভেবে উঠতে পারে না সোমা।

সোমা কুণ্ঠিতভাবে বলে—আমি জিজ্ঞাসা করছি শিক্ষিত লোক কজন আছে?

যুবক উত্তর দেয়—একজন।

সোমা—মাত্র একজন?

যুবক—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সোমা—তিনি কে?

যুবক—কাব্যতীর্থ মশাই।

সোমা জোর করে একটু বেহায়া হবার চেষ্টা করে।—আপনি কি করেন?

যুবক—আমি গ্রামসেবার কাজ করি।

সোমা—নয়নবাবুদের গ্রামসেবা মণ্ডলে আছেন?

যুবক—আজ্ঞে হ্যাঁ।

আবার নীরবে পথ চলা। সোমার সব কৌতূহলের সদুত্তর পাওয়া গেল না, কিন্তু আর প্রশ্ন করার উৎসাহ হয় না। পথটাও ফুরোয় না, হাঁটতে বেশ ক্লান্তি বোধ হয় সোমার। গ্রাম্য একলব্যের মুখটাও অনেকখানি অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

ভোর হয়েছে। ছেলেরা বলে—পৌঁছে গেছি কাঞ্চীপুর।

একটা বেড়াঘেরা কুটিরের কাছে গাড়িটা এসে থামে। দুটো কুকুর ছুটে এসে অনবরত চিৎকার করে।

হঠাৎ ভোরের পাখির দলের মতই কতগুলি ছোট ছোট ছেলে কুটিরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয়ে এসে গাড়ির কাছে দাঁড়ায়। সোমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। একসঙ্গে কলরব করে—গুরুমা, গুরুমা, আমাদের গুরুমা।

গ্রাম্য একলব্য ছোট ছেলেগুলিকে শান্ত করে—যাও, এখন বিরক্ত করো না।

ছেলেরা আবার নিঃশব্দে কুটিরের ভিতরে ফিরে যায়। গাছপালার আড়ালে কুটিরগুলি তখনো ঝাপসা হয়ে লুকিয়ে আছে। সোমা দু'চোখের দৃষ্টি ঘুরিয়ে যেন জায়গাটার সত্যিকারের স্বরূপ সন্ধানের একটু চেষ্টা করে, কিন্তু স্পষ্ট করে কিছুই ঠাহর হয় না। সোমা

বলে—এটাই কি শিশুভবন?

যুবক—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সোমা—তাহলে জিনিসপত্র নামিয়ে নিই।

যুবক—আজ্ঞে না, এখন আপনাকে কাব্যতীর্থ মশাইয়ের বাড়িতে যেতে হবে। ওঁর স্ত্রী বার বার করে আমাদের বলে দিয়েছেন, আপনি এলে প্রথমে ওঁর বাড়িতেই উঠতে।

সোমা বিরক্তি চেপে রেখে বলে--চেনা নেই শোনা নেই, হঠাৎ একজনের বাড়িতে...তাছাড়া ওঁদের মিছিমিছি কষ্ট দিয়ে কি লাভ?

যুবক—আপনি ক্লান্ত হয়েছেন, এবেলাটা ওঁদের ওখানেই বিশ্রাম নিয়ে ওবেলা শিশুভবনে আসতেন। সেটাই তো সবচেয়ে ভাল হতো। তা ছাড়া, ওঁরাও খুব খুশী হতেন।

সোমা বলে—তবে তাই চলুন।

বেশীদূর এগিয়ে যেতে হয়নি। গরুর শব্দ শুনতে পেয়ে সেই আবছা ভোরেই অপরাজিতার বেড়ায় ঘেরা একটা কুটিরের দরজায় প্রদীপ হাতে নিয়ে একটি বৌ দাঁড়িয়ে ছিল। সোমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে বলে—আসুন ভাই।

ঐশ্বর্যের ভারে অন্তর সঙ্কুচিত হয়, নয়নকে হঠাৎ দেখলে একথা মনে হবে না।

বাপের এক ছেলে নয়ন। বাপ বিগত হয়েছেন, কিন্তু রেখে গিয়েছেন অনেক। প্রচুর জমি জমিদারী বাড়ি ও গাড়িতে, তা ছাড়া শেয়ারে নগদে আর কোম্পানীর কাগজে। আর রেখে গিয়েছেন একদল মক্কেল, বারমেসে দেওয়ানী মামলায় যারা সম্পত্তির ফাটকা নিয়ে মাতোয়ারা।

কিন্তু সবই ব্যর্থ। ওকালতী পাস করেও নয়ন আদালতে ভিড়তে পারেনি। পিতৃদত্ত সম্পদ বিলিয়ে দিতে পারেনি সত্য, কিন্তু দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেও রাখছে না। এক বছর আগেও যতটা ছিল, এখন আর ততটা নেই, পুরো পাঁচটি হাজার টাকা কমেছে দান খয়রাতের কারণে। কিন্তু তারই শোকে পিসীমা কেঁদে ভাসিয়েছেন এবং তারই গল্প ফলাও হয়ে রটতে রটতে নয়নকে একেবারে সর্বত্যাগীর দলে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। অনেকে বলেন, স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ উকিলের ঐশ্বর্যের স্তূপে ভাঙন ধরলো এতদিনে। তবে ভাঙতেও কিছু সময় লাগবে, স্তূপটা তো আর নিতান্ত সামান্য রকমের ছিল না।

নয়নের চেয়ে বেশী বড়লোকের ঐশ্বর্য, এর চেয়ে অনেক বড় বড় স্তূপও ভেঙেচুরে একেবারে উপে গেছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। মেজাজের ঝড়ে, খেয়ালের খেলায় অথবা নানারকম চরিত্রের প্রকোপে অনেক বনেদী ইমারত ধুলো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু নয়নের পিতৃদত্ত সম্পদের পাঁচটি হাজার টাকা যে দানের ঘুণে খেয়ে গেল, সেটা আদৌ নিজের স্বার্থের খেয়ালে নয়, দশজনের মঙ্গলের জন্যই। আত্মীয়েরা বলে মূর্খতা, প্রতিবেশীরা বলে স্বদেশী চালিয়াতি। ভৈরববাবুদের আর একটা দেশকর্মী দল আছে, তারা বলে—বিপ্লববিরোধী ফন্দিবাজ।

এসব অভিযোগ বিশ্বাস করার মত মানুষ মতিগঞ্জ শহরে কম নেই। আবার অবিশ্বাস করার মত মানুষও আছে। নয়ন ছেলেটি মূর্খ নয়, চালিয়াতও নয়, আর ওর চক্রান্তই বা কি থাকতে পারে, তাও সহজে বোঝা যায় না। লোকে জানে, একটা মস্ত বড় আদর্শের প্ল্যান নিয়ে সে দেশের কাজে নেমেছে। একবার ভুল করে মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিল নয়ন। ভৈরববাবুদের একটি ইস্তাহারের আঘাতেই সন্ত্রস্ত হয়ে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিল।

গ্রামসেবা মণ্ডলের অফিসটা নয়নদের বাড়ির বৈঠকখানাতেই। এই গ্রাম ও সেই গ্রাম থেকে কর্মীরা আসে। নয়নের কাছে কাজের হিসেব দেয়, কাজের পরামর্শ নেয়। হয়তো দুদিন থাকে, তারপরেই যে যার গ্রামে বা কর্মকেন্দ্রে চলে যায়। টাকা ছাড়া এসব কাজ চলে না, এই বিষয়ে অনেকখানি ভরসা হলো স্বয়ং নয়ন। নয়নের মনটা যদি এই নীরব

সেবার আদর্শকে এক বছরে পাঁচটি হাজার টাকা খরচ করে না পুষতো, তবে কি হতো বলা যায় না। কিন্তু জেলা মতিগঞ্জের অন্তত ত্রিশটা গ্রামের প্রাণ একটু অসাড় হয়ে পড়ে থাকতো বৈকি। গ্রামগুলি আগে কি ছিল, আর এখন কি হয়েছে, তুলনা করতে হলে যেতে হয় কাঞ্চীপুরে। একটা শিশুভবন, একটা বাণীপীঠ, একটা চরকা প্রচারের আশ্রম, কাঞ্চীপুরের সেবাকেন্দ্র চারদিকের পনরটা গ্রামের অবসন্ন সত্তাকে যেন সকল দীনতা ও গ্লানির রোগ থেকে উদ্ধার করে বাঁচিয়ে রেখেছে। বহু সেবাকর্মীর কায়মন নিষ্ঠার জন্যই এ কাজ সম্ভব হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে নয়নের টাকার সাহায্যটুকু ছিল বলেই এত দ্রুত এতখানি হতে পেরেছে।

এর মধ্যে দোষের কি থাকতে পারে? ভৈরববাবুরা বলেন, এসব আগাগোড়াই দূষণীয়, অপদার্থ ও অবান্তর। এসব কাজ মানুষকে ঝিমিয়ে রাখা আফিং খাওয়ানো ব্যাপার। দুঃখের বিরুদ্ধে মারমুখো হয়ে যারা উঠতে চায়, তাদের ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া। নয়ন না হয় টাকা ঢালছে, এতগুলি কর্মীও কাজ করছে, কিন্তু হিসেব করে দেখা যাক, কাঞ্চীপুর কি স্বর্গ হয়ে উঠেছে? ঘরে ঘরে অন্নপূর্ণাও বিরাজ করেন না, দুধের সরোবরও নেই, মাটিতেও সত্যি সোনা ফলছে না।

ভৈরববাবু তাঁর বক্তৃতায় বিশেষভাবে কাঞ্চীপুরের উদাহরণ উল্লেখ করে বলেন--ঐ তো জাজ্বল্যমান ব্যর্থতার প্রমাণ। কিছু হয়নি, হতে পারে না, ওপথে স্বাধীনতা আসে না। মারতে না পারলে কিছু হবে না। মারতে হবে, নিরন্তর অবিশ্রাম আঘাত হেনে যেতে হবে, তবেই সত্যিকারের স্বাধীনতা লাভ হবে।

ভৈরববাবু তাঁর বক্তৃতায় স্পষ্ট করে বলেন না যে কাকে মারতে হবে। কি অস্ত্র দিয়ে মারতে হবে, তাও ভাল করে জানিয়ে দেন না। তবে পলিটিক্স সম্বন্ধে যাদের যৎসামান্যও ধারণা আছে, তারা অবশ্য বুঝতে পারে যে, ভৈরববাবু ব্রিটিশ শক্তিকেই মেরে সায়েস্তা করার জন্য বলছেন এবং নিরামিষ উপায়ে নয়, কামান-বন্দুক দিয়েই মারতে বলছেন।

মতিগঞ্জ শহরে এইভাবেই পলিটিক্স চলে। ভৈরববাবুর বক্তৃতায় পরের দিন দেখা যায়, কারা যেন রাত্রির অন্ধকারে সত্যিই আঘাত হেনে চলে গিয়েছে, গ্রামসেবা মণ্ডলের সাইনবোর্ডটার উপর ইঁটের আঘাত। পলিটিক্সের বৈপ্লবিক আঘাতে বেঁকেচুরে সাইনবোর্ডটা তেমনি পড়ে থাকে। নয়ন আর মেরামতও করে না।

অথচ ভৈরববাবু আর নয়ন, দুজনেই কংগ্রেসের লোক। মতিগঞ্জের জনসাধারণের কাছে এই একটা রহস্য। ভৈরববাবুকে বুঝতে কষ্ট হয় না, নয়নকেও বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু দুজনকে একসঙ্গে মিলিয়ে কংগ্রেস করে নিয়ে বুঝতে একটু কষ্ট হয় বৈকি। স্বাধীনতা দিবসে নয়নের বাড়িতে সেবাকর্মীরা চরকা কেটে সুত্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। আর ভৈরববাবুদের একটা ব্যাণ্ড পার্টি সারা শহর 'চাই রুধির, চাই রুধির' সুর বাজাতে বাজাতে কুচকাওয়াজ করে ঘুরে যায়। মতিগঞ্জের জনসাধারণ যেমনটি দেখে, ঠিক তেমনটি বিশ্বাস করে—ঐ দুই মিলিয়েই কংগ্রেস। সম্ভব হলে চরকা, আর সুযোগ পেলেই রুধির।

যদি মতিগঞ্জ শহরের গত দশ বছরের ইতিহাস ধরা যায়, তবে এটাও প্রমাণিত হবে যে, এখানে চরকাও সম্ভব হয়নি, রুধির নেবার সুযোগও ঘটেনি। দুটোই কথার কথা হয়ে আছে মাত্র। বছরে এক-আধবার গ্রামসেবা মণ্ডলের কেন্দ্রীয় অফিসের অর্থাৎ নয়নদের বৈঠকখানায় কতগুলি চরকা কয়েক ঘণ্টার মতো গুনগুন করেই নিস্তব্ধ হয়ে যায়। দশ বৎসরের মধ্যে রুধিরের ব্যাপার একটি মাত্র হয়েছিল। পটকার বারুদ দিয়ে ঠাসা একটা নারকেলের খোল একজন ঘুমন্ত পাহারাওয়ালার গায়ে ছুঁড়ে মারা হয়েছিল। পাহারাওয়ালা আহত হয়েছিল। একটু রুধিরপাত হয়েছিল বৈকি। এই ঐতিহাসিক ঘটনার জের সহজে মেটেনি, এক মাস ধরে ধরপাকড় আর খানাতল্লাস এবং তিন মাস ধরে মামলার পর কুড়িজনেরও উপর

লোকের জেলও হয়েছিল।

এতদূর গড়িয়েও জের মেটেনি। মতিগঞ্জের ইতিহাসে ঐ রুধিরাক্ত দিবসটিই ভৈরববাবুর পলিটিক্সের সবচেয়ে বড় সম্বল হয়ে আজও রয়েছে। ঐ একটি ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি প্রতি বক্তৃতায় মতিগঞ্জের বিদ্রোহী আত্মাকে সংগ্রামের আহ্বান শুনিয়ে সর্বদা প্রস্তুত করে রাখেন। রুধিরের চেয়ে রুধিরের আহ্বানটাই বেশী লাল হয়ে ওঠে এবং এই রক্তাক্ত আহ্বানের জোরেই মতিগঞ্জের শতকরা আশিটি ভোটে সমাদৃত হয়ে ভৈরববাবুর দল মিউনিসিপ্যালিটি অধিকার করতে পেরেছেন। চরকাবাগীশ নয়নের সাধ্য নেই যে, ভৈরববাবুর সঙ্গে এই ভোটের লড়াইয়ে জয়লাভ করতে পারে।

ভৈরববাবুর দুশ্চিন্তার একটা প্রশ্ন হলো, গ্রামসেবার উপর নয়নের এত ঝোঁক কেন? খবরের কাগজে নামও ওঠে না, অথচ বাপের দেওয়া পয়সাগুলি মিছিমিছি উজাড় হয়ে যায়। সত্যিই কি নয়ন বিশ্বাস করে যে, গ্রামের মশা মেরে আর চরকা চালিয়ে স্বাধীনতা আসবে?

নয়নকে এতটা আদর্শবাদী বলে ভাববার মত কারণ খুঁজে পান না ভৈরববাবু। বটকৃষ্ণ উকিলের ছেলে নয়ন, যে বটকৃষ্ণ পয়সা উপার্জনের জন্য হেন অপকার্য নেই করেনি। তারই ছেলে হঠাৎ প্রহ্লাদ হয়ে গেছে, এতটা বিশ্বাস করা যায় না।

তবে কারণটা কি? গ্রামের দিকে নয়নের মত বড়লোকের নাড়ুগোপালের এত ঝোঁক কেন? ভৈরববাবুর হঠাৎ সন্দেহ হয়—খুব সম্ভব জেলাবোর্ডের উপর নয়নের নজর পড়েছে।

যেমন সন্দেহ হয়, তেমনি সতর্কও হয়ে ওঠেন ভৈরববাবু। এবার থেকে গ্রামের দিকে তাঁকেও একটু ঝুঁকতে হবে।

ভৈরববাবুদের অভিযোগ সবই লোকমুখে শুনতে পায় নয়ন। কিন্তু তাতে তার মনের শান্তি কখনও নষ্ট হয়নি। লোকের কাছে তার নিজের দিকটা ব্যাখ্যা করে জানিয়ে দেয়—সে যে চুপ করে বসে নেই, একটা কাজ করতে পারছে, এই যথেষ্ট। তার সব সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে এবং গ্রামসেবা করেও যদি স্বাধীনতা না আসে, তাতেই বা দুঃখ করার আছে কি? একটা আদর্শের মধ্যে যদি এইভাবে তার জীবন ফুরিয়ে যায়, তাই তো পরম লাভ।

নিজেকে অনেকবার প্রশ্ন করেছে, অনেক বিচার করে দেখেছে নয়ন। কিন্তু তার চিন্তায় আর অনুভবে, তার বেদনা ও মমতায় কোন ফাঁকি আছে বলে সে মনে করে না। সে বিশ্বাস করে, তার যতটুকু সামর্থ্য আছে, সবই উৎসর্গ করে দিয়েছে সে। এক বছরে পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে, তার জন্য বিশেষ কাতর হয়নি নয়ন।

এক একটি করে সাফল্যের খবর আসে—কাঞ্চীপুরের তাড়ির দোকান উঠে গিয়েছে, মিঞাবাজারে পঞ্চাশটা তাঁত আবার জেগে উঠেছে, নরসিংহতলার হাটে যারা ভিক্ষে করতো, তারা ভিক্ষে ছেড়ে দিয়ে চরকা ধরেছে। ঠাকুরপুরের চাষীরা নিজেরা দল বেঁধে খেটেখুটে একটা বাঁধ বেঁধেছে, যার ফলে তিন হাজার বিঘা জমির ধান মরাকালিন্দীর প্লাবন থেকে এবার বাঁচতে পারবে। নয়নের মনটাও এক রকমের নিরীহ গর্বে ভরে ওঠে। এ সব তো তারই দানের মহিমা! নাই বা হলো স্বাধীনতা, এতগুলি মানুষের সেবায় তার টাকাগুলো যে সার্থক হচ্ছে, এটাই বা কি তার কম আনন্দের বিষয়?

অবসর সময়ে লাইব্রেরী ঘরের নিভৃতে বসে নয়ন নিজেকে অনেক সময় পরীক্ষা করেও দেখেছে। দেখেছে, তার মনের মধ্যে কোন ফাঁকি নেই। এ দেয়ালে মহাত্মা গান্ধীর সুস্মিত মূর্তি, ও দেয়ালে বীর-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ছবি। টেবিলের উপর কাঞ্চীপুরের কুমোরের তৈরি মাটির ফুলদানিতে সাদা ফুলের স্তবক। সারি সারি গ্রন্থ, কত যুগের জ্ঞানী মানুষের দান এক বাণীময় মালঞ্চ। এই সুপবিত্র পরিবেশের মধ্যে কিছুক্ষণ বসে থাকলে মনটাও যেন সুরভিত হয়ে ওঠে। তার টাকা খরচ সার্থক হয়েছে। শুধু নিজে ধন্য নয়, অপরকেও ধন্য করে দিয়েছে নয়ন। নয়নের আত্মপ্রসন্নতা দিন দিন বেড়ে

উঠতেই থাকে।

আজ অনেকদিন পরে নয়ন একটু আনমনা হয়ে লাইব্রেরী ঘরে বসেছিল। এতদিনের আত্মপ্রসন্নতার পথে কোথায় যেন একটা বাধা এসে দেখা দিয়েছে। একটা অলক্ষ্য সংশয় থেকে থেকে এসে তার চোখের দৃষ্টিটাকে ক্ষণিকের মত বিষণ্ণ করে তুলেছে।

কাঞ্চীপুরের শিশুভবনটা ভাল চলছিল না, কিন্তু এখন থেকে ভাল চলবে বলেই মনে হয়, কারণ একজন সুযোগ্যা অধ্যক্ষা পাওয়া গিয়েছে। এটাও আনন্দের বিষয়। তবু আজ নয়নের চিন্তাগুলি কেমন এলোমেলা হয়ে যায়।

সোমা এখানে এসে একদিন ছিল। কাল রাত্রে চলে গিয়েছে। আজ সকালে লাইব্রেরী ঘরে পড়তে বসেই নয়নের পড়া ভুলিয়ে দিয়ে সবার আগে মনে পড়ে সোমার কথা।

কলকাতায় মানুষ হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, অথচ কাঞ্চীপুরের মত অজ পাড়াগাঁয়ে একটা সামান্য মাইনের চাকরি নিয়ে চলে গেল। সত্যিই কি চাকরিটাই ওর কাছে সবচেয়ে বড় কাম্য?

নয়ন একটু সন্দিগ্ধভাবেই জিজ্ঞাসা করেছিল—আপনি শুধু চাকরি করার আগ্রহেই এসেছেন বলে মনে হয় না, নিশ্চয় দেশসেবার একটা আদর্শও আপনার আছে।

সোমা উত্তর দেয়—দেশসেবা আমি কখনও করিনি, দেশসেবার কিছু বুঝিও না। আমি চাকরি করতে এসেছি।

নয়ন অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞাসা করে—যাই হোক, টিকে থাকতে পারবেন তো?

সোমা—মাইনেটা নিয়মিত পেয়ে গেলে নিশ্চয় টিকে থাকতে পারবো।

সোমা যেভাবে কথা বলে এবং তার কথায় যে মতবাদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা শোনার পর গ্রামসেবার কাজের পক্ষে তাকে সবচেয়ে অবাঞ্ছনীয় বলেই মনে করা উচিত। নয়ন কিন্তু তা মনে করতে পারেনি, হিতেনবাবুর চিঠির অনুরোধ মত সোমাকে ষাট টাকা মাইনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাঞ্চীপুরে পাঠিয়ে দিয়েছে।

আসল কথা হলো, সোমার কথাগুলিকে আদৌ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে পারেনি নয়ন। নয়নের ধারণা, মুখে যাই বলুক না কেন, সোমা দেশসেবার আগ্রহেই এসেছে। কিন্তু মাত্র একদিনের মত দেখা, আর কিছুক্ষণের মত আলাপ, এরই মধ্যে সোমার মতন মেয়ের মুখের কথাকে অবিশ্বাস করা, আর তার মনটাকে চিনতে পারা, এই অধিকার কোথা থেকে পায় নয়ন?

নিজের অধিকারের কথা ভাবছিল না নয়ন। ভাবছিল তার নিজের কথা, সোমার সঙ্গেই তুলনা করে। নয়নও তো তার আদর্শে বিশ্বাসী, এই আদর্শের জন্য বছরে পাঁচটি হাজার টাকা খরচ করতেও সে কুণ্ঠিত নয়, অথচ এই পৃথিবীতে একটি টাকার জন্য মানুষ কত না কুণ্ঠা করে। কিন্তু তার সব আদর্শ একটা ভদ্রজনোচিত মাত্রার মধ্যে আছে। আর সোমা? কলকাতার মায়া, ভবিষ্যতের সব সুখ আর সোনালী দিনের কল্পনা পিছনে ফেলে রেখে, কাঞ্চীপুরের মত পাড়াগাঁয়ের সেবায় চলে যেতে পারলো। এ তো মাত্রাছাড়া জীবন সঁপে দেওয়া ব্রত। সোমার মত মেয়ের পক্ষেও যতদূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো, নয়ন আজ দশ বছর ধরে আদর্শকে মনে মনে বিশ্বাস করে এবং একটা বছর পাঁচ হাজার টাকা ব্যয়ে সেই আদর্শকে চর্চা করেও ততদূর এগিয়ে যেতে পারেনি। সোমাকে যেন তার কোমল চিবুকের চেয়ে এই মাত্রাছাড়া দুঃসাহসের জন্যই বেশী সুন্দর দেখায়। তার নিজের শান্ত শুদ্ধ ভদ্রজনোচিত জীবনটাকে একটু দুঃসাহসী করার জন্য নয়নের মনটাও কেন যেন প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে।

হঠাৎ রহস্যের মত সোমার আবির্ভাব। কাঞ্চীপুরের শিশুভবনের কাজের জন্য এ-ধরনের মানুষ পাওয়া যাবে, এটা অভাবিত ছিল। কথাবার্তায় কেমন একটু রূঢ়তা ফুটে ওঠে। কিন্তু

মুখের চেহারার সঙ্গে সোমার মুখের ভাষা ঠিক মানানসই হয় না। চোখের দৃষ্টিটা ভীরু, চিবুকটা বেশী রকমের কোমলতা দিয়ে গড়া। নয়ন বুঝতে ভুল করেনি, এই মেয়েকে হঠাৎ যা মনে হয়, সত্যিই তা নয়।

তবে একটু রূঢ় হওয়াই বোধ হয় ভাল। কাঞ্চীপুরের মত যে-গ্রামের জীবনটাই রূঢ় হয়ে আছে, সে-গ্রামের মঙ্গলাচারে বনফুলের নৈবেদ্যই ভাল শোভা পায়।

সোমার কথা এত বেশী করে ভাবা এবং ভাবনাটাকেও এত শ্রদ্ধা দিয়ে মেশানো নয়নের মত মানুষের পক্ষে শোভা পায় না। কিন্তু নয়ন বুঝতে পারে না, তার চিন্তাটা কতখানি অশোভন হয়ে উঠেছে। নইলে নয়ন হয়তো মনে মনে লজ্জিত হতো।

--শুনলাম তুই নাকি আজ গাঁয়ের দিকে বের হবি?

পিসীমা দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। পিসীমার আকস্মিক প্রশ্নে বিব্রত হয়ে নয়ন উত্তর দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না।

পিসীমা আবার বলেন--কাঞ্চীপুরে যাবি বোধ হয়, আজকেই ফিরবি তো?

নয়ন একটু চিন্তা করে নিয়ে বলে--হ্যাঁ, বঙ্কুকে অবশ্য বলেছিলাম যে আজ বাইরে যাব, কিন্তু যাওয়া হবে না।

পিসীমা বলেন--কাজ থাকে তো ঘুরে আয় না।

পিসীমার অনুরোধটা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের মত মনে হয়। নয়নের গ্রামসেবার কাজকে যদি মনেপ্রাণে কেউ ঘৃণা করে থাকেন, তো তিনি হলেন পিসীমা। তাঁর চোখের সামনে ভাইয়ের এত বড় ঐশ্বর্যের পাহাড় দিন দিন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, নয়নের একটা বদখেয়ালে। মদো মাতাল হলেও বোধহয় নয়ন এতটা হিতাহিতজ্ঞানহীন হতো না। পিসীমা বিধবা, চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ভাইয়ের সংসারে ছিলেন, এখন ভাইয়ের ছেলের বাড়িতে আছেন। এখন শুধু বাড়িটাই আছে, সংসার বলে কিছু নেই। সংসারী হবার মতিগতিও ভাইয়ের ছেলের হয়নি। একদিন পথে বসবে এই বদখেয়ালী ছেলে, আর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে পথে বসবেন। এই অবস্থায় নয়নের গ্রামসেবার আদর্শকে ক্ষমা করা তাঁর পক্ষে কত কঠিন, তা তিনিই জানেন। তিনি ক্ষমা করতেও পারেননি, সহ্য করতেও আর পারছেন না।

পিসীমা রাজনীতির কোন ধার ধারেন না, কিন্তু ভৈরববাবুর বক্তৃতাগুলি শুনতে তাঁর খুব ভাল লাগে, কারণ ভৈরববাবু যেভাবে প্রতি বক্তৃতায় চরকা চূর্ণ করে থাকেন, তাতে পিসীমারই মনের আক্রোশ অনেকখানি চরিতার্থ হয়। সেবাকর্মীরা এসে যখন পাত পেড়ে খেতে বসে, পিসীমা ক্রোধ সংবরণ করার জন্য একটা ঘরের দরজায় খিল এঁটে দিয়ে ভিতরে বসে থাকেন। আস্তে আস্তে উচ্চারণ করেন--যত সব চোর আর ডাকাত, ভাতে বিষ মিশিয়ে দিতে হয়।

নয়নকে সংসারী করবার জন্য অনেক সাধনা ও অনেক ষড়যন্ত্র করেছেন পিসীমা। কত সুন্দরী মেয়ের ফটো আনিয়েছেন, কত বড়লোকের মেয়েকে গিয়ে দেখে এসেছেন, কত শিক্ষিতা মেয়েকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে এনে গান গাইয়েছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। এত ধীর ও শান্ত নয়ন পিসীমার উপদ্রবে মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছে--আমাকে শান্তিতে থাকতে দিন পিসীমা।

পরেশবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে পিসীমার একটু অন্তরঙ্গতা আছে। তিনি বলেছেন--আপনি একটা ভুল করেছেন দিদি, এরা হলো অসাধারণ ছেলে, অসাধারণ মেয়ে না হলে এদের পছন্দ হবে না।

অসাধারণ মেয়েও কম খোঁজ করেননি পিসীমা। একটি নার্স মেয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন, ইংরিজীতে গান গাইতে পারে। মেয়ে ও মেয়ের বাপ-মা সবাই রাজী ছিল, কিন্তু অতি

গোঁয়ার এবং অতি বুদ্ধিহীন তাঁর ভাইয়ের ছেলেটি রাজী হয়নি।

পিসীমা একরকম আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। নয়নকে সংসারী করবার মত আর কোন কৌশল আবিষ্কার করা তাঁর প্রতিভায় কুলিয়ে উঠছিল না। আজ সকালে বঙ্কুর কথায় একটা খবর শুনতে পেয়ে তাঁর চক্ষে হঠাৎ আবার আশার আলো ঝলক দিয়ে উঠেছে। বার বার ব্যর্থ হয়েও পিসীমার মনে আজ নতুন করে একটা বিশ্বাসের সাড়া জেগেছে—এবার হয়তো তাঁর আশার দৃশ্যটা হঠাৎ মরীচিকা হয়ে যাবে না। নয়ন কাঞ্চীপুরে যাবে শুনতে পেয়েই পিসীমা লাইব্রেরী ঘরে নয়নের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।

—কাল যে মেয়েটি এসেছিল, তাকে কোথায় কাজ দিয়েছিস, কাঞ্চীপুরে?

সব খবর জেনেশুনেই পিসীমা অনর্থক প্রশ্ন করলেন।

নয়ন সংক্ষেপে উত্তর দেয়—হ্যাঁ।

পিসীমা বলেন—মেয়েটি বেশ।

নয়ন তার মনের অজ্ঞাতসারে চমকে ওঠে—কে?

পিসীমা বলেন—সোমা।

নয়নের চোখের দৃষ্টি কুণ্ঠিত হয়ে সামনের পাতাখোলা বইটার উপর ঝুঁকে পড়ে। পিসীমা কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন, দুঃসহ একটা অস্বস্তি বোধ করছিল নয়ন। এ সময়ে পিসীমার আবির্ভাব নেহাৎ আক্রমণ বলেই মনে হয়। পিসীমা কি নয়নের এলোমেলো চিন্তার প্রতিধ্বনি শুনে ফেলেছেন?

নয়নের মূক মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে পিসীমার চোখে আর এক ঝলক ভরসার জ্যোতি ফুটে ওঠে।—একা একা অজ পাড়াগাঁয়ে থাকবে মেয়েটা, আমি সোমাকে বলেছি, যখনই মন খারাপ লাগবে, যেন এখানে এসে বেড়িয়ে যায়।

মুখ তুলে একটা শানিত দৃষ্টি দিয়ে পিসীমার দিকে তাকিয়ে নয়ন বলে—আপনি অন্যায় করেছেন পিসীমা। সে এখানে আসবে কেন?

নয়নের চিরকেলে ধীর স্থির মূর্তিটার গায়ে জ্বালা লেগেছে বলে মনে হয়। কিন্তু কার বিরুদ্ধে এই আক্রোশ? শত বিরক্ত হলেও পিসীমার দিকে এত কঠোরভাবে তাকিয়ে থাকার ছেলে নয় নয়ন। নিজেরই মনের দিকে তাকিয়ে একটা পথ-ভুল-করে-দেওয়া ছলনার বিরুদ্ধে তার অন্তরাত্মা বোধ হয় বিদ্রোহ করে উঠেছে।

পিসীমা অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন, তারপর ক্ষুব্ধ ও অপমানিত হৃদয়ের বেদনা লুকিয়ে ফেলবার জন্যে নিঃশব্দে চোখ মুছতে মুছতে ভিতরের ঘরে চলে গেলেন।

•

কাব্যতীর্থের বাড়ি। তিনটে মেটে ঘর, মাথায় খড়ের ছাউনি, আঙিনাটা বেশ বড়। আসবাবপত্র বলে কোন পদার্থ নেই। বাইরের ঘরে একটা মাদুর পাতা। বাইরের লোকজন এলে এখানেই বসে। কাব্যতীর্থের স্ত্রী শুচি ব্যস্তভাবে এগিয়ে এসে সোমার হাত ধরে।

শুচিই পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় সোমাকে, একটা কলাবাগানের ভিতর দিয়ে পুকুরঘাটের কাছে। পদ্মপাতার পাশে এককোমর জলে দাঁড়িয়ে এত ভোরে স্নান করতে ভালই লাগলো সোমার।

সোমার আপত্তি সত্ত্বেও শুচি জোর করে সোমার ছাড়া শাড়িটা জলকাচা করে নিংড়ে নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলে—চলুন, এবার আরাম করে একটা ঘুম দিন।

ক্লান্ত দেহ মাদুরের উপর এলিয়ে দিয়ে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল সোমা। শুচি এসে বলে—ও কি! কিছু না খেয়েই?

কাঁসার গেলাসে গরম দুধ নিয়ে এসেছে শুচি। বলে—এটা খেয়ে নিয়ে লক্ষ্মীটির মত ঘুমিয়ে পড়ুন, আর বিরক্ত করবো না।

অপরিচিত অজ্ঞাত কাঞ্চীপুরের এই আদরের মত ঘুমও যেন সোমার মাথাটা জড়িয়ে ধরছিল। অলস উদ্বেগহীন সুখমন্থর ঘুম। তারই মাঝে মাঝে আধোজাগা স্বপ্নের মত কাঞ্চীপুরের উপর একটা মমতার আবেশ। অজানা কাঞ্চীপুরের জন্য শুধু একবোঝা ঘৃণার উপহার সঙ্গে নিয়ে এসেছিল সোমা। আর কাঞ্চীপুর তার অজানা অভ্যাগতাকে মহীয়সীর সম্মান দিয়ে পদে পদে অভ্যর্থনা সাজিয়ে রেখেছে। কলকাতা শহরের লাখো মেয়ের মধ্যে এক রিক্তা ও নগণ্যা নিরুপায় হয়ে কাঞ্চীপুরে চাকরি করতে এসেছে। বিধবা মা আর দুটি বোনের জন্য অন্ন সন্ধানের অভিযানে। সোমা এসেছে তার স্বার্থের দাবি নিয়ে, সে কাহিনীর কোন কিছু খোঁজ না নিয়েই এরা এত কৃতার্থ হয় কেন?

—সোমা! সোমা!

যেন স্বপ্নের মধ্যেই ডাক শুনতে পেয়ে ধড়ফড় করে জেগে ওঠে সোমা। শুচি হাসতে হাসতে বলে—নাম ধরেই ডাকলুম ভাই, কিছু মনে করো না, তুমি আমার চেয়ে বয়সে ছোট।

সোমা বিব্রতভাবে যেন ঘুমের ঘোরেই বলতে থাকে—হ্যাঁ আমি ছোট, অনেক ছোট।

ছোট মেয়ের কাতর আবেদনের মত সোমার গলার স্বর। বিশ্বাস হয় না, এই মেয়ে সামান্য চাকরি করার জন্য দূর গ্রামদেশে স্বজনহীন একা জীবনের নির্বাসন সইতে পারে।

শুচি বলে—তোমার নিশ্চয় এখনও মায়ের কাছে শোওয়া অভ্যেস, সত্যি করে বল তো?

সোমা বিস্মিত হয়—আপনি কি করে জানলেন?

শুচি হেসে হেসে বলে—ঘুমের ঘোরে মাকে এত ডাকছিলে কেন?

সোমার মুখ ক্ষণিকের মত বেদনায় ম্লান হয়ে ওঠে। শুচি যেন ঠাট্টা করার জন্যই আরও জোরে হাসে—তাতে এত চিন্তে করার কি হয়েছে? এখানেও সব পাবে, আমরা আছি কি জন্যে?

আর অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না সোমার। এখানেও সব পাবে, শুচির কথাগুলি দিব্যবাণীর মত সোমার সমস্ত চেতনায় পরিপূর্ণ আশ্বাস হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

সোমা বলে—এবার আমি উঠি শুচিদি।

শুচি—কেন? কোথায় যাবে?

সোমা—শিশুভবনে।

শুচি—তা তো যাবেই। ভদ্রলোক আসুক, তার সঙ্গে দেখা না করে কি করে যাবে?

সোমার মনে যেন একটা বিস্মৃত প্রশ্ন সরব হয়ে ওঠে। ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করে—কে ভদ্রলোক?

শুচি—যার বাড়িতে দয়া করে এসেছ, তার সঙ্গেই দেখা না করে কি যাওয়া যায়?

সোমা এবার বুঝতে পারে—ও, তিনি বাড়িতে নেই?

শুচি—না।

সোমা—কাজে বেরিয়েছেন?

শুচি—হ্যাঁ, কাজ আর অকাজ দুই-ই। ভোর বেলা রোজই বাণীপীঠের প্রার্থনা সেরে একবার বাড়িতে আসে, কিন্তু আজ বলে গেছে একটু দেরিতে ফিরবে।

শুচি একটু চুপ করে থাকে, তারপর বলে—তুমি ধারণাই করতে পারবে না ভাই, কেমন মানুষের সঙ্গে আমি ঘর করি।

সোমা চারদিকে তাকিয়ে দেখে, এক রিক্ত নিঃস্ব মানুষের ঘর। পাশের ঘরটারও দরজা খোলা, ঘরের ভিতরের ঐশ্বর্য এখানে বসেই দেখা যায়। একটা মাদুর, কতগুলি বই, আর দড়িতে সব মিলিয়ে বড় জোর তিন-চারটে ধুতি শাড়ি ঝুলছে। দেয়ালে একটা কুলুঙ্গিতে ছোট একটি আয়না, আর একটা সিঁদুরের কৌটো দেখা যায়। আর কিছু চোখে পড়ে না। মাত্র এই, এই নিরাভরণ নিরলংকার সংসারই কি শুচিদির সংসার? শুচির মুখের দিকে

তাকিয়ে সোমার মনটা সমবেদনায় মেদুর হয়ে ওঠে।

শুচি বলে—কি রকম অদ্ভুত মানুষ জান? ঘরে কোন বাক্স রাখবে না।

সোমা আশ্চর্য হয়—বুঝতে পারলুম না।

শুচি—বাক্স থাকলেই পয়সা জমাবার লোভ হয়।

বিভ্রান্তের মত তাকিয়ে শুচির অদ্ভুত ধরনের কথাগুলি শুনতে থাকে সোমা।

শুচি বলে—তুমি তো কলকাতার মানুষ, কত লোক দেখেছ। কিন্তু এ রকম অদ্ভুতটি বোধ হয় দেখনি। ঘরে তালা চাবি রাখবে না, কপাটে খিল দেওয়া মানা।

সোমা—এর মানে?

শুচি—এতে মানুষকে অবিশ্বাস করা হয়।

সোমাকে আরও হতবুদ্ধি করে দিয়ে শুচি এবার সলজ্জভাবে হেসে হেসে বলে—তোমার কাছে লুকিয়ে লাভ নেই ভাই, ঘরে একটা থালা একটা বাটি ও একটা গেলাস। এর বেশী রাখবার নিয়ম নেই।

সোমা বুঝতে পারছিল না, এর মধ্যে বিশেষভাবে লজ্জিত হবার কি আছে? শুচিই রহস্যটা ব্যাখ্যা করে বলে—সে বলে, তুমি আমি দুজনেই যখন এক, তখন এক থালাতেই এক সঙ্গে খাব। সত্যি ভাই, এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে এখন আর ভিন্ন করে পাত পেড়ে খেতে পারি না, ইচ্ছেও হয় না।

শুচিদির রিক্ত ও নিঃস্ব সংসারের রূপ দেখে কয়েক মুহূর্ত আগে বেদনা বোধ করেছিল সোমা। নিজের মূর্খতার লজ্জায় মনে মনে মরে যায়। শুচিদির শাড়ির সংখ্যা গুণে সোমা ঐশ্বর্যের হিসাব করেছিল। ভুল ভেঙে যায় সোমার। হতবাক্ হয়ে শুচির দিকে নিষ্পলকভাবে তাকিয়ে থাকে। শুচিদির শাড়িটা ঠিক মাথার উপর ঘোমটার কাছেই অনেকখানি ছেঁড়া। কিন্তু শুচিদি হাসছিলেন। গরবিনী রাজেশ্বরীদের হাসি কাকে বলে, সোমা ঠিক জানে না। কিন্তু সোমার মনে হয়, শুচিদি যেন তার চেয়ে বেশী গর্বে হাসছেন।

শুচি দরজার দিকে তাকিয়ে বলে—আজ একটা পুকুর প্রতিষ্ঠা আছে, সেখানে মন্ত্রপাঠের পর সোজা বাড়ি ফিরবে বলে গেছে, যদি আবার কুমোর পাড়ায় চলে না গিয়ে থাকে!

সোমা—কুমোরপাড়ায় কিসের কাজ?

শুচি—বললাম যে, অকাজ। কুমোরেরা যে সব প্রতিমা গড়ে, তাতে ভুল থাকে। দেবতাদের রূপ খারাপ করে দিলে ও একেবারে সইতে পারে না।

সোমা—উনি কি মূর্তি গড়তে পারেন?

শুচি—না, কুমোরদের সামনে থেকে ও শুধু মূর্তির ধ্যান শুনিয়ে ভুল শুধরে দেয়।

হঠাৎ ঘরের ভিতর এক ভদ্রলোক প্রবেশ করেন। নিঃসংকোচে সোমার সামনে এসে সহাস্য নমস্কার জানিয়ে দাঁড়ান।

সোমা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায়। হাত জোড় করে নমস্কার জানায়। সেই ব্যস্ত মুহূর্তের মধ্যেই সোমা মনে মনে বুঝতে পারে, এতখানি শ্রদ্ধা নিয়ে জীবনে কোন মানুষকে এই বোধ হয় প্রথম সে নমস্কার করছে।

সোমা যেন নিজের মনের বিস্ময় নিজেকেই শোনায়—আপনিই কাঞ্চীপুরের কাব্যতীর্থ?

কাব্যতীর্থ সহাস্যভাবে উত্তর দেন—হ্যাঁ।

সোমা একটু প্রীতভাবে বলে—আপনার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে যাবার জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম।

কাব্যতীর্থ শুচিকে দেখিয়ে দিয়ে সোমাকে তেমনি হাসিমুখে প্রশ্ন করেন—এর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছে তো?

সোমা—হ্যাঁ।

কাব্যতীর্থ--তাহলেই হলো।

হঠাৎ শুচির মাথায় হাত দিয়ে উচ্ছ্বসিত হাসির সঙ্গে কাব্যতীর্থ বলে ওঠেন--এই হলো আমার কাব্য।

শুচি লজ্জিত হয় না, দূরে সরে যায় না। কাব্যতীর্থকে দেখিয়ে দিয়ে শুচিও সপ্রতিভ স্বরে উত্তর দেয়--আর, এই আমার তীর্থ।

কাব্যতীর্থ প্রায় প্রৌঢ় হয়েছেন, শুচিদির স্বামী হিসাবে বয়স একটু বেশী বলেই মনে হয়। কিন্তু কাব্যতীর্থ ও শুচিদির দিকে তাকিয়ে সোমা দেখছিল অন্য জিনিস। মানুষের মূর্তি দেখেও এত আনন্দ হয়? সোমা যেন কোন অপার্থিব মাটি দিয়ে গড়া দুটি মূর্তির দিকে মুগ্ধ ভক্তের মত তাকিয়েছিল।

শুচির কথাতেই আবেশ ভাঙে, সোমা তার পার্থিব সম্বিৎ ফিরে পায়। শুচি বলে--আর দেরি নয়, এবার দুটি খেয়ে নাও ভাই।

আর একবার দরজার দিকে তাকিয়ে শুচি যেন কাউকে খোঁজে। তারপর খুশী হয়ে বলে--ঐ যে প্রবীর ঠাকুরপোও এসে গেছে।

প্রবীর ঠাকুরপো? সোমা কৌতূহলী হয়ে বাইরের বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখতে পায়, সেই গ্রাম্য একলব্য বসে আছে।

মনটা খুশিতে ভরে ছিল সোমার। ঝড়ের রাতে পথহারা পাখির নীড় ফিরে পাওয়ার মত, ভোরের হাওয়ায় নিদহারা চাঁদের ঘুমিয়ে পড়ার মত তৃপ্তি; আত্মহত্যার জন্য এক মরণের দহে ডুব দিতে এসে বরুণালয়ের মত এক রাজ্যে এসে পড়েছে সোমা। এর রূপ নতুন, এর সৌরভ নতুন, সুখ দুঃখ মায়া মমতাগুলিও নতুন রকমের। নেহাৎ অপরিচিত বলে প্রথমে একটু অস্বস্তি হয়, একটু পরেই ভাল লাগতে আরম্ভ করে।

সামনে একটি থালা একটি গেলাস, এই তো শুচিদির বৈষয়িক ঐশ্বর্যের যথাসর্বস্ব। তবু খেতে বসে সোমার বারবার মনে হয়, সে যেন দেবতার প্রসাদ খাচ্ছে।

একরকম আনমনা আবেশের মধ্যেই সোমার খাওয়া শেষ হয়। এইবার এই ক্ষণিকের খেলার ঘর ছেড়ে কাজের ঘরে চলে যাওয়ার পালা। সোমা বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দেখতে পায়, শুচিদির প্রবীর ঠাকুরপো খাওয়া শেষ করে এঁটো পাতা হাতে তুলে নিয়ে দাঁড়িয়েছে।

সোমা হঠাৎ বলে ফেলে--এ কি? আপনি এখানে বসে খাচ্ছিলেন?

প্রবীরও হেসে উত্তর দেয়--হ্যাঁ।

এঁটো পাতা হাতে নিয়ে পুকুর ঘাটের দিকে প্রবীর চলে যেতে কাব্যতীর্থ ও শুচি এসে সোমার কাছে দাঁড়ায়। চুপ করে দাঁড়িয়ে অন্যমনা হয়ে কি ভাবছিল সোমা, বোধ হয় তার সব বিস্ময় আর কৌতূহল একটা রহস্যের সন্ধানে কিছুক্ষণের জন্য প্রবীরের পিছু পিছু পুকুরঘাটের দিকে চলে গিয়েছিল।

কাব্যতীর্থ বলেন--এবার তাহলে...।

সোমার উত্তর না পেয়ে শুচি বলে--কি ভাবছো সোমা?

সোমা তখুনি উত্তর দেয়--ও হ্যাঁ, আমার জিনিসগুলি দেখছি না যে।

শুচি--ওসব প্রবীর ঠাকুরপো কখন শিশুভবনে পৌঁছে দিয়ে এসেছে!

প্রবীর ফিরে আসে।

আর দেরি করার কোন অজুহাত নেই। সোমা বিদায় নিয়ে বলে--চলি এবার, অনেক উপদ্রব করে গেলাম।

শুচি বলে--গেলাম মানে কি? আরও উপদ্রব করতে আসতে হবে।

সোমা--বেশ, তাই হবে।

চলে যেতে উদ্যত হয়েও সোমা যেন একটা সংকোচে কুণ্ঠিত হয়ে বলে—এখান থেকে শিশুভবনে যাবার পথটা তো আমি ঠিক বুঝতে পারবো না।

শুচি বলে—তা তো পারবেই না। তার জন্যে চিন্তে কিসের?

কাব্যতীর্থ বলেন—এই যে, প্রবীর আপনাকেই নিয়ে যাবার জন্যে এসেছে।

কাব্যতীর্থের বাড়ির অপরাজিতার বেড়ার সীমা পার হয়ে পথে এসে দাঁড়াতেই সোমা প্রবীরকে বলে—কাল আপনি আমাকে মিছিমিছি একটা মিথ্যা কথা কেন বললেন?

অভিযোগটা এতই আকস্মিক এবং বলার ভঙ্গীটা এতই অস্থির যে, শুনে মনে হয় অনেকক্ষণ থেকে এই কথাটা বলার জন্য সুযোগ খুঁজছিল সোমা।

প্রবীর অপ্রস্তুত ভাবে সোমার মুখের দিকে তাকায়।—কি?

এই বোধ হয় সোমার মুখের দিকে প্রথম স্পষ্ট করে চোখ খুলে তাকায় প্রবীর। অন্তত এই সময়টা সোমার বুদ্ধিসুদ্ধি যদি আগের মত একটু সাবধান থাকতো, তাহলে অনায়াসেই বুঝতে পারতো যে, শুচিদির প্রবীর ঠাকুরপো নামে পরিচিত এই ভদ্রলোক সোমার প্রশ্নের ভাষা ও ভঙ্গী ভাল চক্ষে দেখছে না। কিন্তু কাঞ্চীপুরের একদিনের খাতিরেই বোধ হয় বড় বেশী আদুরে হয়ে উঠেছে সোমা। নইলে, কলকাতায় ট্রামে-বাসে যেতে কোন ভদ্রলোক ইচ্ছা করে গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকলেও যে-সোমা একটা ভ্রূকুটি করতেও ভয় পেয়েছে, এখানে এসে একদিনের মধ্যে তার সব প্রশ্ন কৌতূহল আর প্রতিবাদ এত মুখর হয়ে ওঠে কেমন করে?

সোমা বলে—আপনি বলেছিলেন, কাঞ্চীপুরে কাব্যতীর্থ ছাড়া আর কোন শিক্ষিত লোক নেই।

প্রবীর—আমার তো তাই ধারণা।

সোমা হেসে ফেলে—শুচিদির কাছে সবই শুনেছি। এখানকার বাণীপীঠের হেড মাস্টার মশাইটিও রীতিমত শিক্ষিত গ্র্যাজুয়েট।

সোমা বোধ হয় বুঝতে পারে না, কতটা মাত্রাহীন উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সে হাসছে। এতটা খুশি হওয়ার সঙ্গত কারণই বা কি থাকতে পারে? কথাবার্তার মধ্যে সেই মুখচোরা সন্দেহ আর সতর্কতার অভ্যাসও এত সহজে ভেঙে যায় কেমন করে? কি এমন নির্ভয় আশ্বাসের হাওয়া আছে এখানে?

প্রবীর বলে—আমি এই শিক্ষার কথা ধরিনি। কাব্যতীর্থের তুলনায় আমার শিক্ষাকে আমি শিক্ষা বলেই মনে করি না।

সোমা—তাহলে আমি তো কিছুই নই, আপনার মত বি.এ. পাসও করতে পারিনি।

প্রবীর—ভালই করেছেন।

কিছুটা পথ নিঃশব্দতার মধ্যেই দুজনে পাশাপাশি হেঁটে পার হয়। বাঁশবনের স্যাঁতসেঁতে ছায়ার ভিতর দিয়ে, এঁদো ডোবা আর পানায় ভরা পুকুরের কিনারা ধরে পথ চলে গিয়েছে। রোগা রোগা গরু অলসভাবে মাটি শুঁকে ঘুরে বেড়ায়। এককোমর পাঁকের ভিতর কতগুলি উলঙ্গ ছেলে-মেয়ে কুলো নিয়ে কাদা ঘেঁটে গুগলি তোলে। শেষরাত্রের রহস্যালোকিত কাঞ্চীপুরের ছবি স্বপ্নেদেখা রূপলোকের মত দিনের বেলার রোদে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। পথ চলতে যেন একটু ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল সোমা।

ক্যাক্ ক্যাক্ ক্যাক্, একটা কঠোর কর্কশ আর্তনাদের মত শব্দ। সোমা চমকে সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। পথের পাশেই শামুকভরা জলাটার দিকে তাকায়। একটা সাদা বক পাখা ঝাপ্‌টে জল ছিটিয়ে আর্তনাদ করছে। নিমেষের মধ্যে জলের ভিতর থেকে যেন এক অদৃশ্য প্রেতের হাত একটান দিয়ে বকটাকে লুঠ করে নিয়ে লুকিয়ে পড়লো।

সোমা বলে—এটা কি ব্যাপার প্রবীরবাবু?

প্রবীর—বোয়াল মাছে বকটাকে টেনে নিয়ে গেল।

সোমা—সর্বনাশ! এও সম্ভব?

প্রবীর হেসে ফেলে—দৃশ্যটা আপনার খুব খারাপ লাগছে, না?

একটা অলক্ষুণে ঘটনার আঘাত থেকে মনটাকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করে সোমা—যাই বলুন, আপনাদের দেশটা সুবিধের নয়।

প্রবীর সংক্ষেপেই উত্তর দেয়—হ্যাঁ, কলকাতার মত নয়!

সোমা বলে ফেলে—কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা করছেন, কোথায় কলকাতা আর কোথায় কাঞ্চীপুর।

জলাটা আর দেখা যায় না, একটা মেঠো ডাঙা, পথটা কাশের বন ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে গিয়েছে। প্রবীর বলে- আপনি কি বরাবরই কলকাতায় ছিলেন?

সোমা—হ্যাঁ।

প্রবীর—কলকাতার রাস্তায় মোটর গাড়ির চাকার নিচে মানুষ চাপা পড়তে দেখেননি?

সোমা—হ্যাঁ, কয়েকবার দেখেছি।

প্রবীর—দেখতে খারাপ লাগেনি?

প্রশ্নের আক্রমণে সোমা হঠাৎ মনে মনে অপ্রস্তুত হয়। তারপরেই বিরক্ত হয়ে উত্তর দেয় –হ্যাঁ, খুব খারাপ লেগেছে। কলকাতা খুব খারাপ, আর কাঞ্চীপুর খুব ভাল।

প্রবীর মাস্টার কোন উত্তর দেয় না। সোমার কথাবার্তার রূঢ়তায় যদি বিরক্ত হয়েও থাকে, তবু মুখের ভাবে তার কোন চিহ্ন ফুটে ওঠে না। পথটা সংকীর্ণ, প্রবীর দু'পা এগিয়ে আগে আগে চলতে থাকে, পাশাপাশি হাঁটবার মত জায়গা নেই।

কিছুক্ষণের নিঃশব্দ চলার পর সোমার চিন্তাগুলি যেন কাণ্ডজ্ঞানের নাগাল ফিরে পায়। তারই সামনে এক পুরুষের মূর্তি হেঁটে চলেছে, বাণীপীঠের হেড মাস্টার, বয়সে তার চেয়ে কিছু বেশীই হবে। কে জানে এদেশের হেড মাস্টারই বা কি বস্তু! কিন্তু এর বেশী পরিচয় সোমা আর কিছু জানে না। তার সঙ্গে এভাবে ধমক দিয়ে কথা বলার অধিকার কোথায় পেল সোমা? এ তো আর সমবয়সী ভদ্রাও নয়, বয়সে ছোট চুনী আর পান্নাও নয়। এত মুখরতা ও নির্লজ্জতাকে মেনে নিতে পারলে এখানে আসার কি প্রয়োজন ছিল? কলকাতাতেই চাকরি করা যেত, এই দুটি বিশেষ গুণের জোরে।

সোমা বলে—শুনছেন?

প্রবীর মুখ ফিরিয়ে তাকায়। সত্যিই মুখটা ছেলেমানুষের মত। কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখতে বিশেষ কোন লজ্জা করে না। চরকায় কাটা সুতোর তৈরী কর্কশ কাপড়ের ফতুয়া আর ছোট ধুতি। ভদ্রলোক যে স্বদেশী কাজের মানুষ, তা সহজেই বোঝা যায়, প্রশ্ন করে জানতে হয় না। হয়তো দেশের লোকের কাছে ইনি একজন প্রকাণ্ড কর্মী বলে পবিচিত, তাই সাজসজ্জায় এই অনাড়ম্বর সাত্ত্বিকতা। সোমার কেমন মনে হয়, এই সাত্ত্বিক সাজ তবু ভদ্রলোকের চেহারাটাকে গুরুগম্ভীর করে তুলতে পারেনি। যেন এক দুষ্টু ছেলের দৌরাত্ম্যমাখা মূর্তি খদ্দরের শাসনে সংযত হয়ে আছে।

সোমা যথাসাধ্য সবিনয় সংযমে এবার কথাগুলি বলবার চেষ্টা করে—আমাকে ভুল বুঝবেন না।

প্রবীর বলে—না, মোটেই ভুল বুঝিনি...এই যে আপনার শিশুভবন।

এক টুকরো খোলা জমি, তারই মধ্যে গোটা তিনেক মাটির ঘর। একটা একচালা, মেঝেটা বেশ লম্বা চওড়া। পিছনে তালগাছে ঘেরা ছোট একটা পুকুর দেখা যায়। একপাল ছোট ছোট ছেলে ও মেয়ে পিলপিল করে দৌড়ে আসে। আবার কলরব ওঠে—গুরুমা গুরুমা আমাদের গুরুমা।

এই হলো সোমার শিশুভবন। যাদুঘর নয়, অস্থিমাংস দিয়ে সাজানো এক লক্ষ্মীছাড়া জীবন্ত পৃথিবীর ভগ্নাংশ। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে সোমা। যেমন শিশুগুলির চেহারা, তেমনি তার ভবন। এখানে চাকরি করতে হবে, সে চাকরির নিয়ম কি, লক্ষ্য কি, কিছুই জানে না সোমা। শুধু দিন গুণে গুণে, প্রতি পল ও প্রহর নিরর্থক প্রতীক্ষায় পার করে দিয়ে, সমস্ত অন্তরাত্মাকে এখানে নির্বাসিত করে প্রতি মাসে ষাটটি টাকার প্রসাদ লাভ করে ধন্য হতে হবে।

প্রবীর বলে—আসুন, আপনাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে যাই।

শিশুভবনের একটা ঘরের ভিতরে সোমা তার উদ্ভ্রান্ত ও সন্ত্রস্ত মূর্তিটাকে কোনরকমে টেনে নিয়ে যায়। কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিল, তা সোমা হয়তো বুঝতে পারেনি। যেন এক ক্ষণিকের দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে সোমা চোখ মেলে দেখতে পায়, দুটি ছেলে হাতপাখা নিয়ে সোমাকে বাতাস করছে। প্রবীর মাস্টার একটা কাগজে কিসের হিসাব লিখছে।

প্রবীর বলে—এইবার আপনাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে আমাকে যেতে হবে।

পকেট থেকে ঘড়ি বের করে প্রবীর সময় দেখে। সোমা যেন আতঙ্কিত ভাবে হঠাৎ বলে ওঠে—কোথায় আবার যাবেন ! বসুন।

প্রবীর বলে—শিশুভবনের ফাণ্ডের এই পঞ্চাশটা টাকা আপনার কাছে রইল। আর এই হলো হিসেবের খাতা। এটা হলো নিয়মাবলী। এটা রেজিস্টার। ঐ যে দেখছেন, রান্নাঘর। আর ওপাশে ঐ নতুন ঘরটা, ওটা আপনার নিজের জন্য।

সোমা—সবই বুঝলাম, কিন্তু আমাকে কি করতে হবে?

প্রবীর বিস্মিতভাবে বলে—কেন? বিনোদদা আপনাকে কিছু বলেননি?

সোমা—বিনোদদা কে?

প্রবীর—বিনোদ কাব্যতীর্থ।

সোমা—না, তিনি এ বিষয়ে কিছুই বলেননি।

প্রবীর একটু চুপ করে থেকে বলে—নয়নবাবু নিশ্চয়ই আপনাকে কাজের কথা কিছু না কিছু বলেছেন।

সোমা—বলেছেন কাজে কোন রকম অসুবিধা হলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে জানাতে। কিন্তু কাজটা কি?

প্রবীর কিছুক্ষণ অন্যমনা হয়ে থাকে। সোমা বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করে—আপনিও জানেন না? এতদিন এখানে কাজ করছিল কে?

প্রবীর—আমিই করছিলাম।

সোমা—তাহলে বলতে পারছেন না কেন?

প্রবীর—কথা ছিল, আপনাকে আমি কাজের চার্জ বুঝিয়ে দেব। বুঝিয়ে দিয়েছি। কাজটা কি, সেটা আগেই জেনেশুনে তবে আপনার আসা উচিত ছিল। আপনি ভুল করেছেন।

সোমা—আমার ভুলের কথা আপনাকে ভাবতে হবে না। কাজটা কি, অনুগ্রহ করে বলে দিন।

প্রবীর সোমার দিকে রুক্ষদৃষ্টি তুলে তাকায়।—কাজটা হলো, এই শিশুগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা আর লেখাপড়া শেখানো।

প্রবীরের কথাগুলি যেন প্রাণদণ্ডের আদেশের মত কঠোর ও নির্মম। সোমার মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়, যেন একটা বীভৎস কালো ছায়া ধীরে ধীরে সমস্ত আলোকে গ্রাস করে ফেলেছে। দৈনিক চার পাতা টাইপ করা, দু ঘণ্টা পড়ানো, তিন পাতা যোগ-বিয়োগ করে অ্যাকাউণ্ট লেখা, পৃথিবীর সর্বত্র এই তো চাকরির রূপ। কিন্তু এক পাল শিশুকে বাঁচিয়ে রাখা, এত বড় অদ্ভুত চাকরিটা কি সোমার মত মেয়ের জন্যই ইতিহাসে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছিল?

সোমা বলে—মাপ করবেন প্রবীরবাবু। এ-কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। আমি নিজেকে বাঁচাবার জন্যে চাকরি করতে এসেছি, পরকে বাঁচাবার জন্যে নয়।

শিশুভবনের ঘরের আবহাওয়া সত্যিই যেন কিছুক্ষণের মত শোকার্ত হয়ে ওঠে, উৎসবের আঙিনায় হঠাৎ বজ্রপাতের মত।

প্রবীর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে বসে থাকে। শুধু প্রবীর কেন, শিশুভবনের কয়েকটি ছেলেমেয়ের মুখ দেখেও বোঝা যায়, সোমার কথার অর্থ তারা বুঝতে পেরেছে এবং তাদের ক্ষণিকের আনন্দ হঠাৎ বেদনায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

সোমা আবার কথা বলে। গলার স্বরে একটা ভীত অসহায় ও অক্ষম মানুষের মিনতি ফুটে ওঠে—চুপ করে থাকলে চলবে না প্রবীরবাবু, আমার একটা ব্যবস্থা করে দিন।

প্রবীর—কিসের ব্যবস্থা বলুন? চলে যাবেন?

সোমা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারে না। চলে যেতে কোন বাধা নেই। এই প্রবীর মাস্টারই হয়তো আবার লণ্ঠন হাতে পথ দেখিয়ে কাঞ্চীপুর রোড স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে। কিন্তু তার এত বড় দুঃসাহসের অভিযানকে একদিনের মধ্যেই এভাবে পরাজয়ে লাঞ্ছিত করে আবার কি চক্রবেড়ের গলির জীবনে ফিরে যেতে হবে? সেই লোকহাসানো নাটকের নায়িকা হওয়ার চেয়ে বোধ হয় আত্মহত্যা ভাল। তবে সোমা চায় কি?

প্রবীর মাস্টার আশ্বাসের সুরে বলে—আপনার পক্ষে হঠাৎ এত মুষড়ে পড়ার কোন কারণ নেই। নয়নবাবু তো আপনাকে কথাই দিয়েছেন যে কোন অসুবিধা হলে...।

সোমা হয়তো কল্পনা করতে পারে না, কিন্তু প্রবীর মাস্টার জানে, নয়নবাবু ইচ্ছা করলে সোমাকে সব অসুবিধার যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করতে পারেন। নয়নবাবুর দানের উপর এই শিশুভবনের প্রাণ নির্ভর করছে, নয়নবাবুরই আর্থিক দাক্ষিণ্যের জন্য বাণীপীঠের একশোটি ছাত্র লেখাপড়া শেখে আর কাব্যতীর্থ ও প্রবীর মাইনে পায়। সেই নয়নবাবু যদি আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, তবে সোমার মত চাকরিগতপ্রাণ মেয়ের পক্ষে সত্যিই চিন্তিত হবার কিছু নেই। ষাট টাকা মাইনে অনায়াসে একশো টাকা হতে পারে। শিশুভবনের উন্নতির জন্য সাহায্যের বরাদ্দ অনায়াসেই দু'গুণ হয়ে যেতে পারে। এই মাটির বাড়িকে এক মাসের মধ্যে পাকা দালানে পরিণত করতে কোন অসুবিধা নেই নয়নবাবুর। যিনি ইচ্ছা করলে সবই পারেন, তিনিই যখন সোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তখন আর...।

কিন্তু সোমার মন এই মুহূর্তে যে সান্ত্বনা খুঁজছে নয়নবাবুর প্রতিশ্রুতির মধ্যে তো সেই সান্ত্বনা নেই। তিনি কাজ দিয়েছেন, কাজের হিসাব নিয়ে মাইনে দেবেন। ভাল কাজ করলে হয়তো মাইনে বাড়িয়ে দেবেন, এটা তো স্বাভাবিক। কিন্তু কাজ করতে না পারলে? কাজের প্রভু হিসাবে নয়নবাবু কি সোমার সকল অক্ষমতা মাপ করে শুধু মাইনে দিয়ে যাবেন?

সোমা বলে—অসুবিধে হলে নয়নবাবুকে হয়তো জানাবো, কিন্তু কাজটাই যদি না করতে পারি...।

দায়িত্বের স্বরূপ দেখে খুবই ভয় পেয়েছে সোমা। সব ভয় দুর্বলতা অক্ষমতা ও হতাশা নিয়ে প্রবীরের কাছে নিজেকে ধরা পড়িয়ে দিতে আজ আর সোমার সম্মানে বাধছে না। তার জীবনের সব সম্মানই যে ডুবতে বসেছে।

প্রবীর উত্তর দেয়—কেন করতে পারবেন না? ধৈর্য ধরে যদি কটা দিন থাকতে পারেন, তবে আপনার সব ভয় একে একে ভেঙে যাবে। কাঞ্চীপুরে যতদিন আছেন, ততদিন নিজেকে একা মনে করবেন না।

এইটুকু সান্ত্বনা পাওয়ার জন্যই সোমার অসহায় চিন্তাগুলি যেন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। কাজের জীবনে সাহায্য করতে, কাজের ভুল থেকে রক্ষা করতে, যদি একটি বন্ধুত্বের প্রশ্রয় পাশে পাশে থাকে, তবে কাঞ্চীপুরের মত দীনহীন পল্লীগ্রামেও তার প্রতিদিনের জীবনের

শূন্যতা নেহাৎ শূন্যতা হয়ে থাকবে না। ভদ্রারা না থাকলে কলকাতাতেই কখনও এতদিন বেঁচে থাকতে পারতো না সোমা, সোমার তাই বিশ্বাস। আর এ তো একেবারে অজ পাড়া গাঁ, রূপ নেই, সাড়া নেই, গতি নেই।

সোমার মনটা যেন একটা মূর্ছা থেকে সুস্থ হয়ে জেগে ওঠে। দুটি ছেলে অনেকক্ষণ থেকে হাতপাখা নিয়ে বাতাস করছিল। সোমা হাসিমুখে আদরের সুরে ধমক দিয়ে বলে--ও কি? আমাকে বাতাস করতে কে বলেছে?

সোমা ছেলেদের হাত থেকে পাখা দুটো কেড়ে নেয়। ছেলে দুটিও আকস্মিক প্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে সোমার গা ঘেঁষে বসে পড়ে। একটি ছেলে সোমার মুখের দিকে যেন ছবি দেখার ভঙ্গিতে নিষ্পলকভাবে তাকিয়ে থাকে। আর একজন সাহস করে সোমার শাড়ির আঁচলটা বার বার ছুঁয়ে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। একে একে আরও আসতে থাকে, সোমার চারদিকে আবার একটা কলরবমুখর শিশু-মানুষের ব্যূহ রচিত হয়। সোমার কাছে কে কতটা এগিয়ে আসবে, তার জন্যে একটা তাড়াহুড়ার প্রতিযোগিতা চলতে থাকে।

ছেলেমেয়েগুলির বেশির ভাগই জীর্ণশীর্ণ চেহারা। পরিধানের মধ্যে শুধু একটা রঙিন খদ্দরের প্যাণ্ট, গায়ে জামা বলতে কোন বস্তু কারুরই নেই। একটা ছেলে জ্বরে ধুঁকছে বলে মনে হলো।

প্রবীর বলে--মাত্র ছ'মাস হলো এই শিশুভবন তৈরী হয়েছে। বিনোদদা আর আমিই এটা করেছিলাম, কিন্তু চালাবার শক্তি ছিল না। নয়নবাবুর অনুগ্রহ, যেটুকু দেখতে পাচ্ছেন, তিনি সাহায্য এবং উৎসাহ না দিলে তার অনেকখানিই সম্ভব হতো না।

সোমা বলে—হ্যাঁ, দেখতেই পাচ্ছি।

শিশুভবনের রূপ অথবা নয়নবাবুর অনুগ্রহের রূপ, সোমার মন্তব্যটা কার উপর বিদ্রূপ করে উঠলো বোঝা যায় না। প্রবীর মাস্টার নিজের উৎসাহেই সোমাকে যেন কাঞ্চীপুরের ইতিহাস শোনাতে থাকে।—বিনোদদা আর আমি যে বাণীপীঠ করেছি, সেটাও এখন নয়নবাবুর অনুগ্রহে চলছে। তিনি সাহায্য না দিলে..।

সোমার বুঝতে বাকি থাকে না, এটা নয়নবাবুরই অনুগ্রহের রাজ্য। তিনি সাহায্য করেন বলেই কাব্যতীর্থের মত মানুষের অন্নের সংস্থান হয়, আর এই ভদ্রলোকের মত শিক্ষিত কর্মী মানুষ জীবিকা লাভ করেন। সোমা বুঝতে পারে, এঁরাও তার মত ষাট টাকা মাইনের দল। দেশসেবার বিনিময়ে নয়নবাবুর কাছ থেকে বৃত্তি পেয়ে থাকেন। তবু নয়নবাবুকেই প্রশংসা করতে হয়, তিনি তো ইচ্ছা করলেই কাঞ্চীপুরে একটা চালের কল করতে পারতেন, আরও বড় একটা ষাট টাকা মাইনের দল পুষতে পারতেন। তার ফলে তিনি টাকার দিক দিয়ে লাভবানই হতেন। কিন্তু তিনি বেছে বেছে সেবার কাজেই টাকা বিলিয়ে দিচ্ছেন। নিছক দানের ব্যাপার, আদৌ ব্যবসা নয়, এবং কোন লাভের উদ্দেশ্যও নয়।

সোমা জিজ্ঞাসা করে—এরা সবাই কি কাঞ্চীপুরের ছেলে-মেয়ে?

প্রবীর—কাঞ্চীপুরের কেউ নেই, সবাই ভিনগাঁয়ের।

প্রবীর মাস্টার এদিক ওদিক তাকিয়ে একটি ছেলের দিকে লক্ষ্য করে ডাক দেয়--মাধাই।

মাধাই প্রবীরের দিকে তাকায়, ইঙ্গিত বুঝতে পারে। এগিয়ে এসে সোমাকে প্রণাম করে।

প্রবীর বলে—এই ছেলেটির ঠাকুমা তীর্থ করতে চলে গিয়েছে, কবে ফিরবে ঠিক নেই। যাবার সময় নাতিকে আমার কাছে ছেড়ে দিয়ে গেল। কাজেই...।

প্রবীর আবার ডাকে--পবন, মনু, বিশু, হারু, চারি...।

গোটা পাঁচ-ছয় ছেলে-মেয়ে উঠে এসে সোমাকে প্রণাম করে। প্রবীর একে একে পরিচয় করিয়ে দেয়, দরিদ্র ক্ষুধাবিকৃত অধঃপতিত মানুষের ইতিহাস থেকে উদ্ধৃত এক-একটি কাহিনী।

প্রবীর—এই দলটাকে বিনোদদা নরসিংহতলার হাট থেকে কুড়িয়ে এনেছেন। এদের বাপ-মা আছে, মতিগঞ্জে মজুরগিরি করে। তবু তারা ছেলেমেয়েগুলিকে হাটে হাটে ভিক্ষে করতে ছেড়ে দিয়েছে। মাসে একবার করে বাপ-মার দল গ্রামের হাটে আসে, আর ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে ভিক্ষে-করা পয়সা নিয়ে চলে যায়।

মানুষের ছেলেমেয়ে হয়েও মানুষী মমতার কক্ষ থেকে বিতাড়িত কতগুলি শিশুর আত্মা। সোমা ছেলেমেয়েগুলিকে করুণাভরা দৃষ্টি দিয়ে দেখতে থাকে। বাপ-মা'র কোলে যারা স্থান পেল না, তারাই বাপ-মা'র পয়সার খাঁকতি মেটাবার জন্যে হাটে হাটে জীবন বিলিয়ে দিতে বসেছিল। এদের দুঃখটা যেন বিশেষভাবে নিজের দুঃখ দিয়ে অনুভব করতে পারে সোমা।

প্রবীর মাস্টারের আহ্বানের অপেক্ষায় না থেকে একটি ছেলে ব্যস্তভাবে এসে সোমাকে প্রণাম করে—আমি নেপাল।

সোমা হেসে ফেলে—এটি কে প্রবীরবাবু?

প্রবীর উত্তর দিতে গিয়ে চুপ করে যায়। একটি কাগজে উত্তরটা লিখে সোমার দিকে এগিয়ে দেয়—সদানন্দ নামে এক দাগী চোর ছিল ঠাকুরপুরে, তারই ছেলে নেপাল, সদানন্দ এখন জেলে।

একে একে আরও প্রণাম এসে সোমার পায়ে পড়তে থাকে। একে একে আরও পরিচয় জানা যায়, আরও ইতিহাস শোনা যায়। অতসী, হরি, বিন্দু, নারায়ণ...এদের সংসারে কেউ নেই, একেবারে অনাথ। একজনের নাম সুমন্ত—পাগলের ছেলে। আর একটি মেয়ের নাম জনা—ওর মা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এক-একটা ঘটনা, করুণ মর্মান্তিক ও ভয়ানক। প্রবীর কখনো সংক্ষেপে বর্ণনা করে শোনায়, কখনো বা কাগজে লিখে জানায়। সব কথা ছেলেমেয়েদের সামনে বলা যায় না, ওরা যেন নিজের জীবনের মানসম্মান বুঝতে শিখেছে।

একটি মাত্র শিশু সোমাকে প্রণাম করতে পারলো না, প্রণাম করার মত বয়সও হয়নি। বছর দুই বয়স, রোগা অথচ ফুটফুটে মুখখানা, ছেলেটাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল জনা।

সোমা জিজ্ঞাসা করে—এটি কে? জনার ভাই?

প্রবীর—না। জনা ওর কেউ নয়।

'না' বললেও কথাটা মিথ্যা বলে মনে হয়। সব গরিব ঘরের বোন যেমন ছোট ভাইকে কোলে কাঁধে টেনে নিয়ে বেড়ায়, বড় জোর আট বছর বয়স হবে, এই একরত্তি মেয়ে জনাও যেন সেই রকম একটা বিরাট দিদিয়ানার দায়ে ছেলেটাকে সেইভাবে স্নেহভরা পরিশ্রম দিয়ে কোলে বয়ে বেড়াচ্ছে।

প্রবীর যেন কি একটা সঙ্কোচে স্পষ্ট করে জবাব দেবার দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই সংক্ষেপে বলে—ওর মা নিজেই এসে ওকে দিয়ে গেছে।

সোমা—কেন? কে ওর মা?

প্রবীর বলে—এবার আমি উঠি। বাণীপীঠে যাবার সময় হয়ে গেছে।

সোমা যেন নিজের মনের অজ্ঞাতসারেই হাত বাড়িয়ে ছোট ছেলেটাকে জনার কোল থেকে নিজের কোলে তুলে নেয়। জিজ্ঞাসা করে—তোমার নাম কি?

জনা উত্তর দেয়—ওর নাম ভোলা।

প্রবীর ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতে সোমাও সৌজন্য রক্ষার জন্য সঙ্গে সঙ্গে আসে। ভোলার দিকে তাকিয়ে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে প্রবীরকে অনুযোগ করে—আপনাদের কাণ্ড। এতটুকু ছেলেকে মা-ছাড়া করে কখনো রাখতে আছে?

প্রবীর—আমরা তো চাইনি, ওর মা নিজেই জোর করে দিয়ে গেছে।

সোমা—কে ওর মা?

আবার সেই প্রশ্ন। সোমার মত ভদ্রয়ানায় লালিত মেয়ের রুচি ও সংস্কারের উপর দুঃসহ আঘাত দেবার ইচ্ছা প্রবীরের ছিল না। এরই মধ্যে শিশুভবনের কক্ষে কোন্ এক ক্লেদাক্ত জগৎ থেকে কুড়িয়ে আনা দলিত মানবতার যে পরিচয় সোমাকে শুনতে হয়েছে, তাই যথেষ্ট। সোমার মত মেয়েকে ভয় পাইয়ে দিতে ও ধৈর্য ভেঙে দিতে যথেষ্ট। তার উপর ভোলার পরিচয় আর না শোনানোই ভাল। সন্দেহ নেই, প্রবীরের ভাবনাগুলির সব সংযত সতর্কতা ফাঁকি দিয়ে সোমার উপর একটা সমবেদনা অলক্ষ্যে তার মনের আনাচে একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছিল। সত্যিই তো, মাসিক ষাট টাকার বৃত্তির লোভ দেখিয়ে এই মেয়ের উপর একটা অসম্ভবের সাধনা চাপিয়ে দেওয়া নিষ্ঠুরতা বৈকি!

সোমা আবার বলে—আমার মত হলো, এতটুকু বাচ্চা ছেলেকে শিশুভবনে রাখবেন না। একে ওর মা'র কাছে ফিরিয়ে দিন।

প্রবীর—ওর মা ওকে কাছে রাখতে চায় না বলেই দিয়ে গেছে।

সোমা—কেন?

প্রবীর—এখানে থাকলে মানুষ হবে, ওর মা'র তাই ধারণা।

সোমা—ওর মা কি খুবই গরিব?

প্রবীর—না।

সোমা—তবে? এ কোন্ ধরনের প্রবৃত্তি? আপনি চেনেন ওর মাকে?

প্রবীর—চিনি, ওর মা'র নাম সিন্ধু, শ্যামনগরের বাজারে থাকে।

সোমা—কি করে?

প্রবীর বিব্রতভাবে বলে—বাজারেই থাকে।

সোমার সমস্ত দেহ শিউরে ওঠে, হাত দুটো যেন হঠাৎ আঘাতে শিথিল হয়ে আসে, কোল থেকে ভোলা প্রায় পড়ে যেতে থাকে। সোমার চোখের দৃষ্টিটা জ্বলন্ত শিখার মত—বাজারের মেয়ের ছেলেকে মানুষ করার জন্যে ষাট টাকা মাইনে দিয়ে আমাকে এনেছেন, কি বলুন?

বলবার মত কোন উত্তর প্রবীরের মুখে আসে না।

সোমা বলে—আপনারা কেন আমাকে এভাবে অপমান করলেন?

প্রবীর হঠাৎ কঠোর স্বরে একটা প্রশ্ন করে—ভোলাকে কোলে নিয়েছেন বলেই কি আপনার অপমান হয়েছে?

সোমা—নিশ্চয়, আমি হাসপাতালের জমাদারনী নই। সস্তায় শিক্ষিতা চাকরানী খুঁজছেন, অথচ নাম দিয়েছেন শিশুভবনের অধ্যক্ষা। মানুষকে ঠকাবার ষড়যন্ত্র।

প্রবীর—আমাকে এসব কথা বলবার কোন অধিকার আপনার নেই।

সোমা—মিথ্যে কথা বলে আমাকে এখানে এনেছেন কেন?

প্রবীর—আমি আপনাকে আনিনি।

সোমার ক্ষুব্ধ দৃষ্টির সব অভিযোগ ও নিন্দা তুচ্ছ করে প্রবীর আরও স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়—নয়নবাবু আপনাকে এনেছেন।

প্রবীরের যুক্তির আঘাতে সোমার সব বাচালতা স্তব্ধ হয়ে যায়। এই মন্তব্যের মধ্যে কোন মিথ্যা নেই। নয়নবাবুই সোমাকে চাকরি দিয়ে এখানে পাঠিয়েছেন, এবং সোমাও চাকরি নিয়ে এসেছে। এর মধ্যে যদি কোন অন্যায় হয়ে থাকে, তবে সেটা হয় নয়নবাবুর, নয় সোমার। এর জন্য প্রবীর মাস্টারকে এক তিলও দায়ী করবার কোন অজুহাত নেই।

যুক্তির কথা নয়। সোমা ভাল করে জানে, সে নিজেই এক দুরন্ত অভিমানের ভুলে ভদ্রজীবনের নীড় ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ চলে এসেছে। এর জন্য আর কেউ দায়ী নয়। কিন্তু এই তো সেই গ্রাম্য একলব্যের মূর্তি, কাঞ্চীপুর রোড স্টেশনে সব অন্ধকারের ধাঁধা ভেদ করে

প্রথম আলোকের সঙ্কেত দেখা দিয়েছিল যে লোকটি। লণ্ঠন হাতে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল, এই তো সেই। কিছুক্ষণ আগেই যার মুখের ভাষায় সান্ত্বনার আভাস পেয়ে সোমার মন থেকে একাকিত্বের শঙ্কা মুছে গিয়েছিল, এই তো সেই ভদ্রলোক। তবু কোন যুক্তির জোরে প্রবীর মাস্টারকে দায়ী করা যায় না। ভুল করে এই ভয়ঙ্কর অভিশাপের মত চাকরিটার মধ্যে তিলে তিলে মরতে হবে, এর জন্য প্রবীর মাস্টার দায়ী নয়। প্রতিদিন নিঃশব্দে তার সারা জীবনের রুচি ও সংস্কার দিয়ে গড়া সত্তাকে এক পঙ্কিল জীবজগতের সেবায় নিঃশেষ করে দিতে হবে, তার জন্য প্রবীর মাস্টারের মন বিচলিত হবার কোন কথা নেই। পুরো দুদিনেরও পরিচয় নয়, প্রবীর মাস্টার সোমার জাতকুলমানের মর্যাদা রক্ষার জন্য দায়ী হবে, এর মধ্যে কোন যুক্তি নেই।

প্রবীর চলে যাবার জন্য উদ্যত হয়। একটু ইতস্তত করে। তারপর বলে--আচ্ছা আমি এবার যাই।

সোমা সহজভাবেই বলে—একটা প্রশ্ন আছে।

প্রবীর--তাড়াতাড়ি বলুন। আমার অন্য কাজ রয়েছে।

সোমা—শুচিদির বাড়িতে দেখলাম, আপনি বাইরের বারান্দায় বসে খাচ্ছিলেন। কেন?

প্রবীর—এই সামান্য ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি?

সোমা—না।

প্রবীর--আমার নাম প্রবীর পাটনী, আপনার ঠাকুরঘরে বা থাকার ঘরে ঢুকলে, কিংবা খাবার জল ছুঁয়ে দিলে আপনার জাত চলে যাবে। বুঝেছেন?

সোমা -বুঝেছি।

নিজেকে খুব শক্ত করে নিয়েই এতক্ষণ প্রশ্ন করছিল সোমা এবং শক্তভাবেই উত্তরগুলিকে গ্রহণ করে। বিচলিত হবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

প্রবীর চলে যায়। এতক্ষণে সব রহস্যও স্পষ্ট হয়ে যায়। লোকটা ভদ্রলোকই নয়। সোমার জাতকুলমানের সম্ভ্রমকে দরদ দিয়ে বুঝতে পারবে, লোকটার হৃদয়টা সে জাতেরই নয়।

শিশুভবনের বাইরের আঙিনায় একটা মাটির বেদীর গায়ে হেলান দিয়ে ঘাসের উপর বসেছিল সোমা। পাশে একটা তুলসীর ঝারি থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়ছে। জনা এসে অনেকক্ষণ হলো ভোলাকে আবার কোলে নিয়ে চলে গিয়েছে। ছেলেরাও দূর থেকে গুরুমার নিশ্চল গম্ভীর মূর্তি দেখে দূরেই সরে গিয়েছে।

অন্য সময় হলে, এর চেয়ে কম বিপদে পড়লে, এবং এর চেয়ে ঢের অল্প আঘাত পেলেও সোমার মন সহ্য করতে পারতো না। চোখ দুটো ঐ তুলসী ঝারির মতই হয়ে উঠতো। কিন্তু কেঁদে হালকা হবার অভ্যাসও বোধহয় জীবনে স্তব্ধ হয়ে গেল, এবং এখানে সেটা আর তার পক্ষে শোভাও পায় না। তার চিন্তার আকাশপটে যে দিগ্‌দাহ শুরু হয়েছে, তার জ্বালা শুধু একা একা শুকনো চোখে চুপ করে সহ্য করাই উচিত। সোমাও নিঃশব্দে সহ্য করে।

জীবনে নিয়তির হাতে নানাভাবে বঞ্চিত হয়েছে সোমা। কাঞ্চীপুরে এসেও তার কল্পনা নানাভাবে বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু সোমার মনে হয়, কাঞ্চীপুরের সব বঞ্চনার ষড়যন্ত্রকে যেন শেষ কথায় চরম করে দিয়ে চলে গিয়েছে প্রবীর মাস্টার। কিন্তু এই বঞ্চনাটা যে কি, সেটা স্পষ্ট করে বুঝে উঠতে পারে না সোমা, বোধ হয় বুঝতে চেষ্টাও করে না।

পুকুরের তালের প্রাচীরের আড়ালে অপরাহ্ণের সূর্য ঢাকা পড়েছে অনেকক্ষণ। একটি প্রৌঢ় বয়সের স্ত্রীলোক ব্যস্তভাবে সোমার কাছে এসে দাঁড়ায়, একেবারে মুখের কাছে মুখ

এগিয়ে নিয়ে দেখতে থাকে।—দেখি, আমাদের গুরুমাটি কেমন হলো।

সোমা বিরক্ত হয় না। শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করে—আপনি কে?

—আমাকে আবার আপনি করে বলো কেন? আমি তারার মা, এখানেই কাজ করি।

—কি কাজ?

—আমি চাকরানী মানুষ, রান্না করি।

—কত মাইনে পাও?

—মাইনে কই দেয়? আমিও চাই না। বিনোদ পণ্ডিত বলে, দেশের কাজ করবে তারার মা, তার জন্যে আবার মাইনে কিসের?

তারার মা'র দিকে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে থাকে সোমা। এ যেন বহুরূপী কাঞ্চীপুরের আত্মার আর এক মূর্তি। দেশের কাজ করছে, এই বিশ্বাসেই ওর প্রাণ ভরে আছে, মাইনে নেয় না। নিজের মনটা বঞ্চনার জ্বালায় ক্ষুব্ধ হয়ে থাকলেও তারার মা'র চিত্তের ঐশ্বর্যকে বুঝবার মত শ্রদ্ধার দৃষ্টি আপনা হতেই সোমার দু'চোখে ছাপিয়ে জেগে ওঠে। এই প্রৌঢ়া গ্রাম্য দরিদ্রার পাশে নিজেকে নিতান্ত ক্ষুদ্র বলে স্বীকার করে নিতে সোমা আজ কুণ্ঠিত হয় না।

সোমা জিজ্ঞাসা করে—দেশের কাজ করে আর সবাই তো মাইনে নেয়, তোমার নিতে বাধা কি?

তারার মা—আর কে মাইনে নেয়?

সোমা—বিনোদ পণ্ডিত, প্রবীর মাস্টার।

তারার মা—নেয় বটে, কিন্তু থাকে কই? নিজেরা তো এক বেলা পেট পুরে খেতে পায় কি তাও পায় না, ভগবান জানেন।

সোমা—এ দশা কেন?

তারার মা—চরকা ফরকা হেন তেন কি না কাজ ওদের আছে বল। ওতেই সব ফুরিয়ে যায়। ঐ এক পাগল ধরনের মানুষ, ওদের কথা ছেড়ে দাও গুরুমা। আমাদের প্রবীর মাস্টার...।

তারার মা গলার স্বর খুব শান্ত করে নামিয়ে আনে, সোমার কানের কাছাকাছি মুখ নিয়ে যেন চুপে চুপে বলে—আমাদের প্রবীর মাস্টার জাতে পাটনী, সেটা জান তো? ওর বাপ মা ভাই সব আছে, কি দুঃখে তাদের দিন যাচ্ছে আহা! সেদিন ধুপখালের হাটে প্রবীর মাস্টারের মায়ের সঙ্গে দেখা হলো। বুড়ি কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। ছেলে থাকতেও তার ছেলে নেই, ছেলে ভদ্দর হয়ে গেছে, বাপ-মার দুঃখ, একবার উঁকি দিয়েও দেখতে যায় না।

সোমার নিঃশব্দ আগ্রহে উৎসাহিত হয়ে তারার মা যেন কাঞ্চীপুরের গোপন রহস্যের বার্তা একে একে শুনিয়ে দিতে থাকে—আর এই যে আমাদের বিনোদ পণ্ডিত, বিয়ে করেছে এক বড়মানুষের মেয়েকে। শুচির বাপের বাড়ির অবস্থা খুব ভালো। কিন্তু হলে হবে কি? বিনোদ পণ্ডিত মেয়েটাকে না খাইয়ে শুকিয়ে মারছে, একটি দিনের জন্যও বাপের বাড়ি যেতে দেয় না।

সোমার কিছুক্ষণের বিষণ্ণ মুখে ধীরে ধীরে হাসির পুলক ফুটে ওঠে। তারার মা নিজেকে নিন্দে করে, প্রবীর মাস্টারকে আর কাব্যতীর্থকে নিন্দে করে যে-কাহিনী শুনিয়ে যাচ্ছে, তার তাৎপর্য বুঝতে আর ভুল হতে পারে না সোমার। তারার মা যে কাহিনীকে অপরাধী কাঞ্চীপুরের কুৎসারূপে চুপে চুপে শুনিয়ে যাচ্ছে, সোমার মনে সেই কাহিনীই অশ্রুতপূর্ব পুণ্যকথার মত যেন মুগ্ধ আবেশ সৃষ্টি করে। এত মহৎ হয়েও যারা এত ছোট হয়ে আছে, পরের দুঃখের মূর্তির দিকে যারা প্রতি মুহূর্ত চোখ মেলে তাকিয়ে আছে, নিজের দুঃখ দেখতে পায় না, তাদের কাছে সব পরাভব মেনে নিয়ে, এবং সব অক্ষমতা স্বীকার করে এই কাঞ্চীপুরের কাছ থেকে চুপে চুপে পালিয়ে যেতে হবে, কিন্তু মিথ্যা অহংকারের ভুলে তাদের

আর ছোট করে দেখতে চায় না সোমা।

তারার মা'র প্রশ্নেই আবার সোমার এই ক্ষণিকের ধ্যানস্থ সম্বিৎ যেন চমকে ওঠে। তারার মা বলে—তুমি কি নিজের জন্যে ভিন্ন করে রাঁধবে গুরুমা?

সোমা—না।

তারার মা খুশি হয়ে বলে—তাই ভাল, এক হেঁসেলেই সব হয়ে যাবে, ভিন্ন ঝঞ্ঝাট করে লাভ কি? তা ছাড়া, আমার ছোঁয়া খেতে ভয় করবার কিছু নেই গুরুমা, ছোট জাত নই, আমাদের জলচল আছে।

সোমা—তার জন্যে নয়, শুধু আজ রাত্রিটাই তো, না খেলেও চলবে। আমার জন্যে রান্না করতে হবে না।

তারার মা সোমার কথার ইঙ্গিত হয়তো বুঝতে পারে না। আপত্তি করে বলে—একেবারে না খেয়েই থাকবে, ও কি কথা?

সোমা—না, আমি ভাতটাত খাব না। শুধু একটু জল গরম করে দিও।

তারার মা—কেন?

সোমা—চায়ের জন্যে।

তারার মা—সঙ্গে চা এনেছ তো? এখানে ওসব বালাই নেই।

সোমা—হ্যাঁ।

তারার মা—বেশ, এবার তুমি নিজের ঘরে গিয়ে বাতি দাও, সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

আঙিনার পুবদিকে কয়েকটা ঝুমকো জবার গাছ, তারই পাশে সোমার থাকবার ঘরটা নতুন তৈরী করা হয়েছে বলে মনে হয়।

সোমা ধীরে ধীরে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, আজ রাত্রিটুকু ভোর করে দিতে পারলেই যে-ঘরকে পিছনে রেখে চিরকালের মত বিদায় নিয়ে চলে যাবে সোমা, আর এক মুহূর্তের জন্যও ফিরে তাকাবে না। সোমার মনে আর অভিমান নেই, রাগ নেই, অভিযোগ নেই। মনটা সব অহংকারের বোঝা শূন্য করে নিয়ে একেবারে হালকা হয়ে গিয়েছে।

ঝুমকো জবার গাছটা পুরনো, কিন্তু ঘরটা একেবারে নতুন। ভিতটা শুকিয়ে খটখটে হয়ে গিয়েছে, কিন্তু দেয়ালে গাঁথা জানলা ও দরজার চারদিকটা এখনো ভেজা ভেজা, কাঁচা মাটির গন্ধ। সোমা তার নিজের ঘরের ভিতরে ঢুকে একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। কারণ, ঘরটা একেবারে আসবাবহীন নয়। কাঁচা কাঁঠাল কাঠের একটা সাধারণ রকমের খাট, দেখেই বোঝা যায়, সাততাড়াতাড়ি তৈরী করা হয়েছে। দেয়ালে দু' জায়গায় তিন সারি করে তাক আছে জলচৌকির মত দেখতে একটা বস্তু, টেবিলের কাজ চলতে পারে। সোমা দেখতে পায়, তার বইয়ের প্যাকেটটা এই চৌকির উপর রয়েছে। বাক্স বিছানা স্টোভ, চায়ের বাসন, ছবি আঁকার সরঞ্জাম—কাজের জিনিস বলতে যা কিছু সোমা সঙ্গে এনেছিল সবই যেন অদৃশ্য এক যত্নের ছোঁয়ায় ঠিক জায়গা মত সাজানো রয়েছে।

অনেক কিছু কাজের জিনিস, যা সঙ্গে আনতে পারেনি সোমা, তাও এখানে কে যেন সাজিয়ে রেখে গিয়েছে। একটা জলের কুঁজো, একটা হাতপাখা, মশারি টানাবার দড়ি, একটা ল্যাম্প। কে এই দরদী শিল্পী, পরের ঘর সাজিয়ে দেবার জন্য এত গরজ? যিনিই হোন, তিনি বোধ হয় আবেগের বশে একটু বেশিরকম অনধিকার চর্চা করে গিয়েছেন।

যাই হোক, মাত্র আজ রাত্রিটুকু। কাঞ্চীপুরের আতিথ্যকে মাত্র আর কয়েকটি ঘণ্টা সহ্য করে বেঁচে থাকতে পারে, তার পরেই মুক্তি। তাই আর নতুন করে বিচলিত ও চিন্তিত হবার কোন প্রয়োজন নেই। ঝুমকো জবা গাছের পাশে এই নতুন মাটির ঘর, এটাকে জীবনের নীড় বলে কখনই ভুল করবে না সোমা। বরং ঘরটাকে একটা যত্নসজ্জিত ফাঁদ বলেই মনে হয়,

ব্যাধ আড়ালে সরে আছে। ভুল করে এখানে একবার ঘুমিয়ে পড়লে জাতকুলমান দিয়ে তৈরী সোমার জীবনের সব সম্ভ্রম চিরকালের মত লুপ্ত হয়ে যাবে।

সোমা আলো জ্বালে। গরম জলের হাঁড়ি নিয়ে তারার মা উপস্থিত হয়। পিছু পিছু শিশুভবনের ছেলেমেয়েরা হল্লা করে ছুটে আসে। তারার মা ধমক দেয়--যা যা রাক্ষসগুলো, এদিকে এসেছিস তো ভাল হবে না।

সোমা জিজ্ঞাসা করে--কি হয়েছে?

তারার মা--তোমার চা খাওয়া দেখতে এসেছে।

সোমা--শুধু দেখবে কেন? আরও চা তৈরি করে ওদের খাইয়ে দাও।

শিশুভবনের আঙিনায় একটা পিদিমের আলোর কাছে বসে চা তৈরী করে তারার মা। ছেলেমেয়েগুলি অপলক চোখে চেয়ে থাকে, তাড়াহুড়ো ঠেলাঠেলি বা খাই-খাই চিৎকার নেই। তারার মা যার হাতে যেমন চায়ের খুরি তুলে দেয়, সেও তেমনি চুপচাপ খেয়ে সরে পড়ে। সোমা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে।

দেখতে পায় সোমা, তার নিজের বোন চুনিপান্নার মতই কতগুলি কচি মানুষের তৃষ্ণার্ত প্রাণ যেন আঙিনায় বসে কৃতার্থভাবে মানুষের স্নেহের প্রসাদ খেয়ে খুশি হয়ে উঠছে। এখানে দাঁড়িয়ে ওদের মুখের দিকে তাকলে ঠিক ভিখিরী ছেলের পাল বলে মনে হয় না। ওদের আগ্রহটা ঠিক চা খাওয়ার ক্ষুধা তৃষ্ণা বা লোভের মত নয়। গুরুমার মমতা আদায় করে, ভাই-বোনের জটলার মত গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে, তারার মার যত্ননিপুণ হাত থেকে যেন জীবনের একটা প্রাপ্য গ্রহণ করছে সবাই। মিষ্টি চা না হয়ে যে-কোন বস্তু হতো, ঠিক এমনই আগ্রহ ও আনন্দে বোধ হয় ওরা ছুটে আসতো।

জনার কোলে সেই ভোলা, সবচেয়ে ছোট। তারার মা ভোলার জন্য এক বাটি চা এগিয়ে দিতে যায়। সোমা নিজের অজ্ঞাতসারে একটা আর্তনাদ করে ওঠে--আহা! ওকে দিও না, এইটুকু বাচ্চাকে চা খাওয়াতে আছে?

ভোলার জন্য হঠাৎ এই প্রগল্‌ভ মমতার আতিশয্য সোমার নিজের কাছেই বড় বিসদৃশ মনে হয়। সিন্ধু নামে কোন্ এক জীবের ছেলেকে না চিনে কোলে নিয়ে কি অশুচি বোধ করেছিল সোমা, এই তো কয়েক ঘণ্টা আগে!

ভোলাও ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে। জনা সান্ত্বনা দেয়, ভোলা কান্নার স্বর আরও চড়িয়ে দেয়।

সোমা অপ্রস্তুত হয়ে, বোধহয় নিজের মনের দুর্বলতাকে সংযত করে রাখার জন্যই এইবার কথাগুলি শক্ত করে বলে--ওকে এক মুঠো চিনি দিয়ে দাও তারার মা, একরত্তি ছেলে, কী লোভী!

ছেলেমেয়েদের চায়ের আসর ভাঙবার পর সোমা এক বাটি চা নিয়ে খাটের উপর বসে। তারার মাও সোমার ঘরের ভিতর-দরজার কাছে মেঝেতে ক্লান্তভাবে বসে, আর এক বাটি চা নিয়ে তৃপ্তিভরা চুমুক দিয়ে খায়।

প্রথম চুমুকের তৃপ্তিতেই তারার মা যেন গলে গিয়ে মন্তব্য করে--আঃ কাঞ্চীপুরের ভাগ্যি ভাল, লক্ষ্মী সরস্বতী দুই হলো।

সোমা--কি বলছো তারার মা?

তারার মা--বিনোদ পণ্ডিতের বউ শুচি হলো কাঞ্চীপুরের লক্ষ্মী, আর তুমি হলে সরস্বতী।

সোমা হাসতে থাকে--কোথায় শুনলে ওকথা? কেউ বলেছে?

তারার মা বাটিতে চুমুক দিতে গিয়েই থেমে যায়, সোমার দিকে যেন অনুযোগভরা দৃষ্টি তুলে তাকায়।--শুনবো আবার কোথায়? দুটো ভাল কথা বলতে পারি না। তুমি কি আমাকে এমনি মুখ্‌খু মানুষ মনে করলে?

সোমা লজ্জিত হয়।—ছিঃ, আমি তোমাকে মোটেই তা মনে করি না তারার মা। যাক, শুচিদি কাঞ্চীপুরের লক্ষ্মী নিশ্চয়, কিন্তু আমি সরস্বতী নই তারার মা, লেখাপড়া খুব কমই শিখেছি।

সোমা একটু চুপ করে থেকে বলে--তা না হলে ষাট টাকা মাইনের চাকরি নিয়ে এখানে আসতে হয়?

তারার মা মন্তব্য করে--তোমার কপাল ভাল।

সোমা চুপ করে যায়, তারার মাকে আর যুক্তি দিয়ে তার মন্দ কপালের ইতিহাস বোঝাবার চেষ্টা না করাই ভাল।

তারার মা ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায়--এবারে হেঁসেলে গিয়ে ঢুকি। তোমার জিনিসপত্তর সব বুঝে গুণে দেখে নাও গুরুমা। যদি আবারও কিছু গুছিয়ে সাজিয়ে দিতে হয় তো এখুনই বল।

সোমা--আমার ঘরের জিনিসপত্তর কি তুমিই গুছিয়ে দিয়ে গেছ?

তারার মা--হ্যাঁ গো, প্রবীর মাস্টার যেমনটি বলেছে আমি তেমনটি সাজিয়ে রেখেছি।

সোমা--প্রবীর মাস্টার এসেছিলেন এখানে?

তারার মা--হ্যাঁ, কিন্তু ঘরে ঢোকেনি, তুমি নিশ্চিন্তি থেকো।

সোমা--ঘরে ঢোকেননি কেন?

তারার মা--ওমা! সে ঢুকবে কেন এখানে? সব ছোঁয়া যাবে না? তোমার ঘরে জল রয়েছে, বাসনপত্র রয়েছে, কাপড়চোপড় রয়েছে...।

তারার মা চলে যায়। সোমার ভাবনাগুলি যেন আত্মধিক্কারের জ্বালায় বাইরের অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যেতে চায়। কিন্তু এই প্রবীর মাস্টার নামে লোকটিও তো অদ্ভুত বেহায়া, যেচে নিজের গায়ে এই অপমানের কালিমা মাখবার কি দরকার? জন্ম-অপরাধীর মত অস্পৃশ্য মূর্তি নিয়ে শুদ্ধশোণিত সজ্জাতদের অনুগ্রহের সিংহদ্বারে উঁকি দিতে আসে কোন্ উপহারের লোভে? ওর রক্ত বিদ্রোহ করে না কেন?

শুধু প্রবীর মাস্টার নয়, এত শ্রদ্ধেয় কাব্যতীর্থ ও শুচিদিকেও ক্ষমা করতে পারে না সোমা। এ কী রকম ব্যবহার? হয় তাকে বাড়িতে আসতেই দিও না! কিন্তু নেমন্তন্ন করে ডেকে নিয়ে বাইরের বারান্দায় পাত পেড়ে দিতে শুচিদির মনুষ্যতে কি একটুও বাধলো না?

সোমা বুঝতে পারে, একদিনের পরিচিত কাঞ্চীপুরের বন্ধন থেকে পালিয়ে যাবার আগে, একটা সমবেদনার উপহার সবার অলক্ষ্যে রেখে সে চলে যাচ্ছে, পৃথিবীর হাতে তার চেয়ে ঢের বেশী নিগৃহীত একটি মানুষের উদ্দেশ্যে।

আরও ভাবতে গিয়ে সোমার মনটা যেন ভয় পেয়েই আরও বেশী সতর্ক হয়ে ওঠে। এই সমবেদনার ইতিহাসকে সূচনাতেই স্তব্ধ করে দেওয়া উচিত, যেন কোন ভুলের প্রশ্রয় পেয়ে পরীক্ষার মূর্তি হয়ে তার জীবনের পথে দেখা না দেয়। একটা গোপন স্মৃতি হয়েও এই সমবেদনা যেন তার মনের ভিতর ঠাঁই নিতে না পারে। এখানকার ভুলের হিসাব এখানেই শেষ করে দিয়ে ভদ্রলোকের মেয়ের সম্ভ্রমটুকু বাঁচিয়ে নিয়ে চলে যেতে হবে।

আলোটাকে একটু উজ্জ্বল করে দিয়ে সোমা খাটের উপর বসে। বিছানাটা আর না খোলাই ভাল, জেগে জেগে রাতটুকু কাটিয়ে দেওয়া যাবে। হঠাৎ চোখে পড়ে, একটি খোলা চিঠি তাকের উপর চাপা রয়েছে, যেন সোমারই উদ্দেশ্যে।

সোমার কাছে লেখা চিঠি নয়, গ্রামসেবা কমিটির প্রেসিডেন্ট নয়ন চৌধুরীর কাছ থেকে সেক্রেটারী প্রবীর পাটনীর কাছে লেখা চিঠি।

চিঠির কতগুলি লেখার নীচে লাল কালির দাগ। শিশুভবনের অধ্যক্ষার উপর কি কি কাজের ভার দেওয়া হলো, তারই একটি তালিকা দিয়েছেন নয়নবাবু।

(ক) ছেলেমেয়েদের জাতীয় সঙ্গীত শেখানো।
(খ) অঙ্কের মধ্যে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ আর নামতা।
(গ) একটু বেশী করে ডিসিপ্লিন।
(ঘ) একটু কম করে ইতিহাস্।
(ঙ) মাঝারি রকমের ভূগোল জ্ঞান।

চিঠির শেষাংশে প্রবীর মাস্টারের প্রতি অনেকগুলি নির্দেশ ঃ

আপনি নিজে স্টেশনে এসে ওঁকে নিয়ে যাবেন, ওঁর সব রকম স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রাখবেন, ওঁর থাকবার জন্য একটা নতুন ঘর তুলে কতগুলি দরকারী আসবাবপত্রও তৈরী করে দেবেন। কলকাতার মানুষ উনি, একটা বড় রকমের আদর্শ নিয়ে এসেছেন, সুতরাং ওঁকে কোনমতে নিরুৎসাহ না করা আপনারই দায়িত্ব। ...আপনার ও কাব্যতীর্থের গত মাসের বৃত্তি পাঠালাম।

সোমার কাছে একটা প্রহেলিকা এতক্ষণে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। কাঞ্চীপুর রোড স্টেশন থেকে শিশুভবন পর্যন্ত যে গ্রাম্য একলব্য সোমাকে আলো হাতে পথ দেখানো থেকে শুরু করে এখানে এসে এই ঘরটিকে পর্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের উপচারে সাজিয়ে রেখে গিয়েছে, সে শুধু নয়নবাবুর নির্দেশ পালন করেছে, তার চেয়ে একতিলও বেশী কিছু নয়। সে শুধু বৃত্তিদাতা প্রেসিডেন্টের হুকুমে নিয়মমত চাকরি করে গিয়েছে। সোমার মনের গভীরে নিহিত সেই ভাবতে-ভালো-লাগা সংশয়টা নিতান্ত মিথ্যা, নিতান্ত অলীক, এসবের মধ্যে প্রবীর মাস্টারের আগ্রহের কোন স্পর্শ নেই।

কী বিভ্রম, কী লজ্জা, কী দুর্বলতা! এতক্ষণ যেন একটা নিশির ডাকের ছলনার সঙ্গে অকারণে এত মান-অভিমান নিয়ে বোঝাপড়ার চেষ্টা করেছে সোমা। ঝুমকো জবা গাছের পাশে এই যত্নসজ্জিত নতুন মাটির ঘর, এটা ফাঁদ নয়, কোনও ব্যাধও আড়ালে দাঁড়িয়ে নেই, এটা নিছক একটা ফাঁকি।

নয়নবাবুর চিঠিটা আর একবার পড়ে সোমা। প্রতি ছত্রে আশ্বাস আছে, প্রতি কথায় স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতি আছে। শিশুভবনের অধ্যক্ষার জন্য যে কর্তব্যের তালিকাটি দেখা যাচ্ছে, সেটাও মোটেই অগ্নিপরীক্ষার ব্যাপার নয়, ভয় করবার কিছুই নেই।

তারার মাকে ডাক দিয়ে বলে সোমা—ছেলেদের খাইয়ে তুমি আমার কাছ থেকে একটা চিঠি প্রবীর মাস্টারকে এখুনি দিয়ে আসবে তারার মা...আর শোন, আমি খাব, আমার চাল নিও।

নয়নবাবুর চিঠি আর একবার সাবধানে পড়ে সোমা। হ্যাঁ, গ্রামসেবা কমিটির সেক্রেটারীকে ইচ্ছামত কাজের হুকুম দেবার অধিকার শিশুভবনের অধ্যক্ষার আছে। নয়নবাবু এই চিঠিতে স্পষ্ট করেই সোমাকে সেই অধিকার দিয়েছেন।

চিঠি লিখতে আরম্ভ করে সোমা।

আজ সকাল থেকে কাঞ্চীপুরের লোক দলে দলে ছুটেছে, এখান থেকে প্রায় ক্রোশ তিনেক দূরে মরাকালিন্দীর ওপারে একটা জঙ্গলের দিকে। জঙ্গলটার নাম পায়রাপরীর বন।

পায়রাপরীর বন, পায়রা আছে হাজার হাজার, যারা হলো এই বনভূমির সম্রাজ্ঞী এক পরীর প্রজা। কিন্তু প্রজাদের যেমন দুচোখে স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যায়, সম্রাজ্ঞীকে সেভাবে কেউ অবশ্য আজ পর্যন্ত দেখতে পায়নি। ক্বচিৎ কোন শীতজ্যোৎস্নার রাত্রে মরাকালিন্দীর পাশে জেলা বোর্ডের সড়কে দাঁড়িয়ে হাটফেরত বেসাতীর দল দেখতে পায়, বনের মাথার উপর পরী উড়ে বেড়াচ্ছে, মস্ত বড় বড় দুটো পাখা, কুয়াশার চেয়েও কোমল, সারা গায়ে ফুলের গয়না।

কল্পলোকের আইন অনুসারে এই বনের মালিকানা স্বত্ব পায়রাপরীর হলেও, মতিগঞ্জের কাছারীর নথি অনুসারে এটা হলো ভৈরববাবুর জমিদারী। বড় বড় শাল অর্জুন আর ডুমুর গাছ, শ্বেত পুনর্নবা আর কণ্টিকারীর ঝোপ, আরও শত রকমের ফুল লতা কাঁটা গুল্ম ও ওষধির উপনিবেশের মত পায়রাপরীর বন। শত রকমের পোকা ও পতঙ্গ, শত বর্ণের পাখি, সাপ গোসাপ সজারু আর খাটাসের লীলাভূমি। ডুমুরের ডালে ডালে লক্ষ মধুকরের কীর্তি মৌচাকগুলিও প্রকাণ্ড রসাল ফলের মত শোভা পায়। পায়রাপরীর বন থেকে ভৈরববাবুর আয় মন্দ হয় না। যার ইচ্ছা ভৈরববাবুর কাছে পাঁচ টাকা জমা দিয়ে একটা পাস কিনে আনতে পারে, যার ফলে এক সপ্তাহ ধরে পায়রাপরীর বনে চাক ভেঙে মধু যোগাড় করা যায়। জ্বালানির জন্য শুকনো ঝোপঝাপ বা মরা গাছের ডাল পেতে হলে জমা দিতে হয় এক মাসের জন্য দশ টাকা।

কিন্তু সম্প্রতি ভৈরববাবু একটা বড় রকমের লাভের বন্দোবস্ত করেছেন। সমস্ত পায়রাপরীর বনটাকে লীজ দিয়ে দিয়েছেন যুদ্ধমার্কা ঠিকেদারের কাছে। দি মিনার্ভা বিলডার্স, একটা ঠিকেদার কোম্পানী যুদ্ধের প্রয়োজনে কাঠ সাপ্লাই করার ভার নিয়ে পায়রাপরীর বনের পাশে মাঠের ওপর ক্যাম্প ফেলেছে। এক শতের উপর করাতী কুলি মিস্ত্রি ও দারোয়ান এসেছে—কয়েকটা বড় বড় কলের করাতও আছে।

মিনার্ভা বিলডার্সের করাত চলছে অবিশ্রান্ত, বড় বড় শাল আর অর্জুনের মৃতদেহগুলি স্তূপাকারে পড়ে থাকে, আতঙ্কিত পায়রার দল ঝাঁকে ঝাঁকে আর্তকূজন করে উড়ে বেড়ায়।

কিন্তু এখান থেকে মাইল খানেক দূরে নবগ্রামে আজই একটা বৃক্ষ রোপণ উৎসব খুবই সমারোহের সঙ্গে শেষ হলো। পৌরোহিত্য করলেন কাব্যতীর্থ। সর্বকামফলপ্রদ বৃক্ষরূপী জনার্দনের ছায়াঘন করুণাকে মাটির পৃথিবীতে আহ্বান করে মুগ্ধ মনের তৃপ্তি নিয়ে একা একা এই পথে কাঞ্চীপুর ফিরে যাচ্ছিলেন কাব্যতীর্থ। তিনি বিশ্বাস করেন, এ মাটি সত্যিই আঁচল পেতে মানুষের মুখের পানে চেয়ে আছে, সে-আঁচল শুধু প্রাণের ফুলে ও ফলে ভরে দিতে হয়, কখনও শূন্য করে রাখতে নেই। ভুবনস্য ধর্ত্রী পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃংহ পৃথিবীং মা হিংসীঃ...কিন্তু কাব্যতীর্থের মুগ্ধমনের গুঞ্জস্বরণ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। মিনার্ভা বিলডার্সের ক্যাম্পের কাছে এসে তিনি থমকে দাঁড়ালেন, শাল আর অর্জুনের মৃতদেহগুলির দিকে তাকালেন। তারপর নিজের মনেই বলে উঠলেন—কী নিষ্ঠুর! কী ভয়ানক!

ক্যাম্পের ভিতরে ঢুকে পদস্থ গোছের এক ভদ্রলোকের কাছে এসে দাঁড়ালেন কাব্যতীর্থ। —আমার একটা বক্তব্য ছিল, কাকে বলি?

পদস্থ গোছের ভদ্রলোক বললেন—আমাকে বলুন, আমিই এই কোম্পানীর ওভারসিয়ার।

কাব্যতীর্থ—বনটাকে এভাবে উচ্ছেদ করা হচ্ছে কেন?

ওভারসিয়ার—উচ্ছেদ মানে কি মশাই? জঙ্গল কাটা হচ্ছে।

কাব্যতীর্থ—কেন?

ওভারসিয়ার—কাঠের জন্য।

কাব্যতীর্থ—কাঠের জন্যে বনটাকে নির্মূল করবেন, আমাদের যে সর্বনাশ হবে।

ওভারসিয়ার বিরক্ত হয়ে বলেন—আবোলতাবোল বকবেন না মশাই। সাড়ে চার হাজার টাকা দিয়ে লীজ নেওয়া হয়েছে। লোকসান হলে মিনার্ভা বিলডার্সের হবে। আপনার সর্বনাশটা কি হবে মশাই?

কাব্যতীর্থ হাত জোড় করেন—না, এ কাজ করবেন না। পায়রাপরীর বন নির্মূল করে দিলে অন্তত বিশটা গ্রাম মরুভূমি হয়ে যাবে।

ওভারসিয়ার সন্দিগ্ধভাবে কাব্যতীর্থের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর ডাক দিলেন—দারোয়ান?

কাব্যতীর্থ তেমনি হাতজোড় করে আবেদন জানাচ্ছিলেন—দেখতেই তো পাচ্ছেন, গাছগুলির গায়ে সিঁদুর মাখানো! গাঁয়ের লোক পুজো করে গেছে। মাত্র কতগুলি কাঠের লোভে এই গাছ কাটবেন না, আমাদের ছায়া মেঘ বৃষ্টি পাখির ডাক এভাবে শেষ করে দেবেন না! আমাদের রোগের ওষুধ এই বনের লতাপাতা, আমাদের...।

ওভারসিয়ার হাসছিলেন। দারোয়ান কাব্যতীর্থের ঘাড়ে হাত দিয়ে বলে—শালা পাগলা কাঁহাকা!

কাব্যতীর্থকে ধাক্কা দিয়ে ক্যাম্পের বাইরে নিয়ে আসে দারোয়ান। কাব্যতীর্থ বলে—জোর করলে কিছু হবে না ভাই। আমি গাছ কাটতে দেব না।

প্রত্যুত্তরে দারোয়ান আরও জোরে একটা ধাক্কা দেয়। কাব্যতীর্থ মুখ থুবড়ে পড়ে যান। তবু খুব বেশী আঘাত লাগে না, মাত্র ভুরুর উপরটা সামান্য কেটে গিয়ে রক্ত দেখা দেয়।

কাব্যতীর্থ সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে সত্যিই পাগলের মত চেঁচিয়ে বলতে থাকেন—এ বন নষ্ট করতে দেব না, দেব না দেব না...।

কাব্যতীর্থের মত মানুষের পক্ষে পাগল হয়ে যাবারই কথা। এই পায়রাপরীর বন, যেন বনস্পতিময় আদিম পৃথিবীর একটি পুরাতন ভালবাসার হৃদয় কাঞ্চীপুরের প্রতিবেশীরূপে দাঁড়িয়ে আছে, আজ কতকাল ধরে। কত ঝড়ো হাওয়ায়, কত বনফুলপরিমলে, কাঞ্চীপুরকে কত রূপকথা দান করে আসছে এই পায়রাপরীর বন।

কাব্যতীর্থ চেঁচিয়ে বলছিলেন—এ বন গেলে আমরা ভিখিরী হয়ে যাব, আমাদের গ্রাম শুকিয়ে যাবে, এ বন নষ্ট করতে দেব না।

একটি দুটি করে পথচারী গ্রামের লোক ব্যস্তভাবে কৌতূহলী হয়ে কাব্যতীর্থের কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপর আরও আসে। খবরটা রাষ্ট্র হয়ে যায় চারদিকে। দলে দলে নানা গ্রামের লোক ছুটে আসতে থাকে। প্রবীর মাস্টারও খবর পেয়ে ছুটে আসে। বাণীপীঠের ছেলেরাও এসেছে।

বেলা দুপুর হতে না হতেই হাজার খানেক মানুষের একটা জনতা মিনার্ভা বিলডার্সের ক্যাম্প ঘিরে ফেলে একসঙ্গে হাতজোড় করে অনুরোধ করে—বন নষ্ট করবেন না।

ক্যাম্প ছেড়ে সবচেয়ে আগে পালিয়ে যায় দারোয়ান আর ওভারসিয়ার। ওভারসিয়ার উর্দ্ধশ্বাসে সাইকেল চালিয়ে স্টেশনের দিকে পালিয়ে যান, দারোয়ান দৌড়তে দৌড়তে। একদল করাতীও ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে একটা গাছের ছায়ায় শান্তভাবে কাব্যতীর্থ বসেছিলেন। ভুরুর উপর কপালের হাড়টা ফুলে উঠেছিল। চাদরের একটা প্রান্ত দিয়ে ভুরুর উপর ক্ষত-চিহ্নটা হাত দিয়ে চেপে রাখেন কাব্যতীর্থ। একটু বিচলিতভাবে বলেন—প্রবীর, তুমি আমাদের গাঁয়ের লোকগুলোকে শান্ত কর ভাই, যেন কারও গায়ে হাত না দেয়।

জনতা তখন চিৎকার করে দুটো করাতের কল হিঁচড়ে নিয়ে চলে যাচ্ছিল, ঠাকুরপুরের বিলে ডুবিয়ে দেবার জন্য। প্রবীর গিয়ে বাধা দেয়।

মিনার্ভা বিলডার্সের কিছু লোক তখনও সন্ত্রস্তভাবে বসে ছিল। প্রবীর তাদের অনুরোধ করে—আপনারাও চলে যান, আর এখানে আসবেন না। আমরা গাছ কাটতে দেব না।

ক্যাম্প শূন্য হয়ে যায়। গাঁয়ের লোকদেরও প্রবীর অনুরোধ করে—বাস, আজ এই পর্যন্ত। আপনারাও ঘরে ফিরে যান।

সবাই ঘরে ফিরে যায় এবং সবশেষে কাব্যতীর্থ প্রবীর মাস্টার এবং বাণীপীঠের ছেলেরাও ফিরতে থাকে। তখন বিকাল হয়ে এসেছে। ঠাকুরপুরের বিলের উপর সূর্য নামছে অস্তস্নানের জন্য, জলে রং ধরেছে।

তারার মা সেই রাত্রেই সোমার চিঠি প্রবীর মাস্টারকে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। কিন্তু আজকের সকাল পার হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ আগেই, তবু চিঠির প্রত্যুত্তর এল না। চিঠির নির্দেশমত, সকাল হলেই প্রবীর মাস্টারের একবার এসে দেখা করবার কথা। কিন্তু প্রবীর তো আসেইনি, এমন কি চিঠির বদলে চিঠি দিয়ে একটা জবাবও দেয়নি। যেমন দায়িত্ববোধ তেমনি সৌজন্যবোধ।

"সেক্রেটারী, গ্রামসেবা মণ্ডল, সমীপেষু...।"

চিঠিটার ভাব ভাষা ও বিষয় আদ্যোপান্ত মনে পড়ে সোমার। শিশুভবনের জন্য ভারতবর্ষের একটা বড় মানচিত্র চাই, মহাত্মা গান্ধীর একখানা ছবি চাই। ছেলেমেয়েদের গায়ে জামা বলে কোন বস্তু নেই. এই বীভৎস দৃশ্য সোমা সহ্য করতে পারবে না। অবিলম্বে এক ডজন ফ্রক আর দু ডজন শার্ট চাই। একজন কবিরাজ বন্দোবস্ত করে দেওয়া হোক. প্রত্যহ ছেলেমেয়েদের একবার করে দেখে যাবে। আর, এতগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, দুধের বরাদ্দ মাত্র আধ সের! দৈনিক অন্তত সের পাঁচেক করে দুধ চাই।

একসঙ্গে এতগুলি দাবি। কিন্তু এর মধ্যে বিসদৃশ ব্যাপার এমন কি-ই বা আছে? এটা সোমার ব্যক্তিগত স্বার্থের দাবি নয়, এবং এর জন্যে তাকে টাকা খরচ করতে হবে না। এটা প্রবীর মাস্টারেরও ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, এবং তার পক্ষেও নিজের পয়সা খরচ করতে হবে না। খরচ হলে হবে নয়নবাবুর, গ্রামসেবা মণ্ডলের বদান্য প্রেসিডেন্টের। সোমার অধিকার, শিশুভবনের অধ্যক্ষা হিসেবে সেবামণ্ডলের সেক্রেটারীকে সে নির্দেশ দিতে পারে। এবং বেশ স্পষ্ট করেই দিয়েছে। এখন সেক্রেটারীর কর্তব্য, নয়নবাবুর কাছে গিয়ে ধর্না দিয়েই হোক আর যেমন করেই হোক, এই নির্দেশ বর্ণে বর্ণে পালন করা।

সবই খুব সাবধানে নিয়ম বাঁচিয়ে রীতি অনুযায়ী লিখেছিল সোমা, সরকারী অফিসের রিকুইজিশন নোটিশের মত। কিন্তু এই সব সরকারী দাবির মধ্যে কোথা থেকে এক অগোচরে দাবি ঢুকে শেষ পর্যন্ত সোমাকে আবার সাংঘাতিকভাবে ভুল করিয়ে দিল। চিঠির শেষদিকের লেখাগুলি মনে পড়ে সোমার।

> ...পুনশ্চ, সকালবেলা সময় করে একবার আসবেন। তারার মা'র কাছে শুনলাম. আপনি আমার ঘরের ভেতর ঢোকেননি, আমার জিনিসপত্র 'ছোঁয়া' যাবে বলে। ধন্য আপনার সংস্কার। এতে যে আমার শিক্ষাদীক্ষাকে আপনি কতখানি ছোট করে দেখলেন, তা বোধহয় বুঝতে পারেননি। যাই হোক, আপনাকেই আপনার ভুল শুধরে নিতে হবে। একবার আসবেন, এই ঘরেই চা খেয়ে যাবেন, কি 'ছোঁয়া' গেল কি না গেল, তার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না।

এই পুনশ্চটাই সব ভুল করে দিয়েছে। এটা তো আর শিশুভবনের সরকারী দাবি নয়, নিতান্ত ব্যক্তিগত। হয় একটা অন্যায়বোধের যন্ত্রণা থেকে, নয় কোন রুদ্ধ সমবেদনার উপদ্রব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই সোমা প্রবীর মাস্টারকে সামান্য একটা অনুরোধ করেছিল। সে আসুক, বুঝে যাক, সকলেই মানুষকে সংস্কারের চোখ দিয়ে দেখে না।

প্রবীর মাস্টার আসেনি। অনুরোধের মর্যাদা বুঝবার মত মানুষ এরা নয়। এরা শুধু নয়নবাবুর বৃত্তির দাপটে হুকুম তামিল করতে পারে। সব জেনেশুনে আবার ভুল করে যেচে অপমান গায়ে মেখেছে সোমা। যত চিন্তা করা যায় অপমানটা ততই যেন তীক্ষ্ণ হয়ে মনের ভিতর বিঁধতে থাকে। জীবনে কোনদিন কোন একদিনের পরিচিত পুরুষকে চা খেতে আহ্বান করবে, দুদিন আগেও সোমা এমন অসম্ভব ঘটনা কল্পনা করতেও পারেনি। এমন পরিষ্কার ভাষায় কোন যুবককে নিমন্ত্রণলিপি সে লিখতে পারে, এটাও বিস্ময়ের বিষয়। কোন্ এক দুর্নিরীক্ষ্য গ্রহের প্রকোপ যেন সোমার চিরদিনের অভ্যস্ত অহঙ্কারের জীবনকে মুহূর্তে মুহূর্তে ওলটপালট করে দিতে আরম্ভ করেছে। এই বোধহয় অধঃপতনের আরম্ভ।

অপমানটা আরও দুঃসহ, কারণ এই অধঃপতনও যে নিতান্ত ব্যর্থ। প্রথম নিমন্ত্রণলিপিও প্রত্যাখ্যাত হয়।

সোমা নিজের ঘর ছেড়ে আঙিনায় নেমে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে। পুকুরের ঘাটে ছেলেরা হৈ চৈ করে স্নান করছে, সোমা ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে তালের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছেলেদের স্নানের দৃশ্য দেখে। যারা বয়সে একটু বড়, তারা জল তোলপাড় করে সাঁতার দিয়ে স্নান করছে। যারা ছোট সিঁড়িতে বসে জলে পা ডুবিয়ে এক একটা তালপাতার ঠোঙা দিয়ে জল তুলে মাথায় ঢালছে।

এর মধ্যে শুধু একমাত্র জনা নিজের জন্য ব্যস্ত নয়। ভোলাকে অনেক উপরের একটা সিঁড়িতে সাবধানে বসিয়ে রেখে জনা নিজে নীচে নেমে এসে জল তুলে নিয়ে যায়, ভোলাকে স্নান করায়, হাত দিয়ে ঘষে ঘষে ভোলার পায়ের ধুলো-ময়লা ধুয়ে দেয়। ভোলা আনন্দে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে।

এই জনা মেয়েটাকে দেখতে কেমন যেন ভয় করে সোমার। ওর মা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে, কিসের লোভে জনাকে নিজের কোল থেকে নামিয়ে পৃথিবীর কোলে ফেলে দিয়ে জনার মা সরে পড়লো কে জানে? একরত্তি মেয়ে জনা, ভোলা ওর কেউ নয়। কিন্তু ভোলার জীবনের সত্যিকারের অধ্যক্ষা এই জনা। শিশুভবনের গুরুমা হয়েও সোমার পক্ষে যে কাজ করা অসম্ভব, শিশুভবনের শিশু হয়েও জনার পক্ষে সেটা কত অনায়াসসাধ্য। মা হওয়ার ও বোন হওয়ার যে নিয়মগুলি সংসারে প্রচলিত আছে, জনা যেন তার মিথ্যা চরম করে প্রমাণিত করে ছেড়েছে। কোন সর্ত নেই, স্বার্থ নেই, ষাট টাকা মাইনের দাবি নেই—জনা যেন একটা প্রাণের আবেগ, ভোলাকে সর্ব অকল্যাণের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য সর্বদা পাহারা দিয়ে ফিরছে। কেমন করে এটা সম্ভব হয়, সোমার মন এই প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পায় না। তারার মা অবশ্য এই রহস্যের ব্যাখ্যা করে মাঝে মাঝে মন্তব্য করে—জনা, তুই নিশ্চয় আগের জন্মে ভোলার মা ছিলি।

তাহলে তো ভোলাকে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান বলতে হয়। জন্মে জন্মে একই মা পেয়ে আসছে। যাক গিয়ে, এসব তত্ত্ব নিয়ে বেশী চিন্তা করতে গেলে শুধু নিজেকে অনর্থক বিব্রত করা হবে। সোমা নিজের ঘরে ফিরে আসে।

পর পর দুটি চিঠি লেখে। একটি চক্রবেড়ের ঠিকানায়, মাকে। আর একটি শ্যামবাজারের ঠিকানায়, ভদ্রাকে।

মাকে এক কথায় আশ্বস্ত করে সোমা লেখে—বেশ ভাল আছি, চাকরিটা ভাল, জায়গাটা ভাল, লোকজনগুলি খুবই ভাল, কোন চিন্তা করো না।

ভদ্রাকে লেখে—একরকম বেঁচে আছি, চাকরিটা অদ্ভুত, জায়গাটা বিচিত্র, লোকগুলি উদ্ভট, জানি না আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

চিঠি লেখা শেষ করে আবার বাইরে বের হবার জন্য তৈরি হচ্ছিল সোমা। কি ভেবে চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। তারপর আর একটি চিঠি লেখে।

শ্রীনয়নচন্দ্র চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট গ্রামসেবা মণ্ডল

সমীপেষু.......।

লিখতে গিয়ে একবার হাত কাঁপে, বুকের ভিতর শ্বাসবায়ুর ছন্দ যেন এলোমেলা হয়ে যায়, কপালটা স্বেদাক্ত হয়ে ওঠে। প্রতিশোধের একটা ক্ষুদ্র স্পৃহা যেন শিশু সরীসৃপের শীতাক্ত স্পর্শের মত সোমার চিন্তাকে শিউরে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমার অসুবিধার কথা আপনাকে জানাইবার জন্য আপনিই বলিয়াছিলেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সমিতির সেক্রেটারী প্রবীরবাবুকে স্পষ্টভাবে এই নির্দেশ দিবেন যে, শিশুভবনের কাজে অথবা আমার ব্যক্তিগত কোন প্রয়োজনে তিনি যেন সাহায্য করিতে

কুণ্ঠা প্রকাশ না করেন। দুঃখের বিষয়, কতকগুলি কাজের বিষয় তাঁহাকে জানাইয়াও উত্তর পাই নাই।...

সংক্ষেপে অতি দ্রুত চিঠিটা শেষ করে ফেলে সোমা। ঠিকানা লিখে সব চিঠিগুলি এক সঙ্গে নিয়ে রান্নাঘরে এসে তারার মার কাছে দাঁড়ায়।

সোমা—ডালের হাঁড়িগুলো ওরকম খোলা রেখো না তারার মা, পাতা দিয়ে ঢেকে দাও। নইলে দেখতে কেমন ঘেন্না করে।

তারার মা বিরক্তভাবে উত্তর দেয়—ঘেন্না করলে চলবে কেন? বিনা মাইনেতে দেশের কাজ এইরকমই হয়ে থাকে!

সোমা—থাকগে ওসব কথা, কাল রাত্রে প্রবীর মাস্টারের কাছে আমার চিঠিটা ঠিক পৌঁছেছিল তো?

তারার মা—হ্যাঁ গো, তার হাতে দিয়েছি, আমার সামনেই তো সে চিঠিটা পড়লে।

সোমা—বেশ বেশ! আজ এই চিঠি কটা ডাকে যাবে।

তারার মা—চৌকাঠের ওপর রেখে দাও।

সোমা—আমি শুচিদির বাড়িতে একবার যাচ্ছি।

তারার মা—এস, দেরি করো না।

কাব্যতীর্থের স্ত্রী শুচি অনেকক্ষণ ধরে অস্থিরভাবে এদিক ওদিক করছিল। একবার ঘরের ভিতরে, এরবার বাইরে, তারপর নেমে এসে অপরাজিতার বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করে।

সোমাকে দেখতে পেয়ে বলে—এস ভাই।

সোমা—শুচিদি, ব্যস্ত আছেন মনে হচ্ছে?

শুচি—হ্যাঁ ভাই।

সোমা ঠাট্টা করে—কাব্যতীর্থমশাই বোধহয় ফিরতে দেরি করছেন?

শুচি পথের দিকে দূরান্তে দৃষ্টি তুলে বলে—তার জন্যে নয়, কি একটা হাঙ্গামা বেধেছে নদীর ওপারে, গাঁয়ের লোকজন সব সেইদিকে দৌড়ে গেছে।

সোমা—কাব্যতীর্থ মশাইও বুঝি সেখানে গেছেন?

শুচি—উনি সেখানেই ছিলেন, শুনলাম, ওঁকে কোন্ কোম্পানীর লোকেরা মেরেছে।

সোমার মুখটা হঠাৎ যন্ত্রণার আঘাতে বিবর্ণ হয়ে যায়। কাব্যতীর্থের মত মানুষকে মেরেছে, ঘটনাটা কল্পনা করতেও কেমন ভয়ানক অস্বস্তি হয়, এ যে দেববিগ্রহ লাঞ্ছিত করার চেয়েও জঘন্য অপরাধ।

বেদনারুদ্ধ নিঃশ্বাস মুক্ত করে দিয়ে সোমা বলে—এ আপনাদের এক অদ্ভুত দেশ শুচিদি, এখানে সবই সম্ভব।

শুচির উদ্বিগ্ন দৃষ্টিটা তেমনি পথের দিকে নিবদ্ধ হয়ে থাকে। সোমা সান্ত্বনার সুরে বলে—বেশী চিন্তা করবেন না শুচিদি, গাঁয়ের লোকজন যখন সবাই তাঁকে সাহায্য করতে ছুটে গেছে তখন...।

শুচি—বেশী চিন্তা কিছুই করছি না। সে পাগলকে তো আমি ভাল করে চিনি, হাসতে হাসতে ফিরে আসবে। কিন্তু প্রবীর ঠাকুরপোও গেছে কি না, তাই ভয় হয়।

সোমা—কেন?

শুচি—ওর গায়ে যারা হাত দিয়েছে তাদের সামনে পেলে কি ক্ষমা করে ছেড়ে দিয়ে আসবে প্রবীর ঠাকুরপো? প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়বে, তাতে তার প্রাণ থাক আর যাক। সেইজন্যে ভয়। তবে একটা ভরসা, সে সামনে আছে, রক্তারক্তি ঘটতে দেবে না।

সোমা—আপনার প্রবীর ঠাকুরপো দেখছি, একটি খাঁটি লক্ষ্মণ ভাই।

শুচি—তা ঠিকই বলেছ।

সোমা—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো শুচিদি?

শুচি—বল।

সোমা—এমন লক্ষ্মণ ভাইটিকে আপনারা ঘরের বাইরে পাত পেড়ে খেতে দেন কেন? ছোঁয়া যাবার ভয়ে?

শুচি—এ প্রশ্ন করে আমাকে লজ্জা দিও না ভাই। এ আমার মনের দোষ নয়, অভ্যাসের দোষ। অথচ এ পোড়া অভ্যাসের কোন মানেও বুঝি না।

সোমা—কাব্যতীর্থ মশাইও কি অভ্যাসের দোষেই...।

শুচি—না ভাই, তার মনেও এ দোষ নেই, অভ্যেসেও ছিল না।

সোমা—তবে তিনি এসব কুসংস্কার মেনে চলছেন কিসের জন্যে?

শুচি যেন একটা লজ্জার বাধায় কিছুক্ষণ ইতস্তত করে, তারপর স্পষ্ট করেই বলে ফেলে—আমার জন্যে!

সোমার মুখের ভাব লক্ষ্য করে শুচি আবার বলে—তুমি ভদ্রলোককে যা ভাবছো, সে তা নয় সোমা। সে আমাকে আশীর্বাদ করে বলেছে—আমার এ ভুল একদিন ভেঙে যাবে। আমিও জানি, একদিন ভাঙবে, ওর কথা তো মিথ্যে হবার নয়। কিন্তু মাঝে মাঝে বড় ভয় হয় সোমা, কি জানি কবে কেমন করে ভুল ভাঙবে।

শুচির চোখ দুটো হঠাৎ ঝাপসা হয়ে আসে। সোমা অনুতপ্ত ও অপ্রস্তুত হয়ে বলে—আপনি কিছু মনে করবেন না শুচিদি। আপনাকে লজ্জা দেবার জন্যে আমি এসব প্রশ্ন করিনি।

শুচি শান্ত স্বরে উত্তর দেয়—কিছু মনে করিনি। মনে করবার কিছু নেই।

এরপর, বোধ হয় আর কোন প্রসঙ্গ খুঁজে পায় না বলেই সোমা জিজ্ঞাসা করে—আপনার রান্নাবান্না সারা হয়ে গেছে?

শুচি—আরম্ভই করিনি তো সারা হবে কি? এসব খারাপ খবর শুনলে কি আর কোন কাজে মন লাগে। কখন যে ফিরবে কে জানে!

কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, কোন পরিকল্পনা করে সোমা এসময় শুচির সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। নেহাৎ একটা ঝোঁকের মাথায় চলে এসেছে। আসার আগে, পথে আসতে এবং এখানে আসার পরেও সোমা জানতো না যে, এক অকারণ অপমানের ইতিহাস তদন্ত করে জানবার জন্যই অগোচর ইচ্ছার ঝোঁকে এখানে সে এসেছে। কিছুক্ষণের প্রসঙ্গহীন নিস্তব্ধতার মধ্যে সোমার মনে পড়ে, কি সেই পরম জ্ঞাতব্য, যা জানতে না পারা পর্যন্ত সে স্বস্তি পাচ্ছে না।

সোমা জিজ্ঞাসা করে—প্রবীরবাবু কখন গেছেন আপনি জানেন?

শুচি—অনেকক্ষণ, সেই কোন্ সকালে।

সোমার প্রশ্নাকুল মুখের দিকে তাকিয়ে শুচি যেন একটা নতুন অর্থ এতক্ষণে বুঝতে পারে। কথাগুলি সান্ত্বনার মত কোমল করে নিয়ে শুচি বলে—তোমার ওখানেই তো যাচ্ছিল, চা খেতে ডেকেছিলে না?

সোমার সারা মুখে এক ঝলক রক্তাভ ছায়া চকিতে ছড়িয়ে পড়ে। কি যেন বলতে চেষ্টা করেও বলতে পারে না।

শুচি আরও স্পষ্ট সান্ত্বনা দেয়—কি আর করবে ভাই বল? বাণীপীঠের ছেলেরা এসে হাঙ্গামার খবর দিল, শোনা মাত্র ছুটে চলে গেল।

সোমা উঠে দাঁড়ায়—আমি যাই শুচিদি।

সোমার আকস্মিক ব্যস্ততায় শুচি একটু বিব্রত হয়ে বলে—যাবে? আচ্ছা এস, বেলাও অনেক হয়েছে।

আবার ভুল। ক্ষণিক অন্ধতার ভুল, শিক্ষার ভুল, কলকাতার তৈরী মনের ভুল এবং হয়তো বয়সের অভিমানের ভুল। মানুষ চিনতে বার বার ভুল করছে সোমা।

নিজের হাতে জ্বালানো এক মহা মূঢ়তার আগুন, নিজেই নিভিয়ে দেবার জন্য সোমা যেন ছুটে ফিরে যায় শিশুভবনের দিকে।

সমস্ত পথটা যেন একটা নিঃশ্বাসের ঝোঁকে অতিক্রম করে শিশুভবনে ফিরে আসে সোমা। আঙিনায় ঢুকেই চেঁচিয়ে ডাকে--তারার মা!

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তারার মা সাড়া দেয়--কি বলছো!

সোমা--আমার চিঠিগুলো কই?

তারার মা--সে কি! কখন ডাকে দিয়ে এসেছি, আমি কাজ ফেলে রাখি না গুরুমা।

শাস্তিভীত অপরাধীর মূর্তির মত অবসন্নভাবে ধীরে ধীরে নিজের ঘরে ফিরে যায় সোমা। বিছানার ওপর কিছুক্ষণ নিঃসাড়ভাবে বসে থাকার পর সোমা বুঝতে পারে যে, মাথাটা বড় বেশি ভার হয়ে বার বার ঝুঁকে পড়ছে।

হীন অহংকারের কলঙ্কে স্বাক্ষরিত সেই মিথ্যা অভিযোগের লিপিকা, এতক্ষণে নয়ন চৌধুরীর দরবারে রওনা হয়ে গিয়েছে। অভিযোগগুলি এমন একজনের বিরুদ্ধে, যে আজ সকালে তার জীবনের প্রথম লেখা আমন্ত্রণপত্রের সম্মান রাখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

অনেকদিন অনেক যুক্তি প্রশ্ন দিয়ে বিচার করেও নিজেকে যতখানি চিনতে পারেনি, আজকের অনুশোচনায় ভরা চোখের দৃষ্টি দিয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে নিজের স্বরূপ তার চেয়ে বেশী স্পষ্ট করে বুঝতে পারে সোমা।

সোমা বুঝতে পারে, জীবনে এই প্রথম সে এক ঘৃণ্য নীচ কাজ করেছে। শুধু বুঝতে পারে না। কিসের জন্য করলো।

সোমা বুঝতে পারে, প্রবীর মাস্টারের উপর তুচ্ছ কারণে অথবা অকারণে এত বেশী রাগ করা তার পক্ষে কত অশোভন। বুঝতে পারে না, কেন রাগ হয়।

সোমা বুঝতে পারে, নতুন হাওয়ার আনন্দে পতঙ্গের প্রগল্‌ভ চঞ্চলতার মত কাঞ্চীপুরের অতিরিক্ত সমাদরে তার আচরণগুলি নির্লজ্জ রকমের দুরন্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার চিত্তলোকের দহনে যে এক শুক্তির তৃষ্ণা স্বাতীজলের আশায় অস্থির হয়ে উঠেছে, এইটুকু শুধু বুঝতে পারে না সোমা।

বেলা বাড়ছে, বুঝতে পারে সোমা, কিন্তু স্নান করার উৎসাহ কেন নেই, হয়তো সেটা বোঝবার চেষ্টা করে না।

তারার মা এসে খেতে ডাকে।

সোমা বলে—এবেলা আর খাব না।

তারার মা রাগ করে চলে যায়। তারার মা'র রাগ করার অর্থ বুঝতে পারে সোমা। শুচিদিও না খেয়ে আছেন, স্বামী ঘরে ফিরে এসে না খাওয়া পর্যন্ত শুচিদির খাওয়া হতে পারে না। সবই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু সোমার পক্ষে না খেয়ে থাকবার কোন কারণ নেই, শুধু এই সত্যটুকু যুক্তি দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করে না সোমা।

বিকেল হয়ে আসে। শিশুভবনের আঙিনা ছেলেমেয়েদের খেলার চাঞ্চল্যে অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু নদীর ওপারে কে জানে কতদূরে, হাঙ্গামাটা শান্ত হলো কি না, এখনো জানতে পারা গেল না। সবাই নিরাপদে সুস্থ ভাবে ফিরে এলে হয়। ক্ষণে ক্ষণে সোমার মন দুশ্চিন্তায় উপদ্রুত হতে থাকে, চেষ্টা করেও একটা বই মন দিয়ে পড়া যায় না। কিন্তু ঠিক শুচিদির অনুকরণ করে এভাবে অস্থির হয়ে দুশ্চিন্তার অভিনয় করা সোমার পক্ষে যে শোভা পায় না, সোমা সেটা বুঝতে চায় না।

সন্ধ্যাও হয়ে গেল। সোমা ঘর ছেড়ে উঠে আসে। তারার মাকে অনুনয় করে বলে--তুমি

কষ্ট করে একবার যাও তারার মা, শুচিদির কাছে জেনে এস সবাই ফিরেছে কিনা।

আলোটা কেঁপে কেঁপে জ্বলে। শিশুভবনের অন্য ঘরে ছেলেমেয়েদের আবোলতাবোল গানের শব্দ শোনা যায়। সন্ধ্যা হাওয়ার ছোঁয়া লেগে আঙিনার বেড়ার ধারে একটা কাপাস গাছের শুঁটি ফেটে যায়, সাদা মেঘের কুচির মত একরাশ তুলো উড়ে এসে সোমার ঘরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ঘরটা যেন ক্ষণিকের মত স্বপ্নেদেখা এক ফুলছড়ানো বাসরঘরের মত অলীক হয়ে ওঠে।

—গুরুমা!

তারার মা ফিরে এসে ডাকে। সোমাও ঠিক ঘুমিয়ে পড়েনি, তবু চমকে উঠে উত্তর দেয়—কি খবর?

তারার মা—সবাই ফিরে এসেছে। সবাই খেয়েছে। তুমি খাওনি শুনে সকলে খুব রাগ করেছে।

সোমা—কে রাগ করলো?

তারার মা—সবাই। শুচি, বিনোদ পণ্ডিত, প্রবীর মাস্টার...।

সোমা—আমি খাইনি, সেকথা প্রবীর মাস্টারও শুনেছে নাকি?

তারার মা—হ্যাঁ, আমিই তো বললাম।

সোমা—উনি কি বললেন?

তারার মা—প্রবীর মাস্টার উল্টো আমাকেই ঠাট্টা করলো, আমি তোমাকে ধমক দিয়ে কেন খাওয়াইনি, সেই জন্যে।

সোমা হেসে ফেলে—উনি একবার ধমক দিতে এলেই তো পারতেন।

তারার মা—আসতো নিশ্চয়, কিন্তু এক্ষুণি দুজনে আবার মতিগঞ্জ চলে গেল।

সোমা একটু চমকে ওঠে—মতিগঞ্জ? কেন?

তারার মা—ঐ আজকের হাঙ্গামার ব্যাপার নিয়ে। আর বল কেন? ছেলে দুটোর জন্যে বড় দুঃখ হয়, পোড়া দেশের কাজের জন্যে মিছিমিছি কি হায়রানিই না হচ্ছে!

অন্য সময় হলে সোমা হয়তো আবার এই সংবাদের উপরেই নিজের বুদ্ধি দিয়ে গবেষণা করতে বসে যেত। কিন্তু আর সে সাহস নেই, নিজের যুক্তির উপর অত্যুচ্চ শ্রদ্ধাও আর নেই। আর চিন্তা করতে গেলেই ভুল হবে। নিজের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে কাঞ্চীপুরের অত্যদ্ভুত রহস্যময় আত্মাকে ধরতে যাওয়া বৃথা। বরং, একটু মাথা হেঁট করে, প্রিয়শিষ্যার নম্রতা নিয়ে কাঞ্চীপুরের হৃদয়ের কাছে ধরা দেবার জন্যই সোমা যেন এরই মধ্যে নিজেকে প্রস্তুত করে ফেলেছে।

কাঞ্চীপুরের ঘরের মেয়ের মতই সোমা বলে—আমাকে খেতে দাও তারার মা, বড্ড খিদে পেয়েছে।

নয়নের বৈঠকখানা। বছর কয়েক আগে এই বৈঠকখানাতেই ঐ তক্তাপোষে বসতো গাঁয়ের মক্কেলরা, আর চেয়ারটাতে বসতেন নয়নের বাবা বটকৃষ্ণ উকিল। আজও সেই তক্তাপোষ এবং সেই চেয়ার রয়েছে। কিন্তু চেয়ারে বসে আছেন বটকৃষ্ণের ছেলে নয়ন, আর তক্তাপোষে কাব্যতীর্থ ও প্রবীর মাস্টার। নয়ন উকিল নয়, সে হলো গ্রামসেবা মণ্ডলের প্রেসিডেণ্ট। আর তক্তাপোষে বসে রয়েছেন যে কাব্যতীর্থ এবং প্রবীর মাস্টার, তারাও মক্কেল নয়, তারা হলো গ্রামসেবা মণ্ডলের কর্মী। দু'পুরুষেই কি বিরাট পরিবর্তন! অথচ এই পরিবর্তনের তাৎপর্য অনেকে বুঝতে না পেরে অযথা নিন্দা করে।

আবার এমন অনেকে আছেন, যাঁরা এই পরিবর্তনের মহিমা খুব বেশী করে উপলব্ধি করেন। যেমন, স্বরাজ অয়েল মিল-এর মালিক মঙ্গলদাস মুলুকচাঁদ। ইনিও কংগ্রেসের একজন

উৎসাহী সভ্য এবং এতক্ষণ ইনিই এখানে বিশেষ প্রয়োজনে বসেছিলেন। এই মাত্র তিনি খুশী হয়ে বলে গেলেন--বাস্ বাস্, ইসিকো তো বোলে ক্রান্তি। বাহিরটা সোব সেই আছে, সেই ইমারাত, সেই সব কুছু। কিন্তু ভিতরটা বিলকুল বদল হোয়ে গেছে।

নয়নের জরুরী চিঠি পেয়ে আজ প্রবীর মাস্টার ও কাব্যতীর্থ এখানে এসে পৌঁছেছেন। কাব্যতীর্থের মাথায় একটা পটি বাঁধা। ভুরুর উপর ক্ষতটাকে ওষুধ লাগিয়ে শুচি নিজের হাতে পটি বেঁধে দিয়েছে, কাব্যতীর্থের আপত্তি গ্রাহ্য করেনি। পথে এসে ইচ্ছা করলে পট্টিটা খুলে ফেলে দিতে পারতেন কাব্যতীর্থ, কিন্তু তেমন ইচ্ছা করাটাই তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ ওটা শুচি নিজের হাতে বেঁধে দিয়েছে।

নয়ন প্রথম কাব্যতীর্থের মাথার পটিটার দিকেই নজর দেয়।--আপনার মাথার ব্যাণ্ডেজটা একটু বেশী বড় হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

কাব্যতীর্থ--আজ্ঞে হ্যাঁ।

নয়ন--লোকের সামনে বের হতে আপনার লজ্জা হচ্ছে বোধ হয়।

কাব্যতীর্থ--আজ্ঞে না। আপনার সামনে আবার লজ্জা কিসের?

নয়নের প্রশ্ন আর প্রশ্নের ভাষা শুনে চমকে ওঠে প্রবীর মাস্টার। কাব্যতীর্থের সঙ্গে নয়নকে এভাবে কথা বলতে কোনদিন সে শোনেনি। কাব্যতীর্থের ব্যাণ্ডেজটাকে, না কপালের ক্ষতটাকে, কোনটাকে বিদ্রূপ করছে নয়ন?

নয়ন বলে--মিনার্ভা বিলডার্সের যিনি মালিক, তিনি হলেন বিনয় চৌধুরী। চেনেন বোধ হয়?

কাব্যতীর্থ--না।

নয়ন--তিনি আমার ছোড়দা, আমার কাকার ছেলে।

নয়ন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার আরম্ভ করেন।--ভৈরববাবুও এসেছিলেন। এই দুজনের কাছেই আমি আজ লাঞ্ছিত হয়েছি আপনাদের অপরাধের জন্য।

কাব্যতীর্থ--অপরাধ?

নয়ন--হ্যাঁ, প্রথম তো আপনারা অহিংস নীতির ব্যতিক্রম করে মিনার্ভা বিলডার্সের ক্যাম্প আক্রমণ করেছেন এবং তাদের লোকজনকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয়...।

কাব্যতীর্থ--আমরা মোটেই আক্রমণ করিনি। আমরা শুধু অনুরোধ করেছিলাম...।

নয়ন--দু'হাজার লোক নিয়ে অনুরোধ করলে ওটা ঠিক অহিংসার ব্যাপার হয় না কাব্যতীর্থ মশাই।

কাব্যতীর্থ--সেটাই অহিংসা নয়নবাবু। দু'হাজার লোক অনায়াসে মারধর করতে পারতো, কিন্তু তা না করে শুধু অনুরোধ করেছে।

নয়ন--অহিংসা সম্বন্ধে আপনারও কি এই ধারণা প্রবীরবাবু?

প্রবীর মাস্টার যেন জোর করে নিজের মুখ বন্ধ করে রেখেছিল। নয়নের প্রশ্নে অনিচ্ছাসত্ত্বে উত্তর দেয়--অনুরোধ করে হোক, আর গলাধাক্কা দিয়ে হোক, যেকোন ভাবে ওদের তাড়িয়ে দেওয়াই হলো অহিংসা।

নয়ন মাটির দিকে তাকিয়ে আবার কিছুক্ষণ কি ভাবেন। তারপর বলেন--যাক, বোঝা যাচ্ছে যে অহিংসা সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা ও আমার ধারণার অনেক তফাৎ। হয়তো আমার ধারণাই ভুল।

কাব্যতীর্থ বিচলিত হয়ে ওঠেন--না না নয়নবাবু, ভুল আমাদেরও হতে পারে। আপনি শুধু যদি বুঝিয়ে দিতে পারেন কোথায় আমাদের ভুল, তাহলে...।

নয়ন--না কাব্যতীর্থ মশাই, ওভাবে কাউকে জোর করে বোঝানোও আমার অহিংস নীতির সঙ্গে খাপ খায় না।

নয়নের যুক্তির মহিমায় বোধ হয় হতভম্ব হয়ে কাব্যতীর্থ অসহায়ভাবে প্রবীরের দিকে তাকালেন। প্রবীর প্রশ্ন করে--ভৈরববাবু আর আপনার ছোড়দা, এঁদের কাছে আপনার লাঞ্ছিত হবার কি কারণ থাকতে পারে?

নয়ন--ছোড়দা বললেন, আমি আত্মীয়দ্রোহী হয়েছি। ভৈরববাবু বললেন, রাজনৈতিক মতভেদের জন্য আমি ঈর্ষাবশে তাঁর ব্যক্তিগত অর্থোপার্জনের পথেও উপদ্রব আরম্ভ করেছি।

প্রবীর--তাঁরা যা খুশি বলতে পারেন, কিন্তু আপনি সেসব গ্রাহ্য করবেন কেন?

নয়ন--অভিযোগগুলি সত্য বলেই গ্রাহ্য করতে বাধ্য হচ্ছি। আপনারা এই কাণ্ড করেছেন, আর আপনারা হলেন আমার লোক। সুতরাং...।

কাব্যতীর্থ লজ্জিত ভাবে বলেন--আহা, ওভাবে বললে কথাটা কেমন ভুল বলা হয় নয়নবাবু। আমরা আপনার লোক, আপনিও আমাদের লোক।

নয়ন--কিন্তু বৃত্তিটা তো আমিই দিয়ে থাকি, আমাকে কেউ বৃত্তি দেয় না।

বৈঠকখানা ঘরটা কিছুক্ষণের জন্য মূর্ছাহতের মত স্তব্ধ হয়ে থাকে।

কাব্যতীর্থ বলেন--আচ্ছা, এইবার আমরা চলি।

নয়ন বিব্রতভাবে বলে--কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি পেলাম না তো!

কাব্যতীর্থ--কিসের প্রতিশ্রুতি?

নয়ন--আপনারা শুধু শিশুভবন ও বাণীপীঠের কাজ ছাড়া অন্য অবান্তর কাজে শক্তির অপচয় করবেন না।

কাব্যতীর্থ হেসে উত্তর দেয়--এরকম প্রতিশ্রুতি কি হতে পারে নয়নবাবু?

নয়নের অট্টালিকার ফটক পার হয়ে সড়কের জনতার মধ্যে এসে কাব্যতীর্থ একটা হাঁপ ছেড়ে দাঁড়ান। প্রবীরকে কাছে টেনে নিয়ে কাঁধে হাত রেখে আস্তে আস্তে চলতে থাকেন। মতিগঞ্জ শহরের সরু আঁকাবাঁকা ও ভিড়ছড়ানো পথের সব চাঞ্চল্য ও মুখরতা ভেদ করে দুটি নিঃশব্দ প্রাণের মত কাব্যতীর্থ ও প্রবীর মাস্টার একমনে হেঁটে চলে যেতে থাকে। সবেমাত্র সন্ধ্যার আলো জ্বলছে, জনপদের বুকে একটু একটু করে মত্ততা জাগছে। সিনেমা ঘরে ভিড়, শুঁড়ির দোকানে ভিড়, ব্যাঙ্কে দোকানে ও গদিতে হিসাব ছাপিয়ে উপচে পড়া টাকার কাঁড়ি কারবারীর আত্মা আত্মহারা। যুদ্ধের শরণাগত, মুদ্রায় পরিস্ফীত, গুণে গুণে ইংরাজের ভারতরক্ষা উৎকোচে বশীভূত সারা ভারতের একটা বিকৃত সত্তারই প্রতিচ্ছবি। এত উল্লাস, এত উচ্ছলতা, তবু কাব্যতীর্থের বেদনার্ত দৃষ্টিটা যেন অসহায়ভাবে এই দৃশ্যের মাঝখানে ঘুরতে থাকে। মনে হয়, এ যেন টাকায় বিকিয়ে যাওয়া মনুষ্যত্বের, যেন একটা সুখী পাগলের চেহারা।

স্টেশনের দিকে অনেকদূর এগিয়ে এসেছেন কাব্যতীর্থ আর প্রবীর মাস্টার। শহরটা এখানে প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, তারপর আবছা অন্ধকারে একটা খোলা মাঠের আরম্ভ। মতিগঞ্জ মিউনিসিপালিটি এখানে সন্ধ্যাদীপ জ্বালে না।

কিন্তু এই মাঠই তো কাব্যতীর্থের শিশুকাল থেকে পরিচিত সুধাময় ঠাকুরের পাট ; বিস্মৃত এক বৈষ্ণব রাজার শ্রীস্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে মাঠের মাঝখানে। স্তম্ভশীর্ষে আজ আর কোন পতাকা নেই, একটি শিশু অশ্বত্থ আকাশমুখী আনন্দে চঞ্চল হয়ে ডালপালা দোলায়। এই মাঠেই তো মেলা বসতো প্রতি বছর, মহাবিষুব সংক্রান্তির দিনে।

ভারতরক্ষা অর্ডিন্যান্সের হুমকি সুধাময় ঠাকুরের পাটে বাৎসরিক মেলা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। কাব্যতীর্থ আর একটু এগিয়ে গিয়ে বুঝতে পারেন, আর একরকমের মেলা বসে গিয়েছে এখানে। এই মেলা বৎসারান্তের কোন মহালগ্নের মাঙ্গলিক উৎসব নয়। এই মেলা বসে আছে মাটির প্রতি কণিকা কলুষিত করে, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। কাব্যতীর্থ দেখতে পান, মাঠের দুদিকে দুটো বসতি। একদিকে ফৌজের ছাউনি, তার মাঝখানে বৈষ্ণব

রাজার শ্রীস্তম্ভ, নিতান্ত খুঁটোর মত তাঁবুর দড়ি শরীরে জড়িয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। তার গা ঘেঁষে একটা মদের ক্যান্টিন। শত শত তাঁবু, বিদেশের সেনা।

আর একদিকে মুখোমুখি আর একটু তফাতে, মাঠের উপর আর একটা নতুন বসতি। নতুন নতুন চাঁচের বেড়া, টিন ও খড়ের চালা দিয়ে তৈরি আর গ্যাস বাতি দিয়ে সাজানো সরকারী বন্দোবস্ত চালিত বেশ্যার উপনিবেশ। 'ইন বাউণ্ডস্'—ইংরাজীতে লেখা একটা কাষ্ঠফলক বড় আলোর নীচে দাঁড়িয়ে বিদেশী সৈনিককে নৈশ লাম্পট্যের সঙ্কেত জানায়। শত শত কুটীর—কাব্যতীর্থের দেশের শত শত মেয়ে।

প্রবীরের হাতটা নিজের মুঠোয় শক্ত করে ধরে তাড়াতাড়ি পথ হাঁটেন কাব্যতীর্থ। মনে হয়, এই তো মহালগ্ন, পুঞ্জ পুঞ্জ কলুষের ভার মানুষের সত্তাকে প্রায় চূর্ণ করে আনছে। এই সময়েই তো নীলকণ্ঠ জাগেন আর বিষপান করেন। যুগে যুগে এই লগ্নেই তো রুদ্রের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে। এক যুগের আবর্জনাকে একদিনে পুড়িয়ে দেবার, এক শতাব্দীর পাপের পাহাড়কে একদিনে গুঁড়ো করে দেবার আহ্বান।

প্রবীর বলে—বিনোদদা একটু দাঁড়াও।

স্টেশনে ঢুকতেই এক সারি আলোকোজ্জ্বল দোকানের মধ্যে একটা বইয়ের স্টলে উঁকি দিয়ে প্রবীর জিজ্ঞাসা করে—গত সপ্তাহের হরিজন পত্রিকা এসেছে?

দোকানী বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রবীর—দিন।

পত্রিকা নিয়ে দোকানের আলোর সামনেই লেখাগুলির উপর একবার তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে প্রবীর হঠাৎ কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। কাব্যতীর্থের দিকে তাকিয়ে বলে—বিনোদদা।

কাব্যতীর্থ এগিয়ে এসে বলেন—কি?

পত্রিকার লেখাগুলির মধ্যে একটা জায়গা প্রবীর আস্তে আস্তে কাব্যতীর্থকে পড়ে শোনায়, গান্ধীজীর আহ্বান—

"...হিন্দুস্থানমে ভয়ংকর জ্বালামুখী ফুটেগী! তুম লোগ উসকে সাক্ষী রহনা, ঔর জব বহ সমীপ আ জায় তো উসমেঁ কুদ পড়না...।"

—হিন্দুস্থানে ভয়ংকর জ্বালামুখী ফুটে উঠবে। তোমরা সবাই তার সাক্ষী হয়ে থেক। আর, যখন এই জ্বালামুখীর শিখা সম্মুখে এগিয়ে আসবে, তোমরা তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

সত্যিই যে রুদ্রের আহ্বান, নিপীড়িত ভারতের লক্ষ লক্ষ প্রাণকে এক বিরাট মরণ আহবে আত্মাহুতি দেবার জন্য আহ্বান। আসমুদ্র হিমাচল ভারতের রণগুরুরূপে আবার এক কৌপীনবন্ত মহাক্ষত্র সেই বিরাট তর্জনী তুলে ইঙ্গিত করেছেন। উনিশশো বিয়াল্লিশের পয়লা জুলাইয়ের ঘন সন্ধ্যার আলোছায়ায় মতিগঞ্জ স্টেশনের পথে দাঁড়িয়ে দুটি নিঃস্ব গ্রাম্য মানুষের বিশ্বাসী চিত্তে সেই ইঙ্গিতের প্রেরণা এক অদৃশ্য ঝঞ্ঝাবায়ুর মত প্রবেশ করে।

কাব্যতীর্থ বলেন—আর একবার পড় তো ভাই।

প্রবীর পড়ে—"হিন্দুস্থানমে ভয়ংকর জ্বালামুখী ফুটেগী...।"

সত্যিকারের ধুপখালের পাশে গ্রামটারও নাম ধুপখাল। খালের জল জোয়ারের সময় বেশী খরা, ভাঁটার সময় একটু মিঠা, কারণ সমুদ্রের সঙ্গে তার নিত্যদিনের মিতালি। কাঞ্চীপুর থেকে চার ক্রোশ দক্ষিণে ধুপখাল, ধুপখাল থেকে আরও দশ ক্রোশ দক্ষিণে মাটির রাজ্য শেষ হয়ে গিয়েছে—সমুদ্র। লোনা। জোয়ারের মত সমুদ্রবাতাসের ছোট-ছোট ঝড় প্রতি রাত্রে ধুপখাল গ্রামের নিম বাবলার ডালে ডালে দৌরাত্ম্য করে যায়। সমুদ্র যে এত নিকটে সেটা দিনেরবেলার মুখরতার মধ্যে ঠিক স্পষ্ট করে বোঝা যায় না। কিন্তু রাত্রে অন্য রকম। দূর সমুদ্রের ঢেউ-ভাঙা উল্লাস যেন মাঝে মাঝে তরল মেঘারাবের মত শেষ রাত্রির ঘুমন্ত

ধুপখালের স্বপ্ন স্পর্শ করে চলে যায়।

--আমি আগেই না তোকে বলেছিলাম পবুর মা, ছেলেকে লেখাপড়া শেখাসনি। এখন তো দেখলি, ছেলে তোর কেমন ভদ্দর লোক হয়েছে আর শত্তুর হয়েছে।

একটা ছেঁড়া জাল দিয়ে জীর্ণ শরীরটাকে জড়িয়ে জ্বরে ধুঁকছিলেন প্রবীরের বাবা জয়ন্ত পাটনী। প্রবীরের মা হাট থেকে ফিরে নুনের খালি ঝুড়িটা মাত্র মাথা থেকে নমিয়ে একটু জিরিয়ে নেবার জন্য বসেছেন, অমনি কথাগুলি চেঁচিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন জয়ন্ত পাটনী। একদিন নয়, দুদিন নয়, আজ এক বছর হলো বুড়ো জয়ন্ত পাটনী জপের মত এই একই অভিযোগ আর ধিক্কার উচ্চারণ করছেন। জয়ন্ত পাটনীর বুক যেন চরম পরাজয়ের আঘাতে দীর্ণ হয়ে গিয়েছে। ছেলে তার মানুষ হয়নি।

অনেক ভদ্দরলোকের ছেলের বাপ-মা বড় আশার লোভে ছেলেকে বিলেতে পাঠিয়েও সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকেন--ছেলে যেন সাহেব না হয়ে যায়। অনেক ছেলে সত্যিই শেষ পর্যন্ত সাহেব হয়ে যায়, মেম বিয়ে করে, বাপ-মাকে পর ভাবে। জয়ন্ত পাটনীরও যে সে-ভয় হয়নি, তা নয়। কুটুমেরা তো আরও বেশী করে ভয় দেখিয়েছিল--সর্বস্ব খুইয়ে ছেলেকে তো বিদ্যে শেখাচ্ছ, পরে ভদ্রলোক হয়ে গিয়ে তোমাকে বাপ বলে ডাকতে ছেলে লজ্জা না করলে হয়।

জয়ন্ত পাটনী তবু ছেলেকে বিদ্যা শিখিয়েছে। পাঠশালা থেকে মতিগঞ্জের স্কুল, মতিগঞ্জ থেকে কলকাতার কলেজ। নৌকা বেচে, ঘর বেচে, ঋণ করে ছেলের পড়ার খরচ যুগিয়েছে। কিন্তু সবই ব্যর্থ। প্রবীরের ভাই, ঐ শ্যামু, বয়স পনর পার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনো পাঠশালার মুখ দেখতে পারলো না। তবু জয়ন্ত পাটনী কাটমুখ্যু শ্যামুকে দেখে এখন খুশীই হন। এ ছেলে আর ভদ্দরলোক হয়ে পর হয়ে যাবে না।

বড় ছেলের পড়ার খরচ, আর এদিকে নিজেরা তিনটি প্রাণীর প্রাণ বাঁচাবার খরচ--বুড়ো বয়স পর্যন্ত একটি মাত্র নৌকা সম্বল করে জয়ন্ত পাটনী দিনের বেলা ধূপখালে খেয়া খেটেছে, আর রাতের বেলায় পরের নৌকায় দাঁড় টেনেছে। প্রবীরের মাও পরের খামারে ধান ভেনেছে। দিন প্রতি এক সের চালের বিনিময়ে ছোট শ্যামুও মাঠে মাঠে পরের গরু চরিয়েছে। কিন্তু আর নয়, এবার জয়ন্ত পাটনীর সংসারের দম ফুরিয়ে এসেছে ঠিকই। এত লেখাপড়া শিখেও প্রবীর আজ পর্যন্ত একটি পয়সা রোজগার করতে শিখলো না।

জয়ন্ত পাটনী ধুঁকতে ধুঁকতে বলতে থাকেন--আরে হতভাগা ভদ্দরলোকই বা হতে পারলি কই? একটা প্যায়দার চাকরিও জোটাতে পারলিনি? ভদ্দরলোকেরা তো ঐ বিদ্যেতেই ম্যাজিস্টার হয়।

প্রবীরের মা পথশ্রমকাতর পা দুটোকে মাটির উপর টান করে দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকেন। অলসভাবে নিজের হাতে রুক্ষ ও শীর্ণ পায়ের পাতা দুটো টিপতে টিপতে শান্ত ভাবে প্রত্যুত্তর দেন--আঃ, কেন অমন করে নিজের ছেলেকে গালমন্দ করছো? যেমন আছে, তেমনি হয়েই যদি ভালভাবে বেঁচে থাকে তো ভগবানের দয়া। আর কি চাও?

জয়ন্ত পাটনীর চিৎকার হঠাৎ কোমল হয়ে আসে।--কিছু চাই না পবুর মা, একবার এসে নিজের বাপ মা ভাইয়ের দুঃখু নিজের চোখে দেখে, একবার কেঁদে চলে যাক, তাহলেই আমি...।

বুড়ো জয়ন্ত পাটনী কেঁদে ফেলেন। অপোগণ্ড শিশুর মত অসহায় ভাবে টেনে টেনে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। বহু খালের লোনা জলের ছোঁয়ায়, ক্ষয়ে যাওয়া পুরনো ছেঁড়া জালের উপর জয়ন্ত পাটনীর শেষ বয়সের চোখের জল গড়িয়ে পড়ে।

প্রবীরের মা বলেন--থাম থাম। একদিন না একদিন তোমার ছেলে আসবেই।

জয়ন্ত পাটনী থামেন, যদিও আশ্বস্ত হন না। অনেকক্ষণ পরে বিড় বিড় করে আবার

একটা দুঃসহ ক্ষোভের সঙ্গে বোঝাপড়া করেন--বড় জাতের সঙ্গে এত মাখামাখি ভাল নয়। ওরা সব করতে পারে।

ঠিক এই সন্দেহ প্রতিবেশীদের মধ্যে আরও অনেকে সমর্থন করেন। প্রবীর ভদ্দর জাতের খপ্পরে পড়েছে। ও জাতকে বিশ্বেস নেই।

কেন বিশ্বেস নেই?

জয়ন্ত পাটনীর ঘরের আঙিনাতেই ধূপখালের আর দশ-পাঁচজন জাতকুটুম এসে কতবার আলোচনা করেছেন--হায়রে, বাপ-মা খেতে পায় না, আর ছেলে যত বামুনকায়েতের দলে ভিড়ে স্বদেশী করছেন। তোকে ছুঁলে যারা স্নান করে, তাদের সঙ্গে আবার স্বদেশী কিরে?

প্রবীর এসেছিল প্রায় দু বছর আগে একবার। তখনও জয়ন্ত পাটনীর বুকে দম ছিল, আজকের মত পঙ্গু হয়ে পড়েননি। প্রবীর এসে এই ঘরের দাওয়ার উপর জাল পেতে ঘুমিয়েছে। সকালবেলা উঠে নিজেই শখ করে মাছ ধরতে চলে গিয়েছে। উঠোনের চারধারে এই যে এতগুলি শ্বেতকরবী আর টগরের গাছ, এসবই প্রবীরের নিজের হাতের রচনা। এক মাস ছিল প্রবীর, তারই মধ্যে সারাদিন খেটে খেটে বাগান করেছে--ওরই তৈরী কুমড়োর মাচান এখনো রয়েছে। খেয়া খেটে ঘাট থেকে ফিরে জয়ন্ত পাটনী এই ঘরেই বসে তামাক খেয়েছেন, বাপের পা টিপে দিয়ে প্রবীর গল্প করেছে কত। জয়ন্ত পাটনীর সুখ আর গর্ব যেন তাইতেই চরম হয়ে উঠেছিল। প্রবীরের কাছে এর চেয়ে বেশী আর কিছু তাঁর পাওনা আছে বলে মনে হতো না।

কিন্তু, প্রবীর আর আসেনি। জয়ন্ত পাটনীর এত কঠিন দেহেও ঘুণ ধরেছে। একটা মাত্র নৌকা ছিল, তাও গভর্নমেণ্ট নিয়ে গিয়েছে জাপানীদের জব্দ করার জন্য। শুধু শ্যামু বেশী করে গরু চরায় আর মা লোনা কাদা ছেঁকে নুন তৈরী করে হাটে হাটে বিক্রী করেন। কিন্তু পোষায় না, হয় না, তিনটে প্রাণীর একবেলার ক্ষুধা মিটতে চায় না। জয়ন্ত পাটনী এখন সত্যিই ছেলের কাছে আশা করেন দুটো টাকা পয়সার সাহায্য। আর ছেলে হয়ে এখন যদি প্রবীর এটুকুও না করতে পারবে, তবে কবে করবে?

প্রবীর আর আসেনি, চাকরিও পায়নি। কাঞ্চীপুরের লোক মাঝে মাঝে এদিকের হাটে বেচা-কেনা করতে আসে। প্রবীরের মা একদিন শুনলেন, তাঁর ছেলে স্বদেশী করছে, আর চাকরির আশাও নেই।

তারপর থেকে এইভাবেই ধূপখালের জয়ন্ত পাটনীর সংসার দুঃসহ দীনতার জ্বালায় তিল তিল করে পুড়ছে। জয়ন্ত পাটনীও যেন সারাদিন ধরে চিৎকার করে তাঁর পোড়া অদৃষ্টকে ধিক্কারে ধিক্কারে আরও জর্জরিত করেন।

অকস্মাৎ একটা সংবাদ যেন শান্তিজল ছিটিয়ে জয়ন্ত পাটনীর মনের জ্বালা ক্ষণিকের মত শান্ত করে।

শ্যামু মাঠ থেকে অসময়ে ফিরে এসে চিৎকার করে ডাক দেয়--মা শুনেছ?

মা তার পথশ্রমকাতর পা দুটিকে তেমনি অলসভাবে নিজের হাতে আস্তে আস্তে টিপছিলেন। শ্যামুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন--কি? এখনই ফিরে এলি যে, চরাতে যাসনি?

শ্যামু তার আনন্দের আবেগের মতই অস্থিরভাবে কথাগুলি বলতে থাকে--দাদা হেডমাস্টার হয়েছে, কাঞ্চীপুরের লোকের কাছে খবর পেলাম।

মা'র মুখটা তো এমনিতেই শান্ত, তার উপর হাসিটা বড় স্নিগ্ধ হয়ে ফুটে ওঠে। বলেন--তা তো হবেই, আমি আগেই জানতাম।

জয়ন্ত পাটনী তাঁর গায়ে জড়ানো ছেঁড়া জাল টেনে সরিয়ে দেন, যেন তাঁর জ্বর হঠাৎ থেমে গিয়েছে। তিনিও বহুদিন আগেকার মত শান্ত স্বরে বলেন--শ্যামু, আমাকে ধরে একবার বাইরে করে দে তো। দাওয়ার ওপর একটু বসি।

শ্যামুর হাত ধরে আস্তে আস্তে উঠে এসে দাওয়ার উপর তৃপ্তভাবে বসেন জয়ন্ত পাটনী। তখুনি আবার বলেন—শ্যামু, আমার মৃদঙ্গটা দে।

মাকড়সার জালে ঢাকা মৃদঙ্গটা শিকেয় ঝুলছিল দু বছর থেকে। শ্যামু মৃদঙ্গটা নামিয়ে ভাল করে ঝাড়া-মোছা করে নিয়ে জয়ন্ত পাটনীর কোলের ওপর রাখে।

মা বলেন—শ্যামু, আমাকে কাঞ্চীপুর নিয়ে যেতে পারবি?

শ্যামু—কেন পারবো না?

মা—তাহলে একদিন চল। একবার পবুকে দেখে আসি। কতদিন দেখিনি।

শিশুভবনের ছেলেমেয়েরা আজ বড় খুশী। তারার মা আশ্চর্য হয়ে বলেছে—তুমি তো ঠিক কলকাতার মেয়েদের মত নও গুরুমা।

আজ সকাল থেকে আরম্ভ করে সন্ধ্যাটা পর্যন্ত একটা একটানা কাজের ঘোরে সময় পার হয়ে গিয়েছে সোমার। আজ এই প্রথম বই সেলেট নিয়ে ছেলেমেয়েদের পড়া শিখিয়েছে। একটা ছড়া আবৃত্তি করে শুনিয়েছে, একটা গান গেয়েছে, আর একটা গল্পও বলেছে। লব-কুশের গল্প, সীতারামের দুটি ছোট ছোট ছেলে, দুটি বনচারী ভাই ; রাজা রামচন্দ্রের যজ্ঞের ঘোড়াকে লব-কুশ যখন বন্দী করে ধরেছে, তখন গল্পটাকে সেইখানে রেখে দিয়ে সোমা উঠে যায় রান্নাঘরের দিকে। তারার মা উনুন ধরায়, আর সোমা বঁটি নিয়ে বসে, আজকের রান্নার বরাদ্দমত কতগুলি কুমড়ো আর ঢেঁড়স নিজেই কেটেকুটে আর ধুয়ে ডালায় সাজিয়ে রেখে চলে যায়।

পুকুরের ধারে তালগাছের ছায়ায় একটা নতুন উনুন করিয়েছে সোমা। ছেলেমেয়েদের গায়ের ছেঁড়া ও নোংরা একগাদা কাপড় মাটির হাঁড়িতে ক্ষারে সেদ্ধ হয়। মাধাই ও সুমন্ত উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে, সোমা সামনে থেকে কাজে সাহায্য করে।

ছেলেমেয়েদের খাওয়ার সময়ও আজ সকলের সঙ্গে ছিল সোমা। তারার মা'র মত সোমাও আজ সকলকে নিজের হাতে ডাল ভাত পরিবেশন করে খাওয়ায়। আজ হঠাৎ ছেলেগুলো খায়ও বেশী করে, ভাতে টান পড়ে।

তারার মা'র হাতে আজ কুড়িটা টাকা দিয়েছে সোমা—কাপড় কিনে নিয়ে এস। তারার মা—কিসের কাপড়?

সোমা—ছেলেমেয়েদের একটা করে গায়ে দেবার জামা করবো।

তারার মা আঁতকে উঠে বলে—অ্যাঁ? তুমি কি শেষে একটা কেলেঙ্কারি করবে গুরুমা?

সোমা চমকে ওঠে—কেলেঙ্কারি? কি যা-তা বলছো?

তারার মা আরও জোর করে বলে—হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কি?

তারার মা কাপড় কিনতে চলে যায়।

আজকের দিনটা সমস্ত মনের আগ্রহ দিয়ে এইভাবে শিশুভবনের জীবনে ছোট ছোট নতুন ঘটনা ঘটিয়ে কাজের দীক্ষা গ্রহণ করেছে সোমা। এই কাজের সীমা কতদূর, সার্থকতা কতটুকু, স্থায়িত্ব কতখানি, এই রকম প্রশ্ন নিয়ে আর চিন্তা করতে ইচ্ছা করে না। হয়তো এটা তার জীবনে দুদিনের খেলাঘর মাত্র। হোক না তাই, দুদিনের জন্যই সে খেলাঘরকে ভাল করে সাজিয়ে রাখলে দোষ কি?

সন্ধ্যাবেলা এল সাঁওতাল বউ একটা গাই নিয়ে, দুধ দুইতে। রোজই সন্ধ্যাবেলা সাঁওতাল বউ এই শিশুভবনের আঙ্গিনায় এসে দুধ দুইয়ে কেঁড়ে ভর্তি করে, আর সব দুধ এখানে বসেই গাঁয়ের আরও পাঁচজনের কাছে বিক্রি করে চলে যায়। শিশুভবনের জন্য মাত্র আধসের।

সাঁওতাল বউকে দেখতে বড় ভাল লাগে সোমার। বয়স হয়েছে পঞ্চাশের উপর, তবু

ঝরনার মত সুরে হাসে, সন্ধ্যাতারার মত তাকায়। সাঁওতাল বউ আজ বাঙালী হয়ে গিয়েছে। সিঁথিতে সিঁদুর পরে, নিজের নাম গঙ্গা আর গাইটার নাম সুরভি। কবে কোন্ অতীতে এক কুলিমায়ের পিঠে পুঁটলি-বাঁধা হয়ে মাটি কাটার দলের সঙ্গে কাঞ্চীপুরে এসে আজ একেবারে কাঞ্চীপুরের মেয়ে হয়ে গিয়েছে সাঁওতাল বউ।

সুরভির অভ্যাসও অদ্ভুত। শিশুভবনের আঙ্গিনায় ঢুকেই দুরন্ত আগ্রহে ছটফট করে প্রথমে একটা ডাক দেয়। ছেলেমেয়েগুলিও যেন সুরভির প্রতীক্ষায় ছিল, ডাক শোনামাত্র ছুটে আসে। কেউ সিং ধরে, কেউ লেজ টানে। সারা আঙ্গিনায় শিশুজনতার সঙ্গে ছুটোছুটি না করে সুরভি শান্ত হয় না এবং তার আগে তাকে দোহানো যায় না।

মাত্র আধসের দুধের খদ্দের শিশুভবন, তবু বড় খদ্দেরের বাড়ি না গিয়ে এখানে দুধ দুইতে আসে কেন সাঁওতাল বউ?

সোমা জিজ্ঞাসা করে--তুমি এখানে এসে গরু নিয়ে দুধের বাজার বসাও কেন?

সাঁওতাল বউ বলে--আমি কি করবো বল? গরুর মরজি। অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে দুইতে গেলে দুধ টেনে রাখে। নইলে আমার কি সাধ যায়, আধসের দুধের জন্যে গরুকে এতদূর টেনে আনতে?

সাঁওতাল বউ তার কথা শেষ করে খল খল স্বরে হাসে। কিন্তু সোমার বুকের ভেতরটা অদ্ভুত বেদনায় শিউরে ওঠে। জোরে নিশ্বাস টানে, সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে। যেন একটা অস্বস্তির ভারে হঠাৎ ক্লান্ত হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সোমা। সাঁওতাল বউয়ের গল্প বিশ্বাস হয় না।

সাঁওতাল বউ সুরভিকে টেনে নিয়ে এসে দুধ দুইবার আয়োজন করে। সোমা বলে--আজ থেকে রোজ আরও আধসের করে দুধ দেবে।

সাঁওতাল বউ হাসে--কে খাবে গুরুমা?

সোমা বিরক্ত হয়ে বলে--খাবার লোক আছে।

সাঁওতাল বউ একবার চকিতে সোমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে আবার হাসে--তোমার তো খাবার লোক কেউ নেই বলে মনে হচ্ছে গুরুমা।

সোমার রাগ হয়--এখানে ছোট ছেলে আছে তুমি জান না?

সাঁওতাল বউ হাসে--কে? ভোলা?

সোমা বলে--আজ্ঞে হ্যাঁ।

তারার মা ফিরে আসে অনেকক্ষণ পরে, সুরভিকে নিয়ে সাঁওতাল বউও চলে গিয়েছে অনেকক্ষণ। দু থান খদ্দরের কাপড় আর দুখানা চিঠি নিয়ে আসে তারার মা। সোমা নিজের ঘরে গিয়ে আলো জ্বালে।

"সুমি, লক্ষ্মী মেয়ে আমার, ফিরে এস...।"

মা লিখেছেন চিঠি। চিঠিটা বার বার দুবার আদ্যোপান্ত পড়ে সোমা। বার বার অনেকবার চেষ্টা করেও নিজেকে আর সামলাতে পারে না। চিঠিটা চোখের উপর চেপে ধরে কেঁদে ফেলে। বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট মেয়ের মতই আজ সোমার ডাকতে ইচ্ছে করে--মা, তুমি এসে নিয়ে যাও।

যে মেয়ে একা চলে আসতে পারে, সে কি একা ফিরে যেতে পারে না? তাকে নিয়ে যেতে হবে কেন? কে জানে, সোমা হয়তো এই সত্য আজ স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নয়, সে আর এখান থেকে একা একা নিজের সাহায্যে নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে হবে, কেড়ে নিয়ে যেতে হবে। মা যে জানেন না, এই নির্বাসন তাঁর মেয়ের কাছে ধীরে ধীরে মধুর হয়ে উঠছে। ঝোঁকের মাথায় ষাট টাকা মাইনের চাকরি করতে এসে চক্রবেড়ের গলির একটা একঘরে বাসার অভিমানিনী মেয়ে এখানে ভুল করে

এরই মধ্যে এমন এক অনুভবের দুর্গ রচনা করে ফেলেছে, যার অন্তরতম প্রকোষ্ঠে সে আজ নিজেই বন্দিনী। ফিরে যাওয়ার পথ বন্ধ জেনেই কি সোমার চেতনা ফুঁপিয়ে উঠেছে—মা তুমি এসে নিয়ে যাও?

তারার মা চায়ের জল নিয়ে যায়। সোমা জোর করে নিজেকে আবার কাজের মধ্যে আনমনা করে আনে। চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসে, চা তৈরী করে, ঘরের ভিতর পাইচারী করে করে চায়ের কাপে চুমুক দেয়।

দু' পাতা ভরে চিঠি লিখে মাকে প্রতি কথায় সান্ত্বনা দেয়—আমি খুব ভাল আছি, কোন অসুবিধা নেই, কোন চিন্তা করো না।

দ্বিতীয় চিঠিতে মতিগঞ্জের পোস্ট-অফিসের ছাপ। চিঠিটা খুলতে সোমার হাত কাঁপে।

নয়নবাবুই লিখেছেন, সোমার চিঠির উত্তর।

কাঞ্চীপুরের শিশুভবনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ও দায়িত্ব আর কতদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকবে, তা জানি না। কিন্তু যতদিন আছে, ততদিন আপনি অবশ্যই ওখানে থাকবেন এবং ততদিন আপনার প্রত্যেকটি অসুবিধার জন্য আমিই দায়ী থাকবো।

তবে যেকোন দিন আপনাকে হয়তো কাঞ্চীপুর ছেড়ে আসতে হবে, কারণ আমি অন্য কোন গ্রামে আমার আদর্শ অনুযায়ী বড় করে একটি শিশু শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করবো। বলা বাহুল্য আপনাকেই এই কেন্দ্রের ভার নিতে হবে।

মাপ করবেন, প্রবীরবাবুকে কোন নির্দেশ দিতে আমি অসমর্থ। আপনার যে কোন অসুবিধার কথা আপনি আমাকে জানালেই আমি আমার যথাসাধ্য সেটা দূর করতে চেষ্টা করবো।...

আপনার প্রাপ্য বেতন প্রতি মাসে এখান থেকেই আপনার বাড়ির ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে, আশাকরি আপনার কোন আপত্তি নেই।...

পড়া শেষ করেই সোমা চিঠিটা ভাঁজ করে তাকের উপর রেখে দেয়, হাত কাঁপবার মত কিছুই এর মধ্যে নেই। যদিও এক দুর্বোধ্য রহস্যের আভাস এর প্রতি ছত্রে পাওয়া যাচ্ছে। কোথায় যেন ঘটনায় ঘটনায় একটা সংঘাত বেধেছে।

এইটুকু শুধু বুঝতে পারে সোমা, তার মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে গড়া হীনবুদ্ধির ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেল। সাময়িক পাগলামির বশে নয়নবাবুর সাহায্যে যাকে আঘাত দেবার অভিসন্ধি সে করেছিল, তার গায়ে আঘাত লাগলো না। সে জানলোও না কিছুই। একটা অভিশাপের শঙ্কা থেকে সোমার মন যেন মুক্তি লাভ করে। চিঠিটা পড়ে এতদিন পরে মনের খুশীতে একটা সত্যিকারের মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলবার সুযোগ পেয়েছে সোমা। মনে হয়, তার জীবনের আশেপাশে যেমন এক ভুল করিয়ে দেবার নিয়তি ঘুরছে, তেমনি ভুল থেকে বাঁচিয়ে দেবারও নিয়তি রয়েছে। সোমা তার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একবার বাইরের দিকে তাকায়।

কি কথা মনে করতে গিয়ে অন্যমনস্কভাবে নয়নের চিঠির কথা আর একবার মনে পড়ে সোমার। কাঞ্চীপুর থেকে চলে যাবার আহ্বান জানিয়েছেন নয়নবাবু। নয়নবাবু পয়সা খরচ করতে যেমন বদান্য, তাঁর আদর্শটাও তেমনি বদান্য। একটা বড় করে শিশু শিক্ষার কেন্দ্র খুলবেন, আর বলা বাহুল্য সোমা তখুনি সেই কেন্দ্রের ভারবহন করতে ছুটবে। নয়নবাবুর বিশ্বাসটাও বড় বদান্য। সোমার ঠোঁট দুটো একটা বিদ্রূপের হাসিতে কুঁচকে ওঠে।

অনেকক্ষণ দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল সোমা, মন্দিরদ্বারে পাথরের পুরোনায়িকার আভঙ্গ মূর্তির মত। কিন্তু সত্যিই সে তো পাথরের মূর্তি নয়। এই পথে কোন পথিকের পদধ্বনি যদি এখুনি শোনা যায়, তবে সে তো আর পাথুরে মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে থাকবে না। অন্তত একবার তার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে

দেখবে, অভ্যর্থনা করা যায় কি না?

সোমা লক্ষ্য করবার আগেই একেবারে ঘরের কাছাকাছি চলে এসেছিল প্রবীর মাস্টার। সোমা হঠাৎ চমকে উঠলেও শান্তভাবে বলে—আসুন।

প্রবীর মাস্টার ঘরের ভিতর ঢুকলে সোমা খাট দেখিয়ে দিয়ে বলে—বসুন।

পটের ছবির মত গোটানো একটা মানচিত্র খুলে প্রবীর মাস্টার বলে—এই নিন আপনার ভারতবর্ষের মানচিত্র, আর এই গান্ধীজীর ছবি। আপাতত এ ছাড়া...।

সোমা বলে—রাখুন।

চায়ের সরঞ্জাম তুলে নিয়ে সোমা রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। বলে যায়—একটু অপেক্ষা করুন, আসছি।

প্রবীরের হাতে চায়ের কাপ তুলে দিয়ে, সোমা দু পা পিছিয়ে সরে গিয়ে আবার আগের মতই দরজার কপাটে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়, প্রবীরের চা খাওয়া দেখতে থাকে। এখন সোমাকেই বরং ব্যাধিনীর মত দেখায়, যার নিপুণ হাতে পাতা ফাঁদের মাঝখানে এক লুব্ধ বনবিহঙ্গ ভুল করে এসে বসেছে। এখনই যে নীল আকাশের অবাধ গর্ব দিয়ে গড়া ওর পাখা দুটি এই জালে জড়িয়ে যাবে, তা সে জানে না। ব্যাধিনী যদি নিতান্ত করুণা করে নিজেই ছেড়ে না দেয়, তবে আর ওর মুক্তির আশা নেই।

চা খাওয়া শেষ হতেই প্রবীর তার এঁটো কাপটা হাতে নিয়ে একটু ইতস্তত করে, তারপর বাইরে যাবার জন্য দরজার দিকে অগ্রসর হয়।

থামুন! দরজার কাছে পথ-অবরোধ-করা এক প্রহরীর কঠিন মূর্তির মত দাঁড়িয়ে সোমা প্রবীরকে সাবধান করে।

প্রবীর অপ্রস্তুতভাবে থমকে দাঁড়ায়। সোমা জিজ্ঞাসা করে—কোথায় যাচ্ছেন?

প্রবীর—কাপটা ধুয়ে নিয়ে আসছি।

সোমা হাত বাড়িয়ে বলে—আমার হাতে দিন।

আর কোন দ্বিধা না করে প্রবীর সোমার হাতে কাপটা ছেড়ে দিয়ে খাটের উপর বসে।

মেঝের উপর কাপটা রেখে দিয়ে আবার সোমা যেন প্রস্তুত হয়।

সোমা বলে—ভারতের মানচিত্র এনেছেন, গান্ধীজীর ছবিও এনেছেন। শিশুভবনকে ভোলাবার মত রঙীন খেলনাগুলো ঠিকই হয়েছে।...কিন্তু আর সব কই?

প্রবীর—আর কি?

সোমা—শিশুভবনকে বাঁচাবার জন্যে যা চেয়েছিলাম। এক ডজন ফ্রক, দু ডজন শার্ট, দৈনিক অন্তত সের পাঁচেক দুধ, একজন কবরেজ।

প্রবীরের মাথাটা ক্ষণিকের মত হেঁট হয়ে থাকে, যেন তার দুঃসহ অক্ষমতার মূক স্বীকৃতি। শুধু সোমা আজ ব্যাধিনীর মত নির্মম। গভীর কৌতুকের পুলকে প্রবীরের নিরুত্তর মূর্তিটার দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করে সোমা—শিশুভবনের কাজ হলো এতগুলি শিশুকে বাঁচিয়ে রাখার কাজ। আমি সেই কাজের জন্য যা যা চেয়েছি সেসব কোথায়?

প্রবীর আলোটার দিকে তাকিয়ে তবু চুপ করে বসে থাকে। যেন তার কপর্দকহীন জীবনের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে চোখ দুটো উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সোমা বলে—এই মাসটা শেষ হলেই যে আমাকে ষাটটি টাকা দিতে হবে, তার সঙ্গতি আছে তো?

প্রবীর এইবার উত্তর দেয়—না।

সোমা বলে—তাহলে নয়নবাবুর কাছে গিয়ে টাকার জন্যে ধর্না দিন, আমি তো আর

আমার মাইনে ছেড়ে দেব না।

প্রবীরের চোখের দৃষ্টি হঠাৎ প্রখর হয়ে ওঠে--আপনি কি মনে করেন যে, টাকার জন্যে নয়নবাবুর কাছে ধর্না দেওয়া আমার অভ্যেস?

সোমা--ধর্না না দিন, নির্ভর করেন তো?

প্রবীর--না, আপনি ভুল বুঝেছেন, টাকার জন্যে কারও ওপর নির্ভর করতে শিখিনি।

বন্দী বিহঙ্গ যেন মরিয়া হয়ে জালের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের জন্য পাখা ঝাপ্টায়, সোমার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে প্রবীর হঠাৎ বলে--আর, টাকা দিয়ে কাউকে কিনতেও শিখিনি।

প্রবীর চলে যাবার জন্যে দরজার দিকে অগ্রসর হয়। সোমা হেসে ফেলে--বসুন।

বিব্রতভাবে এবং হয়তো নিজের উষ্মায় কিছুটা লজ্জিত হয়ে প্রবীর বলে--আমার কাজ আছে।

সোমা--জানি। নয়নবাবুর সঙ্গে কি হয়েছে আপনাদের?

প্রশ্নের আকস্মিকতায় প্রবীর চমকে ওঠে--আপনি এ খবর কোথা থেকে পেলেন?

সোমা--আপনার কাছ থেকে। এই তো এখুনি বললেন।

প্রবীর--হ্যাঁ, নয়নবাবুর সঙ্গে আমাদের মতভেদ হয়েছে।

সোমা--সে জন্যে কি আপনি খুবই দুঃখিত?

প্রবীর--সে জন্যে দুঃখিত নই।

সোমা--তবে? নয়নবাবু আর টাকা দিয়ে সাহায্য করবেন না, সেই জন্যে?

প্রবীর--না। বরং নয়নবাবুর সব টাকা ফেরত দিয়ে দিয়েছি, ধর্মগোলার চাল বিক্রি করে।

সোমা--তবে কিসের জন্যে আপনি দুঃখিত?

প্রবীর--আপনার জন্যে।

সোমা--তার মানে?

প্রবীর--আপনাকে চলে যেতে হবে, আমরা তো আর আপনাকে মাইনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না।

সোমা--একটু স্পষ্ট করে বলুন প্রবীরবাবু, কিসের জন্যে আপনি দুঃখিত। আমাকে মাইনে দিতে পারবেন না, সেই জন্যে? না আমি চলে যাব, সেই জন্যে?

প্রবীর স্পষ্ট করে উত্তর দেবার জন্যই বোধ হয় কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবে, তারপর বলে--যেতে দিন ওসব কথা।

সোমা একটা ধূর্ত হাসি চাপা দেবার চেষ্টা করে বলে--একেবারে সবই যে অস্পষ্ট করে দিলেন!

প্রবীর উঠে দাঁড়ায়--আজ্ঞে না, আমি এইটুকুই শুধু বলতে চাই, আপনি মাত্র কদিনের জন্য এখানে এসে মিছিমিছি কতগুলি কষ্ট পেয়ে গেলেন।

সোমা--উঠছেন কেন?

প্রবীর--আপনি অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছেন।

সোমা--তা তো আছিই, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না, তার ওপর আবার জ্বর এসেছে।

প্রবীর হঠাৎ ব্যস্তভাবে এগিয়ে গিয়ে সোমার কপালে হাত রাখে। প্রবীরের হিতাহিতজ্ঞানহীন দুঃসাহসী হাতটাকে সোমা ধীরে ধীরে নামিয়ে দেয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সোমার মুখে একটা মন্তব্যও কঠোরভাবে বেজে ওঠে--ছুঁয়ে দিলেন যে?

প্রবীর সন্ত্রস্তভাবে দু'পা পিছিয়ে যায়। এত ঠাণ্ডা নিঃশ্বাসের বাতাসটা যেন তার বুকের ভিতর গিয়ে পুড়তে আরম্ভ করে। হঠাৎ হাতজোড় করে প্রবীর--ভুল হয়েছে। মাপ করবেন।

এত সাবধানী, এত অহংকারী প্রবীর মাস্টার, এ কী করুণ চেহারা? চোখের কোণ দুটো

আবার হঠাৎ একটু যেন সজল হয়ে চিকচিক করে। প্রবীর বলে -আপনি বোধ হয় জানেন না, আমি নরসিংহের ভক্ত। পথে যেতে আসতে ঐ নির্জন নরসিংহ মন্দিরের দরজা কতবার খোলা পেয়েছি, কিন্তু কোনদিনও ভেতরে ঢুকে বিগ্রহের সামনে গিয়ে দাঁড়াইনি। আপনি বিশ্বাস করুন, আমি আপনাদের মন্দিরের ঘরের বাতাস যেমন কখনো ছুঁই না, তেমনি আপনাকে ছুঁয়ে দেবার ইচ্ছেও আমার ছিল না. হঠাৎ ভুল হয়ে গেল।

প্রবীরের ভুল হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কিছুক্ষণ নিষ্পলক চোখে কঠিন হয়ে তাকিয়ে থাকার পর সোমাও হঠাৎ ভয়ানক রকমের একটা ভুল করে ফেললো। সেই পথ-অবরোধ-করা ছলনাময়ী নায়িকার কঠিন মূর্তি যেন আকস্মিক বেদনার আঘাতে রেণু রেণু হয়ে ভেঙে পড়তে চাইছে। তার সব কৌতুক বিদ্রূপ ও ষড়যন্ত্র সার্থক হয়েছে। যা জানবার ছিল তার অনেক বেশী জানা হয়ে গিয়েছে। সোমা এগিয়ে এসে প্রবীরের জোড়করা হাত দুটোকে নিজের দু হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে বলে—কার কাছে মাপ চাইছেন প্রবীরবাবু?

আরও ভুল হলো। প্রবীরের হাতের উপর ধীরে ধীরে নিজের কপালটা নামিয়ে দেয় সোমা, যেন তার সমস্ত সত্তা দিয়ে নম্র আগ্রহে এক দুর্লভ স্পর্শসুখ পান করতে থাকে।

প্রবীর আবার অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেও ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করে—আপনার কপালটা যে পুড়ে যাচ্ছে, কখন জ্বর এল?

সোমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে প্রবীর বিছানাটা পেতে ফেলে বলে—আপনি শুয়ে পড়ুন।

সোমার চোখ দুটো লাল হয়েছিল, প্রবীর ল্যাম্পের আলোটা একটা বই দিয়ে আড়াল করে দেয়। হাতপাখাটা তুলে নিয়ে বলে—তবু আপনি বসে আছেন? শুয়ে পড়ুন, লজ্জা করবার কিছু নেই।

সোমা হেসে ফেলে—আর লজ্জা! তারার মা দুবার দেখে গেছে।

প্রবীরের হাতপাখার চাঞ্চল্য হঠাৎ একবার থেমে যায়। অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবে। তারপর আবার সোমার মাথায় বাতাস দিতে দিতে বলে—আপনি মস্ত ভুল করলেন।

সোমা—ভুল করে কিছুই করিনি। সবই ইচ্ছে করে, ষড়যন্ত্র করে করেছি, আপনার চোখ নেই তাই বুঝতে পারেননি।

প্রবীর—কিন্তু কিসের জন্যে আপনার ষড়যন্ত্র?

সোমা—যাতে কাঞ্চীপুর থেকে যেতে না হয়, তারই জন্যে।

প্রবীর—সত্যিই আপনি যেতে চান না?

এতক্ষণে অবিরাম ঝিঁঝির ডাক হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়, বাইরের অন্ধকারটাও যেন এই ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তর শোনার জন্য কান পাতে। প্রবীর সোমার চোখের দিকে কয়েকটি মুহূর্ত নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে। উৎসুক, মৃদু, করুণ ও স্নিগ্ধ দুটি চোখ।

সোমা বলে—আমি যাব না প্রবীরবাবু।

ভারতবর্ষের চারদিক থেকে যে সব খবরের অদৃশ্য মৌমাছি মতিগঞ্জের মত শহরে এসেও গুনগুন করে, তা থেকে ভৈরববাবু অন্তত এইটুকু অনুমান করে নিতে পারলেন যে, একটা কিছু ঘটতে চলেছে। নেতারা বলে, লোকে বলে, খবরের কাগজে বলে, একটা আন্দোলন আরম্ভ হবে শীগগির। কিন্তু ভৈরববাবু আরও বিজ্ঞসূত্রে খবর পান যে, এত উৎসাহিত হবার কোন কারণ নেই, এটা গান্ধী বুড়োর একটা ফাঁকা হুমকি, আসলে কোন আন্দোলনই হবে না।

কিন্তু পলিটিক্স বোঝেন ভৈরববাবু। তিনি জানেন এই সব ব্যাপারে আসর খালি রাখতে নেই। কোন্ পার্টি এসে কখন টপকে বসে পড়বে কোন ঠিক নেই এবং তার ফলে আগামী মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে ভোটাভুটির দ্বন্দ্বে তাল ঠোকা কি দুঃসাধ্য ব্যাপার হবে, তা তিনিই

জানেন।

গান্ধী বুড়ো কি করে বা না করে তার জন্য কোন পরোয়া আর প্রতীক্ষা না করেই মতিগঞ্জ শহরের দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার পড়ে গেল ; ভৈরববাবুর দল গণবিপ্লবের অভিযান আরম্ভ করবেন, আগামী কাল সন্ধ্যা থেকেই। দেশবাসী যেন দলে দলে এই অভিযানে যোগদান করেন।

পরের দিন সত্যিই গণবিপ্লবের জন্য একটি অভিযাত্রী বাহিনী ভৈরববাবুর বাড়ির আঙিনায় প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো। ভৈরববাবুদের সেই ব্যাণ্ড পার্টি, আরও কয়েকজন ভলাণ্টিয়ার ও কর্মী, এবং তাদের অধিনায়ক ভৈরববাবুর বড় ছেলে বেচু। ভৈরববাবুর বাড়ির ফটকের বাইরে একটা কৌতূহলী জনতা মতিগঞ্জের প্রথম গণবিপ্লবী বাহিনীকে অভিনন্দন জানাবার জন্য মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে উঠছিল।

রক্ততিলক অনুষ্ঠানের পর অভিযাত্রীরা বের হবেন। একটা ছাত্রীসমিতির মেয়েরা এসে ব্যস্তভাবে অনুষ্ঠানের নানা উপচার যোগাড় করে রাখছিল। ফুল, দীপ, ধূপ আর একটা বাটিতে রক্তচন্দন। বেচুর বোন নিরুপমা একটা পিন টিংচার আইডিনে ডুবিয়ে এক এক করে ছাত্রী সমিতির সভ্যদের আঙুলে ফুটিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত নিয়ে রক্তচন্দনকে আরও রক্তাক্ত করছিল।

ভৈরববাবুর আনুষ্ঠানিক বক্তৃতার পর, একটি মেয়ে বেচুর কপালে রক্ততিলকটা সবেমাত্র এঁকেছে, অমনি একজন পুলিস অফিসার দুজন কনস্টেবল নিয়ে উপস্থিত হলেন। কতগুলি সওয়াল করে রিপোর্ট লিখে বেচুকে থানায় ডেকে নিয়ে চলে গেলেন। অভিযান স্থগিত রইল।

থানায় নিয়ে গিয়ে বেচুকে ধমকে সাবধান করে ছেড়ে দেওয়া হলো। অনেক রাত্রি পর্যন্ত ভৈরববাবু থানায় দৌড়াদৌড়ি করলেন, একশো চুয়াল্লিশ জারি করবার জন্য থানা অফিসারকে অনেক মিনতি করলেন, নইলে দশের কাছে তাঁর মান আর থাকে না। থানা অফিসার ভৈরববাবুর অনুরোধ রাখতে পারলেন না।

বাড়ি ফিরে এসে অনেক রাত্রি পর্যন্ত ভৈরববাবু চিন্তা করলেন। পুলিস অফিসারদের মনোভাব দেখে কিরকম যেন সন্দেহ হয়, দিনকালের লক্ষণ ভাল মনে হচ্ছে না।

নয়নও চুপ করে বসে ছিল না। এক মাসের জন্য ভাল মাইনে দিয়ে মতিগঞ্জ শহর থেকেই একদল কর্মী যোগাড় করেছে। গ্রামাঞ্চল সফর করবার একটা পরিকল্পনাও করেছে। বিলি করবার জন্যে একটা পুস্তিকা ছাপিয়েছে বিশ হাজার কপি।

শোনা যাচ্ছে আন্দোলন হবে। শোনা যাচ্ছে, ভৈরববাবু গ্রামের দিকে প্রভাব বিস্তার করার উদ্যোগ করছেন। আর ঠিক এই সময়েই, একটা তুচ্ছ মতভেদের কারণে কাব্যতীর্থ ও প্রবীর মাস্টার সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে তাকে একেবারে একলা করে দিয়েছে। এখন শুধু সে আর তার গ্রামসেবা মণ্ডলের কাঠের সাইনবোর্ড ; ভৈরববাবুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে এর চেয়ে আর একটু বেশী সম্বল প্রয়োজন। এবং সময় থাকতে সেটুকু তৈরী করে রাখা উচিত।

গান্ধীজী এখান থেকে অনেক দূরে, তিনি কি করবেন বা না করবেন কিছু ঠিক নেই। কালবিলম্ব না করে পুস্তিকার প্রতি ছত্রে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছে নয়ন চৌধুরী এবং তার জন্য একটা কাজের প্রোগ্রামও দেশবাসীর কাছে উপস্থিত করেছে। আগামী সোমবার প্রত্যেক গ্রামবাসীকে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নির্জলা উপবাস করে সংগ্রামের উদ্বোধন করতে হবে। পুস্তিকার মুখবন্ধে শুদ্ধ অহিংসা, অনুচ্ছেদে তিতিক্ষা এবং উপসংহারে আত্মত্যাগ! ভৈরববাবুদের পতাকার চেয়েও বড় আকারের দেখতে, গান্ধীজীর একখানা ছবি আঁকিয়েছে নয়ন এবং প্রতি মুহূর্তে তার আসন্ন গ্রামসফরের পরিকল্পনার কথাই ভাবতে থাকে।

একজন পুলিস অফিসার নয়নকে থানায় ডেকে নিয়ে গেলেন এবং পিসিমা খুব বেশী উতলা হবার আগেই বাড়ি ফিরে এল নয়ন। আজকের ডাকে এসেছে, একটা চিঠি সামনে পড়েছিল। চিঠিটা খুলে পড়তেই নয়ন জানতে পারলো, কলকাতা থেকে হিতেনবাবুর স্ত্রী লিখেছেন...উনি কদিন হলো গ্রেপ্তার হয়েছেন।

আশ্চর্য, হিতেনবাবুর মত নিরীহ মানুষও গ্রেপ্তার হয়েছেন। নয়ন বুঝতে পারে লক্ষণগুলি ভাল নয়। ব্রিটিশ রাজশক্তি ভয় পেয়ে বড় বেশী নার্ভাস হয়েছে।

কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে এঘর ওঘর পায়চারি করে নয়ন। তারপর লাইব্রেরি ঘরে গিয়ে বসে, যেখানে বসে পিসিমাকে জীবনে প্রথম শক্ত কথা বলেছিল নয়ন এবং পিসিমা যেখান থেকে আঁচল দিয়ে চোখের জল লুকিয়ে চলে এসেছিলেন। আজ সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যই যেন পিসিমাকে ডেকে পাঠায় নয়ন, একটি পরামর্শের জন্য।

শুনতে পেয়ে পিসিমা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন, বিদ্রোহী ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁর কাছে আজ পরামর্শ চাইছে। এটাও যে তাঁর প্রথম সৌভাগ্য।

পিসিমা ব্যাকুলভাবে বলেন—কি বাবা?

নয়ন—আমি কিছুদিনের জন্য দেরাদুন যাব পিসিমা।

পিসিমা—একটু উদ্বিগ্ন হন—কেন, ভাল লাগছে না?

নয়ন—শরীর মন দুই-ই ভাল নয়।

পিসিমা—তা হলে একবার ঘুরেই আয়।

নয়ন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যেন কথাগুলিকে মনের ভিতর গুছিয়ে নেয়। ঠিক সেই আগের দিনটির মতই একটা খোলা বইয়ের ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়ে নয়ন বলে—হিতেনবাবু যে একটা দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন, তারই জন্যে আপনার কাছে পরামর্শ চাইছিলাম।...সেই মহিলাকে আমি চাকরি দিয়ে কাঞ্চীপুরে পাঠিয়েছি, অথচ কাঞ্চীপুরের সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক চুকে গেছে।

পিসিমা বোধ হয় তাঁর উৎফুল্লতা চাপা রাখতে পারছিলেন না। চেঁচিয়ে বলতে থাকেন—ও আমার কপাল! এর জন্যে আবার পরামর্শ? এর জন্যে আবার চিন্তা? তুই সোমাকে এখুনি চিঠি লিখে দে, পত্রপাঠ চলে আসতে। ভদ্রলোকের মেয়ে, লেখাপড়া শিখেছে, আর জায়গা নেই, গেছে কাঞ্চীপুরে শিশুভবন করতে। যত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড!

নয়ন বলে—আমি চিঠি দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আপনি একটু উদ্যোগ করে তাকে আনিয়ে নেবেন।

পিসিমা আশ্বাস দেন—তুই নিশ্চিন্ত থাক।

নয়ন বলে—আর একটা কথা...।

পিসিমার কাছে প্রথম নির্লজ্জ হওয়ার মত দুঃসাহস যেন মনে মনে খুঁজছিল নয়ন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—মহিলার জন্য যতদিন না আমি একটা কাজ ঠিক করতে পারি, ততদিন পর্যন্ত তাকে এখানেই যদি রাখতে পারেন...।

পিসিমা বলেন—এখানে থাকবে না তো কোথায় থাকবে? আমার দায়িত্ব নেই?

নয়ন—আর, ততদিন পর্যন্ত তার মাইনেটা যেন মাসে মাসে নিয়ম মত তার মায়ের কাছে পাঠানো হয়।

পিসিমা বলেন—তোকে কিছু ভাবতে হবে না।

পিসিমা নয়নকে একেবারে ভাবনাহীন করে দিয়ে তাঁর হাসিমুখের আনন্দ আঁচল দিয়ে লুকিয়ে ফেলার জন্যই আবার ভিতর ঘরে চলে যান।

রাত্রি গভীর হয়ে আসে। পর পর দুটো চিঠি লেখে নয়ন। কাঞ্চীপুরের কাব্যতীর্থকে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দেয়—আমি নিতান্ত বাধ্য হয়েই আপনাদের বৃত্তি দেওয়া বন্ধ করলাম।

সোমার উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিটা সংক্ষেপ করতে গিয়েও অতিরিক্ত বড় হয়ে ওঠে। দেশের কাজ, রাজনীতি, নতুন পরিকল্পনা ইত্যাদি নানা প্রকার কাজের কথার বর্ণনার মধ্যে মাঝে মাঝে প্রার্থনাকুল আবেদনের মত এমন কথাও থাকে—"চলে আসবেন সোমা দেবী, কোন অধিকারের জোরে এ দাবী করছি না। আপনি কষ্টে আছেন, একথা মনে পড়লে আমি দেরাদুনে গিয়েও শান্তি পাব না...।"

ছোট ছোট ঘটনা, কিন্তু বড় দ্রুত। সারা হিন্দুস্থানে জ্বালামুখী ফুটবার আগেই মতিগঞ্জের দুই নেতা যেন জ্বালার আঁচ টের পেয়ে গিয়েছে। পরের দিন মতিগঞ্জ স্টেশনেই দেরাদুন-যাত্রী নয়ন গ্রেপ্তার হয়। আরও আশ্চর্য, ঘণ্টা দুই পরে মতিগঞ্জ স্টেশনের আর এক প্ল্যাটফর্মে দার্জিলিং-যাত্রী ভৈরববাবুও গ্রেপ্তার হলেন।

জনতার জয়ধ্বনির মধ্যে ভারত রক্ষা আইনে, শৃঙ্খলিত দুটি বিপজ্জনক সংগ্রামী জেলে চলে গেলেন। একজন ত্যাগী এবং আর একজন বিপ্লবী।

দেখতে দেখতে সারা হিন্দুস্থানে জ্বালামুখী ফুটলো। বেয়াল্লিশের আগস্ট মাসের সূর্য প্রথম সাতটি দিন শান্তভাবেই সাদা রোদের শোভায় ভারতবর্ষের আকাশে দিনরাত্রির পথ এঁকে দিয়ে যায়, কিন্তু তারপরেই যেন কেমনতর হয়ে গেল, ভারতবর্ষের ইতিহাসে যা কখনো হয়নি। সে এক রক্তসংকাশ ও বহ্নিময় মহাদ্যুতি!

সহস্র দুঃখের আঘাতে যন্ত্রণাক্ত ভারতভূমির বুকের পাঁজরে যেন ভয়ংকর এক উল্লাসের শিহর জেগেছে। বোম্বাই, গুজরাট, অযোধ্যা, অন্ধ্র, মহাকোশল আর বিহার ; তারপর সেই মহাস্পন্দনের তরঙ্গিত অনলের জ্বালা কাঞ্চীপুরেও পৌঁছে গেল।

বাণীপীঠের প্রাঙ্গণে ত্রিবর্ণ পতাকার নীচে প্রার্থনা করছিলেন কাব্যতীর্থ। দশ হাজার গ্রাম্য নরনারীর জনতা নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে সমস্ত হৃদয়ের আগ্রহ দিয়ে সেই প্রার্থনা শুনছিল।

কাব্যতীর্থের সেই অতি প্রশান্ত সদাস্মিত মুখটা অদ্ভুত এক তেজোময় বর্ণের ছটায় যেন রঙীন হয়ে উঠেছে। দাও পুণ্য, দাও প্রেম, দাও শক্তি! ভারতভূমির হৃদয়োদ্ভূতা এই জ্বালামুখীকে আত্মাহুতি দিয়ে বরণ করবার জন্য কাব্যতীর্থ যেন মহাপ্রাণের আবাহন করছিলেন ঃ

—হে জ্বালামুখী, তোমার শুদ্ধ পাবকের লক্ষ শিখা দিয়ে পরাধীন ভারতের জীবন হতে এই সুদীর্ঘ কালরাত্রির পুঞ্জীভূত তমিস্রা দগ্ধ কর, দূরীভূত কর। ভারতের সমীর হতে সকল গ্লানির জঞ্জাল ভস্মীভূত করে দাও। ভারতের সলিলে নতুন স্নিগ্ধতা আন, ভারতের মাটিকে নতুন সৌরভে ও রসে ভরে দাও।

—হে আমার দেশের ইতিহাস, তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা। আমার চেতনার নেপথ্যে যারা নিঃশব্দ হয়ে আছ, হে লক্ষ সাধকের স্মৃতিময় সত্তা, সাড়া দাও। ভারতের জীবনে এই মহা অরুণোদয়ের জন্য যুগে যুগে তিলে তিলে প্রাণ দিয়েছে যারা, সেই নামহীন পরিচয়হীন হে অখ্যাত প্রণম্য দল, আজ নতুন করে আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর। হে দুর্জ্ঞেয় বরেণ্য দল, আজ নতুন করে আমাদের বরণ গ্রহণ কর। এস এস, এস, আমার ভারত ইতিহাসের ধ্যানলোকে সমাহিত লক্ষ পুণ্যবান কীর্তিমান ও প্রেমিক, এই পুণ্যলগ্নে আমাদের আত্মায় আবার জাগ্রত হও। ভারতের নতুন সূর্যে তোমরা আবার ভাস্বর হও। ভারতের জননী-জায়া-ভগিনীকে তোমার কারুণ্যে মধুরতর কর, ভারতের ভ্রাতা-পিতা-পুত্রকে জ্ঞানে ও চরিত্রে গরীয়ান কর। হে ভারত ইতিহাসের মহতো মহীয়ান, আজ এই সংগ্রামের প্রথম মুহূর্তে ক্ষুদ্র কাঞ্চীপুরের গ্রাম্য প্রাণের প্রার্থনারূপে তোমাকে আহ্বান করি।

—হে আমার সুপ্রবীণ ভারতবর্ষ, তোমার অদৃশ্য সরস্বতীর তীর হতে হোমাগ্নি ধূমের পুঞ্জ পুঞ্জ পূত সৌরভ আজ আমাদের প্রতি গৃহে প্রেরণ কর। সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ

বীর্য করবাবহে। বহু যুগের স্তব্ধতার দুঃখ ভেদ করে তোমার মন্ত্রস্বর ভারতের আঙিনায় নতুন করে মুখরিত হোক।

--হে মৌনী কপিলাবস্তু, তোমার সিদ্ধার্থের বাণী আবার নতুন শোনাও। জাগ সারনাথ, জাগ মৃগদাব, জাগ উরুবিল্ব, তোমার শীলাচারের পুণ্যে আবার ভারতের গৃহে গৃহে নতুন প্রদীপ জ্বাল। ভাবতের প্রতি কুটির স্বাধীন ভারতের নব সংঘারামে পরিণত হোক।

—জাগ্রত হও পাটলিপুত্রের পাষাণ। দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী হে ধর্মাশোক, ভারত ভূমিতে আবার শান্তির সাম্রাজ্য সম্ভব কর।

—আহ্বান করি তোমাকে, ক্ষাত্রশক্তিসেবিতা হে আমার সুদরাতীতা দুর্জয়া ভারতভূমি। তোমার সীমাপথের কিনারায় বৈরী লুণ্ঠকের হিংস্র অশ্বক্ষুরধ্বনি চিরকালের মত স্তব্ধ কর। সমুদ্রচুম্বিত উপকূলের সুশ্যাম বেলাবলয় হতে বৈদেশিক জলদস্যুর তরণী চিরকালের মত দূরাপসৃত কর। শত হল্‌দিঘাটের পুণ্যে মহিমান্বিত হে ভারতের ক্ষাত্র আত্মা, আবার শুদ্ধা দেশাত্মিকা শক্তিতে ভারতভূমিতে জাগ্রত হও।

—জাগো ভারতের শস্য ও বনস্পতি, স্বাধীন ভারতের বলিষ্ঠ কৃষকের মমতাময় স্পর্শে আবার অন্নময় হও। ভারতের শিল্পী, স্বাধীন ভারতের হৃদয়কে নতুন করে প্রতিমায়িত কর। দাও প্রেম, দাও পুণ্য, দাও শক্তি, হে মহাপ্রাণ আমাদের যাত্রা সফল কর।

কাব্যতীর্থের প্রার্থনা শেষ হয়। বিরাট জনতা যেমন নিঃশব্দে বসে প্রার্থনা শুনছিল, তেমনি নিঃশব্দে আবার ধীরে ধীরে যে যার ঘরে ফিরে যায়।

শুধু ভাবাবিষ্টের মত প্রাঙ্গণের এক কোণে বসেছিল সোমা। এই বাণী সোমা জীবনে কখনো শোনেনি, এমন করে শোনেনি, এখানে শুনতে পাবে তাও আশা করেনি। এই বাণী শোনার পর তার মনপ্রাণ যে এমন করে শিউরে উঠবে তাও সে কল্পনা করতে পারেনি। চুপ করে বসে ছিল সোমা, তার চেতনার উপর দিয়ে যেন এক অদৃশ্য তীর্থসলিলের স্রোত এই মাত্র প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে।

প্রবীর মাস্টার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ডাক দেয়--চলুন।

সোমা যেন হঠাৎ তন্দ্রাভঙ্গ চোখ মেলে চারদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে—কাব্যতীর্থ মশাই কোথায় গেলেন?

প্রবীর বলে--ঐ যে চলে যাচ্ছেন।

সোমা দেখতে পায়, কাব্যতীর্থ একা একা একমনে ধীরে ধীরে হেঁটে চলে যাচ্ছেন। পায়ে খড়ম, আদুড় গায়ের উপর একটি চাদর, আর হাঁটু পর্যন্ত বহর খাটো ধুতি! সোমার বিস্ময়াপ্লুত দৃষ্টিটা যেন নিজেকে প্রশ্ন করে—সত্যিই কি ওর নাম বিনোদ কাব্যতীর্থ, শুচিদির স্বামী, দুবেলা পেট ভরে খাওয়ার মত ভাত জোটে না, চাষীদের সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাতে ঝুড়ি নিয়ে মরাকালিন্দীর হানা মাটি দিয়ে বাঁধে, মতিগঞ্জের নয়ন চৌধুরী যাকে জব্দ করার জন্য বৃত্তি বন্ধ করে?

প্রবীর বলে—কি ভাবছেন?

সোমা--কাব্যতীর্থ মশাই কি সত্যই পৃথিবীর মানুষ?

প্রবীর কৃতার্থভাবে অথচ কেমন যেন একটা শান্ত গর্বের সঙ্গে হাসতে থাকে—আপনি এতদিনে ওঁকে চিনতে পেরেছেন মনে হচ্ছে, কিন্তু আমি অনেক দিন আগেই চিনেছি।

সোমা ব্যগ্রভাবে অনুনয় করে—ওঁকে একবার থামতে বলুন প্রবীরবাবু, ওঁর কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে।

প্রবীর ডাক দিতেই কাব্যতীর্থ থেমে মুখ ফিরিয়ে তাকান। সোমা আর প্রবীর এগিয়ে সামনে পৌঁছতেই কাব্যতীর্থ হাসিমুখে অভ্যর্থনা করেন--কি? দুজনে একসঙ্গে কি মনে করে?

কাব্যতীর্থ যেভাবে এবং যা মনে করেই কথাগুলি বলুন না কেন, সোমা আর প্রবীর

দুজনেই হয়তো মনে মনে ক্ষণিকের মত একটা সংকোচে জড়িয়ে পড়ে। কথাগুলির মধ্যে যেন আকাশবাণীর মত একটা পরিণামের রহস্য হঠাৎ বেজে উঠেছে।

সোমা বলে--আমি এসেছি, একটা প্রশ্ন করবো বলে।

কাব্যতীর্থ তেমনি হাসিমুখে সস্নেহভাবে বলেন--বল।

সোমার মনটা হঠাৎ খুশীতে ভরে ওঠে। কাব্যতীর্থ মশাই তাকে আজ 'আপনি' করে কথা বলতে ভুলে গিয়েছেন।

সোমা আবদারের সুরে বলে--আপনি কেমন করে এত আনন্দে থাকেন, কি মন্ত্রের জোরে, আমাকে বলতে হবে।

কাব্যতীর্থ হো হো করে প্রবল উচ্ছ্বাসে হাসতে থাকেন।--আমি কানে মন্তর দিয়ে গুরুগিরি করি নাকি সোমা? অ্যাঁ?

সোমা--আমি কিছু শুনবো না, আমাকে বলতে হবে।

কাব্যতীর্থ আবার শান্ত হাসির সঙ্গে সস্নেহে বলেন--তুমি কি নিরানন্দে আছ সোমা?

সোমা--না কাব্যতীর্থ মশাই, আমি আনন্দেই আছি, কিন্তু আপনার মত নির্ভয় আনন্দে নয়।

কাব্যতীর্থ--ও, বুঝলাম।

মাটির দিকে একদৃষ্টি দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে কাব্যতীর্থ ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে যান। তারপর যেন মধুরমন্দ্র প্রতিধ্বনির মত স্বরে বলতে থাকেন--জীবনকে সৎপথে রাখলেই আনন্দ।

সোমা--কোনটা সৎপথ কি করে বুঝবো?

কাব্যতীর্থ--নিজে যেটা সত্য বলে বিশ্বাস করবে, সেটাই সৎপথ। তাতে ভুল করলেও আনন্দ।

কাব্যতীর্থ আবার মুখ তুলে সস্মিতভাবে তাকান। সোমা ভাবছিল, এমন কথা তো আগেও সে কতবার শুনেছে, কিন্তু সেই শোনা আর আজকের শোনায় কত তফাত! আগে যেটা শুধু মুখস্ত করবার নীতিকথা মনে হতো, আজ সেটাই প্রাণবাঁচানো ওষধি বলে মনে হয়। নিজে যেটা সত্য বলে বিশ্বাস করবে, সেটাই সৎপথ। এত লোভ ও মায়াব ছলনা, এত ঘৃণা ও ভয়ের ভ্রূকুটি, এত সংস্কার ও ভালো-লাগা দিয়ে তৈরী জটিল আবর্তের মধ্যে স্খলন-পতন ও ত্রুটি থেকে আত্মরক্ষা করতে, এর চেয়ে সহজ মন্ত্র আর কি হতে পারে? পথের ধাঁধায় পীড়িত সোমার মনটা এখনই যেন অনেকখানি ভারমুক্তির আনন্দ অনুভব করে।

কাব্যতীর্থ বলেন--তুমি কখন আসছো প্রবীর?

প্রবীর--আমি এসেই রয়েছি বিনোদদা, শুধু এঁকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

--এস। কাব্যতীর্থ চলে যান। সোমা আর প্রবীর অন্যদিকে শিশুভবনের পথে অগ্রসর হয়।

প্রবীর যেন কৌতুক করে ভয় দেখাবার জন্যই সোমাকে বলে--আপনি কি কাণ্ডটা করলেন বুঝতে পারছেন?

সোমা চিন্তিতভাবে বলে--কাণ্ড? কি কাণ্ড করলাম?

প্রবীর--আপনি কাব্যতীর্থের শিষ্য হয়ে গেলেন।

অগাধ পুলকে গভীর এক হাসির আভা হঠাৎ সোমার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে ; কোমল চিবুক আর ললিত ভুরু দিয়ে গড়া সোমার মুখটা বড় সুন্দর হয়ে ওঠে।

সোমা বলে--তাই বলুন। আর, মশাই বুঝি এ কাণ্ডটা অনেকদিন আগেই...।

প্রবীর বলে--হ্যাঁ।

এক অন্তরঙ্গ সাথীর কাছে মন খুলে জীবনের এক গোপন ঘটনার বৃত্তান্ত যেন বর্ণনা করে প্রবীর।--অনেক গুণী-জ্ঞানীর কাছে খোঁজ করে বেড়িয়েছি অনেক দিন, সবাই তাঁদের নিজের

নিজের সত্য দেখিয়ে দিয়ে বলেছেন—এই একমাত্র সত্য, এই পথে এস। একমাত্র বিনোদদাই উল্টো কথা বললেন—তুমি নিজে যেটা সত্য বলে বিশ্বাস করবে সেটাই একমাত্র পথ।

সোমা আরও খুশি হয়ে বলে—এত সহজ পথ থাকতেও লোকে পথ চিনতে পারে না, আশ্চর্য।

প্রবীর সত্যিই আশ্চর্য হয়—কি বললেন? সহজ পথ?

সোমা যেন নিজের মনের আবেগেই আবৃত্তি করে—হ্যাঁ, কত সোজা ও সহজ পথ। নিজে যেটা সত্য বলে বুঝবে...।

প্রবীর আর কোন প্রশ্ন বা তর্ক করে না। অনেকটা পথ নীরবে পার হয়ে একটা ছায়া পেয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে প্রবীর। বহুকালের পুরনো একটা রাসমঞ্চের ধ্বংসস্তূপের ছায়া। পথটা এখান থেকে দু ভাগ হয়ে একটা ডাইনে ঘুরে শিশুভবনের দিকে চলে গিয়েছে, আর একটা গিয়েছে ধানক্ষেতের আলের মাথায় মাথায় ছোট একটা মাঠের দিকে, যেখানে কতগুলি বড় বড় পলাশ একপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

শুধু পলাশের ভিড় নয়, এখান থেকেই দেখা যায়, মাঠের উপর কংগ্রেস শিবিরের সামনে হাজার হাজার মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রবীর বলে—আমাকে এখান থেকেই বিদায় দিন, সবাই আমার অপেক্ষা করছে। আর সময় নেই।

দূরে জনতার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টি দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সোমা ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করে। এ তো আর কল্পনার ছবি নয়, জ্বালামুখীর শিখাকে আত্মাহুতি দিয়ে বরণ করার জন্য ঐ যে প্রত্যক্ষ এক বিরাট প্রাণের সমাবেশ! শুভেচ্ছা ও আনন্দ, কিন্তু তার সঙ্গে যেন একটা ছেড়ে-দিতে-মন-চায় না উৎকণ্ঠা, সব মিলিয়ে সোমার গলার স্বর নিবিড় করে আনে—কোথায় যাবেন প্রবীরবাবু?

প্রবীর হাত তুলে জনতার দিকে ইঙ্গিত করে—ঐ যে।

সোমা চোখ খুলে তাকায়। শান্তভাবেই বলে—যান।

—চলি। প্রবীর হাসিমুখেই চলে যাচ্ছিল। কিন্তু পথের অপর দিক থেকে ছায়ার বাঁকে দুটি মানুষ এগিয়ে আসছে দেখা যায়। প্রবীর থমকে দাঁড়ায় ও তাকিয়ে থাকে।

আস্তে আস্তে এগিয়ে এল দুটি মূর্তি। এক শীর্ণদেহ প্রৌঢ়া, শত তালি দিয়ে সেলাই করা জীর্ণ শাড়িটা দেখতে ভিক্ষুকদের পরিচ্ছদের মতই ; চোখ মুখ কিন্তু নম্র পরিচ্ছন্নতায় ভরা ; রোগা রোগা পায়ের পাতা দুটি পথচলা ধুলোয় ঢাকা, সঙ্গে একটি কিশোর বয়সের গ্রাম্য ছেলে।

শীর্ণদেহ নারীমূর্তি আর একটু নিকটে এগিয়ে আসতেই প্রবীর যেন একটা লাফ দিয়ে গিয়ে সেই নারীর পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে। সেই ধুলোয় ঢাকা রোগা পায়ের পাতায় মাথাটা লুটিয়ে দিয়ে ঘষতে থাকে প্রবীর। সোমা সন্ত্রস্ত ভাবে তাকিয়ে থাকে। মানুষকে এভাবে প্রণাম করতে জীবনে দেখেনি সোমা।

প্রবীর উঠে দাঁড়িয়ে বলে—মা, তুই কোত্থেকে এলি?

সোমা কেন জানি দৃশ্যটাকে সহ্য করতে পারছিল না। কাঁটালতায় ঢাকা রাসমঞ্চের ইঁটের স্তূপের গায়ে হেলান দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করে সোমা।

শ্যামু এগিয়ে এসে প্রবীরকে প্রণাম করে, শ্যামুর মাথায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে প্রবীর আবার বলে—কেমন আছিস মা?

মা বলেন—আমি ভালই আছি, কিন্তু বুড়োর বড় কষ্ট যাচ্ছে রে পবু।

প্রবীর কোন উত্তর দেয় না। মা একবার প্রবীরের আপাদমস্তক মূর্তিটার উপর যেন দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। তারপর বলেন—তুই ভাল আছিস তো?

প্রবীর—হ্যাঁ মা।

মা—শুনলাম তুই হেডমাস্টার হয়েছিস।

প্রবীর একটু চুপ করে থেকে উত্তর দেয়, হ্যাঁ মা।

মা—তবে এবার বুড়োকে দুটো টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য কর পবু, নইলে যে আর চলে না।

প্রবীরের নিরুত্তর মূর্তিটা শুধু দিক্‌প্রান্তে শূন্য দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মা বলেন—তুই ঘরে যাস না কেন রে? একবার উঁকি দিয়ে দেখেও তো আসতে হয়।

প্রবীর বলে—যাব।

মা—কবে?

প্রবীর—শীগগির যাব।

মা—আমি কিন্তু আজকেই ফিরে যাব পবু।

প্রবীরকে নিরুত্তর দেখে মা একটু চঞ্চল হয়ে বলেন—ব্যাপারীদের নৌকায় নরসিংহতলা পর্যন্ত এসেছি, দয়া করে বিনি ভাড়ায় নিয়ে এসেছে। ওরা আজই বিকেলে আবার ধূপখাল ফিরে যাবে। আমি এখুনই যাব পবু।

মা যেন কিসের আশায় কথার ইঙ্গিতে একটা তাগিদ দিচ্ছেন। প্রবীর বুঝলো কিনা, তা সে-ই জানে। মাকে আবার প্রণাম করে প্রবীর বলে—আচ্ছা, এস মা।

মার শীর্ণ অথচ শান্ত মুখ হঠাৎ যন্ত্রণাক্ত হয়। প্রবীরের দিকে তাকিয়ে মার চোখের দৃষ্টিটা যেন তৈলহীন প্রদীপের পোড়া সলিতার শিখার মত ধোঁয়াটে হয়ে ওঠে—বুড়োর জন্যে সঙ্গে কিছু দিবি নি পবু?

প্রবীর নীরব। মা একটু বেশি বিচলিত হয়ে বলেন—আমি তো তোর কাছে কোনদিন কিছু চাইনি পবু। কিন্তু আজকেও দিবি না? বাঁচবো কি করে বল?

মার হাতটা ধরে প্রবীর যেন একটা চিৎকার চেপে রাখবার চেষ্টা করে—আর কটা দিন তোরা জোর করে বেঁচে থাক মা, এখন আমায় তাগিদ দিস না। আমার কিছু নেই।

সেই মুহূর্তে মার শীর্ণ মুখটা আবার স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে বলেন—আচ্ছা।

মার হাত ছেড়ে দিয়ে আর কোন দিকে না তাকিয়ে প্রবীর পথ ধরে যেন ছুটে চলে যেতে থাকে, যেন ছোট্ট ঘরের মায়ার ভয়ে ভীত একটি পলাতক আত্মা, নিখিল জ্বালামুখীর দিকে।

এই চকিত দৃশ্যটার সীমাহীন নিষ্ঠুরতায় যেন মূর্চ্ছাহতের মত চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়েছিল সোমা। চোখ খুলতেই বুঝতে পারে; চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। প্রবীরের মা আর ভাই কিছু দূর এগিয়ে চলে গিয়েছে শিশুভবনেরই দিকে, নরসিংহতলার সড়কটা ধরবে বলে।

এখনও সুযোগ আছে। সোমা প্রায় দৌড়ে দৌড়ে শিশুভবনের কাছাকাছি এসে প্রবীরের মা ও ভাইকে বলে—আপনারা একটু দাঁড়ান। আমি এখুনি আসছি।

সোমা প্রায় তেমনি ব্যস্তভাবে প্রায় ছুটে গিয়ে শিশুভবনের নিজের ঘরটিতে ঢোকে। বাক্স খোলে, কুড়িটা টাকা তুলে নিয়ে আবার প্রবীরের মার কাছে এসে দাঁড়ায়।

সোমা বলে—এই নিন।

প্রবীরের মার শীর্ণ মুখটা হঠাৎ বিস্ময়ে বিমূঢ়ের মত হয়ে ওঠে।—টাকা? কেন?

সোমা—আমি দিচ্ছি, নিন।

প্রবীরের মা শান্তস্বরেই প্রশ্ন করেন—ভিক্ষে দিচ্ছ?

সোমা লজ্জিত ও ব্যথিতভাবে বলে—না, না, এ আপনারই ছেলের টাকা, নিন।

প্রবীরের মা সোমার মুখের দিকে আরও বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকেন। দৃষ্টিটা যেন এক অতল প্রশ্নের সমুদ্রে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে।—আমার ছেলের টাকা, তোমার কাছে? তুমি কে

মা?

সোমা--আমি এই শিশুভবনে ছেলে পড়াই, নিন।

সোমার মুখের দিকেই তাকিয়ে থেকে প্রবীরের মা ধীরে ধীরে মাথা নাড়েন--না।

প্রবীরের মা আর শ্যামু এবার একটু বেশি ব্যস্তভাবেই পা চালিয়ে চলে যায়। তুমি কে মা? প্রশ্নটার উত্তর যেন হঠাৎ পেয়ে গিয়েছেন প্রবীরের মা। শিশুভবনে ছেলে পড়ায়, রূপে গুণে জাতে অতি ভদ্র ঐ মরীচিকার কাছে তাঁর ধূপখালের কুঁড়ে ঘরের ছেলে হারিয়ে গিয়েছে চিরকালের জন্য। প্রবীরের মা আর ফিরে তাকান না। শুধু সোমা দেখতে থাকে, যতক্ষণ দেখা যায়।

প্রথম গেল ভরাকুল থানা।

দশটি রাইফেল আর দুটি রিভলবারের অগ্নিময় হিংসায় উদ্ধত ভরাকুল থানা জনতার প্রথম শঙ্খরোল শোনামাত্র কাঁটাতারের বেড়া গায়ে জড়িয়ে প্রস্তুত হয়ে রইল। কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না। শঙ্খরোলও থামলো না। দশ হাজার গ্রাম্য প্রাণের বাহিনী ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে যেন সজীব গ্রানিটের প্রাচীরের মত থানার চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল, রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজের হুমকি বাতাসে ফাঁকা হয়েই মিলিয়ে গেল।

দশ হাজার পুণ্যাত্মার জনতা নয়। দুঃখে অপরাধে ও দীনতায়, লোভে ক্ষোভে ও নিরন্নতায়, ধৈর্যে ক্ষমায় ও ভালবাসায়, ভাল-মন্দের রক্তমাংস দিয়ে তৈরী গ্রামের মলিনমূর্তি জনতা। কে না আছে এর মধ্যে? বুড়ো-আধবুড়ো, তরুণ-কিশোর, ক্ষেতচাষী, বেসাতি, মাটিকাটা মজুর, ছোট-বড় জাত-কুজাত, কর্মী, বিদ্যার্থী, স্বেচ্ছাসেবক। আছে পাগলা বাউল অভিরাম। আছে রাতভিখারী কানা ফটিক। মাত্র দুদিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে, সেই দাগী চোর সদানন্দও আছে। কিন্তু আজ সবাই মিলে. যেন মন্ত্রশুদ্ধ নিঃশ্বাসের মত এক আত্মভোলা প্রেরণায় এই অভিযানকে পুণ্যময় করে তুলেছে। জনতার পুরোভাগে ছিলেন কাব্যতীর্থ। শুধু দুহাত তোলা জয়ধ্বনি আর বুকভরা প্রতিজ্ঞা সম্বল করে সবাই এগিয়ে এসেছে।

কাঁটাতারের আড়ালে দাঁড়িয়ে পুলিস ইনস্পেক্টার জনতাকে হুঁসিয়ারী শুনিয়ে দিলেন, পনর মিনিটের মধ্যে সরে যেতে।

জনতার পক্ষ থেকে কাব্যতীর্থ পুলিস-ইনস্পেক্টারকে এক ঘণ্টা সময় দিলেন, যত ইচ্ছা গুলি চালিয়ে নিতে।

আগস্ট মাসের মধ্যাহ্নসূর্য প্রতি মুহূর্ত ক্ষয় করে ধীরে ধীরে পশ্চিম আকাশে হেলে পড়তে থাকেন। প্রতি মুহূর্তে নিজের কাঁটাতারের বেড়ায় বন্দী ভরাকুল থানার কঠিন ঔদ্ধত্য একটু একটু করে ক্ষয় হতে থাকে। একটি ঘণ্টা পর আবার শঙ্খরোলের ঝড় ওঠে, কাঁটাতারের বেড়ার ওপার থেকে দশটা রাইফেল ও দুটো রিভলবার ঝপ ঝপ করে জনতার পায়ের কাছে এসে পড়ে, আত্মসমর্পণ করে।

উর্দি খুলে রেখে বের হয়ে আসে ইনস্পেক্টার, দারোগা, কনস্টেবল, দফাদার ও চৌকিদারের দল। কাব্যতীর্থের কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে, গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার অনুমতি চায়। কাব্যতীর্থ খুশি হয়ে অনুমতি দেন।

সূর্য অস্ত যাবার আগেই দেখা যায়, ত্রিবর্ণ পতাকা উড়ছে ভরাকুল থানার মাথার উপর।

সন্ধ্যা গভীর হবার সঙ্গে সঙ্গে ভরাকুলের অন্ধকারে একটা নতুন ধরনের আগুন জ্বলে রাঙা হয়ে। উদ্ধত ভরাকুল থানার ত্রিশটা উর্দি আর রাশি রাশি নথিপত্র পুড়তে থাকে, ইংরাজের পীনাল কোডের রাশি রাশি অহংকারের জ্বলন্ত চিতা।

এবার ফিরে যাওয়ার পালা। জনতা দলে দলে ভাগ হয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের দিকে চলে

যেতে থাকে। যাবার সময় অনেকে এগিয়ে এসে কাব্যতীর্থকে প্রণাম করে। প্রথম সত্যাগ্রহে জয়ী আনন্দচঞ্চল এক একটি দল ধীরে ধীরে দূরান্তরে চলে যায়। আর স্পষ্ট করে কিছু দেখা যায় না। উপরে তারায় ভরা আকাশ, নীচে গ্রাম-প্রান্তর, তারই মধ্যে পথিক জনতার চলমান জয়ধ্বনির রেশ, পুণ্য পুলকে অন্ধকার শিউরে ওঠে।

সব শেষে সদানন্দ দাগীও এসে কাব্যতীর্থকে প্রণাম করে।--গ্রাম তো একেবারে নিষ্কণ্টক হলো না পণ্ডিত মশাই।

কাব্যতীর্থ--কেন সদানন্দ?

সদানন্দ--মাণিক চৌকিদারকে তো দেখলাম না। সব কাঁটার বড় কাঁটা গা-ঢাকা দিয়ে গ্রামের মধ্যেই যে লুকিয়ে রইল পণ্ডিত মশাই।

কাব্যতীর্থ ও প্রবীর মাস্টার দুজনেই সদানন্দের দুশ্চিন্তায় হেসে ওঠে।

জনতাকে সঙ্গে নিয়ে সব শেষে যখন ফিরতে থাকে কাব্যতীর্থ, তখন কাঞ্চীপুরে প্রতি ঘরের নীরবতার মধ্যে এক একটি প্রতীক্ষার দীপ জ্বলে। স্বামী, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা, স্বরাজের লড়াই সেরে ঘরে ফিরে আসছে। এই আসছে এই আসছে, আর কতক্ষণ?

দীপ জ্বলে সোমার ঘরেও। কেন? তার ঘরে তো ফিরে আসবার মত কেউ নেই। সেই কখন মাঝদুপুরে তারার মা সোমার ভাত এনে এই ঘরের ভিতরেই রেখে গিয়েছে, কিন্তু সোমার এখনও খাওয়া হয়নি। ভাতের থালাটা তেমনি ঢাকা অবস্থায় ঘরের কোণে পড়ে আছে।

দুপুর থেকে শুধু অবিরাম কাজ করেছে সোমা। একটা খদ্দরের থান কাটতে কাটতে সবটাই ফুরিয়ে এল। ফ্রকের মাপগুলি সবই কাটা শেষ হয়েছে। তা ছাড়া ভোলার জন্য একটা নতুন ডিজাইনের নিকার।

অন্য দিনের মত সোমা আজ আর উতলা হয় না, সোমার চিন্তাগুলিও না আচরণও না। যা নিজে সত্য বলে বিশ্বাস করবে তাই একমাত্র পথ, কাব্যতীর্থের কথায় বোধ হয় সত্যিই সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছে সোমা।

এখনও কাজ করতে করতে চক্রবেড়ের গলির কোণে সেই একঘরে বাসাটার কথা অবশ্যই মাঝে মাঝে মনে পড়ে সোমার। জীর্ণ ফ্রেমে বাঁধানো বাবার ফটো, মা চুনি ও পান্না। কিন্তু মনে পড়ার সেই বেদনা কই? প্রবীর মাস্টারের মা ও শ্যামুর দিকে তাকিয়ে আজ যে দুঃখের রূপ দেখতে পেয়েছে সোমা, তার তুলনায় চক্রবেড়ের গলির দুঃখকে নিতান্ত অভিমানের ফ্যাশান বলে মনে হয়। কাঞ্চীপুর রোড স্টেশনের অন্ধকারে প্রথম যেদিন ট্রেন থেকে নেমেছিল সোমা, সেদিন তার মনে এই ধারণাটাই নিঃসংশয় হয়েছিল যে, সে এই পৃথিবীর সব সুখের যোগ্য হয়েও বঞ্চিতা, মানিনী হয়েও অসম্মানিতা, ভাগ্যের কোলে জন্মেও দুর্ভাগ্যতাড়িতা। কিন্তু আজ আর বোধ হয় সে সোমা নেই, দুঃখের প্রতিযোগিতায় অন্তত একটি মানুষের কাছে সে আজ পরাজিত, সে হলো প্রবীর মাস্টার।

যতই মন দিয়ে কাজ করুক না কেন, আজ এই সন্ধ্যাদীপের আলোকে বার বার যার কথা সোমার মনে পড়ে, সে হলো প্রবীর মাস্টার। সবই বুঝতে পারে সোমা, তার চিন্তাগুলিকে মিথ্যা ভ্রূকুটি দেখিয়ে আর আড়াল করতে চায় না। তাকে ভাল লাগে, নিজের মনের কাছ থেকে এই সত্য লুকিয়ে আর লাভ কি?

ভালবাসার রীতিনীতি নিয়ে কোন দিন মাথা ঘামায়নি সোমা, জীবনে কোনদিন প্রয়োজন হয়নি। কলকাতার সংসারে একটা রীতিই সে চিরকাল দেখে এসেছে, ম্যাট্রিক পাস মেয়ে বি. এ. পাসকে চায়, বড় বাড়ির মেয়ে চারুকে আরও বড় ঘরে বিয়ে দেবার জন্য পাত্র খোঁজাখুঁজি হয়। লীলার বৌদি বলেন, লীলার বর লীলার চেয়ে আর একটু ফর্সা হলে ভাল

ছিল। মেয়ে-জীবনের সঙ্গী নির্বাচনে এই তো একটা ভদ্র অনুরাগের সাধারণ আইন প্রচলিত আছে।

সুন্দর সুন্দরতরকে চায়, বৈভব আরও বৈভবকে চায়, কিন্তু দুঃখ কি দুঃখতরকে চাইতে পাবে? তবু তাইতো সত্য হয়ে উঠলো, নইলে এই গ্রাম্য একলব্যের মুখটা তার কাছে এত মায়াময় মনে হয় কেন? সোমা বুঝতে পারে, তার জীবনে অনুরাগের সাধারণ আইনটাও উল্টেপাল্টে গেল। বেশ হলো, এর জন্য বিন্দুমাত্র ব্যথিত হবার কিছু নেই।

নিতান্ত ব্যবসায়ীর মতই হিসাব করে লাভ-লোকসানের ভয়-ভরসা খতিয়ে সোমা তার এই ভাল লাগার পরিণামকে বিচার করে। কি আর হবে? ভদ্রা হয়তো মুখ টিপে হাসবে, হিতেন কাকাবাবু গম্ভীর হয়ে ভাববেন, আর মা বলবেন জাত গেল। চুনি পান্নাও হয়তো বুঝতে পারবে, একটা যাচ্ছেতাই রকমের দিদি তাদের ঠকিয়ে দিল, উপরতলার লীলাদির মত চেলিচন্দনে সুন্দর হয়ে সেজে একটি উৎসবের রাত্রিতে তাদের মনের আনন্দে শাঁখ বাজাবার সুযোগও দিল না। এই তো লোকসান।

আর লাভ? কেউ না জানুক, সোমা জানে তার মনের ভিতরে সকল অনুভবের স্নায়ুগুলিই যেন কি এক পরম লাভের আস্বাদে পরিতৃপ্ত হয়ে আছে। কাঞ্চীপুরের এই হৃদয়ভরা ঐশ্বর্যের জগতে রাজেশ্বরী হওয়ার লাভ। দুর্লভকে নিবিড় করে পাওয়ার লাভ। সাধে কি আর শুচিদি বাপের বাড়ি যেতে চান না?

তারার মা এসে বলে—স্বরাজ হয়েছে গুরুমা।

সোমা হাসিমুখে তারার মা'র দিকে তাকায়—কে বললে?

তারার মা—ভরাকুল থানা পালিয়ে গেছে। ওরা সবাই ঘরে ফিরে এসেছে।

সোমা—বেশ।

ভোলার নিকারটা তুলে নিয়ে সোমা আবার সেলাই ধরে। তারার মা কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর যেন সোমাকে ভাল করে শোনাবার জন্যই আচমকা চেঁচিয়ে বলে ওঠে—প্রবীর মাস্টারও ফিরে এসেছে।

সোমা একটু বিরক্তির সঙ্গেই উত্তর দেয়—শুনলাম তো, এত চেঁচিয়ে বলবার কি আছে।

তারার মা—এবার তাহলে তুমি খেয়ে নাও।

সোমার মাথাটা হঠাৎ সেলাই করার কাজে আরও বেশি করে ঝুঁকে পড়ে, যেন মুখ লুকোবার আড়াল খুঁজছে সোমা। তারার মাকে প্রত্যুত্তরে দুটো কথা শোনানো দূরে থাক, ক্ষণিকের মত চোখ তুলে তাকাবার সাহসটুকু পর্যন্ত যেন সোমার হারিয়ে গিয়েছে।

—খাও। তারার মা আবার বলে। বলার ভঙ্গীতে একটা ধমকের সুর ছিল। সোমা সেলাই ফেলে রেখে নিঃশব্দে উঠে গিয়ে হাত ধুয়ে ঠাণ্ডা ভাতের থালা টেনে নিয়ে খেতে আরম্ভ করে। তারার মা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, তারপর চলে যায়।

এইবার নিশ্চিন্ত সাহসে এক গেলাস জল খেয়ে আর ভাতে জল ঢেলে সোমাও উঠে পড়ে। মনভরা প্রশান্তি নিয়ে আঙিনার চারদিকে ঘুরে ফিরে যেন কাঞ্চীপুরের বাতাসকে গায়ে মেখে বেড়ায়, চিরকালের মত আপন করার জন্য। ইচ্ছা হয়, পুকুরে গিয়ে এই ঘোর সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা জলে সারা শরীরটাকে ডুবিয়ে ডুবিয়ে স্নান করে আসে। কিন্তু তারার মা জানতে পারলে আবার কোন্ সুরে ধমক দিয়ে কি বলে ফেলবে, কে জানে?

রাত হয়ে আসছে আরও নিঃশব্দ হয়ে, তুলসী ঝারির ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার শব্দ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। হাত মুখ ধুয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসে একটা ঘাসী রঙের শাড়ি পরে সোমা যখন আয়নার সামনে দাঁড়ায়, মুহূর্তের জন্য তার লজ্জারক্ত মুখের প্রতিচ্ছবিটা নিজের কাছে ধরা পড়ে যায়। নিজের চেহারাকে কখনো ভাল করে সাজাবার প্রয়োজন হবে, কোনদিন এই কল্পনাকে প্রশ্রয় দেয়নি সোমা। মার মুখে বহু অনুযোগ শুনেও রঙিন শাড়ি

পরেনি। বরং নিজের নগণ্যতাকে চরম করে তোলবার জন্যে সাধ্যমত যা করবার তাই সে এতদিন করে এসেছে। কিন্তু আজ হঠাৎ? এ যে অভিসারিকার গোপন রূপসজ্জার মত। অগোচরের নিয়তি যেন আজ সুযোগ বুঝে সোমার বাইশ বছর বয়সের মনটাকে এক মুঠো পরাগ দিয়ে চেপে ধরেছে।

—আর লজ্জা! ক্ষণিকের সংকোচে বিব্রত মনটাকে যেন নিজের মনেই বিদ্রূপ করে ওঠে সোমা। কি এমন অপরাধ? কার কাছে অপরাধের জবাব দিতে হবে? কাঞ্চীপুরের বনবাসে এসেই তো সোমা আবিষ্কার করতে পেরেছে যে পৃথিবীতে এমন দুটি চক্ষু আছে যা তার এই যেমন-তেমন মুখের দিকেই একটি মিনিট তাকিয়ে থাকতে পারলে মুগ্ধ হয়ে যায়। সে চোখের কাছে মধুরতর হয়ে দেখা দিলে কি অপরাধ হবে? হোক অপরাধ, এর জন্যে তার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবার অধিকার আছে, এমন কোন মাথা-কেনা উপকারী মহাজন তো দেখা যায় না।

লজ্জা দূরে থাক, সোমা শেষ পর্যন্ত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কপালে একটা চন্দনের টিপও পরে, চুলের কাঁটা দিয়ে টিপটাকে তারার মত করে আঁকে।

বাইরে যাবার আগে আলোটা নিভিয়ে দিতে গিয়েই দেখতে পায়, একটি চিঠি পড়ে আছে বইগুলির উপর। খুব সম্ভব আজকের ডাকেই এসেছে, তারার মা কখন রেখে গিয়েছে কে জানে। সারা দিনের কাজের ব্যস্ততার মধ্যে এই চিঠি সোমার চোখেই পড়েনি।

চিঠিটা পড়া শেষ হলে সোমার মুখে এক অস্বস্তিকর কৌতুকের হাসি ছড়িয়ে পড়ে। তার বনবাসের সুখের দরজায় এ আবার কোন্ পুষ্পক রথের শব্দ?

নয়নবাবুর চিঠি। দাবি করবার কোন অধিকার নেই তবু দাবি করেছেন। শিশুভবনের অধ্যক্ষা কষ্টে আছে শুনতে পেলে, তিনি দেরাদুনে থেকেও নিশ্চিন্ত হতে পারবেন না। প্রতি মাসে চক্রবেড়ের ঠিকানায় মাইনেটা নিয়মিত পাঠিয়ে দেবেন। আশ্চর্য! সোমার সৌভাগ্যকে উত্ত্যক্ত করার জন্য অলক্ষ্যে এ আবার কোন্ পরিহাসের ষড়যন্ত্র গভীর হয়ে উঠেছে। এমন অগাধ মিনতি দিয়ে আহ্বান করা, এত সহৃদয় সৌজন্যে টাকা দিয়ে সাহায্য করা, নয়নবাবু যে সত্যিই উপকারী মহাজনের রূপে দেখা দিয়েছেন। কিন্তু কেন, কিসের জন্য?

কিছুক্ষণের জন্য যেন একটা সংশয়ের স্পর্শে সোমার মনের শান্তি ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। দাবি করবার অধিকার নেই তবু দাবি করেছেন, আবদার মন্দ নয়। ভাবতে গিয়ে বিরক্তিটা আরো দুঃসহ হয়ে ওঠে। জীবনের প্রথম অনুরাগে বন্দিত অভিসারের পথে পা বাড়িয়ে দিতেই যেন এক অপয়া অন্ধকারের বাহু পিছন থেকে আঁচল ধরে টেনেছে।

এক ফুৎকারে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে সোমা ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়। রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে এসে বলে—আমি মাধাইকে সঙ্গে নিয়ে একবার বাইরে যাচ্ছি তারার মা।

তারার মা অসন্তুষ্টভাবেই জিজ্ঞাসা করে—এখন আবার কোথায় যাবে?

সোমা—যাই ওদের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।

আর একটু দূরে, আজকের এই নাটকান্ত অন্ধকারের স্পন্দমান অস্পষ্টতার মধ্যে বাণীপীঠের ঘরগুলিকে অবসন্ন সৈনিকের ঘুমন্ত শিবিরের মত দেখায়। সোমা এগিয়ে চলেছিল ধীরে ধীরে, যেন শরীরী নূপুরধ্বনির মত, এই শিবিরের অভ্যন্তরে একটি ক্লান্ত স্বপ্নকে আক্রমণ করার জন্য। কাব্যতীর্থের শিষ্য, নরসিংহের ভক্ত, দেশের মাটির তিলক কপালে লাগিয়ে একটা প্রতিজ্ঞার নেশায় যেন জীবনটাকে কাজের মধ্যে পাগল করে রেখেছে, এই ধরনের একটা মানুষ সংসারের সব সুখ থেকে পৃথক্ হয়ে একা একা পড়ে আছে ঐখানে, ঐ মাটির কুটীরের একটি নিভৃতে, যার নিষিদ্ধ হাতের স্পর্শকে এক অবৈধ দুঃসাহসের আবেগে সোমা এরই মধ্যে বরণ করে ফেলেছে। করুক না দেশের কাজ, কিন্তু তার জন্য কি এমন

করে যোগী হয়েই থাকতে হয়? সোমার মনের লজ্জাকাতর কামনাকে বিচলিত করে দিয়ে নিজে অবিচল হয়ে থাকবে, কোন নরসিংহ ভক্তের এতটা পাথুরেপনা সোমা সহ্য করতে পারবে না।

আলোটা হাতে নিয়ে চলতে চলতে বাণীপীঠের প্রাঙ্গণে ঢুকেই একটা ছোট আতাগাছের দিকে তাকিয়ে মাধাই বলে--আমি এখানেই দাঁড়াই গুরুমা।

সোমা বলে--আচ্ছা।

নিস্তব্ধ বাণীপীঠের বড় বড় ঘরগুলির একটির মধ্যে শুধু আলো জ্বলছে। সোমা ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ায়।

মেঝের উপর একটা মাদুরে বইয়ের উপর মাথা রেখে টান হয়ে শুয়ে রয়েছে প্রবীর, চোখ বন্ধ করে। মাথার কাছে একটা পেতলের পিলসুজে আলো জ্বলছিল। সোমা ভিতরে ঢুকে কাছে এসে দাঁড়ায়। পিলসুজের সলতে উসকে দেয়।

ঘুমিয়ে আছে বলে মনে হয়। সোমা একদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে, ছেলেমানুষের মত একটা অসহায় স্নেহপিপাসু মুখ, অথচ ইনিই নাকি বাণীপীঠের হেডমাস্টার, ভরাকুল থানা জয় করে কিছুক্ষণ আগে ফিরে এসেছেন। শুচিদি বলেন, এই মানুষটিই নাকি মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীর কোন মায়ার দিকে চোখ তুলে তাকাবার অবসর এদের নেই। অদ্ভুত আদর্শ। এরা জোর করে নিজেকে এত নির্মম করে রাখে অথচ...।

--মাঃ। নিশ্বাসের সঙ্গে ক্ষীণ স্বরে যেন একটা রুদ্ধ বেদনাকে মুক্তি দিয়ে প্রবীর পাশ ফেরবার চেষ্টা করে, সঙ্গে সঙ্গে ধড়ফড় করে উঠে বসে।

সোমা পিলসুজটা টেনে একেবারে প্রবীরের মুখের সামনে এনে রাখে। সন্দিগ্ধভাবে প্রবীরের চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপরেই প্রবীরের মাথায় হাত রেখে বলে--ও কি হচ্ছে? তুমি না নরসিংহের ভক্ত?

মুহূর্তের মধ্যে প্রবীরের চেহারাটা বদলে যায়। সব দুর্বলতাকে এক নিমেষে ঠেলে দিয়ে জীবনের প্রতিজ্ঞাকেই যেন জোর করে ধরে রাখবার জন্য চেঁচিয়ে ওঠে--হ্যাঁ।

সোমা--তবে?

প্রবীর বলে--ও কিছু নয়।

সোমা--কিছু নয় কেন? গায়ের জোরে সব কিছু সহ্য করবার চেষ্টা করো না।

প্রবীরের নিরুত্তর মুখের দিকে তাকিয়ে সোমা আবার বলে--তোমার কাছে আজ একটা অনুরোধ করতে এসেছি।

প্রবীর--বলুন।

সোমা--তুমি ধূপখালে গিয়ে তোমার বাবা আর মাকে একবার দেখে আসবে।

প্রবীর--হ্যাঁ, শীগগিরই যাব।

সোমা--আর যতটুকু পার, তাঁদের দুটো টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করবে।

মুখটা হঠাৎ আবার বেদনার্ত হয়ে উঠলেও আর বিচলিত হয় না প্রবীর। শান্তভাবেই উত্তর দেয়--আচ্ছা।

এরপর কিছুক্ষণের মত দুজনের মুখেই যেন সব বক্তব্য নিস্তব্ধ হয়ে থাকে। আর কি বলবার আছে? সোমাই প্রথম কথা বলে--দাঁড়িয়ে আছি, আমায় চিনতে পারছো তো?

প্রবীর অপ্রস্তুত হয়ে বলে--ও কি কথা, বসুন বসুন।

সোমা তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে, ভুরু দুটো যেন একটা রুদ্ধ ক্ষোভের স্পর্শে ঈষৎ কুটিল হয়ে ওঠে। একটু শক্ত করেই প্রত্যুত্তর দেয় সোমা--না, চিনতে পারনি।

সোমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ অপ্রস্তুতের মত তাকিয়ে থাকে প্রবীর। একটু আশ্চর্য হয়ে

প্রবীরের মনটাও যেন নীরবে প্রশ্ন করতে থাকে, চিনতে না পারার কি আছে? কপালে চন্দনের তারা, আর ঐ ঘাসী রঙের শাড়ি, নতুন সাজ বটে। কিন্তু এসব তো তোমারই স্পর্শে সুন্দর, নইলে ওসবের আর কি দাম আছে? তুমি উজ্জ্বল বলেই ঐ চন্দনের তারা এত উজ্জ্বল, তুমি স্নিগ্ধ বলেই তো ঔ শাড়ির ঘাসী রঙ এত স্নিগ্ধ।

প্রবীর হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। সোমার হাত ধরে বলে--বসো সোমা।

সোমা হেসে ফেলে--ভুল ভাঙতেও এত দেরি হয়।

ঘরের এক কোণ থেকে দুটো বেতের মোড়া তুলে নিয়ে এসে প্রবীর বলে--বসো।

সোমা--না, বসবো না। মাধাই দাঁড়িয়ে আছে বাইরে, তাছাড়া তারার মাও বোধ হয় কৈফিয়ত নেবার জন্য তৈরী হয়ে আছে। দেরি করবো না।

সোমার হাসিমুখ পরমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে যায়। ভবিষ্যতের একটা শঙ্কার ছায়ার দিকে তাকিয়ে যেন সোমা বলতে থাকে--সেদিন তুমি আমার কাছ থেকে একটা কথা আদায় করেছ, মনে আছে তো?

প্রবীর--কি কথা?

সোমা--মনে নেই? আমি কাঞ্চীপুর ছেড়ে যাব না, আমি তোমাকে এই কথা দিয়েছি।

প্রবীর--হ্যাঁ।

সোমা--আজ আমি তোমার কাছ থেকে একটা কথা চাইছি।

প্রবীর--বল।

সোমা--তুমি আমাকে কাঞ্চীপুর ছেড়ে যেতে দেবে না।

প্রবীর সোমার হাতটা শক্ত করে ধরে--তুমি নিজে চলে না গেলে আমি তোমাকে যেতে দেব না সোমা।

একটা নিশাচর ছায়া দেখা দিয়েছে কাঞ্চীপুরে। কাঞ্চীপুরের আশেপাশে আরো দু'একটি গ্রামেও তাকে মাঝে মাঝে দেখা গিয়েছে। ছায়াটার লোভ বিশেষ করে কাঞ্চীপুরের উপর। একবার দেখা গিয়েছিল বাণীপীঠের প্রাঙ্গণে, সন্ধ্যার একটু পরে। একবার কাব্যতীর্থের বাড়ির অপরাজিতার বেড়ার ধারে, মাঝ রাতে। আর একবার পলাশতলায় কংগ্রেস শিবিরের কাছে, প্রায় ভোর রাত্রে, কর্মীরা যখন সবেমাত্র ঘুম ছেড়ে উঠে প্রভাতী ভজন গাইতে আরম্ভ করেছে। রাতভিখারী কানা ফটিক এই ছায়াকে অনেকবার দেখেছে। পাগলা বাউল অভিরাম একবার ঐ ছায়াকে ধরতে তাড়া করেছিল, কিন্তু ধরতে পারেনি। দাগী সদানন্দ গাঁয়ের যত মনসাসীজের ঝোপের আড়ালে সারা রাত ওৎ পেতে বসে থাকে, এই ছায়াকে ধরবার জন্যে?

পলাশতলায় কংগ্রেস শিবিরে এক সকাল বেলায় গাঁয়ের লোকেরা ক্ষেতের উপর থেকে কুড়িয়ে একটা লাশ আর একগাদা ছাপা কাগজ নিয়ে এল। মতিগঞ্জ থেকে জেলা বোর্ডের যে সড়কটা বরাবর কাঞ্চীপুর হয়ে আবার দক্ষিণ দিকে ধূপখালের হাট পর্যন্ত চলে গিয়েছে, সেই সড়কেরই এক পাশে চারা ধানের ক্ষেতের উপর লাশটা পড়ে ছিল। আর লাশটার পাশে পড়ে ছিল একগাদা ইস্তাহার, তার কতক কুচি কুচি করে ছেঁড়া, কতক আস্ত।

খবর পেয়ে তখুনি প্রবীর মাস্টার পলাশতলায় কংগ্রেস শিবিরে ছুটে যায়। লাশের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে--হ্যাঁ, এই তো আমাদের কেদার।

মতিগঞ্জের এক প্রেস থেকে ছাপানো এই ইস্তাহারগুলি নিয়ে রাতের অন্ধকারে সড়ক ধরে সোজা কাঞ্চীপুরের বাণীপীঠে আজই কেদারের পৌঁছে যাবার কথা ছিল। বয়সে নিতান্ত ছেলেমানুষ, কিন্তু কাজের বেলায় যুদ্ধঘোড়ার মত উৎসাহী এই ছাত্রটিকে বড় ভালবাসতো প্রবীর মাস্টার। ওরই ফিরে আসার অপেক্ষায় প্রবীর মাস্টার এই কটা দিন যেন ধৈর্য ধরে

বসেছিল। কেদার যেন মরতে মরতেও তার কাজটি করে দিয়ে গিয়েছে ; এই ইস্তাহারে লেখা "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' বাণীকে বর্ণে বর্ণে সত্য করে দিয়ে নিজে চিরকালের মত নীরব হয়ে গিয়েছে।

কেদারের মৃতদেহের চারদিকে দাঁড়িয়ে জনতা বলাবলি করে—এ কার কাজ? কে খুন করলো? কার দ্বারা এমন নিষ্ঠুর কাজ সম্ভব?

একমাত্র সদানন্দ উত্তর দেয়—এ সব সেই ছায়ার কাজ।

কিন্তু এখন সকালবেলার সোনালী রোদে মাঠ ছেয়ে গিয়েছে, পতাকায় নিশাচর ছায়া কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে কে জানে। কেদারকে ত্রিবর্ণ পতাকায় সাজিয়ে সকলে শোভাযাত্রা করে মরাকালিন্দীর চড়ায় গিয়ে পৌঁছয়। চিতাগ্নি জ্বলে ওঠবার আগেই কেদারের মুখের দিকে তাকিয়ে নরসিংহ ভক্তের চোখ দুটো দুঃসহ জ্বালায় জ্বলে ওঠে।

এবং সেদিন থেকেই জ্বলে উঠলো চারদিক। জ্বলে উঠলো সমগড়ের ডাকঘর, নরসিংহতলার ইউনিয়ন বোর্ড অফিস, শ্যামনগরের ডাক বাংলা। জেলা বোর্ডের সুদীর্ঘ সাঁকোটাকে কুপিয়ে কুপিয়ে ছিন্ন-ভিন্ন করা হয় এক জায়গায়, দু জায়গায়, দশ জায়গায়। পোড়ে চণ্ডীখোলার খাসমহল অফিস, পোড়ে নিশুনিয়ার আবগারী ভাঁটি, পোড়ে মরাকালিন্দীর সরকারী খেয়ার নৌকো। এদিকে সমগড় পর্যন্ত, ওদিকে কাঞ্চীপুর স্টেশন পর্যন্ত, এই জ্বালার ঝড়ে টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলি উৎখাত হয়ে মাঠের এদিকে ওদিকে মড়ার মত পড়ে থাকে, ছেঁড়া তারের পিণ্ডগুলি ঠাকুরপুরের বিলের জলে বিসর্জিত হয়। নিদ্রা নেই, শ্রান্তি নেই, প্রবীর মাস্টার পথ দেখায়, আর করাল ঝঞ্ঝাবায়ুর মত গ্রামজনতা দিকে দিকে ঘুরে ফিরে যেন বহু অপমানের এক একটা চিহ্নকে আছাড় দিয়ে চূর্ণ করতে থাকে। গ্রামজীবনের মাঠ থেকে ইংরাজের উর্দিপরা যত দাপট আর বীভৎসতাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার অভিযান। মরতে হয় মরে, মারতে হয় মারে।

কাব্যতীর্থ এক একবার প্রবীরকে কি যেন বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেন।—প্রবীর ভাই, যদি পার তবে অযথা আঘাত না দিয়ে...একটু শান্তভাবে...।

কিন্তু আরও কটা দিন এই বহ্নিময় অভিযানের পালা চলতে থাকে, এবং নবগ্রামের সাব রেজিস্টারী অফিস ও সপ্তবাটির ঘুষখেকো ঋণসালিশী বোর্ডের কাছারিটাকে নিঃশেষে ভস্মীভূত করার পর প্রবীর মাস্টার সত্যিই শান্ত হয়।

শান্তি শান্তি। কাঞ্চীপুরকে কেন্দ্র করে চারদিকের ত্রিশটি গ্রামের আত্মা আজ বন্ধনমুক্ত। তারপর, এক শুক্লা চতুর্দশীর রাত্রে তালকুঞ্জের মাথার উপর যখন কুয়াশালেশহীন আকাশে আবার চাঁদ ভাসতে থাকে, তখন দেখা যায় বাণীপীঠের প্রাঙ্গণে একটি কাঠের ফলকে বড় বড় অক্ষরে লেখা—কাঞ্চীপুর স্বরাজ সরকার। ইংরেজ রাজের দণ্ডিত শাসনভার-পীড়িত ত্রিশটি গ্রামের অভ্যুত্থিত মৃত্তিকা ঝঞ্ঝাবাহিনীর সতর্ক চক্ষুর প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষিত এর দিগ্‌বলয়। বাহিরের পৃথিবী থেকে কোন আগন্তুক বিনা ছাড়পত্রে এখানে প্রবেশ করতে পথ পায় না। ডাক যায় না, ডাক আসে না। মহার্ণবের বুকে ভূকম্পোত্থিত দ্বীপের মত কাঞ্চীপুর স্বরাজ সরকার একেবারে স্বতন্ত্র।

কাব্যতীর্থ আবার নতুন করে এক ধর্মগোলা তৈরী করেন, চাষীদের স্বেচ্ছার দানে ধর্মগোলার শস্যভাণ্ডার পরিপূর্ণ। স্বরাজ সরকারের আইন, স্বরাজ সরকারের শাস্তি, স্বরাজ সরকারের ক্ষমা। ত্রিশটি গ্রামের স্বাধীন মানুষ স্বরাজ সরকারকেই খাজনা দেয়।

কাব্যতীর্থ যেমন ব্যস্ত, তেমনি ব্যস্ত প্রবীর মাস্টার। এক এক করে ত্রিশটি গ্রামের পঞ্চায়েত প্রায় তৈরী হয়ে এল, সব মিলিয়ে তৈরী হবে মহাপঞ্চায়েত। তারই এক পরিকল্পনা নিয়ে গ্রামে গ্রামে সংগঠনের কাজ করে ফিরছেন যেমন কাব্যতীর্থ, তেমনি প্রবীর মাস্টার। দু'বেলা কুমোর পাড়ায় গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে একটা জয়ন্তী মূর্তি তৈরী করাচ্ছেন

কাব্যতীর্থ, মূর্তিটাও প্রায় শেষ হয়ে এল। মহাপঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠার দিনে ঐ জয়ন্তী মূর্তির প্রতিষ্ঠা হবে।

এমন দিনও যায়, যেদিন হয়তো দুজনের একজন কাঞ্চীপুরে ফিরে আসেন ; আবার এমন দিনও যায়, যেদিন দুজনের একজনও ফিরে আসেন না। শুচি তার চিরকেলে অভ্যাসের দোষে কখনো উনুন নিভিয়ে বসে থাকে, কখনো উনুন জ্বালেই না। কাব্যতীর্থের ফিরে আসা পর্যন্ত শুচির ক্ষুদ্র গৃহস্থালীর প্রাণ উপবাসী হয়েই থাকে।

শিশুভবনের উঠানে তুলসী ঝারির পাশে একটা উঁচু বাঁশের মাথায় ত্রিবর্ণ পতাকা ওড়ে চঞ্চল হয়ে। সোনার মনটাও আনন্দে চঞ্চল।

কাঞ্চীপুর স্বরাজ সরকারের কাছ থেকে প্রথম মাইনে পেয়েছে সোমা, ষাটটি টাকা। সৌভাগ্যের আনন্দ যে আর চেপে রাখা যায় না। এ তো চাকরি করার মাইনে নয়, কৃতার্থ কাঞ্চীপুরের হৃদয়ের আশীষ, পরশ পাথরের চেয়েও মূল্যবান।

আজকের আনন্দটাকে চিনতে পারে সোমা। এই তো নির্ভয় আনন্দ। স্বরাজ কাঞ্চীপুর বাইরের পৃথিবীর মাটি থেকে আলগা হয়ে নিজের মহিমায় ভাসছে, তারই মধ্যে দ্বীপেশ্বরীর মত চিরকাল বসে থাকবে সোমা। তার একান্তের ভালো-লাগা সংসারটিকে বিড়ম্বিত করার মত যেটুকু আশঙ্কার পথ খোলা ছিল, তাও রুদ্ধ হয়ে গেল। চক্রবেড়ের গলির কোণে একটা একঘরে বাসার হৃদয় মায়ামৃগ হয়ে ডেকে নিয়ে যাবার জন্য আর কাছাকাছি আসতে পারবে না। কেঁদে কেঁদে ডাকলেও তার প্রতিধ্বনি এখানে পৌঁছবে না। আর, মতিগঞ্জ থেকে কোন বদান্য উপকারী মহাজনের বাহু তাকে উদ্ধার করার জন্য এই দুর্ভেদ্য দুর্গের ভিতরেও পৌঁছবে না। পেটের দায়ে চাকুরিপ্রার্থিনী একটি ঘর-ছাড়া বাইশ বছরের মেয়ের স্বাধীন অনুরাগের সম্মান রক্ষার জন্য যেন কাঞ্চীপুর স্বাধীন হয়ে গেল। সোমার বিস্ময় নির্ভয় আনন্দে ভরে ওঠে।

প্রতিদিনের মত আজকের সকালেও ছেলেমেয়েদের নিয়ে পড়াতে বসেছিল সোমা। এই তিনটি মাসের মধ্যেই সব ছেলেমেয়ে লেখাপড়া কিছু না কিছু শিখেছে। মাধাই বেশ অঙ্ক করতে পারে, নেপাল লিখতে পারে ভাল, বানান ভুল খুব কমই হয়। সুমন্ত গান গায় বেশ। মনু, পবন, চারি, বিন্দু, অতসী, নারাণ, বিশু, হরি—এর মধ্যে সকলেরই অন্তত অক্ষরজ্ঞানটুকু হয়েছে। শুধু মূর্খ রয়ে গেছে জনা। ভোলার কথা ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে, নেহাৎ দুধের ছেলে। কিন্তু জনার মাথায় সামান্য ক-অক্ষর জ্ঞানও আজ পর্যন্ত ভাল করে ঠাঁই পেল না।

গল্প করে মুখে মুখে অঙ্ক শেখাবার চেষ্টা করছিল সোমা। ছেলেমেয়েরা মন দিয়েই শুনছিল। হঠাৎ জনা উঠে দাঁড়ায়।

সোমা বিরক্ত হয়ে বলে—উঠলে কেন জনা?

জনা আমতা আমতা করে বলে—ভোলা।

সোমা—এখন ভোলা আবার কি?

জনা—ভোলা পড়ে গিয়েছে।

সোমা—কখন?

জনা—এখুনি, শব্দ হয়েছে।

সোমা একবার ঘরের বাইরে গিয়ে দাওয়ার উপর দাঁড়ায়। দেখতে পায়, দক্ষিণ ঘরের নীচু বারান্দাটার উপর একটা পিঁড়ি নিয়ে বোধহয় খেলতে খেলতে পড়ে গিয়েছে ভোলা। ভোলার কিছুই হয়নি, হয়তো পিঁড়িটাই নীচে পড়ে গিয়ে শব্দ করে থাকবে।

সোমা আবার পড়ার ঘরে ফিরে আসে, জনা তখনও উৎকণ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জনার মুখের দিকে তাকিয়ে সোমা হতাশভাবে বলে—এরই মধ্যে এত শব্দজ্ঞান হলে আর অক্ষরজ্ঞান

হবে কোত্থেকে।

ঠিক বোধ হয় জনাকে এই প্রশ্ন করছিল না সোমা। অত্যদ্ভুত রহস্যময় এক বিস্ময়ের দিকে তাকিয়ে সোমা হতাশভাবে তার নিজেরই জ্ঞানবুদ্ধির ক্ষুদ্রতাটুকু স্বীকার করে নিচ্ছিল। জনাকে দেখে আরও কতবার বিস্মিত হয়েছে সোমা এবং সে-বিস্ময় সহ্য করতে না পেরে জনারই উপরই মাঝে মাঝে রাগ করেছে।

সোমা রাগ করেই জনাকে মুক্তি দেয়—যাও।

কিন্তু জনা যদি এখানে না থাকতো? ভোলার দশা কি হতো, তাই একবার কল্পনা করে দেখে সোমা। ভোলার ঘুমন্ত বুকের স্পন্দন কে-ই বা এমন করে পাহারা দিত, সব দুঃশব্দের আঘাত থেকে ভোলাকে নিরাপদ করে রাখবার জন্য কে-ই বা এমন করে কান পেতে থাকতো, ঘুম পাড়াতো, স্নান করাতো, কোলে কাঁখে টেনে টেনে নিয়ে বেড়াতো? জনা যেন ক্ষণে ক্ষণে এক অযোগ্য গুরুমার ভয়ঙ্কর ত্রুটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। তাই জনাকে দেখতে মাঝে মাঝে ভয় করে সোমার।

একরত্তি মেয়ে জনাকে এই দুর্ভর দায়িত্ব থেকে অনায়াসে মুক্ত করে দিলেই তো পারে সোমা, স্বয়ং দায় বুঝে নিয়ে। তাহলে আর জনাকে ভয় করবার কিছু থাকে না। ভোলাকে এমনি দেখাশুনা করবার, নিকার তৈরি করে দেবার, আধসের দুধ বাড়িয়ে দেবার দায়িত্ব সোমা গ্রহণ করেছে ঠিকই, কিন্তু কোলে নেবার দায়িত্ব নিতে পারেনি। ঠিক স্নেহাশ্রিত নয়, স্নেহবলিভুক জীবের মত ভোলা সোমার সান্নিধ্য থেকে একটু দূরে দূরেই সরে আছে। সোমার এত দুঃসাহসী মনুষ্যত্বের কাছে ভোলা আজও অস্পৃশ্য হয়ে রয়েছে, এটাই আশ্চর্য। এই সংস্কারের অপরাধকে একেবারে চাপা দিয়ে নিজের মনের মধ্যেই গোপন করে রাখতে চায় সোমা। কিন্তু চাপা থাকতে পারে না, এই জনাই অহরহ ধরা পড়িয়ে দেয়। সোমাই না একদিন শুচিদির সংস্কারকে বিদ্রূপ করেছিল? আর নিজে? গুরুমা হয়েও আজ ভোলার মত কিশলয় দেহের স্পর্শকে অভ্যর্থনা করতে কেন পারলো না সোমা? সোমা নিজের কাছে অস্বীকার করে না, কত বড় একটা ফাঁকিকে সে তার চেতনার গভীরে পুষে রেখেছে, বিনা কারণে, বিনা যুক্তিতে। শুধু একটা অভ্যস্ত সংস্কারের দোষে।

কাব্যতীর্থের আশ্বাসমন্ত্রে বড় খুশী হয়েছিল সোমা ; যেটা নিজে সত্য বলে বুঝবে সেটাই একমাত্র পথ। বড় সহজ ও সুসাধ্য মন্ত্র বলে মনে হয়েছিল সোমার। আজ মনে হয়, কী কঠিন দুঃসাধ্য এই মন্ত্রের নির্দেশ! সত্য বলে বিশ্বাস করেও যে সে পথে এগিয়ে যেতে বুক কাঁপে, পুরনো মিথ্যেগুলিই পুরনো মায়ার মতো পিছন দিকে টানে। সোমা বুঝতে পারে, অগ্নিপরীক্ষা ছাড়া বোধ হয় এই ভীরু মনের শুদ্ধি হয় না। হয়তো তাই আছে কপালে। শুচিদির মতই বিশ্বাস করে সোমা, এই ভুল একদিন ভাঙবে। কিন্তু ভয় করে, কিভাবে ভাঙবে কে জানে।

আবার গল্প করে ছেলেমেয়েদের অঙ্ক শেখাবার চেষ্টা করে সোমা, কিন্তু না গল্প না অঙ্ক, তেমন করে কিছুই জমে উঠছিল না। বাইরেও একটা সোরগোল শোনা যায়, গ্রামের লোকজন যেন ছুটাছুটি করছে।

তারার মা হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে আসে—সেই ছায়া ধরা পড়েছে গুরুমা।

সোমা বিশ্বাস করতে চায় না—কি বলছো? সত্যি?

তারার মা—হ্যাঁ গো, বাণীপীঠের উঠোনে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে।

সোমা আরও কৌতূহলী হয়ে ওঠবার আগেই বাণীপীঠের কয়েকটি বিদ্যার্থী ছেলে ছুটে এসে একেবারে দাওয়ার উপর উঠে ডাকে—গুরুমা।

সোমা—কি খবর?

ছেলেরা বলে—পণ্ডিত মশাইও নেই, মাস্টারমশাইও নেই, আপনি চলুন। সেই ছায়া ধরা

পড়েছে, আপনি বিচার করবেন।

—চল। সোমা ছেলেদের সঙ্গে ব্যস্তভাবে অগ্রসর হয়। অদ্ভুত এক ঘটনার নাটক, সোমাও যেন তার মধ্যে আরও নাটকীয় এক ভূমিকা গ্রহণ করবার জন্যে বাণীপীঠে পৌঁছে যায়।

বাণীপীঠের আঙিনায় আতাগাছটার সঙ্গে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয়ে ধুঁকছিল মাণিক চৌকিদার। আজ ভোরবেলাতেই মনসাসীজের বনে এই নিশাচর ছায়াকে ধরে ফেলেছে সদানন্দ।

মস্ত বড় একটা ভিড় জমে উঠেছিল। একটা আক্রোশের ঝড় যেন চারদিক থেকে ঘিরে মাণিক চৌকিদারের কলুষিত হৃৎপিণ্ডকে উপড়ে লুট করে নিয়ে যাবার জন্য ছটফট করছিল। মাণিক চৌকিদারের পকেট থেকে এক গাদা নোট আর অনেকগুলি কাগজপত্রও পাওয়া গিয়েছে, মতিগঞ্জ সদর কোতোয়ালীর নানারকম নির্দেশ, নোটিশ, সার্টিফিকেট ও চিঠি।

আহত অথচ অসহায় নেকড়ের মত মাণিক চৌকিদারের চোখ দুটো মাঝে মাঝে রুদ্ধ হিংসার জ্বালা লুকিয়ে মিট মিট করে চারদিকে তাকিয়ে দেখছিল। দু'কান আর নাক দিয়ে তখনো রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। সদানন্দ আর রাতভিখারী কানা ফটিক ওকে মেরে আধমরা করেই মনসাসীজের বন থেকে এতটা পথ হিঁচড়ে নিয়ে এসেছে।

মাণিক চৌকিদারের মূর্তির দিকে তাকিয়েই সোমার মুখটা যন্ত্রণাক্ত হয়ে ওঠে।—ইস, একে এমন করে মেরেছে কে?

জনতার ভিতর থেকে কেউ এই প্রশ্নের উত্তর দেয় না। সোমা আবার জিজ্ঞেস করে—একে এমন করে বেঁধেছো কেন, ও কে?

সদানন্দ উত্তর দেয়—মাণিক চৌকিদার?

সোমা—ও কি দোষ করেছে?

সদানন্দ একটু উত্তেজিত হয়ে ওঠে—ও কি দোষ করে নাই, সেই কথাটা জিজ্ঞেসা করুন গুরুমা। থানার সব লোক পালিয়ে গেল, এই প্রেতটা শুধু আমাদের সর্বনাশ করার জন্যে রয়ে গেছে। অনেক কষ্ট করে ওকে ধরেছি গুরুমা।

আর একজন বলে—ও হলো গবরমেণ্টের চর। মতিগঞ্জের কোতোয়ালীতে গিয়ে আমাদের সব খবর দিয়ে আসছে। দেখছেন তো কত টাকা বকশিশ পেয়েছে হারামজাদা।

সোমা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। জনতাও নিঃশব্দ হয়ে যেন সোমার নির্দেশের অপেক্ষা করছিল। সোমা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে—ওর বাড়ি কোথায়?

কানা ফটিক উত্তর দেয়—ওর বাড়ি হলো উত্তর ঠাকুরপুর, আমাদের স্বরাজ সরকারের তল্লাটে নয়।

সোমা—ওর কে কে আছে?

কানা ফটিক—মাগ আছে।

সোমা—আর কেউ নেই?

কানা ফটিক—এই তো মাত্র বছরখানেক হলো ব্যাটা বিয়ে করেছে। আর কেউ নেই।

জনতা আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দ হয়ে থাকে। সদানন্দ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করে—কি আজ্ঞা হয় গুরুমা!

সোমা বলে—ছেড়ে দাও।

সদানন্দ প্রায় চিৎকার করে ওঠে—গুরুমা!

সোমা—ছিঃ, এসব ভাল নয়। ওকে এক্ষুণি ছেড়ে দাও।

বিদ্যার্থী ছেলেরা মাণিক চৌকিদারের হাত-বাঁধা দড়ি খুলে দেয়। মাণিক চৌকিদার আস্তে আস্তে টান হয়ে উঠে দাঁড়ায়, এক পা দু'পা করে এগিয়ে যায়। জনতার চক্র থেকে কিছুদূর এগিয়ে মাঠের উপর পড়তেই তীরবেগে ছুটে অদৃশ্য হয়ে যায় মাণিক।

সদানন্দ ক্ষুব্ধভাবে বলে—আপনি ভুল করলেন গুরুমা।

কোথায় কি ভুল হলো, তা নিয়ে কোন চিন্তা করেনি সোমা। আর ভুল হলেই বা কি? সোমা জানে, তার সকল ভুল এখানে ক্ষমা করে দেওয়াই আছে। রাজ্যটি বেশ, চাইলেই উপহার পাওয়া যায় আশাতিরিক্ত, আর ভুল করলে কোন জরিমানা নেই।

সন্ধ্যা বেলাটা শুচিদির বাড়ি একবার ঘুরে আসবে মনে করেছিল সোমা, একটু খবর জানবার জন্য। নরসিংহের ভক্ত তো এখন শান্ত হয়েছে, কিন্তু আজ তিনদিন হলো কাঞ্চীপুরে ফিরে আসে না কেন? তার অনেক কাজ, কিন্তু তার চেয়ে বেশী কাজের মৌমাছিরাও সারাদিনের গুঞ্জনের পর একবার মধুনীড়ে ফিরে আসে। এই মানুষটির স্বভাবটি কি একেবারে অসাধারণ? চোখের চাউনি দেখে তো সে-রকম মনে হয় না।

শুচিদির বাড়ি আর যাওয়া হলো না। ঝড় উঠলো সন্ধ্যা থেকেই, দিন অন্ধকার করে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির ঝাপটা ছুটিয়ে।

তারপর গাঢ়তর অন্ধকার, ঘনতর বর্ষণ, দক্ষিণের আকাশটা যেন শতছিন্ন হয়ে মত্তবেগে তরুলতার পৃথিবীতে মুহূর্তে মুহূর্তে এসে আছাড় খেয়ে পড়ছে। মাটি কাঁপে, মাটির মানুষের বুক কাঁপে। বায়ুজগতের পরমাণুগুলি যেন পাগল হয়ে অবিরাম আর্তনাদের প্রবাহের মত এক মহা অন্তিমের আহ্বানে ছুটে চলে যাচ্ছে হু হু করে।

তারার মা আজ আর রান্না করতে পারলো না। শিশুভবনের বড় ঘরটির ভিতরে ছেলেমেয়েরা গুটিসুটি হয়ে শুয়ে রইল। জেগে রইল সোমা, অর্ধতন্দ্রাচ্ছন্নের মত অভিভূত ভাবে। জেগে রইল তারার মা, সতর্ক চোখ মেলে আশঙ্কায়।

রাত্রি বেশী হয়নি, বাণীভবনের কয়েকটি বিদ্যার্থী ছেলে এসে জানিয়ে গেল--ভয় নেই। ঝড়ও মৃদু হয়ে আসে, বর্ষণও যেন কিছুটা ক্লান্ত হয় এবং ধীরে ধীরে কাঞ্চীপুরের ঘরে ঘরে ঘুমের আবেশও নেমে আসে।

কিন্তু কোথা থেকে ঘুমন্ত নিশীথিনীর পাঁজরের উপর দিয়ে সুতরল ছন্দে এক ক্রুর খরাজলের কল্লোল ছুটে আসে। খাল ছাপিয়ে ওঠে, ক্ষেত ডুবে যায়, মাঠ প্লাবিত হয়। ঠাকুরপুরের বিলটা ছাপিয়ে জলের তোড় এসে প্রথম ধাক্কা দিল পুরনো রাসমঞ্চের ভাঙা স্তূপের গায়ে। ঘুম ভাঙা চোখে সারা কাঞ্চীপুরের প্রাণ হঠাৎ মাঝ রাত্রির অন্ধকার কাঁপিয়ে আর্তনাদ করে উঠেছে—খরা জল! খরা জল! তারার মা চিৎকার করে ওঠে—ভগবান, ভগবান। জনা জেগে উঠেই ভোলাকে আঁকড়ে ধরে কোলে নেয়।

সোমা ঘরের বাইরে এসে দাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে দূরের দিকে একবার তাকাবার চেষ্টা করে। কিন্তু এখন আর কোন দূরও নেই, দিকও নেই। জগৎজোড়া এক নীরন্ধ্র তমিস্রার বক্ষ ভেদ করে শীতল মৃত্যুর স্রোত সব ভাসিয়ে দেবার আবেগ নিয়ে ছুটে আসছে। অচঞ্চল পাষাণ পুত্তলিকার মত দাঁড়িয়ে থাকে সোমা, ভয় করতে ভুলে যায়।

অনেকগুলি লণ্ঠন আর জলে-ভেজা মানুষের অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি শিশুভবনের আঙ্গিনায় এসে ঢোকে। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। শিশুভবনের দাওয়ার উপর উঠেই সোমাকে দেখতে পেয়েই কাব্যতীর্থ বলেন—ভয় নেই।

প্রবীর মাস্টার, শুচিদি, বাণীপীঠের বিদ্যার্থী ছেলেরাও এসেছে।

কাব্যতীর্থ বলেন—ভয় নেই, জল বাড়বে না। আর যদি বাড়তে থাকে, তবুও ভয় নেই। সবাই সড়ক ধরে হেঁটে গিয়ে নরসিংহতলায় গিয়ে উঠবো। তৈরী থাক।

বিদ্যার্থী ছেলেরা শিশুভবনের এক একটি শিশুর হাত ধরে তৈরী হয়ে থাকে।

শিশুভবনের গুরুমা আখ্যাধারিণী এই কলকাতার মেয়েটিকেও কাব্যতীর্থ বোধহয় শিশুই মনে করেন। কাব্যতীর্থ নির্দেশ দেন—প্রবীর, তুমি লণ্ঠনটা আমাকে দিয়ে সোমার হাত ধর।

সোমা একটু বিব্রতভাবে উত্তর দেয়—আমি ঠিক আছি।

শুচি সোমার দিকে এগিয়ে এসে কানের কাছে আস্তে আস্তে বলে—খুব খারাপ লাগছে, না সোমা?

সোমা বলে—না শুচিদি।

সবাই তৈরী হয়েই থাকে অনিশ্চিতের প্রতীক্ষায়, স্থির হয়ে নিঃশব্দে। এর মধ্যে শুধু কাব্যতীর্থ দাওয়ার এদিক ওদিক ধীরে ধীরে পায়চারি করে বেড়াতে থাকেন। সুষুপ্ত কাঞ্চীপুরের হঠাৎ আক্রান্ত মাটি ও মানুষের আর্তরোলের মধ্যেও মাঝে মাঝে কাব্যতীর্থের সুললিত কণ্ঠস্বরের আবৃত্তি শোনা যায়—মহাগভীর নীরপূত পাপধূতভূতলম্...।

প্রতীক্ষার সমস্ত মুহূর্তগুলিকে যেন সুর শুনিয়ে বিদায় দিতে থাকেন কাব্যতীর্থ, এবং রাত্রি ভোর হয়ে আসে।

ভোর তো হলো, কিন্তু চারদিকে তাকালে চোখে যেন চিরতিমিররাত্রির বিভীষিকা নেমে আসে। যদিও কাঞ্চীপুর নিজে কোনমতে প্রাণে বেঁচে গিয়েছে, কিন্তু এই খলপ্লাবন কাঞ্চীপুরের গায়ে যেন শ্মশানের বীভৎসতা মাখিয়ে দিয়েছে। কত গাঁয়ের কুটীর থেকে কত মানুষের প্রাণ একটি রাত্রির বিভীষিকার স্রোতে কোথায় যে মিলিয়ে গেল কে জানে। এখনো দেখা যায়, কাঞ্চীপুরের মনসাসীজের বনে নানা দিক থেকে ভেসে এসে গলিত শব আটক পড়ে আছে, ঝোপে-ঝাপে ক্ষেতে-বাদাড়ে। এখানে ওখানে শকুনির সমারোহে। ঠাকুরপুরের বিলে শত শত মরা গরু বয়ার মত ভেসে থাকে। গোলার ধান ভেসে গিয়েছে, ক্ষেতের ধান লোনা জলে জ্বলে গিয়েছে। তৃষ্ণা মেটাতে এক আঁজলা মিষ্টি জল খাবার জন্য মানুষ দিগ্বিদিকে ছন্নছাড়া হয়ে ছুটে বেড়ায়।

কোথায় নবগ্রামের এতবড় গোচারণ ভূমি আর বেণাঘাসের সুগন্ধ? এক বিরাট পঙ্কিল দহের মত পড়ে আছে আজ। পলাশতলার পাশে ক্ষেতগুলি আর ক্ষেত নেই, জলা হয়ে গিয়েছে। একটি রাত্রির তরল বিভীষিকাকে পাইকারী মৃত্যুর উপঢৌকন দিয়ে, নিঃস্ব নিরন্ন লক্ষ্মীছাড়া হয়ে, এক শোকার্ত শূন্যতাকে সম্বল করে পড়ে রইল কাঞ্চীপুর স্বরাজ সরকারের রাজত্ব।

বিদ্যার্থী ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে সারাদিন ধরে কাঞ্চীপুরের ঝোপঝাপ ও প্লাবিত ক্ষেত থেকে মড়া কুড়িয়ে সৎকারের ব্যবস্থা করে প্রবীর মাস্টার। পলাশতলায় উঁচু ডাঙাটা চিতাময় হয়ে ওঠে। দহেয়ং সর্বগাত্রানি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু—সারাদিন ধরে চোখের জল মুছতে মুছতে শেষকৃত্যের মন্ত্র পাঠ করেন কাব্যতীর্থ। মুখ দেখে নাম গোত্র চিনতে না পারলেও, ভিন গাঁয়ের এই সব নর-নারী ও শিশুর মূর্তিগুলি যে তাঁরই আত্মার আত্মীয়, যাদের ঘরে-ঘরে ও কানে-কানে আজ বিশ বছর ধরে তিনিই তো বেঁচে থাকার বাণী শুনিয়ে আসছেন।

শুধু চেনা গেল একটি মুখ। কানা ফটিকের কান্নার শব্দ শুনে কাঞ্চীপুরের লোকজন পুরনো রাসমঞ্চের স্তূপের কাছে ছুটে গিয়ে ভিড় করে। টান করে খোঁপা বাঁধা, খোঁপায় বেলকুঁড়ি গোঁজা, একটি তরুণীর শব ভেসে এসে রাসমঞ্চের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে পড়েছিল। কানা ফটিক চেঁচিয়ে কাঁদে—আমার খাঁদি।

চণ্ডীখোলায় হাজরা বাড়িতে অষ্টমীর পূজা দেখতে গিয়েছিল কানা ফটিকের মেয়ে খাঁদি। গিয়েছিল হেঁটে হেঁটে হাসতে হাসতে, ফিরে এসেছে নিষ্প্রাণ হয়ে ভাসতে ভাসতে। কিন্তু এখনো তার নিটোল খোঁপায় এক গ্রামতরুণীর উৎসবসজ্জার রেশটুকু যেন অটুট হয়ে আছে, প্লাবনে একেবারে গলে যেতে পারেনি। শোকক্লান্ত কাব্যতীর্থ আর একবার চিতাগ্নির পাশে দাঁড়িয়ে শেষকৃত্যের বাণী উচ্চারণ করেন।

প্লাবিত কাঞ্চীপুরের শ্মশান থেকে মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে সদর মতিগঞ্জের এস-ডি-ও

নামক সিভিলিয়ান বিধাতাটি যেন এতদিন ধরে এই শুভ মুহূর্তটির অপেক্ষায় বসেছিলেন। ভারত গবর্নমেণ্টের গোপন সার্কুলার অনুযায়ী সব রকম স্ট্র্যাটেজিক ক্রূরতা দিয়ে, পাঁচশত স্পেশাল পুলিস আর দশ নম্বর বেলুচ রেজিমেণ্টের একটি ব্যাটালিয়ান দিয়ে ত্রিশটা বিদ্রোহী গ্রামের চারদিকে এইবার এক সশস্ত্র হিংসার মেখলা রচনা করেন। প্রতি ঘাটে ও পথের মুখে পুলিস ও মিলিটারির ঘাঁটি বসে, যেন একটি চালের কণিকাও এই মহাপাতক উপদ্রুত অঞ্চলে প্রবেশ করতে না পারে। এক গজ কাপড় নয়, এক শিশি ওষুধ নয়। বিদ্রোহী কাঞ্চীপুরের হৃদপিণ্ডকে সকল দিক দিয়ে অবরোধ করে মহামারী অনশন ও উলঙ্গতার অভিশাপে সন্ত্রস্ত করে তুলতে হবে।

আরম্ভ হয়, এত দুঃসাহসী কাঞ্চীপুরের অদৃষ্টে আর এক আত্মাহুতির অধ্যায়। প্রতি দিনে, প্রতি মুহূর্তে তিল তিল করে ক্ষয় হয়ে যাবার পালা। এত শান্ত অবিচল কাব্যতীর্থও যেন উতলা হয়ে পড়েছেন। নরসিংহভক্ত প্রবীর মাস্টারের মুখে হাসির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না।

এক সপ্তাহ না যেতেই সমগড়ের লোকেরা শাপলা খেতে আরম্ভ করে। ঠাকুরপুরের প্রায় অর্ধেক লোক গ্রাম ছেড়ে চলে যায় রেল লাইন পার হয়ে। পলাশতলার কংগ্রেস শিবিরে দিবারাত্রি নরনারীর জনতা লেগেই থাকে—কিছু চাল দাও, একটা কাপড় দাও।

দেখতে দেখতে একটি মাসের মধ্যে কী হয়ে গেল গ্রামের রূপ? ভগ্ন কুটীর, গলিত ভিটা, নিস্তব্ধ ঢেঁকিঘরে শেয়াল ঘুমোয়। শুধু কাব্যতীর্থ আর কর্মীর দল চারদিকে ছুটোছুটি করে বেড়ায়—ভয় নেই, ভয় নেই।

ক্ষণিকের মত যেন নির্ভয় হয়ে ওঠে কাঞ্চীপুর। সমগড়, সপ্তবাটি, নবগ্রাম, ঠাকুরপুর ও আর সব। স্বরাট্ কাঞ্চীপুরের প্রাণ পরাভব মানতে চায় না। যার ঘরে যা আছে, কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে প্রতি গ্রামের পঞ্চায়েত ধর্মগোলা তৈরী করে। অর্ধাশনে হোক বা অনশনে হোক, সব দুর্বিপাক সবার মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেবার জন্য কাব্যতীর্থ গ্রামে গ্রামে আর এক আত্মরক্ষার পরিকল্পনা নিয়ে ঘুরে বেড়ান।

প্রবীর মাস্টার তিনটে দিন এদিকে ছিল না। কাব্যতীর্থের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে কোথায় যেন গিয়েছিল। আজই ফিরে এসেছে, সোমা একবার ডেকে পাঠিয়েছিল, কিন্তু তার আগেই সে আবার কোথায় চলে গিয়েছে।

কাঞ্চীপুরের রাত্রির জ্যোৎস্নায় আজ কাল পাখি কাঁদে। আর অন্ধকারে?

কাঞ্চীপুর থেকে একটি রাত্রির অন্ধকারে তিন দিনের অনশনশয্যা থেকে উঠে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয় দাগী সদানন্দ। একটানা হেঁটে গিয়ে নরসিংহতলার মন্দিরের দরজাটা সন্তর্পণে ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলে। কোমর থেকে বার করে একটা কাটারি। পাথুরে নরসিংহের বড় বড় দুটো রুপোর চোখ কাটারির মুখ দিয়ে দুটি আঘাত দিয়ে উপড়ে তুলে নিয়ে গামছায় বাঁধে। এক দৌড়ে মন্দির ছেড়ে আবার অন্ধকারে মিশে যায় সদানন্দ।

আরও অনেক অন্ধকারের ঘটনা ; এক এক করে খবর আসতে থাকে। ডায়মণ্ডহারবার থেকে চাল নিয়ে নৌকাটা রাত্রির অন্ধকারে প্রায় মরাকালিন্দীর জলে এসে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু ধরা পড়ে যায়। ঘাঁটির পুলিস গুলি চালিয়েছে, রজনী ও সনাতন মারা গিয়েছে, একমাত্র অনন্ত নদী সাঁতরিয়ে কোনমতে পালিয়ে আসতে পেরেছে। চাল বোঝাই নৌকোটা মরাকালিন্দীর জলেই ডুবিয়ে দিয়েছে পুলিস।

কাব্যতীর্থের সারা মুখটা কেমন যেন হয়ে গিয়েছে, চামড়াগুলো কুঁচকে গিয়েছে ভাঁজে ভাঁজে। শুচির কণ্ঠাস্থি দেখবার মত জিনিস। তবু কাব্যতীর্থ বলেন—ভয় নেই।

এমনি আর একটি সন্ধ্যার অন্ধকারে এক বস্তা চাল নিয়ে শিশুভবনে এসে প্রবীরও বলে—ভয় নেই, এক বস্তা চাল দিয়ে গেলাম। এবার থেকে একটু সামলে কম কম করেই খরচ করবে সোমা।

এমন ভয়ঙ্কর আশ্বাস শোনবার জন্য বোধ হয় প্রস্তুত ছিল না সোমা। প্রবীরের হাত ধরে হঠাৎ ভয়ার্ত স্বরে বলে—এ কী সর্বনাশ আরম্ভ হলো চারদিকে?

সোমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে প্রবীর। আবার আশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করে—ভয় করছে বুঝি সোমা?

মুহূর্তের মধ্যেই সোমা নিজেকে সামলে ফেলে, আর সহজভাবেই উত্তর দেয়—না।

প্রবীর—এবার আমি যাই?

সোমা—না।

সোমা দেখতে পায়, প্রবীরের চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল, সারা মুখ যেন একটা দুঃসহ প্রদাহের আঁচ লেগে কালো হয়ে গিয়েছে।

সোমা জিজ্ঞাসা করে—শুনলাম এখান থেকে আরও দক্ষিণে খুব বেশী রকম বন্যা হয়ে গেছে?

প্রবীর—হ্যাঁ।

সোমা—তোমার বাড়ির কিছু জানতে পারলে?

প্রবীর—জানতে হয়নি, নিজে গিয়েই দেখে এসেছি।

সোমা—বাবা-মার সঙ্গে দেখা হলো?

প্রবীর—হ্যাঁ।

সোমা—কেমন আছেন?

প্রবীর—মরে গেছেন!

সোমা বিচলিতভাবে অনুনয় করে বলে—অন্তত আমার সঙ্গে অমন আবোল-তাবোল করে কথা বলো না প্রবীর। কি হয়েছে বল?

প্রবীর—দেখলাম, বাবা-মা দুজনেই আমারই তৈরী কুমড়ো মাচানের নীচে একসঙ্গে মরে পড়ে আছেন, একেবারে ভেসে যাননি। বাবার একটা হাত মার একটা হাতের সঙ্গে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে, তাও দেখলাম।

সোমা ঢোঁক গিলে যেন একটা নিশ্বাস আটক করে রাখে।—আর তোমার ভাই শ্যামু?

প্রবীর—হয়তো ভেসে গেছে, কিংবা কোথাও পালিয়ে গেছে, কোন খবর পেলাম না।

যেন একটা তদন্তের রিপোর্ট নির্বিকারচিত্তে পড়ে শোনাচ্ছে প্রবীর, লাল চোখে একটু সজলতার বাষ্পও দেখা দেয় না।—কিছুদিন থেকে বাবা খুবই অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন, মা ধরে না ওঠালে উঠতেও পারতেন না। কাজেই, বানের সময় বাবা যাতে কাছছাড়া না হয়ে পড়েন, সেই জন্যেই বোধ হয়...যাক্, আমি কথা দিয়েছিলাম একদিন দেখতে যাব, দেখে এলাম।

সোমাও মনোযোগী শ্রোতার মত কান পেতে সুস্থির ভাবে এই কাহিনীকে নিছক একটি রিপোর্ট রূপেই সহ্য করার চেষ্টা করে। অশ্রুপাত এখানে নিরর্থক। তা ছাড়া, চোখ পুড়ে গেলে চোখে জল আসতেও পারে না।

সোমা বলে—তোমাকে সান্ত্বনা দেব, এ সামর্থ্য আমার নেই। তোমার এই দুঃখের ইতিহাসকে অভিনন্দন জানাবো, এমন উঁচুদরের নির্মমতাও আমার নেই। তোমাকে দেশের কাজে আরও উৎসাহ দিতে পারি, সেই অনন্ত দেশপ্রেমও আমার নেই। তোমাকে সব আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারি, সে শক্তিও আমার নেই। তাই আজ...।

সুগভীর নিঃশ্বাস টেনে বুকের ভিতর একটা নিরুত্তর শূন্যতার মধ্যে সব কথা এক কথায় বলে দেবার ভাষা খুঁজতে থাকে সোমা। চোখ বন্ধ করে খুবই আস্তে আস্তে সোমা বলে—আজ আমি শুধু এই প্রার্থনাই করছি প্রবীর, তুমি ভেঙে পড়ো না, তোমার জীবনের সব শক্তি নিয়ে তুমি বজ্র হয়ে যাও।

প্রবীর বলে—এবার আমি উঠি।

আজ এক নবাগন্তুক ভদ্রলোক দেখা দিয়েছেন কাঞ্চীপুরে। চারদিকের সুকঠিন মিলিটারী ব্যূহের বাইরে থেকে এই প্রথম একজন কাঞ্চীপুরে এসে পৌঁছতে পারলেন। এস-ডি-ওর সহিকরা ছাড়পত্র সঙ্গে ছিল বলেই ইনি আসতে পেরেছেন। ইনি হলেন কাব্যতীর্থের স্ত্রী শুচির দাদা।

মতিগঞ্জ শহরেই শুচির দাদার মস্তবড় কাপড়ের দোকান। শুচির মা দাদা বৌদি, সবাই এখন মতিগঞ্জে থাকেন। শুচির বাবা মারা যাবার পর থেকে দেশগাঁয়ে আর কেউ থাকে না, যায়ও না।

কাঞ্চীপুরের বন্যা আর দুর্ভিক্ষের খবর শুনেই দাদা এসেছেন বোনকে দেখতে এবং মা বলে দিয়েছেন, যেমন করে হোক, শুচিকে ধরে নিয়ে যেতে। আরও আগেই দাদা হয়তো আসতেন, কিন্তু ছাড়পত্রের জন্য তদ্বির করতে করতে এতদিনে সফল হবার পর আসবার সুযোগ পেয়েছেন।

শুচির মতিগতির পরিচয় শুচির মা ভাল করেই জানেন। তাই একটা চিঠিও দিয়েছেন—আমার খুব কঠিন অসুখ। তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। পত্রপাঠ তোমার দাদার সঙ্গে চলে আসবে।

শুচির মা তাঁর জামাইকেও ভাল করে জানেন। তাই বলে দিয়েছেন—ঐ পাগলকেও আসতে বলবি যতী, যদি আসে তো ভালই, নইলে শুধু আমার মেয়েকে নিয়েই চলে আসবি, যেমন করেই হোক।

দাদাকে দেখে শুচি খুশীই হয়, আর চিঠিটা পড়ে দুঃখিত হয়। প্রশ্ন করে—মার এত কঠিন অসুখ কবে থেকে হলো দাদা?

যতী—হয়েছে, অনেকদিন থেকেই হয়েছে। যা, একটু চা করে নিয়ে আয়।

শুচি হেসে ফেলে—চা? চা কোথায় পাব?

যতী—যা, এক গেলাস গরম জল নিয়ে আয়।

শুচি চলে যায়। শুচির অসাক্ষাতে কাব্যতীর্থকে কয়েকটা কথা বলবার জন্যই যতীদা এই সুযোগটি তৈরী করে নিলেন।

কাব্যতীর্থ চিন্তিতভাবে বলেন—তাইতো, মার অসুখটা হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠলো...। অসুখটা কি?

যতীদা একটু গম্ভীর হয়ে বলেন—আপনি নিশ্চয় জানেন বিনোদদা, আমার দোকানে গাঁট গাঁট কাপড় পড়ে আছে।

কাব্যতীর্থ—তা তো আছেই।

যতীদা—আর আমার বোন এখানে ছেঁড়া কাপড় পরে রয়েছে।

কাব্যতীর্থ যেন একটু চমকে উঠে বলেন—হ্যাঁ।

যতীদা—আপনি জানেন তো, আমার বাড়িতে এখনো কত অচেনা অনাত্মীয় নিছক বসে বসে দুবেলা ভাত খায়?

কাব্যতীর্থ—হ্যাঁ, আমি সবই শুনেছি যতী।

যতীদা—আর, আমার বোন এখানে একবেলাও খেতে পাচ্ছে কি না সন্দেহ, কণ্ঠাস্থি খট্ খট্ করছে।

কাব্যতীর্থ এবার আর উত্তর দেন না।

যতীদা বলেন—এই সব কাণ্ডই হলো মার অসুখ, বুঝেছেন?

কাব্যতীর্থ অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভেবে নিয়ে বলেন—বুঝেছি। কি করতে চাও বল?

যতীদা—শুচিকে নিয়ে যেতে চাই, কিন্তু দোহাই আপনার, আপনি বাগড়া দেবেন না।

কাব্যতীর্থ—ছি ছি, আমি বাগড়া দেব কেন?

যতীদা একটু অনুনয়ের সঙ্গে বলেন—বরং আপনি ওকে যাবার জন্য একটু উৎসাহ দিয়েই বলুন।

কাব্যতীর্থ—নিশ্চয় বলবো। কবে যেতে চাও?

যতীদা—আজই।

কাব্যতীর্থ—বেশ বেশ।

যতীদা এবার কথাগুলি অনেকখানি কোমল করে বলেন—আপনিও চলুন না বিনোদদা।

কাব্যতীর্থ—এখন পারবো না ভাই, সুযোগ পেলেই যাব।

যতীদা বেশ বুদ্ধি খাটিয়েই পরিকল্পনাটা করেছিলেন এবং শুচি গরম জল নিয়ে ফিরে আসা মাত্র কাব্যতীর্থও উৎসাহ দিয়ে বললেন—তুমি আজই যতীর সঙ্গে চলে যাও।

সেই মুহূর্ত থেকেই শুচি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে এবং সন্দেহটার কোন অর্থ স্পষ্ট করে ধরতে পারছে না বলেই রাগে ও অভিমানে একটা অনর্থ বাধাবার উপক্রম করেছে।

শুচি বলে—যতীদা আমাকে নিয়ে যেতে তো আসবেনই, কিন্তু তুমি যেতে বল কেন? কিছু একটা ব্যাপার আছে, নইলে তুমি কোন্ মুখে আমাকে...।

শুচি মুখ লুকোবার জন্যই অন্য ঘরে চলে যায়। পরক্ষণেই আবার ফিরে আসে। যতীদা সামনে বসে আছে, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে সে সত্যও যেন ভুলে গিয়ে শুচি বলে—তুমি কোন্ প্রাণে আমাকে যেতে বলছো?

যতীদা বিব্রত বোধ করে ঘরের বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ান এবং সেখান থেকেও সরে গিয়ে অপরাজিতার বেড়ার পাশে পাশে ঘুরে বেড়াতে থাকেন।

কাব্যতীর্থ কোনমতেই শুচিকে বোঝাতে না পেরে অগত্যা প্রবীর ও সোমাকে ডেকে আনতে লোক পাঠান। সাবধানী পরিকল্পনাকুশল যতীদা এই লোকের সঙ্গে সঙ্গে চলে যান। কে প্রবীর কে সোমা, তা তিনি জানেন না। যেই হোক, সবাইকে সমস্যাটা আগে থেকে বুঝিয়ে দিয়ে সমর্থন আদায় করে রাখা ভাল। একবার কোনমতে শুচিকে এই চক্র থেকে বের করতে পারলে হয়। মা বলে দিয়েছেন—যেমন করেই হোক...।

সোমা আর প্রবীর না আসা পর্যন্ত শুচি নিঃশব্দে ধৈর্য ধরে বসে থাকে ঘরের ভিতরে, আর কাব্যতীর্থ ঘরের বাইরে বারান্দায়। সত্যিই আজ একটি সত্তা যেন হঠাৎ দ্বিখণ্ডিত হয়ে এক অতিকরুণ স্তব্ধতার মধ্যে পড়ে আছে, এক টুকরো এখানে, আর এক টুকরো ওখানে।

তার মনের গভীরে ডুব দিয়ে শুচি একটি প্রশ্নের উত্তর শুধু খুঁজে বেড়ায়—তুমি কি করে আমাকে ছেড়ে দিতে পারছো? আমি খেতে না দিলে তুমি খেতে পার, আমি তোমার মাথায় হাত না দিলে তুমি ঘুমোতে পার, তোমার যে এত গুণ আছে তা তো জানতাম না।

কাব্যতীর্থ দূর আকাশপটের দিকে তাকিয়ে মনে মনে যেন একটা কামনাকে সম্ভাষণ জানাতে থাকেন—তুমি আকাশগঙ্গা হও, তোমার জীবনের প্রবাহ তুমি নিজের শক্তিতেই ধার করে রাখ। তোমার শিব তো আর সত্যিই শিব নয়, তোমাকে ধরে রাখবার শক্তি তার নেই।

প্রবীর ও সোমা একটু ব্যস্তভাবে উদ্‌ভ্রান্তের মতই এসে ঘরে ঢোকে। দেখলেই বুঝতে পারা যায়, দুজনেই যেন জোর করে বেদনাকীর্ণ মুখের উপর একটা হাসি টেনে রেখেছে কোনমতে।

শুচি একটু আশান্বিত ভাবেই বলে—তোমরাই একবার ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা কর তো ভাই, আমাকে হঠাৎ মতিগঞ্জ পাঠাবার জন্যে এত উৎসাহ কেন?

সোমা বলে—মার অসুখ হয়েছে, একবার দেখে আসুন।

প্রবীর আস্তে আস্তে আশ্বাসের সুরে বলে—আপনি মতিগঞ্জ ঘুরে আসুন বৌদি, বিনোদদার জন্যে ভাববেন না। আমাদের যতদূর সাধ্যি আমরা ওঁকে দেখবো।

একেবারে নিরুত্তর হয়ে মাথায় হাত দিয়ে অবসন্নের মত বসে থাকে শুচি। যেতেই হবে, সবারই তাই ইচ্ছে, না পাঠিয়ে ছাড়বে না।

যতীদা বুদ্ধিমান মানুষ, তিনি আর সময় দিলেন না। তাঁর ব্যাগটা এক হাতে তুলে নিয়েই উদ্ব্যস্ত হয়ে বলেন—এবার রওনা হওয়া যাক, এখান থেকে নরসিংহতলা কম দূর তো নয়, সময় মত পৌঁছে সরকারী মোটরবাসে জায়গা নিতে হবে।

শুচিও আর সময় নিল না। নিঃশব্দে উঠে গিয়ে বারান্দায় পৌঁছে কাব্যতীর্থকে প্রণাম করে। সোমা আর প্রবীরের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবেই বলে—আসি ভাই। যতীদা ততক্ষণে অপরাজিতার বেড়া পার হয়ে পথে দাঁড়িয়েই হাঁক দেন—আয় শুচি।

কাব্যতীর্থ তো এমনিতেই লজ্জা করার নিয়মগুলি মাঝে মাঝে ভুলে যান। আজও তাই করলেন। শুচির কাঁধে হাত দিয়ে যতীদার পিছু পিছু চলতে আরম্ভ করেন, কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে আসার জন্য।

সোমা শুধু দেখছিল, শুচিদির শাড়ির আঁচলটা আর কাব্যতীর্থ মশাইয়ের মুখটা। আঁচলটা সেই প্রথম দিনের দেখার মতই ছেঁড়া ছেঁড়া। আর কাব্যতীর্থ মশাইয়ের মুখটা সেই প্রথম দিনের দেখা ছবির একেবারে উলটো। কাব্যতীর্থের মত ধৈর্যকঠিন মানুষের মুখও যে এত করুণ হতে পারে, না দেখলে কল্পনা করতে পারতো না সোমা। কাব্যতীর্থ যেন সত্যিই আধখানা হয়ে গিয়েছেন। তাঁর জীবনের কাব্য আর নেই, শুধু জীবনের কঠোর তীর্থটুকু পড়ে আছে।

ইংরাজ রাজের খর-নখরের ব্যূহ ক্রমেই এগিয়ে আসে কাঞ্চীপুর স্বরাজ সরকারের হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে। গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে, শাস্তির দাবানল ছড়িয়ে, কংগ্রেস শিবিরগুলি উৎখাত করে, স্কুলবাড়িগুলিকে ভস্মসাৎ করে, গরুবাছুর নীলাম করে, ঘটিবাটি বাজেয়াপ্ত করে এবং শেষ পর্যন্ত সমগড়ের দশটি নারীর ধর্ম লুঠ করে। তবু ক্ষান্তি নেই, বিষবাষ্পের বৃত্তের মত চারদিকে ঘিরে তারা এগিয়ে আসতে থাকে। এস. ডি. ও.-র প্রতিভা, দেশী পুলিসের দাস্য আর বেলুচি সেপাইয়ের পশুত্ব। তার উপর দেখতে দেখতে পায়রাপরীর বনের পাশে খোলা মাঠে একটা গোরা পল্টনের ছাউনিও দেখা দিল।

ঠিক সময় আর সুযোগ বুঝে মিনার্ভা বিল্ডার্সের পরিত্যক্ত ক্যাম্প আবার কলের করাতের শব্দে মুখর হয়ে ওঠে। পায়রাপরীর আদরের লালিত শাল অর্জুন আর ডুমুরগুলিকে যেন পিলখানার জীবের মত দলে দলে হত্যা করা হতে থাকে। চিরসবুজ পায়রাপরীর বন দিন দিন ছায়াহীন আর বর্ণহীন হয়ে নেড়া মাঠের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। গ্রামের পুনর্ণবা শুকিয়ে ধুলোয় লুটিয়ে ধুলো হয়ে যায়।

সপ্তবাটি একবার মরিয়া হয়ে বাধা দেয়। জেলাবোর্ডের সড়ক আবার কাটা পড়ে, সেতু পোড়ে, মিলিটারী রসদের দুটো নৌকো এক মধ্যাহ্নের দিবালোকেই জনতার আক্রমণে জলে ডোবে।

খর নখরের অভিযান আরও এগিয়ে আসে। এস-ডি-ও স্বয়ং নিজের হাতে নিশুনিয়ার পঞ্চায়েতের ধর্মগোলায় আগুন লাগান, ত্রিবর্ণ পতাকা ছিঁড়ে বুট দিয়ে চেপে চেপে নাচেন। তিনটি টিউবওয়েল চূর্ণ করে দিয়ে, ত্রিশজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলে যান।

গুলি চলে চণ্ডীখোলায়, দীঘির ধারে কচুবনের উপর মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ে থাকে, হাজরা বাড়ির তিনটি ছেলে আর কর্মকার বাড়ির দুটি। বেলুচ সেপাই মৃতদেহের কোমর হাতড়ে পয়সা খোঁজে। আঙুল কেটে আংটি খুলে নেয়।

নবগ্রাম ক্ষেপে ওঠে এক মাঝরাতে, দুঃস্বপ্নের আগুনের মত। পুলিস ক্যাম্প জ্বলে ওঠে দাউ দাউ করে, গ্রামজনতার চিৎকার যেন অন্ধকারে প্রেত শিকার করবার জন্য দিকে দিকে তাড়া করে বেড়ায়। পুলিসের দল গা-ঢাকা দিয়ে জলে জলেই হেঁটে পালিয়ে যায়।

মরাকালিন্দীর ভাঁটায় এক হুইস্কির বোট এসে লাগে পায়রাপরীর বনের গায়ে। গোরা ফৌজের নৈশ টহলদারী মত্ত হয়ে ওঠে। গাঁয়ের মেয়ে কুটীর ছেড়ে দিয়ে বাঁশবনে রাত কাটায় এবং দেখতে দেখতে একদিন ভরাকুল থানার অভ্যন্তরে আবার দশটি রাইফেল ও দুটি রিভলভারের অগ্নিময় হিংসা উর্দিভূষিত হয়ে হাসতে হাসতে দপ্তর খুলে বসে। মাণিক চৌকিদার থানার বারান্দায় বসে বিজয়গর্বে তাড়ি খায়।

আর, কাঞ্চীপুরের শিশুভবনে সোমার ঘরে মৃদু দীপালোকের সম্মুখে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে মহাপঞ্চায়েতের সকল সংগ্রামের পরিচালক প্রবীর মাস্টার, হাতের কব্জিতে ব্যাণ্ডেজ, কপালে একটা কাটা দাগ।

প্রবীরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সোমা বলে—অনেক তো হলো, এবার কটা দিন একটু ক্ষান্তি দাও। অন্তত গুলির ঘাটা সেরে যাক, তারপর।

প্রবীর হাসে—ক্ষান্তি কেমন করে হবে সোমা? এ থামতে পারে না, যতদিন না...।

সোমা—থামলে কেন? কি বলছিলে বল?

প্রবীর—যতদিন না একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যায়।

সোমা তীক্ষ্নভাবে প্রশ্ন করে—হেস্তনেস্তটা কি শুনি।

প্রবীর চুপ করে থাকে। সোমার গলার স্বর আরও তীক্ষ্ন হয়।—তাতে ইতিহাসে তোমার নাম থাকবে। কিন্তু আমার কি?

প্রবীর হেসে ফেলে—তাতে আমারই বা কি? তোমার বদলে ইতিহাসের নামে আমার কোন লোভ নেই।

মৃদু দীপালোকের পেলব স্পর্শে এই মুহূর্তগুলি যেমন মধুর, তেমনি মধুর সোমার পেলবতর স্পর্শ। কাঠুরিয়ার মাণিক কুড়িয়ে পাওয়ার মত প্রবীরের জীবনে আকস্মিক এক উপহার। সোমাকে বুকের কাছে নিবিড় করে টেনে নিয়ে প্রবীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে—শুধু এরই জন্যে আমি বাঁচতে চাই সোমা, এই প্রাণটার হেস্তনেস্ত করতে চাই না।

দুটি ব্যগ্র বাহু দিয়ে ঘেরা এই ক্ষণিক স্বপ্নের আক্রমণের কাছে নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ করে সোমা। মনে মনেই বলে—এর জন্যেই যে আমিও এই হাহাকারের মধ্যে মরেও বেঁচে আছি।

প্রবীর কথা বলে, কথাগুলি শান্ত হাহাকারের মতই শোনায়—আজ আমি তোমায় চলে যেতে দিতে চাই সোমা, কিন্তু...।

সোমার মনটাও নিঃশব্দে হেসে ওঠে বোধ হয়। এ তো বেশ ভাল কথা। দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে চলে যেতে বলা!

প্রবীর বলে—কিন্তু তুমি যেও না।

ব্যগ্র বাহু দিয়ে ঘেরা স্বপ্ন হঠাৎ মাত্রা ছাড়িয়ে আকুল হয়ে ওঠে। তারই মধ্যে সোমা তার সকল অনুভব দিয়ে নিঃশব্দে বরণ করে নেয় কপালের উপর একটি নতুন টিপ। বড় উষ্ণ, চন্দনতারার মত স্নিগ্ধশীতল নয়।

প্রবীরের হাত ছাড়িয়ে মুক্ত হবার জন্য একটু মৃদু চেষ্টা করে সোমা বলে—এমন করে সব কেড়ে নিলে মানুষ যায়ই বা কি করে?

এ সবের মধ্যে বিন্দুমাত্র অভিমান আজ ছিল না, যদিও প্রবীরের দাবিটা বড় অদ্ভুত। কিন্তু সে তো আর কাব্যতীর্থ মশাইয়ের মত নয়। কাব্যতীর্থ শুচিদিকে যেতে দিতে চান না, তবু যেতে বলেছেন। প্রবীর সোমাকে যেতে দিতে চায়, কিন্তু থাকতে বলে। কাব্যতীর্থ দাবি ছেড়ে দিয়েছেন, প্রবীর দাবি ছাড়তে চায় না। অনেক তফাৎ দুজনের মধ্যে।

শুচি হলো কাব্যতীর্থের স্ত্রী, আর সোমা হলো প্রবীরের কেউ নয়। তবু একটি বিষয়ে দুজনের মধ্যে অদ্ভুত মিল দেখা যাচ্ছে, কাঞ্চীপুরের আক্রান্ত জীবনের বেদনাকে যেন প্রতিধ্বনিত করে দুজনেই স্বীকার করেছে—ধরে রাখার সামর্থ্য আর নেই।

কাঞ্চীপুর স্বরাজ সরকারের প্রাণকে ছিন্নভিন্ন করার জন্য চারদিক থেকে খর-নখরের ব্যূহ এগিয়ে আসছে। সোমার মনে হয়, এই স্বপ্নকে দ্বিখণ্ডিত করে বিচ্ছিন্ন করার জন্যই যেন শত্রুর অভিযান এগিয়ে আসছে, স্বাধীন কাঞ্চীপুর আবার পরাধীন হতে চলেছে।

তবু অভয় দিতে থাকেন কাব্যতীর্থ। পালিয়ে না গিয়ে আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত থাকার জন্য আবার আহ্বান। বাণীপীঠের প্রাঙ্গণে ত্রিবর্ণ পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছিলেন কাব্যতীর্থ, কয়েক হাজার জনতা নিঃশব্দে বসে শুনছিল ঃ

"অন্তরীক্ষ আমাদের হউক অভয়, আমাদের দ্যুলোক ভূলোক অভয় হউক...উত্তরাধরাদ্ অভয়ং নো অস্তু, আমাদের ঊর্ধ্ব ও অধঃ অভয় হউক...অভয়ং নক্তমভয়ং দিবা নঃ, আমাদের রজনী অভয় হউক, দিবস অভয় হউক...।"

উর্দিভূষিত মানুষের একটা দল হঠাৎ দূর সড়কের উপর দেখা দেয়। মাঠের উপর দিয়ে কাদা ছিটকে বন্য বেগে ছুটে আসে এস-ডি-ও, দেশী পুলিস আর বেলুচে সেপাই।

এস-ডি-ও একটা লাফ দিয়ে পতাকাদণ্ডের উপর লাথি মারেন। কয়েকটি বিদ্যার্থী ছেলে ছুটে এসে পতাকা দণ্ডে বুক লাগিয়ে দু হাতে আঁকড়ে ধরে। এস-ডি-ও যেন আহত গোক্ষুরার মত একটা মোচড় দিয়ে লাফিয়ে আবার পিছিয়ে যান।

মাথার টুপিটা এক হাতে ঢালের মত ধরে, আর একটা চকচকে রিভলবার তুলে এস-ডি-ও গলাছেঁড়া গর্জনের মত হাঁক ছাড়েন—ফায়ার!

এক রাউণ্ড, দু রাউণ্ড, তিন রাউণ্ড—বুলেট বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বারুদের ধোঁয়া আর গন্ধের মধ্যে কেউ মুখ থুবড়ে পড়ে আর মরে যায়, কেউ দাঁড়িয়ে মরে আর পড়ে যায়, আর কেউ জখম হয়ে দূরে ছিটকে পড়ে। আক্রান্ত জনতা হঠাৎ বিমূঢ় হয়ে কিছুদূর পিছিয়ে যায়, তারই মধ্যে এক নরসিংহ ভক্তের চোখ এস-ডি-ওর বন্য চোখের চেয়েও হিংস্র হয়ে জ্বলে ওঠে।

জনতার হঠাৎ বিমূঢ়তায় আবার আগুন ধরিয়ে দিয়ে প্রবীর মাস্টার সামনে এগিয়ে এসে হাঁক দেয়—স্বরাজ সরকার কি জয়। এক জনারণ্যের দাবানল ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য এক পা দু'পা করে এগিয়ে যেতে থাকে।

বেলুচ হাবিলদার গলা কাঁপিয়ে হাঁক দেয়—ড্র সোর্ড এণ্ড হাল্লা...।

বীভৎস চিৎকার তুলে এক ঝলক সূচীমুখ বেয়নেট জনতার বুকের উপর লাফিয়ে পড়ে চার্জ করে। প্রবীর মাস্টার পড়ে যায়, আবার টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়। জনতাও হঠাৎ অটল পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

এস-ডি-ও এক থাবা দিয়ে পতাকাটা ছিঁড়ে নিয়ে হুইসিল বাজাতে থাকেন। প্রবীর মাস্টার যেন জ্ঞান ফিরে পেয়ে ভাল করে চোখ মেলে দেখতে পায়, মাঠের উপর দিয়ে কাদা ছিটকে এস-ডি-ও'র দল দৌড়ে চলে যাচ্ছে। আর...।

আর ছোট আতা গাছটার ছায়ার নিচে রক্তমাখা চাদর গায়ে জড়িয়ে টান হয়ে নিশ্চিন্তভাবে শুয়ে আছেন কাব্যতীর্থ।

নরসিংহ ভক্তের চোখের হিংস্র জ্বালা কোথায় মিলিয়ে যায় এক মুহূর্তে, যেন এক অনাথের কান্না প্রবীরের চোখ ভাসিয়ে দেবার জন্য বুকের ভিতর থেকে ফুঁড়ে উঠতে চাইছে।

ছুটে এসে কাব্যতীর্থের পায়ে হাত দিয়ে প্রবীর ডাকে—বিনোদদা!

কাব্যতীর্থ বলেন—একটু জল দাও তো ভাই।

কয়েকটি বিদ্যার্থী ছেলে এক দৌড়ে ছুটে গিয়ে জল নিয়ে ফিরে আসে।

কাব্যতীর্থ বলেন—তুমি খাইয়ে দাও প্রবীর।

বোধ হয় এই পরম ছোঁয়ার জলটুকু পান করার জন্য তিনি জন্মাবধি তৃষ্ণার্ত হয়ে ছিলেন। মিটে গেল সে তৃষ্ণা, এবং তারই অগাধ তৃপ্তিতে চিরকালের মত শান্ত হয়ে গেলেন কাব্যতীর্থ।

তারপরের ঘটনাগুলিও শান্ত। অস্তোন্মুখ সূর্যের শান্ত রোদের আলোয় মরাকালিন্দীর চড়ায় চিতার ধোঁয়া আকাশে ওঠে। পাশাপাশি সাতটি চিতা। কাব্যতীর্থের, আর সুদাম জগদীশ পাঁচু শ্রীধর বীরু ও শ্যামানাথের।

সন্ধ্যাবেলা, নিস্তব্ধ বাণীপীঠের প্রাঙ্গণে মাটির উপর সাতটি প্রদীপও শান্তভাবে জ্বলে। সোমা এসে আহত প্রবীর মাস্টারের ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মূর্তিটাকে ধরে ধরে শিশুভবনে নিয়ে যায়। জীর্ণ রাসমঞ্চের স্তূপের কাছে পৌঁছে প্রবীর একবার থামে। মুখ ফিরিয়ে বাণীভবনের প্রাঙ্গণের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে।

সোমা জিজ্ঞাসা করে—কি দেখছো?

প্রবীর—সাতটি প্রদীপ, এখান থেকে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে সোমা?

সোমা—হ্যাঁ।

সেই কাহিনীটাও মনে পড়ে সোমার, সপ্তর্ষির দল একদিন আকাশ থেকে নেমে এলেন ভূতলে...।

আজকের সকালবেলাটা খুবই শীতার্ত, সূর্য উঠলেও যেন কুয়াসাগুলি সরতে চায় না, খড়ের চালা থেকে টপ টপ করে শিশির জল ঝরে পড়ে। পাখিগুলির ঘুম ভাঙেও দেরি করে। সারা কাঞ্চীপুরের শোণিত যেন উত্তাপহীন হয়ে গিয়েছে।

শিশুভবনের বারান্দায় একটা মাদুরের উপর কম্বল জড়িয়ে তখনো ঘুমিয়ে ছিল প্রবীর। সোমা এসে একবার দেখে গিয়েছে, কিন্তু ঘুম ভাঙায়নি। তারার মা সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে, রান্নাঘরের চৌকাঠের কাছে দরজায় হেলান দিয়ে বসে বসেই ঝিমোয়। বেলা হয়, কিন্তু কাজের তাড়া নেই। এই রান্নাঘরের উনুন জ্বালবার সাধও বোধহয় মিটে আসছে একে একে।

কিন্তু প্রবীরের ঘুম না ভাঙলেও ভাঙিয়ে দিতে হলো। কয়েকটি বিদ্যার্থী ছেলে একটা খবর জানতে এসেছে।

পুলিস আসছে, প্রায় এসে পড়েছে, সমস্ত কাঞ্চীপুরকে তল্লাসী করতে।

একটি বিদ্যার্থী ছেলে বলে—আর আপনাকে গ্রেপ্তার করতে মাস্টার মশাই।

প্রবীর প্রশ্ন করে—শুধু আমাকেই গ্রেপ্তার করবে?

বিদ্যার্থী ছেলেটি বলে—আমি খবর পেয়েছি, শুধু আপনার নামেই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে।

প্রবীর উঠে দাঁড়ায়, বারান্দার উপর ধীরে ধীরে কিছুক্ষণ পায়চারি করে, তারপর বলে—শোন, তোমরাও সবাই এখান থেকে সরে পড়।

যে আজ্ঞে। বিদ্যার্থী ছেলেরা চলে যায়।

সোমা এতক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছিল। প্রবীর বারান্দা থেকে নেমে আঙিনার উপর দাঁড়াতেই সোমা এসে হাত ধরে—কোথায় যাবে?

প্রবীর হেসে ফেলে—তোমার ঘরে, একটু জল খাব।

মিথ্যা বলেনি প্রবীর, সোমার ঘরেই এসে এক গেলাস জল খেয়ে সুস্থ মানুষের মত দাঁড়ায়। সোমার হাত ধরার জন্য হাতটা এগিয়ে দিয়ে প্রবীর বলে—এবার যাই সোমা।

সোমা হাত সরিয়ে নেয়—এরকম কথা তো ছিল না।

প্রবীর—কি কথা ছিল?

সোমা—কথা ছিল, তুমি আমাকে যেতে দেবে না, আর আমিও যাব না। কিন্তু আজ তুমি পালিয়ে যাচ্ছ কেন?

প্রবীর—আমি পালিয়ে থাকছি সোমা। বরং পুলিসের কাছে ধরা দিলেই পালিয়ে যাওয়া হবে, এটুকু তুমি বুঝতে পারছো না?

প্রবীর সোমার দুটি হাত চেপে ধরে।—আমি পালিয়ে যাব কোথায় সোমা? আমার আত্মা যে পড়ে রইলো এখানে।

সোমা—কোথায় থাকবে?

প্রবীর—তোমার চারদিকে।

সোমা—তোমার খবর পাব কি করে?

প্রবীর—আমি খবর দেব, আমি নিজে এসে খবর দিয়ে যাব।

সোমা—এভাবে কতদিন চলবে?

প্রবীর—এর বেশী আর কিছু জানি না সোমা। শুধু জানি, আজ থেকে আমার জীবনে এই এক নতুন কাজের পালা শুরু হলো।

সোমা—এ কাজের পালা কি ফুরোবে না?

প্রবীর চুপ করে থাকে। সোমার হাত দুটি আর একটু শক্ত করে ধরে, যেন নিজেরই হৃদয়কে আরও কঠিন করে নিয়ে প্রবীর বলে—ফুরোবে, যেদিন এখানে এসে আর তোমাকে দেখতে পাব না।

সোমার চোখের পাতাগুলি ভারি হয়ে আসে। দুঃসহ হলেও সোমা তার জীবনের এই নতুন পরীক্ষাকে শান্ত চিত্তে গ্রহণ করবার চেষ্টা করে। মনটাও যেন বলছে ; মন্দ কি? চিরকাল এমনি করে তুমি আসতেই থাক। এই আসা যেন ফুরোয় না। আর আমি শুধু প্রতীক্ষা হয়ে থাকি। তুমি এস, আমি আছি, আমি থাকবো, আমি যাব না।

সোমা বলে—তা কখনো হতে পারে না প্রবীর, হতে দেব না। আমি যাব না।

প্রবীর—আমি এবার আসি।

সোমা—এস।

প্রবীর চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ ধরে শিশুভবনের ঘুম যেন ভাঙতে চায় না। তারার মা চৌকাঠের কাছে তেমনি আলস্যে ঝিমোতে থাকে ; সোমা বসে থাকে তার অবসন্ন চিন্তার নিভৃতে, এক গভীর নির্জনতার মধ্যে। প্রবীর নিজে চলে গিয়ে সোমাকে যেন একেবারে নিশ্চল করে রেখে গিয়েছে।

কাঞ্চীপুরের এই চাঞ্চল্যহীনতাকে যেন প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে চূর্ণ করবার জন্য একটা উল্লাস গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে। ভরাকুল থানার ইনচার্জ, দশজন কনস্টেবল, মানিক চৌকিদার, আর...আর সব চেয়ে আশ্চর্য, মিঞাবাজারের জন পঞ্চাশ লোক।

ইনচার্জ মহাশয়ের উৎসাহের অর্থ বোঝা যায়, তিনি প্রতিশোধের আনন্দে চঞ্চল। কনস্টেবলদের উৎসাহ বোঝা যায়, তারা হাতে হাতে কিছু পেয়ে যাবার ভরসায় চঞ্চল, আর মানিক চৌকিদারের উৎসাহের রহস্য তো জানাই আছে। সে আজ প্রতিহিংসার উৎসাহে চঞ্চল।

শুধু বোঝা যায় না মিঞাবাজারের লোকজনের এই প্রবল উৎসাহের অর্থ। ওরাই তো কতবার গ্রাম সেবামগুলের কেন্দ্রে এসে বিনামূল্যে চরকা নিয়ে গিয়েছে, এক বছরে শোধ দেবার মেয়াদে বস্তা বস্তা তুলো নিয়ে গিয়েছে। গত বছরের ম্যালেরিয়ায় এই গ্রামসেবামগুলই তো মিঞাবাজারকে চারটি মাস বিনামূল্যে সালসা আর পাচন খাইয়েছে।

আজ ওরাই এসেছে কাঞ্চীপুরের দেনা শোধ করতে, স্পেশ্যাল পুলিস হয়ে, কেরোসিনের টিন হাতে নিয়ে!

নির্জন বাণীপীঠের প্রত্যেক ঘর তল্লাসী করে শুধু দু বস্তা বই গ্রেপ্তার করলেন ভরাকুল থানার উৎসাহী ইনচার্জ। মেঝে খুঁড়ে কিছুই পেলেন না। সবচেয়ে বেশী ঠকে গেলেন কাব্যতীর্থের বাড়ি তল্লাসী করতে এসে।—এঃ, সব সরিয়ে ফেলেছে! বঞ্চিত ইনচার্জ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। একটা থালা, একটা গেলাস আর একটা বাটি ছাড়া নেবার মত আর কিছুই পেলেন না।

এইবার ইনচার্জ সত্যিই ক্ষেপে উঠে প্রতি কুটিরে হানা দিয়ে ফিরতে লাগলেন। পুলিস আর স্পেশ্যাল পুলিস ঘরে ঘরে শূন্য ধানের মরাই ভাঙে। বাক্স পেঁটরা ভেঙে যা পায়, হাতে হাতে লুঠ করে। থালা বাসন, ঘটি বাটি টেনে নিয়ে গাছতলায় জড়ো করে। মেয়েরা ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে থাকে। পুরুষ যাকে পাওয়া যায়, থুড়থুড়ো থেকে আরম্ভ করে ষোল বছরের ছেলে পর্যন্ত সবাইকে গুঁতিয়ে অশথতলায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখে, নিলামের গরুর পালের মত।

এপাড়া থেকে ওপাড়া, তল্লাসীর উল্লাস সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত লুঠেরা দস্যুরা হল্লার মত ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

ঠিক সন্ধ্যার আগে ইনচার্জ মহাশয় প্রবীর মাস্টারের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে সদলবলে ঢুকলেন শিশুভবনে তল্লাসী করতে। শিশুভবন তন্ন তন্ন করে তল্লাসীর পর এক বস্তা চালের খুদ গ্রেপ্তার করলেন ইনচার্জ। বাকি রইল সোমার ঘর।

সোমাকে দেখে একটু আশ্চর্য হলেন ইনচার্জ ; খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা সওয়াল জেরা করে প্রায় তিন পাতা রিপোর্ট লেখার পর জিজ্ঞাসা করেন—স্বদেশী করবার এত জায়গা থাকতে আপনি কলকাতা ছেড়ে এখানে এলেন কেন?

সোমা—চাকরি করতে।

ইনচার্জ হাসেন—উঁহু, একথা বললে ভবী ভোলে না ম্যাডাম ; বেছে বেছে ডিস্‌টার্বড্ এরিয়াতে চাকরি করতে আসা? আপনার এ চাকরিতে প্রসপেক্ট কি আছে বলুন দেখি?

সোমা—জানি না।

ইন-চার্জ মহাশয় কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবতে থাকেন। তারপর বলেন—আপনার ভালর জন্যই বলছি শুনুন...।

পকেট থেকে বাংলা গবর্নমেণ্টের একটা ইস্তাহার বের করে সোমার চোখের সামনে মেলে ধরেন—পড়ুন।

সোমা ইস্তাহারের উপর চোখ বুলিয়ে মনে মনে পড়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ইনচার্জ উৎসাহিতভাবে জিজ্ঞাসা করেন—পুরো দুটি হাজার টাকার প্রসপেক্ট! আপনি শুধু আমাকে খোঁজ দিন, প্রবীর মাস্টার কোথায় লুকিয়ে আছে, তাহলেই এই সরকারি পুরস্কারটা আপনাকে পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দেব। আমি কথা দিচ্ছি। বলুন?

সোমা—জানি না।

ইনচার্জ—খোঁজ পেলে বলবেন তো?

সোমা—না।

ইনচার্জ ভুরু কুঁচকে হাসেন—এত চালাক হয়েও আপনি কিন্তু একটা বে-আইনী কথা বলে ফেললেন। আপনার এই কথার দায়েই আপনাকে গ্রেপ্তার করতে পারি, জানেন?

সোমা—জানি না।

ইনচার্জ একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার অত্যন্ত ধীর হয়ে বললেন—চাল নেবেন? সরকারী রিলিফের চাল আছে আমার কাছে।

সোমা এতক্ষণ ধরে যেন তার মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে সংযত করে ইনচার্জের সব কথা সহ্য করছিল। হঠাৎ রূঢ় হয়ে উঠে সোমা বলে—ঠাট্টা করছেন নাকি? চাল কেড়ে নিয়ে আবার চাল দেবার কথা কোন্ মুখে বলেন?

ইনচার্জ শান্তভাবে হাসেন—আমাদের ওপর এইরকমই ইনস্ট্রাক্‌শন্ আছে ম্যাডাম।

সোমা আর কোন উত্তর দেয় না। উর্দিধারী হয়ে থাকলেও ইনচার্জ মহাশয়ের চেহারাটা হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য মানুষের মত হয়ে ওঠে, স্বাভাবিক সৌজন্যের সঙ্গে বলেন—চিন্তা করবেন না, আমি গিয়ে কিছু চাল পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সোমা—পাঠাবেন না, আমি নেব না।

ইনচার্জ—তাহলে বাড়ি চলে যান। এখানে থাকবেন না, নইলে মস্ত অসুবিধায় পড়বেন।

সোমা—এ বিষয়ে আপনি কোন উপদেশ দেবেন না।

ইনচার্জের চেহারাটা সেই মুহূর্তে আবার কেতাদুরস্ত উর্দিধারী অমানুষের মত হয়ে ওঠে। গম্ভীরভাবে বলেন—আপনার ঘর তল্লাসী করবো।

অনেকক্ষণ ধরে সোমার ঘরের জিনিসপত্র তন্ন তন্ন করে তল্লাসী করেন ইনচার্জ। বাক্স ঘেঁটে, বইগুলি তছনছ করে শেষ পর্যন্ত একটা রহস্যময় জিনিস হাতে নিয়ে একটু সুস্থির হয়ে বসলেন ইনচার্জ। সোমার ডায়েরী। সিগারেট ধরিয়ে এক পাতা দু পাতা করে ডায়েরীটা পড়তে পড়তে ইনচার্জের ঠোঁট ভুরু চোখ সবই এক দিব্য হাসির পুলকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে থাকে।

"২৭শে জুন—শেষরাত্রির জ্যোৎস্নায় নরসিংহতলার বটকুঞ্জে লুটোপুটি আলোছায়াতে তোমার মুখটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো।"

"২৯শে জুন—পথে আসতে দেখেছিলাম তোমাকে, তুমি গ্রামের একলব্য। শুচিদির বাড়ির বারান্দায় দেখলাম, তুমি অস্পৃশ্য। আজ দেখছি, তুমিই নাকি বাণীপীঠের হেড মাস্টার। তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে একটুও লজ্জা হয় না আমার, আশ্চর্য।"

"৩০শে জুন—আমার জীবনের প্রথম নিমন্ত্রণলিপি গেল তোমার কাছে।"

"৫ই জুলাই—মন্দির দ্বারের মূর্তির মত এই সন্ধ্যার দ্বারপ্রান্তে আমি দাঁড়িয়েছিলাম কার জন্য? তুমি এলে, পেলাম তোমার স্পর্শ। কিন্তু নরসিংহের ভক্ত হয়েও তোমার চোখে জল কেন? তোমার মনের এই গোপন বেদনাটি কি আমি জানতে পারি না?"

পড়তে পড়তে ডায়েরীর শেষ পাতার কাছে এসে থামেন, পুলকবিকম্পিত ইনচার্জ।

"৩রা ডিসেম্বর—তোমার দুই বাহু দিয়ে ঘেরা স্বপ্নের মধ্যে আমি বন্দী। আজ আমার কপালে একটি নতুন টিপ তুমি এঁকে দিলে।"

—ভাল প্রসপেক্ট! ডায়েরী বন্ধ করেন ইনচার্জ। আর কোন কথা না বলে কিছুক্ষণ শুধু হাসতে থাকেন। থেমে নিয়ে আবার হাসেন।

ডায়েরীটা হাতে নিয়ে একটা হাঁপ ছেড়ে ইনচার্জ বলেন—যাকগে, এর মধ্যে ন্যাশনালজিমের ছিটেফোঁটাও দেখছি না, এসব ব্যাপার আমার পীনাল কোডের আওতায় পড়ে না বলেই তো মনে হচ্ছে। তাই শুধু এর ওপর নির্ভর করে আপনাকে এখুনি গ্রেপ্তার করতে পারলাম না। এটি আমি সদর কোতোয়ালিতে রিপোর্টের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে দেখি, তাঁরা কি অর্ডার দেন? আপাতত...।

ইনচার্জ হেসে ফেলেন।—আচ্ছা, আপাতত আসি।

পুলিস দল চলে যাবার পরও সন্ধ্যার শিশুভবন নিস্তব্ধ হয়ে থাকে। আজ আঙিনার উপর ছেলেমেয়েদের হুটোপুটি খেলার সোরগোল নেই। সাঁওতাল বউ আজ আর সুরভিকে নিয়ে দুধ দুইতে আসেনি।

রান্নাঘরের উনুনটাও নিস্তব্ধ। ওবেলা ছেলেমেয়েদের জন্য আধপেটা বরাদ্দের চাল নিয়ে

রান্নাবান্না এবং খাওয়াদাওয়া হয়েছিল। এবেলা তাও নয়।

তারার মা এসে সোমাকে ডাকে—গুরুমা।

সোমা—কি বল?

তারার মা—ঢ্যাঙাগুলো সব চলে গেছে গুরুমা?

সোমা—কে চলে গেছে?

তারার মা—মাধাই নেই, সুমন্ত নেই, বিশু পবন মনুও নেই।

সোমা—কোথায় গেল?

তারার মা বিরক্ত হয়ে ওঠে—সামান্য কথা সোজা করে কিছুতেই বুঝতে চাও না গুরুমা। কদিন ধরে ছেলেগুলো পেট পুরে খেতে না পেয়ে সুঁটকি হচ্ছিল, আর কতদিন থাকবে বল?

সোমার মুখটা সহসা একটা যন্ত্রণার আঘাতে বিবর্ণ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকার পর বলে—গেছে ভালই করেছে, কিন্তু যাবার সময় আমার সঙ্গে একটিবার দেখাও করে গেল না?

সোমার চোখ দুটো দুঃসহ পরাজয়ের অভিমানে ঝাপসা হয়ে উঠতে চায়। এক ভুয়ো গুরুমাকে এতদিনে চিনতে পেরে ওরা যেন সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

নেপাল হঠাৎ সোমার ঘরে এসে সোমাকে প্রণাম করতেই সোমা চমকে তাকায়।

শিশুভবনে প্রথম যেদিন এসেছিল সোমা, এই নেপালই এমনি করে না ডাকতেই এসে প্রণাম করেছিল সোমাকে, দাগী সদানন্দের ছেলে নেপাল।

সোমা জিজ্ঞাসা করে—কি নেপাল?

নেপাল—আমি চলে যাচ্ছি গুরুমা।

সোমা—কোথায় যাবে?

নেপাল—চাল আনতে যাব।

সোমা—সে কি কথা? তুমি চাল আনবে কি করে?

নেপাল নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে, কি যেন বলতে চায়, তবু বলতে পারে না। কিছুক্ষণ উসখুস করে তারপর নেপাল যেন একটা রহস্যময় সুরে বলে—আমি চাল আনতে জানি গুরুমা।

সোমা নেপালকে হাত ধরে কাছে টেনে আনে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে—ছিঃ নেপাল। তোমাকে চাল আনতে হবে না।

নেপাল আবার কি যেন ভাবে। বোধহয় ওর ভবিষ্যতের সুদূরে এক যাবজ্জীবন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে নেপাল বলে—যাই গুরুমা। আমি আর আসব না।

সোমা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে—যাও।

নেপাল চলে যায়। সব কাছে-ধরে-রাখা আবেদন ছিন্ন করে একে একে চলে যাওয়ার পালা আজ সকাল থেকে শুরু হয়েছে।

পুলিসও কাঞ্চীপুর ছেড়ে চলে গিয়েছে, এতক্ষণে অনেক দূরে। যাবার আগে বাণীপীঠে আগুন ধরিয়ে দিয়ে, কাঞ্চীপুরকে রাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছে পুলিস। জ্বলন্ত বাণীপীঠের শিখার লাল আলোকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়, নরসিংহতলার কাছ দিয়ে সড়ক ধরে পুলিসের দল চলে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছে কাঞ্চীপুরের পঞ্চাশজন বন্দী ছেলে বুড়ো যুবক। গরুর গাড়ির উপর বোঝাই হয়ে কাঞ্চীপুরের সব পিতল কাঁসা চলে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে সাঁওতাল বউয়ের সুরভি, দড়িবাঁধা বন্দিনীর মত পুলিস দলের সঙ্গে সঙ্গে। গরুর গাড়ির উপরে স্তূপীকৃত লুণ্ঠিত সামগ্রীর মধ্যে একটা প্রতিমার মূর্তিও দেখা যায়, যার দোমেটে শরীর মাত্র রঙীন হয়ে উঠেছিল। কুমোর পাড়া তল্লাস করে পুলিস আজই মূর্তিটাকে গ্রেপ্তার করেছে। গরুর গাড়ির ঝাঁকুনিতে কাঁপতে কাঁপতে চলে যাচ্ছে এই মূর্তি, কাব্যতীর্থের কল্পনার

বড় প্রিয় শুভান্বিতা কুন্তধারিণী জয়ন্তী মূর্তি।

পাথরের নরসিংহকে সদানন্দ একেবারে অন্ধ করে দিয়েছে কদিন আগেই। স্তবের ভাষা বলে, নক্ষত্রমালা তার চারুহার, সূর্য চন্দ্র তার কুন্তল, পাঞ্চভৌত তার পায়ে লুঠৎ-শির, কিন্তু সেই বিশ্বসাক্ষী নৃহরির চোখের উপর দিয়েই সব চলে যাচ্ছে, অন্ধ নরসিংহ কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু আড়াল থেকে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে এক পলাতক নরসিংহভক্তের চক্ষু এই অন্ধকারেই জ্বলে ওঠে।

হেসে ওঠে এই রাত্রের অন্ধকারেই শ্যামনগরের বাজারের মধ্যে প্রেতবিবরের মত একটি ঘর। মানিক চৌকিদার হাসে।

কেরোসিন ল্যাম্পের আলোটা আর একটু বাড়িয়ে নিয়ে মানিক চৌকিদার বলে—মুখটা একবার কাছে নিয়ে আয় দেখি সিন্ধু, এক পাত্র চড়িয়ে নে।

মানিক ঝুলি থেকে একটা হুইস্কির বোতল বের করতেই সিন্ধুর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—অ্যাঁ, বিলাতী জল? মানকে আমার বড় মানুষ হয়ে উঠলো দেখছি?

মানিক চৌকিদার ঝুলি থেকে একতাড়া নোট বের করে দেখায়—এই দেখ, ভেবেছিস কি? সেদিন আর নাই সিন্ধু, সেদিন আর নাই।

এক নিঃশ্বাসে ঢক ঢক করে এক গেলাস বিলাতী জল খেয়ে নিয়ে মানিক একটা ঢেঁকুর তোলে। সিন্ধু সাগ্রহে প্রশ্ন করে—সত্যি বল্ না মানকে, আমাকে বলতে তোর এত লাজ কেন?।

মানিক—কি?

সিন্ধু—এত টাকা, বিলাতী জল, এত সব পাচ্ছিস কোথা থেকে?

মানিক—তোকেও পাইয়ে দিতে পারি, যাবি?

সিন্ধু—চল্ না।

মানিক আর একটা ঢেঁকুর তোলে—নাঃ, তোকে নিয়ে গিয়ে সুবিধে হবে না।

শ্যামনগর বাজারের বেশ্যা সিন্ধু, এই রাত্রের প্রতিটি লালসার পদধ্বনিকে নিজের ঘরে আনবার জন্য পান খেয়ে, চোখে কাজল দিয়ে পরিপাটি সাজ করে বসে আছে। কানে বড় বড় সোনার টাপ, মাথায় একটা ঝাপটা ও গলায় জালফাঁস, নকল সোনার তৈরী। পায়ে একজোড়া রুপোর বাঁকমল। নেশাখোর মানিক চৌকিদারের কথার মধ্যে কি একটা নতুন পাপের আভাস পেয়ে সিন্ধু যেন সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে থাকে।

মানিক বলে—গোরা পল্টন এসেছে, শুনিস নাই সিন্ধু?

সিন্ধু—হ্যাঁ শুনেছি।

মানিক—ওদের জন্য মেয়েমানুষ চাই সিন্ধু, কিন্তু তোকে দিয়ে হবে না।

সিন্ধু যেন ধৈর্য ধরে কান দুটো সজাগ করে শুনতে থাকে, মানিক চৌকিদারের কথাগুলি নেশার ঝোঁকে গড়িয়ে গড়িয়ে শেষ পর্যন্ত কোন্ রসাতলে গিয়ে পৌঁছায়।

মানিক ফিক করে হেসে বলে—কাঞ্চীপুরে এক মাস্টারনী আছে, জিনিসটা ভাল।

সিন্ধুর দু কানের সোনার টাপ দুটো হঠাৎ যেন শিউরে উঠে কাঁপতে থাকে। মানিক চৌকিদার ঝুলি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, নেশার আবেগে একটা সুগোপন চক্রান্ত এইবার একেবারে তরল হয়ে মানিকের মনটাকেই যেন আহ্লাদে ভিজিয়ে দিয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে—যাই, দেখি বরাতে কি বলে! আজ রাতের মধ্যেই কাজ সারতে হবে।

মানিক চৌকিদার চলে যাবার জন্যে পা এগিয়ে দিতেই সিন্ধু পিছন থেকে ডাকে—শোন মানকে।

মানিক অনুযোগ করে বলে—পেছু ডাকিস না সিন্ধু। দেরি করলে সব ফসকে যাবে, নগদ

নগদ একশোটি টাকা বকশিশ দেবে বলেছে। আজ রাতের মধ্যে না হলে আর হলো না। কালকেই ছাউনি তুলে নিয়ে ওরা চলে যাবে।

সিন্ধু--কে?

মানিক--ঐ গোরাগুলো, আবার কে?

সিন্ধু--কিসের বকশিশ?

মানিক--তোর মাথায় একটুও ঘিলু নাই রে সিন্ধু, কিছু বুঝিস না কেন?

সিন্ধু--তুই ভাল করে বলবি তবে তো বুঝবো।

মানিক চৌকিদার ঘর ছেড়ে একেবারে বাইরে এসে দাঁড়ায়, সিন্ধুও পিছু পিছু এসে দাঁড়ায়। মানিকের ঝুলি এক হাত দিয়ে টেনে রেখে জিজ্ঞাসা করে--কোথায় যাচ্ছিস, আমাকে না বললে ঝুলি ছাড়বো না।

মানিক--এঃ, তুই যে একেবারে বিয়ে-করা মাগের মত ঢং করে কথা বলছিল সিন্ধু।

মানিক চৌকিদার গলার স্বর নামিয়ে আস্তে আস্তে বলে--গোরাগুলোকে রাতারাতি একবার ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে চলে আসবো, ব্যস্, নগদ একশোটি টাকা বকশিশ।

সিন্ধু--কার ঘর?

মানিক--শুনেই ছাড়বি সিন্ধু?...তবে শোন।

সিন্ধুর কানের কাছে মুখটা এগিয়ে মানিক ফিস ফিস করে অন্তরঙ্গ ভাবে কথা বলে। কিন্তু সিন্ধু যেন আগুনে-পোড়া সাপের মত ছটফট করে দু পা পিছিয়ে যায়। পরক্ষণেই এগিয়ে এসে মানিকের ঝুলিটা শক্ত করে চেপে ধরে--তুই যেতে পারবি না, আমার মাথা খাস।

একটা ধাক্কা দিয়ে সিন্ধুকে সরিয়ে দিয়ে মানিক মুখ খিঁচিয়ে ধমক দিয়ে ওঠে--সর মাগী।

ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়েও সিন্ধু আবার উঠে মানিককে ধরতে যায়। মানিক চৌকিদার লাঠি তুলে হিংস্র একটা গর্জন করে--আমার গায়ে হাত দিয়েছিস কি, মাথা গুঁড়া করে দেব।

হন হন করে অন্ধকারের মধ্যে মানিক চৌকিদার নিশাচর শ্বাপদের মত অদৃশ্য হয়ে যায়। সিন্ধু চিৎকার করে ডাকতে থাকে--যাসনি মানকে, যাসনি...।

সিন্ধু দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে, নরকের রূপ দেখে আজ যেন এতদিন পরে সে ভয় পেয়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছে। এক মিনিট, দু মিনিট, তারপরেই মানিকের চেয়েও হিংস্রতর শ্বাপদের মত উগ্র আর চঞ্চল হয়ে ওঠে সিন্ধু। পা থেকে বাঁকমল দুটো খুলে ঘরের ভিতর ছুঁড়ে ফেলে দেয়। দরজার শিকল টেনে তালা লাগায়। তারপরেই যেন মানিকের সঙ্গে এক নারকীয় খেলায় পাল্লা দেবার জন্য ছুটে চলে যায় ; অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আজ রাত্রে ভোলা এত কাঁদছে যে, জনাও সামলাতে পারছে না। কিছুক্ষণ ঘুমোয় ভোলা, তার পরেই কেঁদে ওঠে। জনাও সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠে সান্ত্বনা দিয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করে। আর সান্ত্বনা দিতে দিতে জনা নিজেই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, ভোলা আবার কাঁদে।

জনার সান্ত্বনায় যখন কাজ হয় না, তারার মা এক একবার বাঘের ডাক ডেকে ভোলাকে ভয় দেখিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করে। ভোলা ভয় পায়, ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু আবার জেগে উঠে কাঁদতে থাকে।

সুরভি তো আর নেই, তাই ভোলার দুধও আজ জোটেনি। একবেলা শুধু ভাত খেয়েছে ভোলা, এ বেলা তাও নয়। হয় খিদে পেয়েছে, নয় পেট কামড়াচ্ছে। যাই হোক না কেন, সান্ত্বনা না মানলে নিরন্ন শিশুভবনের এই গভীর রাত্রে ওকে বাঘের ডাক ডেকে ভয় দেখানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

নিজের ঘরে শুয়ে সোমাও ঘুমোতে পারে না। ভোলার কান্নার মধ্যে যেন একটা অলক্ষুনে ভয় মিশে রয়েছে, রাতটাই মাঝে মাঝে কেঁদে উঠছে মনে হয়।

একবার শুধু শোনা গেল, সদানন্দ বিড়বিড় বকতে বকতে চলে যাচ্ছে, কদিন থেকে ওর মাথা খারাপ হয়েছে। সদানন্দও যেন ভয় পেয়ে এই রাতের নাগাল থেকে বাইরে পালিয়ে গেল। আবার ভোলা কেঁদে ওঠে।

সোমা বিছানা ছেড়ে ওঠে। ভয় পেয়ে নয়, ভোলার উপর একটা অলক্ষুনে মমতার টানে আজ নিজের ঘরে থাকতে পারছিল না সোমা। ধীরে ধীরে শিশুভবনের বড় ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়। হাত বাড়িয়ে জনার কোল থেকে ভোলাকে তুলে নিয়ে কোলে করে বসে সোমা। আদর করে সান্ত্বনার সুরে গান করে, ভোলাকে যেন তার নিজের অজ্ঞাতসারে এক অলক্ষুনে মমতা দিয়ে থাপড়ে থাপড়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করে সোমা। ভোলা ঘুমিয়ে পড়ে।

জনা নিষ্পলকভাবে তাকিয়ে থাকে একবার সোমার দিকে, একবার ভোলার দিকে। দেখতে দেখতে ওর চোখের আশা যেন ধীরে ধীরে মিটে আসে। এতদিন পরে যেন ঠিক জায়গাটিতে জনা তার জীবনের দায় ভোলাকে সঁপে দিতে পেরেছে। এইবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে জনা।

শিশুভবনের প্রদীপ খুবই ক্ষীণ হয়ে জ্বলে। সবাই ঘুমোয়, শুধু ঘুমন্ত ভোলাকে কোলে করে একা জেগে বসে থাকে সোমা। এতদিন পরে, এই নিস্তব্ধ ভয়ার্ত রাত্রির শিশুভবনে সোমাকে সত্যিই গুরুমার মত দেখায়।

বড় নিস্তব্ধ রাত, রাতভিখারী কানা ফটিকের কণ্ঠস্বরও কাঞ্চীপুরের অন্ধকার সইতে না পেরে কোথায় সরে গিয়েছে কে জানে।

কিসের শব্দ? আঙিনার উপর একসঙ্গে অনেকগুলি ভারি ভারি জুতোর শব্দ, অনেকগুলি টর্চের আলো দৌড়াদৌড়ি করছে, তার সঙ্গে রকমারী সুরের শিস।

সোমা একটা ঠেলা দিতেই তারার মা উঠে বসে। বদ্ধ জানলার উপর কান পেতে শোনে, সাবধানে একটু ফাঁক করে দেখে, তারপরই এক লাফে সরে এসে ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নিভিয়ে দেয় তারার মা। কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলে—তোমার ঘরে কতগুলো গোরা ঢুকেছে গুরুমা।

তারার মা সোমাকে দু হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। এক মহানরকের আক্রমণ থেকে সোমাকে বাঁচাবার জন্য যেন তারার মার দুঃখজীর্ণ চাকরানির শরীরটা অন্তত আজকের মত যেন পাথরের বর্ম হয়ে উঠতে চাইছে।

সোমা আস্তে একটা আর্তনাদ করে—মাগো!

মনে হয় আর্তনাদ নয়, শিশুভবনের বিনা মাইনের এই দাসীটিকেই আজ এতদিন পরে সত্যি নামে ডাকতে পেরেছে সোমা।

তারার মা সোমার হাত ধরে ব্যস্তভাবে বলে—এস, এখন ঘরে থাকলে বিপদ হবে, পুকুরের পাশ দিয়ে ওপারে নলখাগড়ার জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে পড়ি, চল।

সোমাকে একরকম হাত ধরেই টেনে নিয়ে যায় তারার মা। ঘুমন্ত ভোলা সোমার কোলেই ঘুমোতে থাকে। নারকীয় রাত্রির প্রতি মুহূর্ত ধরে নলখাগড়ার ঝোপে দাঁড়িয়ে সোমা শুধু যেন নিঃশ্বাসের স্পন্দন গুনতে থাকে। গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তলোলুপ জোঁক একসঙ্গে সোমার পায়ের পাতা কামড়ে ধরে। তারার মা সারারাত সোমার পায়ের পাতা থেকে টেনে টেনে জোঁক ছাড়ায়। সোমাকে সব রকম রক্তলোলুপ আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য তারার মা যেন প্রতিজ্ঞা করেছে।

সোমার কোলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই রাত ভোর করে দেয় ভোলা। তারার মা বাইরে বের হয়ে আসে, চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে তারপর ডাকে—চলে এস গুরুমা।

পুকুর ঘাটের কাছে আসতেই তারার মা ও সোমা একসঙ্গে চমকে ওঠে—ঘাটের সিঁড়িতে জলের মধ্যে বসে আছে, ও কে?

অবশ্য দেখে বোঝা যায়, কোন ভয়দেখানো মূর্তি নয়। একটি মেয়ে, কিন্তু কেমন অদ্ভুত তার রকমসকম। ঘাটের সিঁড়িতে জলের মধ্যে কোমর ডুবিয়ে অবসন্নের মত বসে আছে। মাথায় ঝাপটা, কানে টাপ আর গলাতে একটা বিচিত্র রকমের অলঙ্কার।

সোমা ও তারার মাকে ঘাটের কাছে দেখে কোন মেয়ের পক্ষে এমন কিছু লজ্জিত হবার কথা নয়, কিন্তু মেয়েটা তার ভেজা শাড়িটা টেনেটুনে ভাল করে গা ঢাকতে থাকে।

তারার মা বলে—তুমি কে বাছা? এত শীতে জলের মধ্যে বসে আছ?

মেয়েটা বলে—বড় জ্বালা গো বুড়ো মা।

তারার মা—তোমার মুখে এসব কি হয়েছে?

মেয়েটা জলের দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়—সাপে কামড়েছে।

তারার মা একটু কঠোর ভাবেই প্রশ্ন করে—এত ঠাঁই থাকতে তুমি এখানে বসে করছো কি?

মেয়েটা মুখ তুলে একবার সোমার মুখের দিকে, আর একবার ভোলার মুখের দিকে তাকায়। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর বিরক্তভাবে উত্তর দেয়—আমি উঠবো, তোমরা একটু দূরে সর দেখি, আমার লজ্জা করছে।

তারার মা আর সোমা দূরে সরে যেতেই মেয়েটা জল থেকে ওঠে, ভেজা কাপড়টা একটু ভদ্রভাবে গায়ে জড়ায়। তারপর পুকুরের কিনারা ধরে এগিয়ে গিয়ে সারি সারি তালের ছায়া ধরে চলে যায়। তারার মা বলে—মাথা খারাপ।

ভোর হতেই যেন আবার চমকে ওঠার পালা শুরু হচ্ছে। নিজের ঘরে ঢুকতে এখন আর ইচ্ছে করছিল না, বড় ঘরের বারান্দার দেয়ালে হেলান দিয়ে নিঃশব্দে বসে থাকে সোমা। ভোলা আশেপাশে ঘুর ঘুর করে। সোমাকে চমকে দিয়ে শিশুভবনেব আঙিনায় দেখা দেয় প্রবীর ও দুটি বিদ্যার্থী ছেলে, এক বস্তা চাল সঙ্গে নিয়ে।

চমকে উঠলেও, এই চমকে মেঘ কেটে যায়। সোমার সারা মুখটা যেন মেঘমুক্ত প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সোমা হেসে হেসে জিজ্ঞাসা করে—চাল কোথা থেকে নিয়ে এলে?

প্রবীরও হেসে জবাব দেয়—সরকারি রিলিফের চাল।

সোমার মুখটা মুহূর্তের মধ্যে আবার বিষণ্ণ হয়ে ওঠে—সরকারি রিলিফের চাল আমি নেব না।

প্রবীর বলে—এই চাল আমি নিজের হাতে লুট করে নিয়ে আসছি সোমা।

সোমা আর একবার চমকে ওঠে—কি বললে?

প্রবীরের মুখটা অস্বাভাবিক রকমের উগ্র হয়ে ওঠে—আমি আমার দল নিয়ে সরকারি নৌকো আটক করে, তিনটি সরকারি মাথা ফাটিয়ে এই চাল নিয়ে এসেছি সোমা। আমার শিশুভবন উপোস করে আছে, আমি কি এখনো চাল ভিক্ষে পাবার আশায় বসে থাকবো?

সোমা একটু ভেবে নিয়ে শান্তভাবে বলে—আচ্ছা, তাই দাও।

বিদ্যার্থী ছেলেরা চালের বস্তাটা তুলে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। তারার মা খুশী হয়ে বিদ্যার্থী ছেলেদের বলে—আমি এখুনি রান্না চড়িয়ে দিচ্ছি, তোরাও দুটি খেয়ে নিয়ে যাস বাবা।

প্রবীরকে সঙ্গে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকতে আর তেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল না সোমার। ভোলাও পিছু পিছু আসছিল, সোমা ভোলাকে কোলে তুলে নেয়। প্রবীরের চোখ দুটো ঝিক করে হেসে ওঠে।

ঘরের ভিতর ঢুকেই সোমা কিছুক্ষণ আতঙ্কিতের মত দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরটা যেন

বন্যপশুর ধস্তাধস্তিতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে। প্রবীরের নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে সোমা একটু বিস্মিত ভাবেই প্রশ্ন করে--দেখছো, কি কাণ্ড হয়েছে।

প্রবীর নির্বিকার ভাবেই বলে--জানি।

সোমা আরও আশ্চর্য হয়--তুমি জান?

প্রবীর--হ্যাঁ।

কথাটা বলেই প্রবীরের মুখটা ভয়ঙ্কর রকমের কঠিন হয়ে ওঠে।

সোমা বলে--একটি অদ্ভুত ধরনের মেয়ে কোথা থেকে এসে আজ পুকুরঘাটের সিঁড়িতে বসেছিল।

প্রবীর বলে--জানি।

সোমা--এও তুমি জান?

প্রবীর--হ্যাঁ, আজই পথে আসতে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে।

সোমা--মেয়েটি কে?

প্রবীর--সিন্ধু, ভোলার মা। কাল রাত্রে সে এই ঘরেই ছিল।

সোমার বুকটা একবার ধড়াস করে ওঠে, তারপর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে যেন ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে--ভোলার মা এখানে কেন এসেছিল?

প্রবীর--তুমি কি সত্যিই বুঝতে পারছো না সোমা, সে কেন এসেছিল?

সোমা আরও ভয়ার্ত ভাবে প্রবীরের হাত ধরে বলে--আমি কিছুই বুঝতে পারছি না প্রবীর।

প্রবীর--ভোলার মা এসেছিল ভোলার গুরুমাকে রক্ষে করার জন্যে।

সোমা মাথা হেঁট করে মাটির দিকে তাকিয়ে তার ভাবনার সমস্ত শক্তি দিয়ে এই রহস্য বুঝবার চেষ্টা করে। রহস্যটা যেন একটি মূর্ছিত রাত্রির জগৎ, যেখানে রাত-ভিখারী কানা ফটিকও ভয়ে বোবা হয়ে গেছে। সেই অসহায় তমিস্রার সুযোগে পৃথিবীর সব নারীর মনুষ্যত্বকে দংশন করার জন্য রসাতল থেকে কতকগুলি বিষধর যেন শিস দিতে দিতে সোমার ঘরে প্রবেশ করে। কিন্তু এই পৃথিবীরই এক নারকীয়া যেন রক্ষা দেবতার মত সোমার ঘরে দাঁড়িয়ে ছিল। সব দংশন নিজের দেহে বরণ করে কাঞ্চীপুরের অসহায় অন্ধকার থেকে সকল কলুষ হরণ করে সে চলে যায়। তার মাথায় ঝাপটা, কানে সোনার টাপ...।

সোমা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। ভোলাকে বুকের উপর তুলে জড়িয়ে ধরে থাকে। সোমা যেন নিঃশব্দে কারও কাছে মাথা পেতে মার্জনা ভিক্ষা চাইছে। ভোলা যেন একটা চন্দনকাঠের পুতুল। ভোলাকে চুমু খেয়ে, ভোলার গালে মুখ ঘষে ঘষে সোমা যেন বারবার এক শিশু পৃথিবীর শোণিতসৌরভ আহরণ করতে থাকে।

সোমা বলে--আমার ভুল ভেঙেছে প্রবীর, আর আমার ভুল হবে না।

প্রবীরকে উদ্দেশ করে বললেও কথাগুলি যেন সুদূরের এক শুদ্ধা জন্মদাত্রীর মহিমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার মত ধ্বনিত হয়। প্রবীর বলে--শান্ত হও সোমা, ভোলাকে বেশী অবাক করে দিও না।

তারার মা দরজার কাছে এসেও ঢুকতে ইতস্তত করছিল। সোমা জিজ্ঞাসা করে--কি তারার মা?

তারার মা--ভাত হয়ে গেছে, ছোঁড়াটাকে দাও, দুটো খাইয়ে দি। সেই কাল দুপুর থেকে...।

তারার মা ভোলাকে নিয়ে চলে যায়। সোমা প্রবীরকে বলে--না খেয়ে কোথাও যেও না কিন্তু।

প্রবীর একটু বিষণ্ণভাবে হাসে--খাওয়াতে আবার বেশী দেরি করে দিও না। তাহলে খাওয়াও হবে না, আর থাকাও হবে না।

সোমা--তার মানে?

প্রবীর--ওয়ারেণ্ট আর হুলিয়া নোটিশ চারদিকে ওৎ পেতে আছে জান না?

আঙিনায় মচমচ জুতোর শব্দ শোনা যায়। শব্দটা সোমার ঘরের দিকেই আসছে। সোমা প্রবীরের হাত চেপে ধরে চমকে ওঠে। আজ শুধু চমকে ওঠার পালা।

--কই, কোথায় আছেন আপনারা?

যতীদা উদ্‌ভ্রান্তভাবে সোমার ঘরের কাছে এগিয়ে এসে ডাকতে থাকেন। প্রবীর ও সোমা দুজনেই চমকে উঠে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়।

যতীদা চেঁচিয়ে বলতে থাকেন--শুচিকে ফেরত নিয়ে এলাম। এই কটা দিন বাড়িসুদ্ধ লোককে কি জ্বালান জ্বালিয়েছে মশাই, সে আর কহতব্য নয়। খেতে বসলে ভাতের থালা ঠেলে দিয়ে মার সঙ্গে ঝগড়া করেছে, শুতে গেলে ওর বৌদির সঙ্গে ঝগড়া করে মেঝেতে শুয়েছে। হেন তেন উপদ্রবের একশেষ। মা বললেন--যাঃ, ওটাকে দিয়েই আয়। এখানে এসে ইচ্ছে করে না খেয়ে সুঁটকোচ্ছে, ওখানে এমনিতেই না খেয়ে সুঁটকোবে, অগত্যা...।

প্রবীর জিজ্ঞাসা করে--কখন এলেন আপনারা?

যতীদা--এই তো এসে পৌঁছলাম।

সোমা--শুচিদি কোথায়?

যতীদা--ঘরে বসে আছে।

প্রবীর--গাঁয়ের কারও সঙ্গে দেখা হয়নি আপনার?

যতীদা--না, এই তো এলাম। বিনোদদা কই?

সোমা অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। প্রবীর চুপ করে থাকে, যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে নিজেকে কঠিন করে রাখতে চাইছে।

যতীদা একটু সন্দিগ্ধ ভাবে জিজ্ঞাসা করেন--কি ব্যাপার মশাই বলুন তো।

প্রবীর বলে--চলুন।

সোমার বোধ হয় যাবার ইচ্ছা ছিল না, চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। প্রবীর একটু থেমে গিয়ে সোমার দিকে তাকিয়ে যেন ইঙ্গিতে আহ্বান করে। আর দ্বিধা না করে সোমাও অগ্রসর হয়।

কাব্যতীর্থের বাড়ির কাছে এসে যতীদা আর ঘরের ভিতর ঢোকেননি। অপরাজিতার বেড়ার পাশে পাশে ঘুরে বেড়াতে থাকেন, আর মাঝে মাঝে থেমে রুমাল দিয়ে চোখ মুছে সুস্থির হবার চেষ্টা করেন। ভয়ঙ্কর উপকথার মত অবিশ্বাস্য, তবু ঘটনাটা একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্য। অভিশাপের ফাঁদের মত এই অদ্ভুত গাঁয়ের মাটি ছেড়ে পালিয়ে যাবার আগে যতীদা যেন কয়েকটি মুহূর্তকে কোনমতে সহ্য করছেন।

সোমা আর প্রবীর ঘরের ভিতর শুচির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে, কাহিনী শোনাবার জন্য। অনেকক্ষণ হলো গিয়েছে। যতীদা মাঝে মাঝে ছটফট করছিলেন, আর বেশীক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকার সামর্থ্য তাঁর নেই।

কিন্তু আরও অনেকক্ষণ সময় পার হয়ে গেল। ঘরের ভিতর থেকে কান্নার শব্দও এখনও শোনা গেল না। যতীদা অগত্যা এগিয়ে এসে আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর ঢুকলেন।

একেবারে শান্ত হয়ে বসেছিল শুচি। যতীদা বুঝতে পারেন না, কাহিনীটা শোনানো হয়ে গিয়েছে কিনা।

শুচি বলে--দেখলে তো সোমা, কি রকম অদ্ভুত লোক ছিল, আমাকে ছেড়ে একটি দিনও রইল না।

সোমা উত্তর দেয় না, আঁচলটা মুঠো করে ধরে মুখ চেপে দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রবীর বলে—বিনোদদার একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি বৌদি। জানি না আপনি কি মনে করবেন।

শুচি—সব বল প্রবীর ঠাকুরপো, পুণ্য কথার সবটুকু শুনে নিয়ে আমি চলে যাই।

প্রবীর—শেষ সময়ে আমিই তাঁর মুখে জল দিয়েছি, তিনি চেয়েছিলেন।

শুচির মুখটা অদ্ভুত রকমের একটা হাসির আভায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—তুমি দেবে না তো আর কে দেবে প্রবীর ঠাকুরপো? তুমি তো ওরই ভাই।

শুচিদি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলেন—আমার ভুল ভেঙেছে প্রবীর ঠাকুরপো। আমি জানতাম একদিন ভাঙবে, ওর কথা তো মিথ্যে হবার নয়।

যতীদা গম্ভীরভাবে ডাক দেন—চল শুচি।

শুচি ওঠে—যাই দাদা।

যাবার আগে ঘরের ভিতরে চারদিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজতে থাকে শুচি। নিয়ে যাবার মত কি এমন মূল্যবান বস্তু আছে এখানে, যেখানে ভরাকুল থানার লোভী পুলিসও তল্লাসী করে নেবার মত কিছু পায়নি? দেয়ালের একটা খোপে আয়নাটা এখানে পড়ে আছে। আয়নার বুকে সিঁদুরের সামান্য একটু গুঁড়ো এখনো লেগে রয়েছে, সেদিন চলে যাবার আগে শুচি যেমনটি রেখে গিয়েছিল, ঠিক তেমনটি।

শুচি আস্তে আস্তে এগিয়ে ঘরের কোণ থেকে একজোড়া খড়ম তুলে নিয়ে আঁচলে বাঁধে। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়, শান্তভাবে একটি কথায় যেন সমস্ত কাঞ্চীপুর থেকে তার চিরবিদায় ধ্বনিত করে শুচি বলে—চল দাদা।

চলতে চলতে শিশুভবনের কাছাকাছি এসে শুচি কি ভেবে নিয়ে একবার থামে। সোমার মুখের দিকে সস্নেহভাবে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর ডাকে—সোমা।

সোমা—বলুন শুচিদি।

শুচি—তুমি এখানেই থাকবে? যাবে না?

সোমা—না শুচিদি।

শুচির মনের ভিতর বোধ হয় সোমার জন্য ক্ষণিকের মত একটা গভীর মমতার আলোড়ন চলছিল। শেষ পর্যন্ত সঙ্কোচ কাটিয়ে বলে ফেলে—এখানে তুমি আর কোন্ আশায় পড়ে থাকবে সোমা?

সোমা গম্ভীর হয়ে বলে—আপনি কোন্ আশায় এতদিন এখানে পড়েছিলেন শুচিদি?

শুচি আঁচল বাঁধা খড়মজোড়া দেখিয়ে দিয়ে বলে—এরই আশায়।

সোমার মনের ভিতরটা হঠাৎ শিউরে ওঠে। একটু সংযত হয়ে নিয়ে বলে—এত বড় আশা আমি করি না শুচিদি। এত বড় পুণ্য বইবার শক্তি আমার নেই। আমার আশা খুবই ছোট শুচিদি, তবু তারই জন্যে পড়ে থাকবো।

একবার সোমার মুখের দিকে, আর একবার প্রবীরের মুখের দিকে তেমনি সস্নেহ দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে নিয়ে শুচি আবার শান্তভাবে হাসে—তোমার আশা পূর্ণ হোক ভাই।

—যাই। শুচি কাঞ্চীপুরের দিক থেকে দৃষ্টি তুলে নিয়ে সামনের সড়কের দিকে তাকায়। যতীদার পিছু পিছু হেঁটে গেলেও শুচিকে দেখে মনে হয়, একেবারে একা একা সে আজ এই পৃথিবীর পথে হেঁটে চলেছে।

শিশুভবনে ফিরে এসে সোমা আর প্রবীর দুজনেই কিছুক্ষণের জন্য যেন একটা শূন্যতার মধ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকে। সোমা ঘরের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে থাকে, কিন্তু গভীর স্বপ্নের বস্তুহীন কাজের মত এই কাজের কোন শব্দ হয় না। বিদ্যার্থী ছেলেরা খেয়েদেয়ে প্রবীরের অপেক্ষায় চুপ করে বসে ছিল। প্রবীরও নিঃশব্দে খেয়ে এসে আবার আঙিনার

চারদিক ঘুরে বেড়ায়। এই শূন্যতার মধ্যে শিশুভবনের প্রাণটাই শুধু যেন একটা অভ্যাসের জোরে নড়েচড়ে বেড়ায়, কিন্তু শব্দ করে না।

এর মধ্যে একমাত্র ভোলা আবোলতাবোল ভাষায় একটু সাড়া জাগিয়ে টলতে টলতে হেঁটে সোমার ঘরের কাছে এসে দাঁড়ায়, হামা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে চেষ্টা করে। সোমা ঘর থেকে বের হয়ে এসে ভোলাকে তুলে নিয়ে খাটের উপর বসিয়ে রাখে।

তারপরেই, শিশুভবনের এই নিঝুম মনটাকে যেন খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলবার জন্য তারার মা এসে সোমার ঘরে ঢুকে একটা সংবাদ দেয়।--জনা চলে গেছে!

সোমা চিৎকার করে--জনা চলে গেছে?

তারার মা--হ্যাঁ।

সোমা--কেন?

প্রবীরও আশ্চর্য হয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে--জনা চলে গেল কেন?

আশ্চর্য হবারই কথা। আজ তো জনাকে চলে যেতে বাধ্য করবার মত কোন ঘটনা হয়নি বরং এক বস্তা চাল এসেছে। জনা নিজেই ঘুম থেকে উঠে স্বচক্ষে দেখেছে যে, তারার মা রান্না আরম্ভ করে দিয়েছে। তবু জনা চলে গেল কেন?

সোমার গলার স্বরে তার গভীর অভিমান যেন আক্রোশের মত বেজে ওঠে--এই একরত্তি মেয়েটা আমাকে এতদিন ধরে জ্বালিয়ে আজ পালিয়ে গেল কেন? ওকে ধরে নিয়ে এস, যেখানেই থাকুক।

প্রবীর একটু আশ্চর্য হয়ে হাসে--তুমি কার ওপর এত রাগ করছো?

সোমা--এতদিন ধরে রইল, জেদ ধরে একটা ক অক্ষর পর্যন্ত শিখল না। একরত্তি মেয়ে সবাইকে এমন তুচ্ছ করে চলে যাবে...।

সোমার উচ্ছ্বসিত ক্ষোভ হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে যায়, আর কিছু বলতে পাবে না।

তারার মা ধীরে ধীরে কতগুলি কথা বলে এই মুখর গবেষণার চাঞ্চল্য ধীরে ধীরে শান্ত করে আনে--ও ছুঁড়ি তো আর ভাত খাবার জন্যে এখানে পড়ে ছিল না। ক অক্ষর শেখবার জন্যেও নয়।

সোমা--তবে কিসের জন্যে?

তারার মা--ভোলার জন্যে। ভোলাকে তুমি কোলে নিয়েছ গুরুমা, ছুঁড়িও নিশ্চিন্তি হয়ে চলে গেছে।

তারার মা আবার সবাইকে স্তব্ধ করে দিয়ে চলে যায়। অনেকক্ষণ পরে এই স্তব্ধতা ভাঙে।

প্রবীর বলে--এবার আমি যাই সোমা, আর দেরি করা চলে না।

সোমার অন্তরাত্মা যেন অবসন্ন হয়ে আছে, তাই প্রবীরের কথায় আর চমকে উঠতে পারে না। শান্তভাবে একটু অনুরোধ করে--এখনই যাবে?

প্রবীর--হ্যাঁ সোমা।

সোমা--আর কতদিন এভাবে চলবে বলতে পার?

প্রবীর--কি?

সোমা--এই চলে যাবার পালা।

প্রবীর--আমি তো চলে যাই না সোমা, গিয়ে আবার আসি।

সোমা--তোমার কথা নয়, এই কাঞ্চীপুরের, এই শিশুভবনের কথা বলছি। এমন করে এত শীগগির ভাঙন ধরবে, এ আমি বুঝতে পারিনি প্রবীর।

প্রবীর কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবে, যেন নিজের মনের ভিতর যত ধাঁধা থেকে খুঁজে খুঁজে একটা উত্তর উদ্ধার করে নিয়ে বলে--ভেঙে যাওয়াও বোধহয় একটা নিয়ম সোমা, এর

দরকার আছে।

সোমা--কিন্তু কি ভয়ঙ্কর নিয়ম!

প্রবীর সোমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে থাকে, পরমুহূর্তেই সে দৃষ্টি উচ্ছ্বল মমতায় ভরে ওঠে।--এত ভয়ঙ্করকে সহ্য করতে বড় কষ্ট হচ্ছে সোমা।

সোমা--হ্যাঁ। আর সহ্য করতে পারছি না।

প্রবীর--তুমি তো এখন এখান থেকে চলে যেতে পার সোমা।

সোমা--তুমি যেতে বলছো?

প্রবীর--আমি বলছি না।

সোমা--আমি যাব না।

প্রবীর হাসতে থাকে--আচ্ছা, আপাতত আমি তো যাই।

সোমা--একটু দাঁড়াও, একটা কথা বলবার আছে।

প্রবীর--বল।

সোমা তার যুক্তিবুদ্ধির সমস্ত শক্তিগুলিকে গুছিয়ে নিয়ে প্রবীরকে একটা দুঃসাধ্য অনুরোধ করার জন্য প্রস্তুত হয়।

সোমা জিজ্ঞাসা করে--তুমি বলেছিলে, তুমি নরসিংহের ভক্ত।

প্রবীর--হ্যাঁ।

সোমা--তুমি বলেছিলে, তুমি কাব্যতীর্থের শিষ্য।

প্রবীর--হ্যাঁ।

সোমা--এই দুই একসঙ্গে কি করে সম্ভব হয়? কাব্যতীর্থের শিষ্য হয়ে মানুষকে এত ভালবাস, আবার নরসিংহের ভক্ত হয়ে মানুষকে মারতে তোমার বাধে না। এ আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না প্রবীর।

প্রবীর শান্তভাবে গভীর আগ্রহে সোমার কথাগুলি শুনতে থাকে। সোমা আবার বলে--আমি বিদ্যের জোরে তোমাকে কিছু বোঝাতে চাই না প্রবীর, সে সাধ্য আমার নেই। কিন্তু মনে হয়, তুমি তো সেই পুরাণের ক্ষমাময় নরসিংহভক্তের মত নও, বরং তার উলটো। তুমি নিজে নরসিংহ হয়ে প্রতিশোধ নিতে আর প্রতিহিংসা মেটাতে ছুটে বেড়াচ্ছ। এটা কি ঠিক হচ্ছে?

প্রবীর--তুমি আমাকে কি বোঝাতে চাইছো সোমা?

সোমা--আমার অনুরোধ, তুমি নিজে ভয়ঙ্কর হয়ে মানুষের মাথা ফাটিয়ে বেড়িয়ো না।

প্রবীর হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে--মতিগঞ্জের এস. ডি. ও., ভরাকুল থানার পুলিস, গোরার দল আর মানিক চৌকিদার, এরা মানুষ? এদের ক্ষমা যারা করে তারাই মানুষ নয় সোমা।

প্রবীরের মুখটা বড় কঠোর, ও বড় হিংস্র হয়ে ওঠে--প্রতিশোধ ছাড়া কোন কাজের কথা আমি এখন ভাবতে পারি না সোমা। যেমন করে পারি, যেখানে পাই যতটুকু শক্তি আছে তাই দিয়ে তাদের মারবো, আমাকে যারা প্রতিদিন মারছে, আমার সব ভেঙে দিয়ে যাচ্ছে। এখন কি আমি বসে বসে ধ্যান করে আমার ভুল খুঁজবো সোমা?

সোমার শান্ত ও অবিচল মূর্তিটা তেমনি নিষ্পলকভাবে তাকিয়ে শুধু প্রবীরের এই জ্বালাভরা বিলাপ সহ্য করতে থাকে।

প্রবীর একটু শান্ত হয়, চোখ দুটো তবু নিষ্কম্প শিখার মত জ্বলে।--যদি ভুল হয়েও থাকে, নিজে থেকেই সে ভুল ভাঙবে। কিন্তু আমি ভেবে ভেবে এ ভুল ভাঙতে চাই না, বরং চাই আমার ভুলও ভয়ঙ্কর হয়েই ভাঙুক।

প্রবীর চলে যায়।

মাত্র কদিন হলো অমাবস্যাটা পার হয়েছে। দূর ঠাকুরপুরের বিলের পশ্চিম কিনারায় জলের রেখার সঙ্গে টুকরো চাঁদের শীর্ণ আলোর রেখা মিশে রয়েছে। এখানে একটা বাঁশবনের বুকে অন্ধকার এখনো বাঁধা পড়ে আছে। শ্যামনগরের বাজার থেকে রাস্তাটা এতদূর এসে, এই বাঁশবনের ওপিঠে একটু বেঁকে গিয়ে বরাবর ভরাকুল থানা পর্যন্ত চলে গিয়েছে। অল্প বাতাসে বাঁশের শরীরগুলি মট মট করে মোচড় দেয়। আর মানিক চৌকিদার প্রবীর মাস্টারের পা দুটো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে, মৃত্যুভীত শজারুর মত আর্তনাদ করে।

স্যাঁতসেঁতে মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে ছিল মানিক চৌকিদার, সমস্ত শরীরটা কাদায় মাখা। পা দুটো দড়ি দিয়ে বাঁধা। তিনজন গাঁয়ের লোক দাঁড়িয়েছিল মানিক চৌকিদারের চারদিক ঘিরে, মৃত্যুর ফাঁদের মতই। দুজন চাষী ছেলে আর সদানন্দ। সদানন্দের হাতে একটা কাটারি।

অমাবস্যার রাত্রিটা থেকে আরম্ভ করে এই কটা দিন প্রতি রাত্রে গাছের মাথায় চড়ে বিনিদ্র শিকারীর মত পাহারা দিয়ে মাত্র গতকাল এই নিশাচর অভিশাপের ছায়াকে কায়াসুদ্ধ ধরতে পারা গিয়েছে। কাল রাত থেকে আজ সারাদিন ও সন্ধ্যা পর্যন্ত এই বাঁশবনের ভিতরেই মানিক চৌকিদারকে হাত পা ও মুখ বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছিল। চাষী ছেলেরা আজ সারাদিন ধরে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রবীর মাস্টারকে খুঁজে বেড়িয়েছে। মাত্র এই সন্ধ্যারই কিছু পরে পাগলা বাউল অভিরামের ঘর থেকে প্রবীর মাস্টারকে ডেকে নিয়ে কিছুক্ষণ আগে তারা পৌঁছেছে। বিচার চাই। গ্রামজীবনের শান্তির শত্রু, কলুষের ছায়া, গোরা লম্পটের দালাল, কোতোয়ালীর গোপন দূত মানিক চৌকিদারের বিচার চাই।

সদানন্দ বলে—এর আর বিচার কি মাস্টার মশাই? বিচার হয়েই আছে, আপনি শুধু দেখে নিয়ে সরে যান।

সদানন্দ মানিকের একটা হাত ধরে নির্মমভাবে হেঁচকা টান দেয়। মানিক মাটিতে মুখ ঘষে আরও শক্ত করে প্রবীরের পা জড়িয়ে ধরে।

সদানন্দ অস্থির হয়ে ওঠে—আপনি ওকে একটা লাথি মেরে পা ছাড়িয়ে সরে যান মাস্টার মশাই।

মানিক চৌকিদার এইবার কাদা মাখা মাথাটা দিয়ে প্রবীরের পা চেপে ধরে। প্রবীর মাস্টার কঠিন পাষাণের অনড় স্তম্ভের মত অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সদানন্দ ছটফট করে কাটারি হাতে একটু পিছিয়ে যায়। চাঁদের আলো কাটারির পালিশে পড়ে একবার ঝক ঝক করে ওঠে। দূর বিলের কিনারায় জলে ডোবা কাশবনের ভিতর অকারণে ডাহুক ডাকে।

সদানন্দ এক লাফ দিয়ে আবার এগিয়ে এসে বলে—আপনি ঠিক অমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন মাস্টার মশাই, একটি কথাও বলবেন না। ওর বিচার হয়েই আছে, এবার ওকে নিয়ে গিয়ে ছুটি করে দিয়ে আসি।

কি এক ভয়ঙ্কর আহ্লাদে অধীর সদানন্দ, তবু কয়েক মুহূর্তের মত নিজেকে একবার সংযত করে। প্রবীর মাস্টারের দিকে হাত জোড় করে যেন কাতর প্রার্থনার মত স্বরে বলে—আমি দেবতার চোখ উপড়ে নিয়েছিলাম, তাতেও আপনি একটুও রাগ করেননি। আর এই পশুর পশুটাকে গলার নলি ছিঁড়ে ওকে ছুটি করে দেব, তার জন্য আপনি এত ভাববেন কেন মাস্টার মশাই?

প্রবীর মাস্টার তেমনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। আবছা আলোকিত এই বনান্ধকারে বাতাসের কতগুলি উৎপীড়িত ছায়া যেন ছটফট করে ঘুরে বেড়ায় আশেপাশে। সাপের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত একটা মুখের বেদনার্ত প্রতিচ্ছায়া যেন এক মহাবিচারালয়ের কাছে তার নিগ্রহের প্রতিশোধ দাবি করে ফিরছে।

সদানন্দ বলে--আপনি আর 'না' করবেন না মাস্টার মশাই। জীবনে আমাকে একটা ভাল কাজ করতে দিন...এবার নিয়ে যাই।

মানিক চৌকিদারের গলায় একটা গামছা জড়িয়ে টেনে তোলে সদানন্দ। চাষী ছেলে দুজন পা দুটো শক্ত থাবা দিয়ে আঁকড়ে তুলে ধরে। নিশাচর ছায়ার কায়াকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলে যায় ও ঠাকুরপুরের বিলের কিনারায় কাশবনের দিকে।

প্রবীর মাস্টার নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে।

সদর মতিগঞ্জের বিকার নেই। সুধাময় ঠাকুরের পাটে বিস্মৃত বৈষ্ণব রাজার শ্রীস্তম্ভ তেমনি বিদেশী সৈনিকের তাঁবুর সঙ্গে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি দুপুরে ব্যাঙ্কের দরজা নিয়মিত খোলে, প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত বন্ধ হয়। সিনেমা ভবনের সামনে জনতার মেলা নিয়ম মতই চলে। জ্বালামুখীর আঁচও লাগে না, এমনই কঠিন খোলস দিয়ে ঢাকা সদর মতিগঞ্জের শরীর। বিপ্লবে প্লাবিত হয়েও যায়নি, এমনই পোক্ত ভিৎ। এত রুধিরাক্ত পলিটিক্সে দীক্ষিত মতিগঞ্জের রাজপথে এক ফোঁটা রুধিরের চিহ্নও দেখা দিল না, আশ্চর্য! ত্যাগের আহ্বানে মতিগঞ্জের একটি নস্যির কৌটোও নিলামে বিকিয়ে গেল না, এটাও আর এক বিস্ময়। অথচ এই মতিগঞ্জই তো জেলার দেশপ্রেমের সদর, জাতীয়তার হেড অফিস এবং ত্যাগী ও বিপ্লবী, দুই নেতাও কারাগার ছেড়ে অনেকদিন হলো সুস্থভাবে ফিরে এসে ঘরে ঢুকেছেন।

অবশ্য জেলে যখন ছিলেন, তখন মতিগঞ্জের এই বিখ্যাত নেতা দুজন চুপ করে ছিলেন না। সাধ্যমত জেলের ভিতর থেকেই সংগ্রাম করেছেন। সরকারি ভাতা বাড়াবার জন্য প্রতিদিন দরখাস্ত করে ভৈরববাবু এক অবিরাম সংগ্রাম আরম্ভ করেছিলেন, আর নয়ন শুরু করেছিল এক সবিরাম সংগ্রাম, জেল কর্তৃপক্ষকে ঘন ঘন অনশনের নোটিশ দিয়ে। কিন্তু সংগ্রাম ঘোরতর হয়ে ওঠবার আগেই পর পর সাত দিনের মধ্যে দুজনেই নিজের নিজের অট্টালিকার কোলে ফিরে এলেন। তার পরেও তো ক'মাস হয়ে গেল, মতিগঞ্জের লোক দুটো পরামর্শের জন্য উদ্বাস্ত হয়ে উঠলেও দুজন নেতার একনজরেও নাগাল পায় না। কারণ, নয়ন ভয়ানক রকমের অসুস্থ এবং ভৈরববাবু নাকি যোগশাস্ত্র অধ্যয়নে ব্যাপৃত।

কোথায় কাঞ্চীপুর আর কোথায় মতিগঞ্জ! তবু জেলা গেজেটিয়ারে বলে, কাঞ্চীপুর নাকি মতিগঞ্জের অধীন একটি গ্রাম। কিন্তু কি করে বিশ্বাস করা যায়? দুঃখের সমুদ্র হলো সুখের গোষ্পদের অধীন? আত্মোৎসর্গের হিমগিরি হলো স্বার্থের উইঢিপির অধীন? কাঞ্চীপুরের অগ্নিপরীক্ষার জ্বালা হলো মতিগঞ্জের মিটমিটে জাতীয়তার জোনাকী আলোর অধীন?

মতিগঞ্জ আর কাঞ্চীপুর--সদর আর গ্রাম। কিন্তু যেন দুই ভিন্ন পৃথিবীর মাটি দিয়ে তৈরী দুটি অনাত্মীয় জনপদ। একটি অক্ষত, একটি বিধ্বস্ত। কাঞ্চীপুরের বেদনার কোন প্রতিধ্বনি মতিগঞ্জে পৌঁছায় না, গত ক'মাসের ঘটনায় এই সত্যই প্রমাণিত হয়েছে।

শুধু সখের রূপকথার মত মতিগঞ্জের জনসাধারণের কানে কানে কাঞ্চীপুরের কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে। শুনতে বেশ লাগে—কাব্যতীর্থের কথা, প্রবীর মাস্টার ও তার ঝঞ্ঝাবাহিনীর কথা এবং আর এক রহস্যময়ী সংগ্রামিকা সোমা রায়ের কথা। মতিগঞ্জের কাছে কাঞ্চীপুর মাত্র একটা কৌতূহল, একটা সুখশ্রাব্য কিংবদন্তী।

এইজন্যই ভৈরববাবু মাঝে মাঝে খুবই চিন্তিত হয়ে উঠছিলেন। আগামী নির্বাচনে জেলা বোর্ডে ঠাঁই পাওয়া দূরের কথা, মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনেও নয়নের কাছে তার পরাজয় অবধারিত। কাঞ্চীপুরের এইসব কিংবদন্তীর জ্যান্ত নায়ক আর নায়িকাগুলি একবার যদি মতিগঞ্জের লোকের চোখের উপর এসে নয়নকে সমর্থন করে একটা পোস্টার আর দুটো ইস্তাহার ছাড়ে, তাহলে কি আর রক্ষা আছে? নয়নের সঙ্গে ভোটের লড়াইয়ে কোথায় যে

তলিয়ে যেতে হবে, সেই আশঙ্কায় মাঝে মাঝে খুবই পীড়িত হতে থাকেন ভৈরববাবু।

নয়ন চৌধুরীও বিমর্ষ হয়ে আছে। গ্রাম সেবামগুলের সঙ্গে সব সম্পর্ক কবেই তো চুকিয়ে দিয়েছে। তার জনপ্রিয়তার প্রধান বেদী থেকেই সে স্খলিত হয়ে আছে। অথচ দিন এগিয়ে আসছে, ইংরাজের রাগ ক্রমেই পড়ে আসছে, জেলা বোর্ডের নির্বাচনও আসন্ন হয়ে আসছে। তার উপর ভৈরববাবুও জেলের বাইরে সশরীরে ও সকৌশলে বোধ হয় এই আসন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য তৈরী হচ্ছেন।

এত নিরাশার অন্ধকারেও নয়নের মনে একটি আশার প্রদীপ জ্বলতে থাকে—সোমা রায়। একটি দিনের দেখা সেই প্রথম পরিচিতার স্মৃতি তার এই নিভৃত বন্দিত্ব ও কর্মহীন অবসরের মধ্যে আরও প্রখর হয়ে ওঠে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সে মেয়ে আজ এমন এক দূর দুর্গের ভিতরে লুকিয়ে আছে, যেখানে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে আনবার সামর্থ্য নয়নের নেই। কিন্তু আজ না হোক, একদিন সে আসবে। তার আমন্ত্রণের ব্যাকুলতার মর্মটুকু উপলব্ধি করতে পারবে না, এত অল্পবুদ্ধির মেয়ে তো সে নয়। এত কোমল চিবুক দিয়ে গড়া যার মুখ, তার মনে অকৃতজ্ঞতা থাকতে পারে না।

একটা দিনের অল্পক্ষণের পরিচিতা হলেও সেই তো সোমা, যাকে নয়ন চাকরি দিয়ে কাঞ্চীপুরে পাঠিয়েছিল, যার মা-বোনের জন্য প্রতিমাসে নিয়মিত টাকাও পাঠিয়ে যাচ্ছে। সেই মেয়েই আজ মতিগঞ্জের ঘরে লোকের মুখে রূপকথার নায়িকা হয়ে উঠেছে। সোমার মায়ের কৃতজ্ঞতার স্বাক্ষরে ভরা চিঠিগুলি নয়নের টেবিলের দেরাজে ভরে রয়েছে। সোমার নামে লেখা সোমার বাড়ির চিঠিগুলিও তারই ঠিকানার অধীনে এসে জমে রয়েছে। এই ঠিকানাকে চিরজীবনের মত স্বীকার করে নিতে সোমা কি আপত্তি করবে?

একটি চিঠি দেওয়া যায় না, একটি চিঠিও আসতে পারে না, এই অবরুদ্ধ কাঞ্চীপুরের দুঃখের প্রশ্রয় ছেড়ে কবে যে রূপকথার নায়িকা এসে এই চৌধুরীভবনের প্রদীপ হয়ে উঠবে, কে জানে! সোমার মা শেষ যে-চিঠিটা নয়নকে লিখেছেন, তার মধ্যে একটা আশ্বাসের আভাস আছে। 'সোমার শুভাশুভের জন্য আপনি দায়ী...যে কোন ভাবেই হোক ওকে ঐ জঘন্য জায়গা থেকে উদ্ধার করবেন, এই আমার অনুরোধ...এ দুর্দিনে আপনি যে উপকার করলেন তার ঋণ কখনো শোধ করা যায় না।'

সোমার মায়ের লেখা অনুরোধগুলি পড়তে পড়তে নয়নের মনটা নিজের কাছেই বড় ছোট হয়ে যায়। নিজের দুঃখভীরু মনের ক্ষুদ্রতাকে অন্তত এই নিভৃতের চিন্তায় চাপা দিতে পারে না নয়ন। যাকে এখনি উদ্ধার করে আনা উচিত, তার অপেক্ষায় সে শুধু চুপ করে বসে আছে। যে তার জীবনের কামনার এত সন্নিকটের মূর্তি, তারই কাছে এগিয়ে যাবার সাধ্য হচ্ছে না।

পিসিমাও মনের অশান্তি ও উদ্বেগের মধ্যে মাসের পর মাস ছটফট করছিলেন। নয়নের উপযুক্ত পাত্রীও যখন আবিষ্কৃত হয়েছে এবং নয়নেরও যখন এই পাত্রীকে মনে ধরেছে এবং পাত্রীর মাও যখন সম্মতি দিয়েই রেখেছেন, তখনও তাঁকে সব উৎসাহ স্তব্ধ করে দিয়ে এমনভাবে বসে থাকতে হবে, এটা তিনি কল্পনা করতে পারেননি। এটা নিতান্তই দুর্ভাগ্য। আর মেয়েটারই বা কি দুর্ভাগ্য? আহা, একবার চলে আসতে পারলে হয়। অল্প বয়সে চাকরি করতে এসে কোথায় এক খুনোখুনি আর রক্তারক্তির জগতে গিয়ে আটক হয়ে রইল মেয়েটা!

নয়নের জীবনের সব জয় নেতৃত্ব প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যৎ যেন সোমা রায় নামে সেই একটি দিনের পরিচিতার অভ্যাগমনের শুভ মুহূর্তটির সঙ্গে মিশে রয়েছে। দূরপরাহতার পথ চেয়ে বসে আছে নয়ন, সর্বস্ব দিয়ে অভ্যর্থনা করার জন্য। কিন্তু গৃহপ্রান্তের এই নিরালাতেই দাঁড়িয়ে, এগিয়ে গিয়ে নয়। এগিয়ে যেতে পারে না, পুলিসের নিষেধ আছে।

হঠাৎ এই মতিগঞ্জ শহরেই একটি সরকারি কক্ষে এক সন্ধ্যায় একটি বিস্ময় প্রতিধ্বনিত হয়—অ্যাঁ, এ যে দেখছি তারকদার মেয়ে।

কোতোয়ালীর দপ্তরে বসে ফাইল ঘেঁটে রিপোর্ট পড়ছিলেন ডি-এস-পি। ডি-এস-পি হলেন একজন শ্রীযুক্ত দত্ত, তিনি শুধুই যে একটি সরকারি প্রাণী, তা নয়। কোতোয়ালী ছাড়াও তাঁর জীবনের একটা আদর্শ আছে। তিনি কায়স্থ আন্দোলনের একজন প্রগাঢ় সমর্থক।

ভরাকুল থানার প্রেরিত বিবরণ পড়তে পড়তে সম্মুখের আলোটার দিকেই বার বার ভ্রূকুটি করছিলেন ডি-এস-পি দত্ত। সোমা রায়ের ডায়েরীটা তাঁর চোখের সম্মুখে এক ভয়ংকর জাতহারানো অধঃপতনের নির্লজ্জ স্বীকৃতির মত পড়ে রয়েছে। কিন্তু এই সোমা তো আর পাটনীর মেয়ে নয়, তাঁরই জ্ঞাতি তারকদার মেয়ে, বংশোত্তম কায়স্থের মেয়ে। সেই মেয়েকে বন্দী করে রেখেছে কুৎসিত এক জলচলহীন অস্পৃশ্য ষড়যন্ত্র। ডি-এস-পি'র মূর্তিটা বার বার উত্তেজিত হয়ে ক্রমেই যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল।

তারকদাকে বিশ বছর আগে একবার দেখেছিলেন ডি-এস-পি শ্রীযুক্ত দত্ত। গত বিশ বছরে তারকদার নামটা দুবারও মনে পড়েছে কি না, তাও তিনি বলতে পারবেন না। তারকদা যে আর ইহজগতে নেই, সেটা তিনি আজই জানতে পারলেন, ভরাকুল থানার প্রেরিত রিপোর্টের মধ্যে। সোমাকে তো জীবনে কোনদিনই দেখেননি, সোমা নামে একটা অস্তিত্বের খবরও তিনি জানতেন না। জানার দরকারও ছিল না। কিন্তু এতদিন ধরে সম্পর্কটা নিঃশব্দ হয়ে থাকলেও আজ সেটা বড় জোরে বেজে উঠেছে, আকস্মিক এই আঘাতে। তাঁর জাতের মর্যাদা কলঙ্কিত হতে চলেছে, কি করেই বা ধৈর্য ধরে থাকবেন?

কিন্তু উপায়ই বা কি আছে? যে-ইংরাজের উপর কোনদিন তাঁর রাগ হয়নি, আজ প্রথম সে-ইংরাজের উপর রাগ হয়। ভারতরক্ষা আইনটাকে নিতান্ত সংকীর্ণ ও অক্ষম বলে মনে হয়। এর মধ্যে সব রকম রক্ষাকর অর্ডিন্যান্সের সুযোগ রেখেও তাঁর জাত নিরাপদ করার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেন্ট একটা সুযোগও রাখেননি।

সবচেয়ে বেশী রাগ হয়, স্বদেশীওয়ালা নেতাগুলোর উপর। কাপুরুষগুলো স্বদেশী কববার আর কাজ পায় না? আড়কাঠির মত কোথা থেকে একটা ভদ্রঘরের মেয়েকে ধরে এনে পাঠিয়ে দিয়েছে কাঞ্চীপুরের মত অজ পাড়াগাঁয়ে, এক অনাথ আশ্রমের শিশু পালন করতে? মেয়েটার জাত গেল কি রইল, তার জন্য এই নেতাগুলোর কি এক ফোঁটাও দরদ আছে?

তারকদার মেয়ে! প্রতিধ্বনিটা যেন কোতোয়ালী ছেড়ে সেই সন্ধ্যাতেই ছুটে গেল ভৈরববাবুর বাড়িতে। ডি-এস-পি শ্রীযুক্ত দত্ত এসে নানা কথার পর চ্যালেঞ্জ করলেন ভৈরববাবুকে—মানুষের জাত নষ্ট করে আপনারা স্বদেশী করতে পারবেন না। মেয়েটাকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করুন।

ভৈরববাবু—কার মেয়ে?

ডি-এস-পি—আমারই জ্ঞাতি তারকদার মেয়ে হলো সোমা। প্রবীর পাটনী নামে কাঞ্চীপুরের একটা পলিটিক্যাল অফেণ্ডার যে প্রেম করে মেয়েটার মাথা খাচ্ছে, সে খবর রাখেন?

ভৈরববাবু উৎসাহের সঙ্গে নড়ে চড়ে বসেন—সোমা কি আমাদের সেই তারকদার মেয়ে, যাঁর সঙ্গে আলিপুর বারে চার বছর একসঙ্গে প্র্যাকটিস করেছি? ন'দে জেলার হরগঙ্গাপুরে যাঁর দেশ? রায় বাড়ির তারকদা?

ডি-এস-পি—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভৈরববাবু প্রচণ্ডভাবে বিস্মিত হয়ে ওঠেন—বলেন কি? আমার তারকদার মেয়ে হলো সোমা?

ডি-এস-পি—বসে বসে আশ্চর্য হলে তো চলবে না। মেয়েটাকে উদ্ধার করার একটা ব্যবস্থা করুন।

ভৈরববাবু একটু বিষণ্ণ হয়ে যেন আপসোস করেন—আমি সবই করতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এ বিষয়ে নয়নবাবু সাহায্য না করলে একক আমার পক্ষে...মেয়েটি নয়নবাবুরই পার্টিতে আছে কি না!

ডি-এস-পি—চলুন নয়নবাবুর কাছে, তিনি কেমন সাহায্য না করেন আমি দেখছি।

তারকদার মেয়ে! ভৈরববাবুর বাড়ি থেকে প্রতিধ্বনিটা মোটর গাড়ি চড়ে সোজা ছুটে আসে নয়ন চৌধুরীর বাড়িতে, সেই সন্ধ্যাতেই।

ডি-এস-পি'র ভুরু দুটো আক্রোশের স্পর্শে কুঞ্চিত হয়েই ছিল। নয়নের দিকে তাকিয়ে চ্যালেঞ্জের সুরে বলেন—সোমাকে আপনিই কাঞ্চীপুরে পাঠিয়েছেন?

নয়ন বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে পলিটিক্স করতে নয়, শিশু ভবনের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে।

ডি-এস-পি—কিন্তু সে যে সেখানে পলিটিক্স করছে না, মাস্টারনিগিরিও করছে না, এ খবর রাখেন?

নয়ন—আজ্ঞে না।

ডি-এস-পি বলেন—হুঁ।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকার পর ডি-এস-পি তাঁর চাপা আক্রোশকে একটু স্পষ্ট করে দিয়ে প্রশ্ন করেন—মেয়েটা যে ডুবতে বসেছে, সে-খবর রাখেন?

নয়ন—ডুবতে বসেছে? তার মানে?

প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে নয়নের মুখের উপর একটা আতঙ্কের অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে। ডি-এস-পি'র রুক্ষ মূর্তির দিকে তাকিয়ে নয়নের দৃষ্টিটা যেন করুণ কৌতূহলে ছলছল করে।

ভৈরববাবু সতর্ক মনস্তাত্ত্বিকের মত নয়নের আচরণগুলি যেন লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর চোখ দুটো শুধু দূরদর্শিতার জন্যই বিখ্যাত নয়, অন্তর্দর্শিতাও যথেষ্ট আছে। নয়নের মুখের দিকে তাকিয়ে দশটি মুহূর্তের মধ্যে কি-একটা রহস্য আন্দাজ করে নিলেন ভৈরববাবু এবং চকিত দৃষ্টির ইঙ্গিতে ডি-এস-পি'কে চুপ করিয়ে দিয়ে নিজেই উৎসাহিত ভাবে উত্তর দিলেন—তার মানে, কাঞ্চীপুরে এখন দুর্ভিক্ষ চলছে, মেয়েটা খেতে পাচ্ছে কি না সন্দেহ।

সব অভিযোগ আর চ্যালেঞ্জ ধীরভাবে শুনে নিয়ে নয়ন ধীরে ধীরে অনুযোগের সুরে বলে—আমি তাকে সেখান থেকে ছাড়িয়ে আনবার জন্যেই তৈরী হয়ে রয়েছি, কিন্তু পুলিসের বাধানিষেধের জন্যে কিছু করে উঠতে পারছি না।

ডি-এস-পি—সোমার আপন অভিভাবক কেউ আছেন?

নয়ন—আছেন। সোমার কাকা হাজিপুরে থাকেন।

ডি-এস-পি—তাঁকে পত্রপাঠ চলে আসতে লিখে দিন।

ভৈরববাবু বলেন—তাহলে কথা রইল, উনি আসার পর আমরা একসঙ্গে গিয়ে সোমাকে নিয়ে আসবো।

নয়ন একটু চমকে উঠে ভৈরববাবুর দিকে তাকায়—আপনি যাবেন?

ভৈরববাবু—কি বলছেন নয়নবাবু? সোমা যে আমাদের তারকদার মেয়ে, না গিয়ে উপায় আছে? আগে জানলে আমি কবেই...।

নয়ন ভৈরববাবুর দিকে শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। বোধ হয় এই প্রথম।

পিসিমা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সবই শুনছিলেন। প্রথমে উৎকণ্ঠভাবে স্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন, পরে উৎসাহে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ব্যস্তভাবে বঙ্কুকে ডেকে বলেন—বঙ্কু, বেচুর

বাবাকে একবার ভেতরে ডেকে নিয়ে আয় তো।

ভৈরববাবু অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে এসে পিসিমাকে নমস্কার জানিয়ে প্রশ্ন করেন- বলুন পিসিমা।

পিসিমা--সোমাকে আপনারা আনতে যাচ্ছেন?

ভৈরববাবু--হ্যাঁ, ও যে আমাদেরই তারকদার মেয়ে।

পিসিমা সাগ্রহে অনুরোধ করেন--যত শীগগির পারেন একটা ব্যবস্থা করে ফেলুন, মেয়েটা বড় কষ্টে আছে।

ভৈরববাবু--কষ্টের চেয়ে আরও খারাপ বিপদের মধ্যে রয়েছে পিসিমা।

পিসিমা আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন--আপনারা সবাই থাকতেও যদি মেয়েটার বিপদ হয়, তবে...।

ভৈরববাবু--কোন চিন্তা করবেন না পিসিমা, আমি যতক্ষণ আছি, কোন বিপদ হতে দেব না।

পিসিমা একটু ইতস্তত করেন, কি যেন বলতে চান, তারপর বলেই ফেলেন--আপনি বোধ হয় একটা কথা জানেন না, বেচুর মার সঙ্গে দেখা হলেও জানাতে পারিনি...যে দিনকাল যাচ্ছে, কাকে যে কি বলবো ভেবেই পাই না।

ভৈরববাবুর দৃষ্টিতে একটা গভীর কৌতূহলের আভাস ফুটে ওঠে। পিসিমা বলতে থাকেন--সোমার বিপদ হলে এই সংসারের একটা ক্ষতি হয়ে যাবে, নয়নকেও আর সংসারী করতে পারবো না। সোমার মা এ খবর জানেন, সোমাকে নিয়ে আসবার জন্যে তিনি বার বার চিঠি দিয়েছেন।

রহস্যটা একেবারে স্পষ্ট হয়ে যায়। ভৈরববাবু উৎসাহের সঙ্গে একটা নিঃশ্বাস ছাড়েন--আর বলতে হবে না পিসিমা। আপনি কিছু ভাববেন না।

ভৈরববাবু যেমন নিশ্চিন্ত করে দিয়ে যান, ডি-এস-পি শ্রীযুক্ত দত্তও তেমনি আশ্বাস দিয়ে গেলেন--মেয়েটাকে নিয়ে আসবার একটা ব্যবস্থা করে ফেলুন, আমার যথাসাধ্য সাহায্য আমি করবো; করতে বাধ্য, এ তো আর সরকারি চাকরির প্রশ্ন নয়, আমার জাতের মান-সম্মানের প্রশ্ন।

সুদূরপরাহত সোমা সন্নিকট হয়ে আসছে, এই আকস্মিক সৌভাগ্যের সূত্রপাতে মতিগঞ্জের চৌধুরী ভবন এতদিন পরে নিশ্চিন্ত হয়।

আরও নিশ্চিন্ত করে দিয়ে কয়েকদিন পরেই নয়নের টেলিগ্রামের উত্তরে সশরীরে চলে এলেন হাজিপুরের কন্‌ট্রাক্টর সেজকাকা।

সোমাদের কোন খবর বহুদিন পর্যন্ত না রাখলেও আজ তিনি আর থাকতে পারেননি। দুর্ভিক্ষগ্রস্ত সোমার প্রাণসঙ্কটের কথাও তিনি জানেন না, নয়নের মত বড়লোকের আহ্বান পেয়ে মুগ্ধ হয়েই এক কৌতূহলের আবেগে তিনি ছুটে চলে এসেছেন।

চক্রবেড়ের গলির কোণে একটা অসহায় একঘরে বাসার দেয়ালে জীর্ণ ফ্রেমে বন্দী তারকদা যেন পৃথিবীতে নতুন করে আবিষ্কৃত হলেন, এক জাতগর্বের হঠাৎ অভ্যুত্থানের মধ্যে। সোমার জীবনকে অস্পৃশ্য বিপদের আক্রমণ থেকে উদ্ধার করার জন্য আর কটি দিনের মধ্যেই প্রতিধ্বনিটা আরও সরব হয়ে ছুটে চলে গেল কাঞ্চীপুরের দিকে।

রওনা হয়ে গেলেন, সোমা রায়ের তিন কাকা। হাজিপুরের সেজকাকা, ডি-এস-পি দত্ত কাকা এবং ভৈরব কাকা।

শিশুভবনের বারান্দায় ছেলেমেয়েরা বসেছিল, এ ওর গা ঘেঁষে, শীতটা আজ খুব বেশী। সোমাও ভোলাকে কোলে করে আজ পড়াতে বসেছে, ছেলেমেয়েদের মাঝখানে, এক

স্পর্শনিবিড় শিশুজনতার সঙ্গে যেন অঙ্গীভূত হয়ে।

কিন্তু শুধু শীতের জন্য নয়। সোমা সকলকে একসঙ্গে জড়ো করে নিয়েছে, যেন দু হাতে ওদের জড়িয়ে রাখা যায়, যেন ওরা পালিয়ে না যায়, যেন আর এই লুণ্ঠক দুরদৃষ্টের চঞ্চু কোন ফাঁকে এসে কাউকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যেতে না পারে।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই একটা ভয় করছিল সোমার এবং তার জন্যই এই সতর্কতা। চালের বস্তাটা প্রায় খালি হয়ে এসেছে। আর সামান্য কিছু আছে। যতক্ষণ না এই শিশুভবনের পলাতক অদৃষ্টপিতা হঠাৎ অন্নের ঝুলি নিয়ে পৌঁছয়, ততক্ষণ সহ্য করে থাকতেই হবে, এই শীতের হিমেল বাতাস আর মিষ্টি রোদের আলো খেয়ে খেয়ে। ততক্ষণ যেন এই অবুঝ ক্ষুধার মূর্তিগুলো শিশুভবনের মায়াকে চরম সন্দেহ করে পালিয়ে না যায়।

সোমা এক এক করে নাম ধরে বলে--অতসী হরি বিন্দু, শোন। চারি নারাণ হারু, ভাল করে শোন আমি কি বলছি।

খুব আগ্রহের সঙ্গে সবাই শুনতে থাকে। অন্তরের সব মমতা ঢেলে দিয়ে সোমা আদরের সুরে বলতে থাকে--লক্ষ্মী মানিক সব, আমাকে না বলে কেউ চলে যেও না। বেশ?

সবাই একসঙ্গে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়, সোমার উপদেশ ওরা মনেপ্রাণে মেনে নিচ্ছে, আর না বলে কেউ পালিয়ে যাবে না।

শিশুভবনের শিশিরার্দ্র আঙিনা হঠাৎ নানারকম জুতোর শব্দে মচমচ করে ওঠে। দুজন প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক, সঙ্গে আর একজন খাকি পোশাকের প্রৌঢ় চেহারা, আর একজন কনস্টেবল।

কনস্টেবল আঙিনাতেই দাঁড়িয়ে রইল। প্রৌঢ় তিনজন হনহন করে সোজা হেঁটে একেবারে বারান্দার উপরে উঠে সোমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়েন।

এক ভদ্রলোক বলেন--কি রে সুমি, চিনতে পারছিস তো?

সোমা চোখভরা বিস্ময় নিয়ে চিনতে চেষ্টা করে। ভদ্রলোক নিজেই বলে ফেলেন--আমি সেজকা।

আর এক ভদ্রলোক বলেন--তুমি আমাকে চিনতে পারবে না। আমি তোমার বাবার বন্ধু। তারকদা আর আমি এককালে একসঙ্গে আলিপুর বারে প্র্যাকটিস করেছি।

খাকি পোশাকের ভদ্রলোক বলেন--আমি তোমার জ্ঞাতিকাকা, নাম বললে তোমার মা হয়তো আমাকে চিনতে পারবেন, তুমি পারবে না।

অকস্মাৎ তিনটি পূজনীয়ের আবির্ভাব। তিনটি গুরুজন ও আপনজন। তবু সোমা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রণাম করা দূরে থাকুক, একটা মাদুর পেতে যথাসম্ভ্রমে আপ্যায়ন করতে ভুলে গিয়েছে সোমা। কাঞ্চীপুরে এসে গ্রাম্য রূঢ়তার মধ্যে সোমার আচরণ থেকে যেন ভদ্রজনোচিত সাধারণ লৌকিকতাগুলিও মুছে গিয়েছে।

সোমার নিঃশব্দ মূর্তি। যেন একটা প্রতিজ্ঞা নিঃশব্দে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সোমার চোখে আর বিস্ময়ের ছায়া নেই। কৌতূহলও আর চমকে ওঠে না। মনটাও অপ্রস্তুত হয়ে নেই। পা দুটোও যেন অদ্ভুত এক অহঙ্কারের ভারে অনড়। ঝড়ের মুখে উদ্ধত মন্দিরচূড়ার মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সোমা।

সেজকাকা আর কালক্ষেপ না করে হুকুমের ভঙ্গীতে বললেন--আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, একটি কথাও বলতে পারবে না, চুপচাপ লক্ষ্মীটির মত আমাদের সঙ্গে চলে এস। চল।

সোমা--কেন?

সেজকাকা ধমক দিয়ে ওঠেন--কেন আবার কি? ভদ্রলোকের মেয়ে ভদ্রসমাজে থাকবে। এখানে থাকা চলবে না।

সোমা—থাকলে দোষ কি?

সেজকাকা ভ্রূকুটি করেন—তোমার জাত চলে যাবে, এই দোষ!

সোমার ভ্রূকুটি আরো তীব্র হয়ে ওঠে—তাই বলুন, এতক্ষণে বুঝলাম। আপনি আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আসেননি, জাত বাঁচাবার জন্যে এসেছেন।

ক্রুদ্ধ সেজকাকার চোয়াল দুটো চড়চড় করে ওঠে—জাত গেলে যে প্রাণও চলে গেল ইডিয়ট মেয়ে।

সোমা—আপনার পাঞ্জাবী বন্ধুর সঙ্গে বিয়ের কথা শুনে কবেই ভয়ে আমার প্রাণ চলে গেছে। নতুন করে প্রাণ হারাবার আর ভয় নেই।

সেজকাকা চমকে উঠেই স্তব্ধ হয়ে থাকেন। সোমার কথার আঘাতে হাজিপুরের কন্‌ট্রাক্টরের একটা মস্ত বড় বোগাস দাবির বিল যেন সকলের সামনে হাতে হাতে ধরা পড়ে গিয়েছে। ভৈরববাবু মুহূর্তের মধ্যে সোমার কথার তাৎপর্য ও ইতিহাস বুঝে ফেলেন। ডি-এস-পি শ্রীযুক্ত দত্ত সেজকাকার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে নিয়ে, তারপর বুঝতে পারেন।

—যাক গে ওসব কথা। ভৈরববাবুই এইবার ঘটনাটাকে সামলাবার জন্য তৈরী হন।

ভৈরববাবু স্নেহার্দ্র স্বরে বলেন—আমাদের কথা ছেড়ে দাও সোমা। ধর, আমরা তোমার কাকা নই, কেউ নই। কিন্তু তোমার ওপর যাদের দাবি আছে, তাঁরাই তোমাকে আর এক মুহূর্ত এখানে রাখতে রাজি নয় সোমা। তাদের কথা নিয়েই আমরা তোমাকে নিতে এসেছি।

সোমা—কার কথা নিয়ে এসেছেন?

ভৈরববাবু—তোমার মার কথামতই আমরা এসেছি। তা ছাড়া, যিনি তোমাকে এখানে পাঠিয়েছিলেন, সেই নয়নবাবুর কথামতই তোমাকে নিতে এসেছি।

সোমা বলে—কিন্তু আমি তো নয়নবাবুর কথায় এখানে আসিনি, মার কথাতেও আসিনি। যাঁর কথায় আমি এসেছিলাম, অন্তত তিনি এসে না বললে আমি এখান থেকে চলে যাবার কথা ভাবতে পারি না।

ভৈরববাবু—তিনি কে?

সোমা—হিতেন কাকাবাবু।

খাকি পোশাকের কাকা কৌতূহলী হয়ে হাজিপুরের সেজকাকাকে জিজ্ঞাসা করেন—হিতেন আবার কে? আপনার কোন্ ভাই?

হাজিপুরের সেজকাকা ভুরু কুঁচকে আর ঠোঁট কামড়ে চিন্তা করে উত্তর দেবার চেষ্টা করতে থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিতে পারেন না। কে জানে, আপন ভাই না হোক, এইরকম একটা জ্ঞাতি ভাই-টাই হয়তো থেকে থাকবে। সেজকাকা ভেবে নিয়ে উত্তর দেন—আমরাই এক খুব নিকট সম্পর্কের জ্ঞাতি ভাই।

সোমা বলে—হিতেন কাকাবাবু আমাদের জ্ঞাতিই নন। আমার বন্ধু ভদ্রার বাবা।

—যাক গে ওসব কথা। ভৈরববাবু যেন সেজকাকার বোগাস সত্তাটাকে আর একটা আঘাত থেকে আড়াল করে ফেলবার চেষ্টা করেন। সোমাকে উদ্দেশ করে বলেন—বেশ তো, চল তোমাকে হিতেনবাবুর কাছেই পৌঁছে দিয়ে আসি।

সোমা—না, আসবার হলে তিনি নিজেই আসবেন। আমাকে যেতে হবে না।

ভৈরববাবু আমতা আমতা করে বলেন—দেখ সোমা, তোমাকে কি করেই বা বলি, বলতে সঙ্কোচ হয়...।

সঙ্কোচে সত্যিই প্রথমে একটু বিব্রত বোধ করেন ভৈরববাবু, তারপর নিঃসঙ্কোচ হয়ে যান।—এরই মধ্যে অনেকখানি জানাজানি হয়ে গেছে, তবু আমরা ব্যাপারটাকে এখানেই চাপা দিতে চাই। তোমার একটা বংশমর্যাদা আছে, তোমার মত মেয়ের পক্ষে প্রবীর মাস্টারের সঙ্গে ওসব সাজে না। এখান থেকে একবার বের হতে পারলেই তুমি তোমার ভুল বুঝতে

পারবে। অবশ্য আমরা জানি, তোমার দোষ নেই, এখানে অসহায়ভাবে পড়ে আছ বলেই তোমার মন ছোট হয়ে যাচ্ছে। আর সেই সুযোগে যত ছোট জাতের চক্রান্ত তোমাকে...।

সোমা--আমি এখান থেকে যাব না।

জ্ঞাতিকাকা শ্রীযুক্ত দত্ত সঙ্গে সঙ্গে ছোট একটি গর্জন করেন--যেতে হবে, আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম।

সোমা হঠাৎ চমকে গিয়ে খাকি পোশাকের দিকে তাকায়।

শ্রীযুক্ত দত্ত তাঁর খাকি পোশাকের একটা চকচকে পেতলের বোতাম ধরে বলেন--আমি কোতোয়ালীর লোক, ডিউটি করতে এসেছি, তোমার কাছে কাকাগিরি করতে আসিনি। চল, কুইক।

ডি-এস পি শ্রীযুক্ত দত্ত, ভৈরববাবু ও সেজকাকা বারান্দা থেকে আঙিনার উপর নেমে আসেন। কনস্টেবল গা-ঝাড়া দিয়ে কেতাদুরস্ত ভাবে দাঁড়ায়।

ডি-এস-পি যত তাড়াতাড়ি করতে বললেন, সোমার পক্ষে ততটা করা সম্ভব হলো না। এত তাড়াতাড়ি করার সাধ্যও নেই, তার প্রাণ যে এই শিশুভবনের প্রাণের সঙ্গে পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। আজ হঠাৎ তাড়াতাড়ি করলেই এত তাড়াতাড়ি সে বাঁধন খুলবে কেন? জোর করতে গেলে এ বাঁধন শুধু ছিঁড়ে যেতে পারে, কিন্তু তাতে বেদনাটাই আরও রক্তময় হয়ে উঠবে, তাকে বাঁধন খোলা বলে না। কিন্তু সোমা চায়, তার মনের সব সহ্যের শক্তি দিয়ে ধীরে ধীরে শান্তভাবে এই বাঁধন খুলে চলে যেতে। যেন ভোলা শান্তভাবেই কোল থেকে নেমে যায়, যেন অতসী বিন্দু হারু নারান শান্তভাবেই তাকে সন্দেহ না করে বিদায় দেয়।

ভোলাকে একবার কোলে তুলে নিয়ে আবার নামিয়ে দেয় সোমা। অতসী বিন্দু হারু নারান, সবাই জটলা করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে। সোমা ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণের জন্য একবার মুসড়ে পড়ে, চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। এই তো মাত্র কিছুক্ষণ আগে সবাইকে পালাতে নিষেধ করে ভুয়ো গুরুমা স্বয়ং নিজে পালিয়ে যাচ্ছে, অতসীর দৃষ্টিটা কি নীরবে এই কথাই বলছে না?

তারার মা এসে সামনে দাঁড়ায়। সর্ব আপদে ধীরবুদ্ধি, কষ্টের দাসী, শক্ত বুড়ী তারার মা সোমার হাত ধরে অসহায়ভাবে আজ শিশুভবনের একটি শিশুর মতই তাকিয়ে থাকে। যা কখনো হয়নি, তারার মার চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে। শক্ত ও রুক্ষ হাত দুটো দিয়ে সোমার হাতটা যেন আঁকড়ে ধরে তারার মা বলে--লক্ষ্মী চলে গেছে, সরস্বতী চললো, আমি আর এ পোড়া প্রাণ নিয়ে কতদিন এখানে পড়ে থাকবো গুরুমা? আমার যাবার ডাক আসবে কবে?

সোমা অস্ফুট স্বরে, যেন তার উত্তপ্ত নিশ্বাসের বাতাস গিয়ে কথা বলে--আসি তারার মা।

তারার মা--এস, এস, অন্তত আমার যাবার আগে একটিবার এস।

মতিগঞ্জের কোতোয়ালীর ফটকের সামনে বিরাট ভিড় উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, শুধু একটু দেখবার জন্য। কাঞ্চীপুর বিদ্রোহের সেই রহস্যময়ী সংগ্রামিকা গ্রেপ্তার হয়ে এখনি সদর কোতোয়ালীতে এসেছে।

ভিড়ের ভিতর একটা মোটর গাড়িও এসে ঢুকলো। পুলিস জনতাকে ঠেলেঠুলে সরিয়ে দিয়ে মোটর গাড়ির পথ করে দেয়। গাড়ি থেকে নামে কাঞ্চীপুরের সর্বজনপরিচিত যুবক নেতা নয়ন চৌধুরী, এবং নেমেই সোজা কোতোয়ালীর ভিতরে প্রবেশ করে।

একটু পরেই জনতা আর একবার প্রবলভাবে চঞ্চল হয়ে ওঠে। সেই ভয়ঙ্কর রূপকথার নায়িকাকে জামিনে মুক্ত করে এবং সঙ্গে নিয়ে নয়ন আবার গাড়িতে এসে ওঠে। ভৈরববাবুও

কোতোয়ালী থেকে বের হয়ে এসে একই গাড়িতে ওঠেন। ভৈরববাবু বসেন মাঝখানে, এক পাশে সোমা, আর একপাশে নয়ন। ভৈরববাবুকেই সবচেয়ে কৃতার্থ বলে মনে হচ্ছিল। পলিটিক্সকুশল ভৈরববাবুর পরিকল্পনাটা বোধ হয় সার্থক হতে চলেছে। তিনি জয়ীর মত বসেছিলেন এবং জনতার জয়ধ্বনির অভিনন্দনকে তিনিই বার বার দু হাতের নমস্কারে প্রত্যুত্তর দিয়ে একেবারে নিজের করে নিচ্ছিলেন। আসন্ন নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে দূরদর্শী ভৈরববাবু এখন থেকেই যেন ভোটগুলিকে আপন করে রাখছিলেন।

হর্নের বিলাপে ভিড় ঠেলে গাড়ি অগ্রসর হয় এবং তারপরেই ধুলো উড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। হাজিপুরের কন্ট্রাক্টর সেজকাকা বোধ হয় আগেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন, তাঁকে কোথাও দেখা যায় না।

গাড়ি এসে চৌধুরী ভবনের ফটকে থামে। পিসিমা এগিয়ে এসে সোমাকে সাগ্রহে হাত ধরে বাড়ির ভিতর নিয়ে যান। যেতে যেতেই স্নেহাক্ত ভর্ৎসনার সুরে বলেন--তুমি আমাদের ভাবিয়ে ভাবিয়ে একেবারে মেরে ফেলেছ সোমা।

তারপরেই দোতলার একটি সুসজ্জিত ঘর, পাতালের বরুণালয় ছেড়ে একেবারে ইন্দ্রপুরী, তারই মধ্যে একটি সোফার উপর বসে সোমার ক্লান্ত মন কিছুক্ষণের জন্য তার সমগ্র অস্তিত্বকে ভুলে যাবার চেষ্টা করে।

এই ঘরটাকেও যেন আজকালের মধ্যে নতুন করে সাজানো হয়েছে এবং কার জন্য সাজানো হয়েছে তাও বুঝতে কষ্ট হয় না। উপকরণবহুল এই গৃহসজ্জার মধ্যে একটা আগ্রহের স্পর্শও রয়েছে মনে হয়, কে যেন খুব ভেবেচিন্তে সবকিছু যত্ন করে গুছিয়ে রেখে গিয়েছে, একটি মেয়ের প্রাত্যহিক সাজসজ্জার জীবনে যা কিছু প্রয়োজন হতে পারে, সবই। প্রসাধনের সামগ্রীতে পরিপূর্ণ ঐ একটা আলমারী, চিরুনিটা হাতীর দাঁতের। বড় আয়নাতে প্রতিবিম্বিত আপাদমস্তক মূর্তিটা আসল মূর্তির চেয়ে বেশী ঝকঝক করে। আর একটা আলমারী, থাক দিয়ে জামাকাপড় সাজানো। একটা হ্যাঙ্গারে তোয়ালেই ঝুলছে ছটা। পালঙ্কের উপর বিছানাটা একটা মির্জাপুরী রেশমের রেজাই দিয়ে ঢাকা। লেখবার জন্য একটা ছোট টেবিলও আছে ঘরের একপাশে, কাগজপত্র দোয়াত কলম সবই রাখা আছে । মীনার নক্সা করা দুটো সাদা পাথরের ফুলদানিও রয়েছে। ফুলগুলিও একেবারে তাজা, টাটকা তোলা হয়েছে বলে মনে হয়, এখনো জলের ছিটে গায়ে লেগে রয়েছে। আসবাবগুলি সবই সুন্দব। সোমা দৃষ্টি ঘুরিয়ে সবই দেখতে থাকে, কোনটাই কাঁচা কাঁঠাল কাঠের তৈরী নয়।

দিন কাটছিল কাঞ্চীপুরে, দিন কাটে মতিগঞ্জে। প্রথন দিনটা কেটে গেল, পুরনো চিঠিগুলি পড়তে পড়তে। চক্রবেড়ের একটা একঘরে বাসার পুঞ্জ পুঞ্জ আশীর্বাদ, মিনতি, আবেদন এবং তার সঙ্গে মাঝে মাঝে অনুযোগ ও ভর্ৎসনা।

"...এক মুহূর্ত দেবি না করে অজ পাড়াগাঁ ছেড়ে মতিগঞ্জে চলে এস।...নয়নবাবু যা বলবেন, নয়নবাবুর পিসিমা যা বলবেন, মন দিয়ে শুনবে, অবাধ্য হয়ো না। চুনি ও পান্না তোমার ওপর রাগ করে আছে।...তোমার মাইনের টাকা নয়নবাবু প্রতিমাসে নিয়মিত পাঠিয়ে দিয়েছেন, আজ একশো টাকা পেলাম।...তোমাকে ছাইপাঁশ স্বদেশীগিরি করতে হবে না, চাকরিও করতে হবে না। তোমার মত সব ভদ্রলোকের মেয়ে এই বয়সে সুখে স্বচ্ছন্দে স্বামীর ঘর করে, তোমাকেও তাই করতে হবে...নয়নের পিসিমাকে আজ আমি চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিলাম যে, আমার আপত্তি দূরে থাক, যদি বিয়ে হয় তো সৌভাগ্য বলে মেনে নেবে।"

দ্বিতীয় দিনটা কেটে যায় ভদ্রার চিঠিগুলি পড়তে পড়তে। "...পাস করেছি সোমা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ভয় করছে, এবার বোধহয় ছাড়াছাড়ি নেই, মা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন—

কিছুই ভাল লাগছে না সোমা: বোধ হয় খবর শুনেছ যে বাবা জেলে গিয়েছেন, কবে ছাড়া পাবেন ঠিক নেই। তোমার কোন উত্তর পাই না কেন? মা খুবই অসুখে পড়ে আছেন, আমরা সবাই এক রকম আছি।...এবার আমার জন্মদিনটা বিনা উৎসবেই কেটে গেল সোমা। তুমি নেই, গান গাইবে কে?...তোমার জন্য বড় চিন্তা হচ্ছে সোমা, উত্তর দিও।...শুনলাম, তুমি কাঞ্চীপুর ছেড়ে এবার থেকে মতিগঞ্জেই থাকবে, সুসংবাদ, নমস্কার সোমা।"

ভদ্রার শেষ চিঠিটার মধ্যে কেমন একটা অভিমান আছে। হঠাৎ নমস্কার করে বিদায় নিয়ে ভদ্রা যেন অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। পর পর তারিখের এক একটা চিঠি, গত ক' মাসের ইতিহাস ঘটনার গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে কি ভাবে কোন্ পরিণামের দিকে কতদূর এগিয়ে গিয়েছে, তারই পরিচয় পঞ্জিকা। ভাবতে আশ্চর্য লাগে সোমার, এক তাড়িয়ে-দেওয়া তুচ্ছা মেয়ের জন্য হঠাৎ এই ভদ্রলোকের পৃথিবীর এত চিন্তা? এ রহস্যের অর্থ কি? কারণ কি?

চিন্তার ভারে পীড়িত মনের বোঝা বইতে বইতে সোমার দোতলা জীবনের আরও কটা দিন কেটে যায়। এ রহস্যের কোন অর্থ বোঝা যায় না, নিতান্ত যেন ঘটনার ব্যভিচার আর খামখেয়াল।

কিন্তু সোমা বিষণ্ণ হয়ে থাকলে কিছু আসে যায় না। সোমার বিষণ্ণতার অর্থ বুঝতে পারবে, এই পৃথিবীতে তেমন কোন হৃদয়ও নেই। বরং সোমার সব দুশ্চিন্তাকে অনর্থক করে দিয়ে চৌধুরী ভবন দিন দিন যেন উৎসবে চঞ্চল হয়ে উঠছে।

এরই মধ্যে পিসিমা এসে হেসে হেসে একটা ভবিষ্যদ্বাণী স্পষ্ট করেই শুনিয়ে যান—এ বাড়িতে তুমি এত লজ্জা করছো সোমা ; কিন্তু আর কদিন পরে এই লজ্জার কথা মনে পড়লে তুমি আরও বেশী করে লজ্জা পাবে।

এক ফোঁটাও সংশয় নেই, কী বিশ্বাসে বিহ্বল হয়ে আছে চৌধুরী ভবন। সোমার মত মেয়ে, ষাট টাকার জন্য যে কাঞ্চীপুরের দুঃখের মধ্যে জীবন বিকিয়ে দিতে যায়, তার আবার মতামতের প্রয়োজন কি? চৌধুরী ভবনের আহ্বান তো তার কাছে অভাবিত কল্পলোকের আহ্বান। এ বিষয়ে সোমার মার মনেও যেমন কোন সংশয় নেই, নয়নের পিসিমারও নেই এবং নয়নেরও নেই! এই অভ্যর্থনা উপেক্ষা করবে, সোমাকে সেরকম বুদ্ধিহীনা বলে মনে করবার কোন কারণও নেই। অন্তত নয়ন সেটা মনে করে না। জীবনে সব মেয়েই কোথাও না কোথাও বাঁধা পড়ে, যতই বিদ্রোহিনী হোক না কেন। এবং সোনার জাল পেলে সুতির জালে কেউ বাঁধা পড়তে চাইবে, এমন অদ্ভুত খেয়ালিনী কি কেউ থাকতে পারে?

আজকের দিনটা মতিগঞ্জের পলিটিক্সের ইতিহাসের একটা লাল অক্ষরের দিন। চরকা ও রুধিরে সমন্বয়ের দিন। চিরকালের কলিশন ছেড়ে দিয়ে নয়নের বৈঠকখানাতেই ভৈরববাবু ও নয়নের দলের কোয়ালিশন হয়ে গেল। প্রচার কার্যের জন্য একটা কমিটিও গঠিত হয়, তার সেক্রেটারীর নামটাও অবিসম্বাদিত অভিমত অনুসারে সুস্থির হয়ে যায়—সোমা রায়।

মঙ্গলদাস মুলুকচাঁদ বলেন—বাস্ বাস্, আজ আমার বিশোয়াস পুরা হোয়ে গেল। যখন নয়নবাবু আর ভৈরববাবু একট্‌ঠা হোয়েছেন, তখন স্বরাজ হোবেই হোবে।

নয়নের বৈঠকখানাতেই স্বরাজের ভিত্তি রচনার একটা প্রাথমিক পরিকল্পনাও হয়ে যায়। মিউনিসিপ্যালিটির সীটগুলির শতকরা ষাটটি সীটে ভৈরববাবুর লোক মনোনয়ন পাবে, বাকিগুলিতে নয়নবাবুর লোক। আর জেলা বোর্ডের সীটগুলিতে শতকরা ষাটটিতে নয়নবাবুর লোক, বাকি সীটে ভৈরববাবুর লোক। মিউনিসিপ্যালিটির ওয়াটার ওয়ার্কসের জন্য যে স্কীমটা তৈরী হয়েও যুদ্ধের জন্য স্থগিত আছে, সেটার কন্‌ট্রাক্ট মুলুকচাঁদ অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রহণ করতে রাজি হয়েছেন।

নয়ন বলে—আপনি শুধু ইলেকশনের সময় এইটুকু দেখবেন ভৈরববাবু, কোয়ালিশনের

নন্দিনী ছাড়া একটাও ইন্ডিপেণ্ডেন্ট যেন কোথাও পাত্তা না পায়।

ভৈরববাবু আশ্বাস দেন—সে বিষয়ে নিশ্চিন্তি থাকবে নয়ন। তুমি শুধু এখন থেকেই প্রপেগ্যাণ্ডার দিকটা জোর দিয়ে যাও, কখন কোন্ শহীদের কাকা-মামা এসে টপকে পড়ে ঘায়েল করে দেয়, কোন ঠিক নেই।

কোয়ালিশন দলের প্রথম বৈঠক শেষ হয়ে বৈঠকখানা আবার শূন্য হয়, কিন্তু নয়নের মন পূর্ণ হয়ে ওঠে—সফল সাধনার আনন্দে, সবদিক দিয়ে জয়ী হওয়ার আনন্দে। সব সুদূরপরাহত কামনা আজ সন্নিকটের ভরসা হয়ে গেছে।

কোয়ালিশন দলের মিলনচুক্তির ও প্রচার কমিটির খসড়াটি হাতে করে নয়ন বৈঠকখানা থেকে বের হয়, দোতলায় গিয়ে ওঠে এবং সোজা সোমার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে থামে।

—বড় ব্যস্ত ছিলাম এই কদিন, তাই কোন খোঁজ নিতে পারিনি। বলতে বলতে সোমার ঘরের ভিতর নয়ন উপস্থিত হয়।

হাতের উপর খোলা বইটা বন্ধ করে সোমা বিড়ম্বিতভাবে তাকিয়ে থাকে। নয়ন তার রাজনৈতিক কীর্তিকলাপের নথিপত্রগুলি সোমার হাতের বইয়ের উপরেই ছড়িয়ে দিয়ে বলে—আপনার ওপরেও একটা মস্ত দায়িত্ব পড়লো।

সোমা—আমার ওপর কিসের দায়িত্ব?

নয়ন—পড়ে দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন।

সোমা—এসব পড়েও আমি কিছু বুঝতে পারবো না। বলুন।

নয়ন—ভৈরববাবুদের সঙ্গে আমাদের কোয়ালিশন হয়ে গেল।

সোমা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে—কিছুই বুঝলাম না।

নয়ন—আমাদের দুজনের মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে একটা মস্ত বড় পার্থক্য আছে, কিন্তু তবু আমরা একসঙ্গে কাজ করবার জন্যে তৈরী হয়েছি।

সোমা—আপনাদের কাজটা কি?

নয়ন—কংগ্রেসের কাজ।

সোমা—কাঞ্চীপুরের কাব্যতীর্থ মশাই যেসব কংগ্রেসের কাজ করতেন, সেই সব কাজ?

নয়নের কথার উচ্ছ্বাস হঠাৎ একটু মন্দাক্রান্ত হয়।—না, ওসব নয়, ওটা হলো আর এক ধরনের কাজ। আমরা চাই, যাতে ইংরেজভক্ত রায়বাহাদুরের দল জেলা বোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটিতে ঢুকতে না পারে। ওর মধ্যে যেটুকু ক্ষমতা আছে, সব আমরা দখল করে নিতে চাই।

সোমা—আপনারা কেন দখল করবেন? ইংরেজ-ভক্তদের সরিয়ে ইংরেজের শত্রুরাই দখল করুক।

নয়নের কৌতূহল একটু তীব্র হয়ে ওঠে—আমরা না হলে, আপনি আর কাকে ইংরেজের শত্রু মনে করছেন?

সোমা—কাব্যতীর্থ মশাইয়ের দল।

নয়ন হঠাৎ চুপ হয়ে যায়। সোমার কাছে একটা উল্লাস নিবেদন করতে এসে, এই রকম একটা তর্কের জেরায় পড়তে হবে, তা সে হয়তো কল্পনা করতে পারেনি। কেমন করেই বা পারবে? যখন নিজে ধন্য হয়ে থাকে, তখন সারা পৃথিবী ধন্য হয়ে আছে, এই বিশ্বাস নিয়েই চিরকাল পৃথিবীতে সে চলছে। তার কাছে পৃথিবীটা বোধ হয় একটা বিরাট চৌধুরী ভবন ছাড়া আর কিছু নয়। সব কিছুতেই তার অধিকার আছে। ইচ্ছা হয়েছে, ইংরেজের শত্রু হবে। সখ হয়েছে, জেলা বোর্ড দখল করবে। সাধ হয়েছে, জননেতা হবে। এর বিরুদ্ধে যোগ্যতার প্রশ্ন ওঠে কেন? আবার তার চেয়েও বেশী যোগ্য লোকের কথা ওঠে কেন?

নয়ন একটু অনুযোগের সুরে বলে—অন্তত আপনার কাছে এই ধরনের কথা আশা করি

না।

সোমা প্রশ্ন করে—কেন বলুন তো?

নয়ন আবার বিব্রত হয়, সোমার এই কথাগুলিও যে নয়নের ইচ্ছা ও বিশ্বাসকে প্রশ্ন করা। সোমার উপর নয়নের একটা বিশেষ দাবি আছে, এটাই একমাত্র যুক্তি। কোন্ অধিকারে দাবি করে, আবার এসব প্রশ্ন কেন?

নয়ন--আপনাকেই আমাদের প্রচার কমিটির সেক্রেটারী করা হয়েছে।

সোমা--আমাকে না জিজ্ঞাসা করে কেন করলেন?

নয়ন--আপনাকে সম্বর্ধনা করার জন্যে আজ সন্ধ্যাবেলা এই বাগানে একটা সভার ব্যবস্থা করেছি। বিশেষ বিশেষ ভদ্রলোকেরা আসবেন।

সোমা--কেন এসব করলেন? আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার খোঁজ না নিয়েই এতদূর এগিয়ে গেলেন কেন।

নয়নের মুখটা হঠাৎ নিষ্প্রভ হয়ে যায়, মনের গভীরে চিরকেলে বিশ্বাসের উৎসটা যেন রুদ্ধ হয়ে যেতে থাকে। ইচ্ছা করলেই পাওয়া যায় না, পেতে হলে যোগ্যতার প্রশ্ন ওঠে। সোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার খোঁজ নেবার প্রয়োজনও তো সে বোধ করেনি, এবং সেই জন্যে সত্যিই যে অনেক দূর সে এগিয়ে গিয়েছে।

সোমা হঠাৎ অন্য একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে।--আমার মামলার তারিখটা কবে পড়লো? খোঁজ করেছেন?

নয়নের বিষণ্ণ মূর্তিটা সুস্মিত হয়ে ওঠে--তার জন্যে দুশ্চিন্তা করবেন না।

সোমা—দুশ্চিন্তা নয়, চিন্তা করছি।

নয়ন কৃতার্থভাবে হাসে--ওসব কিছু নয়।

সোমা একটু বিস্মিতভাবে তাকায়—তার মানে?

নয়ন--কোন মামলাই হবে না।

সোমা--কেন?

নয়ন--আপনার বিরুদ্ধে কোন চার্জশিটই পুলিস দাখিল করেনি।

সোমা—এ অনুগ্রহ কেন?

নয়ন—ডি-এস-পি দত্ত যে আপনারই কাকা। তিনিই ওসব কিছু হতে দেননি।

সোমা--আপনি এতদিন চুপ করে রইলেন কেন?

নয়ন আবার বিব্রত বোধ করে এবং কুণ্ঠিতভাবে বলে—আপনাকে জানাবার বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে, একথা আমার মনে হয়নি।

বলতে বলতে নয়ন ঘর ছেড়ে চলে যায়। আদৌ রাগ করে নয়, সোমার প্রশ্নগুলির ভ্রান্তি দেখে একটু বিস্মিত হয়ে। সোমার সম্পর্কে সব খবর নয়ন জানলেই তো সব জানা হয়ে গেল, কারণ সোমার ভালমন্দের ভবিষ্যৎ ও দায়িত্ব যে তারই উপর। সোমা কি সেকথা জানে না?

সবই জানে সোমা এবং জেনেশুনে তার অন্তরাত্মা হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। একদিন কাঞ্চীপুরের শিশুভবনে একলা রাতের অন্ধকারে তার ভয়ার্ত প্রাণ ফুঁপিয়ে উঠেছিল—মা তুমি এসে উদ্ধার করে নিয়ে যাও। সোমার সেই আবেদন এখন বর্ণে বর্ণে সার্থক হয়েছে, তাকে উদ্ধার করেই আনা হয়েছে। তবু এই বিষণ্ণতা কেন?

এই তো সুন্দর আগ্রহ দিয়ে ঘেরা আর একটা রঙীন জগৎ, এর মধ্যে সে নগণ্য নয়, বরং তারই প্রসন্নতায় সব প্রসন্ন হয়ে রয়েছে। এখানেও চোখের সামনে যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, না-চাইতে হাতের কাছে যা চলে আসছে, এসবই তো আশার অতিরিক্ত। তবু সব বুঝেও বুঝে উঠতে পারে না সোমা, চিন্তার শক্তি ফুরিয়ে আসে। শুধু মনে হয়, এই সুন্দর

প্রহেলিকার মধ্যে সে আজ নিতান্ত অসহায়ভাবে বন্দিনী।

চক্রবেড়ের গলির কোণে একটা রিক্তমূর্তি বাসার মধ্যে এক স্বামীহীনা প্রৌঢ়ার বেদনাক্লিষ্ট মুখের ছবিটা সোমার চোখে ভেসে ওঠে। সে তো তারই মা, সেই মুখ এতদিনে সচ্ছল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই মায়ের সব উপদেশ মমতা ও আবেদন সন্দেহ করে, আবার ঐ মুখ বিষণ্ণ করে দিতে হলে যে নির্মম শক্তির প্রয়োজন, এই প্রহেলিকার নীড়ে বসে সোমা নিজের মধ্যে আজ সে শক্তি খুঁজে পায় না। শুধু মনে হয়, তার জীবনটা যেন এক অন্ধকারে পথ ভুলে হঠাৎ জলে ডুবে গিয়েছিল। সেই ক্ষণিকের সংজ্ঞাহীন জীবনের স্মৃতি হলো কাঞ্চীপুর। বড় আবছা, বহুদিনের অতীত, বহু দূরে বিদূরিত জীবন। আজ যেন ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে সব একে একে বুঝতে পারছে সোমা।

শুধু নিজের মা কেন, এই বাড়ির পিসিমার যখন-তখন মমতাভরা ডাক, আগ্রহভরা যত্ন আর উঠতে বসতে সমাদর—এসবও কি সন্দেহ করার জিনিস? নিতান্ত মিথ্যা আর তুচ্ছ? সোফার উপর সোমার অবসন্ন মূর্তিটার দিকে তাকালে মনে হয়, তার অল্পদিনের পরিচিতা পিসিমা নামে এই মাতৃতুল্যার ভরসাকে অপমান করার মত শক্তি তার হারিয়ে গিয়েছে। কাঞ্চীপুরের বিদ্রোহিনীর সত্তা এক নতুন ওষধির মাদকতায় ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ছে, আর জেগে উঠতে পারবে কি না সন্দেহ।

সোমা হঠাৎ যেন জোর করে মনটাকে চিন্তার গ্রাস থেকে মুক্ত করার জন্য ঘর ছেড়ে দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। একটা বুকভরা নিশ্বাসের জন্য বারান্দার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে বাইরের বাতাস খুঁজতে থাকে সোমা।

বারান্দার শেষ দিকে একটা টবের ক্রিসেন্থেমাম, তারই পাশে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকালে বাগানটা দেখা যায়। সোমা স্থিরদৃষ্টি নিয়ে দেখতে থাকে, তারই সংবর্ধনার জন্য একটা মণ্ডপ তৈরী হয়েছে, উপরের রঙীন ঝালর, আর তার নীচে ফুলের টব দিয়ে মালঞ্চের মত একটা মঞ্চ। নয়ন নিজেই ঘুরেফিরে লোকজনকে কাজের নির্দেশ দিচ্ছে। বোধ হয় যতদূর সম্ভব সুন্দর করে সাজাবার চেষ্টা করছে নয়ন এবং মাঝে মাঝে রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে আবার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠছে।

দেখতে দেখতে সোমার মুখটা বিবর্ণ হয়ে আসে। এই প্রহেলিকা তো নিতান্ত অলীক নয়। এ যে একটি মানুষের নিদ্রাহীন রাত্রির চিন্তা দিয়ে, জাগ্রত দিবসের পরিশ্রান্তি দিয়ে, সঙ্গোপন স্বপ্নের আগ্রহ দিয়ে তৈরী প্রহেলিকা। সোমা প্রায় ছুটে এসে নিজের ঘরে ঢোকে, বিছানার উপর নিঃশব্দে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। বদ্ধ নিঃশ্বাসটা যেন চূর্ণ হয়ে গিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ করে—উদ্ধার কর। কিন্তু দেখে মনে হয়, এক বন্দিনীর আত্মসমর্পিত সত্তা মুখ গুঁজে পড়ে আছে।

—সোমা! পিসিমার আহ্বানে চমকে উঠে বসে সোমা। পিসিমা সস্নেহ স্বরে ভর্ৎসনা করলেন—ছিঃ, তুমি তো একেবারে ছেলেমানুষটি নও সোমা। এরকম করছো কেন?

পিসিমা একটু চুপ করে থেকে আবার ব্যস্ত হয়ে বলেন—নাও ওঠ, বেচুর মা তোমাকে একবার দেখতে চাইছেন, গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।

পিসিমা নিজেই আলমারী খুলে বেছে বেছে ভাল একটা শাড়ি বের করে সামনে রাখেন—এটা পরবে, বুঝলে? তোমাকে এরকম রুক্ষসুক্ষ হয়ে আমি বাইরে যেতে দিতে পারি না।

সোমার হাত ধরে মৃদুভাবে একটা টান দিয়ে পিসিমা বলেন—ওঠ ওঠ ওঠ, একটু ভাল করে সাজ সোমা, আমার কথাটা একটু গ্রাহ্যি করতে শেখ। সব বুঝেও বোঝ না কেন?

পিসিমা চলে যান। সোমা স্নান করে আবার নিজের ঘরে ফিরে আসে। পিসিমার নির্দেশ মত সেই শাড়িটাই পরে। চৌধুরী ভবনের সম্মান রাখার জন্য তাকে আজ ভাল করে সাজতে হবে। সাজবার যতটুকু নিয়ম জানা আছে, সবই করে সোমা। ইচ্ছা করে কোন ত্রুটি সে আজ

আর রাখতে চায় না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একবার তাকিয়ে দেখে। রুমাল দিয়ে কপালটা ঘষে নিয়ে কাজলের বাটিটায় আঙুল ডুবিয়ে একটা টিপ তুলে নেয়।

হাতটা হঠাৎ কাঁপে, কপালটা ঘেমে ওঠে, নিঃশ্বাস এলোমেলো হয়ে যায়। রুমাল দিয়ে আঙুলের কাজল মুছে ফেলে আয়নার কাছ থেকে দু পা পিছিয়ে যায় সোমা। হঠাৎ মনে হয়, একটা সুন্দর লোভের ঘুস খেয়ে এই রঙীন শাড়ির প্রতিটি সুতো অশুচি হয়ে রয়েছে।

কাঞ্চীপুর থেকে গ্রেপ্তার হয়ে আসার সময় যে কালোপাড়ের প্লেন শাড়িটা পরে এসেছিল, আবার সেই শাড়িটাই পরে সোমা। পিসিমা আবার ডাকতে এসে হতভম্ব হয়ে দেখতে থাকেন, তাঁরই নির্বাচিত রঙীন শাড়িটা অপমানে জড়োসড়ো হয়ে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে আছে, আর সোমা দাঁড়িয়ে আছে টেবিলে ঠেস দিয়ে, জানলা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে, একটা কদর্য রকমের রুক্ষসুক্ষ মূর্তি।

পিসিমার কথাগুলি তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনার মত—এ কী হলো সোমা?

সোমা—আমি কোথাও যেতে পারবো না।

পিসিমা—যেতে পারবে না, সেটা তো আমাকে ভাল করে বললেই হতো। কিন্তু এ কি রকমের ব্যবহার? কটা মাস পাড়াগাঁয়ে থেকে তোমার বুদ্ধিসুদ্ধিও যে...।

পিসিমা তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ না করেই হনহন করে চলে যান।

কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়েছিল সোমা, তা সে জানে না। তার চেতনার চারদিকে একটা বর্ণময় প্রহেলিকা যেন দুঃসহ প্রদাহের মত ঘিরে রয়েছে।

বঙ্কু এসে দুটো চিঠি দিয়ে যায় আর জিজ্ঞাসা করে—আপনার খাবার নিয়ে আসি?

সোমা উত্তর দেয়—না।

সোমা চিঠি পড়ে। প্রথম চিঠিটা চক্রবেড়ে থেকে, মা লিখেছেন। সোমা দুবার চিঠিটা পড়ে। কাগজ টেনে নিয়ে উত্তর লিখতে থাকে। জীবনে এই প্রথম মার চিঠিকে পত্রপাঠ উত্তর জানিয়ে দেয় সোমা।

"মা, তুমি তো জান, গঙ্গাসাগরে মেয়েকে ভাসিয়ে দেওয়া কি নিষ্ঠুর কাজ। কিন্তু মেয়েকে বিক্রী করা কি তার চেয়ে নিষ্ঠুর কাজ নয়?..."

লেখা শেষ করেই চিঠিটার উপর কিছুক্ষণ মাথা চেপে পড়ে থাকে সোমা। অনেকক্ষণ, দু চোখ থেকে জল গড়িয়ে চিঠি ভিজে যায়।

চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে নতুন করে লেখে সোমা—"মা, তুমি মাপ করো...প্রণাম নিও।"

কলকাতা শ্যামবাজার থেকে লেখা ভদ্রার মার চিঠিটাও পড়ে সোমা।

"তুমি খবরটা শুনে খুবই দুঃখ পাবে, সোমা, তবু জানাচ্ছি। তোমার কাকাবাবু জেলে থাকতেই আমাদের মায়া কাটিয়ে চিরকালের মত চলে গেছেন। নিউমোনিয়া হয়েছিল।...তোমার বিয়ের খবর শুনে সুখী হলাম সোমা। তোমার কাকাবাবু বেঁচে থাকতেই নয়নের সঙ্গে ভদ্রাকে বিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। যাই হোক, তুমিও তো আমার মেয়ে, এক মেয়ের সঙ্গে না হয়ে আর এক মেয়ের সঙ্গে হলো।...সুখী হও।"

কাকাবাবু! সোমার বেদনা আর বাঁধ মানে না। কান্নারও মাত্রা থাকে না। জ্ঞাতিও নয়, আত্মীয় নয়, কিন্তু হিতেন কাকাবাবু নামে শ্যামবাজারের সেই সৌম্য ও সহৃদয় হাসির মূর্তিই যে তার স্বজনের চেয়েও আপন ছিল। এতদিন মনে মনে হিতেন কাকাবাবুর ওপর কী গভীর অভিমান পুষে এসেছে সোমা। যাঁর কথা শিরোধার্য করে ঘরছাড়া হয়ে সোমা এতদিন এখানে বরুণালয়ের জলে ডুবেছে, অগ্নিপরীক্ষায় পুড়েছে, প্লাবনে ভেসেছে, প্রহেলিকায় বন্দিনী হচ্ছে, তিনিই শুধু আজ পর্যন্ত একটিও উপদেশ পাঠাননি। অথচ সোমার বিশ্বাস ছিল, শেষ পর্যন্ত হিতেন কাকাবাবু একবার আসবেনই এবং সেদিন সোমা ঐ বাইরের ভদ্রপৃথিবীর একমাত্র শ্রদ্ধার মূর্তির কাছে নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করে নেবে—আমার ভুল কোথায় হলো কাকাবাবু?

সত্যিই কি আমার জাত যাচ্ছে।

যাক, উপদেশ চাইবার মত যে একটি মাত্র আশ্রয় ছিল, তাও ঘুচে গেল। বন্ধন মুক্ত হয়ে সোমা যেন আবার এই পৃথিবীতে স্বতন্ত্রা হয়ে ওঠে, নিজেরই চিত্তের গভীরে অন্বেষণ করে তাকে আজ সব উপদেশ খুঁজতে হবে। সোমার শোকাচ্ছন্ন মন আবার সুস্থ হয়ে ওঠে এবং শান্ত মনের ক্ষণিক চিন্তার মধ্যেই যেন গুঞ্জন ধ্বনির মত শুনতে পায়--নিজে যা সত্য বলে বুঝবে, তাই একমাত্র পথ।

পিসিমা আর খোঁজ নিতে আসেননি। সোমা খেয়েছে কি না, কিংবা কেন খায়নি, এই প্রশ্ন নিয়ে তিনি অন্যদিনের মত আর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন না।

আবার বঙ্কুই এল অনেকক্ষণ পরে। সোমা তখন ঘরের মেজের উপর শুয়েছিল, জানলা দিয়ে পড়ন্ত রোদের এক ঝলক আলো এসে সোমার মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল।

বঙ্কু ডাকে--দিদিমণি?

সোমা যেন স্বপ্ন থেকে উঠে বলে--কে ডাকছে?

বঙ্কু বলে--আমি বঙ্কু। একটি ছেলে নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

--কে? কই? কে দেখা করতে এসেছে? সোমা উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘর থেকে বের হয়ে সিঁড়ি ধরে নামতে থাকে। বঙ্কুও পিছু পিছু আসে।

নয়নের লাইব্রেরী ঘরে দরজার কাছে, বারান্দার উপর একটি ছেলে দাঁড়িয়েছিল, কাঞ্চীপুর বাণীপীঠের একটি বিদ্যার্থী। সোমা এগিয়ে আসতেই ছেলেটি বলে--আমি শঙ্কর।

সোমা বলে--হ্যাঁ, চিনেছি।

শঙ্কর--আমি আজই আসছি গুরুমা।

সোমা--কি খবর বল?

শঙ্কর বড় বুদ্ধিমান, বঙ্কুর দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলে--বড় জল তেষ্টা পেয়েছে গুরুমা।

সোমা বলে--বঙ্কু, জল নিয়ে এস।

বঙ্কু চলে যেতেই শঙ্কর একটা খামে বন্ধ চিঠি সোমার হাতে দেয়। চিঠিটা মুঠোর মধ্যে ধরে সোমার সমস্ত শরীরটা কাঁপতে থাকে। সোমা বলে--আমি এই ঘরের ভেতরে আছি, তুমি একটু বসো শঙ্কর।

সোমা লাইব্রেরী ঘরের ভিতরে ঢুকে চিঠিটা খুলে পড়তে থাকে।

"তুমি তোমার কথা রেখেছ, আমি আমার কথা রেখেছি। আমি তোমাকে চলে যেতে দিইনি, তুমিও চলে যেতে চাওনি। তবু তোমাকে চলে যেতে হলো। আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে সোমা।"

চারদিকের শব্দের আলোড়ন হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, সোমা কিছু শুনতে পায় না। একটি শূন্যতার মাঝখানে যেন একা বসে থাকে সোমা।

এই সমাধির গ্রাস থেকে আত্মরক্ষার জন্যই যেন সোমা চেঁচিয়ে ডাক দেয়--শঙ্কর, এখানে এসে বসো।

শঙ্কর লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে সোমার কাছে এসে বসে। কাঞ্চীপুরের দুটি দুঃখের প্রতিনিধি, যেন নিঃশব্দে বসে বসে মতিগঞ্জের সুখী হৃৎপিণ্ডের উল্লাস শুনতে থাকে। যেন এর সমাপ্তি দেখবার জন্য ওরা দুজন একটি চরম মুহূর্তের অপেক্ষায় বসে থাকে।

সংবর্ধনার মণ্ডপে তখন আলো জ্বলতে আরম্ভ করেছে। চৌধুরী ভবনের অন্তর্লোকে একটা উৎসবের আকুলতা প্রখর হয়ে ফুটে উঠছে। কিন্তু তখনো লাইব্রেরী ঘরের একান্তে বসেছিল শঙ্কর আর সোমা, গরীব ভাই যেমন বোনের বড়লোক শ্বশুরবাড়িতে এসে একটু সঙ্কোচে

একান্তে বসে আলাপ করে, এ দৃশ্যও তেমনই।

বোধ হয় দোতলা থেকে নেমে এল নয়ন। একটু উদ্বিগ্ন হয়ে। ব্যস্তভাবে এসে লাইব্রেরী ঘরে ঢোকে। শঙ্করকে দেখতে পেয়েই সোমাকে জিজ্ঞাসা করে—ছেলেটি কে?

সোমা উত্তর দেয়—কাঞ্চীপুরের ছেলে।

নয়ন সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে মণিব্যাগ বের করে। সোমা জিজ্ঞাসা করে—ও কি করছেন?

নয়ন—কিছু দিয়ে দিই।

সোমা—না।

শঙ্করের দিকে তাকিয়ে সোমা বলে—শঙ্কর, তুমি একটু বাইরে বসো।

শঙ্কর বাইরে গিয়ে বসতেই লাইব্রেরী ঘরটা কিছুক্ষণের মত নীরব হয়ে যায়। সোমা দাঁড়িয়ে থাকে ঘরের মেজের দিকে তাকিয়ে, স্থির হয়ে। নয়ন দাঁড়িয়ে থাকে সোমারই মুখের দিকে তাকিয়ে, কথা হারিয়ে। এই সন্ধ্যারাতের পৃথিবী যেন নিজে মুখর হয়ে লাইব্রেরী ঘরের নিভৃতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা একটি মৌন সান্নিধ্য রচনা করে দিয়েছে এবং এই পৃথিবীর ইতিহাস যেন চেষ্টা করে এক সুদূরপরাহতাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে, নয়নেরই জীবনের উপহাররূপে। নয়নের মুখের ভাষা এই আবেগময় মুহূর্তে হারিয়ে যাবারই কথা।

কথা বলে সোমা—আপনার কি অনেক টাকা আছে নয়নবাবু?

নয়ন চমকে উঠে বলে—তা আছে।...কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করছো কেন সোমা?

এই সান্নিধ্যের মোহময় স্পর্শেই বোধ হয় নয়নের মুখের ভাষা সোমার এত কাছাকাছি চলে এসেছে। সোমা নয়নের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

সোমা জিজ্ঞাসা করে—দেশের কাজে আপনার বোধ হয় অনেক টাকা খরচ হয়ে যায়?

নয়ন—হ্যাঁ, গত এক বছরে সবসুদ্ধ প্রায় এগার হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে।

সোমা—আমার জন্য কত খরচ করেছেন?

নয়ন বিব্রতভাবে বলে—তোমার জন্যে?...ও বুঝেছি, নশো টাকারও বেশী তোমার মাকে পাঠিয়েছি।

সোমা—আপনি অনেক উপকার করেছেন নয়নবাবু।

নয়ন—উপকার করা সার্থক হয়েছে সোমা, তার চেয়ে ঢের বেশী প্রতিদান পেয়ে গেছি।

সোমা—এখনও পাননি নয়নবাবু।

নয়ন কৃতার্থভাবে বলে—সেদিনও আর বেশী দেরি নেই সোমা।

সোমা চকিতে আর একবার নয়নের দিকে তাকায়।—আপনি একটা বিরাট শিশু-শিক্ষার কেন্দ্র খুলবেন বলেছিলেন, তার কি হলো?

নয়ন—আর তো কোন প্রয়োজন নেই সোমা।

সোমা—কেন?

নয়ন—যার জন্যে সে পরিকল্পনা করেছিলাম, সে তো আমার ঘরেই এসে গেছে।

সোমা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, জানলার গা-ঘেঁষা লতাবিতানের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে বোধ হয় তার চোখের দুঃসহ চাঞ্চল্যকে সংযত করে।

সোমা বলে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো নয়নবাবু?

নয়ন—বল।

সোমা—যদি এক বছর আগে চক্রবেড়ে থেকে আমার একখানা ফটো পাঠিয়ে দিয়ে কেউ আপনাকে অনুরোধ করতো আমাকে বিয়ে করার জন্যে, আপনি রাজি হতেন?

নয়ন চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবে, নিজের মনের দিকে তাকিয়ে উত্তর খোঁজে এবং

অসঙ্কোচেই সত্য কথাটা বলে—রাজি হতাম না।

সোমা—আজ কেন রাজি হয়েছেন?

নয়ন—তুমি তো আজ একটা ফটো নও সোমা, তুমি আজ রূপকথা।

সোমা—এ রূপকথাকে তো আপনি রূপ দেননি নয়নবাবু, তবে তার ওপর আপনার লোভ কেন?

নয়ন—জীবনে জয়ী হতে, সুখী হতে, কার না লোভ হয় সোমা? তোমাকে পেলেই যে আমার সব জয় আর সুখ পূর্ণ হয়।

সোমা—খ্যাতিও পূর্ণ হয়, ত্রিশটা গ্রামের ভোটও জয় করা হয়।

নয়নের সব কথার আগ্রহ হঠাৎ আহত হয়, কিন্তু এই সন্ধিক্ষণে নয়নের মনের কপাট যেন খুলে গিয়েছে, কোন কথাকেই মিথ্যা দিয়ে সাজিয়ে বলতে চায় না নয়ন। নয়ন বলে—হ্যাঁ, তাও হয় সোমা।

সোমা প্রশ্ন করে—কিন্তু ত্রিশটা গ্রামের ভোট আর পরের তৈরী রূপকথাকে জয় করবার কি অধিকার আপনার আছে নয়নবাবু?

নয়নের মুখ চোখ থেকে সব আগ্রহের চাঞ্চল্য যেন কিছুক্ষণের মত মুছে যায়। মনের গভীরে অতি বিশ্বাসে লালিত একটা প্রত্যয় হঠাৎ ভাঙনের টানে যেন কেঁপে উঠেছে। লাইব্রেরী ঘরের এই নিভৃত সান্নিধ্য থেকে সব মায়ার আবরণ মুছে গিয়ে একটা কঠিন আদালতের মত হয়ে উঠেছে। সোমার নির্মম জেরার উত্তরে নয়ন যেন আত্মরক্ষার জন্য সেই একটি মাত্র চরম প্রমাণ উপস্থিত করে—নিতান্ত ফাঁকির ওপর আমি এই অধিকার চাইছি না সোমা। আমি টাকা দিয়েছি।

সোমা—টাকার জোরেই আপনি জীবনে সব অধিকার পেতে চান?

নয়নের দৃষ্টিটা একেবারে অসহায় হয়ে যায়—এ ছাড়া আমার আর কি জোর আছে সোমা?

নয়নের এই অসহায় ও অকপট দৃষ্টির আবেদন সত্যিই করুণা করার মত। সোমাও বোধ হয় ক্ষণিকের করুণায় নয়নের মুখের দিকে একবার তাকায়, কিন্তু পরমুহূর্তে অন্য রকম হয়ে যায়।

কোমল চিবুক দিয়ে গড়া সোমার মুখটা অদ্ভুত রকমের কঠোর হয়ে ওঠে। নয়নের মনে পড়ে—এ মেয়েকে দেখে যা মনে হয়, আসলে সে তা নয়। আজও সেই কথাগুলি হয়তো একই আছে, কিন্তু অর্থটা উলটে গেছে কি ভয়ানকভাবে। সোমার দিকে তাকিয়ে নয়নের দৃষ্টি আবছা শঙ্কায় মেদুর হয়ে উঠতে থাকে।

সোমা বলে—তাহলে টাকার জোরেই আমাকে কিনতে চাইছেন?

নয়ন—আমি তোমাকে চাই সোমা।

সোমা—আমি আপনাকে চাই কি না, সে খোঁজ করেছেন?

নয়ন—তুমি কেন চাইবে না সোমা?...আমি কি তোমার পক্ষে না চাইবার মত মানুষ?

সোমার ললিত ভুরুর শান্ত ভঙ্গিমা মুহূর্তে কুটিল হয়ে ওঠে। ঠোঁটে দাঁত চেপে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রতিধ্বনিত হবার প্রতীক্ষায় থেকে থেকে চরম উত্তরটা এতক্ষণে যেন সোমার মুখের কাছে এসে গিয়েছে। টাকার জোরে মানুষের বিশ্বাসটাও কী ভয়ংকর বড়লোক হয়ে উঠেছে। নয়ন তার বক্তব্য অকপটভাবেই বলেছে। সোমাও অকপটভাবেই শেষ উত্তর দিয়ে দিতে চায়। এই কাঞ্চনগর্বিত বিশ্বাসকে চূর্ণ না করে দিলে সংসারে মানুষ আর নিশ্চিন্ত মনে প্রীতির ঘরে বাস করতে পারবে না।

সোমা বলে—কিন্তু আমি যে একজনকে চেয়ে বসে আছি নয়নবাবু।

নয়নের কণ্ঠস্বর যেন চূর্ণ হয়ে যায়—কি বললে?

সোমা শান্তভাবে বলে—প্রবীর মাস্টার আমারই অপেক্ষায় রয়েছে।

ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বের হয়ে চলে যায় নয়ন। সন্ধ্যার আলোকিত মণ্ডপে তখন দু'একজন করে অভ্যাগত আসছেন, উৎসবের বাতাস আর একটু বিহ্বল হয়ে বাগানের লতাপাতায় দুলছে। হাজার হাজার প্রাণের ভোট আত্মসাৎ করে মতিগঞ্জের প্রহেলিকা আরও সুন্দর হয়ে এক অভিসন্ধির বাসর রচনা করে চলেছে। দুঃখের শ্মশান কাঞ্চীপুর এখান থেকে অনেক দূর, যেখানে সপ্তর্ষিরা এক-একদিন আকাশ থেকে নেমে আসেন ভূতলে।

লাইব্রেরী ঘর থেকে বাইরে এসে সোমা ডাকে—চল শঙ্কর।

সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চীপুরের একটা প্রতিশোধ যেন তার কাজ শেষ করে চৌধুরী ভবনের ফটক পার হয়ে সন্ধ্যার কোলে লুকিয়ে পড়ে।

কাঞ্চীপুরের শিশুভবন এতদিন পরে নিস্তব্ধ, কাকলিহীন বনবীথির মত। শিশু আর কেউ নেই, একটি দুটি করে সবাই একে একে চলে গিয়েছে। শুধু ছিল ভোলা। ভোলাকেও প্রবীর মাস্টার এসে একদিন নিয়ে চলে গেল, ঠাকুরপুরের পাগলা বাউল অভিরামের বাড়ি। অভিরামের পাগলি বউ আদর করে ভোলাকে কোলে তুলে নিয়েছে।

সন্ধ্যা হয়ে গেলেও অনেকক্ষণ ধরে অভিরামের কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় চুপ করে বসেছিল প্রবীর মাস্টার। কোথাও যাওয়ার বোধ হয় আর তাড়া নেই, তার কাজ ফুরিয়ে গিয়েছে।

অভিরাম বলে—আজ এখানেই থাকুন না কেন মাস্টার মশাই।

প্রবীর বলে—না, আমি এখনি চলে যাব।

অভিরাম—কোথায় যাবেন?

প্রবীর উত্তর দিতে পারে না। কোথায় যাবার আছে, আজ চেষ্টা করেও স্মরণ করতে পারে না প্রবীর। কিন্তু পাগলা অভিরামের মনে এই কৌতূহল কেন? কোনদিনও তো সে এত সমবেদনা দিয়ে প্রবীর মাস্টারের মত দুরন্তের যাওয়া বা না-যাওয়ার ঠাঁই চিন্তা করে কোন কৌতূহল দেখায়নি?

প্রবীর ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায়—আমি চললাম অভিরাম।

প্রবীরের সঙ্গে সঙ্গে অভিরামও আসতে থাকে। প্রবীর বলে—তোমাকে আসতে হবে না অভিরাম, তুমি ঘরে যাও।

অভিরাম—না। জলার কিনারা দিয়ে আপনাকে একা একা যেতে হবে, রাতের বেলা পথটা ভাল নয় মাস্টার মশাই, আমি আপনাকে পথটা পার করে দিয়েই চলে আসবো।

প্রবীর—পথটা ভালই, আজই তো ওপথে এসেছি।

অভিরাম চিন্তিতভাবে বলে—আমি সে ভালর কথা বলছি না মাস্টার মশাই। একটা খারাপ ব্যাপার দেখা দিয়েছে। রাতের বেলা কেউ আজকাল ওপথে হাঁটে না।

প্রবীর উৎসুকভাবে প্রশ্ন করে—খারাপ ব্যাপার আবার কি?

অভিরাম ভয়ার্ত স্বরে বলে—এই জলার মধ্যে এক নাগকন্যে দেখা দিয়েছে মাস্টার। আমি নিজের চোখে দেখেছি, আমার পাগলিও দেখেছে, আরও অনেকে দেখেছে।

ঠাকুরপুরের বিল থেকে শাখার মত একটা শালুকভরা জলা পথটার গা ঘেঁষে কিছুদূর চলে গিয়েছে। জলার কাছে এগিয়ে আসতেই অভিরাম চাপা গলায় বলে—এই, এখান থেকেই পথটা ভাল নয় মাস্টার মশাই।

প্রবীর হাসতে থাকে—ওসব চোখের ভুল অভিরাম। তুমি বাড়ি যাও।

অভিরাম হঠাৎ প্রবীরের হাত চেপে ধরে সন্ত্রস্তভাবে ফিসফিস করে বলে—চোখের ভুল নয় মাস্টার মশাই, ঐ দেখুন, স্বচক্ষে দেখে নিন।

প্রবীর বিস্মিতভাবেই দেখতে থাকে, নিকটেই জলার কিনারায় অন্ধকারের মধ্যে একটা

ছায়ামূর্তি নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। ছলাক করে একটা জলের আলোড়নের শব্দও শোনা যায়। কিছুক্ষণের মত একেবারে অস্পষ্ট হয়ে থাকে, আবার ছায়ামূর্তিটা একটু দূরে গিয়ে নড়তে থাকে।

প্রবীর বলে--চল অভিরাম, এগিয়ে গিয়ে দেখে আসি।

অভিরাম প্রবীরকে বাধা দেয়--খবরদার নয় মাস্টার মশাই।

প্রবীর অভিরামকে একরকম জোর করে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যায়। মানুষের পায়ের শব্দে ছায়ামূর্তিটা পালিয়ে না গিয়ে ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসতে থাকে। একেবারে সামনে এসে বিড়বিড়ি করে বলে--মরতে দিবি না মুখপোড়া, কি ভেবেছিস তোরা? আমাকে মরতে দে, নয় তোরা মর।

নাগকন্যা নয়, একটা মেয়ে, হাতে একটা মাটির কলসী, আর দড়ি। মেয়েটার মাথা খারাপ হয়েছে বলে মনে হয়। বিড়বিড় করে আবোলতাবোল বকতে থাকে মেয়েটা।

প্রবীর জিজ্ঞাসা করে--তোমার বাড়ি কোথায় গো?

মেয়েটা এক আছাড় দিয়ে কলসীটা চূর্ণ করে--আমার বাড়ি এই জলায়।

আর কোন কথা না বলে সেখানেই কাদাটে মাটির উপর বসে পড়ে মেয়েটা, আর সুর করে টেনে টেনে কাঁদতে আরম্ভ করে, কখনো ফুঁপিয়ে, কখনো গুমরে।

অভিরাম এতক্ষণে নির্ভয় হয়ে গিয়েছে, কান্নাময়ী নাগকন্যার একেবারে মুখের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে--তোমার বাড়ি কোথায় বাছা? কোন্ গাঁয়ে?

কান্না থামিয়ে মেয়েটা বলে--উত্তর ঠাকুরপুর।

অভিরাম চমকে পিছিয়ে আসে। প্রবীর মাস্টারের কানে কানে বলে--আমি এতক্ষণ যা ভাবছিলাম তাই সত্যি হলো মাস্টার মশাই।

প্রবীর--কি?

অভিরাম--মেয়েটা মানিক চৌকিদারের বউ।

প্রবীর শিউরে ওঠে, চোখ বন্ধ করে, যেন তার গলার উপর একটা চকচকে পালিশ করা কাটারির কোপ পড়েছে। অভিরামের হাতটা শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে প্রবীর, তবু কাঁপতে থাকে। অভিরাম আশ্চর্য হয়।

অভিরাম প্রবীরের কানের কাছে ফিসফিস করে--মেয়েটা আত্মহত্যা করতে এসেছিল মাস্টার মশাই।

প্রবীরের চোখ দুটো যেন এক ভয়ংকর শূন্যতার মধ্যে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। শুধু দূর ঠাকুরপুরের বিলটাকে একটা রক্তময় হ্রদ বলে মনে হয়।

অভিরাম আবার কানে কানে বলে--মেয়েটাকে পোয়াতি বলে মনে হলো মাস্টার মশাই।

ভুল ভেঙে যায়। প্রতিশোধের থিওরীর মত এত বড় মূর্খ মনের সৃষ্টি সংসারে বোধ হয় আর নেই। অভিরামের কাঁধের উপরেই প্রবীরের মাথাটা অবশ হয়ে ঝুঁকে পড়ে। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় পুড়ে পুড়ে প্রবীরের মনের ভিতর থেকে পুঞ্জীভূত একটা হিংস্র অন্ধকার নিঃশ্বাসের বাতাস জ্বালিয়ে দিয়ে ছুটে বের হয়ে যায়। একটা করুণ আর্তনাদ অস্ফুট স্বরে বুক ঠেলে বের হয়ে আসে--মাপ কর, শাস্তি দাও।

অভিরাম আরও আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে--আপনি এমন কেন করছেন মাস্টার মশাই? ভয় পেলেন কেন?

মুহূর্তের মধ্যে শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে প্রবীর বলে--না, কিছু নয়! একটা ব্যবস্থা করতে হয় অভিরাম।

অভিরাম--কি করতে হবে বলুন।

প্রবীর--একে এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে তো, মরতে দিতে পারি না।

অভিরাম সমাদরের সুরে মানিক চৌকিদারের বউকে অনুরোধ করে—তুমি ঘরে যাও বাছা।

মানিকের বউ যেন শ্রান্তভাবে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলে—ওকথা আর বলোনি বাবা, একা ঘরে থাকতে পারবো না, আবার মরতে ছুটে আসবো।

কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে প্রবীর কি যেন ভেবে নেয়, তারপর মানিকের বউয়ের কাছে এগিয়ে এসে ডাক দেয়—কোন ভয় নেই, একা ঘরে তোমাকে থাকতে হবে না, তুমি এস।

মানিকের বউ মুখ তুলে তাকাবার চেষ্টা করে—কোথায় যাব?

প্রবীর—সবাই আছে যেখানে, সবাই তোমাকে দেখবে। কোন চিন্তে করো না, এস।

মানিকের বউ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। অভিরাম জিজ্ঞাসা করে—আমিও কি সঙ্গে যাব?

প্রবীর—না, থাক। তুমি বাড়ি যাও।

প্রবীর মাস্টারের পিছু পিছু নাগকন্যার মূর্তিটাও যেন অন্ধকারে পথ করে নিয়ে ধীরে ধীরে চলতে থাকে, আশ্রয়ের নীড় খুঁজতে।

এবং মাঝরাত্রে শূন্য শিশুভবনের দরজা খুলে এক নিদ্রাহীন কর্মদাসীর শীর্ণ মূর্তি প্রদীপ হাতে বাইরে বেরিয়ে এসে আশ্চর্য হয়—এ কাকে নিয়ে এলে মাস্টার?

প্রবীর উত্তর দেয়—এর ঘরে কেউ নেই, স্বামী মারা গেছে।

তারার মা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে—আহা! কি হয়েছিল গো? কবে মারা গেল?

প্রবীর হঠাৎ বলে ফেলে—দেশের কাজে, এই কদিন আগে।

মানিকের বউয়ের হাত ধরে তারার মা বলে—আয় বাছা, ভেতরে আয়।

প্রবীর চলে যায়। যেন এই জন্মের কাজ ফুরিয়ে দেবার আগে আর একটা নতুন কাজের সূচনা করে রেখে গেল প্রবীর, এক নতুন জন্মলগ্নের ভরসায়। এর বেশী সে আজ আর কিছু বুঝতে পারে না, বুঝতে চায় না, বুঝবার শক্তি নেই। নেহাৎই ঝোঁকের মাথায় শূন্য শিশুভবনকে যেন মাতৃভবন করে দিয়ে আবার পৃথিবীর অন্ধকারে পালিয়ে যায় প্রবীর মাস্টার।

সকালবেলা টেবিলের উপর খাতাপত্র নিয়ে বসেছেন ভরাকুল থানার ইনচার্জ। এবং বাইরের দরজার দিকে একবার মাত্র তাকিয়েছেন ; সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কিত হয়ে হুইসিল বাজাতে থাকেন, তীব্রভাবে, জোরে জোরে।

এক মিনিটের মধ্যে কনস্টেবলের দল এদিক ওদিক থেকে দৌড়ে এসে বারান্দার উপরে প্রবীর মাস্টারের শান্ত মূর্তিটাকে চারদিকে থেকে ঘিরে ধরে।

প্রবীর বলে—আমি ধরা দিতেই এসেছি।

ইনচার্জের আতঙ্কিত মুখ তখনি হাস্যময় হয়ে ওঠে—আসুন, আসুন। আমি জানতাম আপনি নিজেই আসবেন, আর সেজন্যেই আপনাকে ধরবার জন্যে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিনি।

ইনচার্জ বেশ খাতির করে প্রবীর মাস্টারকে সামনের চেয়ারের উপর একটু ভাল করে বসবার জন্য অনুরোধ করেন।

আর কালবিলম্ব না করে চালান লিখতে আরম্ভ করেন। দুজন কনস্টেবল বন্দুক নিয়ে প্রবীর মাস্টারের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে। লিখতে লিখতে একটু পুলকিতভাবে ইনচার্জ বলেন—তারপর...প্রবীরবাবু?

প্রবীরের কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে ইনচার্জ পরক্ষণেই উৎসাহিতভাবে প্রেরণা দিয়ে ওঠেন—বিষণ্ণ হবেন না, বিষণ্ণ হবেন না।

ইনচার্জ প্রমত্তভাবে লিখতে থাকেন। এক এক মুহূর্তে চিন্তা করেই এক একটা পাতা

লিখে ভরে ফেলেন। চালান লেখা শেষ করে আবার কি একটা রিপোর্ট লেখেন। রিপোর্ট লেখা শেষ করে আবার নানারকম মন্তব্য লিখতে থাকেন।

প্রবীরের হাসির শব্দে হঠাৎ চমকে উঠে একটু বিস্মিতভাবে তাকিয়ে ইনচার্জ জিজ্ঞাসা করেন--কি হলো?

প্রবীর--সারা রাত ধরে সমগড়ের কাঠের পুলের নীচে পাহারা রেখে আমাকে কেরোসিনের টিন আর তার-কাটা যন্ত্রপাতি সমেত ধরে ফেলেছেন আপনি?

টেবিলের উপর রাখা রিপোর্টটা দু হাত দিয়ে ঢেকে ইনচার্জ যেন অভিমান করে বলেন--কেন আমাকে অপ্রস্তুত করছেন মশাই? এদিকে আবার নজর দেন কেন?

প্রবীর--ওসব লিখে কি লাভ হচ্ছে?

ইনচার্জ একটু গম্ভীর হয়ে বলেন--আপনার লাভ নেই ঠিকই, কিন্তু আমার আছে প্রবীরবাবু। সামান্য একটু কায়দার জোরে বেটা গবর্নমেণ্টের হাত থেকে যদি দুটো হাজার টাকা নিজের হাতে আনতে পারি, সেটাও একটা পেট্রিয়টিক কাজ হবে না কি?

টেবিলের দেরাজ থেকে বাংলা গবর্নমেণ্টের একটা পুরস্কারের ইস্তাহার বের করে প্রবীরের দিকে দেখিয়ে ইনচার্জ ফিক করে হেসে ফেলেন।--আমি মন-খোলা মানুষ প্রবীরবাবু, রেখে ঢেকে কথা বলি না, তাতে আমাকে যা-ই ভাবুন না কেন?

প্রবীর কিছুই ভাবেনি এবং ইনচার্জও প্রবীরকে আর বেশীক্ষণ ভাবাবার চেষ্টা করেননি। নথিপত্র নিয়ে, কোমরের বেল্টে রিভলবার ঝুলিয়ে, আর চারজন বন্দুকধারী কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে ভরাকুল থানার বন্দী প্রবীর মাস্টারকে নিয়ে ইনচার্জ রওনা হয়ে যান। পথে চলতে চলতে ইনচার্জ বলেন--আমাদের একটা অপরাধ মাপ করতে হবে প্রবীরবাবু, অবিশ্যি এক্ষুনি নয়।

প্রবীর--কি?

ইনচার্জ বলেন--নরসিংহতলা পর্যন্ত হলো আমার এলাকা। ততদূর পর্যন্ত আমি আপনাকে বন্ধুভাবেই নিয়ে যাব। কিন্তু তারপরেই হাতকড়া পরতে হবে। বুঝছেনই তো, আপনি তো আর যে-সে অফেণ্ডার নন।

ইনচার্জ হঠাৎ দুঃখিতভাবে আপসোস করেন--বেশ তো মাস্টারী করছিলেন, মিছিমিছি এতগুলি বিশ্রী বিশ্রী চার্জে কেন পড়লেন মশাই! আপনার জন্যে চিন্তা হয়।

প্রবীর বলে--হাতকড়া এখনি দিতে পারেন, আমার কোন আপত্তি নেই। শুধু একটা অনুরোধ আছে ; যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে তবে...।

ইনচার্জ--বলুন বলুন।

প্রবীর--নরসিংহ মন্দিরের সামনে আমাকে একটু থামতে দেবেন, এই সামান্য কিছুক্ষণ। আমি মন্দিরের বাইরে থাকবো, ভেতরে যাব না।

--বেশ বেশ। ইনচার্জ প্রবীরকে আশ্বাস দিয়ে জোরে জোরে হাঁটতে থাকেন। পথচলার তালে তালে বেলাও চড়ে ওঠে, জেলা বোর্ডের সড়কের ধুলো গরম হয়। একটানা হেঁটে এসে সবন্দী পুলিস দলের ঘর্মাক্ত অভিযান একেবারে নরসিংহতলার বটকুঞ্জের ছায়ায় ঢুকে শান্ত হয়।

একজন কনস্টেবল মন্দিরের দরজা খুলে দেয়, প্রবীর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণ মাত্র, দেখা শেষ হয়।

একজন কনস্টেবল প্রবীর মাস্টারের হাতে হাতকড়াটা লাগাবার জন্য এগিয়ে আসে। ইনচার্জ হঠাৎ বলে ওঠেন--এই, সবুর কর।

পথের বিপরীত দিক থেকে দুটি আগন্তুক মূর্তির দিকে সুতীব্র কৌতূহলে চোখ দুটো বড় বড় করে তাকিয়ে থাকেন ইনচার্জ। তার পরেই কেমন একটু বেদনাচ্ছন্ন স্বরে বলেন--এঃ,

আপনাকে মস্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেললাম প্রবীরবাবু।

বটকুঞ্জের অপর দিক থেকে পথ ধরে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসছে সোমা, সঙ্গে বাণীপীঠের একটি বিদ্যার্থী ছেলে, শঙ্কর।

ইনচার্জ ছটফট করে প্রবীরের চারদিকে পাক দিয়ে ঘুরতে লাগলেন ; কি করবেন কিছু যেন ভেবে উঠতে পারছেন না। পীনাল কোডের পৃথিবীর বাইরে থেকে যেন একটা বেসরকারী মমতা এসে ইনচার্জকে ক্ষণিকের মত বিচলিত করে দিয়েছে।

ইনচার্জ কনস্টেবলদের একটু তফাতে সরে যেতে বলেন। তারপর প্রবীরের মুখের দিকে তাকিয়ে অনুযোগ করতে থাকেন--এঃ, আপনি আমাকে বড় অপ্রস্তুত করলেন মশাই, এমন জানলে এ-পথে আসতাম না।...মুশকিল হচ্ছে, সবই জানি কিনা, সবই জানি।

সোমা প্রায় কাছে এসে পড়েছে। ইনচার্জ বিচলিতভাবে অনুরোধ করেন--যা কথাটথা বলার আছে, দুটি মিনিটের মধ্যে সেরে নিন মশাই। আর আমাকে অপ্রস্তুত করবেন না।

বলতে বলতে ইনচার্জ সরে যান, কিছুটা দূরে গিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকেন।

শঙ্কর একটা বটের ছায়ায় দাঁড়িয়ে মুখের ঘাম মুছতে থাকে। সোমা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে প্রবীরের সামনে দাঁড়ায়।

মাত্র দুটি মিনিট সময়, একটা মিনিট নিঃশব্দের মধ্যেই মিলিয়ে যায়, শুধু প্রাণভরে দেখে নেবার আবেগে। এতদিনে সব দেখার ইতিহাস যেন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

সোমা যেন তার নিঃশ্বাসের শব্দ দিয়ে আস্তে আস্তে বলে—কবে আসছো?

প্রবীর—কোথায়?

সোমা—আমার কাছে?

প্রবীর—কেন সোমা?

সোমা—চিরকালের মত আমার আপন হয়ে থাকতে?

প্রবীর—ডেকে নিও, আসবো।

শঙ্খধ্বনিময় ও বড় মধুর এক উৎসবের বর্ণচ্ছটা যেন প্রবীরের মুখটাকে ক্ষণিকের মত রঙীন করে তোলে। বটকুঞ্জের নিবিড়তা ভেদ করে প্রবীরের দৃষ্টিটা কয়েক মুহূর্তের মত দূরান্তরের সীমা ছুঁয়ে সীমাহারা হয়ে যায়।

ইনচার্জ দূরে দাঁড়িয়ে গলাঝাড়া দিয়ে একবার কাশেন।

সোমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রবীর শান্তভাবে হাসে—আসি সোমা।

সোমা—এস।

প্রবীর চলে যায়। দু হাত জোড় করে নমস্কার করে সোমা। আর যা-কিছু বলবার ছিল, কিন্তু বলা হলো না, একটি নমস্কারেই যেন সব জানিয়ে দিতে চায় সোমা। শুধু তার অনুরাগে গড়া ঐ বল্লভের মূর্তিটি কেউ নয়, যেন এক মহৎ দুঃখের শৌর্যময় মূর্তিকে নির্ভয় প্রীতি দিয়ে আজ নমস্কার করে সোমা। কাব্যতীর্থের মন্ত্রকে, সাতটি প্রদীপের আলোককে ; শুচি-জনা-সিন্ধু-সুরভির হৃদয়শোণিতে পূত কাঞ্চীপুরের মাটিকে আজ যেন পূজারিণীর মত অভ্যর্থনা জানায় সোমা, একটি নমস্কারে।

শূন্য শিশুভবনের দাওয়ার উপর সেই শীতের মধ্যাহ্নে জীর্ণমূর্তি একটি বিনে-মাইনের চাকরানির শরীর টান হয়ে শুয়ে ছিল--তারার মা। একটা মেয়াদহীন আয়ু, যেন যাই-যাই করেও যেতে পারছে না। দিন ফুরিয়ে এসেছে, কিন্তু কাজ ফুরোয় না।

সোমার পায়ের শব্দে আস্তে আস্তে মাথা তুলে তাকায় তারার মা। সারা মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সোমা দেখেই বুঝতে পারে, এটা ক্লান্ত প্রদীপের হাসি।

—এসেছ গুরুমা! আমি বাঁচলুম।

—এসেছি তারার মা।

সোমা এগিয়ে এসে তারার মার হাত ধরে কাছে বসে। চারদিকে তাকিয়ে, শিশুভবনের স্তব্ধতাকে একটু করুণ করে দিয়ে সোমা জিজ্ঞাসা করে—ছেলেমেয়েরা বুঝি সব চলে গেছে তারার মা?

তারার মা—হ্যাঁ।

গুরুমা আর তারার মা, শিশুহীন শিশুভবনের দুটি মা যেন শূন্য ঘরের বেদনার মধ্যে নিঃশব্দে বসে থাকে। পাশের ঘরের ভিতরে একটা আর্তশব্দ হঠাৎ বুকছেঁড়া বেদনায় আকুল হয়ে ওঠে—মা মা মা...রক্ষে কর।

—ও কে? সোমা চমকে উঠে দাঁড়ায়।

তারার মা বলে—একটি বউ রাত্তির থেকে এখানে রয়েছে। ভেতরে গিয়ে একবার দেখে এস গুরুমা। পেটের কাঁটা বুঝি নামলো এতক্ষণে।

সোমা ঘরের ভিতরে যায় এবং কিছুক্ষণ পরেই বাইরে এসে দাঁড়ায়। আঙিনায় তুলসীঝারি থেকে একটি একটি করে জলের ফোঁটা মুহূর্তের আয়ু নিয়ে ঠিক ছন্দ রেখে ঝরে পড়ছে, যেন এক জন্মলগ্নের কোলে।

বুঝতে পারে সোমা, এক নতুন মাতৃভবনে সে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তার শিশুভবনও ঠিকই আছে।

এখন অনেক কাজ আছে। সোমা ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

গল্প

আগুন আমার ভাই

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বৈশাখী বিকালের জ্বালাভরা আক্রোশের আঁচ এখন জুড়িয়ে গিয়েছে, যদিও আকাশের পশ্চিমে এখনও একটু রঙিন আভা দেখা যায়। এমনি এক লগ্নে গরানহাটার সেই গলির বাতাসে এক ভয়াল জ্বালার আভা রঙিন হয়ে ফুটে উঠল। সেই সঙ্গে যেন চাপ-চাপ নিরেট ধোঁয়ার কুণ্ডলী প্রকাণ্ড বাড়িটার তিনতলার যত জানালা, যত ঘুলঘুলি আর যত রন্ধ্রপথ ভেদ করে ঠেলে উঠতে থাকে। সারা পথের উপর হাজার মানুষের ভিড় চেঁচায়, হায়-হায় করে, আর হঠাৎ যেন এক-একটা দমকা আতঙ্কের ঠেলায় দশ-পা পিছিয়ে যায় ; আবার হৈ-হৈ করে দু-পা এগিয়ে আসে।

আগুনের সঙ্গে লড়াই করে যারা, তারাও এসে গিয়েছে। জোর লড়াই চলছে। গলির বাতাস ঝনঝনিয়ে দমকলের ঘণ্টার শব্দ মরিয়া হয়ে দৌড়ে আসতে থাকে। যেন গভীর আতঙ্ক আর শান্ত উল্লাসের বাজনা। এগিয়ে যায় এক-একটি ফায়ার-ইঞ্জিন, যার বুকের কাছে সুডোল ট্যাঙ্কের ভিতর চারশো গ্যালন জল টলমল করে।

ছুটছে জলের ফোয়ারা। কিন্তু কী ভয়ানক রাগী আগুন! লকলকে রক্তবরণ শতশত শিখার সেই নাচন যেন বিভোর হয়ে প্রচণ্ড এক জ্বালার উৎসব মাতিয়ে তুলেছে। তার কাছে পৌঁছবার আগেই গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে জলের ফোয়ারা, কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীর সঙ্গে সাদা বাষ্পের কুণ্ডলী জড়াজড়ি করে উপর আকাশের দিকে পালিয়ে যায়।

ফায়ার বিগ্রেডের একদল ক্রু ছুটে ছুটে খাটছে। পাশের বাড়ির তিনতলায় উঠে দশটি হোস-পাইপের মুখ উঁচিয়ে ধরে পোড়া বাড়ির ধোঁয়াভরা জানালাগুলির উপর ওরা জলের ফোয়ারা ছুঁড়ে মারছে। মনে হলো, একটা ঘর ভিজেছে, ঠাণ্ডা জলের মার খেয়ে আগুন মরেছে, জানালা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে সরু সরু জলের ধারা।

কিন্তু তারপর আবার। কোথা থেকে সেই দুর্মর আগুনের জ্বালা যেন রঙিন হাসি হেসে জানালার বুকটাকে আভাময় করে তোলে। পাশের ঘরের জানালাতেও আগুনের রঙিন আলো ধকধক করে।

আগুন-লাগা বাড়ির দোতলা আর একতলার সব লোক অনেক আগেই নীচে নেমে গিয়েছে। একটা ঘরের ভিতরে তখনও শ্বাস টানছিল এক মরমর রোগী। তাকেও কারা যেন বিছানাসুদ্ধ তুলে নিয়ে দুলতে দুলতে দোতলা থেকে নেমে এলো।

কিন্তু তিনতলাতে যারা থাকে, তারা কোথায় গেল? তারা সবাই কি নেমে আসতে পেরেছে? ক্রু-মাস্টার ব্যস্ত হয়ে ভিড়ের লোকের কাছ থেকে জানতে চায়। লোকে বলে তিনতলার সবই হলো বে-আইনী কাপড়ের গুদাম। কেউ কেউ বলে, কোন কোন ঘরে বে-আইনী মেয়েমানুষও থাকে।

যাই হোক, মেয়েমানুষগুলোও নেমে আসতে পেরেছে বলে মনে হয়। নইলে এতক্ষণে কোনও-না-কোন সাড়া পাওয়া যেত। এই দশ মিনিটের মধ্যে ওই তিন তলার কোন জানালা থেকে কোন আর্তস্বর শোনা যায়নি। কোন জানালায় কোন আতঙ্কিত মুখ উঁকি দিয়ে কেঁদে ওঠেনি। মনে হয় তিনতলার আগুনটা কোন জীবন্তের প্রাণকে ছাই করে দেবার আনন্দে নয়, শুধু বে-আইনী লোভের কতকগুলি বস্তুপিণ্ডকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে হাসছে। আগুনটাকে তেমন নিষ্ঠুর বলে মনে হয় না। গরানহাটার এই কুৎসিত গলিটাকেও কোনদিন এত সুন্দর আর এত রঙিন দেখায়নি।

ফায়ার বিগ্রেডের ক্রু কাশীনাথও বোধহয় এই কথাটাই চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবছিল, আর তিনতলার রক্তবরণ আগুনের উৎসবের দিকে যেন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিল। এখনও অর্ডার

হয়নি, কাশীনাথ এখন শুধু স্ট্যাণ্ড-বাই। হয়তো আর-এক মুহূর্ত পরে হুকুম গর্জে উঠবে, তারপর আর এক মুহূর্তও দেরি হবে না। আগুনের ওই জ্বালাভরা হালকা আর হিংসুক লাফালাফি ঠাণ্ডা করে দেবার জন্য ছুটে গিয়ে হোস-পাইপ হাতে তুলে নিতে হবে। বোধহয় দু' ইঞ্চি মনিটর জেট ছাড়তে হবে। জবর মার না মারলে ওই আগুনের দেমাক চূর্ণ হবে না। তৈরি হয়ে আছে কাশীনাথ।

আগুন দেখতে বড় সুন্দর। কত আগুন-লাগা বাড়ির জ্বলন্ত বুকের কাছে কতবার এগিয়ে যেতে হয়েছে। দেখেছে কাশীনাথ, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। দাউ-দাউ করে জিনিসপত্র পোড়ে ; আগুনের শিখাগুলি লক-লক করে। দেখে মনে হয়, যেন একদল রূপসী মেয়ে-ডাকাত হেসে হেসে আর নেচে নেচে ঘরের জিনিস লুট করে নিচ্ছে।

ভাবতে ভালো লাগে, বুকের ভিতরটা যেন নেশার মতো চনচনে আনন্দে শিউরে ওঠে। এই রকমই রাগী আগুনকে ঘায়েল করতে গিয়ে এই পাঁচ বছরের চাকরির জীবনে দু-দুবার ভয়ানক সাহসের খেলা দেখিয়েছে যে কাশীনাথ, তার চোখেও যেন বিদ্যুতের আগুন চমকে ওঠে। দুবার রূপার মেডেল পেয়েছে কাশীনাথ।

আগুন দেখতে বড় সুন্দর, কিন্তু আগুনকে তাই বলে ক্ষমা করতে ইচ্ছা করে না। গোখরো সাপের ফণাদোলানি নাচের মতো এই আগুনের নাচ দেখতে ভালো লাগলেও ভুলতে পারে না কাশীনাথ, এই আগুনের এক সর্বনেশে কামড়ে তার জীবনের সব আনন্দ বিষিয়ে গিয়েছে। আগুনে পোড়া ঘায়ের দাগে কাশীনাথের মুখের একটা দিকের গড়ন ভেঙেচুরে গিয়েছে। দেখলে মনে হয় মুখের উপর এক খাবলা ঘেয়ো মাংস শুকিয়ে রয়েছে। চোখ দুটো বেঁচেছে, কিন্তু সারা মুখটা কুৎসিত হয়ে গিয়েছে। নইলে, কাশীনাথের গায়ের রঙ, চোখের ভুরু আর খাড়া নাকের ধার দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না, এই মুখপোড়া কাশীনাথ সত্যিই দেখতে বেশ সুন্দর ছিল।

মুখের উপর আগুনে-পোড়া ঘায়ের সেই জ্বালা কবেই মিটে গিয়েছে। আগুন-লাগা বস্তির এক ঘরের ভিতর ঢুকে একটা কুষ্ঠ রোগীকে টেনে আনতে গিয়ে ঘরের জ্বলন্ত চালার একটা টুকরো কাশীনাথের মুখের উপর ভেঙে পড়েছিল। সেই কুষ্ঠ লোকটার গায়ে একটা ফোস্কাও পড়েনি, এমনই কায়দা করে লোকটাকে সাপটে জড়িয়ে ধরেছিল কাশীনাথ। রুপোর মেডাল পাওয়া গেল, কিন্তু...।

ক্রু মানিকদা বলেন, "এইবার একদিন একটা বড়লোকের বাড়ির কোন সুন্দরীকে আগুনের মরণ থেকে টেনে বাঁচিয়ে তোল্ কাশীনাথ, তারপর একটা সোনার গ্যালান্ট্রি পেয়ে যা।"

কিন্তু কাশীনাথ জানে যে, তার মুখের এই আগুনে-পোড়া ঘায়ের চিহ্ন, তার এই কুশ্রী মুখই তার জীবনের সব সোনা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। তাই তো বুকের ভিতর আগুন জ্বলে, দুঃসহ এক আক্রোশের আগুন। একবার সেই মেয়েকে চোখের কাছে আর হাতের কাছে পেতে চায়, যে তার এই কুরূপ মুখের দিকে তাকিয়ে ঘেন্না সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে গিয়েছে।

আজ তিন বছর ধরে, এই শহরের কত ভিড়ের কাছে গিয়ে তন্ন-তন্ন করে খোঁজ করেছে কাশীনাথ, কিন্তু তার দেখা পাওয়া যায়নি। মাত্র বার চারেক তার ঠিকানা পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু কাশীনাথ ছুটে গিয়ে তার গলা টিপে ধরবার আগেই, কে জানে কেমন করে ঠাহর করতে পেরে, সেই ঠগিনী মেয়ে সব ঠিকানা মিথ্যে করে দিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছে। আজও রেণুকার নাগাল পায়নি কাশীনাথ।

সাতপাক দিয়ে বিয়ে করা, কত আহ্লাদে ফুলশয্যা আর বউ-ভাত করা কাশীনাথের বউ সেই রেণুকা। একে তো টলটলে ডাগর ডাগর কালো চোখ, তার উপর বেশ বড় সুর্মার টান,

রেণুকার সেই মুখটি শুভদৃষ্টির সময় কেমন করে হেসে উঠেছিল, আজও মনে পড়ে কাশীনাথের। কই, সে হাসি তো ঠাট্টার হাসি ছিল না? সেই হাসির মধ্যে ঘেন্নাও ছিল না, শুধু একটু আশ্চর্য ছিল। বরং মনে হয়েছিল কাশীনাথের, রেণুকা বোধহয় ভাবছে যে, বরের মুখটাকে যত কুৎসিত বলে পাঁচজনে নানা কথা বলছে, তত কুৎসিত তো নয়। বাসরঘরেও ও-পাড়ার এক মুখকাটা মেয়ে ফিসফিস করে বলে ফেলেছিল, "মুখপোড়া বর"। মনে পড়ে কাশীনাথের, রেণুকা তখন কানে কানে অদ্ভুত একটা কথা বলেছিল, "পুরুষের আবার রূপ কী? টাকাপয়সা থাকলে সব পুরুষ সুন্দর।"

হঠাৎ বিয়ে নয়, বেশ তিনটি মাসের দেখাশুনার পর রেণুকা হাসি মুখে রাজি হয়ে কাশীনাথকে বলেছিল, "বেশ তো, যখন তুমি বলছ যে আমাকে সুখে রাখতে পারবে, তখন বউ করে ঘরে নিয়ে যাও।"

এক ঘণ্টা পর পর সিকি-মটর আফিম খায় আর কড়া চা টানে, জিরজিরে চেহারার এক মামা। আর যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণ পা ছড়িয়ে বসে দোক্তা চিবোয়, বেশ ভারী গতরের এক মামী। এহেন এক মামা-মামীর কাছে কালীঘাটের বস্তির এক কুঁড়েঘরের অন্ধকারে দিন কাটাত যে রেণুকা, তাকে এক শুভদিনে নিজের ঘরে আনবার জন্য সাতশো টাকা খরচও করেছিল কাশীনাথ।

মামা বলেছিল, "দেখ বাবাজীবন, যা কথা দিয়েছ তাই যেন হয়। মেয়েটা যেন সুখে থাকে।"

মামী বলে, "যখন নিজের মুখে বলছ যে, তুমি ভালো চাকরি করছ, অনেক সোনা-রুপো নাকি বকশিশ পাও, তখন এই মামা আর মামীর উপর একটু নজর রাখতে ভুলো না।"

সবই মনে পড়ে। কাশীনাথ যেন সত্যিই আশা করেছিল, রেণুকাকে বেশ সুখে রাখা যাবে! আর, বেচারা মামা আর মামীকেও মাঝে মাঝে কিছু সাহায্য করা যাবে। সেই আশার মধ্যে কোন ভুল ছিল না। কাশীনাথের মনের ইচ্ছার মধ্যে কোন ফাঁকি ছিল না।

কী ভয়ঙ্কর রাগী আগুন! আগুনটা যেন আক্রোশে মরিয়া হয়ে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে নীচের দিকে অনেকখানি গড়িয়েছে। দোতলার ঘরের তিনটে জানালায় ধোঁয়া দেখা যায়। পথের ভিড় আরও জোরে হায়-হায় করে।

আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে আগুনটার রূপ। জানালার খড়খড়ি দিয়ে ফুরফুরে পাপড়ির মতো হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে লাল নীল হলদে আর বেগুনী জ্বালার ফুল। আর-একটা জানালার ফাঁক দিয়ে এক সারি সাপের বাচ্ছার মতো লিকলিকে আগুনের সরু-সরু ফণা যেন এলোমেলো হয়ে কুঁকড়ে কুঁকড়ে দুলছে। একটা খোলা জানালা দিয়ে দেখা যায়, ভিতরটা হাপরের চুলোর মতো গনগন করছে। ঝটকা হাওয়ায় গরম ছাই লাফিয়ে লাফিয়ে উড়তে থাকে। ভিড়ের মানুষ ভয় পেয়ে দূরে সরে যায়।

আগুনের রকম দেখে বুঝতে পারে কাশীনাথ, সর্বনাশ অনেক দূর গড়াবে। আর, এক-একটা শক্ত আপদের সঙ্গে মরিয়া হয়ে লড়তেও হবে। ভালোই হলো। এই দশটা দিন শুধু নীল উর্দি চড়িয়ে আর লাল ফায়ার ইঞ্জিনের যত পিতলের ঠাণ্ডা পালিশের গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে, শুধু ঠাণ্ডা ডিউটি দিতে হয়েছে। দশ দিন পরে এই সন্ধ্যায় আগুনের ডাক শোনা গেল। দাঁতে দাঁত ঘষে কাশীনাথ। নিঃশ্বাসে জ্বালা ধরে যায়।

বোধহয় বুকের ভিতরের একটা ফোস্কা আজও জুড়িয়ে যায়নি, কটকট করে আজও জ্বলছে, তাই আগুন দেখলে কাশীনাথের প্রাণটাই যেন দাঁতে দাঁত ঘষে একটা প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞাকে শান দিয়ে আরও ধারালো করে তোলে। কোথায় লুকিয়ে থাকবে? কতদিন লুকিয়ে থাকতে পারবে, রূপের দেমাকে স্বামীর কুলে কালি দিয়ে পালিয়ে যাওয়া সেই

মেয়ে।

শুধু মানিকদা জানেন, এই পৃথিবীতে আর-কেউ জানে না, বিয়ের পর চারটে মাস যেতে না-যেতেই কেন পালিয়ে গেল রেণুকা, কাশীনাথের এত ভালোবেসে বিয়ে-করা সেই বউ! কাশীনাথের ছোট ঘরের ভিতর ঢুকে প্রথম দিনেই চমকে উঠেছিল রেণুকা। রেণুকার বড় বড় করে সুর্মা-আঁকা চোখের এতদিনের স্বপ্নটা যেন ঠকে গিয়েছে। এমন একটা ঘর বোধহয় আশা করেনি রেণুকা।

উনুনের ধারে-কাছে যায় না, কাশীনাথেরই হাতের রান্না করা ভাত আর মাছের ঝোল খেয়ে সারাদিন মাদুরের উপরে পড়ে থাকে রেণুকা। মাঝে মাঝে মামা-মামী আসে। তিনটে সন্দেহ-ভরা মুখ ঘরের এক কোণে কাছাকাছি হয়ে ফিসফিস করে।

চারগাছি সোনার চুড়ি এনেছিল কাশীনাথ, একবার দেখেই মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে রইল রেণুকা। তারপর ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল, "কালীঘাটের ভিখারীকে দান দিচ্ছ নাকি?"

কাশীনাথ আশ্চর্য হয়, "তার মানে?"

রেণুকা বলে, "ওর সঙ্গে গলার একটা চার ভরির জিনিস আর একজোড়া কানপাশা না হলে আমি ওই সরু-সরু চারগাছি ছাই না কচু ছোঁবও না।"

ভয় পেয়েছিল কাশীনাথ। সারারাত জেগে বসেছিল। মনের জ্বালায় ঘুম আসেনি। সে জ্বালায় কিন্তু রেণুকার উপর এক ফোঁটাও রাগের ঝাঁজ ছিল না। নিজের কপালটারই উপর রাগ করেছিল কাশীনাথ। অন্য কেউ তো নয়, সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে তারই ঘর করতে এসেছে যে, সেই রেণুকা। কত সুখের আশা নিয়ে তারই চোখের সামনে অঘোরে ঘুমিয়ে রয়েছে আর স্বপ্ন দেখছে। রেণুকার আশার মধ্যে একটুও অন্যায় নেই। অন্যায় করেছে কাশীনাথের দরিদ্র কপালটা।

সকালে ঘুম থেকে বের হয়েই সোজা মানিকদার কাছে গিয়ে পঞ্চাশ টাকা ধার করে নিয়ে রঙিন একটা বেনারসী কিনে রেণুকার হাতের কাছে রেখে দিল কাশীনাথ। সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে দেখল, সেই বেনারসী মেঝের উপর পড়ে রয়েছে, আর মামা-মামীর সঙ্গে বসে গল্প করছে রেণুকা।

রেণুকাকে একবার বাড়িতে নিয়ে যেতে চায় মামা ও মামী।

ভাদ্দর মাসটা পার করে দিয়ে আশ্বিনটা পড়তেই ফিরে আসবে রেণুকা।

কাশীনাথ হেসে হেসে বলে, "বেশ তো।"

এই 'বেশ তো'ই কাশীনাথের জীবনের শেষ হেসে বলা কথা। আর এই তিন বছরের মধ্যে রেণুকার সেই সুন্দর মুখের ছায়াও' দেখতে পায়নি কাশীনাথ।

রেণুকাকে আনতে গিয়েছিল কাশীনাথ। বন্ধ দরজার সামনে শক্ত হয়ে বসে মামা-মামী বলে, "আমাদের মেয়ে বড় ভয় পেয়েছে বাবাজীবন। এই চারটে মাস তোমার ঘরে একদণ্ড ঘুমোতে পারেনি।"

"কেন?"

"তোমার ওই কুচ্ছিত মুখ কাছে দেখতে পেলে কোন্ মেয়েই বা ভয় না পাবে বলো?"

"রেণুকে একবার ডেকে দিন।"

"আসবে না রেণু, তুমি যাও।"

"খবরদার, বাজে কথা বলবেন না।"

মামা-মামী একসঙ্গে গর্জন করে, "যা রে যা, খবরদারের বেটা। তোর মতো অমন মুখপোড়া কত সেয়ানার কত খবর করে ছেড়ে দিলাম, আজ এসেছিস তুই দাঁত ঘষে ভয় দেখাতে?"

ফিরে এল কাশীনাথ। তারপর এক সন্ধ্যায় মানিকদাকে সঙ্গে নিয়ে কালীঘাটের বস্তির

সেই ঘরের বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে হাঁক দিল, "রেণুকা!"

কোন সাড়া নেই। গলা ফাটিয়ে হুংকার দেয় কাশীনাথ, "বের হয়ে এসো রেণুকা, নইলে দরজা ভেঙে ঘুরে ঢুকব।"

দরজা খুলে গেল, বের হয়ে এল বুড়ি ঃ "তারা এখানে নেই। ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে।"

"কোথায় গিয়েছে?"

"জানি না।"

যেন আগুনের কামড় লেগেছে একেবারে বুকের ভিতর। কটকট করে জ্বলতে শুরু করেছে একটা ফোসকা। কাশীনাথের পোড়া মুখটাকে ঘেন্না করে পালিয়ে গিয়েছে সুন্দর মুখের মেয়ে।

আর অপেক্ষা করেনি কাশীনাথ, শুধু একটা প্রতিজ্ঞাকে মন-প্রাণ দিয়ে তিন বছর ধরে পুষে এসেছে। প্রতিশোধ নিতে হবে, এমন প্রতিশোধ যে, দেখে ভগবানও ভয় পেয়ে যাবে।

ধারালো ছুরি নয়, মিষ্টি বিষও নয়, অ্যাসিড-ভরা একটা শিশি তিন বছর ধরে কাশীনাথের জামার পকেটে প্রতিশোধ নেবার প্রতীক্ষায় যেন ওত পেতে আছে। দেখা কি কোনদিন হবে না? যে-মুহূর্তে দেখা পাওয়া যাবে, সেই মুহূর্তে তার সুন্দর মুখের উপর অ্যাসিড ছুঁড়ে মারবে, তারপর চেঁচিয়ে হো-হো করে হেসে উঠবে কাশীনাথ। প্রাণে নয়, রূপে মেরে দিয়ে ওই মেয়ের জীবনকে কুকুরের চোখেরও ঘেন্না করে ছেড়ে দিতে হবে।

ভুলতে পারা যায় না, সেই মেয়ের সেই সুন্দর মুখ। লম্বা বিনুনী দোলে, কানের কাছে চুলগুলি আংটির মতন পাকিয়ে রয়েছে। গাল দুটো একটু ফোলা-ফোলা, সুডোল গলায় শাঁখের মতো পর পর তিনটে খাঁজ, তার মধ্যে সাদা পাউডারের রেখা ফুটে থাকে। সেই মূর্তিকে এই পৃথিবীর কোন আগুন-লাগা ঘরের মধ্যে কি দেখতে পাওয়া যাবে না? পাওয়া যেতেও তো পারে। যদি পাওয়া যায়, তবে হাসতে হাসতে দু চোখ ভরে দেখে শান্ত হয়ে যাবে কাশীনাথের প্রাণের সব জ্বালা। অ্যাসিড ছুঁড়ে মারবার দরকার হবে না। পোড়া সাপের মতো ছটফট করে মরে যাবে সেই রূপের অহংকার, রেণুকা নামে একটা ঝলসানো লাশ তুলে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ির দরজার কাছে ফেলে দেবে কাশীনাথ।

না, ভাবতে ভুল করছে কাশীনাথ। মরতে দেওয়া চলবে না। মরে গেলে তো ঠিক শাস্তি পাওয়া হলো না। বাঁচাতে হবে সেই মেয়েকে। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর হেসে হেসে দেখতে হবে, সেই দেমাক-ভরা রূপের নাক-চোখ আর ফোলা-ফোলা গাল চর্বির বড়ার মতো ঝলসে যাচ্ছে। তারপর টেনে তুলে বাইরে নিয়ে বাঁচিয়ে ফেলতে হবে। তারপর সেই মেয়েকে একটা নতুন আয়না উপহার পাঠিয়ে দেবে কাশীনাথ।

চমকে ওঠে কাশীনাথের চোখ। ক্রু-মাস্টার চমকে উঠেছে। তিন তলার একটি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছটফট করছে একটি মেয়ের মূর্তি। পাশের ঘরের জানালাটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। ঘরের ভিতরটা লালচে আভায় রঙিন।

"বাবা গো, বাঁচাও গো।"

তীব্র আর্তনাদ, যেন পুড়তে পুড়তে ঠিকরে বের হয়ে আসছে একটা আবেদন। ক্রু-মাস্টার হাঁক দিলেন, "রেস্ক্যু।"

তবে কি ভগবান সুযোগ পাইয়ে দিলেন? দাঁতে দাঁত ঘষে কাশীনাথ।

অ্যাসবেসটসের আংরাখা, টাঙি, তারের দড়ি আর অক্সিজেন। এক মুহূর্তের মধ্যে সব সরঞ্জামে পাতলা শরীরটাকে সাজিয়ে নিয়ে চকচকে ইস্পাতের টার্ন টেবিল মইয়ের মাথায় পা দিয়ে দাঁড়ায় কাশীনাথ।

মইটা যেন একটা অপার্থিব জিরাফের লম্বা গলা। তিনতলার জানালার দিকে লক্ষ রেখে টান হয়ে বেড়েই চলেছে। উঠছে নামছে আর দুলছে মই। বেল্টের সঙ্গে বাঁধা হোসের মুখ

এক হাতে চেপে ধরে আগুনের হলকার দিকে যেন ভেসে ভেসে এগিয়ে যেতে যেতে থাকে কাশীনাথ। ভিড়ের গলা থেকে বিস্ময়ের চমক শিউরে ওঠে "সাবাস! সাবাস।"

জানালার একেবারে কাছে এগিয়ে এসেছে মইয়ের মাথা। থরথর করে কাঁপতে থাকে কাশীনাথের চোখের আগুন। দু' ইঞ্চি মনিটর জেট ভয়ঙ্কর তোড়ে আছাড় খেয়ে জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর পড়ছে। জলের সেই প্রচণ্ড ও পাগলা আঘাতের মার খেয়ে ফিকে হয়ে যাচ্ছে ঘরের লালচে আভা। আগুনের জ্বালার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘরের ভিতর যেন কুয়াশা নেচে বেড়ায়। তারই মধ্যে দেখতে পেয়ে দপ করে হেসে ওঠে কাশীনাথের চোখ। মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ছে, ছটফট করছে, আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে শুধু সায়াপরা একটি মেয়ের মূর্তি। লম্বা বিনুনী দোলে, কানের কাছে আংটি করা চুলের গুচ্ছ নাচে, ফোলা-ফোলা গাল, বড় বড় সুর্মার টানে আঁকা চোখ। আজ আর তোমার পালিয়ে যাবার উপায় নেই রেণুকারানী, সুন্দরী!

মুখোশ পরে নিয়ে অক্সিজেনের টিউব খোলে কাশীনাথ। "সাবাস! সাবাস!"—ভিড়ের মানুষ আশ্চর্য হয়ে চিৎকার করে। উড়ন্ত চিতাবাঘের মতো জানালা টপকে ঘরের ভিতর ঢুকে কাঁপতে থাকে কাশীনাথের শরীরটা, সেই সঙ্গে বুকের ভিতর তিন বছর ধরে পোষা প্রতিহিংসাটাও।

"কেমন? পুড়ে মরতে বেশ ভালো লাগছে?" চেঁচিয়ে ওঠে কাশীনাথ।

"না গো না, একটুও না। মরতে চাই না। বাঁচাও, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে বাঁচাও, বুক জ্বলে যাচ্ছে, দাঁড়াতে পারছি না, ওগো ভগবান গো!"

"স্বামীর বুক জ্বালিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাবার সময় বুক জ্বলেনি?"

"ওগো, বড্ড ভুল করেছি গো। বড্ড শাস্তি হয়ে গিয়েছে গো। আমাকে ক্ষমা কর গো।"

ঘর-ভরা আসবাব, পালঙ্ক মিরর আর কাচের আলমারিতে রকমারি রুপোর ও তামা-কাঁসার জিনিস। রেণুকার গা-ভরা গয়নার স্বপ্নও সফল হয়েছে। গলায় তিনটে সোনার হার, হাতের চার আঙ্গুলে চারটে আংটি। সাচ্চা সোনার জরি দিয়ে জড়ানো বেণী। বাঃ!

"কিন্তু আমি তোমাকে বাঁচাবো কেন গো? ভগবানকে ডাক গো! সে এসে তোমাকে বাঁচাক গো!"

"তুমি বাঁচাও। তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার ভগবান।"

বিনুনীতে আগুন ধরেছে, সায়ার লেসগুলি জ্বলতে শুরু করেছে। দু'হাতে মুখ ঢেকে চেঁচিয়ে ওঠে কাশীনাথের জীবনের অভিশাপ, সাপিনীর মতো সেই বিষ-ভরা সুন্দরী মেয়ে।

'ক্ষমা কর গো, আর জীবনে পাপ করব না গো। তোমার পায়ে পড়ি, আজকের মতো প্রাণটা বাঁচিয়ে দাও।"

বাঁচাতে হবে বই কি। এক লাফ দিয়ে এগিয়ে আসে কাশীনাথ। টাঙির এক কোপে জ্বলন্ত বিনুনীটাকে টুকরো করে কেটে ফেলে, এক থাবা দিয়ে সায়াটাকেও ছিঁড়ে দূরে ছুঁড়ে দেয় কাশীনাথ।

আবার চেঁচিয়ে ওঠে কাশীনাথের জীবনের সেই সুন্দর-মুখ দুঃস্বপ্ন ঃ "দয়া কর গো, আমার মুখটাকে বাঁচাও গো! ওরে বাবা রে!"

মুখের রূপ বাঁচাবার জন্য প্রার্থনা করছে রেণুকা।

মুখোশের ভিতর হঠাৎ জ্বলজ্বল করে ওঠে একজোড়া আক্রোশের চোখ। অ্যাসবেস্টসের ঢাকার আড়ালে টলমল করে ওঠে একটা বুক। কাশীনাথের জীবনের সেই হিংস্র আর জ্বলন্ত প্রতিজ্ঞাটার বুকের উপর যেন দু ইঞ্চি মনিটর জেট আছাড় খেয়ে পড়ছে, ভিজে যাচ্ছে আগুনের জ্বালা।

"এসো!"—দু হাতে সাপটে সেই ফোটা ফুলের মতো নগ্ন ও নরম আর পাউডারের সুগন্ধ মাখানো একটা সুন্দর শরীরকে বুকের উপর তুলে নেয় কাশীনাথ।

পটপট করে অ্যাসবেস্টসের আংরাখার বোতাম ছিঁড়ে চেঁচিয়ে ওঠে কাশীনাথ, "আমার বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে দাও, নইলে হলকার আঁচ থেকে তোমার মুখ বাঁচবে না।"

হ্যাঁ, এতদিনে ফিরে এসেছে রেণুকা, এই আগুনের নিষ্ঠুর উৎসবে একেবারে মিষ্টি করে দিয়ে রেণুকা আজ স্বামীর বুকে মাথা লুটিয়ে মুখ গুঁজে দিয়েছে।

বুকে জড়ানো সেই মূর্তিকে তারের দড়ি দিয়ে চার পাক ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে, এক লাফে জানালার কাছে সরে আসে কাশীনাথ। মইয়ের মাথায় পা দেয়। ভিড়ের হাজার মানুষ উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে। জ্বালাভরা রঙিন ধোঁয়া আর ছাই ছড়ানো এক চিতার জগৎ থেকে সেই মুহূর্তে যেন একটা গোঁত্তা দিয়ে সরে যায় ইস্পাতের মই। কৃতার্থভাবে ঠুংঠাং করে বাজতে থাকে নীচের ক্রেনের শিকল।

অ্যাম্বুলেন্স! কাশীনাথের ফিরে পাওয়া স্বপ্নের মূর্ছাহত শরীরটাকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটে চলে গেল অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি।

সেদিন ডিউটি থেকে ছুটি। মানিকদা সঙ্গে এসেছেন, কাশীনাথের ছোট ঘরের ভিতর যেন একটা আনন্দের গন্ধ থমথম করে। একটি বোতল, দুটি গেলাস আর মুড়ি-পেঁয়াজ। মানিকদা শুনে আশ্চর্য হন ঃ "সে কি রে?"

কাশীনাথ শুনে হাসে, "হ্যাঁ মানিকদা। ও-মেয়ে রেণুকা নয়। অনেকটা রেণুকারই মতো দেখতে। হাসপাতালে গিয়ে দেখি, এক বাবুমশাই এসে মেয়েটির কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। বাবুর গলায় সোনার হার, সঙ্গে গাড়িও আছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, বাবুর মুখটা আমার এই পোড়া-মুখের চেয়েও অনেক কালো আর অনেক কুচ্ছিত।"

মানিকদা অস্বস্তির হাসি হাসেন ঃ "যাচ্চলে! এত বড় আশাটা মিথ্যে হয়ে গেল!"

কাশীনাথ হাসে ঃ "না মানিকদা, একটুও মিথ্যে হয়নি।"

মানিকদা আশ্চর্য হন ঃ "তোর মনে হঠাৎ এত ফুর্তি চমকে উঠল কেন রে?"

"আর তো কোন দুঃখ নেই। ওই এক মিনিটের মধ্যে সবই পেয়ে গিয়েছি। আর খোঁজাখুঁজি করে দরকার নেই।"

"তার মানে?"

"তার মানে, ওই তো। প্রতিশোধ নেওয়া যায় না রে দাদা। টপ করে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরতে হয়। আমি মুখপোড়া হলেও বুকপোড়া তো নই, মানিকদা।"

মানিকদা গম্ভীর হন ঃ "তা ঠিকই বলেছিস।"

হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে কাশীনাথ ঃ "এই শালা মালের বড় তেজ আছে মানিকদা, দু'চুমুকেই চোখ ধরে গিয়েছে।"

"বেশি খাসনি।"

আস্তে আস্তে কথা বলে কাশীনাথ, "কি যেন সেই গানটা, তুমি মাঝে মাঝে যেটা গাও মানিকদা?"

মানিকদা হাসেন ঃ "আগুন আমার ভাই, আমি তোমারই জয় গাই।"

"বাঃ, বেড়ে গানটি। সত্যি, মাইরি খুব সত্যি, মানিকদা।"

ঠগের ঘর

ওখানে আলিপুরের আদালতের কাছে পথের উপর একটি বটের ছায়া। আর এখানে বেহালার এক বস্তির মধ্যে একটি মাটির ঘরের দরজার কাছে একটি তুলসীর বেদী।

রোজ যেমন, আজও তেমনিই ওই তুলসীর বেদীতে একবার মাথা ঠেকিয়ে কাজে বের হয়ে গিয়েছে রাইচরণ। কাজের মধ্যে হলো ওই এক কাজ। এতদূর পথ হেঁটে এসে আদালতের কাছে এই বটের ছায়ায় চুপ করে বসে থাকা।

রাইচরণের হাতের কাছে থাকে একটি হস্তরেখা-বিচার, অনেকগুলি কড়ি আর একটি চার আনা দামের পঞ্জিকা। চোখের সামনে মাটির উপর পাতা থাকে দাবার ছক-এর মতো একটি ছক। সেই ছকের মধ্যে নানারকম অঙ্ক কিলবিল করে। কোথায় শনি, কোথায় রাহু আর কোথায় মঙ্গল অবস্থান করলে অদৃষ্টচক্রের কোথায় কী যে ঘটে যাবে, তার সব উত্তর ওই একটি ছকের মধ্যে নীরব হয়ে রয়েছে। একবার কেউ এসে রাইচরণের চোখের সামনে তার হাতটা এগিয়ে দিলেই হয় অথবা কেউ এসে শুধু তার রাশিটার নাম বলে দিতে পারলেই হয়। রাইচরণ তখনই একটি স্লেটের উপর খড়ি দিয়ে দেগে অঙ্ক কষে তার জীবনের অবধারিত পরিণাম, আসন্ন পরিণামের আভাস এবং আরও অনেক কিছু বলে দেবে।

মানুষের কররেখা আর কপালরেখা দেখে, এমন কি স্বপ্নের একটা বর্ণনা শুনেও রাইচরণ ভবিষ্যতের অনেক ভালোমন্দ সম্ভাবনার কথা বলে দিতে পারে। বেতের খাঁচার মধ্যে একটা তোতা আছে। এই তোতার কেরামতিও অসাধারণ। মামলায় জিত হবে কি হবে না—হ্যাঁ কিংবা না? একআনা পয়সা রেখে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি রাইচরণের সামনে চুপ করে বসে থাকে। একটি কাগজে 'হ্যাঁ' ও 'না'-কে মিশিয়ে দিয়ে তোতার সামনে ফেলে দেয়। তোতার কানে একটি কড়ি কিছুক্ষণ ছুঁইয়ে রাখে রাইচরণ ; তারপর বিড়বিড় করে, "দেবীর আজ্ঞা, দেবতার আজ্ঞা, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের আজ্ঞা। ছুঁয়ে ফেল, নিয়তির পাখি।"

তোতাটি এতগুলি কাগজের পুরিয়া নেড়েচেড়ে ঠিক একটি পুরিয়া ঠোঁট দিয়ে কামড়ে ধরে, হ্যাঁ কিংবা না। 'হ্যাঁ' দেখে খুশি হয় জিজ্ঞাসু, 'না' দেখে বিমর্ষ হয়।

স্কুলের ছেলে চুপিচুপি এসে জানতে চায়, পরীক্ষায় পাস আছে না ফেল আছে? রাইচরণ বলে, "তিনটি ফুলের নাম বলো।" ফুলের নাম শুনেই রাইচরণ বলে দেয়, "পাস।" স্কুলের ছেলে খুশি হয়ে দুটো পয়সা রাইচরণের হাতে তুলে দিয়ে চলে যায়।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেশির ভাগ সময়ই শুধু বসে বসে ঝিমোতে হয়। পথের উপর দিয়ে মাঝে মাঝে ভিড় যেন স্রোতের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যায়। কিন্তু এই বিপুল জনতার ভেতর থেকে কজনই বা অদৃষ্টের কথা জেনে নেবার জন্য ব্যস্ত হয়? দু'পয়সা থেকে দু'আনা, এই তো গণনার দক্ষিণা। সন্ধ্যা হলে যখন পয়সা গোনে রাইচরণ, তখন বুকের ভেতরটা ভয়ে সিরসির করে ওঠে। মাত্র তেরো আনা! কী করে দিন চলবে?

বটের ছায়ায় বসে বসে যেমন জীবনটা তেমনই চেহারাটাও ওই বটের ঝুরির মতো শীর্ণ আর রুক্ষ হয়ে গিয়েছে। রাইচরণের চেহারাটা ফরসা, মুখটা সাদা কাগজের মুখোশ বলে মনে হয়। আস্তে আস্তে এক-একবার উঠে শরীরটা টান করে আর হাই তোলে রাইচরণ। সেই সময় ওর ছেঁড়া গেঞ্জি ভেদ করে বুকের পাঁজরগুলি কাঁটার মতো যেন ফুটে বের হয়।

মাঝে মাঝে দেখা যায়, একটু ফাঁকা পেয়ে আর গণৎকার রাইচরণকে একলা পেয়ে কেউ কেউ একাই এগিয়ে আসে। এদিক-ওদিক তাকায়। তারপর বলে. "একটা কথা একটু শুনে বলে দেবেন ঠাকুরমশাই?"

"কি?"

"ভালোবাসার মানুষটা ঠকাবে না তো?"

"কতদিনের ভালোবাসা?"

"তা মন্দ দিনের নয়। এই ধরুন এক বছর।"

"সধবা, কুমারী, না বিধবা?"

"বিধবা।"

"নামের প্রথম অক্ষরটা বলুন।"

"প।"

একটু ভেবে নিয়ে রাইচরণ বলে, "যদি দু'আনা দেন তবে নখদর্পণ করে বলে দিতে পারি।"

দু'আনা পয়সা বের করে রাইচরণের হাতের কাছে রেখে দেয় জিজ্ঞাসু লোকটা। রাইচরণও লোকটার হাতটা কাছে টেনে নিয়ে তার একটা আঙুলের নখের উপর কড়ি ঘষে। তারপর নখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে। তারপর খুশি হয়ে বলে, "হাসছেই তো দেখলাম।"

"তার মানে?"

"তার মানে ঠকাবে না।"

অন্যদিনের মতো আজও বটের ছায়ায় মাঝে মাঝে ব্যস্ত হয়ে ওঠে রাইচরণের গণৎকারিতা। ক্লান্ত হয়ে মাঝে মাঝে ছোলা চিবোয়, আর সামনের টিউবওয়েল থেকে জল খেয়ে আসে।

রাইচরণের বয়স মন্দ হয়নি। চল্লিশ বছর তো নিশ্চয়। কিন্তু এত বেশি শুকিয়ে আর পাকিয়ে গিয়েছে বলেই একটু বুড়ো-বুড়ো দেখায়। কিন্তু এই বটের ছায়া থেকে অনেক দূরে বেহালার বস্তির মেটে ঘরের দরজার সামনে তুলসীর বেদীর কাছে যে এখন গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেই মানুষটির চেহারা কিন্তু আজও তাজা মাধবীলতার মতো ফুরফুর করে।

রাইচরণের বউ পারুলবালা। যে রাইচরণ গণৎকার, আকাশের রাহু-শনি-মঙ্গলের মতিগতির রহস্য হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছে, সে আজ এই বটের ছায়ায় বসে কোন তন্দ্রার মধ্যে এখনও চমকে ওঠেনি। কিন্তু এতক্ষণে বেহালার বস্তির মধ্যে সেই মেটে ঘরের ভিতরে গণৎকার রাইচরণের অদৃষ্ট ভয় পেয়ে চমকে উঠেছে।

দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে মণিবাবু নামে এক ব্যক্তি, যে আজ এই তিন মাস ধরে রোজই রাতে একবার এসে রাইচরণের সঙ্গে তাস খেলে চলে যায়। বড় ফিটফাট চেহারা মণিবাবুর, মানুষটিও বেশ শৌখিন। হারমনিয়ম মেরামতির কাজ জানে, মন্দ রোজগারও করে না। নইলে একমাস ঘনিষ্ঠতা হতেই পারুলকে এমন সুন্দর একটি রেশমী শাড়ি উপহার দেয় কেমন করে? রাইচরণ নিজেও শাড়ি দেখে খুশি হয়ে বলেছিল, "বাঃ, বেশ চমৎকার!"

সেই মণিবাবু বেশ একটু গম্ভীর এবং বেশ একটু ব্যস্তভাবে বলে, "আর দেরি করে লাভ নেই।"

পারুলবালা বলে, "তুমিই তো আসতে অনেক দেরি করে দিলে। আমি তো ভেবেই মরছিলুম, এ আবার কোন্ এক নতুন ঠগের পাল্লায় পড়লুম।"

রাইচরণকে আজ ঠগ বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে পারছে পারুল, এবং মনে হয়েছে, এই পৃথিবীর মধ্যে মণিবাবুই একমাত্র মানুষ, যে কখনই ঠগ হতে পারে না, এবং কোনদিনও হবে না।

জ্যোতিষবিদ্যার কারবার করি, কত রাজা-মহারাজা আমার খদ্দের, কলকাতার বাসায় ঠাকুর-চাকর আছে, এই রকম একটি অতি সচ্ছল অবস্থার মানুষ বলে নিজের পরিচয় দিয়ে পারুল নামে একটি সুন্দরী মেয়েকে এক গেঁয়ো মামাবাড়ির দাসীপনা থেকে উদ্ধার করেছিল যে, সে হলো ওই রাইচরণ। আজ পারুলবালা দাঁতে দাঁত চিবিয়ে ভাবে, সেই নির্দয় মামাবাড়ির

দাসীপনা তবু ভালো ছিল। কিন্তু এ কি সর্বনাশ করল লোকটা! মিথ্যে কথা বলে পারুলেরও মন ভিজিয়ে দিয়ে, অনেক ভালোবাসার কথা বকে বকে পারুলের মনের ভিতরটাকে একেবারে এলোমেলো করে দিয়ে, তারপর সত্যি অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে করে নিয়ে এসে আজ এ কোন্ দশার মধ্যে পারুলের জীবনটাকে ঠেলে নিয়ে এসেছে রাইচরণ ঠগ?

রাইচরণকে সহ্য করেছে শুধু, ক্ষমা করতে পারেনি পারুল। সব মিথ্যা, সব মিথ্যা। লোকটার শুধু চেহারাটাই দেখতে ভালো ছিল, আর কথাগুলি মিষ্টি। তাই দেখে পারুলের মন ভুলেছিল নিশ্চয়, স্বীকার করে পারুল, এবং সেই ভুলের জন্যই তো তার আজ এই দশা। আটটা বছর ধরে একেবারে একটানা হাভাতে জীবন সহ্য করতে হয়েছে। কত মুলুকেই না পারুলকে ঘুরিয়ে মেরেছে লোকটা। বর্ধমান, ধানবাদ, রাঁচি, মুঙ্গের। মানুষের ভাগ্য গুনতে গুনতে ছটফট করে দুনিয়ার চারদিকে যেন ছুটে বেড়িয়েছে লোকটা, তবু বিয়ে-করা বউটাকে পেট ভরে ভাত খাওয়াতে পারেনি। এক-আধটা গয়নার সাধ তো দুঃস্বপ্ন। এমন দিন গিয়েছে, যখন শাড়ির অভাবে ঘরের ভিতরে গামছা পরে বন্ধ থাকতে হয়েছে।

ধানবাদে থাকতে একদিন কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ঘরের বাইরে এসে যেচে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে দুরবস্থার কথা বলে টাকা নিয়েছিল পারুল। আজও মনে পড়ে পারুলের, সেই ভদ্রলোক ঠিক সন্ধ্যা হতেই এসে ঘরের দরজায় কড়া নেড়েছিলেন। চেঁচিয়ে কেঁদে ফেলেছিল পারুল। অনেক মাপ চেয়ে তবে রেহাই পেয়েছিল।

আজ মনে হয়, সেই বাজে কাঁদুনির কোন অর্থ হয় না। সেই ভদ্রলোককে দরজা খুলে দিলে কি এমন খারাপ হতো? রাইচরণকে ঘেন্না করতে করতে এ-রকম অনেক কথাই অনেকবার মনে হয়েছে। অনেকবার বলেও দিয়েছে ও-রকম দু-চারটে কথা। কিন্তু রাইচরণ নির্বিকার।

আজও নির্বিকার মনে অদৃষ্টের একগাদা নোংরা ঝুলি-ঝোলা নিয়ে কোন এক বটগাছের ছায়ার কাছে গিয়ে বসে আছে লোকটা। মিথ্যে কথা বলে লোক ঠকায়। ঠকিয়ে বিয়ে করে। আজ কিন্তু ওর এতদিনের নির্বিকার ঠগিপনার উপর অদৃষ্টের প্রতিশোধ ঘনিয়ে এসেছে। তাই এসেছে মণিবাবু।

এই তিনটে মাস মণিবাবু নামে মানুষটা অনেক মায়া করেছে বলেই পারুলের সাজটা একটু রঙিন হয়েছে। পারুলের মুখের দিকে তাকিয়ে সেদিন মণিবাবুর চোখ জলে ভরে উঠেছিল। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল পারুল ঃ "আমার কষ্ট দেখলে আপনি কাঁদবেন কেন? আপনি তো আমার কেউ নন।"

মণিবাবু বলেছিল, "কেউ নই বলেই' তো দুঃখ হচ্ছে পারুল, তাই যতখানি সাধ আছে ততখানি করতে পারছি না।"

সেই একটি সন্ধ্যায় এই তুলসীবেদীর কাছে দাঁড়িয়ে মণিবাবু কথাগুলি শুনে পারুলবালার বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠেছিল। কিন্তু তারপর আর নয়।

মণিবাবু বলেছিল, "যতদিন বাঁচি ততদিন দূরে থেকেই তোমাকে ভালোবাসব। থাক, তুমি যেমনটি আছ তেমনটি থাক। আমি যেন তোমাকে শুধু মাঝে মাঝে দেখতে পাই।"

পারুলবালার গলার স্বরটা বিভোর হয়ে বলে, "মাঝে-মাঝে কেন, রোজই দেখে যেয়ো।"

রোজই এসেছিল মণিবাবু এবং রাইচরণের সঙ্গে তাস খেলেছে। বাজার করে নিজের হাতে বয়ে নিয়ে এসেছে কপি আর চিংড়ি আর মুগের ডাল।

পারুলবালা আশ্চর্য হয়ে দেখেছে, আর মনে মনে ঘেন্নায় জ্বলে গিয়েছে, রাইচরণ নির্বিকার মনে সেই কপি-চিংড়ি আর মুগের ডালের রান্না খেয়েছে। বেহায়াটা যেন নিজের রোজগারের জিনিস গর্ব করে খাচ্ছে।

মণিবাবুকে ভালো লাগে। খুব ভালো করে সেজে মণিবাবুর চোখের সামনে দাঁড়াতে

ভালো লাগে। মুগ্ধ হয়ে যায় মণিবাবু। কিন্তু দেখতে পায় পারুল, রাইচরণ নামে যে লোকটা তার স্বামী হয়ে বসে আছে, সেই লোকটা যেন কিছুই দেখতে পায় না।

"আর এভাবে নয় পারুল," যেদিন মণিবাবু পারুলের হাত ধরে এই কথাটা বলে ফেললো, সেদিন পারুলের মনটাও যেন গলে গেল।

পারুল বলে, "আমিও বলছি আর এভাবে পড়ে থাকবার কোন মানে হয় না।"

"তা হলে যাবে?"

"যাব।"

সেই যাবার লগ্ন ঘনিয়ে এসেছে। বেহালার বস্তির ভিতরে একটা মেটে বাড়ির অদৃষ্ট আজ আর কিছুক্ষণ পরেই শূন্য হয়ে যাবে। ব্যস্তভাবে বাক্স সাজাতে থাকে পারুলবালা।

মণিবাবুই দিয়েছে, সেই সব রঙিন শাড়িতে বাক্স ঠাসা। মণিবাবুই দিয়েছে দুটো গয়না, কানের আর গলার। সে দুটোও বাক্সের ভিতরে আছে। তবে আর সাজবার ও দেরি করবার কী আছে?

বাক্সের ভিতরে ছেঁড়া পুরনো আবর্জনার মতো অনেক জিনিস আছে। সেগুলি ফেলে দিলে বাক্সটা একটু হালকা হয়।

মণিবাবু বলে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, পুরনো যা কিছু আছে সব ফেলে দাও।"

বাক্স উপুড় করে পারুলবালা। পারুলের দু'হাতে যেন ডাকাতির নেশা পেয়ে বসেছে। চোখ দুটো ছুরির ফলার মতো চকচক করে। নাক আর কান তেতে যেন জ্বলছে, লালচে হয়ে উঠেছে। আট বছরের জীবনের মতো ছেঁড়া নোংরা কুৎসিত স্মৃতিকে এখানে ফেলে রেখে দিয়ে চলে যাবার জন্য ছটফট করছে এক নারীর ঘৃণাভরা মন।

হাঁপাতে থাকে পারুল। মণিবাবু বলেন, "কী হলো?"

পারুল বলে, "একটা লাল চেলির জোড় রয়েছে দেখছি।"

মণিবাবু চেঁচিয়ে ওঠে, "ছুঁড়ে ফেলে দাও।"

চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকে পারুল। তারপর চেলির জোড়টাকে গুছিয়ে পাট করে তাকের উপর রেখে দেয়। হো-হো করে হেসে ওঠে মণিবাবু।

আবার বাক্স সাজায় পারুল। মণিবাবুরই দেওয়া যত উপহারের সম্ভার—আয়না, পাউডার, সুগন্ধ তেল, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, বিষ্ণুপুরী আর ধনেখালি রঙিন শাড়ি। কানের দুল আর গলার হার।

"চলো এইবার। আর দেরি করা ভালো নয়।"

পারুলবালার চোখ দুটো নিথর হয়ে শুধু দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপরেই চমকে উঠে ঘরের মেঝেটার দিকে তাকায়। মণিবাবু বিরক্ত হয়ে বলে, "কি হলো?"

পারুল বলে, "এইসব ছেঁড়া কাপড়-চোপড় ছড়িয়ে পড়ে ঘরটাকে বড় বিশ্রী করে দিলে যে! কেমন নোংরা দেখাচ্ছে যে!"

হ্যাঁ, দেখে মনে হয়, চোর ঢুকে একটা একলা অসহায় ঘরের বুকটাকে যেন তছনছ করেছে। পারুল বলে, "একটু দাঁড়াও, যাচ্ছিই যখন, তখন ঘরটাকে একটু গুছিয়ে রেখে যাই।"

"কী আশ্চর্য!" চেঁচিয়ে ওঠে মণিবাবু।

ঘর গোছায় পারুলবালা। এখানে-ওখানে বাসনগুলি পড়ে আছে। ঘটিটা এরই মধ্যে গড়িয়ে একটা ভাঙা টিনের পেঁটরার পিছনে গিয়ে লুকিয়ে পড়েছে। ঘটিটাকে তুলে নিয়ে দরজার পাশে রেখে দেয় পারুল।

মণিবাবু বলে, "যত সব বাজে যাচ্ছেতাই কাজ আবার শুরু করলে কেন পারুল?"

পারুল বলে, "কিছু নয়, কিছু নয়। লোকটা এসে হাত-মুখ ধোবার জন্য ঘটিটা খুঁজে খুঁজে যেন মিছে হয়রান না হয়...তাই...।"

মণিবাবু গম্ভীর হয়, "সন্ধ্যা হয়ে আসছে কিন্তু পারুল।"

পারুল বলে, "এই তো আমি তৈরি; শুধু একটু...।"

আবার চুপ করে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে থাকে পারুল। একটা ছেঁড়া কামিজ দেয়ালের একটা গোঁজের সঙ্গে ঝুলছে! ময়লা ছেঁড়া কামিজ, তালি ছিল, সেই তালিটাও খুলে গিয়েছে। সেই তালিটাকে সেলাই করে জুড়ে দিতে আর কামিজটাকে একটু ধুয়ে কেচে রাখতে পারেনি পারুল, ভুলেই গিয়েছে। তাই লোকটা কদিন ধরে শুধু ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে দিয়ে কাজে বের হয়ে যায়।

মণিবাবুর দাঁতে দাঁতে শব্দ হয় যেন, "মনে হচ্ছে, তুমি এখন ওই ছেঁড়া কামিজ সেলাই করতে বসবে।"

যেন একটা খেলা পেয়েছে পারুল। মণিবাবুর দিকে তাকিয়ে মিনতি করে বলে, "একটু দিই না কেন? কতক্ষণই বা সময় লাগবে?"

"বাঃ!" ভ্রূকুটি করে মণিবাবু।

"আচ্ছা থাক্—" ভয় পেয়ে আর অপ্রস্তুত হয়ে মণিবাবুর মেজাজ শান্ত করবার জন্য পারুল টেনে টেনে হাসতে থাকে ঃ "আমাকে তুমি যতটা বোকা মনে করছ, ততটা বোকা আমি নই।"

মণিবাবুও একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। বাক্সটাকে নিজেই হাতে তুলে নিয়ে বলে, "চলে এসো। বড় রাস্তায় গিয়ে ট্যাক্সি ধরব।"

পারুল বলে, "তুমি গিয়ে বাইরে দাঁড়াও, আমি এক মিনিটের মধ্যেই বের হয়ে আসছি।"

বাক্সটা হাতে নিয়ে দরজা পার হয়ে বাইরের তুলসীর বেদীর কাছে ছায়ান্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে মণিবাবু। পরমুহূর্তেই দেখে চমকে ওঠে, বুঝতে পারে, মণিবাবু ঘরের ভিতর আলো জ্বেলেছে পারুল। উঃ, কত থিয়েটারী ঢঙ! রাগ চাপতে চেষ্টা করে মণিবাবু।

দাঁড়িয়ে থেকে শুধু ছটফট করে মণিবাবু। অনেকক্ষণ তো হলো। এখনও আসে না কেন পারুল?

আবার এগিয়ে এসে দরজার কাছে দাঁড়ায় মণিবাবু। আবার চমকে ওঠে এবং স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে, কিন্তু দেখেও ঠিক বুঝতে পারে না মণিবাবু, এ কী করছে পারুল? উপুড় হয়ে ঘরের মেঝের মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে যেন প্রণাম করে পড়ে রয়েছে পারুল।

"ও কি হচ্ছে?" গর্জনের মতো স্বরে, আর দাঁতে দাঁত চিবিয়ে ডাক দেয় মণিবাবু।

প্রণাম নয়, প্রণামের মতো একটা ঢঙ। উনুনটার কাছে মেঝের উপর মাথা পেতে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে পারুল। উনুনের উপর একটা কড়া—কড়ার মধ্যে শুকনো একটা রুটি আর এক ছিটে রান্না-করা শাক।

আস্তে আস্তে মুখ তোলে পারুল। মণিবাবুর দিকে তাকায়। তার পরেই পাগলের মতো চোখ করে যেন একটা প্রলাপ বিড়বিড় করতে থাকে ঃ "তা হলে লোকটা আজ ঘরে ফিরে এসে খাবে কী মণিবাবু? বলতে গেলে কিছুই যে নেই। ওই একটা শুকনো রুটি আর...।"

চিৎকার করে ধমক দেয় মণিবাবু, "তুমি কি এখন তা হলে রান্না আরম্ভ করবে, হতভাগী মেয়েমানুষ?"

কোনও উত্তর দেয় না পারুলবালা।

মাত্র আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে পারুলবালা। তার পরেই বাক্সটাকে বেশ শক্ত করে ধরে নিয়ে দরজার দিকে সরে যায়।

চলে যাবার আগে আর একবার চেঁচিয়ে ওঠে মণিবাবু ঃ "তোমার ওই ঠগ সোয়ামির চেয়ে তুমি আরও ভয়ানক ঠগ। ছিঃ!"

পঙ্কতিলক

ঘরের মাঝখানে বেশ লম্বাচওড়া অথচ বেশ বেঁটে একটা তক্তাপোশ, তার উপর নকশাদার পুরু বনাতের ফরাশ পাতা। ছোট বড় চারটে তাকিয়া। দেওয়ালে মস্তবড় রঙিন ছবি—আদম ও ইভ। ছবির চওড়া ফ্রেম সোনালী গিল্টি করা। মস্তবড় একটা দেয়াল-ঘড়ি টিকটিক করে। হারমনিয়ামটা বাক্সে বন্ধ করা হয়েছে, শুধু এসরাজটা তখনও ফরাশের উপর পড়ে আছে, গেলাপ পরানো হয়নি।

ফরাশের এক কিনারায় বসে, মেঝের উপর পা নামিয়ে দিয়ে, কোলের উপর একটা গল্পের বই রেখে, হেঁট মাথা হয়ে, বেশ মন দিয়ে পড়ছে মানসী, তাই ঘরের বাইরে থেকে ওর মুখটা ঠিক দেখা যায় না। উপরে একটা রঙিন বেলোয়াড়ী ঝাড় দোলে। সেকেলে সেই বেলোয়াড়ী এখন একেবারে ঠাণ্ডা, তার মাঝখানে শুধু গরম হয়ে একেলে বিদ্যুতের এক জোড়া আলোর গোলক জ্বলছে। তাই দেখা যায় মানসীর পাউডারমাখা গলার সঙ্গে সেঁটে সরু একটি সোনার হার চিকচিক করছে, আর খোঁপার মাঝখানে একটি রুপোর প্রজাপতি।

রাস্তার ফুটপাত ঘেঁষে এই ঘর। জানলায় পর্দা আছে। ফুটপাতের লোকের ভিড় সেই পর্দায় সব সময় অস্পষ্ট ছায়া নাচিয়ে যাওয়া-আসা করে। কিন্তু উঁকিঝুঁকির ছায়াগুলি বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। মানসীও বেশ স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছে, অনেকক্ষণ ধরে একটা উঁকিঝুঁকির ছায়া জানলার পর্দায় ছটফট করছে, মাঝে মাঝে সরে যায় আবার ফিরে আসে।

হঠাৎ বই বন্ধ করে মুখ তোলে মানসী। সদরের দরজাটা কি বন্ধ আছে? কিংবা ভেজানো? না, একেবারে খোলা?

উঠে দাঁড়ায় মানসী। দু'পা যেতে-না-যেতেই মচমচ জুতোর শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ায়। সর্বনাশ। বুকের ভিতরটা থরথর করে ওঠে। সদরের দরজা তা হলে খোলা ছিল।

মানসীর বুকের থরথর ভয়টা একটা অদ্ভুত ভয়। নিজের প্রাণের জন্য নয়, পরের প্রাণের জন্য। শুধু আজ নয়, এই দশ বছরের মধ্যে কতবার যে এই ভয় মানসীর বুক কাঁপিয়েছে তার হিসাব মানসীও শুনে বলতে পারবে না। এখনই একটা কাণ্ড হবে। বড় বিশ্রী, বড় হিংস্র এই কাণ্ড। আবার শুনতে হবে সেইসব চিৎকার আর হুঙ্কার, দেখতে হবে সেই দৃশ্য। ঘুষি, লাথি, কিল আর চড়ের মাতামাতি কিংবা লাঠি, লোহার রড আর সোডার বোতলের দাপাদাপি।

যা ভেবেছিল মানসী, বোধহয় তা নয়। আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে মানসী যেন তার বুকের থরথরানিটাকেই মনে মনে সান্ত্বনা দেয়—না, ভয় করবার কিছু নেই। ভদ্রলোক বোধহয় ভুল করেননি। নিশ্চয় বড়দার চেনা মানুষ।

ভদ্রলোক বেশ শৌখিন, অন্তত সাজপোশাক দেখে তাই মনে হয়। জুতো থেকে শুরু করে হাতের আংটি আর সিল্কের পাঞ্জাবি পর্যন্ত সবই ঝকঝকে। বউদির কাছে গল্প শুনেছে মানসী, তাঁর মামাতো ভাই খুব শৌখিন। মানসী জানে, বউদির মামাতো ভাইয়ের বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ, এই ভদ্রলোকের বয়সও যে তাই মনে হয়। বউদির মামাতো ভাইয়ের চেহারাটি বেশ, এই ভদ্রলোকেরও তো বেশ। এমন ভালো চেহারা খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। চোখের চশমা হাতে নিয়ে চশমার কাচ মুছলেন ভদ্রলোক।

চশমা পরে নিয়ে মানসীর দিকে তাকাতেই ভদ্রলোকের সেই ঝকঝকে চেহারা যেন এক নতুন খুশির আলোকে আরও চমক দিয়ে ওঠে। দরজার কপাটে এক হাত রেখে প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক, "তুমি এই ঘরে কতদিন?"

বুকের ভিতরে তীক্ষ্ণ একটা খোঁচা দিয়ে মানসীর ভয়টা যেন রক্তমাখা হয়ে চোখের

সামনে ভাসতে থাকে। কোন সন্দেহ নেই, ভুল করেছে এই ভদ্রলোক, এই লোকটা। ওর রুমাল থেকে সুগন্ধ, আর নিঃশ্বাস থেকে কড়া নেশার দুর্গন্ধ ভুরভুর করে উড়ছে। এই বাড়িকে নরকের একটা বাড়ি বলে মনে করে ভিতরে ঢুকে পড়েছে ভদ্রলোকের মতো দেখতে ওই লোকটা।

বড় রাস্তা থেকে বের হয়ে একটা ছোট রাস্তা বেশ কিছুদূর এসে এখানে সরু হয়ে আর এঁকেবেঁকে এদিক-ওদিক চলে গিয়েছে। ঠিক এখানেই এসে ভদ্রপাড়াটা শেষ হয়েছে, আর শুরু হয়েছে অভদ্রপাড়াটা। মানসীদের বাড়ি, তারপর থেকে সরুপথের শুরু, মাঝে শুধু ছোট একটা পানের দোকান। সেই সরুপথের দুধারে বড় বড় বাড়ির যত ফরাশপাতা আর তাকিয়াগড়ানো ঘরে লম্পটের ফূর্তি বাসা বেঁধে জীবন যাপন করে। ঠোঁটে রঙ মেখে আর বাহারে সাজ সেজে প্রতি ঘরের দরজা ও জানলার কাছে দাঁড়িয়ে যাদের চোখ পথের দিকে তাকিয়ে ওত পেতে থাকে, তাদের ছায়া মানসীদের এই বাড়ির দেয়ালের গা ছুঁয়েই ফেলত যদি মাঝখানে ওই পানের দোকানটা না থাকত।

মানসীদের বাড়ির ছাদের উপর দাঁড়ালে সরুপথের ওই পৃথিবীর রহস্যগুলিকে যেমন চোখে দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি শুনতেও পাওয়া যায়। ফুলের ফেরিওয়ালা চাঁপার তোড়া আর বেল-জুঁইয়ের মালা হেঁকে বেড়ায়। ব্যস্তভাবে রিকশা ছুটে যায়, আরোহীর মুণ্ডু নেশার ঝোঁকে কাত হয়ে দোলে আর কাঁপে। এখানে-ওখানে, রকের কোণে বসে আর ল্যাম্পপোস্টের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দালালেরা বিড়ি টানে। কখনও ঘুঙুরের ঝনন্ ঝনন্ আবার কখনও বা মাতালের চিৎকার এই রাস্তার আলো-আঁধার আর ধোঁয়াভরা বাতাসের বুকে আচমকা বেজে ওঠে। যেমন নিত্য রাতের আকাশে তারা দেখতে হয়, নিত্য ভোরে পাখির ডাক শুনতে হয়, তেমনি সরুপথের এইসব রূপ আর শব্দকে নিত্য দেখে আসছে আর শুনে আসছে মানসী। চোখসহা আর কানসহা হয়ে গিয়েছে।

হ্যাঁ, পানের দোকানের কাছে শিয়ালের মতো চোখ করে ওই যে দালালের দল বসে আছে, তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে ভুল করত না এই লোকটা। ওরা বলে দিত, খুব সাবধান বাবুমশাই, ওটা হল প্রাইভেট বাড়ি, ওখানে ভদ্রলোক থাকে। অনেকেই বাড়িটার মনুষ্যত্ব অনুমান করে নিতে পারে না বলেই তো এই ভুল করে, এবং তারপর সেইসব ভয়ানক কাণ্ড হয়।

কিন্তু মানসীর মুখ দেখেও কি মানসীর মনুষ্যত্বটা ওরা অনুমান করতে পারে না? পারে না নিশ্চয়। ওদের চোখের এই ভুলে মানসীর মনের গায়েও জ্বালা জ্বলেছে অনেক। কিন্তু আর বোধহয় জ্বলে না। গা-সহা হয়ে গিয়েছে। হয় ওদের চোখে ভুল আছে, নয় মানসীর মুখে ভুল আছে।

এই বাড়ি হলো সেই ভয়ানক গম্ভীর ভানু মিত্রের বাড়ি। মানসীর বড়দাদা ভানু মিত্র। তিনি আছেন বলেই বোধহয় ওই অভদ্র সরু রাস্তার কোন পাপের আহ্লাদ এই ভদ্রপাড়ার পথে এসে উঁকিঝুঁকি দিয়ে ঘুরে বেড়াবার সাহস পায় না। যা-কিছু ভুল আর যা-কিছু গণ্ডগোল তার সবই এই বাড়ি পর্যন্ত এসে আর এগুতে পারে না। ভানু মিত্রের ভয়ানক শাসন লোহার রডের মার মেরে সব ভুল শায়েস্তা করে দেয়। ভুলগুলি হাতজোড় করে, ভানু মিত্রের পা জড়িয়ে ধরে, মাপ চেয়ে আর নাক-মুখের রক্ত মুছতে মুছতে ছুটে পালিয়ে যায়।

দেখলে মনে হবে, বাড়িটা যেন এককালের বেশ বড় বনেদিপনার ছোট একফালি অবশেষ। পুরনো বনেদিপনার একটা চুনখসা ফ্যাকাশে স্মৃতির মতো দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা, ভোঁতা কার্নিশ আর মোটা একটা থাম। থামটার গায়ে অজস্র সিঁদুর হলুদ আর চন্দনের এবং গোবরেরও ছোট ছোট ধেবড়ানো ফোঁটার দাগ শুকিয়ে লেগে আছে। সকালবেলা গঙ্গাস্নান সেরে এসে ভেজা কাপড়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকবার আগে এই থামের গায়ে তিলক-কাটা

কপাল ঠেকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন ভানু মিত্র।

এই থামের গায়ে হাত রেখে বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে পাড়ার প্রতিবেশী ভদ্রলোকদের নানারকম উপদেশ শুনিয়ে দেন ভানু মিত্র—"আপনারা কি মনে করেন জানি না, কিন্তু আমি মনে করি, মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পত্তি হলো ক্যারেক্টার অর্থাৎ চরিত্তির।"

"তা তো বটেই।" শ্রোতারা সকলেই স্বীকার করেন। শুধু কালাচাঁদবাবু নামে ওই ভদ্রলোক, যাঁর গায়ের জামাটাতে একটাও বোতাম নেই, তিনিই শুধু হাঁ করে কি-রকম যেন গবেটের মতো তাকিয়ে বলেন, "তাই বলুন! আমার ধারণা ছিল সম্পত্তিই হলো মানুষের সবচেয়ে বড় ক্যারেক্টার অর্থাৎ চরিত্তির।"

বয়স হয়েছে ভানু মিত্রের, মাথার চুল যতখানি সাদা, ততখানি কাঁচা। পঞ্চান্ন বছর বয়সে যতখানি গম্ভীর হওয়া উচিত, তার চেয়ে অনেক বেশি গম্ভীর। ঘরে যতক্ষণ থাকেন ততক্ষণ আদুড় গা। হাটে-বাজারে আর বেড়াতে যাবার সময় চীনে কোট। চাকরি-বাকরি করতে লজ্জা পান, করেন না। তিন-পুরুষের সেই বনেদী সম্মানের ধারা ভানু মিত্রও নষ্ট করে দিতে পারেন নি। কিছু টাকাপয়সা আছে নিশ্চয়, কিন্তু তেমন কিছু নয় বোধহয়, নইলে এতদিনে এক মাত্র বোন মানসীর বিয়েটাও চুকিয়ে দিতে পারতেন। বয়স তো কম নয় মানসীর। পাড়ার মেয়েরা জানে, আত্মীয়-কুটুম্বরাও বলে, মানসীর বয়স ত্রিশ পার হয়ে একত্রিশে পড়েছে, কিংবা আরও একটু বেশি হতে পারে, কম তো নয়ই।

কিন্তু মানসীর বিয়ের জন্য চেষ্টার দিক দিয়ে কোন ফাঁকি রেখেছেন আর ত্রুটি করেছেন, এই নিন্দা ভানু মিত্রের শত্রু কালাচাঁদবাবুও করেন না। বরং খুব বেশি চেষ্টা করেন বলেই তো নীচের ওই ঘরটিকে একটু সাজিয়ে রাখতে হয়, ফরাশ পাততে হয়, আর মানসীকেও প্রায়ই এই ঘরের ভিতর এসে এসরাজ বাজাতে হয়। পাত্রপক্ষ পাত্রী দেখতে আসেন। খড়দহ থেকে যারা মানসীকে দেখতে এসেছিল, তারা এই তো কিছুক্ষণ আগে চলে গেল।

মাসের মধ্যে এমন সপ্তাহ যায় কিনা সন্দেহ, যে সপ্তাহে পাত্রপক্ষের চোখের সামনে এসে মানসীকে দাঁড়াতে না হয়। যতদূর পারা যায়, স্নো আর পাউডারে মুখটাকে ঘষেমেজে ঝকঝকে করে, সবচেয়ে বেশি জমজমাট রঙের জামদানি শাড়ি অনেক কায়দা করে গায়ে জড়িয়ে পাত্রপক্ষের চোখের সামনে বসেও থাকতে হয়। সেই সব চোখের মধ্যে স্বয়ং পাত্রেরও চোখ জ্বলজ্বল করে। মানসীর চেহারাটাকে পছন্দ করে ফেলতে কারও একটুও দেরি হয় না। শুধু এসরাজ বাজিয়ে রেহাই পায় না মানসী, গানও গাইতে হয়। হাতের কাছে হারমনিয়ম টেনে নেয়। চা খান আর পান চিবোন পাত্রপক্ষের ভদ্রলোকেরা, সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ে। ঠোঁটে হাসি, চোখে খুশি, মুখে নানা ফরমাইশ—কীর্তনটা থাক্, এইবার একটা আধুনিক গাও, শুনি।

কখনও আধ ঘণ্টা, এবং কখনও দেড় ঘণ্টা ধরে এইরকম একটা সুন্দর মুখ দেখার আনন্দের কাছে বসে থাকবার পর পাত্র আর পাত্রপক্ষ বিদায় নেন। এবং তার কদিন পরে গম্ভীর ভানু মিত্রের মুখে সেই একই কথা ঘড়ঘড় করে বাজে : "না, হলো না, দরে পোষাল না। বড় বেশি দাবি।"

আর, মাসের মধ্যে তিনটে সপ্তাহও যায় কিনা সন্দেহ, এই বাড়ির জানলার পর্দায় আর-এক রকমের পছন্দের ছায়া উঁকিঝুঁকি দিয়ে উসখুস করে গিয়েছে! চীনেকোট গায়ে ভানু মিত্রের শক্ত পাথরের মতো মূর্তিটা ওই থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাঘের মতো গর্জে উঠেছে ঃ "সাবধান। এটা ভদ্রলোকের বাড়ি হে হতভাগা।"

তা ছাড়া, মাঝে মাঝে এই লোকটারই মতো ভুল করে কোন হতভাগা সদর খোলা পেয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। দেখেই আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠেছে মানসী, আর ভানু মিত্রও সঙ্গে সঙ্গে উপরতলার ঘরের ভিতর থেকে আস্তে আস্তে নীচে নেমে এসেছেন। হাতে মোটা

লোহার রড।

কোন চঞ্চলতা নেই, একেবারে শান্ত কঠোর ও গম্ভীর ভানু মিত্র সদরের দরজায় দাঁড়িয়ে, পাশের বাড়ির জানলার দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে চাপা গলায় বলেন, "বটকেষ্ট আছ নাকি?"

"হ্যাঁ, জ্যাঠামশাই।"

"শয়তান ঢুকেছে, লোক ডাকতে হয়।"

ব্যস্, তারপর একটি মিনিটও দেরি হয় না। মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে শয়তানের মাতাল মুখের হাসি যখন আরও টলমল করে ওঠে, ঠিক তখনই পিছন থেকে শয়তানের ঘাড়ের উপর আছড়ে পড়ে সোডার বোতলের প্রচণ্ড এক বাড়ি। রোগা আর যণ্ডা চেহারার ছোট একটা ভিড় ছুটে এসে শয়তানকে ঘিরে ধরে। কারও হাতে হকিস্টিক, কারও হাতে চাবুকও থাকে।

ভানু মিত্র শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আস্তে আর একবার হাঁক দেন, "মেরে বেহুঁশ করে দাও, তা হলেই হুঁশ হবে।"

তারপর, চড় ঘুষি লাথি আর চাবুক আর হকিস্টিকের একটা আক্রোশ যেন উৎসবে মেতে ওঠে। হঠাৎ ভয়ে আধমরা, আর মার খেয়ে আরও ভীত সেই শয়তানের আর্ত মুখটা ভুল বুঝতে পেরে চেঁচিয়ে ওঠে, "মাপ করুন মশাই, ছেড়ে দিন দাদা। ওঃ, দিব্বি করছি স্যার, এই ভুল আর কখনও হবে না।"

"কেন এমন ভুল হয়? দেখতে পাও না কেন যে, এই পানের দোকানের পর থেকে শয়তানদের ওই নরকপাড়া শুরু?" গম্ভীর স্বরে বলেন ভানু মিত্র।

ভানু মিত্রের পা জড়িয়ে ধরবার জন্য ঝুঁকে পড়ে আর হাত বাড়ায় শয়তান। ভানু মিত্র শান্তভাবে শেষ নির্দেশ উচ্চারণ করেন, "এইবার বের করে দাও।"

উপরের ঘরে উঠে যাবার আগে ভানু মিত্র যেন নিজের মনে তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিন একটি বিশ্বাসের মন্ত্র আস্তে আস্তে বলেন, "চরিত্তির যার নেই, তার মরে যাওয়া ভালো, তাকে মেরে ফেলাও ভালো।"

আজ দশ বছর ধরে এই একই কথা শুনে আসছে মানসী। খুব সত্যি কথা, ভানু মিত্রের এই বিশ্বাসের মধ্যে কোন ফাঁকি নেই। এই জন্যেই তো মানসীর ভয়। আজ এই মুহূর্তে সোনার ফ্রেমের চশমা-পরা ওই লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে এই ভয়েই তো বেশি করে মানসীর বুক কাঁপছে। এখনি একবার চেঁচিয়ে উঠতে হবে, এবং সেই মুহূর্তে নেমে আসবেন বড়দা—হাতে লোহার রড। তারপর...

হঠাৎ মানসীর ভয়ের কাঁপুনিটা একটু মৃদু হয়ে যায়। হঠাৎ মনে পড়েছে, বড়দা এখন বাড়িতে নেই, হরিসভায় গান শুনতে গিয়েছেন।

লোকটা বলে, "গান-টান ভালো আসে তো, না শুধু লোক টানবার জন্য মিছিমিছি হাতের কাছে একটা এসরাজ গড়িয়ে রেখেছ?"

"আপনি চলে যান।" চেঁচিয়ে ওঠে মানসী।

"তার মানে? কারও বাঁধা হয়ে আছ নাকি? না, কারও কাছ থেকে বায়না নিয়ে রিজার্ভ হয়ে আছ?"

মানসী বলে, "আপনি খুব ভুল করেছেন, ভুল করে ভয়ানক অন্যায় করছেন, এটা ভদ্রলোকের বাড়ি।"

"অ্যাঁ?" চমকে ওঠে লোকটা। একটা লাফ দিয়ে দু'পা পিছনে সরে যায়। রুমাল দিয়ে চোখ মোছে আর বিড়বিড় করে, "তাই তো, ছিঃ, এ কী কাণ্ড হলো! সত্যিই ভুল হয়েছে, ভয়ানক অন্যায় হয়ে গিয়েছে। আপনি মাপ করবেন। আমি এখনি চলে যাচ্ছি।"

চলে যেতে থাকে লোকটা। ঘরের দরজা থেকে সরে গিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে সরু

বারান্দার উপর দিয়ে সদরের দরজার দিকে চলে যায়। হঠাৎ চেঁচিয়ে কর্কশ স্বরে ডাক দেয় মানসী, "শুনছেন?"

থমকে দাঁড়ায় লোকটা, পিছন ফিরে তাকায়। মানসী বলে, "এই যে আপনার কি-সব যাচ্ছেতাই জিনিস এখানে পড়ে রয়েছে, তুলে নিয়ে যান।"

সেন্ট-মাখা রুমালটা আর একটা চাঁপার তোড়া পড়ে আছে ঘরের দরজার চৌকাঠের কাছে। নেশাড়ে লম্পটের শিথিল হাত থেকে ফসকে পড়ে গিয়েছে কতকগুলি আবর্জনা।

লোকটা বলে, "লাথি মেরে সরিয়ে দিন। এমন কিছু দামী জিনিস নয় যে, তুলে নিয়ে যেতে হবে।"

আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠে মানসী, "না পারব না। পা দিয়ে ছুঁতেও ঘেন্না করে। এখুনি তুলে নিয়ে যান।"

ফিরে আসে লোকটা। আর, সেই দুই নোংরা আবর্জনা,—একটা সেন্টমাখা রুমাল আর একটা চাঁপার তোড়া তুলে নিয়ে পকেটে রাখে।

আবার ব্যস্তভাবে চলেই যাচ্ছিল লোকটা, কিন্তু ভানু মিত্রের বোনের মনটাও যেন হঠাৎ কঠোর হয়ে লোহার রডের মতো দুলে ওঠে ঃ "খুব বেঁচে গেলেন আপনি।"

"তার মানে?"

"তার মানে, এই ভদ্রপাড়ার ভিড়ের হাতে পড়লে, হাত-পা ধরে মাপ না-চাওয়া পর্যন্ত রেহাই পেতেন না।"

লোকটা গম্ভীর স্বরে বলে, "আমি কারও কাছে মাপ চাই না। জীবনে শুধু এই একবার মাপ চেয়েছি, আপনার কাছে।"

মানসীর রুক্ষ গলার স্বরও হঠাৎ নরম হয়ে যায় ঃ "আমি না হয় মাপ করে দিলাম, কিন্তু ধরতে পারলে এই ভদ্রপাড়ার ভিড় যে আপনাকে মেরেই ফেলবে।"

"মরে যাবার আগে আমিও কয়েকটাকে মেরে রেখে যাব।"

সাংঘাতিক, কী কড়া মেজাজ! জীবনের এই দশার জন্য একটুও লজ্জা নেই, ভয়ানক এক অহংকারের সাপের মতো ফোঁস করে ফণা তুলেছে লোকটা। কী আশ্চর্য, লোকটা যেন এই ভদ্রপাড়ার যত ঘেন্না আর রাগ আক্রোশগুলিকে তুচ্ছ করার জন্য শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মানসীর গলার স্বর হঠাৎ ভীরু হয়ে যায় ঃ "আপনাকে অপমান করবার জন্য আমি এ-সব কথা বলছি না। আপনার ভালোর জন্যই বলছি।"

লোকটা আশ্চর্য হয়ে যায় ঃ "আমার ভালো?"

অজানা অচেনা একটা লোক, ওই সরু রাস্তার যত ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে যে-লোকটা যতসব পাপের রঙ-মাখানো ঠোঁটের হাসির সঙ্গে ফূর্তির দাম দরাদরি করে, বেহায়া গলার গান আর মাতাল পায়ের ঘুঙুরের শব্দ শোনে, সেই লোকটার জীবনের ভালোর জন্য এ কেমন মায়া-মাখানো কথা হঠাৎ বলে ফেলেছে মানসী!

লোকটাও এইবার যেন মানসীর মুখের একটা কথা শোনবার লোভে লোভী হয়ে আস্তে আস্তে বলে, "আপনি যেন কী-একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন!"

"হ্যাঁ, বলছিলাম...।" বলতে গিয়েই থামে, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মানসী বলে, "ওই বাজে রাস্তায় আর যাবেন না।"

আগেই মুখ ফিরিয়েছিল মানসী, এইবার কথাটা বলে ফেলেই চোখ বন্ধ করে। নিথর হয়ে শুধু দেয়াল-ঘড়ির টকটক শব্দ শোনে। সামান্য একটা অনুরোধের কথা লজ্জার মাথা খেয়ে বলে দিতে পেরেছে মানসী। এইবার চলে যাক লোকটা—যেন আর কোন প্রশ্ন না করে, মচমচ জুতোর শব্দ সদরের দরজা পার হয়ে বাইরের পৃথিবীর ওই হইহই রইরই শব্দের মধ্যে মিলিয়ে যাক। হাঁপ ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সদরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আসবে মানসী।

কিন্তু কোন শব্দ হয় না। বুঝতে পারে মানসী এখনও দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। বোধহয় সেইরকমই বেহায়ার মতো আবার দু'চোখ অপলক করে মানসীর খোঁপার প্রজাপতি দেখছে। কী বিশ্রী অস্বস্তি! মানসীর সারা শরীরটা শিউরে উঠতে থাকে।

"আপনি ভালো কথা বলেছেন। দেখি, যদি আপনার কথা রাখতে পারি।"

কেউ যেন অনেক দূরে স্বপ্নের ঘোরে বিড়বিড় করে কথা বলছে। লোকটা চলে যাচ্ছে বোধহয়। মুখ ফিরিয়ে তাকায় মানসী। দেখতে পায়, লোকটাই মুখ ফিরিয়ে সদরের দরজার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই শক্ত আর অহংকেরে চেহারাটা যেন হঠাৎ দুর্বল হয়ে নেতিয়ে পড়েছে। দেয়াল ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে চোখ-মুখ মুছছে লোকটা।

বোধ হয় এতক্ষণে লুকিয়ে দেখার একটা সুযোগ হয় বলেই বেশ ভালো করে লোকটাকে দেখতে পায় মানসী। রাশভারী শক্ত চেহারার মানুষ না ছাই। নিতান্ত একটা ছেলেমানুষের অভিমানী চেহারা যেন ক্লান্ত হয়ে, কে জানে এই পৃথিবীর কার ওপর রাগ করে দাঁড়িয়ে আছে!

মুখের কাছে শাড়ির আঁচল টেনে এনে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে মানসী। আনমনার মতো অপলক চোখ দিয়ে দেখতে থাকে, বেশ তো সুন্দর আর দিব্যি শান্ত একটা কাঁচা মুখ। মানুষটা ওর নিজের বাড়িতে তো এইরকমই ক্লান্ত হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, লোহার রড নিয়ে কেউ ওকে মেরে ফেলতে ছুটে আসে না।

চাঁপাফুলের গন্ধ বাতাসে ভুরভুর করে। নাকের কাপড় চেপে সরে যেতে ভুলে গিয়েছে মানসী। ওই অজানা অচেনা মানুষটার বোধহয় খুব কষ্ট হচ্ছে, হেঁটে যেতে পারবে কি না সন্দেহ। মানসী বলে, "আর সময় নষ্ট করবেন না, বাইরে গিয়ে একটা রিক্‌শা করে বাড়ি চলে যান।"

লোকটা মুখ ফিরিয়ে তাকায় ঃ "আপনি আমাকে আশ্চর্য করলেন?"

"কিসের আশ্চর্য?" ইচ্ছা করে নয়, চেষ্টাও করেনি মানসী, প্রশ্নটা যেন মুখ থেকে নিজের আবেগে ছুটে বের হয়ে গিয়েছে মানসীর।

লোকটার চোখ দুটোও বোধহয় এই কঠিন প্রশ্নের চমক সহ্য করবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারে না। এই প্রশ্নের কত রকমই তো উত্তর হতে পারে, কে জানে কোনটা সত্য! মানসীর মুখের দিকে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে, মানসীকে আরও কয়েকটা কথা বলতে মনটা আকুল হয়ে ওঠে, নিজের জীবনের একটা রাক্ষুসে পরিচয়কে মানসীর চোখের কাছে ধরা পড়িয়ে দিয়েছে, তবু মানসী তারই জীবনের ভালোর জন্য ভেবে ফেলেছে, তাই আশ্চর্য হয়েছে মানুষটা। এর মধ্যে কোন্‌টা সত্য, একবার মুখ ফুটে বলে দিলেই তো মানসীর জীবন একটা গর্ব পেয়ে যায়।

কী যেন ভাবছে লোকটা! লোকটার মনের ভাবনাগুলি বোধহয় আবার ভুল করে একটা ভিন জগতের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। ভয় পেয়েছে বোধহয়। চলে যাবার জন্য উসখুস করছে লোকটার পা দুটো। মনে হয় মানসীর, এইবার সত্যিই আতঙ্কিতের মতো থরথর করে উঠেছে ভদ্রলোকের ওই ক্লান্ত ও উদাস মুখটা।

মানসী বলে, "আপনি মিথ্যে সন্দেহ করছেন, আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না।"

"কেন বলুন তো? কেন ক্ষতি করবেন না? আমি তো আপনাকেই অপমান করেছি।" লোকটার কথাগুলো যেন একটা জ্বালার ছোঁয়া লেগে ছটফট করছে।

হেসে ফেলে মানসী ঃ "সে তো ভুল করে, ইচ্ছে করে নয়।"

"আপনি সত্যি সেটা বিশ্বাস করেছেন?"

"করেছি।"

"তা হলে আমার আর কোন দুঃখ নেই।"

বলতে বলতে লোকটাও হেসে ফেলে। যেন এতক্ষণ ধরে বুকের ভিতর কতকগুলি কালো ধোঁয়া জমাট হয়ে ছিল, মানসীর হাসির এক ছোঁয়াতেই সেই জমাট ধোঁয়া ভেঙে গুঁড়ো হয়ে নিঃশ্বাসের বাতাসের সঙ্গে বের হয়ে গিয়েছে। স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে ভদ্রলোকের মুখ, হাসিটাও ওই মুখে কী সুন্দর মানিয়েছে!

ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টিটাও হঠাৎ যেন চাঁপার গন্ধের মতো ফুরফুর করে উড়তে শুরু করেছে। দেখতে থাকে মানসী, ভদ্রলোক চঞ্চল হয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন, এই বাড়িটার পুরনো ইট-কাঠের রূপ দেখে কি-যেন ভাবছেন। ব্যাধের ফাঁদের মতো যে-বাড়িটা এই সরু পথের মুখে দাঁড়িয়ে থাকে আর যত ভুলের জানোয়ারকে বাগে পেলেই ঘায়েল করে, সেই বাড়িটা ভদ্রলোককে কী সুন্দর নির্ভয়ের উপহার দিয়ে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছে! বোধহয় এই বিস্ময় সহ্য করছেন ভদ্রলোক। যেন কতকাল এই বাড়িতে আসা-যাওয়া আছে, স্বচ্ছন্দে হেঁটে হেঁটে বারান্দার উপর পায়চারি করছেন।

লোকটা হাসতে হাসতে বলে, "কী অদ্ভুত ব্যাপার! ধরুন, এই আমিই যদি সকালবেলা আপনার বাড়ির কারুর সঙ্গে দেখা করতে আসতাম, তবে এই আপনিই আমাকে অনায়াসে বসতে বলতেন, এমন কি এক গেলাস জলও খেতে দিতেন।"

ব্যস্ত হয়ে মানসী বলে ঃ "জল খাবেন?"

লোকটা বলে ঃ "দিন, জল খেয়ে আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে যাই।"

ঘরের ভিতর থেকে গেলাসে করে জল আনে মানসী, দরজার কাছে দাঁড়ায়। আর দরজার চৌকাঠের ওপরে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে জলের গেলাস হাতে তুলে নেয় লোকটা। মানসীও অনায়াসে একটা অচেনা মানুষের বে-আইনী পিপাসাকে শান্ত করার জন্য তার হাতে জলের গেলাস তুলে দিতে পারে।

জল খেয়ে হাঁফ ছাড়ে লোকটা ঃ "এই ভালো।"

"কী?"

"এই যে আমি আপনার ঘরের দরজার বাইরে থেকে জল খেলাম, আর আপনি দরজার ওপার থেকে জল দিলেন। এই যথেষ্ট।"

গম্ভীর হয় মানসী ঃ "আপনাকে ঘরের ভিতরে এসে জল খেতে বলব, এত সাহস আমার নেই।"

কোনও উত্তর দেয় না, চুপ করে দাঁড়িয়ে মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে লোকটা। ওর চোখ দুটো যেন নতুন পিপাসায় আর্ত হয়ে মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে জীবনের শান্তিজল খুঁজছে। মাথা হেঁট করে মুখ নামিয়ে নেয় মানসী। লোকটা বলে, "সে সাহস থাকলেও আপনার কোনো ক্ষতি হতো না।"

মানসীর গলার স্বর জ্বলে ওঠে ঃ "এ কী বলছেন আপনি? ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে কোন তফাত নেই?"

"আছে, তফাত হলো একটা চৌকাঠ।"

হেসে ফেলে মানসীর গম্ভীর মুখ। অচেনা মানুষটাও হাসে।

"যাই এবার।" কিন্তু যাই-যাই করেও লোকটা যায় না। 'চলে যান এবার'—মানসীও এই ছোট একটা কথা মুখ খুলে বলে দিতে পারে না। এই ঘরের অন্তরাত্মাটা যেন ক্ষণস্বপ্নের ছলনায় ভুলে গিয়েছে যে, হরিসভার গান শুনে সেই ভয়ানক ভানু মিত্রের এখন বাড়ি ফিরে আসার সময় হয়েছে।

"তার চেয়ে বরং বলুন, আমার ও আপনার মধ্যে অনেক তফাত।"

হঠাৎ বলে ওঠে লোকটা, আর বলতে গিয়ে চোখের দু কোণে যেন একটা খোঁচা-লাগা আঘাতের ছায়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

"কোন তফাত নেই।" উত্তর দিতে গিয়ে মানসীও অদ্ভুতভাবে চেঁচিয়ে ওঠে, যেন এই ঘরের দশ বছরের ইতিহাস ভয়ানক একটা ঘৃণা হয়ে মানসীর বুকের ভিতর শিউরে উঠেছে।

"আমি বাজে লোক, ওই সরু পথের ঘরে ঘরে গিয়ে গান শুনি।"

"আমি বাজে মেয়ে, আমার ঘরে লোকের পর লোক এসে গান শুনে যায়।"

"কখ্‌খনো না, হতে পারে না। আমাকে এই ভয়ানক মিথ্যাটা বিশ্বাস করতে বলবেন না।" চেঁচিয়ে ওঠে লোকটা। লোকটার মেজাজ যেন হঠাৎ আবার পাগল হয়ে গিয়েছে।

মানসীর চোখ দুটোও যেন একটা অদ্ভুত বিস্ময়ের মায়ায় ছলছল করে ওঠে ঃ "এ কী করছেন আপনি?"

"হ্যাঁ, আমি যা বিশ্বাস করেছি, তাই বিশ্বাস করতে দাও। যদি ভুল বুঝে থাকি, তবে ভুল বুঝেই চলে যেতে দাও। দয়া করে বরং একটা মিথ্যে কথা বলো লক্ষ্মীটি, কোন সত্যি কথা বলে আমার ভুল ভেঙে দিও না।"

"কী বিশ্বাস করেছেন আপনি?"

"তুমি আমাকে ঘেন্না করনি, বরং আমাকে...।"

সদর-দরজার কাছে খটখট খড়মের শব্দ, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে সেই শব্দ।

"সর্বনাশ!" আঁচল তুলে চোখ ঢাকে মানসী ঃ "আমি ভুল করে আপনার সর্বনাশ করলাম।" মানসীর বুকের ভিতর থেকে যেন একটা রক্তমাখা ভয়ের শিহর পাঁজর ছিঁড়ে ঠেলে উঠতে থাকে।

"অ্যাঁ? কে? এ কে রে মানসী?" কাছে এসে থমকে দাঁড়ান, আর অচেনা লোকটার মুখের দিকে তাঁর গম্ভীর মুখের ঘৃণা ও বাঘা চোখের আক্রোশ হানতে থাকেন ভয়ানক ভানু মিত্র।

লোকটা যে সত্যিই কেউ নয়। কী উত্তর দেবে মানসী, উত্তর নেই। উত্তর হয় না, কিন্তু উত্তর দিতে একমুহূর্তও দেরি করলে চলবে না। দেরি করা সাজে না। তা হলে এই ভদ্রপাড়ার সব মনুষ্যত্বই যে ঘৃণায় শিউরে উঠবে আর পানের দোকানের পাশ থেকে দালালেরা ছুটে এসে হেসে ফেলবে। চিৎকার করে উঠবে পৃথিবীটা, ভানু মিত্রের বোন ঘরে লোক ঢুকিয়েছে। খিলখিল করে হেসে উঠছে ওই সরু রাস্তার দুধারে ঠোঁট-রাঙানো যত পয়সার দাসী, ফূর্তি-বিহারিণীর দল। ঘরে বাবু বসিয়েছে ভানু মিত্রের বোন।

মানসী বলে, "জানি না।"

ছোট একটা কথা, সত্য কথা, কিন্তু কী দুঃসহ সত্য কথা! দম বন্ধ করে কথাটা বলতে গিয়েই মানসীর চোখের কোণে ছল্‌কে ওঠে বিচিত্র এক বেদনার জল।

"তাই বল্।" দাঁতে দাঁত চেপে ভানু মিত্র। তারপরেই এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ি কোঠার অন্ধকারের ভিতরে ঢুকে আবার বের হয়ে এলেন। হাতে লোহার রড।

সত্যি কথাই বলেছিল মানসী। লোকটা নির্বিকার। ভানু মিত্রের লোহার রডের দিকে যেন ভ্রূক্ষেপ করতে চায় না। লোকটা কি সত্যিই এই ভদ্র পৃথিবীর যত শাস্তি, গর্জন, মার আর আক্রোশের সঙ্গে মারামারি করে মরে যাবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে আছে? কিন্তু মরে যাবার আগে কিংবা রক্তমাখা মাথা আর নাকমুখ নিয়ে চলে যাবার আগে, অথবা পুলিসের হাতে চালান হবার আগে জেনে যেতে পারবে না লোকটা, ভানু মিত্রের বোন তার জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য কথাটাকে মুখ খুলে বলতে গিয়েও বলতে পারল না। জানি না নয়, জেনেছে মানসী। এই লোকটাকেই চাঁপাফুলের গন্ধে বিভোর একটা সুস্বপ্নের মতো মনে-প্রাণে ভালো লেগেছে মানসীর।

লোকটাও যেন এই জগতের সব ভয় ভুলে গিয়ে মানসীর অদ্ভুত ও অর্থহীন কান্নায় ভেজা চোখের দিকে তাকিয়ে একটা স্বপ্নের নেশায় বিভোর হয়ে রয়েছে। কিংবা সেই প্রশ্নটার

উত্তর খুঁজছে।

লোহার রড তুলেছিলেন ভানু মিত্র ঃ "এটা ভদ্রলোকের বাড়ি, এই কাণ্ডজ্ঞান নেই কেন রে লম্পট?"

"বড়দা।"—চেঁচিয়ে ওঠে মানসী।

ভানু মিত্র কটকট করে তাকান, "কী?"

"উনি ভুল বুঝেছেন, মাপ চেয়েছেন।"

"শিক্ষে হবার আগেই মাপ চায় কেন? খুব চালাক বলে মনে হচ্ছে যে।"

"ছেড়ে দিন বড়দা।"

"তুই এখানে দাঁড়িয়ে অবলাপনা করিস না মানসী, ভেতরে যা। কিছু শিক্ষে না দিলে ওর আক্কেল হবে না।"

লোহার রড ফেলে দিয়ে পায়ের খড়ম হাতে তুলে নেন ভানু মিত্র। মানসী ছুটে এসে হাত চেপে ধরে ঃ "না।"

"কিসের না?"

মানসীকে আস্তে একটা ধাক্কা দিয়ে পাশে সরিয়ে দেন ভানু মিত্র ঃ "না, বেটার কপালটাকে অন্তত একটু দাগিয়ে দিতে হবে, নইলে...।"

লোকটার দিকে তীব্রভাবে তাকিয়ে মানসী চেঁচিয়ে ওঠে, "আঃ, দাঁড়িয়ে দেখছেন কী আপনি? চলে যেতে পারেন না? লজ্জা করে না আপনার?"

লোকটা নির্ভয় নিলর্জ্জতার একটা পাথর যেন। নড়ে না, একটা কথাও বলে না। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যেন ভানু মিত্রের এই ভয়ানক হিংস্র আস্ফালনকে একটা তামাশা মনে করে শুধু চুপ হয়ে দেখছে। কিংবা ওর সেই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়ে ধন্য হয়ে গিয়েছে।

দাঁত কড়মড় করে ভানু মিত্র ঃ "চ্যালেঞ্জ করে দাঁড়িয়ে আছে রাস্কেল! একটুও লজ্জা নেই, ভয় নেই।"

"কিসের ভয়?" এতক্ষণে আস্তে একটা কথা বলে লোকটা।

ভানু মিত্রের বাঘা চোখ ধকধক করে, "প্রাণের ভয় নেই রে হতচ্ছাড়া?"

"না, সে ভয় করি না।"

"ভেবেছিস আমি একা? এই ভদ্রপাড়ার সব লোক এসে যে তোকে ছিঁড়ে মেরে ফেলবে রে চরিত্তিরহীন কুকুর।"

"মরবার আগে আমিও দু'চারটাকে মেরে ফেলব।"

"অ্যাঁ?"—চমকে তিন পা পিছিয়ে যান ভয়ঙ্কর ভানু মিত্র ঃ "এটা যে সত্যিই একটা বেপরোয়া খেপা কুকুর।"

"আপনিই বা কি কম খেপা?"

গর্জন করেন ভানু মিত্র, "আমার সঙ্গে তোমার তুলনা? কিসে আর কিসে? তুমি মদ খেয়েছ, আমি মদ খাই না। তোমার আর আমার মধ্যে তফাত নেই?"

"আছে।"

"কিসের তফাত সে-জ্ঞান আছে কি?"

"আছে, শুধু একটা গেলাসের তফাত।"

চলে যেতে থাকে লোকটা। ভানু মিত্র হুঙ্কার ছাড়েন ঃ "রসিকতা। আচ্ছা এ-পথে আর-একবার এস যেন, ধর্ম ও অধর্মের তফাতটা বুঝিয়ে দেব।"

লোকটা বলে, "খুব বুঝেছি। তফাত ওই একটা খড়ম। আপনার হাতে আছে, আমার হাতে নেই।"

বলতে বলতে চলে গেল লোকটা। ভানু মিত্র আবার হুঙ্কার দেবার আগেই ছুটে গিয়ে

সদরের দরজা বন্ধ করে দেয় মানসী।

লোকটা তা হলে কথা রেখেছে। মানসীর ছোট একটা অনুরোধের কথা। কত সন্ধ্যা পার হয়ে যায়, কত রাত গভীর হয়, এই পথের উপর দিয়ে কত রিকশায় চড়ে কত উল্লাসের চেহারা ছুটে চলে যায়, সরু রাস্তার দুই পাশে ওই নেশা ফুর্তি ঘুঙুর আর মেয়েমানুষের শরীর নিয়ে দরাদরির এক রহস্যের দিকে। কিন্তু এই অফুরান লালসায় মিছিলের মধ্যে সেই মানুষটাকে আজও দেখা গেল না। মানসীর কথা রেখেছে লোকটা, ভাবতে আশ্চর্য লাগে মানসীর।

পঞ্জিকা দেখে এক-একটি সুদিনে আর শুভক্ষণে নতুন নতুন পাত্রপক্ষেরও মিছিল এসে যথারীতি মানসীর ঘরে এই ফরাশ-পাতা তক্তাপোশের উপর বসে। মানসীও যথারীতি সাজে, পাত্রের ও পাত্রপক্ষের চোখের সামনে বসে। তারপর গান গেয়ে চলে যায়।

শুধু যখন সন্ধ্যা পার হয়ে যায় তখন এই বাইরের ঘরের ভিতরে ঢুকেই মনটা একেবারে অভদ্র হয়ে যায় মানসীর। আলো নিবিয়ে দেয় মানসী। জানলার পর্দা সরিয়ে দেয়। আর পথের ওই সব অমানুষ মিছিলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মনের ভিতরে লুকিয়ে একটা আক্ষেপ যেন মানসীর জীবনটাকে ঠাট্টা করতে থাকে। যে-মানুষটাকে ওই পাপের পথ থেকে সরে যাবার জন্য গালভরা ভদ্র অনুরোধ শুনিয়েছিল, আজ সেই মানুষটাকে এই পথের ভিড়ের মধ্যে দেখতে চাওয়া কেন? দেখতে পেলে কি ঘেন্নায় শিউরে উঠবে না মন?

না, একটুও না। তবু তো তাকে দেখতে পাওয়া যাবে। মানসীর চোখের জ্বালাগুলি যেন কটকট করে ওই ঠাট্টার উত্তর দেয়। আরও শক্ত হয়ে জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে মানসী।

রাগ হয় লোকটার উপর। বেশ তো নিজে চট করে পথের ঘেন্না থেকে সরে গিয়ে ভালো হয়ে গেল, আর মানসীকে এই পথের ঘেন্নার মধ্যে নামিয়ে দিয়ে গেল। কী ভয়ানক এ যে ঠিক সরু রাস্তার ওই ওদেরই মতো জীবন! একটা ভালো মানুষকে এই কুপথে দেখবার আশায় ধ্যান করছে মানসীর প্রাণ।

এই ঘরের ফরাশ তাকিয়া ছবি এসরাজও যে ওই ওদের মতো অভিশপ্ত জীবনের আসবাব। কিন্তু দশ বছর ধরে এই ঘর আর এই আসবাবগুলি মানসীর চেহারাটাকে পৃথিবীর চোখে পছন্দ করাতে চেষ্টা করেও পছন্দ করাতে পারেনি। পঞ্জিকা-দেখা শুভক্ষণের বাবুরাও তো মুখ দেখে মনুষ্যত্ব বুঝতে পারেন না।

ভানু মিত্রের বোনের জীবন ঘরের বার হয়েই গিয়েছে। তবে আর দেরি করে লাভ কি? কেরোসিন ঢেলে এই ঘরটাকে ভিজিয়ে দিয়ে তারপর হেসে হেসে আগুনের একটি ফুলকি ছেড়ে দিলে কেমন হয়? তারপর চুপ করে দাউদাউ আগুনের জ্বালার মধ্যে শুয়ে পড়লে কেমন হয়?

মাথাভরা জ্বালা নিয়ে ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয় মানসী। পাগল রোগীর মতো মূর্তি নিয়ে সিঁড়ি ধরে উপরতলার দিকে দৌড়ে উঠতে থাকে। একটা সর্বনেশে প্রতিজ্ঞার কাছে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে মানসী।

বিশ্রী একটা শব্দ করে কেরোসিনের টিনটা মানসীর হাত ফসকে মেঝের উপর পড়ে গিয়ে আরও জোরে বিশ্রী শব্দ করে ওঠে!

চেঁচিয়ে ওঠেন ভানু মিত্র, "ওই অন্ধকার ঘরের ভেতর কি করছিস মানসী? শীগগির শুনে যা! হো-হো-হো...তোর কপাল, তোর সৌভাগ্য রে মানসী...হো-হো-হো...শুভসংবাদ শুনে যা মানসী।"

বড়দা হাসছেন, বাড়িটা যেন প্রেতের হাসি হাসছে। শুভসংবাদ এসেছে, কোন ভদ্রলোকের মনে হয় দয়া হয়েছে, পছন্দ হয়েছে, আর হয়তো টাকার দাবিও করেননি। কিন্তু এই দয়াকে যে ঘেন্না করতেই আজ ভালো লাগছে মানসীর। জানেন না বড়দা, পৃথিবীর কোন ভদ্রলোকের ডাক শোনবার জন্য মানসীর মনে আজ এক ফোঁটা আগ্রহও আর নেই।

বউদিও কলকল করে হেসে উঠেছেন ঃ "শিগগির শুনে যাও, মানসী। এসে বরের ফটো দেখে যাও।"

বউদি উঠে আসেন, আর মানসীকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে আলোর সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে একটা ফটো মানসীর হাতে গুজে দেন।

"এ কার ফটো?"—থরথর করে কাঁপে মানসীর হাত।

ভানু মিত্র বলেন, "এ হলো ভূপতিদার ছেলে রমেশ। ভূপতিদা হলেন, তোর বউদির শীতলমামার ভায়রা। শীতলমামার মেয়ে নীরজাদিকে তুই তো চিনিস মানসী।"

বউদি বলেন, "খুব চেনে মানসী। মানসীকে কত ভালোবাসেন নীরজাদি।"

ভানু মিত্র বললেন, "ওই নীরজাদি তো ফটো চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, আমিও পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। পাত্র ফটো দেখেই পছন্দ করে ফেলেছে। কোন দাবি-দাওয়া নেই।"

বউদি হেসে হেসে দুলতে থাকেন ঃ "মানসীর ফটোও বোধহয় এখন বরের হাতে এই রকমই লজ্জায় কাঁপছে।"

ভানু মিত্র বলেন, "পাইকপাড়া গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসেছি। কী চমৎকার একখানা বাড়ি! ভূপতিদা তো এখন আর নেই। ছেলে রমেশই এখন সব সম্পত্তির মালিক। রমেশও কি কম চমৎকার? যেমন চেহারাটি, তেমনই সুন্দর চরিত্তিরটি।"

বউদি কলকল করেন ঃ 'ফটোটা আর একটু ভালো করে দেখ মানসী, এমন চেহারা জীবনে দেখনি।"

"দেখেছি।" বলতে গিয়ে মানসীর গলার রুক্ষ স্বর যেন কটকট করে কাউকে ধিক্কার দিয়ে ওঠে।

চমকে ওঠেন ভানু মিত্র ঃ "কি? কি দেখেছিস? কবে দেখেছিস?"

মানসীর চোখ জ্বলে ঃ "সেই বাজে লোকটা ঠিক এইরকম দেখতে।"

হো-হো-হো! আরও জোরে হাসতে গিয়ে ভানু মিত্রের গলার ভিতরে হাসিটা আটক হয়ে ঘড়ঘড় করে ঃ "হ্যাঁ, অনেকটা প্রায় সেই রকমই, হুবহু সেই বাজে লোকটারই মতো চেহারা বটে। কিন্তু কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা করছিস মানসী? স্বর্গে আর নরকে?"

চেঁচিয়ে ওঠে মানসী, "কিন্তু তফাতটা কি?"

চুপসে যায় ভানু মিত্রের বাঘা চোখ : "তফাত হলো...মস্ত একটা তফাত এই যে...।'

বউদি বোধহয় নিজের মনের আহ্লাদে বোকার মতো হঠাৎ কলকলিয়ে ওঠেন ঃ "তফাত হলো একটি টোপর।"

ভানু মিত্রের মুখ কুঁচকে যায়, টেনে টেনে হাসতে চেষ্টা করেন। আর মানসী চুপ করে দাঁড়িয়ে এক অবিশ্বাস্য বিস্ময়ের শিহরকে যেন দুটি শান্ত কালো চোখের নিবিড়তা দিয়ে বরণ করে নিয়ে মনে মনে ভাবে—এমন অসম্ভবও সম্ভব হয়? মানুষটা তা হলে এতদিন ধরে আড়ালে আড়ালে আরও ভয়ানক উঁকিঝুঁকি দিয়েছে। সব জেনেছে। মানসীর জীবনটাকে তুলে নিয়ে পালিয়ে যাবার জন্য সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

ভানু মিত্র বলেন, "বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গিয়েছে। সতরই মাঘ, রাত ন'টা পঞ্চাশ।"

মানসীর খোঁপায় রুপোর প্রজাপতি যেন পাখা নেড়েছে। মানসীর সারা মুখ জুড়ে চমকে কেঁপে ওঠে অদ্ভুত একটা লালচে লাজুক আভা।

ভানু মিত্র বলেন, "বিয়ের সব খরচপত্র পাত্রপক্ষই দিচ্ছে। আমি টাকা নিয়ে এসেছি।"

মানসীর চোখের কোণে ছলাক করে জেগে ওঠে আরও অদ্ভুত এক সজল বিস্ময়--লোকটা যেন সত্যিই মানসীকে একেবারে মনে-প্রাণে কিনে নেবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছে।

ভানু মিত্র বলেন, "তুই মিছিমিছি আর কোন সন্দেহ করিস না মানসী। এই মানুষ সেই মানুষ; হতেই পারে না।"

"তাহলে এ বিয়ে হতে পারে না।" চেঁচিয়ে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে মানসী।

"কেন--কেন--কেন?" বিড়বিড় করেন ভানু মিত্র, "পৃথিবীতে কি ঠিক এক রকমের চেহারার দুজন মানুষ হয় না? কত হয়?"

মানসী বলে, "সেই জন্যই তো বলছি, এই বিয়ে হতে পারে না।"

ভানু মিত্রের লোহার রডের মতো শক্ত চেহারা যেন হঠাৎ দুমড়ে গিয়ে কুঁজো হয়ে যায়ঃ "এ আবার কেমন কথা হলো!"

কোন উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে যায় মানসী। অদ্ভুত এক সন্দেহে পাগলের মতো দুড়দাড় করে সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে যেতে থাকে।

"তোমার পাগল ননদের কাণ্ড দেখলে?" বলতে বলতে ব্যস্তভাবে নড়বড় করে উঠে দাঁড়ান ভানু মিত্র ঃ "রাজি হতেই হবে, রাজি না করিয়ে ছাড়ছি না, এ যে আমার মানসম্মানের প্রশ্ন।"

"মানসী--মানসী!" চেঁচিয়ে ডাকতে ডাকতে সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে এসেই চমকে ওঠেন, থমকে দাঁড়ান ভানু মিত্র, বাইরের ফরাশ-পাতা ঘরে আলো জ্বলছে। জ্বলুক। কিন্তু কার সঙ্গে কথা বলছে মানসী?

উঁকি দিতে গিয়েই পা টিপে টিপে সরে আসেন ভানু মিত্র। আস্তে আস্তে হেঁটে সদর দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে কতকগুলি ছায়ার ভিড় দেখে আরও জোরে চমকে ওঠেন, "অ্যাঁ? আরে, কী সৌভাগ্য! আসুন, আসুন।"

"কী ব্যাপার মিত্তির মশাই? এদিকে-ওদিকে কি রকমের একটা কথা শুনছি যে?"

ভানু বলে, "হেঁ হেঁ হেঁ, আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে ঠিকই শুনছেন।"

"এইমাত্র আপনার ওই ঘরে গিয়ে বাইরের কেউ যেন বসল মনে হচ্ছে!"

ভানু মিত্র উৎফুল্লস্বরে বলেন, "পাত্র, পাত্র। পাইকপাড়ার ভূপতি ঘোষের ছেলে রমেশ। পাত্র নিজেই পাকা দেখা দেখতে এসেছে।"

ভদ্রলোকদের বিস্মিত ভিড় চোখ বড় বড় করে চলে যাবার জন্য তৈরি হতেই ভানু মিত্র বলেন, "আপনারা কে কী মনে করেন জানি না, কিন্তু আমি মনে করি দাশুবাবু, চরিত্তিরই হলো মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পত্তি। সৎপথে থাকলে জীবনে একটা অদ্ভুত শক্তি এসে যায় কালীবাবু, কারও কাছে মাথা নীচু করতে হয় না। মাধাইবাবু নিশ্চয় স্বীকার করেন যে, মানসম্মান বজায় রেখে চলাই হলো জীবনের আনন্দ। কিন্তু অনেকেই বুঝতে বড় ভুল করে কালাচাঁদবাবু, আপনি বোধহয় আজও বুঝতে পারেননি যে, পাপ আর পুণ্যের মধ্যে ঠিক তফাতই বা কী?"

কালাচাঁদবাবু হাঁ করে তাকান--"ওই তো তফাত, মাত্র একটা পানের দোকান।"

আকাশবৃত্তি

মাধব চক্রবর্তীর জীবনটাই একটা বিস্ময়।

এটা কিন্তু প্রশংসার কথা নয়। খুবই চিন্তার কথা। কোন কাজ না করে, কোনদিন একটুও উদ্বিগ্ন না হয়ে, কেমন ধীর স্থির ও শান্তভাবে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে মাধব চক্রবর্তী।

বয়সটাও পঞ্চাশ পার হতে চলেছে। কিন্তু জীবনের শেষ পালার দিনগুলির জন্যেও যেন কোন উদ্বেগ মাধব চক্রবর্তীর ভাবনা বিচলিত করে না। প্রশান্ত মনে ঘরের আঙিনার এক কোণে একটা মোড়ার উপর ধীর স্থির হয়ে বসে এক-একটা বেলা পার করে দিতে পারেন মাধব চক্রবর্তী। হাতে জপের মালা নেই, কোন ধর্মগ্রন্থও থাকে না, শুধু এক পরম আলস্যের আরামে সমাহিত হয়ে বসে থাকা। লোভী কাকটা আঙিনার পাশের পেয়ারা গাছে বসে পাকা পাকা পেয়ারা ঠুকরে ফেলে দিচ্ছে। হাত তুলে লোভী কাকটাকে একটা তাড়াও দেন না মাধব চক্রবর্তী। দৃশ্যটা যেন মাধব চক্রবর্তীর চোখেই পড়ে না।

হ্যাঁ, রাজেন যখন ডাক দেয়, ভাত খাবে এসো বাবা, তখন মাধব চক্রবর্তীর এই আলস্যের সমাধিটা নড়াচড়া করে আস্তে আস্তে ভাঙতে থাকে। পুকুরঘাটে গিয়ে স্নান করেন মাধব চক্রবর্তী। তারপর ভাত খাওয়া সেরে নিয়ে আবার আঙিনার এক কোণে একটা মোড়ার উপর বসে থাকেন।

রাজেন, মাধব চক্রবর্তীর এই ছেলেটার বয়স এখন মাত্র ষোল বছর। এখন এই ছেলেটার রোজগারেই মাধব চক্রবর্তীর ঘরের উনানে হাঁড়ি চড়ে। ছেলেটা পাশের গাঁয়ের জমিদার বাড়ির সেরেস্তায় হিসাব লেখে, আর তার পাশের গ্রামের এক জমিদারের তিনটে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েকে অঙ্ক শেখায়। তাই মাধব চক্রবর্তীর বাড়িতে রোজ দু'বেলা না হোক্, অন্তত এক বেলা উনান জ্বলে, হাঁড়ি চড়ে আর ভাতও হয়।

কিন্তু মাধব চক্রবর্তীর কোন অভিযোগ নেই। দু'বেলা ভাত হলে যেমন তৃপ্তি, একবেলা ভাত হলেও যেন তেমনই তৃপ্তি।

রাজেন যখন ছোট ছিল, তখনও মাধব চক্রবর্তীর এই তৃপ্তি আর প্রশান্তি আর আলস্য অটুট ছিল। তখন ভাত যোগাড়ের সব দায় যার উপর ছিল, সে এখন আর বেঁচে নেই। রাজেনের মা গ্রামের এপাড়া আর ওপাড়া ঘুরে, এ-বাড়ি আর সে-বাড়ির গৃহিণীদের নিত্যদিনের কাজে খেটে দিয়ে, কখনও বা শুধু আবেদন করে চেয়ে নিয়ে, যে চাল-ডাল যোগাড় করে নিয়ে আসতেন, তাতেই মাধব চক্রবর্তীর সংসারের প্রাণটা দু'বেলার না হোক, অন্তত একবেলার খোরাক পেয়ে যেত। মাঝে মাঝে কোনদিন দু'বেলা উপোসে কাটাতে হলেও মাধব চক্রবর্তী অভিযোগ করেননি। সকাল দুপুর আর বিকেল ঠিক এভাবে আঙিনার এক কোণে চুপ করে বসে থেকেছেন, আর সন্ধ্যা হলেই দাওয়ার উপর মাদুর পেতে শুয়ে পড়েছেন।

অভিযোগ করা দূরে থাক, কোন দিন চেঁচিয়ে একটা কথা বলেননি মাধব চক্রবর্তী। এখনও বলেন না। সারাক্ষণ চুপ করে বসে থেকেও মাধব চক্রবর্তীর মুখটা কখনও গম্ভীর হয় না। বরং দেখা যায় যে, বেশ শান্ত একটা হাসি ফুটে আছে মাধব চক্রবর্তীর মুখে।

গ্রামের মানুষের সঙ্গে যখন কথা বলেন চক্রবর্তী, তখনও এই অদ্ভুত শান্ত হাসিটা তাঁর চোখেমুখে লেগেই থাকে।

—কি হে চক্রবর্তী, শুনলাম রাজেনের মা'র নাকি খুব জ্বর?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েও হেসে কথা বলছিলেন মাধব চক্রবর্তী—হ্যাঁ, খুব জ্বর।

এই তো, তিন বছর আগে রাজেনের মা তিন দিনের জ্বরে ভুগে যেদিন চোখ বুঁজেছিলেন,

সেদিন মাধব চক্রবর্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে গ্রামের মানুষের মন সত্যিই বেশ রাগ করেছিল। শ্মশানঘাটে বসে কেমন শান্ত দুটি চোখ তুলে জ্বলন্ত চিতার দিকে তাকিয়ে ছিলেন মাধব চক্রবর্তী। শান্ত চোখ দুটো যেন শান্ত হাসির দুটো চোখ। আর মুখটা অবিকার। সেই তৃপ্ত আর প্রশান্ত মুখ।

হরনাথবাবু ফিসফিস করে বলেছিলেন, লোকটা হয় পিশাচ, নয় ঋষি।

রাজেনের মা মারা যাবার পর, রাজেনই মাধব চক্রবর্তীর সংসারের অন্নচিন্তার সহায়। ঐটুকু ছেলে ভিন্ গ্রামের বাড়িতে ছেলে পড়িয়ে আর হিসেব লেখার কাজ করে দুবেলার না হোক, একবেলার ভাত যোগাড় করে।

গ্রামের সবাই ভেবেছিল, এইবার বিচলিত হবেন মাধব চক্রবর্তী। অন্তত কিছু দিনের জন্য মাধব চক্রবর্তীকে এই নিদারুণ কুঁড়েমির আরাম থেকে সরে আসতে হবে, খাটতে হবে, কাজ করতে হবে। না হলে খাবে কি লোকটা?

রাজেন একটা চাকরি পেয়েছে। যুদ্ধের চাকরি। তাও আবার এদেশে নয়, অনেক দূরে সিঙ্গাপুর গিয়ে এক সেনাশিবিরে কেরানীর কাজ করতে হবে।

মাইনে একরকম মন্দ নয়। কিন্তু নিজের খাওয়া-পরার জন্য খরচ করে মাইনে থেকে কি-ই বা বাঁচাতে পারবে রাজেন? যদি নেহাতই কিছু বাঁচাতে পারে আর বাপকে পাঠায়, তবু তো বেশ কিছুদিন দেরি হবে। অন্তত দুতিনটে মাস না গেলে রাজেন যে টাকা পাঠাতে পারবে না, এটা বুঝতে অসুবিধে নেই।

সবাই বুঝেছে, কিন্তু মাধব চক্রবর্তী বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

রাজেন যেদিন মাধব চক্রবর্তীকে প্রণাম করে রওনা হয়ে গেল, সেদিনও গ্রামের মানুষ আশ্চর্য হয়ে গেল, কেমন শান্তটি হয়ে আঙিনার এক কোণে মোড়ার উপর বসে আছেন মাধব চক্রবর্তী। রাজেনকে একটুও বাধা দিলেন না, কোন অভিযোগ কিংবা অনুরোধও করলেন না। রাজেন চলে যাবার পরেও দেখা গেল, মাধব চক্রবর্তীর চোখ-মুখ তেমনই নিবিড় আলস্যের আরামে যেন মুগ্ধ হয়ে হাসছে। ঘর শূন্য হয়ে গিয়েছে, কিন্তু মাধব চক্রবর্তীর প্রাণটা যেন নিজেরই শূন্যতার গৌরবে ধন্য হয়ে বসে আছে।

হরনাথবাবু একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি বলে গেল রাজেন? মাসে মাসে টাকা পাঠাবে?

মাধব চক্রবর্তী তেমনই শান্ত হাসির মুখ তুলে বললেন—কই? রাজেন তো কিছু বলেনি।

—তুমিও কিছু জিজ্ঞাসা করনি?

—না।

—তাহলে বলো, রাজেন কিছু টাকা পয়সা দিয়ে গিয়েছে।

—না।

—হেসে হেসে এত না-না তো করছ, কিন্তু ভেবে দেখেছ কি? পেট চলবে কি করে?

মাধব চক্রবর্তী শুধু চুপ করে হাসিমুখ তুলে হরনাথবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকেন। কোন কথা বলেন না।

হরনাথবাবু এইবার সত্যিই একটু বিস্মিত হয়ে চলে যান। গ্রামের মানুষও বিস্মিত হয়। লোকটার প্রাণটা কি পাথর দিয়ে তৈরি? এখনও নির্বিকার, ভালো-মন্দ একটা বোধও নেই? কী আশ্চর্য!

এই হরনাথবাবু একদিন চমকে উঠলেন।

দেখতে পেলেন হরনাথবাবু, মাধব চক্রবর্তীর হাতে একটা ঘটি আর একটা কাঁথা। কোথায় যেন চলে যাচ্ছেন মাধব চক্রবর্তী। মুখে সেই প্রশান্ত হাসি।

—কোথায় চললে মাধব?

—আকাশ-বৃত্তি।

—তার মানে?

—বাকি দিনগুলি আকাশ-বৃত্তি করে পার করে দিতে চাই!

আকাশ-বৃত্তি! কথাটা হরনাথবাবুর কাছে নতুন কথা অবশ্য নয়। তিনি নিজেই কতবার গল্প করে গাঁয়ের মানুষের কাছে গর্ব করেছেন—আমাদের এই গাঁয়ের তিনজন ব্রাহ্মণ আকাশ-বৃত্তি করে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন।

গ্রামের বাইরে নদীর কিনারায়, কোন বটের ছায়ার কাছে একটি একান্ত নিরালায়, একটি পাতার কুটিরের নিভৃতে বাস করে আর আকাশের দিকে তাকিয়ে দিন পার করে দিতে হয়। কারও কাছে এক কণা চাল চাইবারও নিয়ম নেই। যদি কেউ নিজের ইচ্ছায় এসে কিছু চাল-ডাল দিয়ে যায়, তবেই খাওয়া হবে, নইলে নয়। অন্নচিন্তা করবার কোন অধিকার নেই। পুরাণের গল্পে আছে, কঠোরতপা মুনি-ঋষিরা শুধু বায়ু পান করে জীবনধারণ করতেন। আকাশবৃত্তি সেইরকমই একটা ভয়ানক কঠোর বৃত্তি। মাধব চক্রবর্তী এহেন আকাশবৃত্তি করবার সাহস করে, কী আশ্চর্য!

কিন্তু দেখা গেল, সত্যিই আকাশবৃত্তি নিয়ে নদীর কিনারায় একটা বটের ছায়ায় বসে আছেন মাধব চক্রবর্তী, এ খবর জানে সবাই, দেখেছেও অনেকে। ভিন্ গাঁয়ের লোকেরাও দেখেছে।

কিন্তু একদিন হেসে ফেললেন হরনাথবাবু—মাধব চক্রবর্তী বোকা নয় হে। ভয়ানক চালাক, অতি ভয়ানক চালাক।

—কেন?

—আকাশবৃত্তির দয়াতে আজকাল যা খাচ্ছে মাধব, তেমন খাওয়া জীবনে কোনদিন খেতে পায়নি। রোজই খিচুড়ি রাঁধছে—পায়েস-টায়েসও চলে। তা ছাড়া ফলটলও কম জুটছে না।

—কোথা থেকে জুটছে?

—দশটা গ্রামের লোক দিচ্ছে। হাটের দিন তো কথাই নেই, লোকের দানের সিধায় মাধবের উপোসী ঘর প্রায় একটা মুদিখানা হয়ে ওঠে। শুনলাম, মাধব নিজেও আজকাল দানটান করে। ভিখারী দেখতে পেলে ডাক দিয়ে চাল ডাল দেয়।

সনাতনও একদিন গিয়ে দেখে এসেছে, বেশ গোলগাল নাদুসটি হয়েছে মাধব চক্রবর্তীর বুড়ো বয়সের চেহারা।

ভোলা ভটচাজ বলে—আকাশবৃত্তি নয় হে, পায়েস বৃত্তি। হাঁড়ি ভর্তি পায়েস।

যেমন হরনাথবাবু, তেমনই আরও অনেকে আশ্চর্য হয়েছেন। রাজেন জাপানী বোমায় মারা গিয়েছে, খবরটা কি শোনেননি মাধব?

ভোলাবাবু বলেন—শুনেছে, আমিই সেদিন শুনিয়ে এসেছি। কিন্তু...

—কি?

—কিন্তু, মাধব চক্রবর্তী তাতে একটুও দুঃখিত হয়েছে বলে মনে হলো না।

—আশ্চর্য!

—হ্যাঁ, আশ্চর্যই বটে। একটা কথাও বললে না, চুপ করে আকাশপানে তাকিয়ে শুধু হাসল।

—হাসবেই তো। আকাশবৃত্তি যখন ভালো মতো চলছে, আর পায়েস-টায়েস জুটছে, তখন ছেলের মৃত্যুতেও ওর কোন চিন্তা নেই।

গ্রামের মানুষের প্রাণ কিন্তু এরই মধ্যে একটা আতঙ্কের আঘাতে সব হাসি হারিয়েছে। গ্রামের কিছু মানুষ চলেও গিয়েছে। চারদিকে অন্নাভাবে হাহাকার পড়েছে। দুর্ভিক্ষ, সরকার

নিজেই স্বীকার করেছেন, এ জেলাতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে।

হরনাথবাবুর মতো অবস্থার মানুষও একবেলা ভাত খান। ভোলাবাবু বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন। সনাতনের এত বড় গোয়ালটাও শূন্য, সব গরু বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।

তবু দুর্ভিক্ষের ভয় যেন সারা গ্রামের প্রাণের উপর একটা অভিশাপের মতো চেপে বসে আছে। ভিখারি এলে গ্রামের মানুষ রাগ করে তাড়া দেয়। কোন সাধু এসে দীঘির ধারে সারাদিন বসে থাকলেও ভাত পায় না। কে দেবে ভাত? সবাই যে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে রাখবার চিন্তাতেই বিপন্ন। যার ঘরে পাঁচ সের চাল আছে, সেও সাবধানে কথা বলে, কেউ যেন টের না পায় যে ঘরে পাঁচ সের চাল আছে।

এইরকমই আতঙ্কের একটি দিনে হরনাথবাবু সারা গাঁয়ের মানুষকে একটি খবর দিয়ে চঞ্চল করে তুললেন। —ওহে, মাধব চক্রবর্তী যে যেতে বসেছে।

—কি হলো?

—আজকাল সত্যিই আকাশবৃত্তি করছে মাধব। শুধু হাওয়া খেয়ে কোন মতে বেঁচে আছে। কিন্তু মনে হচ্ছে...।

—কি?

—ভাতটাত না পেলে মাধব আর বাঁচবে না।

—ভাত-টাত পাচ্ছে না কেন?

—কে দেবে ভাত? সবাই যে নিজের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত। দু'মুঠো চাল দেবার সাহস করবে কে?

—কেন? নদীর ধারেই তো একটা সরকারি লঙ্গরখানা খুলেছে। মাধব চক্রবর্তী ইচ্ছে করলেই, সেখান থেকে কিছু ফেনভাত পেতে পারে।

হরনাথবাবু হাসেন—আকাশবৃত্তিতে বাধে। ভিক্ষে করা বা চাওয়া কিংবা কোথাও গিয়ে ভাতের জন্য হাত পাতা নিষেধ।

—তা হলে তো লোকটা মরেই যাবে মনে হচ্ছে।

—সেই জন্যেই বলছি, একটা ব্যবস্থা করা উচিত!

—কি ব্যবস্থা, বলুন।

—চলো, একবাটি সাগুর পায়েস আর কিছু ফল যোগাড় করে নিয়ে মাধবকে খাইয়ে আসি।

কে জানে সেদিন কী ছিল আকাশের মনে! তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, আর আকাশ থেকে নদীর বুকে অদ্ভুত রকমের জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছিল। মাধব চক্রবর্তী তাঁর ঝিরঝিরে শীর্ণ চেহারাটা নিয়ে বেশ শান্ত হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন।

হরনাথবাবু সাগুর পায়েসের বাটিটা মাধব চক্রবর্তীর চোখের সামনে মাটির উপর রেখে দিয়ে অনুরোধ করলেন—খেয়ে নাও মাধব। তারপর একটু জল খাও। আর একটু পরে এই ফলগুলি খেও।

মাধব চক্রবর্তীর শান্ত মুখটা যেন শান্ত জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিলে মিশে হাসছে। অদ্ভুত হাসি। মাধব চক্রবর্তীর সারা জীবনের আলস্যের আর অব্যস্ততার প্রতিজ্ঞাটা গর্ব করে হাসছে। আকাশের সঙ্গে প্রাণটাকেও মিশিয়ে দেবার আনন্দে তৃপ্ত আর কৃতার্থ হয়ে মাধব চক্রবর্তী চোখ দুটো হাসছে।

—খেয়ে নাও মাধব। আবার ডাক দিলেন হরনাথবাবু।

মাধব চক্রবর্তী আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে হাসতে থাকেন—না।

হরনাথবাবু বলেন—এ তোমার কি রকমের জেদ?

—না, জেদ নয়! আস্তে আস্তে কথা বলেন মাধব চক্রবর্তী।

মাধব চক্রবর্তী এখনও যেন সেই পরম আলস্যের সুখে মুগ্ধ হয়ে বসে আছেন। সাগুর পায়েস আর ফল-মূলের দিকে তাকাবার একটুও আগ্রহ নেই। একটুও চেষ্টা নেই। কী ভয়ানক নির্ভীক আলস্য!

কিন্তু চেঁচিয়ে উঠলেন ভোলাবাবু—এ কি হলো? এ কি হলো?

মাধব চক্রবর্তীর সেই অলস শরীরটা গাছের গায়ের উপর ঢলে পড়েছে।

চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন হরনাথবাবু—এ কী কাণ্ড করলে মাধব? তুমি সত্যই ঋষি ছিলে নাকি মাধব?

ভোলাবাবু আস্তে আস্তে মাধব চক্রবর্তীর নিষ্প্রাণ শরীরটাকে দু'হাতে ধরে মাটির উপর শুইয়ে দিলেন।

বৈপিতৃক

পরিচিতা মহিলারা প্রায়ই আসেন এবং আত্মীয়ারা খুব কমই আসেন। অনেকক্ষণ ধরে অনেক আলাপের পর তাঁরা মুক্তিময়ীকে আজও একটি সান্ত্বনার কথা জানিয়ে চলে যান।—তবু, আপনি একরকম ভালই আছেন।

মুক্তিময়ী বলেন—একরকম ভাল আছি ঠিকই, শুধু দুঃখ এই যে, তিনি আগে চলে গেলেন।

আজ বেশ শান্তভাবেই এই কথাটা বলতে পারছে মুক্তিময়ী। কিন্তু দু'বছর আগে এই দুঃখ সহ্য করবার কল্পনাকেও সহ্য করতে পারেননি। ভবতোষ ঘোষ যেদিন মারা গেলেন, সেদিন মুক্তিময়ীর মনের অবস্থা দেখে এই সব মহিলা এবং আত্মীয়ারাও বিশ্বাস করতে পারেননি যে, এই বৈধব্যের বেদনা সহ্য করে আবার শান্ত ও সুস্থ হতে পারবেন মুক্তিময়ী। প্রায় দুটো দিন জ্ঞান হারিয়ে, একটা শোকাক্রান্ত ছিন্নভিন্ন মূর্তি নিয়ে এই বাড়ির মেঝের উপর পড়েছিলেন মুক্তিময়ী। মুক্তিময়ীর দুই ছেলে সঞ্জীব আর অজয় মুক্তিময়ীর দুই হাত ধরে যখন চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছিল, তখন আস্তে আস্তে হারানো জ্ঞান ফিরে পেয়েছিলেন। দুই ভাই-এর সেই কান্নার শব্দ বোধহয় মুক্তিময়ীর বৈধব্যের জ্বালাকেও বিচলিত করেছিল। সঞ্জীব আর অজয়, দুই ছেলের গলা জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে অনেকক্ষণ বসেছিলেন মুক্তিময়ী। তারপর শান্ত হয়েছিলেন।

এই সব পরিচিতা এবং আত্মীয়ারাও জানতেন যে, মুক্তিময়ীর জীবনে এই শোক প্রথম বৈধব্যের শোক নয়, দ্বিতীয়বার বিধবা হলেন মুক্তিময়ী। মুক্তিময়ীর মনে বড় আশা ছিল এবং বোধহয় বিশ্বাসও করতেন যে, এইবার আর তাঁর অদৃষ্টটা করুণাহীন হবে না। তিনি নিজেই আগে যাবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অদৃষ্টের অকরুণাই সত্য হয়ে উঠলো। এবং তাই বোধহয় পঞ্চান্ন বছর বয়সের এই কপালটাকে মেঝের উপর লুটিয়ে দিয়ে তাঁর অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিয়েছিলেন।

পরিচিতা মহিলারা এবং আত্মীয়ারা সান্ত্বনা দিতে এসে মনে মনে একটু বিস্মিতও হয়েছিলেন। এই দুঃখটা যে মুক্তিময়ীর জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা নয়। পঁচিশ বছরেরও বেশি হবে বোধহয়, এই রকমেরই একটা দুঃখের আঘাত মুক্তিময়ীকে সহ্য করতে হয়েছিল। মুক্তিময়ীর বয়সও তখন পঁচিশ বছরের মতই ছিল। আজকের এই সঞ্জীবের বয়স তখন তিন বছর। সঞ্জীবের বাবা দিনেশ দত্তের বয়সও তখন ত্রিশ বছর। যুবক স্বামীর অকাল মৃত্যু সেই দিন মুক্তিময়ীকে অকালে বিধবার সাজে সাজিয়ে দিয়েছিল। সেই শোক সহ্য করতে এবং শান্ত হতে পেরেছিলেন সেদিনের মুক্তিময়ী।

প্রথম স্বামী দিনেশ দত্তের মৃত্যুর মাত্র দু'বছর পরে ভবতোষ ঘোষের সঙ্গে মুক্তিময়ীর বিয়ে যেদিন হয়ে গেল, সেদিনও পরিচিতা মহিলারা আর আত্মীয়ারা বিস্মিত হননি। ভালই তো, শোক ভুলে গিয়ে আর শান্ত হয়ে আবার একটা ভালবাসার জীবন স্বীকার করে নিল মুক্তিময়ী। এরকম না হলেই বরং ব্যাপারটা আরও বেশি দুঃখের হতো।

এই সব পরিচিতা মহিলা এবং আত্মীয়ারাও দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, মুক্তিময়ীর প্রথম স্বামীর ভালবাসার দান, সেই ছোট্ট সঞ্জীবও মুক্তিময়ীর দ্বিতীয় বিবাহিত জীবনে কোন সমস্যা হয়ে উঠলো না। দ্বিতীয় স্বামী ভবতোষ ঘোষ পাঁচ বছর বয়সের সঞ্জীবকে আদর করে কোলে তুলে নিলেন, এবং অপরিচিত কোন ব্যক্তির পক্ষে বোঝবার সাধ্যিও ছিল না যে, এই সঞ্জীব ভবতোষ ঘোষের নিজের ছেলে নয়। সঞ্জীব দত্ত, সন অব লেট দীনেশ দত্ত, এই পরিচয় শুধু সঞ্জীবের স্কুলের নাম ভর্তির রেজিস্টারে লেখা রইল। কিন্তু লোকের চোখে

কোন সন্দেহ রইল না যে, ভবতোষ ঘোষ বাপেরই স্নেহ মমতা আর আগ্রহ নিয়ে সঞ্জীবকে মানুষ করে তুলেছেন। হৃদয়ের বিচারে, ভবতোষ ঘোষই যে সঞ্জীবের বাপ, এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় ছিল না।

আর একটা সমস্যা, যেটা মুক্তিময়ী আর ভবতোষ ঘোষ এবং এই সব পরিচিত মহিলা ও আত্মীয়ারা আশঙ্কা করে একটু চিন্তিত হয়েছিলেন, সে সমস্যাটাও দেখা দিল না। ভবতোষ ঘোষ আর মুক্তিময়ীর ভালবাসার জীবন যখন একটি সন্তান উপহার পেয়ে হেসে উঠলো, তখন সেই হাসির আড়ালে একটা প্রশ্নও ছিল। ভাইকে হিংসে করবে না তো সঞ্জীব।

এক মায়ের পেটের, পিঠাপিঠি দুই ভাই শিশুকালে পরস্পরকে যে হিংসে করে, সে রকম হিংসে থাকুক না সঞ্জীব আর অজয়ের মনে। কিন্তু তার চেয়ে বেশি, এবং অন্য রকমের অদ্ভুত কোন হিংসে দেখা দেবে না তো?

কিন্তু নিতান্তই অনর্থক ও অহেতুক আশঙ্কা। এইসব পরিচিতা মহিলা এবং আত্মীয়ারাই দেখে খুশি হয়ে গেলেন, এবং মুক্তিময়ী ও ভবতোষের চোখের দৃষ্টিও যেন একটা গৌরবের অনুভব পেয়ে ধন্য হয়ে গেল। সাত বছর বয়সের সঞ্জীব কী অদ্ভুত আগ্রহে চঞ্চল হয়ে ভাই-ভাই বলে ছুটে আসে, আর এক বছর বয়সের অজয়কে বুকের উপর সাপটে ধরে নিয়ে টলমল করে হাঁটে।

আবার চিন্তিত হয়েছিলেন এইসব পরিচিতা মহিলা এবং আত্মীয়ারা। আজ না হয় দুজনে নেহাতই দুটি শিশু কিন্তু বড় হবে যখন, তখন? তখন কি আর ভাই-ভাই ভাব থাকবে? সঞ্জীব দত্ত কি অজয় ঘোষকে আপন-ভাই বলে মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারবে? এবং অজয়ও কি পারবে?

এই আশঙ্কাও মিথ্যে হয়ে গেল। এইসব পরিচিতা মহিলা এবং আত্মীয়ারাই বিস্মিত হয়ে দেখলেন, এবং খুশিও হলেন বোধহয়। বাইশ বছর বয়স হয়েছে সঞ্জীবের, এম-এ পাশও করেছে, কিন্তু কী অদ্ভুত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে রয়েছে সঞ্জীবের মন! অজয়টা ম্যাট্রিক পাশ করতে পারবে তো? এগিয়ে এসেছে অজয়ের পরীক্ষা। দিন ও রাতের মধ্যে প্রায় আঠার ঘণ্টা অজয়কে পড়ায় সঞ্জীব—লজ্জার কথা, আমার পক্ষে ভয়ঙ্কর লজ্জার কথা হবে বাবা, যদি অজয় ফেল করে। সঞ্জীবের মনের এই উদ্বেগ দেখে ভবতোষ ঘোষ আর মুক্তিময়ীর মন যেন একটা গর্বের আনন্দে হেসে ওঠে। পৃথিবীর কোন দুই ভাইও কি এর চেয়ে বেশি ভাই-ভাই হতে পারে?

অথচ, আজ তো এই দুই ভাই দুটি শিশু নয়, শিশু-মনের মানুষও নয়, এবং ছেলেমানুষী খেলার আনন্দের দুই সঙ্গীও নয়। দুজনেই বড় হয়েছে। সঞ্জীবের বয়স বাইশ এবং অজয়ের বয়স ষোল। ওরা কি ওদের দুই জীবনের সব মিলের মধ্যে একটি অমিলের কথা জানে না!

সঞ্জীব দত্ত আর অজয় ঘোষ, দুই ভাই-এর দুই নামের মধ্যে কেন একটা পরিচয়ের অমিল থেকে গিয়েছে এই প্রশ্নের উত্তর ওরা পেয়ে গিয়েছে। বড় হয়েছে দুজনে, সবই বুঝতে পেরেছে দুজনে, তবু দুজনের ভাই-ভাই মনটার উপর সেই উপলব্ধির একটা টোকাও পড়লো না যেন, আঘাত দূরে থাকুক। আর ভাবনা করবার কি আছে?

কিন্তু, আবার ভেবেছিলেন এইসব পরিচিতা মহিলা এবং আত্মীয়ারা ভবতোষ ঘোষের সম্পত্তি কি সঞ্জীব আর অজয়ের এই ভাই-ভাই ভাবের আনন্দ ছিন্নভিন্ন করে দেবে না? ভবতোষ ঘোষ যেদিন আর থাকবেন না, সেদিনও কি দুজনের মনে ঠিক এইরকমই ভাই-ভাই ভাবের জোরটুকু থাকবে?

কিন্তু এই সমস্যাও দেখা দিল না। ভবতোষ ঘোষ তাঁর সব বাড়ি বাগান শেয়ার আর নগদ টাকা একেবারে চুলচেরা সমানভাগে ভাগ করে তার এক ভাগ সঞ্জীবের নাম উইল করে রেখেছিলেন। ভবতোষের মৃত্যুর পর এই তথ্য যেদিন জানলেন এই সব পরিচিতা মহিলা ও

আত্মীয়ারা, সেদিন তাঁরা সবচেয়ে বিস্মিত হয়ে ভাবনা করাই ছেড়ে দিলেন। না, আর কোন সমস্যাই দেখা দিল না, দেখা দেবেও না।

তাই মুক্তিময়ী বলেন, একরকম ভালই আছি। দুই ছেলে নিয়ে একরকম নিশ্চিন্ত মনেই জীবনের সন্ধ্যাকালের মুহূর্তগুলি পার করে দিচ্ছেন। শুধু দুঃখ এই যে, উনি আগে চলে গেলেন! এবং এই দুঃখটাও শান্ত-চিত্তে সহ্য করবার মতো শক্তি কেমন করে আর কেন পেয়ে গেলেন তিনি, তাও বুঝতে পারেন।

সঞ্জীব আর অজয়, তাঁর দুই ভিন্ন জীবনের দুই ছেলের আজ দুটি আপন ভাই হয়ে গিয়েছে। এইবার নিজেও পরিপূর্ণ প্রশান্তি ও নির্ভাবনার আনন্দ নিয়ে চোখ বুজতে পারবেন।

২

এইসব পরিচিতা মহিলা এবং আত্মীয়ারা আবার একদিন একটা ভাবনায় পড়লেন ; কারণ মুক্তিময়ীর কথায় কথায় হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠে আর চোখ মুছে একটা নতুন কথা বলে উঠলেন।—না মোটেই ভাল নেই। একটুও ভাল লাগছে না। শেষ পর্যন্ত ভগবান আমাকে শাস্তি দেবেন বলে মনে হচ্ছে,—নিশ্চিন্ত মনে মরবার সৌভাগ্য আর হলো না!

পঞ্চান্ন বছর বয়সের বিধবা। মাত্র দু'বছর আগে যাঁর স্বামী বিগত হয়েছেন কিন্তু দুই ছেলেকে একসঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরে স্বামী হারাবার শোক শেষ পর্যন্ত শান্ত করতে পেরেছিলেন যিনি, তিনি আবার অশান্ত হয়ে উঠলেন কেন?

শুনে বিস্মিত এবং দুঃখিত হলেও বুঝতে পারেন না কেউ, আজ মুক্তিময়ীর এই শান্ত ও সাদা জীবনের উপর আবার নতুন করে কোন্ ব্যথিত চিন্তার ঝড় এসে লাগতে পারে, যার জন্যে এত উতলা হয়ে উঠেছেন?

সাদা ফ্রেমের চশমাটাকে নামিয়ে দিয়ে ধবধবে সাদা থান-শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন মুক্তিময়ী। দু'বছর আগে, যে সময় ভবতোষ ঘোষ মারা গেলেন, সে সময় মুক্তিময়ীর মাথার অনেকখানি কালো ছিল। কিন্তু এই দু'বছরের মধ্যে সেই কালোর সবই প্রায় সাদা হয়ে গিয়েছে। তাঁর এলোমেলো খোঁপাটাকে সাদা রেশমের খোঁপা বলে মনে হয়। এই মুক্তিময়ী এই তো সেদিনও বলেছেন যে, বড় ছেলে সঞ্জীবের বউ-এর মুখ দেখবার দিন পর্যন্ত তিনি বেঁচে থাকতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু সেজন্য তাঁর মনে কোন দুঃখ নেই। আজ তবে তাঁর মনে এ কেমন দুঃখের ছোঁয়া নতুন করে লাগলো, যার জন্য মানুষটা বেদনা সামলাতে না পেরে এতগুলি বাইরের লোকের কাছে কেঁদেই ফেলেছেন?

পরিচিত মহিলারা এবং আত্মীয়ারা মুক্তিময়ীর এই নতুন দুঃখের কারণ আর চোখের জলের অর্থ বুঝতে পারেন না, তাই আশ্চর্য হন। এবং শেষ পর্যন্ত এই ধারণা করেন যে, মুক্তিময়ী মাঝে মাঝে যে শ্বাসকষ্টে ভুগতেন, সেই কষ্টই বোধহয় এইবার একটু বেশি তীব্র এবং যে বেশি দুঃসহ হয়ে উঠেছে। হবার কারণও আছে। মানুষটির বয়সও তো কম হয়নি।

পরিচিত মহিলারা এবং আত্মীয়ারা চলে যাবার পরেও ঘরের নিভৃতে একটি চেয়ারের উপর বসে আরও কয়েকবার চোখ মোছেন মুক্তিময়ী। হাতের বইটার একটা লাইনও মন দিয়ে পড়তে পারেন না, এবং হাতের বইটাও যেন একটা করুণ আক্ষেপের মতো বার বার কেঁপে ওঠে।

আজ শুধু নয়, এই একটা বছর ধরে মুক্তিময়ীর মন এই অশান্তি সহ্য করছে। এতদিন সহ্য করেও চুপ করে ছিলেন, কিংবা চুপ করে সহ্য করেছিলেন, কিন্তু আজ আর সহ্য করতে পারছেন না।

তাই বাইরের মানুষের সামনে কেঁদে ফেলেছেন।

যে সমস্যার আশংকা থেকে একেবারে মুক্ত হয়ে গিয়েছিল মুক্তিময়ীর মন, সেই সমস্যা

একেবারে নিদারুণ রূঢ়তা নিয়ে দেখা দিয়েছে। সঞ্জীব আর অজয়ের মধ্যে সেই ভাই-ভাই ভাব যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু খোঁজ নিয়েছেন মুক্তিময়ী, অজয় কি কোনদিন বড় ভাই সঞ্জীবের সঙ্গে কোন রূঢ় ব্যবহার করেছে?

কোনওদিন না। অজয় নিজেই মুক্তিময়ীর কাছে এসে ছলছল চোখে অভিযোগ করেছে, দাদা আজকাল কেন এত গম্ভীর হয়ে গিয়েছে মা? আমার সঙ্গে যেন কথা বলতেই চায় না।

মুক্তিময়ী—তুই নিশ্চয়ই কোন অন্যায় করেছিস।

অজয়—দাদা বলুক, কি অন্যায় করেছি। আমি তখুনি মাপ চাইব।

মুক্তিময়ী—তুই তাহলে জিজ্ঞাসা করে দেখ।

জিজ্ঞাসা করেছিল অজয়। কিন্তু সঞ্জীব আরও গম্ভীর হয়ে অজয়কে যেকথা বলেছে, তাতে অজয় আরও আশ্চর্য হয়েছে, এবং মুক্তিময়ীর বুকটা আতঙ্কে ভরে গিয়েছে।

—তুমি অন্যায় করবে কেন অজয়? অন্যায় করেছে আমার অদৃষ্ট। সঞ্জীবের এই কথার যে কি অর্থ হয়, বুঝতে পারে না অজয় কিন্তু মুক্তিময়ী মনে করেন, একথার অর্থ যদি কিছু থাকে, তবে সেটা এই যে, আজ এই পঁচিশ বছর বয়সের যুবক সঞ্জীব কারও না কারও উপর একটা ঘৃণা সহ্য করতে গিয়ে কষ্ট পাচ্ছে।

রাগ করে কাকে ঘৃণা করছে সঞ্জীব? নিজেকে এত গম্ভীর করে রেখে কিসের বেদনা সহ্য করছে সঞ্জীব?

স্মরণ করতে পারেন মুক্তিময়ী, আজ থেকে ঠিক এক বছর আগের এমনই একটি বিশেষ দিনের সকাল বেলায় সঞ্জীবের মুখ সেই যে গম্ভীর হয়ে গেল, সে গম্ভীরতাই আজ সকালে একটা রূঢ় বিদ্রোহের মতো যেন চাপা গর্জন করে মুক্তিময়ীর মনের শান্তিকে আতঙ্কিত করেছে। মুক্তিময়ীর বুকের ভিতরটা যেন অপমানে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছে।

আজই সকালে ভবতোষ ঘোষের বড় ফটোটার কাছে উপাসনার জন্য অনেকক্ষণ ধরে বসেছিলেন মুক্তিময়ী, অজয়ও ছিল। আজ হলো ভবতোষ ঘোষের মৃত্যুর তারিখ। আজ থেকে দু'বছর আগে এমনই একটি এগারই বৈশাখে ভবতোষ ঘোষ চিরকালের মতো বিদায় নিয়েছিলেন।

সঞ্জীব উপাসনায় এসে বসবে, বোধহয় কোন কারণে দেরি করছে ; ভবতোষ ঘোষের ফটোর সামনে ফুলের স্তবক আর ধূপের ধোঁয়া ; সঞ্জীবের অপেক্ষায় চুপ করে বসেছিলেন মুক্তিময়ী আর অজয়। কিন্তু খুব বেশি দেরি দেখে খোঁজ নিলেন এবং বুঝতে পারলেন বাড়িতে নেই সঞ্জীব। এই কিছুক্ষণ আগে একটা সাইকেল নিয়ে বেড়াতে বের হয়ে গিয়েছে।

ভবতোষ ঘোষের স্মৃতিকে আজ কী ভয়ানক অপমান করছে সেই ছেলে, যাকে বুকে তুলে মানুষ করেছেন ভবতোষ ঘোষ, আর সম্পত্তির দু' ভাগের এক ভাগ উইল করে দিয়ে গিয়েছেন! শুধু অজয়কে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে কেঁদে উপাসনা করে উঠে গেলেন মুক্তিময়ী।

কিন্তু নিজেকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন মুক্তিময়ী। না, নিশ্চয় অন্য কোন কারণ আছে, যে জন্য আজ উপাসনায় এসে বসতে পারেনি সঞ্জীব। ইচ্ছে ছিল নিশ্চয়।

সঞ্জীব বাড়ি ফিরে আসতেই মুক্তিময়ী বললেন—আজ বিকালে আমাকে একবার ওঁর সমাধিতে ফুল দিতে নিয়ে যাবি সঞ্জীব।

সঞ্জীব গম্ভীর হয়ে বলে—আমার সময় হবে না।

মুক্তিময়ীর যন্ত্রণাক্ত চোখ দুটো থরথর করতে থাকে। বুকের ভিতরের আর্তনাদটাও যেন এই নিদারুণ অপমান সহ্য করতে না পেরে বোবা হয়ে যায়।

আর কোন সন্দেহ নেই, মুক্তিময়ীর এক বছরের আশংকা চরম সত্য হয়ে উঠেছে। ভবতোষ ঘোষের মৃত্যুর প্রথম বার্ষিকী দিনটাতে ফটোর সামনে উপাসনায় বসে হঠাৎ কেন

গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল সঞ্জীব, সেই রহস্য এতদিনে বুঝতে পারা গেল। যার কোলে-বুকে চড়ে চার বছর বয়স থেকে বাপের স্নেহ পেয়েছে, বেঁচেছে, বড় হয়েছে, সেই মানুষকেই ঘৃণা করছে সঞ্জীব। এ কী করে সম্ভব হয়?

মুক্তিময়ীর এই যন্ত্রণাক্ত বিস্ময় আর একবার নীরবে আর্তনাদ করে ওঠে।

অজয় এসে মুখ ভার করে মুক্তিময়ীর কাছে বসে, আর আস্তে আস্তে আতঙ্কিতের মতো বলে—দাদা এসব কি বলছে মা?

মুক্তিময়ী—কি?

অজয়—দাদা বলছে, সম্পত্তির ওর অংশ আমাকে গিফট করে দেবে।

মাথা হেঁট করলেন মুক্তিময়ী। অনেকক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। ধবধবে সাদা থান-শাড়ির আঁচল ভেজা চোখের উপর চেপে আস্তে আস্তে বললেন—তবে আজ বিকালে তুই-ই আমাকে নিয়ে যাবি অজয়—

অজয়—কোথায়?

মুক্তিময়ী—ওঁর সমাধিতে ফুল দিতে।

অজয়—আচ্ছা।

৩

বিকাল হয়ে এসেছে। কিন্তু ঘরের ভিতরে এক ভয়ানক অভিমানের ভারে যেন স্তব্ধ হয়ে অনড় পাথরের মতো বসে থাকে সঞ্জীব। সঞ্জীবের এই অভিমান এই বাড়ির আজকেরই এই বিকাল বেলার জীবনের কোন বিশেষ অভিমান নয়। এক বছর ধরে সঞ্জীবের মনের ভিতরে একটা বেদনা গুমরে রয়েছে।

ভবতোষ ঘোষের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকীর দিন ফটো আর ফুলের স্তবকের কাছে উপাসনায় বসতে এসে মার মুখের দিকে তাকিয়েই হঠাৎ আনমনা হয়ে গিয়েছিল সঞ্জীব। জলভরা চোখ নিয়ে ভবতোষ ঘোষের যে ফটোর দিকে তাকিয়ে আছেন মা, সেই ফটোর উপর বিন্দুমাত্র রাগ অভিমান ও অশ্রদ্ধা নেই সঞ্জীবের মনে। কিন্তু কেন যেন মুক্তিময়ীর এই জলভরা চোখের উপর একটা হঠাৎ ক্ষোভের জ্বালায় ছটফট করে ওঠে সঞ্জীবের মন।

যে-বছর মারা গিয়েছেন ভবতোষ ঘোষ সেই বছরেরই একটি দিনে, মৃত্যুর দু'মাস আগে তোলা হয়েছিল ঐ ফটো। যাট বছর বয়সের এক বৃদ্ধের কী সুন্দর শান্ত স্নেহশীল একটি মুখের ছবি। বৈধব্যের বেদনা আর সঙ্গীহারা জীবনের শূন্যতার দুঃখ চোখের জলে ভিজিয়ে নিয়ে ফটোর দিকে তাকিয়ে আছেন মুক্তিময়ী। কিন্তু...কই, সঞ্জীব দত্তের বাবা দিনেশ দত্তের ফটো কই?

দিনেশ দত্তের ফটোর দিকে এইভাবে জলভরা চোখ নিয়ে বছরের একটি দিনও তাকাবার দরকার কেন হয়নি মুক্তিময়ীর? দিনেশ দত্তের মৃত্যুও তো মৃত্যু, মুক্তিময়ীর স্বামীর মৃত্যু, সঞ্জীবের বাপের মৃত্যু ; সেই মৃত্যু কি মুক্তিময়ীর জীবনে কোন বেদনার ঘটনা হয়ে ওঠেনি?

এমন করে কেন মিথ্যে হয়ে গেলেন দিনেশ দত্ত? কে জানে কেন, সঞ্জীবের বুকের ভিতরটাও যেন ছটফট করে কেঁদে উঠেছিল। মুক্তিময়ী যে তাঁর প্রথম স্বামীর স্মৃতিকে, সঞ্জীবের বাপকে তুচ্ছ করে আর ভুলে গিয়ে অপমান করছেন। শুধু একজনের ফটো মুক্তিময়ীর মনের ভিতরে চিরন্তন হয়ে থাকবে, এবং আর একজনের ফটো একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, এ কেমন মন?

এই অভিযোগ যে মুক্তিময়ীর কঠিন হৃদয়টারই বিরুদ্ধে সঞ্জীবের অভিযোগ। ভাবতে গিয়ে যেন নিজেরই প্রাণটার উপর সন্দেহ হয়—তবে কি সঞ্জীবের এই প্রাণটা মুক্তিময়ীর ভালবাসার সৃষ্টি নয়? দিনেশ দত্তকে কি তুচ্ছ করতেই ভালবাসতেন মুক্তিময়ী?

আজ সঞ্জীবের এই অভিযোগে ভরা আর অভিমানে কাতর যে মনটা গুমরে রয়েছে, সেই মনটা যে বাইশ বছর অতীতের একটি মানুষের, মুক্তিময়ীর স্বামী আর সঞ্জীবের পিতা দিনেশ দত্তের ফটো দেখবার আর ফটোর কাছে বসে উপাসনা করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

দিনেশ দত্তের স্মৃতি যদি মুক্তিময়ীর কাছে তুচ্ছতা পায়, তবে দিনেশ দত্তের ছেলে সঞ্জীব দত্তের উপর সেই মা-এর স্নেহে কি ফাঁকি থেকে যায় না? সঞ্জীব আর অজয়কে সম্পত্তির সমান ভাগ করে দিয়ে গিয়েছেন ভবতোষ ঘোষ। তাঁর কথা ভাবলে সঞ্জীবের মন প্রণাম করবার জন্যই ঝুঁকে পড়ে। তাঁর স্নেহে কোন মিথ্যে ছিল না।

কিন্তু মুক্তিময়ী কি তাঁর স্নেহ সমান ভাগে ভাগ করে দিতে চেয়েছেন? না না না, কখনই নয়। দিনেশ দত্ত যার কাছে মিথ্যে হয়ে গিয়েছে, তার কাছে দিনেশ দত্তের ভালবাসার উপহার এই সঞ্জীব দত্তও অজয়ের তুলনায় কম আপন হয়ে গিয়েছে। হতে বাধ্য।

মনে পড়ে না তাঁকে, দেখতে কেমন ছিলেন সঞ্জীবের বাবা দিনেশ দত্ত, যাঁর রক্তমাংসের স্নেহ সঞ্জীবের এই শরীরের মধ্যে আজও বেঁচে আছে। তিনিও তো এই মুক্তিময়ীকে ভালবেসে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কি কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে, তাঁর মুক্তিময়ীর মনে তিনি একদিন সত্যিই একেবারে একটা ছায়ার চেয়েও বেশি নিরবয়ব একটা মিথ্যে হয়ে যাবেন? সঞ্জীবের কল্পনাতেও যেন এক ব্যথিত স্বামীর মূর্তি তাঁর সারা মুখে অভিমানের বেদনা নিয়ে সঞ্জীবকে বলছে, আমি ভাবতেই পারিনি সঞ্জীব, তোমার মা আমাকে একদিন এমন করে একেবারে ভুলে যাবে।

কিন্তু এই অভিযোগ কি মুখ খুলে কোন দিন মা'র কাছে বলতে পারা যাবে? বলে লাভই বা কি? মুক্তিময়ী যদি এখনও সঞ্জীবের অভিমানের অর্থ না বুঝে থাকেন, তবে তো বুঝতেই হয় যে, দিনেশ দত্তকে একেবারে মিথ্যে করে দিয়ে শুধু ভবতোষ ঘোষের স্মৃতি আঁকড়ে পড়ে আছেন মুক্তিময়ী।

দেখতে পায় সঞ্জীব, গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করছে অজয়। সঞ্জীবের চোখ জ্বলে ওঠে। হ্যাঁ, ঠিকই, ভবতোষ ঘোষের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ভবতোষ ঘোষের সমাধিতে ফুল দিতে যাবার জন্য তৈরি হয়েছেন মা। যাবেনই তো। স্বামী দিনেশ দত্ত আজ যেমন তাঁর স্মৃতিতে অবান্তর হয়ে গিয়েছে, ছেলে সঞ্জীব দত্তও তেমনি অবান্তর হয়ে যেতে চলেছে।

তবে আর দ্বিধা কেন? মুক্তিময়ীর কাছে গিয়ে এই অভিযোগ স্পষ্ট করে বলে দিতেই তো পারা যায়—তবে আর কেন? ভবতোষ ঘোষের স্মৃতিকে নিয়ে, ভবতোষ ঘোষের ছেলেকে নিয়ে আর ভবতোষ ঘোষের সব সম্পত্তি নিয়ে তুমি থাক। আমি যাই, ভবতোষ ঘোষের সম্পত্তির ভাগ আমার নেওয়া উচিত নয়।

ঘর থেকে বের হয়ে মূর্তিমান বিদ্রোহের মতো ব্যস্তভাবে হেঁটে মুক্তিময়ীর ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ায় সঞ্জীব।

কিন্তু একটু অপেক্ষা করতে হয়। কারণ ঘরে নেই মুক্তিময়ী। বোধহয় স্নানের ঘরে গিয়েছেন।

একটু অপেক্ষা করতে গিয়েই হঠাৎ চমকে ওঠে সঞ্জীব এবং মনটা আবার একটা দুঃখের ঠাট্টায় করুণভাবে হেসে ওঠে। দিনেশ দত্তের ফটো যাঁর মনের ঘর থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে, তিনি দিনেশ দত্তের ছেলে সঞ্জীবের ফটোকে মাথার বালিশের কাছে রেখে দিয়েছেন! ফটোটা মুক্তিময়ীর বিছানার বালিশের তলা থেকে অর্ধেক মুখ বের করে রয়েছে।

মার উপর রাগ আর অভিমানের জ্বালা চরিতার্থ করবার আর একটা সুযোগ হাতের কাছে পেয়েছে সঞ্জীব। সঞ্জীবের এই ফটোকে এখনি সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বুঝে নিক মা, তাঁর এই নাটকীয় স্নেহের অসারতা বুঝে নিয়েছে সঞ্জীব।

অভিমানী দিনেশ দত্তের ছেলে সঞ্জীব দত্ত যেন মুক্তিময়ীর নকল স্নেহের বন্ধন থেকে নিজেকে একেবারে ছিন্ন করে সরিয়ে নেবার জন্য একটা থাবা দিয়ে ফটোটাকে আঁকড়ে ধরে ; চলে যায় সঞ্জীব।

কিন্তু একি? নিজের ঘরের ভিতরে গিয়ে এবং নিজেরই এই ফটোর দিকে তাকিয়ে কাঁপতে থাকে সঞ্জীব। সঞ্জীবের ফটো নয়। সঞ্জীবেরই মতো দেখতে এক যুবকের ফটো। সেই ফটোর উপর নাম লেখা আছে--দিনেশ দত্ত।

ফটোটার উপর মাথা ঠেকিয়ে একেবরে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সঞ্জীব। দৌড়ে গিয়ে মুক্তিময়ীর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ায়।

না, এখনও স্নানের ঘর থেকে ফিরে আসেননি মুক্তিময়ী। ফটোটাকে মুক্তিময়ীর বালিশের তলায় রেখে দিয়ে আবার ঘর ছেড়ে চলে যায় সঞ্জীব।

কিন্তু আর ঘরের ভিতরে নয়। সোজা হেঁটে এগিয়ে গিয়ে গ্যারেজের কাছে দাঁড়ায় সঞ্জীব। একটা ধমক দিয়ে অজয়কে সরিয়ে দেয়--তুই পিছনে বস গিয়ে। আমি ড্রাইভ করবো।

তারপরেই চেঁচিয়ে ডাক দেয় সঞ্জীব।--কত দেরি করছো মা? শিগগির কর।

ঘরের ভেতর থেকে ছুটে বের হয়ে আসেন মুক্তিময়ী। ভেজা চুল, আর ধবধবে সাদা-থানের শাড়ি, মুক্তিময়ীর ব্যাকুল চেহারাটা যেন একটা পরম প্রশান্তির স্বপ্নময় আহ্বান শুনে ছুটে বের হয়ে এসেছে।--কি, কি বলছিস সঞ্জীব?

সঞ্জীব--বাবার সমাধিতে ফুল দিতে চল।

নিতসিঁদুর

এই পথে আসতে যেতে অনেকবার দুজনের মুখোমুখি দেখা হয়েছে। ট্রামে বাসেও কতবার। আর, এই যক্ষ্মা হাসপাতালের ফটকেও। শুধু মুখচেনা পরিচয়। একটা বছরের মধ্যে অনেকবার মুখোমুখি দেখা হলে যতটুকু পরিচয় হয়, ততটুকু। দু'জনের মধ্যে কোনদিন কোন আলাপ, কিংবা সামান্য দু-একটা কথারও বিনিময় ঘটেনি।

কিন্তু অনুমানে দু'জনেই দুজনের ভাগ্যের একটা বেদনার পরিচয় বুঝে নিতে পেরেছে। ধারণা করতে পারে প্রভাত, এই হাসপাতালের কোন কেবিনের বিছানায় এমন কেউ একজন আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন, যিনি এই মহিলার কোন আপনজন হবেন। সুমিত্রাও অনুমান করতে পারে, ভদ্রলোক এখানে নিশ্চয় এমন কোন রোগীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসেন, যিনি ভদ্রলোকের কোন আপন-জন কিংবা প্রায় আপনজনের মতো কেউ একজন হবেন।

পরিচয় হলো সেদিন, যেদিন দেখতে পেল সুমিত্রা, সেই চেনামুখ অথচ অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে সুমিত্রারই পরিচিত পুরনো বান্ধবী অঞ্জলি হাসপাতালের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

অঞ্জলি পরিচয় করিয়ে দিল। ভদ্রলোক হলেন অঞ্জলির দাদা প্রভাতকুমার বরাট। জীবন বীমা কোম্পানির অর্গানাইজার। এতদিন আসাম সার্কেলের চার্জে ছিলেন, কিন্তু বউদির অসুখ হবার পর বাধ্য হয়ে আর চেষ্টা করে কলকাতার অফিসে ফিরে এসেছেন।

—নিরুপমাকে মনে আছে তো সুমিত্রা?

—হ্যাঁ।

—সেই নিরুপমার দিদি শোভাদির সঙ্গে দাদার বিয়ে হয়েছে।

কুণ্ঠিতভাবে এবং একটু ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে সুমিত্রা—কি অসুখ শোভাদির?

কোন কথা না বলে, শুধু চোখের ইসারায় বিরাট হাসপাতাল বাড়িটাকে দেখিয়ে দিয়ে গম্ভীর হয়ে যায় অঞ্জলি।

অঞ্জলির দাদা প্রভাত বরাটের দু চোখের দৃষ্টিও যেন হঠাৎ উদাস হয়ে যায়। পাতা ঝরে গিয়েছে, রিক্ত হয়ে গিয়েছে ফটকের কাছের যে কৃষ্ণচূড়াটা, সেটারই দিকে তাকিয়ে আনমনার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে প্রভাত বরাট।

—দাদা?

অঞ্জলির ডাক শুনে মুখ ফেরায় প্রভাত।

সুমিত্রার পরিচয় শোনাতে থাকে অঞ্জলি—এ হলো আমার বন্ধু সুমিত্রা। এক কলেজের একই ক্লাসের বন্ধু। আমার যেদিন বিয়ে হয়েছে, সেদিন সুমিত্রারও বিয়ে হয়েছে।

আরও অনেক কথা বলে অঞ্জলি, তাই জানতে পারে প্রভাত, অঞ্জলির বান্ধবী এই মহিলা হলেন সুমিত্রা ঘোষ। সুমিত্রার স্বামী লোকেন ঘোষ ইকনমিক্সের ভাল স্কলার, কলেজের লেকচারার। আর সুমিত্রা ঘোষ নিজেও মেয়ে-স্কুলের টিচার। বেশ আছে ওরা দুজন ; স্বামী-স্ত্রীতে একসঙ্গে মিলে লেখাপড়ার চর্চা করে বেশ সুখেই আছে।

—কিন্তু। কি-যেন সন্দেহ করে সুমিত্রার মুখের দিকে একটা প্রশ্ন করতে গিয়েই হঠাৎ থেমে যায় অঞ্জলি।

—কি বলছিলে? প্রশ্ন করে সুমিত্রা।

—তুমি এখানে কেন? ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করে অঞ্জলি।

—উনি যে এখন এখানেই আছেন।

কথাটা বলেই মাথা হেঁট করে সুমিত্রা। বেদনাতুর মুখের একটা দুঃসহ বিষাদের ছায়া যেন

লুকিয়ে ফেলতে চেষ্টা করছে সুমিত্রা। গম্ভীর হয়ে যায় অঞ্জলি। আর, প্রভাতের উদাস চোখের দৃষ্টিও করুণ হয়ে যায়।

সেদিনের পর অনেকদিন পার হয়ে গিয়েছে। প্রভাত বরাট আর সুমিত্রা ঘোষের মুখোমুখি দেখাও হয়েছে অনেকবার। ট্রামে বাসে বা পথে, আর হাসপাতালের এই ফটকের কাছেও কতবার দেখা হয়েছে। কিন্তু আর তো সেই অপরিচয়ের বাধা নেই। এখন দেখা হলে দুজনের মধ্যে দু-চারটে প্রশ্ন বিনিময় হয়েই থাকে, কুশল প্রশ্ন নয়, দুটি উদ্বিগ্ন অদৃষ্টের করুণ প্রশ্ন।

জিজ্ঞাসা করে প্রভাত—এখন কেমন আছেন মিস্টার ঘোষ?

সুমিত্রা—আছেন একরকম।

প্রভাত—কিছুটা উন্নতি নিশ্চয় হয়েছে?

সুমিত্রা—উন্নতির কোন লক্ষণ তো দেখছি না।...শোভাদি কেমন আছেন?

প্রভাত—ভাল হয়ে যেতে পারে বলে আশা করতে পারা যাচ্ছে, এই মাত্র।

২

আজকাল আসবার সময় যদি ট্রামে বাসে বা পথে কোথাও দেখা হয়ে যায়, তবে বাকি পথটুকু দু'জনে একসঙ্গেই গল্প করতে করতে পার করে দিয়ে হাসপাতালের ফটকের কাছে এসে একবার থামে।—আচ্ছা আসি। সুমিত্রা চলে যায়, পুবের ওয়ার্ডের দিকে।

—আসুন। প্রভাত চলে যায় পশ্চিমের ওয়ার্ডের দিকে।

চলে যাবার সময় যদি ট্রামে বা পথে কোথাও দেখা হয়ে যায়, হাসপাতালের ফটকে কিংবা ঢাকুরিয়া বাজারের বাস স্টপের কাছে, অথবা যাদবপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, তবে বাড়ি ফেরবার বাকি পথের অনেকখানি দুজনে একসঙ্গে গল্প করতে করতেই পার হয়ে যায়।

শ্যামবাজারের পাঁচ-রাস্তার মোড়ে এসে সিঁথির বাস ধরবার জন্য উত্তর দিকে এগিয়ে যায় সুমিত্রা, আর, দমদমের বাস ধরবার জন্য পূবদিকে এগিয়ে যায় প্রভাত।

—সিঁথিতে কোথায় থাকেন আপনি? জিজ্ঞাসা করে প্রভাত।

সুমিত্রা—জয় দত্ত ফার্স্ট লেন।

প্রভাত—আপনাদের নিজেদের বাড়ি?

সুমিত্রা যেন একটা দীর্ঘশ্বাস চাপতে চেষ্টা করে বলে—হ্যাঁ...আর বলবেন না! এই বাড়িটাই তো...।

প্রভাত—কি বলছিলেন?

সুমিত্রা—কত আশা করে, কত চেষ্টা করে, এই বাড়িটাকে উনি কিনলেন। কিন্তু একটা মাসও এই নতুন কেনা বাড়িতে থাকবার সৌভাগ্য ওঁর হলো না। বাড়িটাকে কেনবার পনর দিন পরেই ওঁর এই কালব্যাধিটা ধরা পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে চলে গেলেন।

আর কোন প্রশ্ন করার সাহস পায় না প্রভাত। সুমিত্রা ঘোষের ভাগ্যের পরিহাস আরও কত নির্মমতা করে রেখেছে কে জানে। প্রশ্ন করলেই যদি শুধু এরকম এক-একটা দুঃসহ দুঃখের আর যন্ত্রণার কথা শুনতে হয়, তবে প্রশ্ন না করাই ভাল। প্রভাত বলে—আচ্ছা আমি এবার আসি।

সুমিত্রা—আপনি দমদমে বোধহয় অনেকদিন আছেন?

প্রভাত—হ্যাঁ।

সুমিত্রা—দমদমে কোথায়?

প্রভাত—বললে চিনবেন না। একটা নতুন রাস্তা, রাম রায় স্ট্রীটে আমার বাড়ি।

সুমিত্রা—আপনার নিজের বাড়ি নিশ্চয়।

প্রভাত—হ্যাঁ, তবে কি জানেন—

কথা থামিয়ে হেসে ফেলে প্রভাত, একটা করুণ আক্ষেপের হাসি।

—কি বলছিলেন? প্রশ্ন করে সুমিত্রা।

প্রভাত বলে—একটা আধখানা বাড়ি।

সুমিত্রা—তার মানে?

প্রভাত—বাড়িটা মাত্র অর্ধেক তৈরী হয়ে উঠলো, ব্যস্...শোভাকে এই ভয়ানক রোগে ধরলো। শোভাকে হাসপাতালে ঠাঁই নিতে হলো। কাজেই...আর কি দরকার বলুন...শোভা যদি ভাল না হয়ে উঠতে পারে, তবে এই আধখানা বাড়ি অমনি আধখানা হয়ে পড়ে থাকবে। বাকিটুকু আর তুলবোই না।

সুমিত্রা—ভাল হয়ে যাবেন, নিশ্চয় ভাল হয়ে যাবেন শোভাদি। আপনি এত হতাশ হয়ে পড়বেন না।

প্রভাত—সত্যি কথা কি জানেন? আমি সত্যিই হতাশ হইনি, যদিও ডাক্তারদের কথা থেকে বুঝতে পারি যে ওঁরা হতাশ হয়ে গিয়েছেন।

মনে হয় সুমিত্রার, সন্ধ্যার আলোকের মেলা, আর যান ও জনতার অফুরান আনাগোনার এই বিপুল হর্ষময় উৎসবের মধ্যে যেন একেবারে একলাটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন প্রভাত বরাট নামে এই ভদ্রলোক। ফুটপাথের এক পাশে দাঁড়িয়ে সুমিত্রার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই একেবারে আনমনা হয়ে গিয়েছেন। তবু অদ্ভুত একটা আশার জোর যেন চিকচিক করে জ্বলছে প্রভাত বরাটের দুই চোখে। একটা বিষণ্ণ স্নিগ্ধতা।

সুমিত্রা বলে—আপনি তো তবু একরকম ভাল আছেন। আশা নেই জেনেও আশা করতে পারছেন। আপনার মনের জোর আছে। কিন্তু আমি...আমি যে দিনগুলি সহ্য করতেই পারছি না।

কেঁদে ফেলে সুমিত্রা। চোখের উপর রুমাল চেপে চোখের জল চেপে রাখতে চেষ্টা করে।

বিচলিত হয় প্রভাত—এ কি করছেন, ছিঃ।

চোখ মুছে নিয়ে সুমিত্রা বলে—ডাক্তাররা বলছেন বটে যে, যদিও অবস্থা সিরিয়াস, তবু একেবারে হতাশ হবারও কারণ নেই। কিন্তু আমি যে কিছুতেই আশা করতে পারছি না প্রভাতবাবু।

সান্ত্বনা দিতে গিয়ে প্রায় একটা ধমক দিয়ে ওঠে প্রভাত বরাটের গলার স্বর।—এত দুর্বল মন হলে চলে না। খুব ভুল করছেন আপনি। আবোল-তাবোল ভেবে মিছিমিছি নিজেকে কষ্ট দিচ্ছেন। ডাক্তাররা যখন বলেছেন যে আশা আছে, তখন নিশ্চয় আশা আছে। হতাশ হবার কোন অধিকারই আপনার নেই।

পথের পাশের একটা দোকানের আলো-ঝলমল রঙিন চেহারার দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সুমিত্রা। প্রভাতের সান্ত্বনাময় ধমক খেয়ে যেন শান্ত হতে চেষ্টা করছে। সব বিষাদ জোর করে ঠেলিয়ে সরিয়ে দিয়ে যেন স্নিগ্ধ হয়ে উঠতে চাইছে সুমিত্রার চোখ। কিন্তু ইচ্ছে করলেও পারছে না বোধহয়। প্রভাত বরাট দেখতে পায়, মহিলার চোখে যেন একটা স্নিগ্ধ বিষণ্ণতা ছলছল করছে।

প্রভাতের গলার স্বর এইবার নরম হয়ে যেন সান্ত্বনার সুরে গলে যায়।—মিস্টার ঘোষ নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবেন। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।

—চলি এবার। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়েই সিঁথির বাস ধরবার জন্য এগিয়ে যায় সুমিত্রা। প্রভাতও রাস্তার ওপারের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায়, একটা খালি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। দমদম যেতে আপত্তি করবে না তো ট্যাক্সিটা?

৩

হাসপাতালের একটি কেবিন। বিছানার উপর বসে আছে প্রভাতের স্ত্রী শোভা। জীর্ণ-শীর্ণ ও ধুকপুকে একটি শরীরে আলোয়ান জড়িয়ে শুধু সাদাটে মুখখানি কোনমতে বাতাসের বুকে ভাসিয়ে রেখেছে শোভা। মাথার চুল রুক্ষ ফেঁপে রয়েছে। আর সিঁথির উপর ছড়িয়ে রয়েছে এক গাদা গুঁড়ো সিঁদুর।

শোভার বিছানার কাছে একটা টুলের উপর একটি আয়না আর সিঁদুরের কৌটা। শোভার এই রক্তহীন সাদা মুখে অদ্ভুত একটা হাসি যেন ঐ সিঁদুরের আভার মতই জ্বলজ্বল করে।

ঘরের ভিতর পায়চারি করে ঘুরেফিরে শোভার সঙ্গে গল্প করছিল প্রভাত। হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে আর হাসিমুখ তুলে আহ্বান জানায় শোভা--আসুন। ওর কাছেই শুনলাম, আপনি আজ আমাকে দেখতে আসবেন।

কেবিনের ভিতরে ঢুকে, আর একটা চেয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে সুমিত্রা বলে--আজ কেমন আছেন?

--আজ আরও ভাল আছি। হেসে ফেলে শোভা। হাসির শব্দটা অদ্ভুত। সেতারের তারের উপর হঠাৎ অসাবধান হাতের আঘাত পড়লে যেমন ঝন্‌ন্ করে একটা আর্ত হাসির ঝংকার চমকে ওঠে, শোভার হাসিটাও সেইরকম একটা চমকে ওঠা ঝংকার।

--আমার কথাটা বোধহয় বুঝতে পারেননি, তাই আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন। শোভা আবার নিজেই হেসে উঠে প্রশ্ন করে।

সুমিত্রা--বুঝবো না কেন? আপনি ভাল থাকুন। ভাল হয়ে উঠুন, এই প্রার্থনা করি।

--ছি ছি ছি। দয়া করে ওকথা বলবেন না। দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছি, এগিয়ে যেতে দিন। ভুল প্রার্থনা করে আমার সাধের মরণটাকে বাধা দেবেন না।...কিন্তু বাধা দিলেই বা কি হবে? ওষুধে না, কারও প্রার্থনাতেও না, আমার এই নিতসিঁদুর মিথ্যে হবার নয়।

কপালে হাত ছুঁইয়ে সিঁদুর-ছড়ানো সিঁথিটাকে দেখিয়ে দিয়ে হাসতে থাকে শোভা--বিয়ের এক মাস যেতেই রাঙাপিসির পরামর্শে নিতসিঁদুর ব্রত করেছিলাম। ভাগ্যিস করেছিলাম। আমি যে সধবা মরবো মিসেস ঘোষ। কেউ আমার এই ভাগ্য খারাপ করে দিতে পারবে না। কারও সাধ্যি নেই।

আয়নাটা এক হাতে তুলে নিয়ে মুখের কাছে ধরে, আর এক হাতের আঙুল চালিয়ে রুক্ষ চুলের ফাঁস ভাঙতে ভাঙতে শোভা বলে--উনি বলেন, আমি নাকি স্বার্থপরের মতো কথা বলি। কিন্তু কি করবো বলুন? এই একটি স্বার্থ আমি ছাড়তে পারি না। আমি আগে যাবই।

হঠাৎ ব্যথিতভাবে চমকে ওঠে শোভা। শোভার মুখের সব হাসি যেন অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছে।--কি হলো? আপনি কাঁদছেন কেন?

চোখের উপর রুমালটাকে জোরে একবার ঘষে নিয়ে সুমিত্রা বলে--কিন্তু আমি যে কোনদিন নিতসিঁদুর করিনি। আমার কি আপনার মতো আগে চলে যাবার সৌভাগ্য হবে?

--হতে পারে বৈকি। বিড়বিড় করে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে শোভা।

--হতে পারে কেন? নিশ্চয় হবে। আপনার মাথার সিঁদুরও নিতসিঁদুর। সুমিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে জোরগলায় চেঁচিয়ে ওঠে প্রভাত।

--ডাক্তারেরা কি বলেন? প্রভাতের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে শোভা।

প্রভাত বলে--ডাক্তারেরা বলেছেন, হতাশ হবার কোন কারণ নেই। তবু উনি মিছিমিছি...তুমি ওঁকে একটু বুঝিয়ে দাও শোভা।

শোভা--সত্যিই তো। আপনি উতলা হচ্ছেন কেন? নিশ্চয় সেরে উঠবেন মিস্টার ঘোষ। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, আপনার সিঁদুরও নিতসিঁদুর হোক।

--আজ আসি। বিদায় নেয় সুমিত্রা।

--আসবেন মাঝে মাঝে যত দিন না...। আবার চমক দিয়ে বেজে ওঠে শোভার সেই রক্তহীন সাদাটে মুখের অদ্ভুত হাসির ঝংকার।

৪

সুমিত্রা বলে--হ্যাঁ বেশ তো, চলুন না। আপনার কথা তো আমার কাছে সবই উনি শুনেছেন। আপনার সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেলে উনি খুবই খুশি হবেন।

প্রভাতের ইচ্ছে ছিল, সুমিত্রারও আগ্রহ আছে, প্রভাত আর সুমিত্রা হাসপাতালের পূবদিকের ওয়ার্ডের একটি কেবিনের ভিতরে ঢুকতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে সুমিত্রার স্বামী লোকেন।

--আপনি বসুন। আপত্তি করে বাধা দিয়ে লোকেনের কাছে এগিয়ে আসে প্রভাত। নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে চেয়ারের উপর বসে।

লোকেন--আপনার কথা সবই শুনেছি সুমিত্রার কাছে।

প্রভাত--এখন কেমন আছেন?

লোকেন হাসে--ভাল আছি বলতে পারি না। কিন্তু আশা আছে, ভাল হয়ে উঠবো।

প্রভাত--নিশ্চয় ভাল হবেন। মিসেস ঘোষের কাছ থেকে যেটুকু শুনেছি, তাতে তো মনে হয় ডাক্তাররাও হোপফুল।

লোকেন হাসে–ডাক্তাররা কেন হোপ করছেন জানি না, কিন্তু আমি ফুলের মতো হোপ করছি ঠিকই।

প্রভাত-- আপনিই যদি এরকম অন্যায় কথা বলেন তবে মিসেস ঘোষকে আর দোষ দেব কি?

লোকেন--অ্যাঁ? সুমিত্রা বুঝি আপনাদেরও কাছে কান্নাকটি করে আপনাদের বিরক্ত করেছে?

প্রভাত--না না, বিরক্ত করবেন কেন? এসব কথা কি মানুষকে বিরক্ত করবার জন্য, না কেউ বিরক্ত হয়? তবে হ্যাঁ, মিসেস ঘোষ একটু বেশি নার্ভাস।

লোকেন--সেই জন্যেই তো দুঃখ হয় মিস্টার বরাট। ও যে শেষ পর্যন্ত কি করে ফেলবে...শোকটোক সহ্য করতে পারবে কি? না, সেন্টিমেন্টের মাথায় একটা আত্মঘাতী কাণ্ড করে...।

--থাক এসব কথা। প্লীজ! চমকে উঠে আড়চোখে ঘরের এদিকে একবার এবং ওদিকে একবার তাকায় প্রভাত। তার পরেই যেন একটা উদ্বেগ থেকে মুক্ত হয়ে হাঁপ ছাড়ে। না, কাছে দাঁড়িয়ে নেই সুমিত্রা। লোকেন ঘোষের কথাগুলি সুমিত্রার কানে যায়নি। কেবিনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দূরের আকাশের দিকে, কিংবা ফটকের কাছে কৃষ্ণচূড়ার দিকে তাকিয়ে আছে সুমিত্রা। সেই নেড়া আর রিক্ত কৃষ্ণচূড়াটার মাথায় কচি সবুজের প্রলেপ পড়েছে।

প্রভাতও গলার স্বর নামিয়ে লোকেন ঘোষের কাছে ফিসফিস করে যেন আবেদন করে। --আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে।

লোকেন--বলুন।

প্রভাত--মিসেস ঘোষের কাছে আপনি এ ধরনের হতাশার কথা বলবেন না।

লোকেন--বুঝেছি, ওর কান্নাকাটি দেখে আপনিও খুব ব্যথিত হয়েছেন।

প্রভাত--ঠিকই বুঝেছেন মিস্টার ঘোষ, মিসেস ঘোষ বড় অবুঝের মতো কান্নাকাটি করেন। আপনার উচিত ওঁকে বুঝিয়ে দেওয়া, হতাশ হবার একটুও কারণ নেই।

লোকেন—আমি অনেক চেষ্টা করেছি মিস্টার বরাট। কিন্তু অসুবিধের ব্যাপার এই যে, আমার মনেই বিশ্বাসের জোর নেই।

প্রভাত—চেষ্টা করে বিশ্বাসের জোর রাখুন। আপনি কি মিছিমিছি, ভুল করে, ডাক্তারদের কথা অবিশ্বাস করে নিজের একটা দুর্ভাগ্য কল্পনা করছেন।

লোকেন বলে—ঠিকই বলেছেন। না...দেখি...সুমিত্রাকে নার্ভাস করে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না।

প্রভাত—আজ তাহলে উঠি।

লোকেন—আসুন...হ্যাঁ...মিসেস বরাট এখন অনেকটা ভাল আছেন আশা করি।

প্রভাত—তাঁর ধারণা, তিনি ভাল আছেন। যদিও ডাক্তারেরা জানেন যে তিনি অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছেন সেই অচেনা জগতের দিকে, ফ্রম হুজ ফেটাল বুন নো ট্রাভলার হ্যাজ এভার রিটার্নড্!

বলতে বলতে ছটফট করে ছোট ছেলের মতো ককিয়ে কেঁদে উঠেই ঢোক গিলে কান্নার শব্দটা চেপে দেয় প্রভাত।

লোকেনের শুকনো গলার শুকনো স্বরও হঠাৎ বেদনাহত হয়ে কেঁপে ওঠে—না না না, আপনি এরকম উতলা হবেন না মিস্টার বরাট। আমার অনুরোধ, প্লীজ...।

আস্তে একটা হাঁপ ছাড়ে প্রভাত—আপনার কাছে মনের বদ্ধ যন্ত্রণার গুমোট মন খুলে একটু হালকা করে নিলাম মিস্টার ঘোষ। আপনার কাছে ধরা পড়ে যেতে লজ্জা নেই। কিন্তু মিসেস ঘোষের সামনে তো পারি না।

প্রভাতের চেয়ারের ঠিক পিছন থেকে বলে ওঠে সুমিত্রা।—আমি একাই নার্ভাস নই প্রভাতবাবু।

যেন ভয় পেয়ে চমকে ওঠে প্রভাত। সুমিত্রার কাছে ধরা পড়ে যাবার যে ভয় থেকে এত চেষ্টা করে নিজেকে এতদিন বাঁচিয়ে এসেছে প্রভাত, সেই ভয়। বিব্রতভাবে, একটু লজ্জিত হয়েও বোধহয়, পকেট হাতড়ে সিগারেট বের করতে চেষ্টা করে প্রভাত।

সুমিত্রা বলে—আমি না হয় সেন্টিমেন্টাল মেয়েমানুষ, কিন্তু আপনি পুরুষ মানুষ হয়ে এ কি করলেন?

লোকেন বলে—ঠিকই বলেছ সুমিত্রা। আপনার এতটা বেশি সেন্টিমেন্টাল হওয়া উচিত নয় মিস্টার বরাট।

লোকেনের কাছেই অভিযোগ করে সুমিত্রা।—শোভাদি একটা নিতসিঁদুরের গল্প হেসে হেসে বলেছেন, আর উনিও সেই গল্পটা বিশ্বাস করে বসে আছেন।

লোকেন—থাক সুমিত্রা। এসব আলোচনাই কোন কাজের আলোচনা নয়।

সুমিত্রা জেদ করে।—না, প্রভাতবাবু কথা দিন, উনি আর কখনও নিজেকে এরকম অসহায় বলে ভাববেন না, নিজেকে একলা মনে করতে পারবেন না।

হেসে ওঠে প্রভাত—চেষ্টা করবো নিশ্চয়।

লোকেন বলে—কোন চিন্তা করবেন না। নিশ্চয় ভাল হয়ে উঠবেন মিসেস বরাট। আই প্রে, তিনি ভাল হয়ে উঠুন।

৫

লেকে যাবার রাস্তা, গোল পার্ক ঘিরে বড় বড় আলো জ্বলছে যেখানে, সেখানে একটা গাছের গায়ে হাত দিয়ে চুপ করে একলাটি কেন দাঁড়িয়ে আছেন প্রভাতবাবু! বাসের জানলা দিয়ে দেখতে পেয়েই বাস থেকে নেমে পড়ে সুমিত্রা।

—আপনি কি বাড়ি ফিরছেন?

—হ্যাঁ?

—তবে এখানে এভাবে চুপটি করে কেন...।

·—এখনই ফিরতে ইচ্ছে করছে না, তাই দাঁড়িয়ে আছি।

—আজ হাসপাতালে যাননি?

—গিয়েছিলাম।

—কখন?

—বিকালে।

—কেমন আছেন শোভাদি?

—জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু কোন উত্তর দিলে না আপনার শোভাদি।

থরথর করে কেঁপে ওঠে সুমিত্রার চোখ—কি বলেছেন একটু স্পষ্ট করে বলুন প্রভাতবাবু।

প্রভাত—শোভার আজ আর কথা বলবার শক্তি নেই। ডাক্তাররা বলেছেন, বড় জোর আর পাঁচ-সাত দিন।

—না না, হতে পারে না। এরকম ভয়ানক কথা বিশ্বাস করবেন না প্রভাতবাবু। বলতে বলতে সুমিত্রার হাত দুটো বার বার উতলা হয়ে ওঠে। যেন কারও চোখ মুছে দিতে গিয়ে ভুল করে নিজেরই চোখ মুছতে থাকে সুমিত্রা।

অনেকক্ষণ নীরব হয়ে থাকার পর হাসতে চেষ্টা করে প্রভাত।—মনে হচ্ছে, বোধহয় আপনারই অপেক্ষায় এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

—ভাগ্যিস দাঁড়িয়েছিলেন, তাই আজ আপনাকে...।

প্রভাত—কি?

সুমিত্রা—আপনাকে অন্তত দুটো সান্ত্বনার কথা বলবার সুযোগ পেলাম।

প্রভাত—মিথ্যে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

সুমিত্রার চোখ দুটো যেন হঠাৎ বেদনায় আহত হয়।—মিথ্যে? একথা কেন বলছেন প্রভাতবাবু?

প্রভাত—শোভা তো সত্যিই বাঁচবে না।

সুমিত্রা—আপনি বারবার ওকথা বললে আমি কি আর বলবো বলুন?

প্রভাত—না, সে তো ঠিক কথা।...কিন্তু আপনি আর রাত করবেন না।

সুমিত্রা অনুনয়ের সুরে বলে—আপনিই বা রাত করছেন কেন প্রভাতবাবু? বাড়ি ফিরে যান।

প্রভাত—বিশ্বাস করুন, বাড়ি ফিরে যাব ঠিকই। কিন্তু এখনই যেতে ইচ্ছে করছে না।

সুমিত্রা—একথা বললে আমাকেও বিপদে ফেলা হয়।

প্রভাত—কেন?

সুমিত্রা—আপনাকে আজ এভাবে একা একা ছেড়ে দিয়ে আমারও চলে যেতে ইচ্ছে করছে না।

প্রভাত বলে—চলুন তাহলে।...একটা ট্যাক্সি ডাকি, কেমন?

সুমিত্রা—ডাকুন।...ভালই হবে। কেউ একজন সঙ্গে না থাকলে আমারও ট্যাক্সিতে যেতে অস্বস্তি হয়, ভয় ভয়ও করে।

চলন্ত ট্যাক্সির ভিতরে অনেকক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে থেকে হঠাৎ ছটফট করে ওঠে, জোরে একটা দীর্ঘশ্বাসও ছাড়ে প্রভাত।—ভাগ্যের ঠাট্টাটা বুঝুন একবার!

সুমিত্রা—কি বললেন?

প্রভাত—আমার লাইফ-পলিসিটা শোভার নামে অ্যাসাইন করে দিয়েছিলাম। খুব বিশ্বাস

ছিল, আমিই বেচারাকে একা রেখে আগে চলে যাব। কিন্তু কি যে হলো, সব ওলট-পালট হয়ে গেল। শোভা আমার লাইফ-পলিসিটাকে যেন ঠাট্টা করে ছিঁড়ে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

সুমিত্রা—আমি ঠিক এর উলটো কাণ্ডটি করেছি প্রভাতবাবু। আমিই রাগ করে আর জোর করে ওর লাইফ-পলিসিটাকে সারেণ্ডার করিয়ে সেই টাকায় বাড়ি কেনবার দেনা শোধ করিয়েছি। এখন দেখুন, সেই বাড়ি পড়ে রইল কোথায়, আর উনি এখন কোথায়?

প্রভাত—আপনি আবার ভুল ভাবনা করছেন! মিস্টার ঘোষ আবার বাড়িতে ফিরে আসবেন। আপনার দুঃখ করবার কোনই কারণ নেই।

সুমিত্রা—জানি প্রভাতবাবু, আপনি আমাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দেবার মানুষ নন। কিন্তু...!

প্রভাত—কি বলুন?

সুমিত্রা—সৌভাগ্যে আর বিশ্বাস করার মতো মনের জোর পাই না।

প্রভাতই যেন মনের সব জোর দিয়ে সুমিত্রার ভয় ভেঙে দিতে চায়।—বিশ্বাস করুন, আপনাকে কখনো একা-একা অসহায় হয়ে পড়ে থাকতে হবে না।

সুমিত্রা—এই যে শ্যামবাজার এসে পড়েছে। আমি এখানে নেমে যাই।

প্রভাত—আসুন।

৬

বিকাল হয়েছে। হাসপাতালের ফটকের কাছে কৃষ্ণচূড়ার মাথা লাল হয়ে উঠেছে। ফটক পার হয়ে ভিতরে ঢুকতে গিয়েই দেখতে পায় সুমিত্রা, হাসপাতালের অফিস ঘরের দিক থেকে প্রভাতবাবু আস্তে আস্তে হেঁটে ফটকের দিকেই আসছেন।

থমকে দাঁড়ায় সুমিত্রা। প্রভাত কাছে এসে দাঁড়াতেই প্রশ্ন করে সুমিত্রা—কখন এসেছিলেন?

প্রভাত—এই মিনিট দশেক আগে।

সুমিত্রা—এরই মধ্যে চলে যাচ্ছেন?

প্রভাত—হ্যাঁ, সামান্য একটু কাজ ছিল। হাসপাতালের কিছু পাওনা হয়েছিল। টাকাটা দিয়ে এলাম।

সুমিত্রা—কিন্তু...।

প্রভাতের মুখে একটা রুক্ষ শুষ্ক ও তীক্ষ্ণ হাসির জ্বালা যেন ঝিকঝিক করে।—বুঝতে পারলেন কিছু?

চেঁচিয়ে ওঠে সুমিত্রা—শোভাদি কেমন আছেন?

প্রভাত—নেই। কালই শেষ রাতে চলে গিয়েছে। তাই আজ পর্যন্ত বাকি বেডভাড়া যা জমা হয়েছিল, সব হিসেব করে চুকিয়ে দিয়ে এলাম।

চোখের উপর রুমাল চেপে ফোঁপাতে থাকে সুমিত্রা।—আপনাকে কি বলে সান্ত্বনা দেব, বুঝতে পারছি না প্রভাতবাবু। শোভাদি এ কি ভয়ানক কাণ্ড করলেন?

প্রভাত হাসে—আপনার শোভাদি তাঁর নিতসিঁদুরের জেদ রাখলেন। আমাকে একলা রেখে পালিয়ে গিয়ে সুখী হলেন...আচ্ছা চলি।

চমকে ওঠে সুমিত্রা। বিদায় চাইছেন প্রভাতবাবু। সত্যিই তো, এই হাসপাতালের কোন ওয়ার্ডের কোন কেবিনে, এই কৃষ্ণচূড়ার ছায়ার কাছে প্রভাতবাবুর জীবনের আর কোন কাজ নেই। এতদিনে শূন্য হয়ে, মুক্ত হয়ে, একেবারে একলা হয়ে চলে যাচ্ছেন ভদ্রলোক। প্রভাতবাবু আর এখানে আসবেন না। একটা দুঃখের তীর্থে আসা-যাওয়ার পথে সুমিত্রার এতদিনের সঙ্গী মানুষটা এবার সঙ্গছাড়া হয়ে গেল।

সুমিত্রা--সত্যিই তাহলে যাচ্ছেন, বিদায় নিচ্ছেন প্রভাতবাবু?

প্রভাত--হ্যাঁ।

সুমিত্রা--এখন কোথায় যাবেন?

প্রভাত--এখন তো আর দমদমের ঐ আধখানা বাড়িতে পড়ে থাকবার কোন অর্থ হয় না।

সুমিত্রা--তার মানে?

প্রভাত--আবার আসাম সার্কেলে চলে যাব।

সুমিত্রা--কলকাতাতে কি আর আসবেন না?

প্রভাত--আসবো বৈকি। এবং আসলেই আপনার খোঁজও নেব নিশ্চয়। হ্যাঁ, আপনার সিঁথির ঠিকানা?

সুমিত্রা--এগার নম্বর জয় দত্ত ফার্স্ট লেন।

বিদায় নেবার জন্যেই বোধহয় একটা শেষ কথা বলতে চায় প্রভাত, কিন্তু কি-যেন ভেবে নিয়ে হঠাৎ বলে ওঠে।--হ্যাঁ, ডাক্তারদের কাছ থেকে একটা সুখবর শুনে এলাম।

সুমিত্রা--কিসের সুখবর?

প্রভাত--ভিয়েনার একজন বিখ্যাত স্পেশ্যালিস্ট সার্জন নাকি আর এক মাসের মধ্যেই আসবেন। মিস্টার ঘোষের কেস তাঁর কাছে রেফার করা হবে এবং তাঁরই পরামর্শ মতো অপারেশন করা হবে। ডাক্তারদের ধারণা, এই অপারেশন সফল হবে, যদিও এ ধরনের জটিল কেসের প্রায় ক্ষেত্রে অপারেশন বিফল হয়ে যায়।

সুমিত্রার মুখে একটা করুণ হাসির ছায়া কাঁপতে থাকে।--বুঝতে পারছি না প্রভাতবাবু, আপনার কথায় হতাশ হব, না আশা করবো?

প্রভাত--নিশ্চয় আশা করবেন।

নীরব হয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে সুমিত্রা। প্রভাতের কথার মধ্যে হেঁয়ালি নেই। তবু যেন মনের ভিতরে এলোমেলো হয়ে একটা হেঁয়ালির বেদনা ছুটোছুটি করছে! কাকে আশা বলে আর কাকে হতাশা বলে, বুঝতে গিয়ে সুমিত্রার মাথাটাই ক্লান্ত হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। না, এই ভদ্রলোকের কাছে আজ আর কিছু বলবার নেই।

৭

আজ সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত সেই যে বিছানার উপর পড়ে আর বালিশ আঁকড়ে অসাড় হয়ে শুয়েছিল সুমিত্রা, সন্ধ্যা হলেও সেইভাবে শুয়ে পড়ে থাকে। সিঁথির জয়দত্ত ফার্স্ট লেনের এগার নম্বরের বাড়িটার এই ঘরের অন্ধকার, সুমিত্রার অদৃষ্টের সবচেয়ে নির্মম আতঙ্কটারই মতো নিরেট হয়ে উঠতে থাকে। আলো জ্বালাতেও ভুলে গিয়েছে সুমিত্রা।

কাল বিকালে হাসপাতালের কেবিনে লোকেনের করুণ চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে, হাসিমুখের অজস্র ভাষায় সাহস দিয়ে, লোকেনের মাথার উপর অনেকক্ষণ মাথা রেখে সেই যে চলে এসেছে সুমিত্রা, তার পর থেকে সুমিত্রার স্যাঁতসেঁতে চোখ আর শুকনো হয়নি। আজই সকালে লোকেনের ফুসফুসে অপারেশন হয়েছে। কি হয়েছে কে জানে? পাশের বাড়ির টেলিফোনের নম্বরটা হাসপাতালের অফিসে লিখিয়ে রেখে এসেছিল সুমিত্রা। কথা আছে, যথাসময়ে টেলিফোনে হাসপাতাল থেকে খবর জানিয়ে দেবে। কিন্তু কই? সন্ধ্যা হয়ে গেল। এখনও খবর আসে না কেন?

কিন্তু খবরটা অনুমান করতে কি কোন অসুবিধা আছে? প্রায় ক্ষেত্রে যে অপারেশন সফল হয় না, সে অপারেশন কি সুমিত্রার উপর বিশেষ দরদ করে সফল হয়ে যাবে? এত বড় সৌভাগ্য যে কল্পনা করতেই পারে না সুমিত্রা। কল্পনা করবার, বিশ্বাস করবার শক্তিই নেই,

বরং বিশ্বাস করতে হয়, এখনও লজ্জা করে সুমিত্রাকে ভয়ানক খবরটা দিতে পারছে না হাসপাতালের অফিস।

হঠাৎ সুমিত্রার কান দুটো চমকে ওঠে। শুনতে পায় সুমিত্রা, পাশের বাড়ির কাকিমা চেঁচিয়ে...না কাঁদতে কাঁদতে নয়, হাসতে হাসতে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠছেন, এই ঘরের দিকে আসছেন।—সুমিত্রা, সুমিত্রা! কোথায় তুমি?

ধড়ফড় করে বিছানা থেকে নেমে আলো জ্বালে সুমিত্রা। ঘরে ঢুকেই কাকিমা হেসে ওঠেন—এইমাত্র হাসপাতাল থেকে খবর এল। খুব ভাল অপারেশন হয়েছে। ডাক্তাররা বলেছেন, আর চিন্তা করবার কিছু নেই। একেবারে নিরাপদ।

সুমিত্রার চোখ-মুখ ছাপিয়ে যেন হাসির এক ঝলক আলো উথলে ওঠে। অদৃষ্টের করুণ কান্নাটা যেন একটা হাঁপ ছেড়ে একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছে। পাশের বাড়ির কাকিমাকে প্রণাম করেই নিজের মনের আবেগে ঘরের ভিতরে ঘুরে বেড়াতে থাকে সুমিত্রা।

কাকিমা বলেন—আমি চলি। আমি এখনি তোমার খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

চলে যান কাকিমা। হঠাৎ নিথর হয়ে, দু'চোখ অপলক করে যেন একটা আর্তনাদহীন বেদনায় বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুমিত্রা। আর হতাশ হবার বিন্দুমাত্র কারণ নেই, কিন্তু কি অদ্ভুত এই হতাশাঘাতক আশা।

জীবনের এত বড় সৌভাগ্য আশা করতে পারেনি সুমিত্রা। এবং যেন এই সৌভাগ্যকে সহ্য করবার মতো শক্তি খুঁজছে, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না সুমিত্রা। আলো নিভিয়ে দিয়ে আবার বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ে সুমিত্রা। কান্না চাপতে গিয়ে হাঁসফাঁস করে, আর বার বার বালিশে চোখ ঘষে ছটফট করতে থাকে ।

৪

আর দেখতে হয়নি সুমিত্রার, হাসপাতালের ফটকের কাছে কৃষ্ণচূড়া আবার কবে রিক্ত হয়ে কেমনতর উদাস হয়ে গেল। এদিকের পথে আসা-যাওয়ার পালা শেষ হয়ে গিয়েছে কবেই।

সিঁথির জয়দত্ত ফার্স্ট লেনের এগার নম্বর বাড়ির উপরতলার একটি ঘরের ভিতর হেসে হেসে গল্প করে সুমিত্রা—এখন মনে পড়লেও লজ্জা লাগে।

লোকেন—কি?

সুমিত্রা—এই বাড়িটাকে অপয়া বাড়ি মনে করে কত ভয়ই না পেয়েছিলাম, কত আক্ষেপও করেছি।

লোকেন হাসে—আপাতত ভয় নেই।

সুমিত্রা ভ্রূকুটি করে হাসে—আবার অপয়া কথা? প্রভাতবাবুর ওয়ার্নিং ভুলে গিয়েছ?

লোকেন—প্রভাতবাবু কে?...ও হ্যাঁ, সেই চমৎকার কোমল স্বভাবের জেণ্টেলম্যান।

সুমিত্রা—হ্যাঁ। ভদ্রলোক প্রায় প্রত্যেক মাসেই একটি করে চিঠি লিখে আশ্চর্য করে দিচ্ছেন।

লোকেনও আশ্চর্য হয়—সে কি! চিঠিতে কি লেখেন ভদ্রলোক?

সুমিত্রা—আমাকে সান্ত্বনা জানাচ্ছেন। চিন্তা করতে নিষেধ করছেন। অনুরোধ করছেন, যেন আশা রাখি।

হো হো করে হেসে ওঠে লোকেন—চমৎকার কমেডি অব এরর্।

সুমিত্রা—কমেডি কেন বলছো? ভদ্রলোক যে সত্যিই দুশ্চিন্তা করে কষ্ট পাচ্ছেন। বোধহয় ধারণা করছেন যে, তোমার অসুখ সারেনি, ভয়ানক একটা কিছু হয়ে গিয়েছে।

লোকেন—ট্র্যাজেডি অব এরর্।

সুমিত্রা—ভদ্রলোক জীবন বীমার কাজে আসামের এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাই বোধহয় ঠিকানা দেন না। তা না হলে সুখবরটা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতাম যে, তুমি ভাল হয়ে গিয়েছ, আর আশা করবার...চিন্তা করবার কিছু নেই।

উঠে দাঁড়ায় সুমিত্রা। দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আরও ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

—আমি চললাম। স্কুলে আজ টিচার্সদের একটা মিটিং আছে।...তুমি বেশি ওঠা-নামা করবে না, এক কাপের বেশি চা খাবে না। সুপ তৈরি করে রেখেছি, মীটসেফের ভেতরে আছে।

নীচে নেমে, বাইরের ঘরের দরজা খুলে এগিয়ে যেতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায় সুমিত্রা। প্রভাতবাবু আসছেন।

—আসুন, কবে ফিরেছেন? হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করে সুমিত্রা।

—আজই। হেসে হেসে উত্তর দেয় প্রভাত।

সুমিত্রা—আপনার খবর ভাল?

প্রভাত—হ্যাঁ, আপনার খবর বলুন।

সুমিত্রা—সুখবর। উনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন ; এই মাসের শেষেই কাজে জয়েন করবেন।

প্রভাতের চোখের কৌতূহল হঠাৎ বিস্ময়ের একটা চমক লেগে কেঁপে ওঠে। যেন সুমিত্রার সিঁথির সিঁদুরের ছায়াটা হঠাৎ প্রভাতের চোখের উপর লুটিয়ে পড়েছে।

অদ্ভুত এক খুশির উচ্ছ্বাস তুলে হাসতে থাকে প্রভাত—তাই বলুন! আমি বলেছিলাম কি না, আপনার সিঁদুরও নিতসিঁদুর। এখন বিশ্বাস করছেন তো?

সুমিত্রা—করছি বৈকি।

প্রভাত—তাহলে এখন স্বীকার করুন, আমি আপনাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিইনি।

সুমিত্রা—স্বীকার করি।

প্রভাত হাসে—স্বীকার করুন, আপনি আমাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

মাথা হেঁট করে সুমিত্রা—না।

কৃতার্থভাবে যেন একটা সফল স্বপ্নের আনন্দে চোখের চাহনি নিবিড় করে নিয়ে হাসতে থাকে প্রভাত—যাক, শুনে খুবই সুখী হলাম। আপনাকে ভুল বুঝিনি তাহলে। আচ্ছা...আমি এবার চলি, মিসেস ঘোষ।

কর্ণফুলির ডাক

বোমা পড়েছে দেড় হাজার মাইল দূরে জোহারবারুর জাঙ্গাল আর সিঙ্গাপুরের জাহাজ ঘাটায়। হাজার লোকের জীবন্ত ধড় ছিটকে পড়লো হাওড়া আর শেয়ালদা স্টেশনে।

মামাবাড়ির গাঁ সম্পর্কে এক দিদিমাকে শিয়ালদার ট্রেনে তুলতে এসে ধ্রুবেশ এই দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। পালাচ্ছে সবাই--ছেলে, মেয়ে, জোয়ান, বুড়ো সবাই,--সবজাতের লোক। আধমরা, উদ্‌ভ্রান্ত, ফ্যাকাশে সব চেহারা। চোখ ঠিকরে পড়ছে, হিসেবের ঠিক নেই--কাশছে, হাঁপাচ্ছে, চীৎকার করছে।

ভয় পেলে পালায় সবাই। শিকারীর গুলির আওয়াজে হরিণের পালও ভয়ে ছুটে পালায়। নদীর বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে ছোট ছোট জনস্রোত ডিঙিয়ে, হঠাৎ ডাইনে, হঠাৎ বাঁয়ে মোড় ঘুরিয়ে ঘূর্ণি হাওয়ার মতো দাপিয়ে চলে যায় তারা। অন্তরঙ্গতার ছন্দে বাঁধা সে ভয়ও কত সুন্দর, কত বেগবান।

আর এখানে? যাত্রী নেবার জন্যে একটা স্পেশ্যাল ট্রেন প্ল্যাটফর্মে এসে ঠেকলো। বাতিক মানুষের পাল কুৎসিত গর্জনে ভূতের ঢিলের মতো এলোপাথাড়ি ছিটকে পড়লো আবার। কামরার দরজায় দরজায় শুরু হলো হুল্লোড় হাতাহাতি।

সেকেণ্ড ক্লাসের দশাও তাই। ভিড় ঠেলে দিদিমাকে নিয়ে কামরার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ধ্রুবেশ। হঠাৎ পেছন থেকে সুটকেশ কাঁধে নিয়ে এক ভদ্রলোক হুমড়ি খেয়ে পড়লো। কনুইয়ের একটি ধাক্কায় দিদিমাকে বসিয়ে দিল সেইখানেই। ধ্রুবেশ তার গলাটা টিপে ধরবার আগেই কামরার আরোহীদের ভিড়ে লোকটা ছারপোকার মতো অদৃশ্য হয়ে গেল।...

বাড়িতে। ঝি বটার মা ছিল ভাল। বেঁকে বসলো এবার। সে এখন দেশে চলে যাবে। কোঁদল করে ধ্রুবেশ ও রমাকে অস্থির করে তুললো। তার পাওনা পয়সাকড়ি আজই মিটিয়ে দেওয়া হোক। তাকে বোঝাতে গিয়ে হার মানলো ধ্রুবেশ। ভদ্রাভদ্র কত লোকের মুখে বটার মা সেই গোপন কথা শুনে ফেলেছে—জাপানীরা এসে গেছে, মেয়েমানুষের ছদ্মবেশে। কাল রাত্তিরে তাদের কজনকে চক্কোত্তিবাবুদের আমবাগানে দেখা গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর কাছেই কোথায় লুকিয়ে পড়েছে।

বটার মা রইল না।...

হরবিলাসবাবুর বাড়ি। অতি দূর সম্পর্কে ধ্রুবেশের মামা। বড়লোক এবং বাড়িওয়ালা। পথে যেতে সন্ধ্যেবেলা ধ্রুবেশ হঠাৎ এসে ঢুকলো।

হলঘরে জাজিমের ওপর হরবিলাস মামার চারটি ঘরজামাই চারকোণে তাকিয়া আঁকড়ে ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ছে। স্বয়ং মামা একটা নতুন বাড়ির নক্সা মনোযোগ দিয়ে দেখছেন।

ধ্রুবেশ একটু বিস্মিত হয়েই বললো, 'এ কী? আপনারা এখনও আছেন!'

মামা—'কেন বল তো?'

'—যুদ্ধ, চারদিকে পালাবার হিড়িক, সিঙ্গাপুরে বোমা পড়েছে!'

মামা তাকিয়ে রইলেন। ঘরজামাই চারজন চারকোণ থেকে আস্তে আস্তে মাথা তুলে তাকালো। শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না, ধ্রুবেশের কথাগুলিকে তারা যেন দেখছে। নির্বিকার নির্লিপ্ত অতি প্রশান্ত সাদা সাদা চোখ।

চাকর একটা পাথরের বাটিতে মধু-মকরধ্বজ নিয়ে এল। মামা চাটতে চাটতে বললেন, 'দিদিমণিকে বলে দাও রাত্তিরে লুচি খাব।'

ধ্রুবেশ আবার যুদ্ধের প্রসঙ্গ নিয়ে এল। '—যুদ্ধটা সকলকে ভাবিয়ে তুলেছে খুব।'

কোন লাভ হলো না। জোড়া জোড়া সাদা চোখগুলি তেমনি তাকিয়ে রইল।

মোহেঞ্জোদড়োর হাঁড়িতে কবর দেওয়া হাজার বছরের বাসি মড়ারা যেন তাকিয়ে আছে।

ধ্রুবেশ অগত্যা উঠলো। এরা কিছুরই ধার ধারে না। এই পরমাণুর জগৎ যদি ভেঙে গলে একটা নীহারিকার আবর্ত তোলে, তবু মামা নিশ্চয় তাঁর বাড়ি ভাড়া আদায় করে যাবেন আর রাত্তিরে লুচি খাবেন।

বেরিয়ে আসার সময় চোখে পড়লো অফিস ঘরে খাতাপত্র নিয়ে বসে আছে লক্ষ্মী মুহুরী।

ধ্রুবেশ গিয়ে যুদ্ধের কথা পাড়লো।--'কি ভাবছেন লক্ষ্মীবাবু, যুদ্ধ যে এসে পড়লো!'

বুড়ো শকুনের মত চিঁচিঁ করে লক্ষ্মী মুহুরী বললো, 'মরি এখানেই মরবো।'

এ হেন জীবকে আর ঘাঁটাতে ইচ্ছে হলো না ধ্রুবেশের। মুরছিত জনে ঘাতন নহে সমুচিত। এ তো ঘায়েল হয়েই গেছে, পালাবার শক্তিও এর নেই।

এই সন্ত্রস্ত উদ্‌ভ্রান্ত কলকাতার মধ্যে সনাতনবাবুর বৈঠকখানা নিয়মিতভাবে প্রতি সন্ধ্যায় গুলজার হয়ে ওঠে আর মাঝরাত্রে ভাঙে। রাজনীতি আলোচনার সঙ্গে পাশা চলে। এখানে ভাগ্যের চালই বড় কথা। কখনো রাজনীতি পাশাকে জমিয়ে দেয়, কখনো পাশা জমায় রাজনীতিকে।

ধ্রুবেশ আসে মাঝে মাঝে। যুদ্ধের কথা ওঠে, আর সনাতনবাবু সঙ্গে সঙ্গে এক কথায় সব সেরে দেন।—'আমি লিখে দিচ্ছি, কিছু হবে না। মিছেই লোকগুলো পালাচ্ছে—যত মাথা খারাপের দল।

ধ্রুবেশ--'কেন বলুন তো? জাপানীরা এতদূর এগিয়ে আসতে পারবে না?'

'—না, সে কথা বলছি না।'

'—তবে কি, সিঙ্গাপুর থেকেই ওরা মার খেয়ে ফিরে যাবে?'

'—না, তা নয়।'

'—তবে কি?'

'আমি বলছি কিছু হবে না—কিস্‌সু হবে না।'

এই বাঁকা ঠোঁটের ভণিতা নিয়েই সনাতনবাবু মশগুল হয়ে আছেন। সুখে আছেন।

অন্নদাচরণ মেমোরিয়াল স্কুলের ইতিহাসের মাস্টার। বেতন চল্লিশ টাকা। ক্ষুৎপিপাসায় চৌচির সংসারের ময়দানে ক্লান্ত সওয়ারের মতো ধ্রুবেশ চলেছিল আর পাঁচজনেরই মতো। কিন্তু এটাই তার পরিচয়ের সব নয়। সে ইতিহাসের মানুষ। যে মানুষের মনের বনের শাখায় পৃথিবীর সুখদুঃখের পাখীর দল কলরব করে ফেরে। প্রতিমুহূর্তের সংগ্রামে সুন্দর এই পৃথিবীর রূপের বালাই নিয়ে সে এক এক সময় মুগ্ধ হয়ে যায়। যে দ্বন্দ্বের মহিমায় হিমগিরি আকাশ ছুঁয়েছে, ধানের ক্ষেত হয়েছে সবুজ, চেতনার রঙে রাঙা হয়ে উঠলো মানুষ। যে পরিবর্তনের স্রোতে পদার্থ গলে গিয়ে হলো প্রবৃত্তি--সুখের হাসি বিরহের বেদনা। মানুষ যেখানে স্বয়ং বিধাতা হয়ে আপন পরিণাম গড়ে তোলে আপন হাতে।

স্কুলে আরও মাস্টার আছে। পরীক্ষার পাশ করার গ্র্যাণ্ড স্ট্র্যাটেজি শেখায় ছাত্রদের। তাদের সুনামও আছে, মাইনে পায় বেশি। ধ্রুবেশ দত্ত ছাত্রদের শোনায় শিয়ালকোটের খুলির কথা। কী কাহিনী লেখা আছে সেই হাড়ের ঠিকুজীর জীর্ণ একটা পাতায়। আমাদেরই এই দুর্দান্ত বন্য পিতামহের কাহিনী। কে ছিল সে? সে ছিল সৈনিক, গুহার মুখে দাঁড়িয়ে পাথরের লগুড় নিয়ে যে লড়েছে বাঘ ভালুকের সঙ্গে—প্রাণ দিয়েছে। সেই সুমহৎ উৎসর্গের সঞ্চার ভেসে এসেছে হাজার বছরের বাতাসে। বর্তমানে আমরা তাই মহত্তর।

ধ্রুবেশ তাই একটা টিউশনিও পায় না। সাবধানী ছেলের বাপেরা ওসব কথা পছন্দ করে না।

রমা টুটুকে ঘুম পাড়াচ্ছিল। প্রতিবেশী দীনুবাবুর বাড়ির সবাই দেখা করে গেল রমার সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত তারাই ধৈর্য ধরে টিকে ছিল, কিন্তু আর সাহস হয় না। পাড়া একেবারে খালি। তবে দীনুবাবু স্বয়ং থাকবেন একটি চাকর নিয়ে। কারণ তাঁর চাকরি আছে, আর চাকরিটা ভালই।

দীনুবাবুর স্ত্রী বললেন, 'আমরা চলুলম রমা। হারাধন জ্যোতিষী বলেছে যা হবার তা তিন মাসের মধ্যেই হয়ে যাবে। এ ক'টা মাস তাই দেওঘরে কাটিয়ে দিয়ে আসি। বীণার বিয়ের তারিখ তাই পিছিয়ে দিলাম।'

রমা—'আমাকে একা রেখে সবাই তাহলে চললেন মাসীমা?'

বীণা রমার কানে ফিস ফিস করে বললে, 'তুমি কোথাও যাচ্ছ না বৌদি?'

রমা মুখ টিপে হাসলো।—'সত্যি কথা শুনবে? তোমার দাদাকে একা রেখে আমি কোথাও যেতে পারবো না।'

কথাটা দীনুবাবুর স্ত্রীর কানে এল। উত্তর না দিয়ে পারলেন না। গলার স্বরে রাগের ঝাঁজ বেশ বোঝা যায়।—'যাবার জায়গা থাকলেই লোকে যায়। কাছে থাকতে চায় না কে? তবে আপদের সময় ঘাড়ে না চেপে পুরুষ মানুষকে একটু হাল্কা করে দিলে সাধ সোহাগ আর জন্মের মতো পুড়ে কিছু যায় না।'

দীনুবাবুর স্ত্রী চলে গেলেন।

মাসীমার কথার আঘাতটা খুব সোজা আর স্পষ্ট। রমার অন্য কোথাও যাবার জায়গা নেই, এ সত্য সে নিজে জানে, মাসীমারাও জানেন।

মা নেই, বাপের একমাত্র মেয়ে রমা। রমার বিয়ের এক সপ্তাহ পরেই বাপ সন্ন্যাস নিয়ে সরে গেছেন সংসার ছেড়ে। বাহির নেই বলেই হয়তো তার ঘরের মায়া এত বেশি। মাসীমার কথার নিষ্ঠুর সত্যটা ছুরির মতো সে সাধের প্রত্যয় কেটে ছিঁড়ে দিলে। চুপ করে বসে রইল রমা।

বোমা পড়েনি, তবু স্কুলগুলি ভেঙে গেল। ছাত্রেরা বাপ-মার হাত ধরে চলে গেল যত আপদহীন রাজ্যে। মাস্টারীগিরি ঘুচে গেল ধ্রুবেশের।

সত্যি কথা বলতে গেলে এ দুর্ঘটনায় ধ্রুবেশ দমে গেল অনেকখানি। কারণ রমা আর টুটুর কথা বড় বেশি করেই মনে পড়ে। ঘর নিয়ে পড়েছে রমা—সোনার খাঁচা গড়ার আনন্দে সে বিভোর। টুটু এই তো ছ' মাসও পার হয়নি, রমা এরই মধ্যে টুটুকে রাজা করবার প্ল্যানও তৈরি করে ফেলেছে—টুটুর খাওয়াপরা ও শিক্ষাদীক্ষা থেকে সুরু করে বিয়ে পর্যন্ত। কিন্তু এই আত্মারামের খেলার জীবনকাঠি যে মাস্টারি চাকরিটা, তাই হঠাৎ ভেঙে গেল। ধ্রুবেশের দুঃখ এইখানে।

চাকরি গেছে। শুধু এই কথাটা জানিয়ে দিয়ে ধ্রুবেশ বাইরে বেরিয়ে গেল। এই ছোট কথাটা রমার চোখের সামনে নেচে বেড়ালো নিষ্ঠুর ভ্রূকুটির মতো। টুটুর গায়ে হাত রেখে রমা কেঁপে উঠতে লাগল বার বার।

চাকরি গেছে, তবু বর্তমানে ধ্রুবেশের কাছে এটাই একমাত্র সত্য নয়। টালিগঞ্জের ছোট বাসাবাড়ির ধোঁয়াটে সন্ধ্যায় তার চোখে সেই ছবি ভেসে ওঠে—লিবিয়ার মরুবেলায় উদ্যত সঙ্গীনের ঝলক। শোনা যায় খারকভের কঠিন তুষার লক্ষ পায়ের পথচলা ধ্বনি। মন্থিত প্রশান্ত সমুদ্রে আহত ক্রুজারের গর্জন, মহাদেশের পথে পথে ট্যাঙ্কের ক্রেঙ্কার, আকাশে বোম্বারের গুরুগুঞ্জন। এ এক অভিনব অর্কেস্ট্রা—নবযুগের ভোরের কাকলি।

স্বার্থে ও সর্বার্থে সংঘাত বেধেছে। এই অভ্যুদয়ের যজ্ঞে পুড়ে যাচ্ছে জাতিবাদ, অর্থনীতির অনর্থ, প্রতাপের মূঢ়তা, পরস্ব শোষণের রসনা। সাম্রাজ্যের চর্বি গলে যাচ্ছে।

ধূলিসাৎ হয়ে পড়েছে ফ্যাসিস্তি স্পর্ধার চূড়া।

ধ্রুবেশের মন প্রাণ ঘিরে অদ্ভুত এক অনুভবের রোমাঞ্চ লাগে।

রমা চা এনে দিল ধ্রুবেশের সামনে। নিজেও মুখ ভার করে বসে রইল কাছে। হঠাৎ একটা এরোপ্লেন খুব নীচু দিয়ে গেঙিয়ে উড়ে গেল--পাখার ঝাপটা যেন গায়ে লাগল তাদের। রমা চমকে উঠলো। দুজনেরই চোখে পড়লো—টুটু হাত পা ছুঁড়ছে আর হাসছে।

ধ্রুবেশ হেসে ফেলে টুটুকে কোলে তুলে নিলে। দুদিনের কথা না বলার গুমোট এতক্ষণে যেন হাল্কা হলো খানিকটা। রমা জিজ্ঞাসা করলো, 'তুমি কি কিছু ভাবছো না?'

'—ভাবছি বৈ কি?'

রমার সন্দিগ্ধ মুখে দ্বিতীয় প্রশ্ন আর এল না। সত্যিই যদি সে জানতে পারে, ধ্রুবেশ চাকরির কথা ভাবছে, তবে তার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু এই মানুষটিকে সে কতকটা চেনে। এখুনি খবরের কাগজ নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। ক'বছর আগে ঠিক এই রকম স্পেনযুদ্ধের ভূতে পেয়েছিল ধ্রুবেশকে। রাত্তিরে ঘুমের প্রলাপ বকতো। এক এক সময় ঘুমোত না। বিছানা ছেড়ে সারা রাত ঘরের ভেতর পায়চারি করতো।

ধ্রুবেশ বেরিয়ে গেল। ফিরবে হয়তো রাত্রি একটায়।

পথে নীতিশের সঙ্গে দেখা। একগাদা পোস্টার বগলে নিয়ে চলেছে নীতিশ। ধ্রুবেশকে দেখতে পেয়ে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো—যেন পলাতক আসামীকে হাতের নাগালে পেয়েছে।

'—বাঃ ধ্রুবেশদা, আপনাকে খুঁজে খুঁজে আমরা হয়রান। বেশ ডুব দিয়ে আছেন। আপনারা এ সময় সরে থাকলে আমরা একা কি করে সামলাই বলুন তো?'

'ব্যাপার কি তোমাদের?'

'—কাল সন্ধ্যেয় পার্কের সভায় অবশ্য আপনাকে আসতে হবে। আমরাই উদ্যোগী আপনাকে কিছু বলতে হবে।'

ধ্রুবেশ যেন তাই খুঁজছিল। সুযোগ পেয়ে খুশিও হলো খুব। নীতিশকে জানিয়ে দিল-- 'আমি বলবো বটে, তবে আগেই জানিয়ে দিচ্ছি, আমি আমার মনের কথা মন খুলে বলবো। তোমাদের মতো করে হয়তো বলবো না। তাতে আপত্তি নেই তো?'

নীতিশ হেসে সায় দিয়ে বললে, 'আচ্ছা তাই বলবেন।'

রমার পৃথিবী খুবই ছোট। টালিগঞ্জের গরীবপাড়ায় দু'ঘরওয়ালা একটা বাসাবাড়ি। বছর তিন আজ তাদের বিয়ে হয়েছে। ধ্রুবেশকে সে ভালবাসে নিজের চেয়ে অনেক বেশি। শেষে এল টুটু—নতুন স্বপ্নের রঙ লাগলো রমার জগতে। কত তৃপ্তি কত নিদ্‌হারা উদ্বেগ। দিনরাত শুধু খাটতে ইচ্ছে করে। সংসারের জন্যে বিলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে নিজেকে।

অকস্মাৎ এল আঘাত। এত বড় পৃথিবী--সেখানে--বড় বড় সাধু, বড় বড় লোভ আর পাপ। সেখানে লাগুক না যুদ্ধের আগুন। ছোট ছোট সুখদুঃখের ধুকপুক করছে পাখীর নীড়ের মতো রমার এই জগৎ। তাকে না ভেঙে ছিঁড়ে ফতেজঙ্গদের হানাহানি কি চলতো না? যুদ্ধের নাম শুনলে রমার সকল মন বিরূপ হয়ে ওঠে। রমার কাছে ঘর-ভাঙানিয়া এ যুদ্ধ ঘোর শত্রু।

আর ধ্রুবেশের মনে লাগে অদ্ভুত এক সুরেলা উল্লাস। ধ্রুবেশের কাছে যুদ্ধ যেন যুগ-গড়ানিয়া তীর্থংকর। সকাল সন্ধ্যা ঘুরে বেড়ায় পথে পথে—ট্রামে বাসে জনসভায়। দেশনেতাদের বিবৃতি পড়ে। ছাত্র ও শ্রমিকদের ইস্তাহার পড়ে। শোভাযাত্রা দেখে। পোস্টারের ছবি আর লেখাগুলির কাছে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। কে কী বললে? কারা বুঝেছে এ মহাযুদ্ধ মহাপরিণামের পূর্বগামিনী ছায়া। কারা কাজের কথা বলছে। কারা জেগে আছে।

সমস্ত দিন চাকরির চেষ্টায় ঘোরা আর সন্ধ্যেয় কার্জন পার্ক--শুয়ে পড়লেই নেশাতুর হয়ে

আসে সকল ইন্দ্রিয়গ্রাম। পার্কের ঘাসে এক রকম ক্লান্তিহারা তন্দ্রার আমেজ আছে যেন।

মনে পড়ে যায়, দূর চট্টগ্রামের এক নগণ্য পাড়াগাঁ—বিরাজপুর। কতদিন সে দেশছাড়া, ঘরের ভিটেয় হয়তো কাঁটাবন আর সজারু বাসা বেঁধেছে। ছেলেবেলায় সেই সাধের বিরাজপুর জলের দাগের মতো মিলিয়ে গেছে আজকের কর্ম-কোলাহলে মুখর দিনের চিন্তা থেকে।

বিরাজপুর--যেখানে শহরের মতো ঘড়ির কাঁটার জীবন চলে না। যেখানে প্রহরে প্রহরে কর্মের ঘণ্টা বাজে না। খালের জলে ছোট ঢেউগুলি আস্তে ওঠে, আস্তে ভাঙে। কামার ও স্যাকরার হাতুড়ি ধীরে ধীরে ওঠে পড়ে, চাষীরা জিরিয়ে জিরিয়ে লাঙ্গল ঠেলে—তামুক খায়। নির্বেগ মান্দাক্রান্তা জীবন।

মনে পড়ে স্কুলের পাশ ঘেঁষে জেলাবোর্ডের কাঁচা সড়ক। জোয়ারের জলে খাল টলমল করে। কাঠের পুল থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়া--নতুন মাছের আনন্দের মতো ক্রীড়া-চঞ্চল কৈশোরের দিনগুলি।

গাঁয়ের কাউকে সে চেনে না। কিন্তু এখনো চিঠি আসে মাঝে মাঝে।

'...শুনেছি বড় হয়েছ, চাকরি করছ, বিয়ে করেছ। দেশের ছেলে দেশে একবার এলে কি কিছু মানহানি হবে? এস নিশ্চয়, আসছে বৈশাখে আমের সময়। বউমাকে নিয়ে এস। সকলেই তাকে একবার দেখতে চায়। ইতি—উত্তরের বাড়ির জ্যেঠামশায়। ধ্রুবেশ চেষ্টা করেও চিনতে পারে না—কে ইনি। এত আপনার জনের মতো ডাকে।

গাঁয়ের স্কুলের ছেলেরা চিঠি দেয়--'আপনার একটা বাণী পাঠাবেন নিশ্চয়। একটা হাতের লেখা পত্রিকা বার করেছি আমরা। অনেক আশায় অপেক্ষা করে রইলাম। ইতি--কিশলয় সংঘ।'

ধ্রুবেশ অবাক হয়ে ভাবে—কোথা থেকে তারা ঠিকানা যোগাড় করে, এত খোঁজ রাখে। ঘরের ছেলে পৃথিবীর মেলায় হারিয়ে যাবে, এটা যেন তারা সহ্য করতে পারে না। প্রস্তর যুগের পূর্বপুরুষের অনাবিল গোষ্ঠী-স্নেহের রেশ যেন আজও এই গেঁয়ো প্রীতির গায়ে লেগে আছে, ঝরা ফুলের গন্ধের মতো।

এত ভুলে থাকা উচিত হয়নি--ধ্রুবেশ মনে মনে লজ্জিত হয়ে ওঠে।

পার্কের সভায় ভীড় হয়েছে খুব। মণ্ডপ উছলে জনতা রেলিং পর্যন্ত গড়িয়ে পড়েছে। শত শত লাল নিশানে লেগেছে, ঝড়ো হাওয়ার পুলক।

ধ্রুবেশ দাঁড়ালো।

'বন্ধুগণ। আজ এক ঝড়ের রাত্রে আমরা সবাই এখানে মিলেছি। শতাব্দীর এই পরম লগ্নে দুরূহতম কর্তব্যের ডাক এসেছে আমাদের কাছে। আজকের এই সভা—এক যোদ্ধার ছাউনিতে আমরা সবাই দাঁড়িয়েছি। আমরা সবাই—

'নিধিরাম!'

সভার পেছন দিকে এক কোণ থেকে বিদ্রূপের বিষে ভরা ভারিগলায় কে একজন বলে উঠলো। হাসির শোর পড়ে গেল চারদিকে। দুজন ভলাণ্টিয়ার হাত জোড় করে বললো, 'মশাই, ওরকম করবেন না দয়া করে!'

ধ্রুবেশের শান্ত কণ্ঠস্বর প্রতিজ্ঞায় কঠিন হয়ে বেজে উঠলো—'বন্ধুগণ, আমরা সবাই সৈনিক। আমরা ভারতবাসী। ইতিহাসের পাতা খুলে দেখুন, যুগে যুগে আমাদের ওপর কত আঘাত এসেছে। শত্রুর সঙ্গে, ধ্বংসের সঙ্গে কখনো আমরা আপস করিনি। নিরন্তর সংগ্রামে উদ্দাম সে ভারতের ইতিহাসকে আমরা স্মরণ করি। আমরা ভুলিনি হূনহিংসার মিহিরকুল এখানে এসে কূল পায়নি। কুশান ধনুর্ধরের তূণীর পুড়ে গেছে ভারতের বিপ্লবী গণশৌর্যের আগুনে।'

'জয়। হিন্দু ধরম কি জয়!' সভার মাঝখানে একদল লোকের উল্লাস শোনা গেল। বিরক্তিভরা ধ্রুবেশের কণ্ঠস্বর এক পর্দা চড়ে উঠলো। '--না কখনো না। আমি সে কথা বলছি না। বলুন গণসংগ্রামের জয়।'

আরম্ভ হলো গোলমাল। বিক্ষুব্ধ একদল লোক মারমূর্তি হয়ে চীৎকার করে প্রতিবাদ আরম্ভ করলো। তারপর ধিক্কার দিয়ে চলে গেল সভা ছেড়ে।

'বন্ধুগণ। ভেবে দেখুন কোথায় আমরা দাঁড়িয়েছি। পঙ্কিল বন্যার মতো শত্রুর অভিযান দেশের মাটি ভাসিয়ে দিতে আসছে! শত পুরুষের নিঃশ্বাসে সুরভিত এ মাটির প্রতিটি কণিকা। কোথায় সরে যাব আমরা?'

আবার যেন কারা কর্কশ চীৎকারে একটা হুল্লোড় মাতিয়ে তুললো।—'জয়তু অভ্যুদিত এশিয়া!'

ধৈর্য হারিয়ে ধ্রুবেশ চীৎকার করে উঠলো।—"জয়তু অভ্যুদিত মহামানব। জয়তু অভ্যুত্থিত বিশ্বগণদেবতা। এশিয়ার নাম নিয়ে যারা গর্জন করছে, তাদের জন্য আমার দুঃখ হয়। এই একচক্ষু হরিণের বিজ্ঞতা নিয়ে তারা নিজেরই সর্বনাশ ডেকে আনবে।'

এপাশ ওপাশ থেকে উত্তেজিত প্রতিবাদের রব উঠতে লাগলো। ঝপ্ করে একটা থান ইট এসে সজোরে লাগল ধ্রুবেশের ডান হাতে!

বক্তৃতা মঞ্চের টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়ালো ধ্রুবেশ।—'কোন হুংকার টিটকিরি আর থান ইট আমায় দমাতে পারবে না। এইখানে দাঁড়িয়ে লক্ষ লোকের সামনে আমি বলবো--আমার দেশের ওপর হাতিয়ার হাতে যারা চড়াও করতে আসছে, তারা শত্রু, নির্জলা নিছক ষোল আনা শত্রু। তারা বিংশ শতাব্দীর নতুন গরল। তাদের ভাণ্ডার ভরে আছে স্তূপীকৃত চিতাকাষ্ঠে। তারা আসছে ব্যাবিলনের প্লেগের মতো নতুন করে রাজ্য জনপদ ছারখার করতে, মুখে তাদের ভুয়ো মুক্তির স্তোকবাণী—রাংতা মোড়া ইস্পাতের হাতকড়া নিয়ে আসছে তারা।'

ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে একটা ধস্তাধস্তির পর প্রতিবাদীর দল সভা ছেড়ে চলে গেল। আবার শান্ত হলো সভা।

আবেগে উত্তেজনায় ধ্রুবেশের গলা ভেঙে আসছে।—'বন্ধুগণ, এ গরীবের ডাক শুনুন। আত্মশক্তি মাথার মাণিক হারিয়েছিলাম আমরা। আজ এসেছে ডাক, ভয় ভাঙার সাধনার, শঙ্কাহরণ ব্রতের। আপনাদের চোখে সেই মশালের দ্যুতি দেখছি আমি। এই মুক্তি কাল রজনীর তিমিরপথের যাত্রীদের ঐ একমাত্র সম্বল।'

করকাপাতের মতো করতালির শব্দ। এক অপূর্ব চাঞ্চল্যের লহর সভার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভেসে গেল।

—'শ্মশান ঘাটের সিঁড়ির মতো আগন্তুকের পদাঘাতের ক্ষতি নিয়ে আমরা কি যুগ যুগ ধরে স্তব্ধ হয়ে থাকবো? কখনই নয়। আপনাদের সঙ্গে এইখানে দাঁড়িয়ে আমি সেই অনাগত ভবিষ্যতের ছবি দেখছি। ধীরে শান্ত হয়ে আসবে এই মুখর মৃত্যুর আসর। আমাদের আত্মোৎসর্গে উজ্জ্বল সেই নতুন প্রভাতে মুক্ত মানবতার মিছিল পথ ধরে আসবে।'

সভা ছেড়ে কিছু দূর চলে আসার পর ধ্রুবেশ একবার ফিরে তাকালো। জনসমুদ্রের গহন থেকে একটা জলস্তম্ভ উঠে যেন মহারোলে ভেঙে ভেঙে পড়েছে।--'ইনকিলাব জিন্দাবাদ।' হাজার হাতের বজ্রমুষ্টি দুলছে ভৈরব গর্বে।

দেশের শ্রদ্ধাস্পদ ছিল যারা, যাদের কাছে দুটো ভরসার কথা শোনবার জন্যে—কাজের ইশারা, পথের দিশা পাবার জন্যে লোকে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো, তারা দিনের পর দিন বিবৃতি দিচ্ছে।—'এ যুদ্ধে আমাদের কিছু করবার নেই। এ বৃটিশে জাপানে যুদ্ধ। ভারত নিরপেক্ষ।'

ধর্মতলার এক চায়ের কেবিনে বসে পরিচিত অপরিচিত কত লোকের মুখে ধ্রুবেশ মন্তব্য

শোনে।—কিছু করবার নেই। বাদপ্রতিবাদে কুতর্কের ঝড় ওঠে। ধ্রুবেশের এক একবার মনে হয়—কিছু একটা বলি। সোজা একটা প্রশ্ন করি, 'ভারতবর্ষ কার দেশ?'

সেদিন প্রশ্নটা তুলেই বসলো। তার আগে সংকোচে, আশংকায় বার বার বুক ছম্‌ ছম্‌ করে উঠেছে—কী জানি, সত্যিই যদি সেই নিদারুণ বিপরীত কথাটা এরা বলে ফেলে!

হলোও তাই। একবাক্যে তারা জানিয়ে দিল।—'কি করে আর আমাদের দেশ বলি মশাই। দেশের জন্যে ভালমন্দ দুটো কাজ করার কতটুকু অধিকার ওরা দিয়েছে? আমাদের কিছু করবার নেই।'

কেবিন ছেড়ে পথে নেমে ধ্রুবেশের মনে হলো সমস্ত শহরটা যেন ভেঙেচুরে কুৎসিত হয়ে গেছে। ঘরবাড়িগুলো পুরোনো উইঢিবির মতো। ছন্নছাড়া পোকামাকড়ের মতো মানুষগুলি ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে।

অনেকক্ষণ পথে পথে নিরুদ্দেশের মতো ঘুরে রোদে মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগলো। টালিগঞ্জ পৌঁছতে তখনো মাইল দুয়েক বাকি। এতটা বিমর্ষ জীবনে সে কদাচিৎ হয়েছে।

শ্মশানের শান্তি খুঁজছে সবাই, ইতিহাসের বাণী এখনও এদের কাছে হৃদয়ের সত্য হয়ে ওঠেনি। এরা খুঁজছে এড়িয়ে যাওয়ার পথ। সর্বনাশা ক্লৈবল্যবাদকে এরা কত রকমারি বচনে ফাঁপিয়ে রেখেছে। ধ্রুবেশের মনে হলো, মথুরার সেই কণিষ্কের মুণ্ডহীন প্রকাণ্ড মূর্তিটা, গোদা গোদা পা দিয়ে সারা দেশের বুক মাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রমা ধৈর্য হারিয়ে বসেছিল। এখন বেলা দেড়টা, তবু ধ্রুবেশের দেখা নেই। প্রশ্ন না করলে আজকাল কোন কথা বলে না। চাকরির খোঁজ যে কতখানি হচ্ছে, তা রমা এখানে বসেই আন্দাজ করে নিতে পারে।

ঘরে ঢুকলো ধ্রুবেশ। রমা বললো, 'কটা যুদ্ধ জয় করে এলে?'

রমার কথার উত্তর না দিয়ে ধ্রুবেশ জামা ছেড়ে গামছা নিয়ে স্নানের জন্যে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। টবে এক ফোঁটা জল নেই। কাছেই রাস্তার ধারে একটা টিউবওয়েল আছে। ধ্রুবেশ স্নানের জন্যে বাইরে চলে গেল।

টবে জল নেই। এটা রমারই ভুল। তবু এই ভুলটার নিষ্ঠুরতা আজ রমার চোখে এমন কিছু ঠেকলো না। একজন ঘুরে বেড়াবে ব্যোম ভোলানাথ হয়ে, ঘরের কথা ছেড়ে ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপার নিয়ে। সে একা আর করবে কত? শূন্য থালায় সে অন্ন সাজাতে পারে, অন্ন ফলাতে পারে না।

রমা সবকিছু সহ্য করতে পারে, শুধু ধ্রুবেশের এই পরম নির্লিপ্ততাটুকু ছাড়া। স্বচক্ষে দেখছে—দিন দিন দৈন্য ঘনিয়ে উঠছে। শ্রীহারা হতে চলেছে সংসার। যুদ্ধ নিয়ে তার যত চিন্তা উদ্বেগ, তার এক কণাও যদি ঘরের জন্যে থাকতো তবে এ রকমটা হত না। আজ দু'মাসের ভেতর দু'জনের মধ্যে একটা ভালবাসার কথা দূরে থাক, ভাল কথাও হয়নি।

ধ্রুবেশ স্নান সেরে এসে রান্নাঘরে ঢুকলো। খাবার ঢাকা দেওয়া আছে। এটা না থাকলেও অবশ্য সে আজ আশ্চর্য হতো না। রমা বসে বসে সব ব্যাপার লক্ষ করলো। তারপর দেখলো ধ্রুবেশ গা এলিয়ে শুয়ে পড়লো মাদুরের ওপর, খবরের কাগজে চোখ ঢাকা দিয়ে।

রমা আস্তে আস্তে সামনে এসে দাঁড়ালো। ঝগড়া করতে নয়, তবে অনেক কিছু সে আজ মন খুলে বলে যাবে।

রমা ডাকলো, 'শুনছো?'

'—হ্যাঁ।'

'—টুটুর দিকে আজকাল তুমি তাকিয়েও দেখ না। এ কি করছ তুমি? তুমি নয় বাইরে যুদ্ধ করছো, এদিকে একা এ ঘরের যুদ্ধে আমি যে আর টিকতে পারি না। টুটুর কি হবে,

সেকথা একবার তোমার ভাবনায়ও আসে না কি?'

ধ্রুবেশ বললো, 'কাজ করতে পারবে?'

'—কি?'

'—বেনারসে এক জমিদারের বাড়ি রাঁধুনীর কাজ আছে। খাওয়া-পরা আর মাইনেও পাবে। তা হলে আমাকে বাদ দিয়ে তুমি তো টুটুর ভার নিজেই নিতে পার। আমি না হলে তোমার চলবে, কিন্তু টুটু না হলে চলবে না।'

কথাগুলো এক ঝাপটা উত্তপ্ত কাঁকরের মতো রমার মুখে এসে যেন লাগলো।

'—তুমি পুরুষ হয়ে একথা মুখে আনলে?' ধ্রুবেশের দিকে সোজা তাকিয়ে রইলো রমা। আগুন-লাগা ঘরের জ্বালায় চোখ দুটো পুড়ে যাচ্ছে।

মুখ ফিরিয়ে নিল ধ্রুবেশ।

উদ্বৃত্ত যা কিছু ছিল টেনে টেনে একটা মাস চলেছে। গয়লা ফিরে গেল দোর থেকেই দুধের কলসী দেখিয়ে। মাসকাবারী ব্যবস্থা করতে সে রাজী নয়। রোজ নগদ-নগদ কিনতে হবে। এ-বাড়িতে কপাল-ভাঙাদের ক্ষুধা এবার খুব ভালভাবেই পাকিয়ে উঠেছে। গয়লার সজাগ কারবারি চোখে সে রহস্য ধরা পড়তে দেরি হয়নি।

দু'গাছা সোনার চুড়ি বেচে দিল রমা।

সন্ধ্যেবেলা ধ্রুবেশ বাইরে বের হবার উদ্যোগ করছে। চায়ের জন্যে আজকাল আর অপেক্ষা করতে হয় না। সব খবরই সে রাখে।

যাবার সময় পেছন থেকে রমা ডাকলো, 'শুনছো? টুটুর জন্যে এক গজ ফ্লানেল নিয়ে আসবে আজ।'

এও একটা অঙ্কুশের আঘাত—ঘরের দায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া। এক গজ ফ্লানেল কিনে আনবার শক্তি যে আজ হারিয়েছে তার চিন্তায় বড় বড় কাজের কথা শোভা পায় না। এই সার সত্যটি রমা ধ্রুবেশকে বুঝিয়ে দিতে চায়। রমা আজকাল জেনেশুনে এই শেষ উপায় ধরেছে। যদি কিছু হুঁস হয়।

অন্যদিনের মতো সকালবেলা চাকরির খোঁজেই বার হয়েছিল ধ্রুবেশ। সনাতনবাবুর বৈঠকখানা থেকে শুরু করে অনেক জায়গা। আজ সে ফিরেছে এক বেদনাকর হতাশ্বাসের বোঝা নিয়ে। অপমানের তালিকা পূর্ণ হয়েছে এবার।

ধর্মতলার চায়ের দোকানে ফিস্‌ফিস্ করে উঠলো দু'চারজন, 'স্পাই, স্পাই।'

নীতিশ বললো, 'ধ্রুবেশদা, আপনি নাকি আমাদের বিদ্রূপ করেছেন। আমরা নাকি শুধু কাঠপুতুলের খেলা দেখাচ্ছি?'

অনেকে অনেক কিছু বলতে আরম্ভ করেছে তার সম্বন্ধে—কেউ প্রকাশ্যে কেউ আড়ালে। কারু কাছে সে ইংরেজের পা-চাটা, কেউ এক আঁচড়ে বুঝে ফেলেছে—প্রচ্ছন্ন পাতিবুর্জোয়া। অনেক ক্রিটিকের চোখ আবার এক্সরের মতো—তারা দেখেছে ধ্রুবেশের ফুসফুস-ভরা নিপ্পনপ্রীতির রস।

কিছু আসে যায় না এতে। কিন্তু চারদিকের এই সব উপসর্গ দেখে সত্যই সব উৎসাহ শিথিল হয়ে যায়। জ্ঞানী-গুণী থেকে আরম্ভ করে ঝি বটার মা পর্যন্ত—সকলের চিন্তা এক সুরে বাঁধা। যুদ্ধের পরে কে কি করবে, কি পেতে হবে—এটাই একমাত্র সমস্যা। সকলে ঝুড়ি ঝুড়ি কর্তব্য আর দাবীর পসরা মাথায় নিয়ে বসে আছে—যুদ্ধের পরে। মাসীমা যুদ্ধের পরেই বীণার বিয়ে দেবেন। পেট্রিয়টেরা যুদ্ধের পরে এক হাত লড়বেন—যারা জিতবেন তাদের সঙ্গে। মহাবণিক সঙ্ঘ আজ থেকেই ছট্‌ফট্ করছে যুদ্ধের পরে কে কত বড় কারবার ফলাবে।

ধ্রুবেশ বাইরে যাবার পরে রান্নাঘরে বসে রমা কেঁদেছে। ধোঁয়ার জন্যে নয়, অভাবের জন্যে নয়, ধ্রুবেশের গৃহবৈরাগী আচরণের জন্যে নয়।

রমার নিজের চোখেই আজ পড়েছে তার স্বার্থন্তর মনের পরিচয়। শুধু টুটু আর টুটু—টুটুর প্রয়োজনের কাছে পৃথিবীর কোন প্রয়োজনের যেন তুলনা হয় না। টুটুর মানুষ হবার পথে দিনরাত শুধু পাথর ভাঙতে থাকবে—এই জন্যেই কি ধ্রুবেশকে তার প্রয়োজন? এ ছাড়া কি ধ্রুবেশ আর কিছু নয়?

ধ্রুবেশ ঘরে ফিরতে রমা ভাল করে তাকিয়ে দেখলে—অনেক রোগা হয়ে গেছে।

আরও কিছুক্ষণ হয়তো তাকিয়ে থাকতো। কিন্তু তা না করে ঘরের ভেতর চলে গেল আর ফিরে এল কিছুক্ষণ পরে।

এক গেলাস সরবত নিয়ে এসে বললো, 'জিরিয়ে এটা খেয়ে নাও।'

আজ যা পারলো একটু ভালো করেই রাঁধলে রমা। তার আচরণের নির্লজ্জ ক্রূরতাগুলি একে একে তাকেই পাল্টে আঘাত করে যাচ্ছে। বার বার চোখে আঁচল দিল রমা।

স্নানের জল এগিয়ে দিয়ে বললো, 'পা দুটোর চেহারা হয়েছে কি? ভাল করে সাবান দাও।' শেষে ধ্রুবেশের আপত্তি অগ্রাহ্য করে নিজেই সাবান দিয়ে ঘষে মেজে দিল।

দুপুরে ধ্রুবেশ ঘুমিয়েছিল, রমা পাশে বসলো পাখা নিয়ে। মুখে হাত বুলিয়ে দেখলো—গাল ভেঙে গেছে, চোয়ালটা হাত ঠেকে।

টানা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রমা একমনে বাতাস করে যায়।

কেন জানি মনটা আজ বেশ শান্ত ছিল—বর্ষাধোয়া গাছপালার মতো।

সেই কলকাতার সন্ধ্যা। কার্জন পার্কের ঘাস নরম বিছানার মতো আরামে ক্লান্ত শরীরটা ঘিরে ধরেছে। আলো-আঁধারী কলকাতার প্রাণ ঠুং-ঠাং করে বাজছে আরতির ঘণ্টাধ্বনির মতো।

চীৎকার করে একটা ছেলে পার্কের রেলিং ডিঙিয়ে ঢুকে পড়লো ভেতরে। একটা কাগজের হকার! মনের অন্ধকারের কবর থেকে এক এক করে নিস্পন্দ শায়িত মূর্তিগুলি নড়েচড়ে উঠে বসলো। হকার ছেলেটা চীৎকার করে হাঁকছে বিকালের টাট্‌কা খবর—চট্টগ্রামে বোমা পড়েছে—বোমা পড়েছে চট্টগ্রামে।

হুড়োহুড়ি আরম্ভ হলো কাগজ কেনা নিয়ে। ধ্রুবেশও হাতে পেল একটা। এরকম দৌড় দিয়েই সে এসে দাঁড়ালো একটা ল্যাম্প পোস্টের কাছে।

দম বন্ধ করেই ধ্রুবেশ পড়লো। সামান্য বাহুল্যহীন কয়েক লাইনের একটা খবর।—তারা এসেছে। বোমা পড়েছে চট্টগ্রামে। লোক মরেছে, লোক ঘায়েল হয়েছে।

তারা এসেছে। কর্ণফুলির জলে পড়েছে তাদের কুৎসিত কালো ছায়া। পূব আকাশের তারার গায়ে কালি মাখিয়ে দেখা দিয়েছে খলস্ফুলিঙ্গের দল।

ধ্রুবেশ কাঁপছিল থরথর করে। দাঁতে দাঁত পিষে যাচ্ছিল।...কে এরা? দেশের মাটিতে আগুন ছড়ায়!

বিশ্ব ইতিহাসের সব লেখা ছাপিয়ে সোনালী আখরে ঝিলিক দিয়ে উঠলো একটি মাত্র নাম—বিরাজপুর। কর্ণফুলির জ্বালাভরা জলের ঢেউ অসহায়ের মতো ডাকছে কলস্বরে। তাও শুনতে পাওয়া যায়।

মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে হঠাৎ ধড়ফড় করে উঠে বসলো রমা। ধ্রুবেশ আসেনি। পিলসুজের আলোর শিখাটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে নীল হয়ে আছে। কতগুলি বাদলা পোকা আলোতে পুড়ে পুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে।

টুটু ঘুমোচ্ছে অঘোরে। জানলাটা খুলে রমা বাইরের দিকে তাকালো। ব্ল্যাক আউটের রাত্রি—এক অগাধ শব্দহীন কাজলসমুদ্রের তলায় সারা কলকাতা যেন ডুবে রয়েছে।

ক্ষোভ নয়, দুঃখ নয়, অভিমান নয়। শান্ত চোখ দুটোতে তবু দু'ফোঁটা জল দেখা দিয়েই হাওয়ায় শুকিয়ে গেল। সকলেই ঘরে রয়েছে আজ, শুধু সে ছাড়া। থাক্, কেঁদে তার পিছু ডেকে আর লাভ নেই। সে থাকবে না, সে থাকতো না। সে যে ইতিহাসের মানুষ--এতদিনে হয়তো সে হাতের কাছে পেয়েছে তার জীবনের পারানি নৌকার হাল।

শান্ত হয়ে চোখ বুজে বসেছিল রমা। তাকাতেই দেখলো ভোর হয়ে এসেছে। একজোড়া স্পিটফায়ার গোঁ গোঁ করে উড়ে চলে গেল মাথার ওপর দিয়ে। টুটু হাসলো আবার! তাকে কোলে তুলে নিল রমা। তার বুকের গোকুলে বড় হয়ে উঠবে যে মানুষের ভবিষ্যৎ।

আস্তে আস্তে চোখ মুদে আসছিল রমার, ধীরে মাথাটা ঝুঁকে পড়লো সামনের দিকে-- প্রণাম।

এ প্রণাম তাদেরই উদ্দেশ্যে, মাটির মান বাঁচাতে জীবনপণে দাঁড়ালো আজ যারা। কালনাগের মতো দুশমনের পথ রুখে দাঁড়ালো যে নওজোয়ানের দল। বিরাজপুরের ধূলিকুট্টিমে যে হার-না-মানা অবুঝেরা নিজের হাতে সাজিয়ে রাখলো ভয়াল মরণবাসর। শত্রুর চণ্ড অভিযান থমকে যাবে নিশ্চয়, ঐ কাঠের পুলের কাছে--অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে। আর শতাব্দীর সিঁথির মতো বিরাজপুরের ঐ সড়কে হয়তো মুখ থুবড়ে পড়বে বুলেটের আঘাতে শতদীর্ণ এক ইতিহাসের মাস্টারের শোণিতাক্ত চুম্বন।

অচিন রাখী

দেখতে পায় অজিত, সেই তরুণী শেষ পর্যন্ত জিনিসটা না কিনেই চলে যাচ্ছে। এমন কিছু দামী জিনিস নয়। আধ পাউণ্ড রঙীন উল। দোকানদারের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে দরাদরি করেছে তরুণী। দাম কমাবার জন্য বার বার বলেছে। কিন্তু দোকানদার এক পসয়াও দাম কমাতে রাজি হয় না।

দোকানের কাউন্টার থেকে একটু দূরে সরে যায় তরুণী। হাতের ছোট ব্যাগের ভিতর থেকে টাকা আর পয়সা বের করে যেন চুপি চুপি গুনতে থাকে। গোনা শেষ হলেই তরুণীর মুখটা বিষণ্ণ হয়ে যায়। দূর থেকেই কাউন্টারের উপর পড়ে থাকা সেই আধ পাউণ্ড রঙীন উলের প্যাকেটটার দিকে তাকায়। আস্তে একটা হাঁপ ছাড়ে তরুণী। মনে হয় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে একটা হতাশার বেদনা হালকা করে নিল। তারপরেই দোকান ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

তরুণীর গায়ে সাধারণ সাদা প্লেন শাড়ির সাধারণ সাজ। পায়ে এক জোড়া সস্তা চটি। কানে দুল আছে, দু'হাতে দু'গাছি মোটা চুড়ি আছে। কিন্তু গলাটা খালি, গলাতে কোন সোনার হার দোলে না।

এগিয়ে যায় অজিত।—আপনি কিছু মনে করবেন না, একটি কথা জানতে চাই।

তরুণী—বলুন।

অজিত—আপনি জিনিসটা না কিনেই চলে যাচ্ছেন কেন?

তরুণী—পয়সা কম পড়েছে।

অজিত—কত কম?

তরুণী—এক টাকা দু'আনা।

অজিত—আমি দিচ্ছি এক টাকা দু'আনা। আপনি জিনিসটা কিনে নিয়ে যান।

তরুণী—আপনি কেন এই উপকার করতে চাইছেন?

অজিত—উপকার করতে যে চায় সে কি কোন কারণ খোঁজে? আপনার পয়সার অভাব হয়েছে, আমার পয়সার অভাব নেই। আমি আপনাকে এক টাকা দু'আনা দিলে আমার কোনই ক্ষতি হবে না। অথচ আপনার উপকার হবে।

তরুণীর চোখ দুটো এমনিতেই খুব উজ্জ্বল। অজিতের কথা শুনে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এতক্ষণের গম্ভীর ও বিষণ্ণ মুখের উপর একটা হাসির আভাও ফুটে ওঠে যেন। তরুণী বলে—কিন্তু আপনার এক টাকা দু'আনা ফেরত দেবো কেমন করে?

অজিত—ফেরত দেবার দরকার কি? অসুবিধা থাকলে ফেরত দেবেন না।

তরুণী—না। ফেরত নেবেন বলুন, তবে আমি আপনার টাকা নিতে পারি। নইলে না।

অজিত—দেখুন, আপনাকে তো বলেইছি, আমি ফেরত পাওয়ার আশা করে আপনাকে টাকা দিচ্ছি না। অতি সামান্য, এক টাকা দু আনা মাত্র। আমি তো সিনেমা দেখে এরকম কত এক টাকা দু'আনা খরচ করে দিই। অথচ এই এক টাকা দু'আনায় আপনার কত দরকারের [illegible] যেতে পারে।

[illegible] যেমন করে পারি, টাকাটা আপনাকে ফেরত দেবই।

[illegible] আমার অনুরোধ রাখুন। সবই তো বুঝি, সাধারণ অবস্থার মানুষের সংসারে এক টাকা দু'আনা বাঁচানো কত কঠিন। আপনি অনায়াসে মনে করতে পারেন, আপনার কোন নিজেরই জন আপনাকে সাহায্য করেছে। হলোই বা অপরিচিত। তাতে কি আর আসে যায়?

তরুণী—না, আপনি ফেরত নেবেন বলুন, তবে আপনার টাকা নেব।

অজিত চেঁচিয়ে ওঠে।—কেমন করে ফেরত দেবেন? আমি কি এখানে এই দোকানে

রোজই আসি, যে এলেই আমাকে দেখতে পাবেন? কিংবা আশা করেন যে, আমি আপনার কাছ থেকে টাকা ফেরত পাওয়ার আশায় রোজই এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকবো?

তরুণী—না। আপনি আমাদের বাড়িতে যাবেন।

অজিত—কোথায়, কতদূরে আপনার বাড়ি?

তরুণী—বাইশ নম্বর সনাতন সরকার লেন।

অজিত—কোথায় আপনার সনাতন সরকার লেন, কে জানে?

তরুণী—এই তো এই দিকে। বাগবাজারে যেতেই পড়বে।

অজিত—বস্তিটার কাছে?

তরুণী—বস্তিটা পার হয়ে।

অজিত—আজই যেতে বলছেন নাকি?

তরুণী কি যেন চিন্তা করে। অজিত বলে -ভেবে দেখুন ভাল করে। সত্যিই আজ যদি টাকা ফেরত দিতে পারেন, তবে বলুন। নয়তো অন্য কোন দিন গিয়ে নিয়ে আসবো।

তরুণী—কাল সকাল আটটায় আসতে পারবেন?

অজিত—পারবো।...আচ্ছা চলি।

২

ট্যাক্সি থেকে নেমে বাইশ নম্বর সনাতন সরকার লেনের বাড়িটার কাছে যখন দাঁড়ায় অজিত, তখন চমকে ওঠে। সেই মহিলা কি তবে ঠাট্টা করে, অজিতকে জব্দ করবার জন্য পরের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে সরে পড়েছে? এক টাকা দু'আনা পয়সা আত্মসাৎ করবার জন্য এ রকমের একটা ছলনা করবার কি দরকার ছিল? অজিত তো টাকা ফেরত চায়নি। কি আশ্চর্য!

অজিতের এই আক্ষেপই চমকে ওঠে আর আশ্চর্য হয়ে যায়। বাড়ির ভিতর থেকে বের হয়ে ফটকের কাছে এগিয়ে এসে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে সেই তরুণী—আসুন।

তরুণীর সাজ আর তরুণীর মুখের হাসি, দুই-ই এক বিচিত্র গর্বের কৌতুকে জ্বলজ্বল করছে।

তরুণীর আচরণে ভদ্রতা বিনয় আর সৌজন্যের কোন অভাব নেই। নিজেই নিজের পরিচয় জানায়।—আমাদের বাড়ি। আমার বাবা এম এল রায়—ব্যারিস্টার। আমাদের বাড়ির সৌখীন চেহারা, এই ফুলবাগান, আর এই সব যে ফার্ণিচার দেখছেন, এই সব-ই বাবার আর আমার রুচি অনুযায়ী হয়েছে।

চা এনে দেয় তরুণী—আমার নাম শমিতা। নিজেই বললাম, যদিও আপনি এখনও আমার নাম জিজ্ঞাসা করেননি। বোধহয় একটু বেশি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন, কিংবা জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাননি।

হ্যাঁ, আপনার টাকাটা। বলতে বলতে উঠে গিয়ে একটা টেবিলের দেরাজ টেনে একটা একশো টাকার নোট বের করে অজিতের হাতের কাছে এগিয়ে দেয় শমিতা। সঙ্গে সঙ্গে সেতারের ঝংকারের মতো শব্দ করে হেসে ওঠে।—যদি চেঞ্জ সঙ্গে না থাকে তবে চিন্তা করবেন না, নোটটা নিয়ে যান। বাকি আটানব্বই টাকা চোদ্দ আনা যে-দিন পারবেন ফেরত দিয়ে যাবেন,—যদিও ফেরত না দিলে আশ্চর্য হব না।

অজিত—কেন?

শমিতা—মনে করবো, টাকাটা আপনার দরকারে লেগেছে।

অজিত—কিন্তু ফেরত দেওয়া তো উচিত।

শমিতা—যেদিন সম্ভব হবে, কিংবা সাধ্যি হবে ফেরত দিয়ে যাবেন।

অজিত—না। বাকি টাকা আজই আপনাকে ফেরত দিতে চাই।

শমিতা—আমি কি আপনার টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য ঘরে বসে থাকবো?

অজিত—কেন? আপনিও তো একবার আমার বাড়িতে যেতে পারেন।

শমিতা ভ্রূকুটি করে—না।

অজিত—তাহলে আমিও আপনার এই একশো টাকার নোট নিয়ে যেতে পারবো না। হয় আমাকে আমার এক টাকা দু'আনা দিন, না হয়, দয়া করে আমার সঙ্গে চলুন, আমার বাড়িতে। বাকিটা ফেরত নিয়ে আসবেন।

অজিতের পায়ের স্যাণ্ডেল, গায়ের পাঞ্জাবি আর আধ ময়লা রুমালের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে শমিতা—আটানব্বই টাকা চৌদ্দ আনা বাড়িতে এখন আছে তো?

অজিত—আছে বলেই তো মনে হচ্ছে।

শমিতা—কত দূরে আপনার বাড়ি?

অজিত—এই তো, নিউ শ্যামবাজার স্ট্রীটের কাছে।

শমিতা—কোন্ গলিতে?

অজিত—রূপনাথ লেন, এগার নম্বর।

শমিতা—সেখানে এখন কি করে যাব?

অজিত—কেন? কিসের অসুবিধা?

শমিতা—বাবা গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গিয়েছেন। সেটা না আসা পর্যন্ত...।

অজিত—আমি একটা প্রস্তাব করছি...।

শমিতা ভ্রূকুটি করে—না, আমি এই রকম সাজ নিয়ে পায়ে হেঁটে ওসব লেন-ফেনের ভিতরে ঢুকতে পারবো না।

অজিত—তাহলে এখন আপনার সময় আছে বলুন। গাড়ি থাকলে যেতে পারতেন।

শমিতা—হ্যাঁ।

অজিত—আচ্ছা, আমি দেখছি। একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারি কি না।...আমি এখনই আসছি।

৩

বেশি দেরি করেনি অজিত, মাত্র পনর মিনিটের মধ্যেই একটা গাড়ি যোগাড় করে নিয়ে ফিরে আসে। শমিতার বাড়ি থেকে শমিতাকে তুলে নিয়ে রূপনাথ লেনের এগার নম্বরের বাড়ির কাছে পৌঁছে যায়। গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভারও নেমে যায়। শমিতা বলে—এই প্যালেসের মতো বাড়িটা কার বাড়ি? এখানে থামলেন কেন?

অজিত বলে—এটাই যে এগার নম্বর রূপনাথ লেন।

শমিতা চমকে ওঠে—তার মানে?

অজিত হাসে—এটা আমাদেরই বাড়ি। এই গাড়িটা আমার নিজের ব্যবহারের জন্য। বাবার জন্য আরও দুটো আছে। ঈশ্বরী কটন মিলের নাম শুনেছেন?

শমিতা—হ্যাঁ।

অজিত—ওটা আমাদেরই মিল।...হ্যাঁ আসুন।

বাড়ির ভিতরে ঢুকে যে ঘরের ভিতরে বসে শমিতা, সে ঘরের মেঝের গালিচার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে, এই ফার্ণিচারের দাম কম করেও তিন হাজার টাকা হবে।

চা-এর যে সব সরঞ্জাম টেবিলের উপর সাজিয়ে দিয়ে গেল বয়, সে-সব খাঁটি রূপোর জিনিস। রূপোর কাপ, ডিস, প্লেট।

চা-খাওয়া শেষ হবার পর শমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুভাবে হাসতে থাকে অজিত।

এক মিনিটের জন্য ঘরের ভিতরে ঢুকে আবার ফিরে এসেই অজিত বলে—বড় অসুবিধা হলো। আপনার একশো টাকার নোটের চেঞ্জ সত্যিই দিতে পারছি না।

শমিতা—কিসের অসুবিধা?

একগাদা নোট পকেট থেকে বের করে অজিত, বলে—এই সবই হাজার টাকার নোট।

অজিতের মুখে হাসি ; সে হাসিও কৌতুকের সুখে অস্থির হয়ে কাঁপছে।

শমিতার চোখ দপদপ করে জ্বলে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

অজিত—নিশ্চয়।

শমিতা—রতন কটন মিল নামে যে মিলটা আছে, সেটা কেমন মিল?

অজিত—বেশ ভাল, খুব বড় মিল।

শমিতা—আপনাদের ঈশ্বরী মিলের চেয়ে অনেক ছোট বোধহয়?

অজিত—না না, এ বিষয়ে আপনার কোন ধারণা নেই। রতন মিলের তুলনায় আমাদের ঈশ্বরী মিল তো শিশু। কোথায় ঈশ্বরী মিলের সাত লাখ টাকার ক্যাপিটাল, আর কোথায় রতন মিলের একুশ লাখ টাকার ক্যাপিটাল।

শমিতা—রতন মিলের মালিক অবনীবাবুকে চেনেন?

অজিত—চিনি।

শমিতা—তাঁর ছেলে সরোজকে চেনেন?

অজিত—চিনি বৈকি। অবনীবাবুর একমাত্র ছেলে সরোজ। ঐ মিল তো এখন সরোজের সম্পত্তি। সরোজই দেখাশোনা করে।...কিন্তু আপনি ওদের চিনলেন কেমন করে?

শমিতা হাসে—চিনি, চেনাশোনা হয়েছে। সরোজবাবুকে দেখতে আপনার চেয়ে অনেক সুন্দর বলে আমার ধারণা।

অজিত—তা তো নিশ্চয়। সরোজের মতো সুপুরুষের সঙ্গে আমার তুলনা করাই হাস্যকর।

শমিতা—সরোজের সঙ্গেই আমার বিয়ে, খুব সম্ভব এ মাসেরই একটি দিনে।

শমিতার মুখে এবার কৌতুকের হাসিটা যেন শিউরে শিউরে জ্বলতে থাকে। আর অজিত একেবারে সুস্থির হয়ে বসে শমিতার জীবনের এই অহংকারের উল্লাস সহ্য করতে থাকে।

—যাক, এখানে অনেক সময় নষ্ট হলো। হেসে হেসে উঠে দাঁড়ায় শমিতা।

অজিত বলে—হ্যাঁ চলুন।

নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে শমিতাকে আবার বাইশ নম্বর সনাতন সরকার লেনের সৌখীন বাড়িতে পৌঁছে দেয় অজিত।

গাড়ি থেকে নামবার আগে হাসিমুখে ভদ্রতা করে শমিতা।—আপনি কি নামবেন না? আর একবার কষ্ট করে এক কাপ চা অন্তত খেয়ে যেতেন।

অজিত—না। চা খাওয়ার ইচ্ছে নেই, কিন্তু...।

শমিতা—কি?

অজিত—একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

শমিতা—বলুন।

অজিত—আপনাদের এই বাড়িতে আসবার পথে, ঐ মোড়ের কাছে যে ঝাউঘেরা একটা বিলিতি স্টাইলের বাড়ি দেখলাম, ওটা কার বাড়ি জানেন নিশ্চয়?

শমিতা—জানি বৈকি। রিটায়ার্ড সিভিল-সার্জেন বিকাশ মল্লিকের বাড়ি।

অজিত—ও বাড়ির কারও সঙ্গে আপনার আলাপ আছে?

শমিতা—বিকাশ মল্লিকের মেয়ে কবিতার সঙ্গে আমার খুব আলাপ আছে।

অজিত—কবিতা মল্লিক নিশ্চয়ই দেখতে আপনার মতো এত সুন্দর নয়?

শমিতা—ঠাট্টা করছেন বুঝতে পারছি! যে কারণেই হোক, মনে মনে বোধহয় ক্রুদ্ধ

হয়েছেন।

অজিত—ঠাট্টা করছি না। একটুও রাগ করিনি আমি। শুধু জানতে ইচ্ছে করছে, আপনার চেয়ে দেখতে বেশি ভাল কি কবিতা মল্লিক?

শমিতা—শতমুখে স্বীকার করবো, কে না স্বীকার করবে, কবিতা মল্লিকের রূপের তুলনা হয় না। আমার চেহারার সঙ্গে কবিতার চেহারার তুলনা করলে কবিতাকে অপমান করা হয়। কিন্তু...।

কথা থামিয়ে হঠাৎ চমকে ওঠে শমিতা। অজিত বলে—কি বলছিলেন?

শমিতা—কবিতার সঙ্গে কি আপনার চেনাশোনা আছে?

অজিত—আছে।

শমিতা—কিরকম চেনাশোনা?

অজিত—কবিতার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যেতে পারে, এই রকম।

শমিতা—তার মানে?

অজিত—তার মানে, বোধহয় এই মাঘ মাসেই বিয়েটা হবে। সব ব্যবস্থা এক রকম ঠিক হয়েই আছে।

শমিতা মুখ ফিরিয়ে নেয়, গাড়ি থেকে নেমে তরতর করে হেঁটে বাড়ির ভিতরে চলে যায়।

আর, অজিতও অনায়াসে গাড়ি স্টার্ট করে সনাতন সরকার লেনে ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলে যায়।

৪

সেই দোকান। সেই দোকানদার। আর দোকানের সেই কাউন্টার। প্রায় একটা বছর পার হয়ে গিয়েছে, তারপর এই দোকানের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অজিত।

সেই রকমই এক বছর আগের সন্ধ্যের মতো একটি আলো-ঝলমল সন্ধ্যা। কয়েকটা জিনিস কেনবার আছে। এই দোকানটাতে পাওয়া যাবে সে-সব জিনিস। তাই দোকানের ভিতরে ঢুকে খরিদ্দারের ভিড়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকে অজিত।

চমকে ওঠে অজিত! কি আশ্চর্য, এমন অসম্ভবও সম্ভব হয়! শমিতাও দাঁড়িয়ে আছে—কাউন্টারের ঐ দিকে। কি-যেন কিনতে চাইছে শমিতা। কিন্তু দোকানদার দর কমাতে চায় না।

দেখতে পায় অজিত, এক কৌটা মাখন কিনতে চায় শমিতা। কিনুক। শমিতা যেন আর অজিতকে দেখতে না পায়। শমিতার চোখের সামনে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে নিজেকে যেন একটা লঘু ছায়ার মতো লুকিয়ে ফেলতে চেষ্টা করে অজিত। কিন্তু এরই মধ্যে, শমিতার মুখ দেখে একটা ধারণা করে ফেলেছে অজিত। মনে হচ্ছে, আজও বিয়ে হয়নি শমিতার।

আড়াল থেকেই দেখতে পায় অজিত, শমিতা তার হাতের ব্যাগ খুলে পয়সা গুনছে। তার পরেই হতাশভাবে আনমনার মতো অন্যদিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে।

আজও কি পয়সা কম পড়েছে শমিতার? হতে পারে। কিন্তু আজ যেন আর অজিতকে দেখতে না পায় শমিতা। ভিড়ের মধ্যে মুখটাকে আরও ভাল করে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে অজিত।

কিন্তু দেখে ফেলেছে শমিতা। কি আশ্চর্য, একেবারে অপলক-চোখের বিস্ময় নিয়ে অজিতের দিকে তাকিয়ে কি যেন সন্দেহ করছে শমিতা। বোধহয় ধারণা করছে যে, অজিত আবার সেই রকমই ভয়ানক ভুল করে শমিতাকে সাহায্য করতে চাইবে।

কিন্তু সে ভুল আর করতে পারে না অজিত। সে ভুল আর অজিতের পক্ষে সম্ভবই নয়। শমিতার ধারণা করা উচিত যে, আবার ভুল করে শমিতার কাছে অপমানিত হবার জন্য ব্যস্ত

হয়ে উঠতে পারে না অজিত। সে কাণ্ডজ্ঞান অজিতের আছে।

কিন্তু এ কি! শমিতা সত্যিই কিছু বলবে বলে কাছে এগিয়ে আসছে!

অজিতের কাছে এসে দাঁড়িয়ে শমিতা বলে--দুটো টাকা দিন।

অজিতের গলা আর্তনাদের মতো কেঁপে ওঠে।—কি বললেন?

শমিতা--দুটো টাকা দিন। কিন্তু জানবেন, টাকা ফেরত দেবো না।

অজিত করুণভাবে তাকিয়ে থাকে--দুটো টাকা হবে না। সামান্য কয়েক আনা খুচরো সঙ্গে আছে।

শমিতা হাসে--আপনার পকেটে সামান্য কয়েক আনা? অদ্ভুত ব্যাপার!

কথাটা বলেই দোকানের সিঁড়ি ধরে নেমে ফুটপাতের ভিড়ের ভিতর দিয়ে এক মনে চলতে থাকে শমিতা। অজিত ডাকে--শুনুন!

এগিয়ে যায় অজিত। শমিতা হাসে—আপনি খুব রোগা হয়ে গিয়েছেন দেখছি।

অজিত--আপনার মুখের রং এরকম ময়লা হয়ে গেল কেন? কোন অসুখ করেছিল?

হেসে ফেলে শমিতা--হ্যাঁ।

অজিত—কি অসুখ?

শমিতা--অভাব।

অজিত—তার মানে!

শমিতা—ঠাট্টা করছি না অজিতবাবু। বাবার জন্য এক কৌটা মাখন কিনতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু হলো না। বাবা অসুস্থ।

অজিত—আপনার কথা শুনে আমার একটা ভয়ানক সন্দেহ হচ্ছে।

শমিতা—কি সন্দেহ, বলুন।

অজিত--সত্যিই অভাব?

শমিতা--ঠিক ধরেছেন। সে বাড়ি, সে গাড়ি, আর সে শমিতাও নেই অজিতবাবু।

অজিত যেন অনেক চেষ্টা করে একটা কুণ্ঠা জয় করে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করে—রতন মিলের সরোজ কি বলে?

শমিতা হেসে ওঠে—শমিতার বাবা হঠাৎ গরীব হয়ে যাবার পর শমিতার সম্বন্ধে একটা সন্দেহ করে, আর ভয় পেয়ে সরোজ নীরব হয়ে গিয়েছে। শমিতাকে বিয়ে করতে সাহস পায়নি।

অজিত—কেন? কি সন্দেহ করলো সরোজ?

শমিতা--সরোজের সন্দেহ, অজিতের সঙ্গে নাকি গোপনে প্রেম আছে শমিতার।

--শমিতা! আস্তে আস্তে, যেন বিপুল এক অভ্যর্থনার আবেগে ডাক দেয় অজিত।

শমিতা—বলুন।

অজিত—তুমি বোধহয় এখনো আমাকে ঠিক চিনতে পারছো না শমিতা।

শমিতা—একথা কেন বলছেন?

অজিত—আজ তোমাকে দুটো টাকা দিতে পারলাম না কেন বলতে পার?

শমিতা--সঙ্গে নেই বলে।

অজিত—না, সঙ্গে নেই, বাড়িতেও নেই। নগদ দুটো টাকা আজ এই সময় আমার জীবনের মধ্যেই নেই শমিতা।

শমিতা—কি অদ্ভুত কথা বলছেন?

অজিত—বাবার মৃত্যু হয়েছে। বাবার সব সম্পত্তি আমার সৎমা পেয়েছেন।

শমিতা—কেমন করে?

অজিত—নকল উইলের জোরে। সৎমার সঙ্গে মামলা লড়তে গিয়ে আমার নিজের নামে

যা কিছু ছিল সবই খুইয়ে বসে আছি। এখন আমি জোড়াসাঁকোর হাইস্কুলের মাস্টার।

কেঁদে ফেলেছে শমিতা। দেখতে পায় অজিত, শমিতার ভেজা চোখের উপর আলো চিকচিক করছে।

শমিতা বলে--আপনার কবিতা মল্লিকের কি হলো?

অজিত হাসে--সেটা কি আর বলে দিতে হবে?

শমিতা--আপনার ওপর একটুও মমতা হলো না কবিতার?

অজিত--না।

শমিতা--কারণ কি?

অজিত--কারণ হলো তুমি।...বাবা মারা যাবার পর যখন মেসে থাকি, তখন কবিতার সঙ্গে একদিন শেষ দেখা করে চলে এলাম। কবিতা বললে, শমিতার মতো মেয়েকে গাড়িতে নিয়ে এক সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় যে, শমিতাকে ভালবাসে যে, তাকে বিশ্বাস করা যায় না।

শমিতা--এ রকম মিথ্যে কথা কেন বললে কবিতা?

অজিত--বোধহয় খুব বেশি মিথ্যে কথা বলেনি কবিতা।

শমিতা--তাহলে শুনুন...।

অজিত--বলুন।

শমিতা--বললে বিশ্বাস করবেন কি?

অজিত--হ্যাঁ!

শমিতা--সরোজের সন্দেহও নিতান্ত মিথ্যা নয়।

মাথা হেঁট করে শমিতা। শমিতার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থাকার পর অজিত ডাকে--শমিতা!

শমিতা--বলুন!

অজিত--এখন কি নিজেকে সত্যিই একলা মনে হচ্ছে?

শমিতা--না।

অজিত--কেন?

শমিতা--তুমি যে কাছে রয়েছ।

দানবিক

বিহারের সেই ভূমিকম্প! কি ভয়ানক রাগ করে ফণা নেড়েছিলেন বাসুকী নাগ! পট পট করে বেজে উঠেছিল ধরিত্রীর পাষাণের পাঁজর। বড় বড় ক্ষেত আর মাঠের বুক ফেটে গিয়ে গরম জল আর বালুর ফোয়ারা উথলে উঠেছিল। মাটির গভীরে লুকিয়ে থেকে ছোট ছোট অগস্ত্য যেন এক চুমুকের টানে উপরের এক একটা ঝিল আর পুকুরের জল শুষে নিয়েছিল। সব কূয়োর মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বড় বড় সড়কের জায়গায় বড় বড় দহ দেখা দিয়েছিল। আর, শহর বাজার ও বস্তির ছোট-বড় কত বাড়ি যে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল, তার কিছু বিবরণ আর পরিচয় এখনও সেই রিলিফ কমিটির রিপোর্টের পুরনো ফাইলে পাওয়া যাবে, যদি সে রিপোর্টের ফাইল এখনও থেকে থাকে।

কোথা থেকে একটা অদৃশ্য আক্রোশের ঝড় হঠাৎ মত্ত হয়ে উঠে যেন প্রচণ্ড এক ধ্বংস আর হাহাকারের খেলা খেলে তারপর স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু সেই ধ্বংসের কান্না আর হাহাকারের রেশ থেমে যেতে বেশ কিছুদিন লেগেছিল। এক বছর পরেও দেখা যেত বিধবা নারী পথের ধারের একটা ইটের স্তূপের কাছে বসে কাঁদছে। সে নারীর স্বামীর লাশ সেই ইটের স্তূপের ভিতর সমাধিস্থ হয়ে কবেই মাটি হয়ে গিয়েছে, তবু অবুঝ বিধবা যেন একটা প্রাণের সাড়া শোনবার লোভে ইটের স্তূপের কাছে বসে থাকে।

সেই সময় ক্যাপ্টেন দেবেশ মল্লিক দেওঘর থেকে শ্বশুরবাড়ির চিঠি পেয়ে চমকে উঠেছিল।--তুমি আর কোন চিন্তা করো না দেবেশ। সুলেখা ভাল আছে, বেবিও ভাল আছে।

থ্যাঙ্ক গড! বহু পুণ্যের জোরে প্রাণে বেঁচে গিয়েছে সুলেখা আর সুলেখার বেবি।

রাজপুত রেজিমেন্টের সঙ্গে মেডিক্যাল অফিসার হয়ে তখন নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্ট্রিয়ারের রাজমাক ফোর্টের ভিতরে, শান্ত-সুন্দর পাথুরে কোয়ার্টারের সামনে, আখরোট গাছের ছোট ছায়ার পাশে আরাম-চেয়ারে বসে বাংলা উপন্যাস পড়ছিল দেবেশ। চিঠি পড়তে পড়তে বুকটা বার বার কেঁপে উঠেছিল। কি অদ্ভুত রক্ষা। তিনটে দিন যেন একটা রসাতলের অন্ধকারে সমাধিস্থ থেকে, তারপর বেঁচে উঠে আর বাইরে এসে পৃথিবীর আলো দেখতে পেয়েছে সুলেখা আর বেবি।

সেদিনই ছুটির জন্য দরখাস্ত করতে চেয়েছিল দেবেশ। সেই মুহূর্তে ছুটে এসে একবার সুলেখার মাথায় হাত রাখতে আর বেবিটাকে কোলে তুলে নিতে মনটা ছটফট করে উঠেছিল। কিন্তু যাক, যখন বিপদ কেটে গিয়েছে, তখন আর এতটা উতলা হবার দরকার হয় না!

আর উতলা হয়নি দেবেশ। কয়েকদিন পরে সুলেখারই কাছ থেকে চিঠি এল। সে চিঠির লেখা পড়ে মনটা একেবারে শান্ত হয়ে গেল। আহত হয়নি সুলেখা। না সুলেখা, না বেবি, কারও গায়ে সেই নিষ্ঠুর ভূমিকম্পের একটা আঁচড়ও লাগেনি।

প্রকাণ্ড একটা বাড়ি ধসে গেল। ইট পাথর কড়ি-বরগার একটা বিরাট স্তূপ কবরের মতো নিরেট হয়ে এতগুলি মানুষের প্রাণ চাপা দিল। তবু বেঁচে গেল সুলেখা আর বেবি! তিনটে দিন আর রাত সেই রসাতলের অন্ধকারে নির্বাসিত হয়ে থাকতে সুলেখার বুকের পাঁজর ভয় পেয়ে গুঁড়ো হয়ে যায়নি, এই তো আশ্চর্য! আরও আশ্চর্যের কথা, চিঠিতে কোন ভয়ের কথা লেখেনি সুলেখা। বরং, শেষ লাইনে যেন একটা উল্লাসের ঝঙ্কার আছে।—বললে বিশ্বাস করবে না, এই তিনটে দিন আর রাতকে তিনটে ঘণ্টার বেশি বলে মনে হয়নি। বুঝতেই পারিনি যে, তিন-তিনটে দিন আর রাত পার হয়ে গিয়েছে, এমনই অদ্ভুত অন্ধকার! এক মিনিটও ঘুমোইনি! চোখ দুটো মাঝে মাঝে অবশ হয়ে ছিল, এই মাত্র।

পরের চিঠিতে একটা দুঃখের খবর ছিল, যে-খবর পড়ে কয়েকটা দিন দেবেশের মন বেশ বিমর্ষ হয়েছিল। দেবেশের কাকা আর কাকিমা খুব বেশি জখম হয়েছেন। প্রাণে বেঁচেছেন ঠিকই, কিন্তু তাদের বোধহয় আজীবন পঙ্গু হয়ে থাকতে হবে। দুজনেই এখন মুঙ্গের হাসপাতালে আছেন। সুলেখা লিখেছে, বাবা আবার চলে গিয়েছেন মুঙ্গের। কাকা আর কাকিমাকে পাটনাতে নিয়ে যাবেন। তুমি ছুটি নিয়ে চলে আসবার চেষ্টা কর।

তারপরের চিঠিতে ভাল খবর। না, চিন্তা করবার আর কিছু নেই। কাকা আর কাকিমা সেরে উঠেছেন। হাড় ভাঙেনি। তবে, চোখের দৃষ্টির জোর কমে গিয়েছে দুজনেরই। ওঁরা উদ্ধার পাওয়ার আগে দুটো দিন সেই রসাতলের অন্ধকারে ছিলেন, আর তাইতেই চোখের জোর নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু...

সুলেখার চিঠির শেষ লাইনে আবার একটা খুশির ঝঙ্কার আছে।--কিন্তু আমার চোখ দুটো তেমনই টনটনে আছে। আশ্চর্য!

সেই চিঠির পর একটা বছর পার হয়ে গিয়েছে। তারপর এই আজ। আজ আর রাজমাক ফোর্টের ভিতরে আখরোটের সেই ছায়ার কাছে বসে কল্পনায় সুলেখার আর বেবির মুখ দেখতে হচ্ছে না। পাটনাতে এসে, কদমকুঁয়ার এই বাড়িতে ঢুকে সুলেখার মুখের দিকে তাকিয়েছে দেবেশ। সুলেখার কোলে বেবি, হেসে হেসে বেবির মুখটাকে দেখছে দেবেশ।

—এ কি? বেবির মুখের দিকে তাকাতেই যেন চমকে উঠেছে দেবেশ। বোধহয় একটু আশ্চর্য হয়েছে।

হেসে ওঠে সুলেখা।—আগে একবার কাকা আর কাকিমার সঙ্গে দেখা করে নাও। চল।

দেবেশের চোখের বিস্ময়কে যেন হঠাৎ হাসির মায়া দিয়ে ভুলিয়ে অন্য দিকে টেনে নিয়ে গেল সুলেখা। সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে, দোতলার একটি ঘরে ঢুকে কাকা আর কাকিমার সঙ্গে গল্প করে দেবেশ।

দোতলার একটি ঘরে বিছানার উপর ঘুমিয়ে আছে বেবি। ঘরের ভিতরে আলো জ্বলে। প্রকাণ্ড মিররটাও প্রকাণ্ড একটা আলো হয়ে ঝকঝক করছে। রাত হয়েছে অনেক।

বাইরে গাড়ির শব্দ শোনা যায়। এতক্ষণে বেরিয়ে ফিরলো দেবেশ। গ্যারেজে ঢুকেছে গাড়ি, তার শব্দও শোনা যায়। হাতের বই রেখে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সুলেখা।

ঘরে ঢুকেই দেবেশ হাসে।—খাওয়ার হাঙ্গামা সেরে এসেছি। মোরাবাদ গিয়েছিলাম। বলাই-এর স্ত্রী পেট ভরে লুচি মাংস খাইয়ে ছেড়েছে।

তারপরেই বিছানার উপর ঘুমন্ত বেবির দিকে তাকায় দেবেশ।—বেবিটা যে এত কালো হয়ে যাবে, ভাবতেই পারিনি।

ঠিকই বলেছে দেবেশ। বেবির বয়স যখন তিন মাস, তখন ঘুমন্ত বেবির গালে চুমো খেয়ে রওনা হয়েছিল দেবেশ। পাটনা থেকে পেশোয়ার, তারপর পিণ্ডি, তারপর রাজমাক ফোর্টে গিয়ে রেজিমেন্টাল হাসপাতালের চার্জ নিতে হয়েছিল। সেদিন বেবিটা কী চমৎকার ফুটফুটে ফরসা একটা ডলের মতো চেহারা নিয়ে ঘুমিয়েছিল! কিন্তু এই এক বছরের মধ্যে কত কালো হয়ে গিয়েছে বেবি! কোথায় গেল সেই রঙ?

সুলেখা হাসে—হ্যাঁ, সত্যিই বেশ কালো হয়ে গিয়েছে বেবি।

ঘুমন্ত বেবির কাছে গিয়ে বেবির গাল টেপে দেবেশ। সুলেখা হাসে--ঘুমের মধ্যে আদর করো না। শেষে ঝগড়াটে স্বভাবের একটা দুষ্টু হয়ে উঠবে।

একটা সোফার উপর বসে ডাক দেয় দেবেশ—তুমি কি এখনই ঘুমিয়ে পড়বার মতলব করছো?

—না। সুলেখা হাসে আর হেসে হেসেই পট করে সুইচটা টিপে আলো নিভিয়ে দিয়ে

দেবেশের পাশে সোফার উপর বসে।

--এ কি? একটু আশ্চর্য হয় দেবেশ।

সুলেখা--এই তো ভাল।

দেবেশ--অন্ধকার ভাল লাগে?

সুলেখা--হ্যাঁ।

দেবেশ--নতুন অভ্যেস মনে হচ্ছে!

সুলেখা বিব্রতভাবে বলে--অ্যাঁ? তার মানে?

দেবেশ--আগে দেখেছি, অন্ধকার সহ্য করতেই পারতে না।

সুলেখা যেন আনমনার মতো আস্তে আস্তে বলে--তা বটে।

গল্প করে দেবেশ। খৈবার পাস, আফ্রিদির উপদ্রব, আর পাখি শিকারের গল্প। তারপর একটা খুসির উচ্ছ্বাসে হেসে ওঠে দেবেশ।--কিন্তু তোমার ভূমিকম্পের গল্পের কাছে এসব গল্পের আশ্চর্য কিছুই নয় বোধহয়।

সুলেখা বলে--হ্যাঁ।

দেবেশ--তবে বলো।

সুলেখা--কি?

দেবেশ--ঐ তিনটে দিন চার-মাসের বেবিকে নিয়ে একটা প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপের ভিতরে আটক হয়ে থেকে, না খেয়ে...আমার মনে হয়, এই জন্যেই বেবিটা কালো হয়ে গিয়েছে!

সুলেখা বলে--হ্যাঁ। রেস্ক্যু-পার্টি যখন ভিতরে ঢুকে উদ্ধার করে বাইরে নিয়ে এল, যখন ভাল করে চোখে দেখতে পেলাম, তখন দেখলাম, বেবিটা বেশ কালো হয়ে গিয়েছে।

--তোমার খুব দুঃখ হয়েছিল নিশ্চয়।

--অ্যাঁ? দুঃখ? না, এতে খুব দুঃখ করবার কি আছে?

দেবেশের একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে সুলেখা। তারপর দেবেশের কাঁধের উপর মাথাটা এলিয়ে দিয়ে একটা হাঁপ ছাড়ে।--আশ্চর্য।

--কি? প্রশ্ন করে দেবেশ।

--এই যে বেবিটা কালো হয়ে গেল। একটা অদ্ভুত অবিশ্বাস্য গল্পের মতো মনে হয়!

--গল্পের মতো?

--হ্যাঁ।

--কেন?

--কি করে বলব বলো? মনে হয়, এইমাত্র।

কথা শেষ করেই একটু কেঁপে ওঠে সুলেখা। তারপরেই যেন নিঝুম হয়ে যায় শরীরটা।

মরণের মুখ থেকে ফিরে এসেছে সুলেখা, কোলের বেবিকে কোলে নিয়ে আবার স্বামীর গা ঘেঁষে বসবার সৌভাগ্য হয়েছে। এই সৌভাগ্যের আনন্দ যেন এতক্ষণে পরিপূর্ণ হয়ে সুলেখার চেতনায় রিমঝিম করে বাজছে। সুলেখার পিঠে হাত বোলায় দেবেশ।

কিন্তু সুলেখার এই সুখের আবেশের মধ্যে যেন একটা বোবা গল্পের বিস্ময় ছটফট করতে থাকে। সুলেখা নিজেও বোবা হয়ে আর দুচোখ বন্ধ করে সেই গল্পের ছবিটাকে যেন সারা অনুভব দিয়ে দেখতে থাকে, কিন্তু বলতে পারে না।

সবই মনে পড়ে সুলেখার। সেদিন মুঙ্গেরে পৌঁছে সূর্যকুণ্ড দেখবার কথা ছিল। মুঙ্গেরের চারুবাবু কাকা আর কাকিমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন--একবার মুঙ্গের এসে বেড়িয়ে যাও।

তাই, অন্য কোন কারণ ছিল না। তাই পরেশবাবু বললেন--তুমিও চল বউমা।

কাকিমা আপত্তি করেছিলেন--চার-মাসের একটা বাচ্চা কোলে নিয়ে সুলেখা আবার কেন ছুটোছুটি করে হয়রান হবে?

পরেশবাবু--কোন অসুবিধা হবে না। পাটনা থেকে মুঙ্গের পর্যন্ত যেতে এখন ভাল সড়ক পাওয়া যাবে। নিজের গাড়িতে যাব। অসুবিধার কি আছে?

জায়গাটা বোধহয় বেগুসরাই থেকে মুঙ্গের যেতে পড়ে। একটা বাজার ছিল। আর নতুন একটা ধর্মশালাও ছিল।

ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলে পরেশবাবু বললেন।--বিকাল পর্যন্ত এই ধর্মশালাতে একটু রেস্ট নেওয়া যাক বউমা, কি বল? সন্ধ্যায় আবার রওনা হওয়া যাবে।

সেই ধর্মশালা। তিনতলা বাড়ি। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, দেখতে কেল্লার মতো বিরাট। সেদিন লোক গিজগিজ করছে ধর্মশালায়। সূর্যকুণ্ড স্নানে যাবার জন্যই এই ভিড়।

বেবিকে ফ্ল্যানেল দিয়ে জড়িয়ে আর কোলে নিয়ে এই ধর্মশালার বারান্দাতে আস্তে আস্তে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল সুলেখা। আর, একটা ঘরের ভিতরে চৌকির উপর বসে খবরের কাগজ সামনে রেখে গল্প করছিলেন কাকা আর কাকিমা। সেই সময়...সেই ধরিত্রীর পাঁজর-কাঁপানো শিহরন, সেই ভয়াল শব্দ, আর সেই প্রচণ্ড হাহাকার, আর্তনাদ। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো তিনতলা ধর্মশালা। প্রচণ্ড ধুলোর ঝাপটা আর অন্ধকারের মধ্যে যেন ছিটকে গেল সুলেখার প্রাণটা।

প্রথমে বুঝতেই পারেনি সুলেখা, একটা নিরেট অন্ধকারের মধ্যে মুখ থুবড়ে কেন পড়ে আছে সুলেখা? মূর্ছাটা তখনও ঠিক ভাঙেনি।

তারপরেই চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে সুলেখা--বেবি, আমার বেবি কোথায়?

নিরেট অন্ধকারে ঢাকা কবরটা যেন সুলেখার চিৎকারের সঙ্গে ভয়ংকর আর্তনাদ তুলে প্রতিধ্বনি ছড়ায়। হাতড়ে হাতড়ে হাঁটতে থাকে সুলেখা। কিন্তু পদে পদে হোঁচট খায়। এগিয়ে যেতে পারে না।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেয়ালের টুকরো এদিকে-ওদিকে হেলে বেঁকে গড়িয়ে আর খান-খান হয়ে পড়ে আছে। গুমরে গুমরে একটা শব্দ ভেসে আসছে, যেন অনেক দূরে একটা বাজারের শোরগোল চাপা পড়ে আর দমবন্ধ হয়ে কান্নাকাটি করছে।

ভয়ানক করুণ শব্দ, তবু তো জীবন্ত শব্দ। ওরই কাছে এগিয়ে যাবার জন্য ছটফট করে সুলেখা। আর, চারদিকে ছড়ানো ইটের উপর হাত রেখে ঘুরতে থাকে।--বেবি। আমার বেবি! শূন্য অন্ধকারকে যেন খিমচে খিমচে খোঁজে আর কাঁদতে থাকে সুলেখা।

হঠাৎ...যেন পাতালপুরীর একটা দানবের হাতের ছোঁয়া সুলেখার পিঠের উপর এসে লুটিয়ে পড়ে। সুলেখার পিঠের মাংস ছিঁড়ে নেবার জন্য পাঁচ আঙুলের নখ এগিয়ে দিয়েছে সেই দানবিক আগন্তুক।

লাফ দিয়ে সরে যায় সুলেখা। দম বন্ধ করে সুলেখা। যেন সুলেখার এই যন্ত্রণাক্ত বুকের এক ছিটে নিশ্বাসের শব্দও শুনতে না পায় দানবটা।

কিন্তু দানবের নিশ্বাস আর পায়ের শব্দ শুনতে পায় সুলেখা। সুলেখার পায়ের শব্দ লক্ষ করে ঘুরছে দানবটা। মড়মড় করে ইটের স্তূপ বাজছে। সুলেখার রক্তমাংসের গন্ধ অন্বেষণ করছে রসাতলের সেই দানবিক আবির্ভাব। মস্ত বড় একটা ইট হাতে তুলে সেই মরণগুহার নিভৃতে এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে সুলেখা।

দানবটা হাঁসফাঁস করে ঘুরতে থাকে। কিন্তু সুলেখাকে খুঁজে পায় না। শুধু শুনতে থাকে সুলেখা, অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিশ্বাস ছাড়ছে দানব।

চমকে ওঠে সুলেখা। হাতের ইট ঝুপ করে খসে পড়ে যায়। চেঁচিয়ে উঠেছে এই মরণগুহার দানব।

--কে আপনি চিৎকার করে কাঁদছিলেন? কোথায় গেলেন আপনি?

--আপনি কে? সুলেখার হৃৎপিণ্ডটা যেন উল্লাসে লাফিয়ে ওঠে।

—আমিও আপনার মতো মরেছি।

—কি সব্বনেশে কথা বলছেন! ফুঁপিয়ে ওঠে সুলেখা।

—সত্যি মরিনি, কিন্তু মরতে হবে যে। লোকটাও চেঁচিয়ে ওঠে।

—কিন্তু আমার বেবি। সুলেখার কান্না এইবার সেই মরণগুহার সব অন্ধকার গলিয়ে দিয়ে গুনগুন করে বাজতে থাকে।

—আপনার কোলে ছেলে ছিল কি?

—হ্যাঁ।

—খুঁজেছেন?

—কত খুঁজলাম, পেলাম না!

—আপনি খুঁজবেনই বা কি করে? আপনার সাধ্যি কি? লোকটা যেন বিচলিত স্বরে আক্ষেপ করে।

—আপনি দয়া করে একটু খুঁজবেন?

—নিশ্চয়। লোকটা আবার হাঁসফাঁস করতে করতে, অন্ধকারের বুকের ভিতর দিয়ে টলতে টলতে কোন দিকে যেন চলে যায়।

কি আশ্চর্য, এই মরণগুহার ভিতরে দাঁড়িয়ে সুলেখার মনের ভিতর থেকে মরণভয়ের ভ্রূকুটিগুলি যেন আস্তে আস্তে মরে যাচ্ছে। মরতে হবে, সে মরণ কি এই রকম জীবন্ত হয়ে থাকার চেয়েও অদ্ভুত! ভয় নয়, ভয় করবার মতো ভীরু জীবনটাই যেন মরে যাচ্ছে। সুলেখার প্রাণ শুধু একটি প্রার্থনা সাধছে। বেবিটাকে চাই। মরে যাবার আগে বেবিকে একবার কোলের উপর তুলে বুকের কাছে চেপে ধরতে চাই। বেবির গালে একটা চুমো দিয়ে এখানে এই রসাতলের অন্ধকারে চিরকালের মতো ঘুমিয়ে পড়লে দুঃখ কিসের?

—আপনি আছেন? বেঁচে আছেন? লোকটা সুলেখার নিকটে এসে আবার হাঁক দিয়েছে।

—আছি। আপনি বেঁচে আছেন তো? উত্তর দেয় সুলেখা।

হেসে ওঠে লোকটা—এখনও আছি।

—আমার বেবি কই?

—এখনও পাইনি।

—তবে আশা কি নেই? আবার ফুঁপিয়ে ওঠে সুলেখা।

—আছে। আশা ছাড়বেন না।

চলে গেল লোকটা। কিন্তু তখুনি ফিরে এসে চেঁচিয়ে ওঠে।—আপনি জল খাবেন যদি, তবে এখানে এসে দাঁড়ান।

ইট তুলে নিয়ে একটা ভাঙা দেয়ালের উপর ঠক ঠক করে আঘাত করে জায়গাটাকে চিনিয়ে দেয় লোকটা।—এখানে একটা চৌবাচ্চা আছে, তাতে জল আছে। বলতে বলতে চলে গেল লোকটা।

হ্যাঁ, জল। এই রসাতলের সবই তাহলে দানবিক নয়। এখানেও জল আছে, করুণা আছে। সুলেখার কান্না শুনে বিচলিত হবার মতো প্রাণ আছে। এমন কিছু রিক্ত শূন্য আর শ্রীহীন নয় মরণময় এই অন্ধকারের সংসার। হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে গিয়ে চৌবাচ্চার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, জল খায় সুলেখা।

—আপনি বেঁচে আছেন? আবার সেই উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর। সুলেখার প্রাণের জন্য, সুলেখার ছেলেকে খুঁজে আনবার জন্য এই ধ্বংসের ইট-পাথরের ভিতর দিয়ে মাথা ঠুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে মানুষটা, তারই কণ্ঠস্বর। সত্যিই মানুষ তো?

—বেবি কই? চেঁচিয়ে ওঠে সুলেখা।

—এই নিন। এগিয়ে আসুন।

—পেয়েছেন, পেয়েছেন! রসাতলের সেই অন্ধকারের এক মহাকরুণার উপহার নেবার জন্য দু'হাত তুলে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে সুলেখা।

লোকটার হাত থেকে বেবিকে তুলে নিয়ে বেবির বুকের উপর কান পাতে সুলেখা। তারপরেই বেবিকে বুকের উপর চেপে ধরে। চার মাসের একটা কোমল ও নরম শরীর, তৃষ্ণার্ত বেবি সুলেখার বুকের উপর মুখ ঘষতে থাকে।

সুলেখা ডাক দেয়—আপনি কোথায়?

—এই তো কাছেই আছি।

—এখানেই থাকুন।

—হ্যাঁ। আর পারি না! লোকটা যেন অলসভাবে একটা হাঁ'প ছেড়ে বসে পড়ে।

—বেবিকে কোথায় পেলেন? প্রশ্ন করে সুলেখা।

—ওদিকের একটা ঘরের একটা তক্তাপোষের নিচে। কান্নার শব্দ শুনে, অনেক চেষ্টা করে ইটের রাশ ঠেলে ঠেলে, শেষে বাচ্চাটাকে ধরতে পেরেছি। কিন্তু...

—কি?

—যাক সে কথা।—এখনও বাঁচবার আশা আছে মনে হচ্ছে।

—কি করে বুঝলেন?

—ওদিকে যারা বেঁচে আছে, তারা খুব জোরে হল্লা করছে। বাইরে থেকে কাজ শুরু হয়েছে বলে ওদের ধারণা।

—কিসের কাজ?

—উদ্ধারের। কোদাল গাঁইতির শব্দ শোনা যাচ্ছে। উপরের ইট পাথর সরানো শুরু হয়েছে।

—উদ্ধার! কথাটা যেন অবাস্তব স্বপ্নের প্রলাপের শব্দ বলে মনে হয় সুলেখার। উপরের সেই সূর্যের আলোক, গাছের সবুজ, আর ফুলের গন্ধকে এখানে বসে সে নিতান্তই পর বলে মনে হয়। এখানে এই নিরেট অন্ধকারের মরণময় মোহ তার চেয়ে কম মধুর নয়। এখানে দানবের হাতের নখ সুলেখার রক্তমাংস লুঠ করতে চায় না, কি আশ্চর্য। এইরকম দানবিক মায়ার গা ঘেঁষে বসে থাকতেই যে ইচ্ছা করে। উঠতে ইচ্ছা করে না। উপরের সূর্যালোকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে এই শান্তির চোখ যে ঝলসে যাবে।

লোকটার হাতটাকে হঠাৎ ছুঁয়ে ফেলেছে সুলেখা। সেই হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে সুলেখা। লোকটা বলে—না, আমি আপনাকে একলা রেখে পালিয়ে যাব না। মরলে দুজনে একসঙ্গেই মরব।

—বেশ ত! সুলেখার হাতটা কেঁপে ওঠে। লোকটার অবশ হাতটাকে আস্তে আস্তে কাছে টানে সুলেখা, যেন মরণবাসরের সঙ্গীকে একটা মধুর উত্তাপের ছোঁয়া দিয়ে অভ্যর্থনা করতে চায় সুলেখা।

কিন্তু মরণগুহার বুকটাই ঝনঝন করে বেজে ওঠে। ঘণ্টা বাজছে। হু হু করে হাওয়া ঢুকছে। আর টর্চের আলো যেন ঝাঁক বেঁধে দৌড়াদৌড়ি শুরু করেছে।

উপরের রাবিশের স্তূপ সরিয়ে ভিতরে নেমেছে রেস্ক্যু-পার্টি। ভলাণ্টিয়ার আর পুলিশ আর স্কাউট।

একটা স্ট্রেচারও ছুটতে ছুটতে সুলেখার চোখের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়।—চলে আইয়ে। হাঁক দেয় ভলাণ্টিয়ার।

বেগুসরাই ক্যাম্পে হাসপাতালের বেডের উপর শুয়ে যখন ভাল করে চোখ মেলে তাকাবার মতো চোখের জোর পায় সুলেখা, তখন কোলের কাছে ঘুমন্ত বেবির মুখের দিকে

তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে যায়। সুলেখার সেই বেবি নয় কিন্তু মানুষেরই বেবি! বেশ গোলগাল নরম-নরম আর বেশ কালো একটা চার মাসের মানুষ।

অনেকক্ষণ ধরে ভেজা চোখ নিয়ে আনমনার মতো বাইরের মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে সুলেখা। তারপর বাচ্চাটাকে বুকের ওপর তুলে নিয়ে দোলা দিয়ে ঘুম পাড়াতে থাকে।

--কি হলো? ঘুমিয়ে পড়লে নাকি সুলেখা? সুলেখার কপালে হাত রেখে ডাক দেয় দেবেশ।

--অ্যাঁ? তুমি কোথায়? চমকে ওঠে সুলেখা। সুলেখার বুকের ভিতর যেন অদ্ভুত এক দানবিক মায়ার স্মৃতি চমকে উঠেছে। যেন এক পরম নিবিড় অন্ধকারের সংসারে একটা প্রীতিময় হাত কাছে টেনে নিতে চায় সুলেখা।

দেবেশের হাতটাকে আস্তে আস্তে কাছে টেনে নেয় সুলেখা।

অনাত্মিক

এক যে আছে একানড়ে...।

এই একানড়ে কিন্তু তালগাছে চড়ে থাকে না। তাঁর দাঁত দুটো মূলোর মতো নয়। পিঠখানাও কুলোর মতো নয়। ইনি একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, চমৎকার চেহারা, গায়ের রঙ ধবধবে ফরসা, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।

কোমরে বিচলির দড়ি ; বেড়ায় লোকের বাড়ি বাড়ি। না, এই একানড়ের কোমরে ওরকমের কোন বিদ্‌ঘুটে জঞ্জাল কেউ কখনও দেখতে পায়নি। বরং মাঝে মাঝে দেখা যায়, বিশেষ করে শীতকালের দুপুরে কিংবা বিকেলে, একটি বাদামী রঙের আলোয়ান কোমরে জড়িয়ে বাড়ি ফিরছেন এই একানড়ে। অফিস থেকে সোজা বাড়ি। মাঝপথে কোথাও থামেন না, আশেপাশের কোন বাড়ির দিকে তাকান না। লোকের বাড়ি-বাড়ি বেড়াবার জন্যে এই একানড়ের মনে কোন সাধের তাগিদ নেই।

সুকিয়া স্ট্রীটের এক গলির একটি বাড়িতে অনন্ত মিত্তির নামে এক ভদ্রলোক থাকেন। তাঁরই বিশেষ একটি দুর্নাম বা সুনাম এই যে, তিনি একটি অদ্ভুত একানড়ে।

অনন্ত মিত্তির নামে এই ভদ্রলোক একলা থাকতে ভালবাসেন। পাড়ার কোন উৎসবের ধারে-কাছেও আসেন না। ছেলেদের ক্লাবের কোন অনুষ্ঠানে তাঁকে পাওয়া যায় না। অনুষ্ঠানের জন্য চাঁদা দিতেও তাঁর বেশ আপত্তি দেখা যায়। যদিই বা, অর্থাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও দু' একটা টাকা চাঁদা কখনও দিয়েছেন, তবে বেশ গম্ভীর হয়ে আর মুখ ফিরিয়ে রেখে সেই চাঁদার টাকা জানালা দিয়ে বাইরে ছেলেদের হাতে ফেলে দিয়েই ঘরের ভিতরে সরে গিয়েছেন। রসিদ নেবার জন্যে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকেননি। রসিদ নেবার জন্য কোন আগ্রহও তাঁর নেই।

রসিদের কাগজটা জানালার ফাঁকে রেখে দিয়ে ছেলেরা চলে যায়। অনেকক্ষণ পরে, অনন্তবাবু নিজেই এসে সেই রসিদের কাগজটাকে টোকা মেরে জানালার বাইরে ফেলে দেন। কাগজটা যেন বাইরের পৃথিবীতে যত ঝঞ্ঝাটের সঙ্গে অনন্ত মিত্তিরের একলা সুখী জীবনটাকে একটা সম্পর্কের বন্ধন দিয়ে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। একটুও পছন্দ করেন না অনন্ত মিত্তির। ক্লাবের ছেলেরাও অনন্তবাবুর এই নির্লিপ্ততা একটুও পছন্দ করেন না। ছেলেরাই ঠাট্টা করে কথাটাকে রটিয়েছে—একানড়ে।

গলির একুশ নম্বর বাড়ির বাসিন্দা অনন্ত মিত্তির বাইশ বছর ধরে এই বাড়ির ভাড়াটে হয়ে দিন কাটিয়েছেন। পাড়ার জীবনে মাঝে মাঝে মেলামেশার আলোড়ন জাগে। কোন বাড়িতে বিয়ে, কোন বাড়িতে শ্রাদ্ধ। অনন্তবাবুও নিমন্ত্রণ পেয়ে থাকেন। টালিগঞ্জের মানুষও ঝড়-বৃষ্টি বাধা উপেক্ষা করে নিমন্ত্রণের প্রীতিভোজে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু পাড়ার মানুষ অনন্তবাবু আসেননি। সকলেই জানেন, হঠাৎ অসুস্থতা নয়, কোন জরুরী কাজের চাপও নয়, অনন্তবাবু ইচ্ছে করেই আসেননি।

কিন্তু দেখতে পাওয়া গিয়েছে, অনন্তবাবুর স্ত্রী রেণুকা, আর মেয়ে শুভা, দুজনেই এসেছে। একুশ নম্বর বাড়ির এই দুটি মানুষ কোন নিমন্ত্রণের আহ্বান তুচ্ছ করে না। কিন্তু একথাও কারও জানতে বাকি নেই যে, অনন্তবাবু তার স্ত্রী ও মেয়ের এই সব সামাজিকতার হৈ-চৈ একটুও পছন্দ করেন না। জানতে কোন অসুবিধে ছিল না ; কারণ রেণুকা নিজেই উৎসবের বাড়ির মেয়েমহলের জিজ্ঞাসার দাবি শান্ত করতে গিয়ে স্পষ্ট করে বলেই ফেলেছেন, আসতে কেন দেরি হলো।—আসতে কি দেয়? শেষে একরকম ঝগড়া করেই চলে এসেছি।

তবে আর জানতে ও বুঝতে কিসের অসুবিধে আছে? অনন্তবাবু চান, তাঁর স্ত্রী আর মেয়েও একানড়ে হয়ে, এই পাড়ার মধ্যে ভিন্নতর একটি একলা-জগৎ সৃষ্টি করে দিনগুলি

কাটিয়ে দিক।

অনন্ত মিত্তিরের এই বাড়ি, এই একুশ নম্বর, এই ভাড়া-বাড়ির ঘর বলতে একটি মাত্র ঘর। ঘরটি অবশ্য ক্ষুদ্র নয় ; ঘরের বারান্দাও দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বেশ বড়। তবু শুধু একটি চেয়ার।

ক্লাবের ছেলেরাও বুঝে নিয়েছে, বাইরের মানুষ এখানে এসে যেন দশটা মিনিটও বসে থাকবার মতো কোন ঠাঁই না পায়, সেই জন্যেই একানড়ে অনন্ত মিত্তির সাবধান হয়ে এই একটি মাত্র চেয়ার রেখেছেন। যদি হঠাৎ বাইরের দু'জন ভদ্রলোক অনন্তবাবুর এই বাড়ির বারান্দায় এসে দাঁড়ান, তবে তাঁরা বসবেন কোথায়? এরকমের কোন প্রশ্ন অনন্তবাবুর মনে নেই। অনন্তবাবু চান না যে, বাইরের মানুষ হঠাৎ এসে একটা ভাল কথার ছুতো করে তাঁর বাড়িতে ভিড় করে। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে তিনি ওই একলা চেয়ারটির উপর চুপ করে বসে থাকতে আর ভাবতে ভালবাসেন।

পাড়ার আশপাশের বাড়ির বয়স্ক ভদ্রলোকেরা ঠাট্টা করে অন্য একটা কথা বলেন--স্বামী একলানন্দ। অনন্তবাবু সম্পন্ন অবস্থার মানুষ নন। দেশী মার্চেন্ট অফিসের কনিষ্ঠ পদের কেরানী ; কত টাকাই বা মাইনে পান? কিন্তু মনে হয়, যা পান তাতেই তিনি প্রসন্ন। এই বাইশ বছরের মধ্যে পাড়ার কোন মানুষের কাছে তিনি কখনও টাকা ধার চেয়েছেন এমন ঘটনার কথা কেউ কখনও শোনেনি। অনন্ত মিত্তির কাউকে কখনো একটি পয়সা ধার দিয়েছেন বলেও কেউ শোনেনি। ভদ্রলোক কারও উপকার নেন না ; কারও উপকার করেন না। সত্যিই মনে-প্রাণে বিশুদ্ধ একটি একলানন্দ।

এক-একদিন সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে বাড়িতে এসেই শুনতে পেয়েছেন অনন্তবাবু, ঘরের ভিতরে অনেক মানুষের কলরব।

কে ওরা? কেনই বা ওরা আসে আর এরকম একটা উৎপাত বাধিয়ে সন্ধে পর্যন্ত ঘরের ভিতরে বসে থাকে। বেশ বিরক্ত হয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে বারান্দার সেই একলা চেয়াটির উপর বসে থাকেন অনন্তবাবু।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে অনন্তবাবুর মেয়ে শুভা--একটু জিরিয়ে নাও বাবা, তারপর চা খেও।

—তার মানে এই যে, আমার চা পেতে এখন বেশ দেরি হবে? অনন্তবাবুর কথার মধ্যে আর গলার স্বরে আন্তরিক বিরক্তিটা আরও তীব্র হয়ে বেজে ওঠে।

শুভা বলে—হ্যাঁ, একটু দেরী হবে।

--কেন?

—পেয়ালা নেই।

--তার মানে?

--তার মানে, কমলা মাসিমাকে চা দেওয়া হয়েছে।

অনন্তবাবুর এই সংসারে যে একটি মাত্র চায়ের পেয়ালা আছে, সে পেয়ালা এখন অভ্যাগতা কমলা মাসিমার হাতের কাছে রয়েছে। সুতরাং অনন্তবাবুর চা পেতে একটু দেরি হবে বইকি!

শুভার চা খাওয়া অভ্যেস নেই। শুভার মা রেণুকা অবিশ্যি চা খান। কিন্তু অসুবিধে নেই। সে জন্যে দ্বিতীয় একটি পেয়ালার দরকার হয় না। অনন্তবাবু চা খাওয়া সারা হলে পেয়ালাটা যখন মুক্তি পায়, তখন রেণুকা সেই পেয়ালাতে নিজের চা ঢেলে নেন। কোন সমস্যা নেই।

এখনও বাইরের যাঁরা ঘরের ভিতরে বসে আছেন আর গল্প গুঞ্জন ও হাসাহাসির উৎপাত সৃষ্টি করছেন তাঁদের মধ্যে শুধু নরহরিবাবুর স্ত্রী কমলার চা খাওয়ার অভ্যেস আছে। সুমতির মা, মনোজের কাকিমা আর জয়া কাজল শান্তি ওরা কেউই চা খায় না। ওরা এই কথা বলেছে বলেই অনন্তবাবুর স্ত্রী রেণুকা বিশ্বাস করেছেন যে, সত্যিই ওরা চা খায় না। কিন্তু ভুল

বিশ্বাস। ওরা জানে, একলানন্দ অনন্তবাবুর বাড়িতে একটি ছাড়া দুটি পেয়ালা নেই। বেচারা রেণুকা মাসিমা অসুবিধেয় পড়বেন, অপ্রস্তুত হবেন, এক-এক করে একটি পেয়ালাতে এতগুলি মানুষকে চা খাওয়াতে গিয়ে হয়রান হবেন, তাই ওরা আগেই মিথ্যে কথা বলে সমস্যাটাকে মিথ্যে করে দিয়েছে।

অনন্তবাবুর বিরক্তির সঙ্গে একটা দুশ্চিন্তার ভাবও আছে। ওরা চা নাই বা খেল, কিন্তু খাবার কি খায়নি? রেণুকা কি অন্তত একটি টাকার সিঙ্গাড়া আনিয়ে ফেলেনি? অনন্তবাবুর এই দুশ্চিন্তার সবই বর্ণে বর্ণে সত্য।

শুভাও বলে--আর সবাই শুধু খাবার খাচ্ছে ; চা খাবে না।

অনন্তবাবু--কী খাবার?

শুভা--সিঙ্গাড়া আর সন্দেশ।

অনন্তবাবু--কত টাকার?

শুভা—দু' টাকা।

অনন্তবাবু--বেশ! চমৎকার!

দুটি টাকা ক্ষয় করিয়ে দিয়ে এই উৎপাত বড় জোর আর পাঁচ মিনিট পরেই সরে যাবে। যাই হোক, একটা বিরক্তির ব্যাপার হলেও, দুঃসহ রকমের কোন ভয়ের ব্যাপার নয়। চা খাওয়া এবং তারপর আরও একটি ঘণ্টা চুপ করে বসে থাকবার পর প্রসন্ন হতে পারবেন অনন্তবাবু। এ ধরনের উৎপাত অনন্তবাবু জীবনের বড়রকমের কোন ভয় নয়। রেণুকাকে শুধু একটু বুঝিয়ে বললেই হবে--একটু হাত টান করে চলতে শেখ। ভুলে যেও না যে, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে ; সে জন্যে অন্তত আটটি হাজার টাকার জোগাড় রাখতে হবে।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বাইরের দরজার দিকে তাকিয়ে থাকেন অনন্তবাবু। দরজার কাছে যেন কোন আগন্তুকের পায়ের শব্দ বেজে উঠেছে। তবে কি সেই উৎপাতটা আবার এসেছে? সেই দুঃসহ উৎপাত? অনন্তবাবুর এই একলা জগতের ভিতর ভয়ানক একটা অনধিকার প্রবেশ।—না, সেই উৎপাতটা নয়! লেংড়া আমের ঝুড়ি মাথায় করে একটা ফেরিওয়ালা এসেছে।

—না, আম চাই না। ফেরিওয়ালাকে হাঁকিয়ে দিয়ে অনন্ত মিত্তির আবার তাঁর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় ভাবনার মধ্যে একলা হয়ে বসে থাকেন।

মেয়ের বিয়ের জন্যে আটটি হাজার টাকার সঞ্চয় এখন প্রায় পূর্ণ হয়ে এসেছে। কাজেই, অনন্তবাবু যেমন একটু নিরুদ্বিগ্ন হয়েছেন, তেমনই একটু বেশি সাবধানও হয়েছেন। এই সঞ্চয়ের উপর যেন কোন আঘাত না পড়ে। সংসারের খরচের টাকা আগে রেণুকার বাক্সে থাকতো। কিন্তু রেণুকার স্বভাবের একটি গোপন সত্য একদিন হঠাৎ জানতে পেরে সাবধান হয়ে গিয়েছেন অনন্তবাবু। সুমতির বিয়েতে বারো টাকা খরচ করে একটি ধনেখালি শাড়ি আশীর্বাদী দিয়েছিলেন রেণুকা। অনন্তবাবুকে না জানিয়ে, দত্তবাবুর ছেলে নৃপেনকে দিয়ে এই শাড়ি কিনিয়েছিলেন রেণুকা।

জানতে পেরে সেই যে সাবধান হয়ে গেলেন অনন্তবাবু, তারপর থেকে রেণুকার হাতের নাগালে পাঁচ টাকার বেশি একটি টাকাও আর রাখতে দিতে পারেননি।

কলেজে পড়ছে শুভা। শুভার বড়মামা জানিয়েছেন, ভাল পাত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু অন্তত আটটি হাজার টাকা খরচ করতে হবে। তা না হলে এখানে শুভার বিয়ে সম্ভব হবে না। নগদ বরপণের দাবি নেই কিন্তু বড় ঘরের সঙ্গে কাজ করতে হলে দানসামগ্রীর কিছু বড়ত্ব চাই। মেয়েকে অন্তত ত্রিশ ভরি সোনার অলঙ্কারে সাজিয়ে দিতে হবে। বরযাত্রীর সংখ্যাও কম করে একশো জন হবে। কাজেই...।

অনন্তবাবু জবাব দিয়েছেন, রাজি আছি। পাত্র দেখতে শুনতে ভাল, পাত্র বেশ বিদ্বান, রোজগার ভাল, কলকাতাতে তিনতলা বাড়ি আছে। সুখে থাকবে শুভা। অনন্তবাবু আপত্তি

করবেন কেন?

আপত্তি দূরে থাকুক, এটাই যে অনন্তবাবুর জীবনের একমাত্র কামনার ধ্যান। যাঁরা অনন্ত মিত্তিরকে একলানন্দ বলেন কিংবা একানড়ে বলে ঠাট্টা করেন, তাঁরাও জানেন যে, ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের কোন সুখের বা সাধের আবদারের কাছে কিন্তু একটুও কৃপণ নন।

রবিবারের সকালবেলাতে বন্ধু শুভার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জয়া নিজের চোখে যে দৃশ্য দেখেছে, তাতে জয়ার দু'চোখে অদ্ভুত এক বিস্ময়ও চমকে উঠেছে। বারান্দার এক কিনারায় বসে অনন্ত মিত্তির ব্যস্তভাবে দু'হাতে চালিয়ে তাঁর মেয়ের জুতো পালিশ করছেন।

বাপের আদুরে মেয়ে কতই তো দেখা যায়। আর আদুরে মেয়ের বাপও তো কতই আছে। কিন্তু অনন্ত মিত্তির যেসব কাণ্ড করেন, তার তুলনা নেই বললেই চলে। শুভা চেঁচিয়ে আপত্তি করে, রাগারাগি বকাবকিও করে, কিন্তু অনন্তবাবু যেন কিছুই শুনতে পান না। জ্বরের শরীর নিয়ে বিছানার উপর চুপ করে বসে শুভার শাড়ির ছেঁড়া আঁচল সেলাই করেন।

শুভা কোন দাবি করে না, তবু শুভার জন্য বাজার থেকে হালফ্যাশনের দামী শাড়ি কিনে আনেন অনন্তবাবু। যখনই শুভাকে দেখতে রোগা-রোগা মনে হবে, তখনই পাঁচ-সাত টাকা খরচ করে পুষ্টির মল্ট কিনে ফেলবেন। মাঝে মাঝে অফিসের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে, আর বড়বাবুর কাছ থেকে বাড়ি যাবার অনুমতি নিয়ে, সোজা মেয়ে-কলেজের ফটকের কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকবেন। বৈশাখ মাসের দিন, তাই অফিসের কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও অনন্তবাবুর মনে একটা সন্দেহের প্রশ্ন ছটফট করে উঠেছে, মেয়েটা বোধহয় ছাতা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছে।

ছুটির পর ফটকের বাইরে এসেই দেখতে পায় শুভা, বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। শুভাকে দেখতে পেয়েই এগিয়ে এসে শুভার মাথার উপর ছাতা ধরেন অনন্তবাবু। শুভা লজ্জা পেয়ে ছটফটিয়ে ওঠে—কী করছো বাবা! আমাকেও বাবলু মনে করলে নাকি? জয়া কাজল আর শান্তি একটু দূরে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসতে থাকে।

মেয়ের বিয়ে হবে ; যেদিন থেকে এ কথা শুনেছেন রেণুকা, সেদিন থেকেই তাঁর চোখ দুটো যখন-তখন ছলছল করে। মাঝে মাঝে ঘরের ভিতরে একলা বসে বিড়বিড়ও করেন, নিজের কথা ভাবছি না—ভাবছি, এই মানুষটার কী দশা হবে?

রেণুকার বাতের ব্যথা আজকাল আরও দুঃসহ হয়ে উঠেছে। তার উপর হার্টের অবস্থাও ভাল নয়। মাঝে মাঝে এমনও হয় যে কাজের মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন, জোরে জোরে শ্বাস টানেন ; তারপর আর দাঁড়িয়ে থাকবারও সামর্থ্য থাকে না। শুয়ে পড়েন। অনন্তবাবু অফিস থেকে ফিরে এলে রেণুকা আর নিজের হাতে এক পেয়ালা চা তৈরি করে দিতেও পারেন না।

কিন্তু শুভা আছে। অনন্তবাবুর প্রত্যেকটি দরকারের আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য মেয়ে যেন কান পেতে আছে। অনন্তবাবু যদি ডাক না দেন তাতেই বা কি আসে যায়? শুভা ঠিক সময়েই কাছে এসে দাঁড়াবে, বাজারের ঝোলাটি অনন্তবাবুর হাতের কাছে এগিয়ে দেবে। এই যে একটানা তিন বছর ধরে উলের জামাটা গায়ে দিচ্ছেন অনন্তবাবু, সেটা শুভারই হাতের কাজ। অনন্তবাবু জানেন না, পাঁচদিনের মধ্যে এই জামাটি বুনেছিল শুভা। তা ছাড়া উপায় ছিল না। ধারণা করতে পারেনি শুভা, নভেম্বর মাসটা শেষ না হতেই শীতের মেজাজ এত প্রখর হয়ে উঠবে।

মাঝরাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে পুরো দুটি গেলাস জল খাওয়া অনন্তবাবুর অভ্যেস। কিন্তু সেজন্যে অনন্তবাবুকে কোন সমস্যায় পড়তে হয় না। শুভা যেন ওর ঘুমের নিয়মটাকেও চেষ্টা করে গড়ে নিয়েছে। ঠিক মাঝরাতে শুভা উঠে এসে অনন্তবাবুর বিছানার কাছে দাঁড়ায়। অনন্তবাবুর নিবিড় ঘুমের স্বপ্নটাও যেন একটা স্নিগ্ধ স্পর্শের স্বাদ পেয়ে চমকে ওঠে। কারণ,

অনন্তবাবুর কপালে হাত রেখে ডাক দেয় শুভা--বাবা, জল খাও!

রেণুকা বলে--আমাকে তো ভগবান যত রোগজ্বালা দিয়ে আধমরা করে রেখেছেন। এই মানুষটার জন্যে আমি কতটুকু আর করতে পারি! যা করে মেয়েই করে। হাত মোছার তোয়ালেটিও মেয়েই বাপের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু এই মেয়ে যখন পরের বাড়ি চলে যাবে, তখন বাপের দশা কী হবে?

কিন্তু অনন্তবাবুর আসন্ন ভবিষ্যতের দুঃখের ছবিটা কল্পনা করে শুধু রেণুকাই যত আক্ষেপ করেন। অনন্তবাবুর চোখের চাহনিতে, মুখের ভাষায়, কিংবা চিন্তার মধ্যে কোন আক্ষেপ নেই। বরং দেখা যায়, মেয়ের সুখের জীবনের রূপটাকেই কল্পনা করে করে অনন্তবাবু যেন তাঁর মন-প্রাণ বিচিত্র এক তৃপ্তি দিয়ে ভরে রেখেছেন। খবর পেয়েছেন অনন্তবাবু, শুভার ভাবী শ্বশুর জগৎবাবু নতুন গাড়ি কিনেছেন। জগৎবাবু নাকি বলেছেন, প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটি দিন শুভাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে যাবেন। মন্দিরের আরতি দেখে, আব ঘাটের সিঁড়িতে বসে গঙ্গার হাওয়া খেয়ে নিয়ে তারপর বাড়ি ফিরবেন।

এ তো নিতান্ত কল্পনার ছবি নয়, এ যে অনন্তবাবুর জীবনের এক সফল স্বপ্নের ছবি। লোকে না বুঝুক, রেণুকা কেন না বুঝবে, মেয়েকে ভাল ঘরে দেবার জন্যেই তো এই মানুষটা তার সারাজীবনের কেরানীগিরির সামান্য উপার্জনের উপর কঠোরভাবে খবরদারী করে কিছু টাকা জমাতে চেয়েছিল। নিজের গায়ের গরম জামার জন্যে উল কিনতে কি সহজে রাজি হয়েছিল এই মানুষ? শুভা রাগ করে বাপের সঙ্গে কথা বন্ধ করেছিল বলেই শেষে বাধ্য হয়ে সেই উল কিনেছিলেন বাপ।

রেণুকাকে মাঝে মাঝে বেশ কঠিন একটা খোঁচা মেশানো কথার আঘাত পেতে হয়। মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে কি যেন ভাবেন অনন্তবাবু, তারপরেই চেঁচিয়ে ওঠেন--তোমার দশা তো স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি। আমার মতো মানুষের সঙ্গে তোমার বিয়ে না হওয়াই ভাল ছিল। খুব ভুল করেছ তুমি।

রেণুকা--আমি ভুল করিনি।

অনন্তবাবু--জানি, তোমার বাবাই ভুল করেছিলেন। একই কথা। কিন্তু তোমার মেয়ের বাবা আর ভুল করবে না। খেয়েপরে সুখে থাকবে, এমন ঘর না পেলে মেয়ের বিয়ে দেব না।

ভাল ঘর পেতে হলে ভাল খরচ করতে হবে, এই সার সত্যটিকে খুব ভাল করে বুঝে নিয়েছিলেন অনন্তবাবু। স্মরণ করতেও ভুলে যাননি যে, রেণুকার বাবার পক্ষে টাকা খরচের সামর্থ্য ছিল না বলেই অনন্ত মিত্রের মতো পাত্রের হাতে মেয়েকে সঁপে দিয়েছিলেন। কাজেই, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অনন্তবাবুর চোখে-মুখে অদ্ভুত একটা গর্বের গম্ভীরতা থমথম করে।

মেয়ের বিয়ের কথা মনে করতে গিয়ে মায়ের চোখ ভিজে যায় ; বাপের শুকনো চোখ কিন্তু খটখট করে। মেয়ের মা যেমন আগে তেমনি আজও বিশ্বাস করেন, মেয়ের বাপ এই ভদ্রলোকর মনটা সত্যিই লোহা দিয়ে বাঁধানো একটা কঠিন মন। যে মেয়ে এই বাপের কাছে একটি সর্বক্ষণের মায়ার পুতুল, সে মেয়েকে পরের ঘরে পাঠিয়ে শূন্য হয়ে যেতে হবে, সেজন্যে মনের কোণে একটু ব্যথা বেজে ওঠে না। কোনদিনও দেখা গেল না যে, ভদ্রলোকের চোখ দুটো একটু স্যাঁতসেঁতে হয়েছে।

অনন্তবাবু বরং সেই শুকনো চোখের চাহনি তীব্র করে নিয়ে আরও ভয়ানক একটা খোঁচা-মেশানো কথা রেণুকাকে শুনিয়ে দিয়েছেন।--আমি কাঁদবো কেন? কাঁদবে তুমি, কারণ ভয় তোমার।

--কিসের ভয়?

--শুভা চলে গেলে তোমার বাতের শরীরের খাটুনি আরও বাড়বে, এই ভয়।

--এমন কথা তুমি মুখে আনতে পারলে?

--যা দেখছি তাই বলছি।

--কি দেখছো?

--ওই যে বসন্তদার মেয়েটা এলেই তুমি যেন হাতে স্বর্গ পাও।

হ্যাঁ, বসন্তদার মেয়ে চারু। আজ এক বছর ধরে এই মেয়েটাই অনন্ত মিত্রের জীবনের একটা দুঃসহ উৎপাত, একটা আতঙ্ক হয়ে উঠেছে। অথচ দেখতে পাওয়া যায়, রেণুকা এই মেয়েটাকে বেশ সহ্য করতে পারছেন। মেয়েটা যখন এ বাড়িতে আসে আর দু'চারদিন থাকে, তখন রেণুকার জীবনটা যেন চমৎকার এক প্রিভিলেজ লীভের আনন্দে একেবারে অলস হয়ে যায়। রান্না থেকে শুরু করে দু'বেলা বারান্দা ধোওয়া পর্যন্ত সব কাজ এই মেয়েই করে। এমন কি শুভাকেও চুপ করিয়ে বসিয়ে রাখে চারু, কোন কাজ করতে দেয় না।

সে-সময় এই বাড়ির একলাসুখী আর আপনমুখী জীবনের নিয়ম-টিয়ম সবই কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে যায়। শুভা নয়, ওই চারু মেয়েটাই ব্যস্তভাবে ছুটে এসে বলে--পান নাও কাকা।

অফিসে যাবার সময় চাদরটি কাঁধে ফেলে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন অনন্তবাবু, খুবই তিক্ত ও অপ্রসন্ন ও বিরক্ত মুখ। একটা পান মুখে দেবার ইচ্ছা থাকলেও সেকথা মুখ খুলে বলতে ইচ্ছেও করে না। বললেই তো ওই মেয়েটা তখুনি ব্যস্ত হয়ে পান সাজতে বসে যাবে। রেণুকা খাটের উপর বসে শুধু তাকিয়ে থাকবে, আর শুভা গুণগুণ করে গান গাইবে। অনন্তবাবু একটুও পছন্দ করেন না যে চারু পান হাতে নিয়ে এভাবে ছুটে এসে কাছে দাঁড়ায়।

কে এই বসন্তদা যাঁর মেয়ে চারু? অনন্তবাবুর কাছে বসন্তদা আজ একটা নাম মাত্র। আত্মীয় নন, ঠিক কুটুম্বও বলতে পারা যায় না, সম্পর্কের দিক দিয়ে বসন্তদা যেন একটা ছায়া-কুটুম্ব। শুধু মনে আছে, খুড়তুতো দাদার বিয়েতে প্রায় চল্লিশ বছর আগে বরযাত্রী হয়ে নদীয়া জেলার এক গ্রামে যেতে হয়েছিল। সে গ্রামে তিন দিন থাকা হয়েছিল। আর নতুন বউদির এক মাসতুতো দাদার সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল। তিনিই বসন্তদা। সারা রাত জেগে বসন্তদার সঙ্গে তাস খেলা হয়েছিল। একদিন জাল নিয়ে বসন্তদার সঙ্গে নদীতে মাছ ধরাও হয়েছিল। নৌকার লগি ঠেলেছিলেন বসন্তদা ; অনন্ত শুধু জাল ফেলে ফেলে সের দশেক কালবোশ আর ফলুই তুলেছিল। সেই বসন্তদা বলেছিলেন--আমার বিয়েতে নেমন্তন্নের চিঠি দেব অনন্ত ; আসতে ভুলে যেও না।

একদিন সেই বসন্তদার বিয়ের চিঠি এসেছিল ঠিকই ; কিন্তু বিয়েতে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আজ পুরনো দিনের স্মৃতির মাত্র এটুকু বিবরণ স্মরণ করতে পারেন অনন্ত মিত্র। কিন্তু আর কিছুই জানেন না।

সেই বসন্তদা আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁর বিয়ের নিমন্ত্রণের সেই চিঠির পর কোথায় ছিলেন, কি করতেন আর কতদিন বেঁচে ছিলেন বসন্তদা, কিছুই জানেন না অনন্ত মিত্তির। কোন দিন জানবার দরকারও হয়নি। চেষ্টা করলে বসন্তদার চেহারাটা আজ স্পষ্ট করে কল্পনা করতেও পারবেন না অনন্তবাবু।

শুভা যে নতুন হ্যাণ্ডিক্রাফট্ শিখেছে, তার জন্য ভাল শোলা চাই। শুভা নিজেই একটা ঠিকানা দিয়েছিল, বরানগরের এক দোকানের ঠিকানা, যেখানে এই শোলা পাওয়া যায়। সেই শোলা কিনতে গিয়েই তো বিপদ হলো।

বরানগরের পথে ছেলেবেলার বন্ধু মাধব সেনের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। মাধব সেন বললেন--আমাদের পাড়াতে তোমার এক বউদি থাকেন ; তিনি প্রাইমারী মেয়ে স্কুলের টিচার।

অনন্তবাবু আশ্চর্য হন--এরকমের কোন বউদি আমার নেই।

--কি আশ্চর্য, উনি যে তোমার নাম করে অনেক কথাই বললেন।

--কি বললেন?

--আমার বাড়ি হেতমপুর শুনে উনি বললেন, ওঁর এক দেবর অনন্ত মিত্তিরও হেতমপুরের মানুষ। তখন বুঝলাম, তুমি ছাড়া হেতমপুরের অনন্ত মিত্তির আর কেই বা হবে?

বিস্ময়ের কথা বটে। তাই মাধব সেনের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে বরানগরের বস্তিগোছের একটা পাড়ার একটি ঘরের দরজার কাছে এসে যাঁকে দেখতে পেলেন ও যাঁর পরিচয় পেলেন অনন্তবাবু, তিনি হলেন বসন্তদার বিধবা স্ত্রী। তিনি বললেন--আমি আপনাদেরই মঙ্গলা বউঠান।

ইচ্ছা ছিল না, তবু বাড়ির ঠিকানা জানিয়ে দিলেন অনন্তবাবু। মনের দিক থেকে কোন তাগিদ নেই, তবু মুখের কথায় মঙ্গলা বউঠানকে অনুরোধ করলেন--সময় করে আমাদের ওখানে যাবেন একদিন।

মঙ্গলা বউঠান ঘরের ভিতরের দিকে তাকিয়ে আর চেঁচিয়ে ডাক দিলেন--চারু এদিকে আয় ; কাকাকে প্রণাম কর।

চারু আসে, অনন্তবাবুকে প্রণামও করে। এর পর হয়তো আরও দু'এক মিনিট থাকতেন অনন্তবাবু ; কিন্তু আর থাকতে পারলেন না। কারণ, হঠাৎ যে-কথা বলে উঠলেন মঙ্গলা বউঠান, তারপর আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা অনন্তবাবুর পক্ষে সম্ভব নয়।

মঙ্গলা বউঠান বললেন--এমন কাকা যখন মাথার উপর আছেন, তখন তোর কোন ভাবনা নেই চারু।--তখুনি একটা দৌড় দিয়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল অনন্তবাবুর। কিন্তু সামলে গিয়েছিলেন।

বয়স কুড়ি-একুশের কম নয়, দেখতেও ভাল, চারুর মুখের দিকে চোখ পড়তেই ভয় পেয়েছিলেন অনন্তবাবু। কোথাকার কোন এক বসন্তদা, যিনি আজ ভবপারে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন, তাঁরই মেয়ে এই চারু কেন যে বিধবা মায়ের জীবনের দুশ্চিন্তা হয়ে উঠেছে, সেটা কি বুঝতে একটুও দেরি হবার কথা? চারুর বিয়ে হয়নি। আর এই মঙ্গলা বউঠানও কী সাংঘাতিক মতলবের মানুষ। এক কথায় পথের একটা মানুষকে মেয়ের কাকা বানিয়ে, সেই মেয়ের জন্যে সব ভাবনার দায় কাকার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছেন।

শুধু ভয় নয়, বিরক্তিও নয়, বেশ একটু ঘৃণাও বোধ করেছিলেন অনন্তবাবু। আর, কোন কথা না বলে চলেও এসেছিলেন।

কিন্তু পালাবার পথ নেই, মঙ্গলা বউঠান আছে পিছে। এই মঙ্গলা বউঠান নিজেই চারুকে সঙ্গে নিয়ে অনন্তবাবুর এই বাড়িতে কয়েকবার এসেছেন আর চলে গিয়েছেন। একদিন রেণুকার হার্টের কষ্ট দেখে নিজেই একটা ব্যবস্থা করে গেলেন মঙ্গলা বউঠান।--চারু ক'টা দিন এখানেই থাকুক। ঘরের সব কাজ চারুই করবে। তুমি একটুও ভেব না রেণু।

সত্যি কথা, রেণুকার ইচ্ছা ছিল, চারু ক'টা দিন থাকুক। শুভারও খুব গরজ, চারুদি ক'টা দিন এবাড়িতে থাকুক।

কাজের সাহায্য হবে, হ্যাঁ, এই সুবুদ্ধির ধারণা রেণুকার মনে অবশ্যই ছিল। আর শুভার মনে এই লোভও ছিল, চারুদি থাকলে যখন-তখন চারুদির গান শোনা যাবে। চারুদির গলা বড় মিষ্টি। চারুদি চমৎকার করে খোঁপা বাঁধবার আর্ট জানে।

এই এক বছরের মধ্যে এই চারু এই বাড়িতে অন্তত দশবার এসেছে। কোন দিনও চিঠি দিয়ে চারুকে কখনও আসতে বলা হয়নি ; মেয়েটা নিজেই এসেছে। অনন্তবাবু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন--কি ব্যাপার?

চারু হাসতে থাকে--মা বললে, একবার গিয়ে দেখে আয়, তোর কাকিমা কেমন আছেন।

অনন্তবাবু--দেখলে তো, বেশ ভালই আছেন।

চারু আবার হাসে—না কাকা, কাকিমার হাঁটুতে একটা ব্যথা কনকন করছে, ভাল করে হাঁটতে পারছেন না।

—তা তুমি আর কি করবে?

—আমি দুটো দিন থেকে যাই কাকা। শুভারও পরীক্ষার সময়। একা কাকিমা এই হাঁটুর ব্যথা নিয়ে ঘরের কাজ সামলাবেন কি করে?

রেণুকা বুঝতে পারে না, শুভার তো বুঝবার মতো বুদ্ধিই হয়নি যে, মঙ্গলা বউঠান নামে এক মতলবের মহিলা কী ভয়ানক চাল চেলেছেন। কোথাকার কোন এক বসন্তদা, তাঁর মেয়ের কাছ থেকে অনন্তবাবুর সংসার উপকার নিতে গিয়ে কোন বিপদে জড়িয়ে পড়ছে, সেটা অনুমান করতে পারেন অনন্তবাবু। এইবার একদিন হঠাৎ এখানে এসে মঙ্গলা বউঠান যখন দাবি করবেন, আমার মেয়ের বিয়ের খরচ দিন, তখন কী হবে?

অনন্তবাবু বলেন—তুমি কেন মিছিমিছি বার বার ছুটে আস চারু; আমাদের সুবিধে-অসুবিধে আমরাই বুঝবো। মঙ্গলা বউঠান তোমাকে এখানে যখন-তখন পাঠিয়ে দিয়ে বড়ই অন্যায় করেন।

চারু হাসে—আমিও তো তাই বলি। কিন্তু আমাকে উল্টে ধমকে দিয়ে মা বললে, আপনজনের দরকারের কাজে নিজেই গরজ করে যেতে হয়। পর তো নয় যে চিঠি দিয়ে ডাকবে।

এসব কথার উত্তর দেওয়া অনন্তবাবুর পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু বুঝতে পারেন, খুবই কঠিন এক বুদ্ধির চক্রান্ত অনন্তবাবুর জীবনের এই সঞ্চয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছে।

চারুর সঙ্গে খুব কম কথা বলেন অনন্তবাবু। চারু যখন এবাড়িতে থাকে, আর ঘুরঘুর করে সর্বক্ষণ কাজ করে, তখন সে দৃশ্য দেখতে একটুও ভাল লাগে না। মাঝরাতে যখন ঘুম ভেঙে যায়, জল খাওয়ার জন্য বিছানার ওপর উঠে বসেন তখন ব্যস্ত হয়ে কঠিন একটা ছায়া কাছে এসে কথা বলে—জল খাবে কাকা?

শুভা নয়, চারু এসেছে। অনন্তবাবুর পিপাসাটাও যেন বিরক্ত হয়ে ওঠে। জল খাওয়ার স্পৃহাও নষ্ট হয়ে যায়।

কিন্তু চারু জল নিয়ে আসে। অনন্তবাবুও জল খান।

চারু যে-ক'টা দিন এখানে থাকে তখন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এসেই দেখতে পান অনন্তবাবু, ঘরের চেহারা ঝকঝক করছে। আর, বসন্তদার মেয়ে এই চারু উনানে চায়ের জল চাপিয়ে দিয়ে বসে আছে।

—কাকিমা কোথায়?

—সুমতি মাসিমার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছেন।

—তোমার কাকিমার না হার্টের কষ্ট বেড়েছে?

চারু হাসে—এবেলা ভাল আছেন।

—শুভা কোথায়?

—জয়া এসেছিল, শুভা বোধহয় জয়াদের বাড়িতে গিয়েছে।

অনন্তবাবুর মনের ভিতরে একটা বিদ্রোহ যেন গর্জন করে উঠতে চায়। কী অদ্ভুত কাণ্ড। কোথাকার এক বসন্তদার মেয়ের কাছে এবাড়ির আত্মাটা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছে। তাই মা আর মেয়ে দুজনেই বেড়াতে বের হয়েছেন। জীবনে কারও কাছ থেকে কোন উপকার গ্রহণ করেনি যে মানুষ, সে মানুষকে আজ বসন্তদার মেয়ের হাত থেকে চায়ের পেয়ালা তুলে নিতে হবে। মেয়েটাও অদ্ভুত, উনানের ধোঁয়াতে ছোট রান্নাঘরটা ভরে গিয়েছে; তারই মধ্যে বসে আছে। মেয়েটাকে ভয়ানক এক উপকারের তপস্বিনীর মতো

দেখাচ্ছে।

মঙ্গলা বউঠানের মতলবের কাছে হার মানবেন, তেমন মূর্খতার মানুষ নন অনন্তবাবু। তাঁর মনটাও নরম কাদা দিয়ে তৈরি কোন তুলতুলে পদার্থ নয়। চারুর জীবনের জন্য ভাবনা করবার কোন দায়িত্ব তাঁর নেই। মঙ্গলা বউঠান বুঝে নিন, তাঁর মেয়ের ভাগ্য কী বলে? বিয়ে হবে কি হবে না?

অনন্তবাবুর কথাতে কিংবা আচরণেও কোন ভুল হয়নি, হয়ও না ; হবেও না। বসন্তদার মেয়ে চারুর সঙ্গে ভুলেও একটা হাসির কথা কিংবা মায়ার কথা বলাবলি করেন না অনন্তবাবু। অনন্তবাবু জানেন, মঙ্গলা বউঠান আর তার মেয়ে এই চারু, দুজনেই ধূর্ত দুটি মতলবের প্রাণী, যারা মানুষের মনের কোন দুর্বলতা বা কোমলতার গন্ধ পেলেই পেয়ে বসবে। হয়তো আট হাজার টাকার চার হাজার টাকা এই ছলনার হাতে লুঠ করে নিয়ে সরে পড়বে। কোথাকার কোন বসন্তদার মেয়ে চারুর বিয়ে হয়ে যাবে ; আর নিজের মেয়ে শুভার বড়ঘরে বিয়ের আশাটা ছলনা হয়ে অনন্ত মিত্তিরের সবচেয়ে বড় সুখের স্বপ্নটাকেই ছিন্নভিন্ন করে দেবে!

না, অসম্ভব। অনন্ত মিত্তির পাগল হয়ে গেলেও এমন ভুল করবেন না। এই চমৎকার চতুর কপটতার কাছে ঠকতে পারবেন না।

চারুকে দেখতে যেমন ভাল লাগে না, ভাবতেও তেমনি বেশ ঘৃণা বোধ করেন অনন্তবাবু। রেণুকাকে অনেকবার আড়ালে ডেকে নিয়ে বলে দিতে পেরেছেন অনন্তবাবু—সত্যি কথা এই যে, চারুকে আমার একটুও ভাল লাগে না। আমি চাই না যে, কোন ছুতো করে চারু এখানে বার বার আসে আর থাকে। তোমরাও একটু সাবধান হও।

অনন্তবাবু নিজেই সবচেয়ে বেশি সাবধান হয়েছেন। শুভার বড়মামা যেদিন চিঠি দিলেন, এইবার প্রস্তুত হলে ভাল হয়, সেদিনই জবাব দিয়ে দিলেন অনন্তবাবু—আমি প্রস্তুত।

যাঁর মুখে কোনদিন হাসি দেখতে পায়নি পাড়ার কোন মানুষ, সেই অনন্তবাবুর সারা মুখ জুড়ে অদ্ভুত এক গর্বের তৃপ্তি হেসে ওঠে। পরম নিশ্চিন্ততার হাসিও বটে। এই হাসিটাই যে অনন্তবাবুর ভাগ্যের চরম লাভ। সব বাধা ব্যাঘাত জয় করতে পেরেছেন। মেয়েকে বড়ঘরে বিয়ে দিতে পারবেন! অনন্ত মিত্তির এইবার হাসিমুখ নিয়ে বাকি জীবন পার করে দিতে পারবেন।

২

পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা দেখে আশ্চর্য হয়েছে, একানড়ে অনন্তবাবুর সেই গম্ভীর মুখ আর নেই। অনন্তবাবুর মুখে সব সময় হাসি ফুটে রয়েছে।

শুভার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বড়মামা নিজেই এবাড়িতে এসে বিয়ের সব কাজ চুকিয়ে দিয়েছেন।

পাড়ার মানুষও খুশি হয়ে শুভার বিয়ের প্রীতিভোজ খেয়েছে।

কিন্তু মেয়ের বিয়ের দিনেও একলানন্দ অনন্তবাবুকে পাড়ার ভদ্রলোকেরা দুটো কথা বলবার সুযোগ পেলেন না। তিনি বাড়ির ভিতরেই ছিলেন। বিনা কাজে একাই ঘুরঘুর করছেন, আর বার বার এসে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েছেন।

রেণুকার চোখ তো সকাল থেকেই ছলছল করেছিল। কিন্তু অনন্তবাবুর চোখে হাসি। অদ্ভুত উজ্জ্বল হাসি! সকলেই বলছেন, খুব ভাল ঘরে শুভাকে দিতে পেরেছেন অনন্তবাবু। অনন্তবাবুর প্রাণের গর্ব না হেসে থাকতে পারবে কেন?

বিয়ের দিনে মঙ্গলা বউঠান এসেছিলেন। বিয়ের দিনেই চলে গেলেন। কিন্তু চারু থেকে

গেল। রেণুকা একটা কথা কতবারই না বললো।—চারু না থাকলে আমার এই ভাঙা শরীরের হাড়গোড় কিছুই আর থাকতো না। উঃ, মেয়েটা দিনরাত কী খাটুনিই না খেটেছে।

কথাটা শুনতে পেয়েছেন অনন্তবাবু ; কিন্তু তাঁর মনে কোন বিকার নেই। তিনি শুধু একবার জবাব দিতে গিয়ে রেণুকাকে একটি কথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন—চারুকে কেউ কি দিব্যি দিয়েছিল যে খাটতে হবে?

ভয়ানক এক গোঁয়ার বুদ্ধিহীনের বাজে কথার মতো এই কথাটা রেণুকার কানে লেগেছে। খুব আশ্চর্য হয়েছেন রেণুকা। বুঝতে পারেন না রেণুকা, চারু মেয়েটার সব কাজের মধ্যেই একটা অপরাধ আবিষ্কার করেন কেন এই ভদ্রলোক।

রেণুকা শুধু বলেন—কী অদ্ভুত মানুষ তুমি।

অনন্তবাবু বলেন—আমাকে গালমন্দ করো না। শুধু বিশ্বাস কর, খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছ।

শুভা যেদিন চলে গেল, সেদিন রেণুকার চোখের দিকে তাকাতে গিয়ে সুমতির মা নিজেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন। কে না জানে, মেয়ে বিদায়ের দৃশ্যটা মেয়ে-মহলের চোখে কান্নাভরা করুণতা না জাগিয়ে পারে না।

কিন্তু মেয়ের বাপের চোখ কি এত শুকনো খটখটে হয়, আর এত হাসি নিয়ে ঝকঝক করতে পারে? লোকে জানে, পারে না। কিন্তু অনন্তবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে সকলেই বিরল বিস্ময়ের ব্যাপার দেখতে পেয়েছে, সত্যিই অনন্তবাবু হাসছেন। যেন বিজয়ীর গর্বের হাসি। যেন সারা জীবনের সাধনার সফলতার হাসি। শুভার শ্বশুর নতুন গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। সেই গাড়িতে স্বামীর পাশে বসে চলে গেল শুভা। রেণুকাকে একবার একলা পেয়ে কথাটা বলেও নিলেন অনন্তবাবু।—কাঁদবো কেন? মেয়েকে তো জলে ফেলে দিইনি যে কাঁদতে হবে।

সুকিয়া স্ট্রীটের গলিতে একুশ নম্বর বাড়ির অনন্ত মিত্তিরের জীবনে কোন ব্যথা নেই। শুভার তোয়ালেটার দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠেন রেণুকা ; কিন্তু অনন্তবাবু বারান্দায় পায়চারি করেন আর গুনগুন করে গান করেন।

শুভা নেই ; কিন্তু চারু এখনও আছে। বিয়ের পর পাঁচটা দিন পার হয়ে গিয়েছে, তবু চারু আছে।

কেন আছে চারু? নিজেকে প্রশ্ন করেও কোন উত্তর পান না অনন্তবাবু।

অফিসে যাবার সময় হয়। চারু এসে অনন্তবাবুর হাতের কাছে পানের ডিবে এগিয়ে দেয়। শুভার একটা অভ্যাস ছিল, মাঝে মাঝে মিছরির সরবত তৈরি করে নিয়ে অনন্তবাবুর চায়ের পিপাসাটাকে বাধা দিত।—না, যা গরম পড়েছে, আর চা খেতে পাবে না। সরবত খাও বাবা।

কি আশ্চর্য, কোথাকার কোন এক বসন্তদার মেয়ে এই চারুও বলে—এই গরমে আর চা খেও না কাকা। সরবত খাও।

সরবত খান অনন্তবাবু ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ভুলে যান না, তুমি তো এবার বরানগরে চলে যাবে?

—হ্যাঁ কাকা।

সামান্য একটা কথা ; কিন্তু এই সামান্য কথাটা বলতে গিয়ে চারু যেন মুখ লুকোতে চেষ্টা করে। লজ্জা? কিসের লজ্জা? মঙ্গলা বউঠানের মতো ধুরন্ধরা নারীর মেয়ের মুখে এই লজ্জা একটু মানায় না। পরের বাড়িতে থাকতে যদি কোন লজ্জার বাধা থাকতো, তবে বারবার এখানে এসে ঠাঁই নেবার এত চেষ্টা করতো না।

সেদিন রবিবার ; অনন্তবাবু বাড়িতেই ছিলেন। সারা দুপুর ধরে অনন্তবাবুর কামিজের ছেঁড়াগুলিকে সেলাই করেছে চারু। বিকেল যখন হয়েছে, তখন অনন্তবাবুর হাতের কাছে সরবতের গেলাস এনে ধরেছে চারু। সন্ধ্যা যখন হয়েছে, তখন অনন্তবাবুর বিছানার চাদর

বদলে দিয়েছে চারু।

রাত্রিবেলা সুজির পায়েস খেতে ভালবাসেন অনন্তবাবু। শুভারই কাজ ছিল, সুজির পায়েসটা শুভা নিজের হাতে তৈরি করতো। রেণুকার হাতে সুজির পায়েস ভাল হয় না। অনন্তবাবুর রাতে সুজির পায়েস আজও মিথ্যে হয়ে গেল না, যদিও শুভা নেই। চারু খুব ভাল সুজির পায়েস তৈরি করেছে।

মাঝরাতেও সেই একই ব্যাপার। শুভা নেই, তবু অনন্তবাবুকে জল খাওয়াবার জন্যে একটি মেয়ে ঠিক তাঁর বিছানার কাছে উপস্থিত হয়েছে। চারু নাকি? শুধু মৃদুস্বরে একটা প্রশ্ন করেন অনন্তবাবু। চারু বলে--হ্যাঁ, কাকা।

সকাল হয়েছে। অনন্তবাবু জেগেছেন, তবু শুয়ে আছেন। অনন্তবাবু জানেন, শুভা নেই, আজ আর শুভা চা নিয়ে আসবে না। ঠিক তখনই চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকে চারু।--ওঠো কাকা, মুখ ধুয়ে নিয়ে চা খাও।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে শুধু একটি চুমুক দিয়েছেন অনন্তবাবু, ঠিক তখন চারু আবার ঘরে ঢুকে অনন্তবাবুকে প্রণাম করে--যাই কাকা।

চারুর হাতে একটা ঝোলা। বেশ চমৎকার স্টাইল করে একটা শাড়িকে গায়ে জড়িয়েছে চারু। কি আশ্চর্য! বসন্তদার এই মেয়েকে সত্যিই যে মস্ত বড় এক বড়লোকের মেয়ের মতো দেখাচ্ছে।

এস, সামান্য একটা কথা। কিন্তু বলতে পারলেন না অনন্তবাবু। বলতে ইচ্ছেও নেই। যাও, কথাটা ভাল শোনায় না বলেই বলতে পারলেন না। অনন্তবাবু শুধু বললেন--হুঁ।

চলে গেল চারু।

রেণুকা ঘরে ঢোকেন।--খবরটা বোধহয় জান না?

--কিসের খবর?

--চারু আর এখানে আসতে পারবে না।

--কেন?

--চারুর বিয়ে।

চমকে ওঠেন অনন্তবাবু। রেণুকা বলেন--চারুর মা সেদিন দুঃখ করে অনেক কথা বলে গেলেন।

--কি কথা?

--টাকা-পয়সা না থাকলে যা হয়, তাই হয়েছে। চারুকে খুব গরীবের ঘরে বিয়ে দিতে হচ্ছে। বেশ বয়স্ক ছেলে, দেখতে শুনতে একটুও ভাল নয়, রোজগারও সামান্য। মোট কথা, বেশ অভাবের ঘর। বিয়েতে পাত্রপক্ষের কোন দাবি নেই, এক পয়সাও খরচ নেই; কাজেই রাজি হয়েছেন মঙ্গলা বউঠান।

--এ কি রকমের ব্যাপার হলো? অনন্তবাবুর হাতের পেয়ালা ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে।

--যা হবার ছিল তাই হলো। চারুর জন্যে এর চেয়ে ভাল ঘর পাওয়া যাবেই বা কেমন করে?

বেশ শান্ত সহজ স্বরে কথাটা বলেই পান মুখে দিলেন রেণুকা। কিন্তু অনন্তবাবুর সারা মুখ জুড়ে একটা যন্ত্রণার জ্বালা লালচে হয়ে ফুটে ওঠে। চেঁচিয়ে ওঠেন অনন্তবাবু--ভাবতে পারিনি, মঙ্গলা বউঠান যে এ-রকম সাংঘাতিক একটা মিথ্যুক।

পেয়ালার চা যেন পেয়ালাভরা গরম বিষ। তখনও ধোঁয়া ছড়াচ্ছে বসন্তদার মেয়ে চারুর হাতের তৈরি সেই চা। পেয়ালাটাকে নামিয়ে রেখে দিয়ে কাঁপতে থাকেন অনন্তবাবু।--এ কি হলো? চারু তবে এতদিন ধরে মিছি-মিছি এসব কাণ্ড করলো কেন?

টিপ টিপ করছে অনন্তবাবুর বুকটা! আর মুখটা যেন চাবুকের মার খাওয়া একটা মানুষের

মুখ।—কোথায় চারু? একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ান অনন্তবাবু। জানালার গরাদ শক্ত করে আঁকড়ে ধরেন। বাইরের পথের দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকেন, চলে যাচ্ছে বসন্তদার মেয়ে চারু।

--কি হলো? ডাকবো চারুকে? রেণুকা জিজ্ঞেস করেন।

—আর ডেকে কি হবে? অভিমানী ছেলেমানুষের মতো মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে থাকেন অনন্তবাবু।

চারু চলে যাবার পর দুটি ঘণ্টা পার হয়ে যায়, তবু জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন অনন্তবাবু। রেণুকা এসে কতবার ডাক দিয়ে যান, এদিকে এস, বলো তো আবার চা করে দিই।

কিন্তু শুনতে পেয়ে থাকলেও সাড়া দিতে পারেন না অনন্তবাবু। একলাসুখী জগৎটা যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। আর ভদ্রলোক নিজেও যেন বধির হয়ে গিয়েছেন।

ঠিক সেই সময় রাস্তা দিয়ে সুমতির বাবা আর মা একসঙ্গে অনন্ত মিত্তিরের বাড়ির এই জানালার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চলে গেলেন।

সুমতির বাবা বলেন—শত হোক্ মেয়ের বাপ তো বটে। না কেঁদে পারবেন কেন?

—মেয়েকে তো জলে ফেলে দেননি, বেশ ভাল ঘরেই দিয়েছেন। তবে এত কান্না কেন?

—কে জানে কেন!

অমানিশা

ডাক্তার বিভূতিবাবু বলেছেন, না, কোনমতেই না ; রাত ন'টার পর আর এক মিনিটও জেগে বসে থাকা উচিত হবে না। চুপচাপ, একেবারে শান্ত হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। ঘুম যত বেশি হবে, শরীরের তত বেশি উপকার হবে।

এবাড়ির রোগিণী মেয়ে দেবিকাও জানে, বিভূতি ডাক্তারের নির্দেশ তুচ্ছ করবার মতো শক্তি তার এই রক্তহীন শরীরের হাড়মাংসে নেই। একদিন সত্যিই রাত একটা পর্যন্ত বই পড়েছিল দেবিকা, কিন্তু পরের দিন সকাল থেকে বিকেলের মধ্যে তিনবার জ্ঞান হারাতে হয়েছিল। একবার শ্বাসকষ্ট হয়ে, একবার বমি করে, আর একবার মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল।

দেবিকার শরীরের এই অবস্থাটা এ বাড়ির প্রাণের সবচেয়ে বড় উদ্বেগ। শুধু বিভূতি ডাক্তার নয়, কলকাতার বড় বড় ডাক্তারও সত্য কথাটা চাপা না দিয়ে মোহিতবাবুকে বলে দিয়েছেন, এখন শুধু নিয়ম আর সাবধানতাই আপনার মেয়ের প্রাণ। একটু এদিক ওদিক হলেই আপনার মেয়ের জীবন বিপন্ন হবে।

একথা দেবিকারও অজানা নয়। পঁচিশ বছর বয়সের শিক্ষিতা মেয়ের পক্ষে অনুমানেও অনেক কিছুই বুঝে নেওয়া সম্ভব। বুঝে নিতে দেরি হয়নি দেবিকার, বাবা আর মা হেসে-হেসে যা-ই বোঝাতে চেষ্টা করুক না কেন, এই সত্যটি বুঝতে একটুকুও অসুবিধে নেই যে, আর দেরি নেই। যেমন দেবিকার সাধের সেতারের তারে মরচে ধরেছে, তেমনই দেবিকার এই শরীরের পাঁজরের হাড়েও মরচে ধরেছে। যে কোন মুহূর্তে ঠুং করে একটি ব্যথার নিঃশ্বাস ছেড়েই দেবিকার রুগ্ন প্রাণের তার ছিঁড়ে যাবে।

দু'বছর আগেও দেবিকার মুখের দিকে তাকালে কোন মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও সাধ্য ছিল না, এই মেয়ের এমন সুন্দর স্বাস্থ্য একটি বছরের মধ্যে একটা করুণ রুগ্নতার চেহারা হয়ে উঠবে। সেই টানা-টানা চোখ দুটির তারার কালো নিবিড়তা ফিকে হয়ে গিয়েছে। গলার শিরাগুলি যেন ছেঁড়া জালের সুতোর মতো এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে। হাতের কব্জির হাড় কাঠের গাঁটের মতো উঁচু, তাই সোনার সরু বালাটা গড়িয়ে পড়ে না গিয়ে কোনমতে ঠেকে আছে।

মেঘলা দিনে আকাশের দিকে তাকাতে ভয় পেত এই মেয়ে। যখন সাত বছর বয়স ছিল, তখন থেকেই আকাশের বিদ্যুৎকে বড় ভয় করতো দেবিকা। বিদ্যুৎ চমকালেই মেয়ের বুক চমকে উঠতো, সারা মুখে রক্তের ঝলকের আভা রাঙা হয়ে ফুটে উঠতো। আজ, এখনও বিদ্যুতের ঝিলিক দেখলে ভয় পেয়ে চমকে ওঠে দেবিকা। কিন্তু দেবিকার মুখ আর একঝলক রক্তের আভার ছোঁয়া লেগে রাঙা হয়ে ওঠে না। ওই শরীরে যেটুকু রক্ত আজও আছে, সে রক্তের পক্ষে ঝলক দিয়ে উথলে ওঠবার কিংবা মুখ রাঙা করে দেবার শক্তি নেই।

কিসের অসুখ? এই প্রশ্নটার কোন সহজ উত্তর থাকলে দেবিকার বাবা মোহিতবাবু একটু নিশ্চিন্ত হতে পারতেন, আর দেবিকার মাও বোধহয় তাঁর আড়ালের কান্নাকাটি একটু কম করে দিতে পারতেন। নানা ডাক্তারের অভিমতে অসুখটা এখন একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ কিসের অসুখ নয়? দেবিকার এই পঁচিশ বছর বয়সের শরীরের সবই যেন ভয়ানক এক অভিশাপে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে। হার্ট খারাপ, লিভার খারাপ। ডান পাঁজরের একপাশে সব সময় একটা ব্যথা। ক্ষুধা হয় না, সামান্য তাপের জ্বর সব সময় গায়ে লেগে আছে। ঘুম কম। যখন তখন হাঁপ ধরে পিঠে ফিক ব্যথা দেখা দেয়। তাঁর ওপর রক্তাল্পতা ; হাত-পা প্রায়ই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এইতো সেই মেয়ে ; মোহিতবাবুর মেয়ে সেই দেবিকা, যে-মেয়ে কোনদিন রঙিন নখ-পালিশ ছোঁয়নি ; তবু কলেজের বান্ধবীরা সন্দেহ করতো, দেবিকা

রোজই হাতের দশ আঙুলের নখে রঙিন পালিশ লাগায়।

আজ বাইরের বারান্দায় গিয়ে বসতে হলে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। কেউ একজন সামনে না থাকলে এতটা নড়াচড়া করতে সাহস করে না দেবিকা। চেঁচিয়ে কাউকে ডাকাও সম্ভব নয়, ডাক্তারের নিষেধ আছে। তাই চুপ করে বসে থাকতে হয়, যতক্ষণ না মা এসে ঘরে ঢোকেন। তখন উঠে দাঁড়ায় দেবিকা।--আমি এখন বাইরের বারান্দায় একটু বসবো, মা। আমার হাতটা ধর।

এই বারান্দায় বসলে আজও দেখতে পাওয়া যাবে, সামনে ব্যাডমিণ্টনের লন। সেই লন এখন জংলী আগাছায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে। মোহিতবাবুও আজকাল আর মালীটাকে বলেন না যে ব্যাডমিণ্টন লনটাকে একটু পরিষ্কার করে রাখুক। হ্যাঁ, কিছুদিন আগে একবার বলেছিলেন কিন্তু বলতে গিয়ে মোহিতবাবুর চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। গলার স্বর বন্ধ হয়ে এসেছিল। আর কী হবে ওই ছাই ব্যাডমিণ্টনের লন পরিষ্কার করে? যে মেয়ে দু'বছর আগেও ছুটোছুটি করে হেসে আর চেঁচিয়ে ওই লনে রায়সাহেবের বউ নমিতার সঙ্গে ব্যাডমিণ্টন খেলেছে, সে মেয়ে আজ বারান্দার সিঁড়িতে একটানা দু'মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। মোহিতবাবু বুকের ভিতরে একটা করুণ নিঃশ্বাস যেন কথা বলে ছটফট করে--আর কি কোনদিনও মেয়েটাকে ব্যাডমিণ্টন খেলতে দেখতে পাওয়া যাবে?

দীপ নিভছে। মোহিতবাবু জানেন, দেবিকার মা জয়াও জানেন, এই অসুখটা একটা ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর অসুখ। একটা নামহীন অভিশাপ। কোন ঠিক নেই, যে-কোন মুহূর্তে একটি ভয়ানক ফুৎকার হেনে দীপ নিভিয়ে দেবে। তবু আশা ছেড়ে দিতে প্রাণ চায় না। দেবিকা আবার সুস্থ হবে ও বেঁচে থাকবে, এটা আশা করা একটা অসম্ভবকে বিশ্বাস করা মাত্র। কিন্তু অনেক সময় অসম্ভবকে তো সম্ভব হতে দেখা গিয়েছে। চারুবাবুর মা, সত্তর বছর বয়সের বুড়ো মানুষটি অসুখে ভুগে ভুগে হাড়সার হয়ে গিয়েছিলেন, এক মাস ধরে যাঁর বুকটা শুধু ধুকধুক করতো, জীবনের আর কোন লক্ষণ ছিল না, সেই মানুষও তো সেরে উঠলো। চারুবাবুর মায়ের হিক্কা দেখে এই বিভূতি ডাক্তারই একেবারে পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলেন--আর বড়জোর এক ঘণ্টা। কিন্তু তারপর, প্রায় সাত মাস পরে এই পাঁচ দিন হলো চারুবাবুর মা কাশী বেড়াতে গিয়েছেন।

তাই আশা ছেড়ে দিতে পারেননি মোহিতবাবু আর জয়া, যদিও আশা করবার মতো কোন কারণ খুঁজে পাননি, কোন লক্ষণও দেখতে পাননি। আলমারির একটা তাক ভরে এক্স-রে প্লেটগুলি ছড়িয়ে পড়ে আছে। প্রেসক্রিপসনের ফাইলগুলি আর-একটা তাক ভরে রেখেছে। সেই সঙ্গে এই বাড়ির মন আর প্রাণের উপরেও একটা করুণ আতঙ্কের ভার চেপে রয়েছে।

ঠিক কথা ; শুধু নিয়ম আর সাবধানতা এখন দেবিকার প্রাণ। ওষুধ খেতে হয়, কিন্তু দেবিকার মা জয়া কতবার নিজের চোখে দেখেছেন, ওষুধ খেতে গিয়ে দেবিকার সাদা ও শুকনো ঠোঁটে একটা শীর্ণ হাসির রেখা শিউরে উঠেছে। দেবিকা নিজেও জানে দীপ নিভছে। পঁচিশ বছর বয়সের মেয়ের মুখের এই হাসি যেন এতদিনের এই জীবনটারই উপর একটা ঠাট্টার হাসি। একটা অভিমানও বটে। অসুখের প্রথম বছরটা দেবিকার চোখে মুখে যে ভয় ঘনিয়ে রেখেছিল, সেই ভয়ের কোন চিহ্ন আজ আর নেই। সেই ভয় আজ একটা ঠাট্টার হাসি হয়ে উঠেছে। দেবিকা জানে, সেই অবধারিত লগ্নটি ক্রমেই এগিয়ে আসছে। বিভূতি ডাক্তারের ওষুধ, আর নিয়ম ও সাবধানতা বলতে গেলে একটা মিথ্যের চেষ্টার ব্রত মাত্র।

দেবিকার স্বামী সুমন্ত চৌধুরীও জানে, দীপ নিভছে। সুমন্তকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বিভূতি ডাক্তার যে-সব কথা বলেছেন, তার মধ্যে মিথ্যে আশার কোন ছলভাষণ ছিল না। বিভূতি ডাক্তার খুবই স্পষ্টবাদী মানুষ, যদিও খুব নরম মনের মানুষ। দেবিকার বাঁচবার আশা নেই, কথাটা সুমন্তকে বলতে গিয়ে বিভূতির ডাক্তারের চোখ দুটোও ছলছল করে উঠেছিল।

আজ নয়, দেবিকার সঙ্গে সুমন্ত চৌধুরীর বিয়ে হবার প্রায় এক বছর আগেই সত্য কথাটা খোলাখুলি ভাষায় সুমন্তকে জানিয়ে দিয়েছিলেন বিভূতি ডাক্তার। সুমন্ত বিভূতি ডাক্তারের জেঠতুতো দাদার ছেলে ; সুতরাং সুমন্ত ছেলেটির জীবনের জন্য বিভূতি কাকার মনে একটা মায়ার ভাবও ছিল। বিভূতি ডাক্তার বরং চেষ্টা করেছিলেন, মোহিতবাবুর মেয়ে দেবিকার সঙ্গে সুমন্তর যেন বিয়ে না হয়। তাঁর মতে, এমন বিয়ের কোন মানে হয় না। সুমন্তর পক্ষে দেবিকাকে বিয়ে করার অর্থ সুমন্তর জীবনে মিছিমিছি একটা শোকের আঘাত আহ্বান করা।

যেমন বিভূতি ডাক্তারের আপত্তি ছিল, তেমনই দেবিকার বাবা আর মারও আপত্তি ছিল। তাঁরাও বুঝেছিলেন, এমন বিয়ের কোন মানে হয় না। কিন্তু দুজনেই শেষ পর্যন্ত মেয়ের ইচ্ছা আর সুমন্তরও ইচ্ছার কাছে হার মেনে গেলেন।

ত্রিশ বছর বয়সের সুমন্ত চৌধুরীও কোনদিন কল্পনা করতে পারেনি যে একদিন গিরিডিতে বেড়াতে এসে একটা অদ্ভুত ঘটনার মায়ায় পড়তে হবে, আর মোহিতবাবুর মেয়েকে ভালবেসে ফেলতে হবে। মোহিতবাবুর সঙ্গেও সুমন্ত চৌধুরীর একটা কুটুম্বিতার সম্পর্ক আছে। মোহিতবাবুর স্ত্রী জয়া হলেন সুমন্তর লক্ষ্মীমামীর দিদি। লক্ষ্মীমামীকে গিরিডিতে পৌঁছে দিতে গিয়েছিল সুমন্ত। দুটো দিন গিরিডির বাড়িতে থাকতে হয়েছিল। তারপর আবার নিজের কাজের জায়গায় ফিরে আসতে হয়েছিল।

জায়গাটা হলো সিজুয়া কলিয়ারি, গিরিডি যেতে বেশি সময় লাগে না। সিজুয়া কলিয়ারির ম্যানেজার সুমন্ত চৌধুরী কিন্তু সিজুয়াতে ফিরে এসেও দুদিনের গিরিডির জীবনের স্মৃতিটাকে ভুলে যেতে পারেনি। সব সময় মনে পড়েছে, লক্ষ্মীমামীর দিদির মেয়ে দেবিকা এখন সেই রঙিন আলোয়ানটি গায়ে জড়িয়ে, বারান্দার চেয়ারে বসে সামনের লনের দিকে তাকিয়ে আছে। পাখি ডাকছে, লনের জংলী আগাছার উপর ফড়িং উড়ে বেড়াচ্ছে, চারদিকে সকালবেলার রোদ ঝলমল করছে ; আর দেবিকার চোখের কালো তারা দুটো যেন করুণ বিষাদে সাদা হয়ে গিয়ে একটি আসন্ন অন্তিমের পায়ের শব্দ শুনছে।

দেবিকাকে দেখলে একটা সাদা মোমের পুতুল বলে মনে হয়। কিন্তু কী সুন্দর মুখটা। সেই রক্তহীন সাদা মুখেও যেন অদ্ভুত এক মায়ার প্রলেপ মাখানো আছে। প্রথম আলাপের পরেই একটি কথা বলেছিল দেবিকা, যদি সময় আর সুযোগ পান আর যদি ইচ্ছে থাকে, তবে মাঝে মাঝে আসবেন।

এই সামান্য অনুরোধের ভাষাটা সত্যিই ক্ষণিকের রক্তচ্ছটা হয়ে দেবিকার মুখ রাঙা করে দিয়েছিল। সেদিন বিভূতি ডাক্তারও দেবিকাকে দেখতে এসে আশ্চর্য হয়েছিলেন। কী ব্যাপার, দেবিকার চেহারা এই একদিনের মধ্যে এত ভাল হয়ে গেল কি করে? মুখটি তো খুবই লালচে দেখাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। রক্তাল্পতায় সাদাটে হয়ে গিয়েছে যে মেয়ের মুখ, সেই মেয়ের মুখে যেন রক্তাভ স্বাস্থ্যের সঞ্চার দেখতে পেয়েছিলেন বিভূতি ডাক্তার ; তাই আশ্চর্য হয়েছিলেন।

সিজুয়া কলিয়ারি থেকে গিরিডি পৌঁছতে তিন ঘণ্টাও সময় লাগে না। তাই, প্রায় প্রতি সপ্তাহে একবার গিরিডি এসেছে সুমন্ত।

মোহিতবাবু আর জয়ারও বুঝতে দেরি হয়নি, কেন আসে সুমন্ত। কিন্তু খুশি না হয়ে বরং বেশ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। ভয় পেয়েছিলেন। ঘটনাকে তাঁদের মেয়ের জীবনে নিয়তির একটা নিষ্ঠুর ঠাট্টা বলেও মনে করেছিলেন। শুধু নিজেদের মেয়ের জন্য নয়, সুমন্তর কথাটাও তাঁরা ভেবেছিলেন। ছেলেটা কেন এই ভুল করছে? দেবিকার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক নিবিড় করে তুলে কী লাভ হবে সুমন্তর? দেবিকাকে তো বিয়ে করতে পারবে না সুমন্ত। দেবিকাও সুমন্তকে বিয়ে করতে চাইবে না।

কিন্তু মোহিতবাবু আর জয়া দুজনেই একদিন শুনতে পেয়ে চমকে উঠলেন, সুমন্ত সত্যিই

দেবিকাকে বিয়ে করতে চায়। কথাটা বলেছিলেন বিভূতি ডাক্তার।

হ্যাঁ, সব জেনেশুনেই দেবিকাকে বিয়ে করতে চাইছে সুমন্ত। দেবিকার প্রাণটা যে একটা নিবু-নিবু দীপের প্রাণ, জেনেও সুমন্তর কোন আপত্তি নেই।

মেয়েকেও একেবারে স্পষ্ট করে প্রশ্ন করেছিলেন মোহিতবাবু, তোমারও কি এই ইচ্ছে? হ্যাঁ, বলে দিতে একটুও দেরি করেনি দেবিকা।

—কিন্তু ভেবে দেখ। এ বিয়ের কোন মানে হয় না।

দেবিকা—সব ভেবে দেখেছি বলেই বলছি, তোমরা আপত্তি করো না।

সবই ভেবেছিল সুমন্ত আর দেবিকা, দুজনেই। সত্যি কথা, খুব বেশি করে ভাবলে বুঝতে অসুবিধে থাকে না যে, এ বিয়ের সত্যিই সে-রকম কোন মানে হয় না, যে-রকম মানে পৃথিবীর অন্য দুটি নরনারীর বিয়েতে থাকে। সুমন্তর জীবনে দেবিকা শুধু নামেই স্ত্রী হতে পারে, কিন্তু জীবনের দরকারে হতে পারে না। সে সামর্থ্য ও শক্তি দেবিকার এই রুগ্ন জীর্ণ ও ভঙ্গুর শরীরে নেই। কিন্তু সেজন্য একটুও ব্যথিত নয় সুমন্ত। সুমন্তর ভালবাসায় সেই দুঃসাহস আছে, দেবিকার শুধু হাত ধরেই ধন্য হয়ে আর সুখী হয়ে থাকতে পারবে সুমন্ত।

সুমন্তকেও একটা কথা বলে দিতে দেবিকার এই রোগার্ত বুকের নিশ্বাসেও একটুও অসুবিধে ঠেকেনি।—আমি তো নিভে যেতেই চলেছি, দিনও ফুরিয়ে আসছে। আমি তোমাকে শেষে একটা দুঃখ দিয়ে চলে যাব। কিন্তু তুমি সে দুঃখ ভুলে যেও।

সুমন্ত—তার মানে?

দেবিকা—তুমি আবার বিয়ে করো।

সুমন্ত হাসে—বাজে কথা।

বাজে কথা বটে। কিন্তু সুমন্ত আর দেবিকা দুজনেরই মনের মধ্যে কোন কপটতা নেই। অস্বীকার করবার উপায় নেই, সুমন্তর জীবনটা হঠাৎ একদিন একলা হয়ে যাবে ; গিরিডির এই বাড়িতে এসে এই বারান্দার এই চেয়ারে দেবিকাকে আর দেখতে পাওয়া যাবে না। বিভূতি ডাক্তার স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, বড় জোর আর এক বছর। সুমন্তর ভালবাসার প্রাণটাও যেন নীরবে চিৎকার করে বলে উঠেছে, এক মাস হলেই বা কি?

দু'বছর আগে ঠিক যখন এম-এ পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিল দেবিকা, তখনই এই অদ্ভুত অসুখের অভিশাপ দেখা দিয়েছিল। আর পড়তে পারেনি, পরীক্ষাও দিতে পারেনি দেবিকা। রায়সাহেবের বউ নমিতা আরও কতবার এসেছে, কিন্তু আর ব্যাডমিণ্টন খেলবার সৌভাগ্য হয়নি। শুধু ওষুধ নিয়ম আর সাবধানতা নিয়ে রুগ্ন শরীরটাকে কোনমতে ধরে রেখে এই পৃথিবীর আলো-ছায়ার কাছ থেকে চরম বিদায় নেবার জন্যই তৈরি হয়েছিল যে মেয়ে, সেই মেয়েরই সঙ্গে সুমন্তর বিয়ে হয়ে গেল।

পুরো এক বছরও পার হয়নি, যে বিয়ের কোন মানে হয় না, সেই বিয়ে গিরিডির এই বাড়িতেই হয়ে গিয়েছে। বিয়েতে সুমন্তর দুই দাদা এসেছিলেন। তাঁরা কেউই প্রসন্ন হননি। শুধু একটি ঘণ্টা চুপ করে বসে থেকে আর গম্ভীর হয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান দেখেই তাঁরা চলে গিয়েছিলেন। বিভূতিকাকাও খুশি হননি। মোহিতবাবু আর জয়া তাঁদের মেয়ের মুখের হাসি দেখে হেসেছিলেন বটে, কিন্তু আড়ালে গিয়ে চোখও মুছে ছিলেন।

গিরিডির এ বাড়ির জীবনের সমস্যা বলতে সত্যিই কিছু ছিল না। ছিল শুধু একটা বিষণ্ণ করুণ উদ্বেগ। দেবিকার এই রুগ্ন প্রাণের সব সাড়া যে-কোন মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে, সুস্থ হয়ে উঠবার কোন লক্ষণও নেই। একটা শোকের আঘাত মাথা পেতে স্বীকার করবার জন্য মনে মনে তৈরি হয়েছিলেন মোহিতবাবু আর জয়া। কিন্তু বিয়ের পর সত্যিই একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে ; তাই ভয় পেয়ে আরও বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছেন দেবিকার বাবা আর মা। বড় কঠিন, বড়ই নিষ্ঠুর, আবার খুব করুণও বটে, এই সমস্যা।

সুমন্ত মাসের যে-কটা দিন তার সিজুয়া কলিয়ারির কাজের জীবনে ব্যস্ত থাকে, সে-কটা দিন গিরিডির এই বাড়ির ভয়টাও যেন আড়ালে চাপা পড়ে থাকে। বরং, মাঝে মাঝে বেশ খুশি হয়ে হাসতে পারেন মোহিতবাবু, যখন দেখতে পান যে, সুমন্তকে চিঠি লিখছে দেবিকা, আর দেবিকার সারা মুখ ভরে একটা রঙিন আলোর হাসি ফুটে উঠেছে।

কিন্তু বিভূতি ডাক্তার খুবই স্পষ্টবক্তা ; তার ভাষার মধ্যেও কোন রাখা-ঢাকা চাপাচাপির ব্যাপার নেই। বিভূতি ডাক্তার আবার বলেছেন--বিয়ে হলো, এক রকম ভালোই হলো। কিন্তু আরও একটু সাবধান থাকতে হবে মোহিতবাবু।

--আপনি যা নিয়ম করে দিয়েছেন, তা তো সবই.

--সে-সব ছাড়াও একটা সাবধানতা দরকার।

--বলুন কি করতে হবে?

--কথাটা হলো, দেবিকার যদি ছেলেপুলে হয়, তবে কিন্তু সর্বনাশের ব্যাপার হবে। তা হলো আর দুটো মাসও বেঁচে থাকবার কোন আশা থাকবে না।

কিন্তু এই ভয়ানক করুণ সত্যটা কি সুমন্তর অজানা আছে? বিভূতি ডাক্তার বলেন, তিনি সুমন্তকে একেবারে খোলা ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন।

তবে দেবিকা কি জানে না? বিভূতি ডাক্তার বলেছেন, নিজেই দেবিকাকে কথাটা বলে দিয়েছে সুমন্ত। কাজেই এখন ব্যাপারটা আর কারও জানা-অজানা সমস্যার কথা নয়। এখন এ বাড়ির প্রাণের ভয় শুধু এই যে, যেন ভুল না হয়।

শিক্ষিত ছেলে সুমন্ত এমন নিদারুণ ভুল করবেই বা কেন? শিক্ষিতা মেয়ে দেবিকার পক্ষেও এমন সাংঘাতিক অসতর্কতা সম্ভব নয়। ওরা দুজনের কেউই অবুঝ নয়। মোহিতবাবু আর জয়া মাঝে মাঝে বিশ্বাস করেন, না ওরা ভুল করবে না।

সুমন্তর লক্ষ্মীমামী একদিন এসেছিলেন, তিনি নিজেও অনেক করে সুমন্তর চিঠি খুঁজে বের করে নিয়ে পড়েছেন। লক্ষ্মীমামী তাঁর জয়াদিকেও চিঠির কথাগুলি শুনিয়ে দিয়েছেন। শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছেন জয়া। না, এত ভয় করবার কিছু নেই। সুমন্ত তো দেবিকার কাছে লেখা চিঠিতে একেবারে স্পষ্ট করে লিখেছে, বিভূতিকাকা মিথ্যে ভয় করছেন। আমাকে আর তোমাকে বোধহয় দুটো পাগল বলে সন্দেহ করেছেন।

সুমন্ত নিজেই নিয়ম করে নিয়েছে, প্রতি মাসে অন্তত দুটি-তিনটি দিনের জন্য গিরিডিতে এসে থাকে আর চলে যায় সুমন্ত। এই দুটি-তিনটি দিন গিরিডির এই বাড়ির বিষণ্ণ প্রাণেও একটা খুশির সাড়া জেগে ওঠে।

আবার মাঝে মাঝে সিজুয়া কলিয়ারির অফিসে গিরিডির টেলিফোনের একটা উদ্বেগের আহ্বানও ক্রিং-ক্রিং করে বেজে ওঠে। দেবিকার শরীর ভাল নয় ; লক্ষণ খারাপ। যদি সম্ভব হয়, তবে তাড়াতাড়ি চলে এস।

এসেই দেখতে পেয়েছে সুমন্ত, জ্ঞান হারিয়ে আর অসাড় হয়ে শুয়ে আছে দেবিকা। খোঁপাটা ভেঙে গিয়ে এলোমেলো হয়ে আছে। শুকনো শীর্ণ হাত দুটো দুপাশে এলিয়ে পড়েছে। বিভূতিডাক্তার ঘরের ভিতরে চেয়ারে বসে আছেন।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে দেবিকার বিছানার মাথার কাছে বসেছে সুমন্ত। একটুও সঙ্কোচ বোধ করে না, দেবিকার মাথায় আর কপালে আস্তে আস্তে হাত বোলায়, মাঝে মাঝে দেবিকার একটা হাত ধরে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

সুমন্ত যেন নিবু-নিবু দীপের সবচেয়ে বড় কামনার তৃপ্তিটি পূর্ণ করে দিয়ে বসে থাকে। এই তো চেয়েছিল দেবিকা। এর চেয়ে বেশি কিছু দাবি করা তো দেবিকার রুগ্ন প্রাণের আব দেহের সামর্থ্যে সম্ভব নয়। একদিকে মৃত্যুর হাত, আর একদিকে সুমন্তের হাত ; দেবিকার প্রাণ যে এইরকম একটি অভ্যর্থনা নিয়ে চলে যাবার জন্য তৈরি হয়ে আছে।

কিন্তু অন্যদিন, যেদিন দেবিকার অসুখের এরকম কোন বাড়াবাড়ি থাকে না, সেদিন সুমন্তকে কাছে দেখতে পেলে দেবিকা যেন ভুলেই যায় যে, দীপ নিভছে।

সুমন্ত আসে, সেদিন সময় মতো ওষুধ খেতে ভুলে যায় দেবিকা। বেশি কথা বলতে নিষেধ আছে কিন্তু ভিতরের ঘরে বসে একটানা একটি ঘণ্টা ধরে গল্প করেও যেন ক্লান্ত হতে বা থামতে চায় না। স্নানের সময় পার হয়ে যায়, দেবিকা তবু সুমন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দেবিকা হাসে--এবার এসেও আমাকে দেখতে পেলে কিন্তু আসছে মাসে কি দেখতে পাবে?

সুমন্ত হাসে, কিন্তু হাসিটা যেন একটা চাপা বেদনার করুণ হাসি--তা, আশা করতেই হবে, দেখতে পাবো।

দেবিকা--আমার ভাবতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়, তুমি একদিন এখানে এসে আমাকে দেখতে পাবে না। কিন্তু তোমার পায়ে পড়ি, লক্ষ্মীটি, তুমি আমার জন্যে কান্নাকাটি করো না।

সুমন্ত--চুপ করো।

দেবিকা হাসতে চেষ্টা করে--সত্যিই, এছাড়া আমার আর কোন দুঃখ নেই।

সুমন্তর চোখ দুটোও যেন আসন্ন সেই শূন্যতার দিনটার রূপ দেখতে পেয়ে ছটফট করতে থাকে। ঘরের এই সব ছবি, ওই ফুলের টব, সবই সেদিন থাকবে। শুধু থাকবে না দেবিকা। দেবিকাকে সারা জীবনে এই পৃথিবীর কোন আলোছায়ার কাছে দেখতে পাওয়া যাবে না। তবু এর মধ্যে একটা সান্ত্বনা এই যে...।

সুমন্তর মনের কথাটা দেবিকারই হাসি-ভরা কথার ভাষাতে যেন ঝংকার দিয়ে বেজে ওঠে। দেবিকা বলে--তবু সুখের মরণই বলতে হবে। তোমার স্ত্রী হতে পেরেছি, এই তৃপ্তি নিয়ে সুখেই মরতে পারবো।--তারপরেই মুখ টিপে যেন আরও একটা খুশির হাসি হাসতে থাকে দেবিকা--তখন তোমারও মুক্তি।

সুমন্ত বলে--সাংঘাতিক মুক্তি। যাক, ওসব কথা না তুললেই ভাল।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গিরিডির এ-বাড়ির প্রাণের উদ্বেগটাও যেন মিথ্যে হয়ে কোথাও সরে থাকে। মোহিতবাবু হেসে-হেসে সুমন্তর সঙ্গে গল্প করেন। জয়াও মাঝে মাঝে এসে সুমন্ত আর দেবিকার কাছে বসে গল্প করে চলে যান।

যখন রাত হয়, রাত নটা পার হয়েও ঘড়ির কাঁটা দশটার ঘরে পৌঁছে যায়, তখন একটু উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেন না জয়া। মোহিতবাবু মাঝে মাঝে উপরতলার ঘর থেকে নীচে নেমে এসে বারান্দায় পায়চারি করতে থাকেন। সুমন্ত যখন দেবিকার হাত ছেড়ে দিয়ে আর আস্তে আস্তে হেঁটে উপরতলার ঘরের দিকে চলে যায়, তখন নিশ্চিন্ত হন মোহিতবাবু, নিশ্চিন্ত হন জয়া।

অনেকদিন পর আবার লক্ষ্মীমামী গিরিডির বাড়িতে এসেছেন। সুমন্তও এসেছে। বাড়ির সবারই মনেও পড়ে গিয়েছে, দেবিকা আর সুমন্তের বিয়ের একটি বছর পূর্ণ হলো। এই এক বছরের মধ্যে দেবিকার শরীরের কোন উন্নতি হয়নি। কিন্তু কোন অবনতি হয়েছে বলেও বিভূতিডাক্তারও মনে করেন না।

লক্ষ্মীমামী বলেন--ভগবানের দয়া।

কিন্তু দেবিকা নিজেই ঠাট্টা করে হেসে ওঠে--ভগবান যদি আরও বেশি দয়া করেন, তবে একজনের ওপর খুবই অবিচার করা হবে।

লক্ষ্মীমামী--বুঝলাম না।

দেবিকা--আধমরা ফিঙের মতো এভাবে ধড়ফড় করে আর ধুকধুক করে যদি আরও ক'বছর বেঁচে থাকি, তবে তোমার ভাগ্নে বেচারার কি দশা হবে?

—কি হবে?

—বুঝে দেখ, কি বলছি।

চমকে ওঠেন লক্ষ্মীমামী। দেবিকার এই ঠাট্টার কথাটা যে ভয়ানক একটা বাস্তব সত্যের বজ্রধ্বনি। বেচারা সুমন্তের জীবনটা তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না। দেবিকার সঙ্গে সুমন্তর বিয়ে মানে ক'দিনের একটা মায়ার বন্ধন স্বীকার করা মাত্র। সকলেরই জানা আছে, সে বন্ধন শিগগিরই ক্ষয় করে দেবার জন্য দেবিকার প্রাণের শিয়রে যমের ছায়া দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সুমন্তর জীবনটা তো সব আশা আর পিপাসা নিয়ে সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকবে। দেবিকা যে সুমন্তর যত সাধ আর সখের, স্বাস্থ্যের আর বয়সের কাছে একটা বঞ্চনা। এমন বঞ্চনা চিরস্থায়ী হবে না জেনেই তো সুমন্তর সঙ্গে দেবিকার বিয়ে হয়েছে।

লক্ষ্মীমামী আর কথা বাড়িয়ে তুলতে চান না।

এমন বিয়ের এক বছর পূর্ণ হবার দিনটিতে কীই বা উৎসব হতে পারে? তেমন কিছুই হলো না। লক্ষ্মীমামী শুধু দুটো ফুলদানীতে দুটো টাটকা ফুলের তোড়া বসিয়ে দিয়ে দেবিকার ঘরে রেখে গেলেন।

সন্ধ্যা পার হয়। আর রাতটাও জ্যোৎস্নায় ভরে যায়। একবছর আগের রাতেও এইরকম একটা আলোমাখানো উতলা ভাব ছিল। মোহিত দত্তের এই বাড়ির বাগানের সব লতাপাতা ফুরফুরে হাওয়াতে সে-রাতে যেরকম দুলেছিল, আজও ঠিক সেইরকম দুলছে।

রাত দশটা পার হয়ে যাবার পরেও দেবিকার ঘরের ভিতরে দেবিকার সঙ্গে গল্প করছে সুমন্ত। ঘরের দরজা খোলা। ঘরে আলো জ্বলে। এটাই নিয়ম। তবু একটু উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেন না জয়া।—তুমি সুমন্তকে ডেকে একটু বলে দাও লক্ষ্মী, যেন আর বেশি গল্প না করে।

লক্ষ্মীমামী ডাক দেন—এবার তুমি ওপরে যাও, সুমন্ত।

—এখনই যাচ্ছি। উত্তর দেয় সুমন্ত। কিন্তু বুঝতে পারেন লক্ষ্মীমামী, তবু দেবিকার সঙ্গে গল্প করেই চলেছে সুমন্ত।

জয়া বলেন—রাত এগারটা যে পার হতে বসলো লক্ষ্মী। আর তো এসব ভাল দেখায় না।

—কি বললে?

—আমার সত্যিই ভয় করছে লক্ষ্মী।

—ভয়?

—হ্যাঁ। তুমি সুমন্তকে আর একবার ডাক দাও, লক্ষ্মী।

লক্ষ্মীমামী ব্যস্তভাবে এগিয়ে এসে, আর দেবিকার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাক দিতে গিয়েই চমকে ওঠেন। সুমন্তর একটা হাত ধরে রেখেছে দেবিকা। দেবিকার মুখে কোন কথা নেই। কিন্তু মেয়েটার চোখ দুটো যেন কথা বলছে।

সুমন্তর চোখেও কী অদ্ভুত চাহনি। দেবিকার চোখেও ওই ভয়ানক ব্যাকুলতাকে শান্ত করার জন্য সুমন্তের চোখের দৃষ্টিটা ছটফট করছে। দেবিকা বলছে—আজ আর ওপরে যেও না।

সুমন্ত বলছে—আমারও আজ আর ওপরে যেতে ইচ্ছে করছে না।

মরণভয় নেই মেয়েটার? আর সুমন্তই বা কী ভয়ানক অবুঝ মনের ছেলে। এত রাতে, এভাবে, এমন করে দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে যে দেবিকার শিয়রের মৃত্যু মুখ টিপে হেসে ফেলবে। মেয়েটাও কি ভুলে গেছে যে, ওর হার্ট খারাপ, লিভার খারাপ, ওর ডান পাঁজরের একপাশে সাংঘাতিক একটা ব্যথা আছে। বিভূতিডাক্তার এত স্পষ্ট করে যে-কথাটা বলে দিয়েছেন, সে-কথা ভুলে যাবার জন্যেই কি ওরা দুজন আজ পাগল হয়ে উঠলো?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যায়। জেগে উঠেছেন মোহিতবাবু। বোধহয় জয়া নিজেই গিয়ে আর আতঙ্কিত হয়ে মোহিতবাবুকে জাগিয়েছেন।

লক্ষ্মীমামীর আতঙ্কিত প্রাণটাও আর নীরব হয়ে থাকতে পারে না। চেঁচিয়ে ডাক দিয়ে ফেলেন লক্ষ্মীমামী—ও সুমন্ত, আর রাত করো না। ছিঃ, দেবিকার শরীরের কথাটা তো একবার ভেবে দেখতে হয়।

—যাচ্ছি মামী। ব্যস্তভাবে সাড়া দেয় সুমন্ত।

ঘর ছেড়ে চলে যায় সুমন্ত। দেখতে পান লক্ষ্মীমামী, দেবিকার চোখ দুটো ছলছল করছে। কিন্তু সেই সঙ্গে দেবিকার দুই চোখের ঘন ভুরু দুটো যেন আহত সাপের শরীরের মতো কুঁচকে পাকিয়ে কাঁপছে।

আজ না হয় লক্ষ্মীমামী ছিলেন তাই এ বাড়ির প্রাণ একটা বিপদের ভয় থেকে বেঁচে গেল। কিন্তু তারপর? তারপর যতবারই সুমন্ত এবাড়িতে এসেছে, এ বাড়ির মন আতঙ্কে ভরে গিয়েছে। একদিন এমন ঘটনাও চোখে দেখতে হয়েছে, দেবিকা নিজেই মাঝরাতে ঘরের বাইরে এসে উপর তলায় যাবার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। জয়া বলেন—একি কাণ্ড!

দেবিকা বলে—কিছুতেই ঘুম আসছে না, মা।

মোহিতবাবু দেখেছেন, অনেক রাতে নীচের তলায় নেমে বারান্দার চেয়ারে চুপ করে বসে আছে সুমন্ত। মোহিতবাবু ভয় পেয়েছেন, বিপন্ন বোধ করেছেন আর করুণস্বরে সুমন্তকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছেন।—দুঃখ করো না, সুমন্ত। এখনও ভোর হতে অনেক দেরি, এবার শুতে যাও।

জয়া মাঝে মাঝে মোহিতবাবুর কাছে এসে ফুঁপিয়ে উঠেছেন—এমন বিয়ে না হলেই তো ভাল ছিল। আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না।

কিন্তু বিভূতি ডাক্তার স্পষ্টবক্তা ; আবার সাবধান করে দিয়েছেন। সাবধান, যতই দুঃখের ব্যাপার হোক, এমন ভুল করতে দেবেন না।

২

বিভূতি ডাক্তার সবচেয়ে বেশি খুশি। ছ'মাসের মধ্যে দেবিকার অসুখের অনেক খারাপ লক্ষণ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। দশ পাউণ্ড ওজন বেড়েছে দেবিকার। মাথা ঘোরা আর নেই। পাঁজরের ব্যথাটাও খুব কম।

তবে কি সত্যিই সেরে উঠবে দেবিকা? বিভূতিডাক্তার বলেন—এখন আমি জোর করে বলতে পারি, আশা আছে।

মিথ্যে বলেননি বিভূতিডাক্তার। সত্যিই এক-একটা মাসে দেবিকার এই জীর্ণ শীর্ণ ও ভঙ্গুর শরীরটার উপর যেন একটা অভাবিত আকস্মিকের করুণা ঝরে পড়ছে। লালচে হয়ে উঠেছে দেবিকার সাদা ঠোঁট। খাবারের পরিমাণ প্রায় ডবল হয়ে গিয়েছে। লনের চারদিকে একবার ঘুরে বেড়ালে হাঁপ ধরে না।

রায়সাহেবেরে বউ নমিতা এসে হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে।—আমি এখন চেঁচিয়ে বলতে পারি দেবি, আবার আমি তোমার সঙ্গে ব্যাডমিণ্টন খেলবো।

সুমন্ত আসে! কিন্তু সুমন্তর চোখের দৃষ্টিতে অদ্ভুত এক বিস্ময়ের নিবিড়তা টলমল করে। দেবিকার হাত ধরতে গিয়েই সুমন্তর হাতটা যেন একটা প্রাণময় কোমলতার স্বাদ পেয়ে চমকে উঠেছে। দেবিকার হাতের সরু বালা দুটো আর কব্জির গাঁটের কাছে ঢলঢল করে না। হাড়সার সেই হাত দুটো বেশ সুডোল হয়ে উঠেছে। সত্যিই তো, এটা যে একটা আশাতীত ঘটনা।

আরও ছ'টা মাস পার হতে হতেই গিরিডির এই বাড়ির জীবনে চার বছর আগের সুস্থ সুখী হাসির কলনাদ আবার বেজে ওঠে। নমিতা এসেছে, নমিতার সঙ্গে ব্যাডমিণ্টন খেলেছে দেবিকা, পনের মিনিট খেলার পরও হাঁপিয়ে পড়েনি।

যে সেতারের তার মরচে ধরেছিল, সেই সেতারে নতুন তার পরানো হয়েছে। সন্ধ্যাবেলা একবার সেতার বাজাতে ভুলে যায় না দেবিকা। মোহিতবাবু বলেছেন, এবার পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরি হলেই তো ভাল হয় দেবি।

দেবিকা বলে—হ্যাঁ, পরীক্ষা দেবো।

সুমন্তর একটা চিঠিতেও নতুন একটা অনুরোধের কথা যেন নতুন আশার গুঞ্জন তুলে দেবিকাকে নিশ্চিন্ত করে দেয়।—হ্যাঁ, তুমি এখন এম-এ পরীক্ষাটা দেবার জন্যেই তৈরি হও। আমি কিছুদিন নতুন কাজে ব্যস্ত থাকবো। কাজেই অন্তত তিন মাসের মধ্যে গিরিডি যাবার সুযোগ হয়ে উঠবে না। যাই হোক, তোমারই সুবিধে হবে। তোমার পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটবে না। আমি থাকলেই তো যত ব্যাঘাত আর উৎপাত। আশা করি, এখন আরও ভাল আছ।

দেবিকা জবাব দেয়।—তবু বলছি, যতই ব্যাঘাত আর উৎপাত হও না কেন, তিন মাসের পর কিন্তু আর দেরি করো না।

তিন মাসের মধ্যে একদিন হঠাৎ উৎপাতের মতো দেখা দিয়েছে সুমন্ত। সুমন্তর গাড়িটা এসে শুধু দুটি ঘণ্টার মতো গিরিডির এবাড়ির ফটকে দাঁড়িয়ে থাকে। একটা কাজের দরকারে মধুপুর যেতে হবে। তাই এসেছে সুমন্ত।

খুব ব্যস্ত সুমন্ত। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়েও চেয়ারে বসতে চায় না সুমন্ত। ঘরের ভিতরে ঘুরে ফিরে দেবিকার সঙ্গে গল্প করে আর চা খায়। দেবিকার মুখের দিকে তাকিয়ে বার বার হাসতে থাকে সুমন্ত। সুমন্তের পক্ষে দেবিকার এই সুন্দর চেহারাটাকে দেখতে পাওয়া যে একটা পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। যে বাড়িতে এসে একদিন দুঃসহ একটা শূন্যতাকে দেখে ফিরে যেতে হবে বলে মনে করেছিল সুমন্ত, সে বাড়িতে দেবিকা আজ যেন একটি পূর্ণ অভ্যর্থনা হয়ে সুমন্তর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

যেমন মোহিতবাবু তেমনই জয়া, দুজনেই একটু বিস্মিত হলেন। সুমন্ত এল, কিন্তু একটি ঘণ্টাও থাকতে পারলো না। মধুপুর চলে গেল। কে জানে সুমন্তকে আজ এত ব্যস্ত করে তুলেছে কিসের জরুরী কাজ! এ বাড়ির এই ঘরের একটা চেয়ারেও কিছুক্ষণের জন্য বসে থাকতে পারলো না? সত্যিই সুমন্তর এই তাড়াহুড়ো ব্যস্ততার মধ্যে যেন একটা উদ্বেগও আছে। সুমন্তর গাড়িটাও এত জোর স্পীড নিয়ে চলে গেল যে, দেখলে মনে হবে, ছুটে পালিয়ে গেল গাড়িটা।

দেবিকাও ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে পেয়েছে, চলে যাচ্ছে সুমন্ত। কিন্তু সেজন্য দেবিকার চোখে কোন করুণতা আর কাতরতা নেই। হাসছে দেবিকার চোখ। আজ আর দেবিকার চোখের তারাতে সেই সাদাটে বিষাদের কোন চিহ্নও নেই। ঘন কালো চোখের তারা দুটো হাসতে গিয়ে আরও কালো হয়ে কাঁপছে আর দেখছে। আজ আর সুমন্তর দিকে তাকিয়ে দেবিকার চোখের চাহনিটা ব্যথিত হবার কোন দরকার হয় না। কারণ কিছুই ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

এম-এ পরীক্ষার জন্যে তৈরি হতে হবে। কিন্তু বিভূতি ডাক্তার বললেন, এখন কিছুদিনের জন্যে ওয়াল্টেয়ারে গিয়ে থাকলে দেবিকার স্বাস্থ্যের সবচেয়ে ভাল উপকার হবে। পরীক্ষা এখন থাকুক।

সুমন্ত চৌধুরী শুধু দেবিকার চিঠিতে জানতে পারে, ওয়াল্টেয়ারে চলে গিয়েছে দেবিকা, সঙ্গে গিয়েছেন দেবিকার মা। গিরিডির বাড়িতে এখন শুধু মোহিতবাবু আছেন। অন্তত তিনটে মাস ওয়াল্টেয়ারে থাকবে দেবিকা।

কিন্তু চিঠিতে একথাটা লিখতে পারেনি দেবিকা, বোধহয় লিখতে ভুলেই গিয়েছে যে, তুমিও একবার ওয়াল্টেয়ারে এস। তবু সুমন্তর মনে কোন অভিমান ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে না। বরং মনে হয়,

এরকম তাগিদ না করে ভালই করেছে দেবিকা। সুমন্তর কাজের চাপ যে এখন আরও বেড়েছে। তাছাড়া খনির মেশিনারি কিনতে দু'মাসের জন্য ইউরোপ যাবার কথাও উঠেছে। ইচ্ছে থাকলেও এখন ওয়াল্টেয়ারে যাওয়া সুমন্ত চৌধুরীর পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয়।

কিন্তু ঝরিয়ার মণিবাবুর অনুরোধের চাপে পড়ে পনের দিনের জন্যে দার্জিলিং বেড়াতে যেতেই হয়। আর দার্জিলিংয়ে এসেও ওয়াল্টেয়ারে দেবিকার কাছে একটা চিঠি দিতেও ভুলে যায় সুমন্ত।

শুধু মোহিতবাবু খবর রাখেন, সুমন্ত এখন দার্জিলিংয়ে আছে। শুধু মোহিতবাবুই চিন্তা করেন, দার্জিলিংয়ে না গিয়ে সুমন্ত এখন একবার ওয়াল্টেয়ারে গিয়ে দেবিকাকে দেখে এলেই তো ভাল করতো। আজ তো সুমন্তর পক্ষে সবচেয়ে বেশি খুশি হবার কথা, দেবিকা সেরে উঠেছে। এমন সৌভাগ্য তো কেনদিনও আশা করতে সাহস করেনি সুমন্ত।

ওয়াল্টেয়ার থেকে দেবিকা গিরিডিতে ফিরে আসবার পর মোহিতবাবু দেবিকার কাণ্ড দেখেও একটু আশ্চর্য হন। সুমন্ত এখন গিরিডিতে আসবার সুযোগ পাচ্ছে না, সময় করতে পারছে না, এর জন্য দেবিকার মনে যেন কোন আক্ষেপ আর কোন অভিযোগ নেই। সন্দেহ করেন মোহিতবাবু, সুমন্তকে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটা চিঠিও লেখে কিনা দেবিকা।

জয়া জিজ্ঞেস করে, সুমন্ত কবে আসবে?

দেবিকা হেসে হেসেই জবাব দেয়—সময় করতে পারলেই আসবে।

বিভূতি ডাক্তার আবার স্পষ্ট ভাষায় মোহিতবাবুকে জানিয়ে দিয়েছেন, না, আর ভয় করবার কিছু নেই। দেবিকা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। কথাটা বলতে গিয়ে বিভূতি ডাক্তারের গলার স্বরে খুশির উল্লাস বেজে ওঠে।—এখন ছেলেপুলে হলেও দেবিকার স্বাস্থ্যের কোন বিপদ দেখা দেবে না। বরং ভালই হবে।

গিরিডির এ বাড়ির প্রাণটা এইবার এতদিনে যেন একটা দুঃস্বপ্নের গ্রাস থেকে মুক্তি পেয়ে খুশি হয়ে ওঠে। আর দুঃখ করবার, ভয় করবার, উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। মেয়েটার তো বলতে গেলে পুনর্জন্ম হয়েছে। দেবিকার ভাগ্য আর বিভূতি ডাক্তারের চিকিৎসা এ বাড়ির মেয়ের অকাল মরণের অভিশাপ মিথ্যে করে দিয়েছে। সুমন্তর জীবনটাও একটা শূন্যতার আঘাত থেকে বেঁচে গেল।

মোহিতবাবু চিঠি দিয়ে সুমন্তকে জানিয়ে দিতে দেরি করেন না, দেবিকা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তার আগে বিভূতি ডাক্তার নিজেই সুমন্তকে চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছেন—তুমি এখন দেবিকাকে তোমার কাছে নিয়ে যেতে পার। দেবিকার স্বাস্থ্যের সব বিপদ কেটে গিয়েছে।

মোহিতবাবুর কাছে, বিভূতিকাকার কাছে, আর দেবিকারও কাছে চিঠি দিয়েছে সুমন্ত। কিন্তু স্পষ্ট করে জানাতে পারেনি, ঠিক কবে গিরিডিতে আসবার সুযোগ পাওয়া যাবে, আর ঠিক কবে দেবিকাকে সিজুয়া নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। একটা অসুবিধে আছে, সিজুয়া কলিয়ারির ম্যানেজারের বাংলোটা সুবিধের নয়। এটা একটা পুরনো ফাটলধরা বাড়ি। নতুন বাংলো তৈরি হচ্ছে।

জয়া একটু বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করেন, না হয় পুরনো বাড়িই হলো, তাতে কি এসে যায়? অন্তত একটা ভাল ঘর তো আছে। দুটো প্রাণীর থাকবার পক্ষে একটা ভাল ঘরই যথেষ্ট।

দেবিকা হেসে ফেলে—সে যখন মনে করছে অসুবিধে আছে, তখন অসুবিধে আছেই। তা ছাড়া, এত ব্যস্ত হবার কী আছে?

লক্ষ্মীমামী যেদিন আবার গিরিডিব বাড়িতে এলেন, সেদিন জয়া আর মোহিতবাবু তাঁদের মনের কথাগুলি খুলে বলবার সুযোগ পেলেন। এখন সুমন্ত একবার এলেই তো পারে। আর তো কোন ভয় নেই। বিভূতি ডাক্তার বলেছেন আর কোন সাবধানতার দরকার নেই।

লক্ষ্মীমামীর চোখ দুটোও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। না, আর ওদের প্রাণের ইচ্ছার ওপর সেই

ভয়ানক নিষ্ঠুর পাহারা রাখবার দরকার ফুরিয়ে গিয়েছে। মনে পড়ে লক্ষ্মীমামীর, সে রাতে দেবিকার ছলছল চোখের তারাতেও যেন আগুনের রেখা ঝলসে উঠেছিল। বাধা দিতে গিয়ে লক্ষ্মীমামী সেদিন নিজেও কেঁদে ফেলেছিলেন। আজ আর কোন সন্দেহ নেই, যে বিয়ের কোন মানে ছিল না, সে বিয়ের এখন খুবই মানে হয়।

লক্ষ্মীমামী খুব তাগিদ দিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন, তাই সুমন্ত এসেছে। কিন্তু দেখে বেশ আশ্চর্য হয়েছেন লক্ষ্মীমামী, সুমন্ত আর দেবিকা দুজনে শুধু বাইরের ঘরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুটি মিনিট মাত্র কথা বলেই চুপ করে গেল। সুমন্ত ব্যস্ত হয়ে ঘরের বাইরে চলে যায় আর বাগানের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে থাকে। দেবিকা উপরতলায় উঠে যায়। যেন অপরিচিত দুটো মানুষ হঠাৎ মুখোমুখি দেখার ঘটনাকে শুধু একটা আলাপ করেই শেষ করে দিল।

সে রাতে ছিল আকাশভরা আলো, আজকের এই রাতে শুধু আকাশভরা কালো। কিন্তু গিরিডির এবাড়ির প্রাণে সে রাতের সেই করুণ আতঙ্ক আর নেই। তাই নীচতলার একটি ঘরের একটি খাটে নতুন করে বিছানা পাতা হয়েছে।

কিন্তু লক্ষ্মীমামী দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, রাত দশটা বেজে গিয়েছে, তবু দেবিকা এই ঘরে ঢোকেনি। বারান্দার শেষ প্রান্তের ছোট ঘরের ভিতরে দরজার কাছে আর বাগানের ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে দেবিকা।

সুমন্ত কোথায়? দেখলেন লক্ষ্মীমামী, সুমন্ত তখনও বাইরের ঘরের চেয়ারে বসে বই পড়ছে। লক্ষ্মীমামী বলেন—রাত হয়েছে, তুমি এখন ওঘরে যাও সুমন্ত।

দেবিকারও কাছে এসে লক্ষ্মীমামী বলেন—এখানে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ওঘরে যা। অনেক রাত হয়েছে।

দেবিকা বলে—না।

—কি?

—ওঘরে যাব না।

—কেন?

—বিশ্রী লাগছে।

ধমক দেন লক্ষ্মীমামী—বাজে কথা বলো না। যাও, এখনি যাও।

চলে গেলেন লক্ষ্মীমামী। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। বুঝতেও পারেন না, এ আবার কোন সমস্যা? কিসের অভিশাপ?

মোহিতবাবু আর জয়া, আর লক্ষ্মীমামী, তিনজন তিনটি স্তব্ধ আতঙ্কের মূর্তির মতো উপরতলার একটি ঘরে বসে থাকেন আর রাত জাগেন। বিশ্বাস করতে চেষ্টা করেন, এতক্ষণে বোধহয় নীচেরতলার বাইরের ঘরের আলো নিভেছে, সুমন্ত শোবার ঘরে ঢুকেছে। কিন্তু দেবিকা কি এখনও ওর বেয়াড়া অনিচ্ছা নিয়ে ছোট ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে?

নীচের তলায় এসে দেখতে পেলেন লক্ষ্মীমামী, সুমন্ত তখনও বই পড়ছে, আর দেবিকা তেমনি দূরের ছোট ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

আজকের এই অমানিশা যেন একটা নতুন অভিশাপ। সুমন্ত আজ দেবিকার জীবনের ভয়। দেবিকা আজ সুমন্তর জীবনের ভয়। আর, বাসরঘরের মতো ওই ঘরটা যেন একটা কারাগারের যাবজ্জীবন শাস্তির কুঠুরি। ওঘরের ভিতরে ঢুকতে দু'জনের কারও মনে একটুও আগ্রহ নেই।

লক্ষ্মীমামী আর ডাকাডাকি করে এই ভয়ানক অমানিশার স্তব্ধতাকে ভেঙে দেবার সাহস পেলেন না। কিন্তু আজও আবার চোখ মুছলেন। উপরতলায় উঠে গিয়ে মোহিতবাবু আর জয়ার কাছে একটা কথা শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন।—না, এমন বিয়ের কোন মানে হয় না।

রিতা

জল নেবার জন্য রিতা ছোট পাহাড়ী নদীটার বালির ওপর এসে দাঁড়ালো।

মাঝ নদীতে বালির ওপর দিয়ে সরু একটা জলস্রোত, ঘড়া ডোবে না। অনেকক্ষণ হাত দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে একটা গর্ত করলো রিতা। তারপর সেখানে ঘড়া ডুবিয়ে দিয়ে নিজে একটু দূরে নীচের স্রোতের ধারে বসে হাত পা ধুয়ে নিল। মুখটা ভাল করে মেজে নিয়ে আঁচল দিয়ে মুছে দাঁড়াতেই চোখে পড়লো, দূরে মহুয়ার ভিড় অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। একফালি চাঁদ উঠেছে মাথার ওপর। ভর সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠেছে।

কলসীটা কাঁখে তুলতে আর ইচ্ছে করলো না। কানাটায় হাত দিয়ে হেঁচড়ে কিছু দূর নিয়ে গিয়ে একটা কালো পাথরের চটানে এসে দাঁড়ালো। আজ তার আর কিছু ভালো লাগছে না।

অনেকদিন থেকেই তার ভাল লাগছিল না। সাঁওতাল চাষার মেয়ে রিতা। পাহাড়ের ঢালুতে ছোট একটা ডিহি। এ ডিহিতে যে সাঁওতালদের বসতি তারা তাদের জংলীপনা হারিয়েছে অনেকদিন। কিন্তু চাষ আবাদেও হাত পাকেনি। আইন-কানুনকে ভয় খায় বেশি। জংলীদের মতো বেপরোয়া মহুয়ার মদ চোলাই করতে পারে না। ট্যাক্স দেয় বেশি, কাপড়-চোপড়ের প্রয়োজন বেড়েছে, অথচ আয় নেই। বার মাসে একটা ফসল তাদের ক্ষিধে মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

তাই মাঝে মাঝে কুলি রিক্রুটারের ক্যাম্প বসে। টাণ্ডেলেরা ডিহি বস্তি ঘুরে ঘুরে জোয়ান খাটিয়ে লোক যোগাড় করে আনে। কিছু আগাম পায়, খাকি কোট আর পাগড়ী পায় বিনা পয়সায়। তিন বছরের কন্ট্রাক্টে ফিজি দ্বীপে চালান হয়।

রিতা শুধু শুনেছে তার বিয়ে হয়েছে। চাষী সাঁওতালেরা প্রায় হিন্দু হয়ে গেছে। অল্প বয়সেই ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেয়। লগন মাঝির মেয়ে রিতার বিয়ে হয় মাত্র সাত বছর বয়সে।

তারপর থেকেই রিতা আজ দশ বছর ধরে শুনে আসছে মুনার কথা। বিয়ের কয়েক মাস পরে সেও তিন বছরের কন্ট্রাক্টে ফিজি চলে গেছে। রিতার শ্বশুরবাড়ির ভিটের ওপর এখন একটা ধুতুরার জঙ্গল। সে বাপ-মায়ের কাছেই থেকেছে, আর বড় হয়েছে। দিনের পর দিন শুনে আসছে,—মুনা এবার ঘরে ফিরবে। চিঠি এসেছে।

সত্যিই মুনার চিঠি আসে। সে খুব ভাল আছে। কাজের অনেক উন্নতি হয়েছে, পয়সা জমেছে কিছু। সে লেখাপড়াও কিছু কিছু নাকি শিখেছে। সাহেবরা তাকে ভালবাসে। সাহেবরা কত বকশিশ দেয়, দামী দামী পোশাক বাঁশি টুপি...

চিঠিতে প্রবাসী পতির এইসব কুশল সংবাদ দিনের পর দিন শুনে আসছে রিতা। লগন মাঝি সমস্ত ডিহি ঘুরে সগর্বে এইসব বার্তা আরও বেশি করে রটিয়ে বেড়ায়। রিতার সৌভাগ্যের কথা সকলে আলোচনা করে।

কৌতূহলের পালা শেষ হয়ে গেছে অনেকদিন। ওসব সংবাদে রিতার আর মন ভরে না। এতদিনে তার আসা উচিত ছিল।

পাথরের চটানে দাঁড়িয়ে রিতার মনে এই চিন্তাই মন্থর কুয়াশার মতো ভর করেছিল। আর কতদিন এই ভাবে, এই মনে মনে দেখবার একটানা অভিনয় চলবে?

রিতা আবার চলতে শুরু করলো। উঁচু নীচু মেঠো জমি পার হয়ে ডিহির কাছাকাছি পৌঁছেছে। কাঠগোলাপের বনে হালকা ঝড়ের দোলা লেগেছে। কাকের ঝাঁক কলরব করে

দেওদারের মাথায় এসে আড্ডা নিচ্ছে। রিতা রাগ করে একটা হোঁচট খেল।

আর একটু দূর এগুতেই দেখা গেল, পথের মাঝে দাঁড়িয়ে নুটু। একথা রিতার জানাই ছিল। শুধু আজ নয়--আজ তিন বছর ধরে নুটু তার পেছনে ঘুর ঘুর করছে। নুটু বাঁশী বাজিয়ে রিতার নামে গান গায়। উত্তরে রিতা ওকে গালাগালি দেয়। নুটু খরগোস শিকার করে এনে লগন মাঝির বাড়িতে দিয়ে যায়। ঘরশুদ্ধ লোক মাংস খায়, রিতা ছোঁয় না। নুটু যতবার ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছে, রিতা তাকে বিমুখ করেছে।

নুটুর উপদ্রবে রিতার রাগ পড়তো গিয়ে ফিজি প্রবাসী মুনার ওপর। নুটুর এই দুঃসাহস কি করে সম্ভব হয়? হয় ও জানে মুনা আর আসবে না, নয় মনে করে রিতা বুঝি মুনাকে ভালবাসে না।

মুনাকে ভালবাসে রিতা। কিন্তু মুনাকে তার প্রথম যৌবনের চোখে সে আজও দেখতে পায়নি। মুনা তার কাছে কল্পনা মাত্র। কিন্তু সে কল্পনার মধ্যে রামধনুর মতো কত না বিচিত্র মোহ মিশিয়ে আছে। সমস্ত ডিহি যার নামে স্তুতিমুখর, সেই মুনা তার স্বামী। মুনা জোয়ান মরদ, মুনা রোজগার করে, পয়সা জমিয়েছে। যখন দেশে ফিরবে মুনা, সমস্ত ডিহির দাম যেন বেড়ে যাবে। ভাগ্যিস অনেকদিন আগেই তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, নইলে ঝড়ু মাঝির মেয়েই হয়তো মুনার ঘরনী হয়ে যেত! রিতার চেয়ে সে অনেক সুন্দর।

নুটুকে ডিহির লোকে দেখতে পারে না, গরীব বলে নয়, বেজায় কুঁড়ে আর বখা। রিতার ওপর ওর অনুরাগের কথা ডিহির অনেকে টের পেয়েছে। ওকে কড়া কথায় অনেকে শাসিয়েও দিয়েছে--সামলে চল। নিজে ভাল হতে শেখ তবে রিতার মতো ভাল মেয়ে তোকে বিয়ে করতে চাইবে। তা ছাড়া পরের বউ, অত মাখামাখি ভাল দেখায় না। মুনা মাঝিও শীগগির আসছে। শেষকালে কি ডিহির মধ্যে একটা খুনোখুনি কাণ্ড ঘটাবি!

দূর ফিজির বাগানেও চাঁদ ওঠে। মুনা দেশের কথা ভাবে নিশ্চয়। কিন্তু বেশি করে ভাবে রিতার কথা। চিঠিতে খবর পেয়েছে--রিতা ডাগর হয়েছে, তার ওপর নাকি রাগ অভিমান করে আর মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলে।

সমস্ত বছরে তিনটে বা চারটে চিঠি পায়। তার মধ্যে শেষ চিঠিগুলিই মুনাকে উদভ্রান্ত করে। রিতা নাকি খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে। তবে বাপ-মার সঙ্গে প্রায়ই কোঁদল করে--মুনা কেন দেশে ফিরছে না।

রিতাকে মনে পড়ে। কিন্তু আট বছর আগে বিয়ের দিনে দেখা রিতার সে-মুখটি আর মনে পড়ে না। হলুদ ছোপানো কাপড়, পরে কাকার কোলে চড়ে বিয়ের আসরে এল রিতা। তারপর পুজোপাঠ হয়েছে, মাদল বেজেছে, ঝুমুর হয়েছে, আর অন্য কিছু মনে পড়ে না।

রিতাকে এইভাবে শুধু চিঠির মধ্যেই পেয়ে এসেছে মুনা--আর ছুটির পর বাগান থেকে ঘরে ফিরতে একা পথে কল্পনায় অনেক কিছু পেয়েছে।

মুনা তার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা পরিকল্পনা করে রেখেছে। তাই সে শুধু মুখ বুজে কঠোর পরিশ্রম করে। কিছু পয়সা জমানো চাই। সেই সঙ্গে লেখাপড়া শিখে নিতে হবে। তারপর দেশে ফিরে নিজের সঙ্গিনীকে আবার কাছে টেনে নেবে।

কিন্তু ডিহিতে থাকা আর চলবে না। শহরে একটা ছোট ভাড়া ঘরে সে নতুন সংসার পাতবে। বিনা মাইনেতে এপ্রেন্টিস খেটে বয়লার মিস্ত্রির কাজটা সে ভাল করে শিখেছে। আর জীবনে বাগানের কুলিগিরি নয়।

একটা সিঙ্গল রীডের হারমোনিয়ম কিনেছে মুনা। মাদ্রাজী গান, হিন্দী গান গাইতে শিখেছে। সাহেবদের দেওয়া ট্রাউজার পরে নাইট ক্যাপ মাথায় দিয়ে মাঝে মাঝে পোর্টেতে সিনেমা দেখে আসে।

মুনার কুলিদের টাণ্ডেল অনেক সময় ঠাট্টা করে বলেছে—কুলি হয়ে এসব কাপ্তেনী ভাল নয় রে ছোঁড়া। দেশে ফিরলে বউ আর চিনতেও পারবে না। ঘরেও নেবে না।

মুনা জানতো দেশে ফিরে আর থাকছে কে? রিতাকেও তারই মতন কায়দা-দুরস্ত করে নেবে। তাকে কুলির বউ করে রাখবে না সে। পাহাড়িয়া চাষী জীবনে ফিরে যাবার মতো মতিগতি তার আর নেই। কিন্তু এবার বোধহয় ফেরা উচিত। বেচারী রিতা।

মুনার মনে তার কল্পনার রিতা সমস্ত রূপ নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ডিহির পঞ্চায়েতের বৈঠকে নুটুর সাজার নির্দেশ হয়েছে। দশ টাকা জরিমানা। যেমন করেই হোক, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কে পাথর ভেঙে ওকে দশ টাকা রোজগার করতে হবে আর জরিমানা দিতে হবে। নইলে এ ডিহিতে ওর স্থান নেই।

নুটু বললো—আমি রিতার কাছে মাপ চেয়ে নিচ্ছি। ও ক্ষমা করে দিক্। জরিমানা যেন না করা হয়। গাঁয়ের বাইরে তাড়িয়ে দিলে আমি মরে যাব।

কিন্তু অপরাধ বড় কঠিন। সহজে মুক্তি দেওয়া যায় না। নোংরা চেহারা, কাজে কুঁড়ে, নুটুর জংলী স্বভাব আজও গেল না। উপোসেও ওর পাথুরে শরীর যেন কাবু হয় না। দিন গেলে দুটো কাঠবিড়ালী মেরে পুড়িয়ে খেয়ে নিলেই ওর চলে গেল। চুলের ঝুঁটিতে সর্বদা বাঁশী গুঁজে রাখে। সকলে যখন মাঠে খাটতে বের হয় নুটু তখন একটা আলের ওপর শুয়ে বাঁশী বাজায়।

এসব অপরাধ ক্ষমার্হ। কিন্তু পরের বিয়ে করা বউয়ের পেছনে একটা উপদ্রবের মতো লেগে থাকা, কোন পঞ্চায়েত ক্ষমা করতে পারে না।

রিতা সেদিন স্রোতে স্নান করতে গিয়েছিল। বনের নিরালায় নিশ্চিন্ত মনে সে স্নান করছে, একটা কুলের ঝোপ থেকে এক ঝাঁক তিতির উড়ে পালিয়ে গেল, যেন ভয় পেয়ে। রিতার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তখুনি ধরে ফেললো অপরাধীকে। ঝোপের ভেতর নুটুর ঝাঁকড়া চুলের মাথা দেখা যাচ্ছে।

ঘরে ফিরে এসেই রিতা লগন মাঝিকে সে কথা জানিয়ে দিয়েছে।

এই অপরাধেই নুটুর শাস্তি। নুটু হাত জোড় করে পঞ্চায়েতের কাছে নিবেদন করলো—আমি রিতাকে বহিন বলে মাপ চেয়ে নিচ্ছি। ও ক্ষমা করে দিক।

রিতা বললো—না।

নুটু ডিহি ছেড়ে চলে গেছে। রিতা তার ঔদ্ধত্যকে মাপ করতে পারেনি, এর জন্য রিতার মনেও কোনো আপসোস নেই। নুটুর এই অপরাধ, এই আবদার অনেকটা বামন হয়ে চাঁদ ধরার সখের মতো। তার স্বামী মুনার কথাও তো নুটু সবই শুনেছে। তবে কেন সে প্রতিযোগিতায় নামে, কোন সাহসে?

চিঠিও এসে গেল, মুনা আসছে। আগামী সপ্তাহে ওদের জাহাজ ছাড়বে।

রিতার বুক দুরদুর করে উঠলো। এ কী অদ্ভুত চাঞ্চল্য। মুনা আসছে। ফিজি দ্বীপের চাঁদ নীল আসমানে ভেসে এসে এই মহুয়ার মাথায় এসে দাঁড়াবে।

জঙ্গল থেকে কোঁচড় ভরে বিঠা ফুল কুড়িয়ে এনে ঘরে রাখলো রিতা। মোটা মুক্তার মালা একটা ধুয়ে রাখলো।

খিদিরপুর থেকে চিঠি এসে গেছে। জাহাজ পৌঁছে গেছে। মুনা তিনদিন পরে পৌঁছচ্ছে দেশে।

ডিহির সব মাঝিরা রাত থাকতে স্টেশনে এসে বসে রইল। ভোরে কলকাতার ট্রেন থামে। লগন মাঝে একটা পালকি খুঁজেছিল, কিন্তু ভাড়া বেশি বলে আর যোগাড় হলো না।

ট্রেন থেকে একদল কুলি নামলো। নানা গাঁ ও ডিহি থেকে কুলিদের মা ও বউ ও ছেলেমেয়েরা এসেছে। বুড়ীরা তাদের ছেলেদের কাঁধে মুখ রেখে একচোট কেঁদে নিল। যাদের ছেলেরা আসেনি তারাও কাঁদলো। শোরগোল শেষ হবার পর নানা দিকের পথে মাঠে জঙ্গলে যে যার ঘরে চললো।

আর নামলো মুনা। কালো ফুল প্যান্ট পরা, গায়ে কোট আর কম্ফোর্টার জড়ানো। পায়ে জুতো আর মোজা। বিবর্ণ একটা পুরানো ফেল্টের টুপি মাথায়, মোটা বর্মা চুরুট হাতে।

মাঝিরা হাঁ করে বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। মুনা লগন মাঝির কাছে এগিয়ে এসে হাঁটুতে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই সকলের জড়তা যেন একটু ভাঙলো। বুড়ো মাঝিদের দু'একজন মুখ ফুটে সাহস করে কুশল প্রশ্ন করলো।

তারপর ডিহির পথ। মুনা আগে আগে চলেছে। মাঝিরা সকলে পেছনে দল বেঁধে চলেছে। সাড়াশব্দ বড় কিছু নেই। মুনা এক একবার থেমে তাদের সঙ্গ নিলেও তারা যেন থেকে থেকে পিছিয়ে পড়ছে।

কথা ছিল মুনা ডিহিতে ঢোকা মাত্র ছেলেরা মাদল বাজাবে। তারপর তো সমস্ত দিনের উৎসব লাগবে। লগন মাঝি একটা পাঁঠা কিনে রেখেছে।

রিতা তার মায়ের নির্দেশ মতো সাজ করেছে। ভয়ে বুক কেঁপেছে, লজ্জা করেছে, তবুও। নিজেকে জোর করে শান্ত করে আনে রিতা। বেশি লজ্জা করে প্রথম দেখার সব আনন্দটুকু যেন নষ্ট না হয়। সে হয়তো রাগ করবে।

বটতলার নীচে লোকজনের গলার শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। কিন্তু ছেলেদের মাদল বাজলো না। রিতা কৌতূহলী হয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

লগন মাঝি আর তার সঙ্গে আরও দুতিনজন মাঝি ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে অদ্ভুত ইংরাজী পোশাকে একজন লোক। রিতা অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। এরা মুনার খবর নিয়ে আসছে।

মুনা হয়তো তুলসী মাঝির গোলায় বিশ্রাম করছে।

লগন মাঝিরা রিতার সামনে এসে দাঁড়ালো। রিতা বোকার মতো তবু দাঁড়িয়ে আছে দেখে একজন মাঝি চোখ টিপে ইশারায় জানালো—ঘরের ভেতর যা।

রিতা তবু দাঁড়িয়েছিল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেনি। লগন মাঝি আবার মুখের ইশারায় জানিয়েছিল—মুনা।

এক দৌড়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে রিতা থরথর কাঁপতে লাগলো। ওর মা এসে ধরে দু'বার ঝাঁকুনি দিল—ওকি হচ্ছে?

সমস্ত ডিহিটা স্তব্ধ হয়ে গেছে। মুনা ফিরেছে, ডিহির ছেলে মুনা। কিন্তু আমোদ তো জমল না। ছোট ছেলেরা দেয়ালে মাদল ঝুলিয়ে রাখলো। পাহাড়ের ওপার থেকে গির্জার একটা দেশী সাহেব আজ তাদের ডিহিতে ঢুকেছে, ভয় দেখাবার জন্য।

আট-হাতি খেরো কাপড়ে রিঠে মাজা শরীর জড়ানো, শালবনের জংলী চাষীর মেয়ে রিতা। চোখে জল দেখা দেবার আগেই মাকে বললো—ছেড়ে দাও, আমি ঠিক আছি।

তবু চোখের জলের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য আর একটা কল্পনার ছবি চকচক করে উঠলো —ডিহি ছাড়িয়ে বহু দূরে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কের পাশে রোদের মধ্যে জংলী নুটু একা পাথর ভাঙছে। ওর পাশে ঝুড়ি হাতে সে যদি গিয়ে একবার দাঁড়াতো, খারাপ কিছু বোধহয় হতো না।

বৈর নির্যাতন

তখন চুংফিংয়ের তাঁতিরা নিশ্চিন্তমনে রেশমী চাদর বুনছে। মাদ্রিদের অপেরা ঘরে বেহালার সুরের খেলা নিরুদ্বিগ্ন নাগরিকের দিনের ছুটি মধুর করে তুলেছে। আকাশে উঠে মাটির মানুষের মাথায় বোমা ফাটাবার খেলাটা তখনো পৃথিবীতে এত ভালভাবে জমে ওঠেনি। নরহত্যার শিল্পে এই নতুন পদ্ধতিতে হাত-পাকাবার কাজটা মাত্র তখন চলেছে, যে দেশের কাঁচা মাথার ওপর, যেখানে এবং যে সময়ে--সেই সময়।

সেই সময়, বেস কম্যাণ্ডারকে স্যালুট জানিয়ে ফার্স্ট ইণ্ডিয়ান ফ্লাইং কোবের একটি স্কোয়াড্রন উড়লো আকাশে। নীচে ভোরের পেশোয়ার কুয়াশার বোরখায় মুখ লুকিয়ে পড়ে রইলো চুপ করে। এই শ্বেতাঙ্গ বিমানবিহারীদের মধ্যে মাত্র একটি কৃষ্ণের জীব রয়েছে-- অফিসার দিলীপ দত্ত।

ভারতভূমির উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ওপারে আজাদ এলাকা। সভ্য শাসনের শান্তিকে অপমান করবার স্পর্ধায় দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে কতগুলি রাষ্ট্রহীন যূথচারী মানুষ। তাদের দুর্বৃত্তি সীমা ছাড়িয়ে উঠেছে। খাড়া পাহাড়, সরু নালা আর চোরা পথের গোলকধাঁধার মতো এই দেশ। কাদার কেল্লার গর্বেই লোকগুলি আত্মহারা। চুক্তির সম্মান জানে না, সরহদ্ মানে না, মজুরী নিয়ে খাটতে জানে না। বন্দুক বগলে, কার্তুজ দাঁতে কামড়ে--পাহাড়ের মাথায় পাথরের মতো নিঃশব্দে মিশে থাকে। ক্রোশের পর ক্রোশ ছাড়িয়ে ওদের চোখের দৃষ্টি যেন ইংরিজি সড়কের ধুলা শুঁকতে থাকে। সড়ক দিয়ে একটা সদাগরের কাফিলা পার হয়। আচম্বিতে নেকড়ের দলের মতো হানা দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে।

ডেরা ইয়াসিনের নাম-করা মহাজন তিলক সাহু আজও বুক চাপড়ে বেড়ান। বিয়ের আসর থেকেই তাঁর ছেলে আর ছেলের বউকে ধরে নিয়ে গেছে। তিলক সাহু আপসোস করেন--ছেলের কানে এক জোড়া হীরের মাকড়ি ছিল। সেটাই ভুল হয়েছে, নইলে রক্ষা পেত ছেলেটা। আর মেয়েটা--সেসব মেয়ের বাবা রাজারামের ভাবনা। সে ইচ্ছে করলেই মেয়েকে ছাড়িয়ে আনতে পারে, ওর টাকার ভাবনা নেই।

ছেলের মায়ের কান্নাকটি আর চীৎকারেই তিলক সাহু ব্যতিব্যস্ত। জীবনব্যাপী মহাজনী সাধনার যা-কিছু সিদ্ধি এইবার শেষ হতে বসেছে। সত্তর তোলা সোনা নিয়ে এক মুন্সীকে পাঠিয়েছেন আজ সাতদিন হলো। কে জানে কোন্ এক খেলের মালিকের খোঁয়াড়ে ছেলেটা পড়ে আছে। ছাড়িয়ে আনতে হবে। মুন্সী ফিরলে হয়। ভয় হয়--ছেলেটা তো গেছেই, এবার সোনাটাও যাবে, মুন্সীও বোধহয় আর ফিরলো না।

রাজমাক রোডের সব কালভার্টগুলি ভেঙে দিয়েছে। রোডের ধারে পর পর তিনটে খসাদারকে মেরে ফেলেছে। কারা করেছে, বুঝতে দেরী হয় না।

এ সবই সহ্য করা যায়। সুসভ্য চিকাগো কত আপ কাপোনকে সহ্য করে। সাম্রাজ্যওয়ালা ইংরাজের স্নেহাধীন কলকাতা কত মীনা পেশোয়ারীকে সহ্য করেছে। তার জন্য আকাশে এক ঝাঁক বম্বোদর বিমান ছাড়তে হয়নি। কিন্তু আজাদী বদমাসদের নতুন একটা অপরাধের খবর পাওয়া গেছে, কোনমতে তার আর ক্ষমা হতে পারে না। পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ থেকে তিনশো মালিক আর মেহতরের এক জীর্গা হয়ে গেছে। চেনারের ছায়ায় বসে আইন তৈরি করেছে তারা, পীরগলের চূড়ার ছবি আঁকা সোনার মোহর চালু করেছে। নতুন একটি বসিয়েছে কুনার নালার ধারে। দর-বাঁধা পণ্যের লেনদেন হয়। মেহমন্দেরা বস্তা বস্তা বাদাম আনে, ইয়ুসুফজাইরা নিয়ে আসে পশম। বিবাদে বিচার করার জন্য এক প্রবীণ মুল্লা কাজীর আসনে বসেছেন--জির্গার প্রস্তাবই তাঁর কাছে হাদিস।

মারামারি ভুলে নতুন করে এক মিতালীর আনন্দে এক লক্ষ ডানপিটে যেন এক রাজ্য গড়ার খেলাপাতি খেলছে। ছোট্ট একটি রাষ্ট্রের পুতুল গড়েছে তারা। এই নতুন বিধান নতুন অহঙ্কারের পতাকার মতো তাদের মনে মনে উড়তে থাকে। জির্গার বৈঠক শেষ হয়—শত শত উদ্ধত শির নেমাজের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ভরসা ও আশ্বাসে নত হয়ে আসে।

তাই মৃত্যুগর্ভ শাস্তির মেঘ উড়ছে আকাশে। এক দানবের সংসার ছিন্নভিন্ন করতে চলেছে। ভাস্কো-ডা-গামার নখায়ুধ প্রেতাত্মা যেন এক নতুন ভারতের রক্তের গন্ধ পেয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে।

বায়ুসমুদ্রে ডানা ঝাপটে দিলীপ দত্তের মন সুখে উড়ে চলেছে। সম্মুখে পশ্চাতে ডাইনে বাঁয়ে হুক বেঁধে এক ধূমকেতুর পরিবার যেন সীমাহীন নীলে পাড়ি দিয়ে চলেছে। নীচের দিকে তাকালে তখনো দেখা যায় দু'একটা মিনারের গায়ে হিমকাতর প্রভাতের একটু আড়ষ্ট আলোকের প্রলেপ লেগেছে মাত্র। তারপর যব আর জাফরানের ক্ষেত—কতগুলি মখমলের জাজিম যেন এখানে ওখানে পাতা রয়েছে। স্বাত উপত্যকার গিরিনদীটা রূপালী ফিতার মতো একবার চক্‌চক্ করেই মিলিয়ে গেল।

এমনি করে হেসে বিদায় নিয়েছিল ডোরা। প্ল্যাটফর্মের শত শত মুখের ভীড়ের মধ্যে সেই স্মিতমুখের ছবি ভোলা যায় না। ডোরা কাঁদেনি, মুখভার করেনি। কোন উদ্বেগ কোন অভিমানবাণী মুখ ফুটে বার হয়নি। শুধু ট্রেন ছাড়বার আগে হেসে হেসে এক মুঠো প্রীতির কণিকা দিলীপের যাত্রাপথে মাঙ্গলিকের মতো ছিটিয়ে দিয়েছিল। ডোরার বাবা মিস্টার নন্দীও সঙ্গে এসেছিলেন। পিঠে হাত বুলিয়ে সস্নেহে সমাদরে বিদায় দিয়েছেন।—যাও, বড় হও, সুনাম কর, জীবনের সব ব্রত সফল কর। বাঙালীর মর্যাদা বাড়িয়ে তোল। তারপর সুস্থদেহে আমাদের কাছে আবার ফিরে এস দিলীপ।

দিলীপ ভাবছিল—ডোরা যখন পরের ডাকে তার চিঠি পাবে, বিবরণ পড়ে মুগ্ধ হয়ে যাবে।

দিলীপ দত্তের ভাবনায় পুলকের বিদ্যুৎ শিউরে ওঠে। তার কারণ আছে। চিরকালের সাহসী ছেলে দিলীপ। তার গায়ের জোরের খ্যাতি সুজাবাগের মৌমাছিটিও জানে। হারু ফটোগ্রাফারের দোকানে শো-কেসের ভেতর দিলীপের একখানি ফটো যেন পৌরুষ ও রূপের নমুনা হয়ে এখনো সুজাবাগের বুকে মেডেল হয়ে ঝুলছে। তাইতো ডোরা নন্দীর মতো মেয়ে—আজ নয়, দিলীপ যখন সেন্ট ডেনিসে পড়তো, তখন থেকেই...।

বিলিতি ছাত্র। চালিয়াতির সব কায়দাগুলি বেশ দুরস্ত ছিল দিলীপের। সার্জের স্যুট ছাড়া ক্লাসে আসতো না। কোটের বুকের ওপর আল্‌মামেটারের ইনসিগনিয়া হলদে সুতোয় আঁকা থাকতো। কলেজ ইউনিয়নের বার্ষিক উৎসবে হুডরু ঝর্ণাতে যখন পিকনিক জমে উঠতো, পথে যেতে মোটর লরীর ছাদে বসে জ্যাক উড়িয়ে সবচেয়ে বেশী গলা ফাটিয়ে হুররা দিত দিলীপ। নন্দী সাহেবের বাংলোর বারান্দায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতো ডোরা। দিলীপের সব চপলতা ধন্য হয়ে যেত। মিষ্টি মিষ্টি হাসতো ডোরা, তাকিয়ে থাকতো ঘাড় হেলিয়ে।

হঠাৎ শোনা গেল, ডোরা নন্দীর বিয়ে প্রায় ঠিকঠাক। মোমের মতো সাদা ও সিড়িঙ্গে সেই পাঞ্জাবী প্রফেসর আর্থার সিংহের সঙ্গে। দিলীপের বিহ্বল যৌবনের অভ্যর্থনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে এক চারুমুখী অ্যাফ্রোদিতে যেন হঠাৎ অকারণে মুখ ভেংচে দিল। সাহেবিয়ানার পলস্তারার নীচে চিড় খেয়ে ফেটে উঠলো একটি মেটে-মলিন বাঙালী-অভিমান।

সেইদিন প্রথম ধুতি-পাঞ্জাবি পড়ে ক্লাসে দেখা দিল দিলীপ। সেইদিন সেন্ট ডেনিস নতুন চোখে দেখলো দিলীপকে। দিলীপও সেন্ট ডেনিস-এর এক নতুন রূপ দেখলো।

সংস্কৃতের অধ্যাপক মিস্টার শর্মা অর্থাৎ পণ্ডিতজী দিলীপকে আড়ালে ডেকে নিয়ে সস্নেহে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন।—স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু—তুম্‌হারা হৃদয় গগনমে

বিবেককা সূর্য চমক্ উঠা হ্যায়। সম্‌ঝা?

মৌলবীসাহেব দিলীপকে দেখেই খুশিতে থমকে দাঁড়ালেন।—বাহবা বাহবা। কেয়া বাৎ হ্যায়—জওয়ান-ই-বঙ্গাল।

ফার্স্ট ইয়ারের কয়েকটি ছেলে কমনরুমে দিলীপকে ঘিরে দাঁড়ালো—ধুতি-পাঞ্জাবিতে আপনাকে কী সুন্দর মানিয়েছে দিলীপদা!

দিলীপদা! এই সামান্য একটি সম্বোধনের আবেদন দিলীপকে যেন প্রীতিভরে যেন গলা জড়িয়ে ধরলো।

যে রমেশ খদ্দরের উড়ুনি গায়ে খালি-পায়ে কলেজ আসতো, কোনওদিন দিলীপের দিকে অবহেলাভরেও চোখ তুলে তাকাতো না, সেই রমেশ দিলীপকে নেমতন্ন করে বাড়ি নিয়ে গেল। রমেশের মা এসে দিলীপের কুশল-পরিচয় নিলেন। রমেশের বোন শোভা খাবার এনে দিল। বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পড়ে, আলোচনা করে রমেশ, দিলীপ ও শোভার একটি সুন্দর সন্ধ্যে কেটে গেল।

তোচিখেল পার হয়ে গেল। উদ্‌গ্রীব পাথুরে কেল্লাটা যেন নিঃশব্দে চুপিচুপি দেখলো, ব্যোমচর গ্রহের মতো রুষ্ট বিমানবহর গোঁ গোঁ করে উড়ে পার হয়ে যাচ্ছে। দেখা যায়, উঁচু উঁচু পাহাড়ের সর্পিল বিস্তার—একটা কবচাবৃত সরীসৃপ যেন নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। সূর্য ওপরে উঠছে। পূবদিক থেকে একটা আলোর ঝালর হেলে পড়েছে মাটির দেশের কুহকের ওপর। সবই ছলনা বলে মনে হয়। নীচে হাজার মিটারের ব্যবধানে মহীতল যেন মিথ্যে হয়ে গেছে।

আজ তেমনি মিথ্যে হয়ে গেছে শোভা।

ডানাভরা নতুন পরাগের আবেশে প্রজাপতি যেমন খানিক ওড়ে, খানিক বসে—কাছে আসে না, দূরেও সরে যায় না, শোভার ব্যবহার ছিল সেই রকম। সেই যেদিন প্রথম দেখা, সেদিন থেকে। কথা বলে যায় ঠিকই, কিন্তু উত্তরটা শোনে কিনা বোঝা যায় না। দুটো কথা বলেই হয়তো দেরাজের দিকে এগিয়ে গেল ; চোখে পড়লো আয়নাটা, তখুনি সরে গিয়ে ঘরের কোণের দিকে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলো। দিলীপের বাড়িতে আসতো শোভা, ড্রইং রুমের নিভৃতে গল্পের ভেতর দিয়ে কত দুপুর সন্ধ্যে হয়ে যেত।

দিলীপ কতবার অনুযোগ করতো—একটু সুস্থির হয়ে বসো শোভা। এ রকম ছটফট কর কেন?

শোভা—ভয় করে।

—কেন? যদি ধরে ফেলি, তাই কি?

—না, যদি ধরা পড়ে যাই।

সেদিন এই দূরে সরে থাকাটাই স্বাভাবিক ছিল, হৃদয়ের দিক দিয়ে এত সান্নিধ্য ছিল বলেই। শোভার ভালবাসার হাওয়া দিলীপের মনের গায়ে গিয়ে লেগেছে। দিলীপের সাজপোশাকের রেশমী বাহার কবে যে সাদা খদ্দরে এসে শুচিতা লাভ করেছে, তা সে নিজেই ঠিক বলতে পারে না। দিলীপ একেবারে বদলে গেছে। কার্তিক পূর্ণিমার দিন ধীরাজের বাড়ির সবাইয়ের সঙ্গে শোভাও গিয়েছিল মধুবনের মেলা দেখতে। মাত্র একটি বেলার জন্য দশ মাইল দূরে একটু ঘুরে আসা। কিন্তু যাবার আগে দিলীপের মুখভার শোভার মেলা দেখার আনন্দটুকু মাটি করে দিল। শোভার মনে হলো—ভালবাসার রীতিই বুঝি এই রকম। একটু মাত্রা ছাড়া, একটু অভিমান-ভীরু!

তাই যদি না হয়, তবে দিলীপ এত বদলে যায় কি করে?

মামুদদের একটা গ্রাম। দূরবীনটা একবার চোখে লাগালো দিলীপ। অনেক দূরে একটা চ্যাপ্টা পাহাড়ের মাথায় হাজার খানেক লোক হাঁটু মুড়ে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে

আছে। পাশে এক একটি লম্বানল রাইফেল শোয়ানো আছে। আজ জুম্মার দিন। সকালবেলার নেমাজ সারছে একটা লস্করের দল। স্কোয়াড্রন উল্কার মতো ঝাঁপ দেবার আবেগে স্পীড বাড়িয়ে দিল। চোখের পলক ফেরাতেই দেখা গেল—ত্রস্ত চতুর হরিণের পালের মতো তরতর করে নেমে লস্করের দল লুকিয়ে পড়লো একটা সুগভীর পাহাড়ী খাদের ভেতর।

প্রতিবছর রামনবমীর মিছিলের দিনে কসাইপাড়ার মসজিদের কাছে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা করে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটাতো। জের চলতো চারদিন ধরে। সাঁজবাতির অর্ডার আর মিলিটারী পাহারা তুচ্ছ করে সুজাবাগের অলি-গলিতে অন্ধকারের মধ্যে ছুরির উৎসব চলতো।

গত বছর দাঙ্গার সময় দিলীপ খুব নাম কিনেছিল। চকের ওপর যে ভয়ানক দাঙ্গাটা হয়েছিল, তাতে হিন্দুপক্ষের নেতা ছিল দিলীপ। বড় হিংস্র আর বেপরোয়া দিলীপের হাতের লাঠির মার। বাছবিছার নেই। চেনামুখ, অচেনামুখ, বুড়ো হোক্, জোয়ান হোক্, রোগা হোক বা মোটা—একবার সামনে পড়লেই হলো। শিক্ষিত ডেনিসিয়ানের রুচির মুখোশ যেন কিছুক্ষণের জন্য খুলে পড়ে যেত। শুধু খুলি ফাটাবার নেশায় পাগল হয়ে যেত বারভুঁয়ে বাংলার একটা লেঠেল সর্দার লাফঝাঁপ দিয়ে বেড়াত।

মিলিটারী এসে গুলি চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়, প্রতিবেশীর হিংসার চেয়ে বীভৎসতর বুঝি আর কিছু হয় না। তাই সারারাত্রি গলিতে গলিতে ঠেঙাঠেঙি কোপাকোপি চলে। পথের উপর বোবা ভিখারী, বদ্ধ পাগল আর ছোট ছেলের লাশ পড়ে থাকে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, সুজাবাগ শহরের হিন্দু-মুসলমানের মতো চিরকালের ভীরু মেনিমুখো প্রাণগুলি হঠাৎ খুনী তাতারের মতো হত্যার প্রেরণায় এত উতলা হয়ে উঠলো কি করে? এই চকের উপরেই গত মাসে এক মাতাল সাহেবের মোটর ইশাকের ছেলেটাকে চাপা দিয়ে মেরেছিল। এক হাজার হিন্দু-মুসলমানের ভীড় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্যের নিষ্ঠুরতা হজম করেছিল। সাহেবটাকে ধরে থানায় নিয়ে যেতেও কেউ এগিয়ে যায়নি। শুধু এক হাজার পদদলিত ব্যাঙের ফুসফুস যেন মোটর ঘিরে দাঁড়িয়ে সুনীচ সৌজন্যে ফিসফাস করে আপসোস্ করছিল। এখনও একটা কাবুলিওয়ালা একা ছুতোরপাড়ায় ঢুকে পেটে লাঠি খুঁচিয়ে সুদ আদায় করে আনে। সেই ইশাক্ আজ যদি দিলীপকে একবার বাগে পায়? থাক্ সে কথা। দিলীপকে কথাই ধরা যাক্—খুড়িমার কার্বঙ্কল অপারেশন দেখে যার মাথা ঘুরে গিয়েছিল, সেই দিলীপ আজ...।

শোভা বললো—তুমি এসব নোংরা কাজে থেকো না দিলীপদা।

দিলীপ—আমি গায়ে পড়ে কাউকে ঠেঙাতে যাব না। তবে পাড়ার ভেতর ঢুকে কেউ উপদ্রব করতে এলে বা বেলতলার ঐ মন্দিরটাকে কেউ ভাঙতে এলে বাধা দিতে হবে অবশ্য। নইলে বৃথাই এতদিন এক্সারসাইজ করে হাতের গুলি পাকিয়েছি।

—কিছু করতে হবে না তোমাকে।

—এসব ব্যাপার তোমার গান্ধীমার্কা অহিংসা কিন্তু কোন কাজের কথা নয় শোভা।

—বেশ তো, তোমার গায়ের জোর যখন আছে, তখন দু'দলকেই লাঠিপেটা করে শায়েস্তা কর।

—কি রকম?

—হিন্দুরা যখন মুসলমান পাড়ায় আগুন দিতে দৌড়য়, তখন ওদের ঠেঙিয়ে ঘরে ফিরিয়ে দিও। মুসলমানদেরও তাই কর।

—তা হয় না।

—তা হয় না যখন, তখন দু'দলকেই হাতজোড় করে বাধা দাও।

—তাতে কোন ফল হবে কি?

—তুমি একবার করেই দেখ, ফল হয় কি না?

দিলীপের মুখে মৃদু হাসি দেখে বোঝা যায়, শোভার কথাগুলি তার বিশ্বাসের মধ্যে

আমল পাচ্ছে না। হাসিটা ভদ্রগোছের বিদ্রূপের মতো মনে হয়।

শোভা বলে--শুনেছি, হিন্দুরা তোমাকে একটি বীর বলে শ্রদ্ধা করে। মুসলমানেরাও নাকি তারিফ করেছে--সাবাস্ দিলীপবাবুর হিম্মৎ! তাতেই বোধহয় গলে গেছ। মেকলে সাহেবের টিটকারি মিথ্যে করে দিতে গিয়ে তোমরা শেষে গুণ্ডাগিরির মধ্যে গিয়ে পড়েছ। এটাও এক ধরনের পাঁঠা মেরে শক্তিপূজা। ছি ছি!

দিলীপ আর উত্তর দিল না। শোভার কথাগুলির রূঢ়তায় প্রথমে রাগ হলো। তারপর কিছুক্ষণের জন্য যেন একটু বিমর্ষ হয়ে পড়লো। তারপর একটা অস্বস্তি। কিছুক্ষণ চঞ্চল হয়ে পড়লো দিলীপ। উঠে গিয়ে জানালার ধারে গিয়ে একটা সিগারেট ধরালো।

শোভা বললো--সত্যিই তুমি সিগারেট ছাড়তে পারবে না দিলীপদা?

জ্বলন্ত সিগারেটটা আর সিগারেটের প্যাকেটটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিল দিলীপ।

শোভা—আমার উপর রাগ করো না। যদি অন্যায় কিছু বলে থাকি, তবে আমায় মাপ করো।

দিলীপ--না, কোন অন্যায় হয়নি। আমি কাল কসাইপাড়ায় মসজিদের সামনে একা দাঁড়িয়ে মিছিল পার করবো।

শোভার মুখ আশঙ্কায় কালো হয়ে এল—এরকম করো না দিলীপদা।

--ভয় নেই। তুমিও আমার সঙ্গে থেকো শোভা।

শোভার মুখ আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

মিলিটারী পুলিশের ট্রাকগুলি বৃথাই সিন্দুক ভরা বুলেটের বোঝা নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ালো। পেট্রল পুড়লো শুধু শুধু। কোতোয়ালী কর্তাদের তোড়াজোড় এবারের শোভাযাত্রায় নতুন একটা সঙের মতো মনে হলো। মসজিদের সিঁড়িতে পাশাপাশি বসেছিল দিলীপ আর শোভা। মুসলমান ছাত্রেরা এসে মাঝে মাঝে হেসে গল্প করে যাচ্ছিল। কাতার বেঁধে মুসলমান জনতা রামনবমীর শোভাযাত্রা দেখলো। শোভাযাত্রার আগে আগে লাঠিধারী পুলিশগুলি বেকুবের মতো মাথা নীচু করে হাসছিল।

বেতারের অপারেটর দিলীপের হাতে একটা নোটিশ গুঁজে দিয়ে গেল। আর নাহি দূর। একটি সুকোমল সবুজ রেজাই দিয়ে ঢাকা আকা-খেল প্রান্তর। ঠাসা গমের ক্ষেত। মাঝে মাঝে এক একটা বুড়ো দেওদারের মাথায় তখনো লম্বা লম্বা কুয়াশার জট ঝুলছে।

বাইরের ঘরে বাবার সঙ্গে নন্দী সাহেবের আলাপের হর্ষ ও উচ্ছ্বাস শোনা যায়। ডোরাও নিশ্চয় এসেছে—ওর চুলের ক্রীমের মৃদু সুগন্ধ ভেসে আসছে।

ওঁরা এসেছেন অভিনন্দন জানাতে। দিলীপের চাকরির কথাটা শুনেছেন। আজ পর্যন্ত কোন বাঙালীকে যে সুযোগ দেওয়া হয়নি, দিলীপ তা পেয়েছে। এক অভাবিত গৌরবে আজ দিলীপের কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা। ফৌজী কৌলিন্যের ফুলের মুকুটটি যে বিমানসেনা দিলীপ, আজ সেই সেরা পদ ও পংক্তির সম্মান গ্রহণ করতে আহ্বান-লিপি পেয়েছে। শীঘ্রই পেশোয়ার গিয়ে ট্রেনিংয়ের জন্য কাজে যোগ দিতে হবে।

প্রফেসর আর্থার সিংহ অসুখে পড়ে ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেছে। তাই ডোরা নন্দী এখনও সিংহ হয়নি।

—সুপ্রভাত!

অপ্রতিভভাবে হেসে ডোরা দিলীপের পড়ার ঘরে এসে ঢুকলো। ঠিক আগের মতো মুখ ভরে হাসির ঝলক ফুটিয়ে তুলতে পারছে না ডোরা। চেষ্টা করলেও দ্বিধায় জড়িয়ে যায়।

—কেমন আছেন?

দিলীপের প্রশ্নে আবও লজ্জিত হয়ে পড়লো ডোরা। বললো—এবার একেবারে মাটি ছেড়ে আকাশে উঠে গেলেন ; ঘাসের ফুলকে কি আর চিনতে পারবেন?

—মাটির ঢেলা আকাশে উঠলে ঝুপ্ করে মাটিতেই পড়ে যায়।

—না-ও পড়তে পারেন। যদি আকাশকুসুম হয়ে যান?

দিলীপ মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। সেই প্রথম জীবনের স্বপ্নে দেখা মাটির কোহিনূর আজ ঘাসের ফুলের মতো সুলভ হয়ে গেছে।

ডোরা বললো--আমার একটা অনুরোধ আছে দিলীপবাবু।

দিলীপ—বলুন।

--দূরে গিয়েই একেবারে পর হয়ে যাবেন না? অন্তত সপ্তাহে একটিবার করে যাতে আপনার খবর পাই তার ব্যবস্থা করবেন। ভুলবেন না, আমি কিন্তু আশা করে থাকবো।

—সত্যি আশা করে থাকবে তুমি?

—হ্যাঁ দিলীপ।

--তুমি এতদিন এই আশার কথা আমাকে বলনি কেন ডোরা? তাহলে আমি হয়তো এ কাজটা নিতাম না। অবশ্য, এখনো নেব কিনা ঠিক নেই।

—ভুল করো না দিলীপ। তোমার জীবনের উন্নতির পথে আমি কোন বাধা দিতে চাই না, তাতে আমার যত দুঃখই হোক না কেন, সব সইতে পারবো। জানি, একদিন তোমায় ফিরে পাব।

স্কোয়াড্রন ক্রমেই ওপরে উঠছে—রাবণের সিঁড়ির মতো যেন ঔদ্ধত্যে স্বর্গের দিকে মাথা ফুঁড়ে চলেছে। হিমাক্ত বাতাসের জীব যেন ছুরির মতো গায়ের চামড়া ছুলে ফেলবে। একটা কাঁপুনির বেগ পুরু ফ্লানেলের কিট ভেদ করে দিলীপের হাড়ে গিয়ে বিধঁছে। মাথাটা রিমঝিম করতে লাগলো। বমির তোড় এল গলা ঠেলে। অসাড় নাকের নালী দিয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। অক্সিজেনের মুখোশটা চাপিয়ে কোন মতে সুস্থির হয়ে নিল দিলীপ।

শোভার জন্য দুঃখ হয়, রাগও হয়। কিরকম যেন ওর প্রকৃতি। দাদা রমেশের দেশ-জাতি-সমাজ-স্বাধীনতার কতগুলি বুলি শিখে তোতাপাখির মতো শুধু আওড়ায়।

সুজাবাগের কে না শুনে খুশী হয়েছে? প্রত্যেক বাঙালীই শুনে বোধহয় খুশী হবে—দিলীপ দত্ত যোদ্ধা হয়েছে। এমন বুকের ছাতি, এমন নির্ভীক দুঃসাহসী ছেলে, ওকি কলম পিষে পিষে জীবনটা ব্যর্থ করে দেবে? যোগ্য কাজই পেয়েছে দিলীপ।

এতদিন পরে অনেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল ছেলেটা। পাঁচু ডাক্তারের সেই তোখড় মেয়েটার পাল্লায় পড়ে স্রেফ ভোঁতা হয়ে যাচ্ছিল। ঐ মেয়েটারই নাম শোভা—এক নম্বরের স্বরাজওয়ালী। ভাই-বোনে'মিলে শুধু গান্ধী গান্ধী করে। পাঁচু ডাক্তারের পসার তো জানা আছে—ফুটো স্টেথিস্কোপ। দেনার দায়ে ভিটে বিকোতে বসেছে। মেয়েটাকে যদি দিলীপের মতো ছেলের কাছে গছিয়ে দিতে পারে—তবে আর ভাবনা কি? ভাউচারে হাতী কেনা হয়ে গেল।

ডোরার সঙ্গে দেখা হবার পরেই শোভা উপস্থিত। দিলীপ বেড়াতে যাবার জন্য সবে সাজ সেরে গ্যারেজের দিকে চলেছে—আজ টু-সীটার নিয়ে বার হবে। আজকের সাজটার মধ্যেও নিদারুণ এক ব্যতিক্রম। সন্ধে হতেই ট্রাই-কলার-ট্রাউজারে একটি আধ-ময়লা বৈলাতিক সন্ধ্যাতারার মতো আবার বহুদিন পরে নতুন করে চমকে উঠেছে দিলীপ।

শোভা বুঝে বুঝে এই অসময়েই এসে দাঁড়িয়েছে, যেন পথ রুখে।

—তোমার চিঠি পেয়ে আসছি, অবশ্য আসতে লেখনি। কিন্তু ক্ষমা চেয়েছ কেন? লিখেছ, ভাগ্য তোমাকে ভিন্ন পথে টেনে নিয়ে চললো, সেই চরম দণ্ড বরণ করে নিয়েছ—তবু আমাদের ভালবাসার স্মৃতি চিরন্তন হয়ে থাকবে...। বেশ সুন্দর লেখাটা।

দিলীপ--তুমি ভুল বুঝে ঠাট্টা করেছো, কিংবা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করে...

কথাগুলি তোতাপাখির মতো শোনালো। যেন একটা আত্মগ্লানির লাঞ্ছনাকে জোর করে এড়িয়ে যাবার জন্য ফাঁক খুঁজছে দিলীপ।

শোভা--আজ সুজাবাগের কাক-কোকিলও জানে তোমার সঙ্গে আমার নাকি প্রেম হয়েছে।

--তাদের এই জানা তো মিথ্যে নয় শোভা।

--বেশ তো, এখন তারা যদি কেউ তোমায় জিজ্ঞাসা করে যে, সেই প্রেমযমুনা এক লম্ফে ডিঙিয়ে তুমি চললে কোথায়?

--বলবো, জীবনে একটা কঠোর পরীক্ষার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, তাই এই বিচ্ছেদ মেনে নিতে হলো।

--বাপরে বাপ্। পরীক্ষা? তার ওপর কঠোর? সোজা কথায় যাকে বলে, একটা চাকরি পেয়েছ মাত্র। বাঙালীর ভীরুতার অপবাদ ঘোচাবে, মিছে কেন এত সব বড় বড় কথা বলছো দিলীপদা? বল, তোমার নিজের অপবাদ ঘুচবে, তুমি নিজে বীর হবে, যোদ্ধা হবে। তাই দিয়ে বাঙালীর বীরত্ব বোঝায় না।

--কেন বোঝায় না?

--যেমন তুমি মোটর গাড়িতে বেড়াও মানে বাঙালী জাতির মোটর গাড়িতে বেড়ানো বোঝায় না।

--আমার একটা খুব সোজা কথার উত্তর দেবে শোভা? সত্যিই কি বিশ্বাস কর তুমি, চরকায় সূতা কেটে স্বরাজ পাওয়া যাবে?

--মেনে নিচ্ছি পাওয়া যাবে না। এবার তুমিই বল, কি করে পাওয়া যাবে।

--যুদ্ধ করেই পেতে হবে, পৃথিবীর আর পাঁচটা পরাধীন জাত যে ভাবে লড়াই করে স্বাধীনতা পেয়েছে, সেই ভাবে।

--তাও মেনে নিলাম।

--তাই বাঙালীকে শুধু কলমবাগীশ কেরানী হয়ে থাকলে চলবে না। যুদ্ধবিদ্যা শিখতে হবে।

--অন্য সময় হলে তোমার মতো লোকের মুখে একথা শুনলে রসিকতা মনে করে হাসতাম। কিন্তু আজ সত্যিই দুঃখ হচ্ছে। যুদ্ধে চাকরি করা আর যুদ্ধবিদ্যা শেখা কি একই ব্যাপার দিলীপদা? এই তত্ত্বটা কি তোমাকে বুঝিয়ে বলার দরকার আছে? তুমি তোমার মনকেই প্রশ্ন করে দেখ একবার।

সুবিজ্ঞ আচার্যার মতো শোভা উপদেশ শুনিয়ে যাচ্ছে। দিলীপের মনের তারগুলি ক্রমেই বিরক্তিতে মোচড় দিয়ে কড়া হয়ে উঠতে লাগলো। বললো--তুমি কোন নতুন কথা শোনাচ্ছ না শোভা, তোমারই মতো গোঁড়া ঠাকুরমায়েরা এই যুক্তি দিয়েই হিন্দু ছেলের সমুদ্রযাত্রাকে পাপ মনে করতেন। সব বিদ্যারই অধিকারী হতে হলে আগে ছাত্র হতে হয়। ছাত্র হওয়াকে চাকরি করা বলে না।

শোভাকে এতক্ষণ সত্যিই যেন আততায়িনীর মতো দেখাচ্ছিল। দিলীপের বিরক্তিভরা উত্তর শুনে চোখ নামিয়ে নিল। না, আজ আর দাবী করে বলবার কিছু নেই। চুপ করে হেঁট মুখে দাঁড়িয়ে রইলো শোভা। দিলীপের মনে হলো, বড় বেশি কালো দেখাচ্ছে শোভাকে। বোধহয় এত ঘামিয়েছে আর হাঁপাচ্ছে তাই। মমতা হয়, কেন এরা মানুষকে শুধু পেছনে টেনে রাখতে চায়। জানে না, তাতে কোন ফল হয় না। দিলীপ একটু অনুনয় করে বললো--দুঃখ করো না শোভা।

শোভা--যুদ্ধ শিখতে হলে মানুষ মারতে হয়, সেটা জান তো?

দিলীপ--শত্রুকে মারতে হয়।

--তুমি শত্রুকে চেন?

—চেনবার কোন প্রয়োজন হয় না।

—আমাকে জব্দ করার জন্য গায়ের জোরে কিছু বলো না দিলীপদা। আমার কথার উত্তর দাও।

—না, উত্তর দেবার কিছু নেই।

দিলীপের কথাগুলি ক্রমেই রুক্ষ হয়ে উঠছে, পালাবার পথ না পেলে বেড়াল যেমন রুষ্ট হয়ে ওঠে। শোভাও তেমনি টিট মেয়ে, সব অপমান সহ্য করে আজ যেন একটা হেস্তনেস্ত করার জন্যই সে এসেছে। বললো—তুমি এই চাকরি নিও না। তুমি নিজেই বুঝতে পারছ না যে, তোমার দ্বারা এসব কাজ হতে পারে না।

—কেন?

—দশজনের বাহবা আর হাততালির উস্কানিতে দাঙ্গা করতে গিয়েছিলে, ভুল বুঝতে পেরেছিলে। এবারও হাততালির তারিফ পেয়ে যোদ্ধা হতে চলেছ।

দিলীপ শোভার কাছে এগিয়ে এসে সান্ত্বনার সুরে বললো—আজ অন্য কথা কি আর বলবার কিছু নেই শোভা? শুধু আমার চাকরিটা নিয়েই তোমার দুঃখ? আমি চলে যাব, শুধু এই কথাটা ভেবে তোমার কি...।

শোভা এইবার হেসে ফেললো—সে দোহাই দেবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে ডোরা। থাক্, সে সব কথা।

একটি কথার আঘাতে দিলীপের সব মুখর চপলতা স্তব্ধ হয়ে গেল। কিছু একটা বলবার জন্য বৃথা চেষ্টা করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল শুধু।

শোভা—এইবার আমি যাই। অনেক সময় নষ্ট করলাম।

থার্মোমিটারের পারা শূন্য-সেন্টিগ্রেড-এর নীচে বিশ ডিগ্রী নেমে গেছে। সময়ের প্রবাহ যেন ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে এক চরম লুপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। বিমানবহরের সেই একটানা সরোষ গুঞ্জন আর নেই। অদ্ভুত এক শব্দের উৎসবে মহাব্যোম স্পন্দিত হচ্ছে, যেন গান গাইছে একটা বিদেহী পরমাণুর জগৎ। আলোক ও শব্দের গুঁড়ো ছড়ানো এই বায়ুর দেশে পৃথিবীর জ্ঞানবুদ্ধি অসহায় হয়ে পড়ে। দিলীপ দত্ত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তাকিয়ে থাকে। বিজ্ঞানী হওয়া উচিত ছিল তার, তবেই না এই পদার্থ-প্রপঞ্চের কিছু রহস্য লুঠ করে নিয়ে যেতে পারতো। যদি এখানে কেউ আসে, সে যেন এই অগোচরের অহঙ্কার ভেঙে এক মুঠো আলোক-কণিকা বন্দী করে নিয়ে যায়। মাটির দুনিয়ার মান রাখতে হলে তার চেয়ে বড় কাজ আর কিছু নেই।

ডোরাকে এইসব কথা লিখতে হবে। কিন্তু সে কি খুশী হবে? খুশী হতো যে সে আজ তার পথ থেকে সরে গেছে। বোধহয় এখন বিলিতি-কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করছে। হয়তো ছ'মাস জেলও হয়ে গেছে।

স্কোয়াড্রন বধ্যভূমির ওপর পৌঁছে গেছে। নীচে ওয়াজিরিস্তানের বিচিত্র প্রান্তর—ছোট ছোট গ্রাম ক্ষেত আর বাগিচা। পাহাড়ের ঢালুতে ভেড়া চড়ছে। বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে একটা আবেশ আসে। শিল্পী হয়ে ছবি এঁকে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। বিশ্বাস হয় না পৃথিবীতে ধুলো আছে, কাঁটা আছে, বিষ আছে। সব মিথ্যা অপবাদ বলে মনে হয়। মাটির পৃথিবীর এই রূপ মানুষেরা জানে না। তাই তারা স্বর্গ কামনা করে। শিল্পী হওয়া উচিত ছিল দিলীপের।

একটা বাজার। তাজটুপি আর পাগড়িবাঁধা শত শত মাথা কিলবিল করছে। বাজারের পাশে খাড়া পাহাড়টার মাথায় একটা জীর্ণ বৌদ্ধ স্তূপ। পাথরের গায়ে ঘুলঘুলির মতো কতগুলি গুম্ফা, কতগুলি কালো চোখের কোটর যেন আকস্মিক দুঃস্বপ্নে বিক্ষত হয়ে রয়েছে।

ভারতবর্ষের কোন্ ছাত্র না ইতিহাস পড়েছে? মীরাগ্রাম থেকে তক্ষশীলা—তক্ষশীলা

থেকে পুরুষপুর—পুরুষপুর থেকে রাজগৃহ। এই সেই পুরাতন হৃদয়ের পথ আজও পড়ে রয়েছে—অবহেলা ও অপরিচয়ের কাঁটায় ঢাকা। সেই যুগ-যুগের কুটুম্বিতার সুখস্মৃতি যেন বিষণ্ন বেদনায় পাহাড়টার মাথায় ভেঙে পড়ে আছে। আজ কিন্তু সেই...।

দিলীপের হঠাৎ মনে পড়ে যায়—রসিদ খলিফার মামাবাড়ি এই দেশে।

রসিদ খলিফা। দিলীপের ঠাকুরদার আমলের দরজি। আজও সে বেঁচে আছে। সাদা শনের মতো ফুরফুরে তার দাড়ি, পাকা ডালিমের মতো গায়ের রঙ। ছেলেবেলায় পূজোর সময় জামা সেলাই নিয়ে রসিদের সঙ্গে দিলীপের প্রতি বছর একটা সংঘর্ষ বাধতো। জামার ছাঁট মোটে পছন্দসই হতো না দিলীপের। বুড়ো রসিদকে খিমচে চড়ঘুঁষি মেরে নাজেহাল করতো দিলীপ। তারপর দেয়ালীর সময়, লেপ সেলাই করতে আসতো রসিদ। দিলীপ বসে বসে রসিদের কাছে গল্প শুনতো—রসিদের মামাবাড়ি ওয়াজিরিস্তানের গল্প।

শত্রুপুরী নয়, সেই রূপকথার দেশ আজ তার পায়ের নীচে। রাবণের সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠে দিলীপ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছে সেই দেশ। কখন আবার বৈদ্যুতিক ঘণ্টি বেজেছে, কাজের অর্ডার এসেছে, দিলীপ কিছুই জানে না। ঠাণ্ডা আয়নার মতো চোখ দুটোতে শুধু নীচের পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি চিক্‌চিক্ করছে। বোমা পড়ছে—এক একটি বিস্ফোরণের এক একটি প্রকাণ্ড ধোঁয়ার গোলাপ হঠাৎ পাঁপড়ি মেলে উঠছে। বাজারটা আর নেই। শুকনো পাতার মতো কতগুলি নিরুপায় ভূচর প্রাণ এক ঝড়ের ঝাপ্টায় ছিট্‌কে পড়ছে চারদিকে।

দিলীপের সহকর্মী দুজন উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। ওদের চোখে মুখে কী অকপট সংহারের আনন্দ। শুধু দিলীপের অন্তরাত্মা যেন ধরা-পড়া চোরের মতো আসরের এক কোণে মাথা গুঁজে পড়ে রইল।

শুধু মনে পড়ে—রসিদ খলিফার মামাবাড়ি। হিমে নয়, বৈরাগ্যে নয়, নিতান্ত এক পার্থিব মমতার আবেশে দিলীপের সংবিৎ অসাড় হয়ে রইল। নীচে যে জীবনের সুখদুঃখের নর্তন চলেছে, সে নিজেই যে তার একটি ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত জীবাণু। সেখানে রসিদ খলিফার মামার বাড়ি—মৃত্যুর ঢিল ছুঁড়ে মারতে হাত ওঠে না। একেই বলে ভীরু কাপুরুষ, একেবারে হৃদয় তাপের ভাপে ভরা ফানুস।

বোম্বারের দল ঘাঁটিতে ফিরে এসেছে। বিমানের ভেতর থেকে মূর্ছাহত দিলীপ দত্তকে বের করে একটা স্ট্রেচারের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে। ধরাচুড়া ছেড়ে কয়েকটি গগনবিহারী চণ্ডা চণ্ডা ডার্বিশায়ার দুলাল চায়ের বাটি হাতে নিয়ে আরামে চুমুক দিচ্ছে। দিলীপের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

ঠিক মূর্ছা নয়, চোখ মেলে তাকাতেই পারছিল না দিলীপ। অভিযান এখনও শেষ হয়নি, আরো পথ বাকী আছে। এখান থেকে হাসপাতাল, তারপর হেড কোয়ার্টারে চালান, তারপর তদন্ত। তদন্তের শেষে বরখাস্ত। একটি মেকি বীর্যবন্তের কুশপুত্তলিকা আবার চুপি চুপি হাওড়া এক্সপ্রেসে চড়ে বসবে। আবার সুজাবাগ স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম। টেলিগ্রাম পেয়ে বাবার আর্দালি আর টু-সীটার এসে অপেক্ষায় বসে থাকবে।

ডোরা আসবে, নন্দীসাহেবও বোধহয়। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ডোরা ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে? কতক্ষণ তার সুন্দর ঠোঁট দুটিতে হাসি ফুটে থাকবে? এক মিনিট দু'মিনিট...পাঁচ মিনিট। তারপর আর বুঝতে বাকী থাকবে না।

দিলীপের মুখের দিকে তাকিয়ে ডোরার হাত কাঁপতে থাকবে। সেই ধিক্কারে ফুলের তোড়া লুটিয়ে পড়বে প্ল্যাটফর্মের কাঁকরের ওপর। ফুলের তোড়াটা হাত তুলে দিলীপ নিতেও পারবে না, মাটি থেকে তুলে ফিরিয়ে দিতেও পারবে না। শুধু নিঃশব্দে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে দিলীপ।

মিথ্যা মা

ঠাকুরপুরের রাজবাড়ি, অর্থাৎ সেই বিখ্যাত ঠাকুরপুর জমিদারীর তিনআনি শরিক অজিত রায়চৌধুরীর বাড়ি। রাজবাড়ি নামটা এখন প্রায় অচল হয়ে এসেছে। আর ক'দিন পরে হয়ত একেবারে লুপ্ত হয়েই যাবে। শুধু আশেপাশের দু'চার গ্রামের অতিবৃদ্ধ এবং চাষাভূষা মানুষ ছাড়া আজ আর কেউ ঐ বাড়িকে রাজবাড়ি বলে না।

সদর শহরের মধ্যে নয়, একটু দূরে, শহুরে জীবন এবং গেঁয়ো জীবনের মাঝামাঝি অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তিনপুরুষ আগের এই রাজবাড়ি। সদরের আদালতে ওকালতি করেন অজিত রায়চৌধুরী। প্রবীণ উকীল অজিতবাবুর পশারও এতদিনে বেশ প্রবীণ হয়ে উঠেছে। রাজবাড়ি নামটা ক্রমে ক্রমে জীর্ণ হয়ে উঠতেই উকীলবাড়ি নামটা বেশ প্রবল ও মুখর হয়ে উঠছিল, এবং এই নামটাই পাকা হয়ে যেত নিশ্চয়, কিন্তু হতে পারেনি। ঠাকুরপুরের ছেলেমেয়েদের ভাষায় নতুন একটা আখ্যা সবচেয়ে বেশি মুখর হয়ে পুরনো নামগুলিকে চাপা দিয়ে একেবারে নীরব করে দিয়েছে। ঐ নাম এখন জয়া-মায়ের বাড়ি।

এই বাড়ির বড় ছেলে মানিক, অজিতবাবুর ছেলে নয়। মানিক হলো অজিতবাবুর স্ত্রী জয়া দেবীর বড়দির সেজ ছেলে। মানিকের মুখের ভাষাটাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। জয়া মাসীমাকে জয়া-মা বলে ডাকে মানিক। তাই ঠাকুরপুরের সব ছেলেমেয়ের কাছে, এবং সদরের কাছে এই বাড়ি জয়া-মায়ের বাড়ি হয়ে গিয়েছে। কে না চেনে মানিককে? অতি ভাল ছাত্র এবং খেলতে পারেও কত ভাল, সেই মানিক তার যে জয়া-মায়ের বাড়িতে থাকে, সেই জয়া-মায়ের নামের গৌরবই আজ প্রাচীন রাজবাড়ি আর কিছুকালের উকীলবাড়ি নামের গৌরব ছাপিয়ে গিয়েছে।

জয়া-মায়ের নামে যে-সব গল্প আর সংবাদ আজ প্রায় বাইশ বছর ধরে ঠাকুরপুরে. আশেপাশের গাঁয়ে, আর সদর শহরেরও মনে মনে স্মৃতি হয়ে রয়েছে, সেই সব গল্প আর সংবাদের গৌরবই জয়ী হয়েছে বলা যায়। সে এক আশ্চর্য মনের ইতিহাস। পরের ছেলেকে সত্যিই খাঁটি মায়ের-মন দিয়ে নিজেরই সন্তানের মতো আপন করে নিতে পেরেছে, এমনই এক নারী জীবনের আগ্রহের ইতিহাস।

এই বাড়িতে যেদিন বধূবেশে প্রথম এসেছিলেন জয়া দেবী, সেই দিনটি হলো আজ থেকে ত্রিশ বছরের বেশি অতীতের একটি দিন। শান্তি ছিল, আনন্দও ছিল, কিন্তু একটি শূন্যতাও যেন অদেখা স্বপ্নের মতো এই বাড়ির জীবনের সব চঞ্চলতার মধ্যে মুখ লুকিয়ে থাকতো। আত্মীয়-স্বজনেরা চিন্তান্বিত হয়েছিলেন, এবং অজিতবাবুও মাঝে মাঝে কি-যেন ভাবতেন। বছরের পর বছর পার হয়, তবু কোন শিশুর কলরব জাগে না কেন এই বাড়ির বাতাসে? চিঠি-পত্রে অনেক স্বজনের কাছ থেকে অনেক উপদেশ আসতো, জয়া একটা মানত করুক। নইলে এত বড় বাড়ির এই ফাঁকা ফাঁকা আর নেড়া-নেড়া ভাব ঘুচবে না। জয়ার কোল ভরে না উঠলে এই বাড়ির বুকের শূন্যতাও ভরে উঠবে না।

অজিতবাবু গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবতেন, কিন্তু জয়া হেসে ফেলতেন। মানত করতে হবে কেন? দরকারই বা কি? একেবারে স্পষ্ট করে এবং অদ্ভুত ও তীব্র আগ্রহের ছোঁয়ায় যেন ছটফট করে জয়া বলে ফেলতেন একটা কথা, আর শুনে চমকে উঠতেন অজিতবাবু। জয়া বলতেন--যেখান থেকে পার একটা বাচ্চাকে নিয়ে এসে ফেলে দাও না আমার কাছে।

নীরব ও নিরুত্তর অজিতবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে জয়া তেমনি অতি সহজে অবাধে আর স্বচ্ছন্দে হেসে হেসে বলতেন--কোন জ্বালা-যন্ত্রণার দুর্ভোগ ভুগতে হবে না, অথচ একটা ছেলে চলে এল কোলে। এই তো ভাল।

অজিতবাবু হাসেন--তা না হয় হলো, কিন্তু...।

--কিন্তু আবার কি?

--তুমি কি সত্যিই মায়ের মন নিয়ে পরের ছেলেকে মানুষ করতে পারবে?

--কেন পারবো না?

--হয় না জয়া, তাতে পরের ছেলে শুধু মানুষ করা হয়, কিন্তু মায়ের আনন্দ পাওয়া যায় না।

জয়া বলেন--খুব হয়, খুব পাওয়া যায়।

শেষ পর্যন্ত জয়ারই এই অবাধ হাসির আগ্রহ সত্য হয়ে উঠলো, সে সত্য আজ এই বাড়ির জীবনের দিকে তাকালেই দেখতে পাওয়া যায়। দেখে মনে হয়, অজিতবাবু আর জয়াদেবী হলেন তিনটি ছেলের ও একটি মেয়ের বাপ ও মা।

বড় ছেলে মানিক হলো জয়া দেবীর বড়দির সেজ ছেলে। মেজ ছেলে তপেশ হলো জয়া দেবীর সেজ ভাসুরের ছেলে। একমাত্র মেয়ে মালতী হলো জয়া দেবীর ন'দার মেয়ে। আর সবচেয়ে ছোটটি, নিতু যার নাম, সে হলো আরও দূরসম্পর্ক এক আত্মীয়ের সংসারের এক মা-মরা ছেলে। নিতুর ভাষা অনুসারে মানিক হলো বড়দা, তপেশ মেজদা এবং মালতী হলো দিদি। বাড়ির ঝি-চাকরের কাছে অজিতবাবু আর জয়া হলেন বাবা আর মা, এবং মানিক, তপেশ, মালতী আর নিতু হলো, বড় খোকাবাবু, মেজ খোকাবাবু, দিদিমণি আর ছোট খোকাবাবু। এই পৃথিবীর নানা আঙিনা থেকে যেন এক একটি জ্যোৎস্না ছায়া আর শিশিরের কণা কুড়িয়ে নিয়ে এসে আপন সংসারের এক মায়াভরা আঙিনা তৈরি করে নিয়েছেন জয়া দেবী। আপন-পর সম্পর্কের নানা বিচিত্র আখ্যাগুলিও যেন এইখানে এসে এক নারীর স্নেহের কাছে সব ভিন্নতা হারিয়ে এক হয়ে গিয়েছে। জয়া হয়েছেন জয়া-মা। এই বাড়ির তিনটি ছেলে আর একটি মেয়ের কাছে এই জয়া-মা নামটিই মানুষের ভাষার মধ্যে সবচেয়ে মিষ্টি আর মায়াময় নাম। মানিক জানে, তপেশ জানে, মালতীও জানে যে, শুধুই মা নামে ওদের কেউ একজন আছেন, দূরেই আছেন, এবং চিরকাল দূরেই থাকবেন। তাঁরা আসেন মাঝে মাঝে, তাঁদের দেখতেও পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ পর্যন্ত, তার বেশি কিছু নয়। জয়া-মার চেয়ে এরা বেশি আপন-জন নয়, হতেই পারে না। তপেশের আপন মা একবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, পূজার সময় তপেশকে ক'দিনের জন্য নিয়ে যেতে। তপেশই গোঁ ধরে বসে রইল। পরের বাড়ি গিয়ে থাকতে ওর একটুও ইচ্ছে করে না।

মা না হয়েও এত বড় মায়ের-মনের গৌরব লাভ করেছে, এমন ব্যাপার কোথাও দেখা যায় না। প্রতিবেশীরা তাই বলে থাকেন। জয়ার নাম করতে বেশ একটু শ্রদ্ধাই অনুভব করেন ঠাকুরপুরের অনেক সত্যিকারের মা।

এপাড়া আর ওপাড়া, অনেক বাড়িতেই অনেক সময় আলোচনা হয়। বিনোদের মা বলেন--এর মধ্যে একটা কথা আছে, যা তোমরা কখনো ভেবে দেখনি।

সুধার মা বলেন--কি?

--আগের জন্মে জয়া সত্যিই ওদের মা ছিল, নইলে পরের ছেলের জন্য এতটা কেউ করতে পারে না। মায়ের-মন কি এমনিতেই হয় ভাই!

এই সব আলোচনার কিছু কিছু কলরব মাঝে মাঝে জয়া দেবীর কানেও আসে। শুনে জয়া দেবীর মনের ভিতরটাও যেন কেমন করে ওঠে। অদ্ভুত এক বিশ্বাসের বিস্ময় যেন বুকের ভিতর তৃপ্তি ছড়াতে থাকে। সত্যিই কি মানিকটা, তপেশটা, মালতীটা আর নিতুটা আগের জন্মে তাঁরই কোলে প্রথম দেখা দিয়েছিল? তাই নিশ্চয়! হয়ত সেই আগের জন্মে ওদের পুরো আদর করতে পারেননি জয়া দেবী। তাই অদৃষ্ট আজ এই জন্মে ওদের আবার জয়া দেবীর কাছে এনে ফেলেছে। আশ্চর্য হয়ে ভাবেন জয়া দেবী, সত্যিই তো বড়দি আজ

ছ'মাসের মধ্যেও চিঠি দিয়ে একবার খোঁজ নিলেন না কেমন আছে মানিকটা। ও তো বড়দির আপন ছেলে।

যাক্ গিয়ে, ওসব প্রশ্ন এখন আর জয়া দেবীর চিন্তারই প্রশ্ন নয়। দুপুরের রোদে ঝলসানো আঙিনার দিকে তাকিয়ে, বাড়ির ভিতরের বারান্দায় পাতা মাদুরের উপরে বসে জয়া দেবী চশমা-চোখে পড়ছিলেন কতগুলি চিঠি। মানিকের বিয়ের জন্য পাত্রীর পরিচয় নিয়ে এসেছে অনেকগুলি চিঠি। বড় ছেলের বিয়ে, এই বাড়ির বউ হয়ে আসবে যে মেয়ে, সে মেয়ে যেমন-তেমন হলে চলবে না। বড়দি একটি পাত্রীর খোঁজ জানিয়েছেন। চিঠি পড়ে খুব ক্ষুণ্ণ হলেন জয়া দেবী। নিতান্তই বাজে একটা সম্বন্ধ। বড়দি কি বুঝবেন ছাই, মানিকের সঙ্গে কেমন মেয়েকে মানাবে ভাল? বড়দি শুধু নামেই মা।

—মা, ওগো মা।

অদ্ভুত একটা ডাক। বাড়ির বাইরের বারান্দার দিক থেকে ভেসে আসছে এই আহ্বানের স্বর। ভিখিরীর গলার স্বর তো এরকম নয়। যেন অনেকদিন পরে দূর থেকে ঘরে এসে ব্যস্তভাবে কেউ তার মাকে ডাকছে—মা, ওগো মা!

মাদুর ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন জয়া দেবী। ধীরে ধীরে হেঁটে এসে বাইরের বারান্দার উপর দাঁড়ালেন। দেখে আশ্চর্য হলেন। সত্যিই ভিক্ষুক-টিক্ষুক নয়—বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে, মানিকের চেয়ে কিছু বড়, রোগা চেহারার একটা লোক বারান্দার সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নোংরা একটা গেঞ্জি গায়ে, ছেঁড়া জুতো, একটা খাটো বহরের কোরা ধুতি। অসুখে ভোগা চেহারা নয়, মনে হয় উপোসী চেহারা। লোকটার চোখ দুটো বেশ ডাগর, নাকটাও বেশ টিকালো। রুক্ষ-সূক্ষ চুলে লম্বা একটি তেড়ি এলেমেলো হয়ে রয়েছে।

জয়া বলেন—কে গো তুমি?

লোকটা বলে—আমি তোমাকে এতদিনে চিনতে পেরেছি মা, কিন্তু তুমি আমাকে দেখেও চিনতে পারছো না।

লোকটার দুই চোখ ছলছল করে উঠলো। জয়া বলেন—কি চাও বলো?

লোকটা হাঁউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে—আপন মা'র কাছে মানুষ যা চায়, তাই চাই, আর কিছু চাই না।

জয়া—তার মানে?

লোকটা বলে—স্নেহ চাই মা।

অস্বস্তি বোধ করেন জয়া দেবী—তুমি কে?

—নদীর ওপারে পলাশপুরের করুণা কালীর কাছে পনের দিন ধরনা দিয়েছিলুম মা। এক ফোঁটা জলও মুখে দিইনি, পনেরটি দিন আর পনেরটি রাত্রি করুণা কালীর পায়ের কাছে পড়েছিলুম। শেষে স্বপ্নে দেখা দিলেন করুণা কালী আর বললেন...। লোকটা হঠাৎ চুপ করে গেল।

জয়া দেবী—চুপ করলে কেন? বল।

—করুণা কালী বললেন, যা তোর আগের জন্মের মায়ের কাছে যা, তোর সব দুঃখু ঘুচে যাবে।

লোকটা কয়েকটা সিঁড়ি উপরে উঠে এসে বলে—করুণা কালী বললেন, ঠাকুরপুরের রাজবাড়ির মা হলেন তোর আগের জন্মের মা। তাই তো ছুটে এলেম মা, মাগো।

চেঁচিয়ে ছটফট করে জয়া দেবীকে প্রণাম করার জন্য সিঁড়ি ধরে উপরের বারান্দার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে লোকটা।

জয়া বলেন—থাম, বসো। ওসব কথা আমি বিশ্বাস করি না।

লোকটা ধপ্ করে বসে পড়ে। বিশ্বাস করতেই হবে মা।

জয়া দেবী হেসে বলেন—বিশ্বাস করি আর নাই করি, তুমি কি চাও বলো।

লোকটা কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মোছে এবং অভিমানের স্বরে বলে ওঠে—কিছু চাই না।

চুপ করে অনেকক্ষণ ধরে এই অদ্ভুত আবির্ভাবের রহস্যের দিকে তাকিয়ে থাকেন জয়া দেবী। এত কাঁদে কেন লোকটা? কেন এত অভিমান? পনেরটা দিন কিছু খায়নি। মাথা খারাপ হয়েছে বোধহয় ; তবু তো মানুষ। ভুল স্বপ্ন দেখে আবোলতাবোল বকছে, কিন্তু কি দুর্ভাগ্য, একটা মিথ্যে স্বপ্নের জন্য কত কষ্ট পাচ্ছে ছেলেটা।

জয়া দেবী বলেন—কিছু খাবে?

—হ্যাঁ।

থালায় ভরে মিষ্টি আনেন জয়া দেবী। মিষ্টিগুলি খেয়ে নিয়ে ঢকঢক করে জল খায় লোকটা। হঠাৎ বলে—এবার যাই মা।

জয়া বলেন—বসো।

একটা নতুন ধুতি, মানিকের জন্য কেনা, এক জোড়া নতুন চটি আর একটা সিল্কের কামিজ নিয়ে আসেন জয়া। লোকটা ব্যস্তভাবে নতুন সাজ গায়ে চড়িয়ে আবার চুপ করে অন্যমনা হয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু চলে যায় না লোকটা। এবং আরও অদ্ভুত, জয়া দেবীও লোকটাকে চলে যাবার জন্য বলতে পারে না। হয়ত পাগল, হয়ত একটা স্বপ্ন দেখেছে ছেলেটা, কিন্তু সেই স্বপ্নটাকে মিথ্যে মনে করবার কি আছে? আগের জন্মে একটা মায়ের কোলেই তো এসেছিল ছেলেটা, সে মা পৃথিবীতে এখন থাকতেও তো পারে।

জয়া বলেন—আজ যাও তুমি।

উদাসভাবে বলে লোকটা—যদি কয়েকটা টাকা দাও মা।

—কেন?

—কেন আবার কি? আমি তোমার ছেলে, টাকা চাইছি তোমার কাছে, দিতে হবে—রাগ করে চেঁচিয়ে আবার কেঁদে ফেলে লোকটা।

জয়া দেবী আর দেরী করেন না। তার মনের ভিতরটা যেন একটা মূর্খ বিশ্বাসের বেদনায় ফুঁপিয়ে উঠছে। এক্ষুনি বিদায় করে দেওয়া ভাল। দশ টাকা লোকটার হাতে তুলে দিয়ে জয়া বলেন—এবার যাও, আর বিরক্ত করো না।

লোকটা প্রসন্নভাবে অথচ তেমনি করুণ ও ছলছল চোখ নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে। বোধহয় আগের জন্মের মাকে প্রণাম করতে চায়।

হঠাৎ একটা কঠোর গর্জনের আঘাতে চমকে ওঠে দুপুরের নীরবতা। ফটক পার হয়ে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন চন্দননগরের ধীরেন ঠাকুরপো—এ বেটা, এ বেটা এখানে কেন, অ্যাঁ?

তার পরেই এসে দাঁড়ায় শ্রীরামপুরের প্রতুল—এ কি, এ বেটা এখানে কি চাইছে বড়দি?

জয়া বলেন—ওকে চেনো নাকি তোমরা?

প্রতুল বলে—চিনি বইকি, এটা একটা মহাপুরুষ।

জয়া দেবীর গলার স্বর ভয়ে কেঁপে ওঠে—তার মানে?

ধীরেন ঠাকুরপো বলেন—মিথ্যে দুঃখের কথা বলে লোকের কাছ থেকে টাকা আদায় করাই ওর কাজ।

প্রতুল বলে—আজ তিন বছর দেখছি, ট্রেনে ট্রেনে ঘোরে, আর লোকের কাছ থেকে পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য সাহায্য চায়।

ধীরেন ঠাকুরপো—বলেন সেদিনও আমাদের অফিসে গিয়েছিল, রুগ্না স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য সাহায্য চাইতে। আমাকে দেখেই পালিয়ে গেল।

লোকটা নির্বিকার। কোন ভয় বা উদ্বেগের ছায়ামাত্র নেই লোকটার চক্ষে।

ধীরেনবাবু বলেন--নিশ্চয়ই ওকে এই জুতো জামা আর কাপড় আপনি দিয়েছেন বৌদি?

প্রতুল বলে--নিশ্চয় কিছু টাকাও আপনার কাছ থেকে আদায় করেছে?

জয়া দেবী বলেন--হ্যাঁ।

লোকটার ঘাড়ে হাত দেয় প্রতুল--বের কর টাকা! ফেরত দাও!

লোকটা বলে--কেন দেব! আমার আগের জন্মের মা আমাকে দিয়েছেন, আপনারা সে টাকা কেড়ে নেবার কে মশাই?

ধীরেনবাবু লোকটাকে একটা ধাক্কা দেন--ছাড়, নতুন কাপড়-চোপড় জুতো সব ছাড়!

ধাক্কার চোটে লোকটার পা থেকে নতুন চটি খসে যায়। ধীরেনবাবু এক টান দিয়ে সিল্কের কামিজটাকে লোকটার গা থেকে খুলে নিলেন।

চেঁচিয়ে ওঠে লোকটা--মা, ওগো মা, তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছো মা? এদের মানা কর মা!

জয়া দেবী নীরবে দাঁড়িয়ে শুধু তাঁর দু'চোখের একটা অর্থহীন চাহনি তুলে তাকিয়ে থাকেন। প্রতুল লোকটার হাত ধরে টান দেয়। লোকটার শক্ত মুঠো কঠোর এক পেষণে চূর্ণ করে দিয়ে টাকা কেড়ে নেয় প্রতুল। ধীরেনবাবু আবার একটা ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে ফটকের দিকে টেনে নিয়ে চলেন।

লোকটা চিৎকার করে--মা, ওগো মা, এরা যে আমার সব ছিনিয়ে নিল মা। তুমি ওদের মানা কর মা।

জয়া দেবীর মনের ভিতরে যেন একটা বোবা বিস্ময় দুঃসহ বেদনায় ছটফট করছে। কোন কথা বলতে পারছেন না জয়া দেবী। মিথ্যাবাদী একটা লোক ধরা পড়ে গিয়েছে আর জব্দ হয়েছে, জয়া দেবী বাধা দেবেন কেন?

ফটকের কাছে লোকটাকে ঠেলে নিয়ে এলেন ধীরেনবাবু। এইবার ধীরেনবাবুর হাতের আর একটি ধাক্কায় অদৃশ্য হয়ে যাবে জয়া দেবীর দুই চক্ষুর সম্মুখ থেকে এক মিথ্যা আগের জন্মের ছেলে।

লোকটা মুখ ফিরিয়ে জয়া দেবীর দিকে হতাশভাবে তাকায়--তুমি আমার আগের জন্মের মা, কিন্তু তুমি মা হয়েও কি করেছিলে জান? করুণা কালী স্বপ্নে আমাকে কি বলেছেন, শুনবে?

লোকটার ছলছল চোখ দুটো হঠাৎ কটমট করে ওঠে। ধীরেনবাবু ও প্রতুল হঠাৎ হাত নামিয়ে কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে থাকেন। জয়া দেবী অপলক চোখে তাকিয়ে থাকেন। কি বলতে চায় লোকটা?

লোকটা বলে--তুমি মা হয়েও নিজের হাতে আমার মুখে বিষ দিয়ে আমাকে মেরে ফেলেছিলে।

লোকটাকে কঠোর একটা ঠেলা দিয়ে ফটকের বার করে দেন ধীরেনবাবু। প্রতুল হাত তুলে তাড়া করে যায় আরও কয়েক ঘা দেবার জন্য।

বাধা দিয়ে জয়া দেবীই আর্তনাদ করেন--আর মেরো না ধীরেন ঠাকুরপো, চলে এস প্রতুল। যেতে দাও ওকে।

জয়া দেবীর চোখ ঝাপসা হয়ে যায়, তাই দেখতে পান না, লোকটা চলে গিয়েছে কি না। জয়া-মাকে মিথ্যা-মা বলে রটাতে চায়, কি ভয়ানক মিথ্যেবাদী ঐ ছোঁড়া! কিন্তু জয়া দেবীর বুকের ভিতরটা কাঁপতে থাকে। মিথ্যে একটা গল্প, কিন্তু কি ভয়ানক সত্যের মতো একটা মিথ্যা!

বিজয়িনী

কোন উপায় যখন নেই, তখন চিন্তা করে লাভ কি?

তবু চিন্তা করে বরুণা, আর বরুণার উপর রাগ করে সোমেশ। যেখানে মায়া করবার কোন অর্থ হয় না, সেখানে মায়া করে লাভ কি?

কিন্তু মায়া না করে পারে না বরুণা, এবং চিন্তাই করে।

যার সম্পর্কে সব সময় যত মায়ার কথা বলে বলে সোমেশকে বিরক্ত করে বরুণা, সে হলো বরুণারই বোন অঞ্জনা। বয়সে বরুণার চেয়ে খুব বেশি ছোট নয় অঞ্জনা, বড়জোর চার বছরের ছোট হবে।

সোমেশ মাঝে মাঝে বলে--তাও যদি বুঝতাম যে, এক মায়ের পেটের আপন বোন, তবে না হয় বোনের কথা ভেবে একটু-আধটু...।

ঠিকই, ঠিক আপন বোন নয়, বরুণার সৎ-বোন অঞ্জনা। এবং কে না জানে, বরুণার সেই ভয়ানক সৎ-মা মানুষটি যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন বরুণাকে কিরকম হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়ে আর কষ্ট দিয়ে খুশি হয়েছিলেন।

বরুণার বয়স তখন মাত্র দু' বছর, যখন বরুণার মা হঠাৎ একদিন বুকের ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে পড়লেন, আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই জোরে জোরে তিনবার শ্বাস ছেড়ে দিয়ে মরে গেলেন। এবং তারপর একটা বছরও পার হয়নি, নতুন করে একটা মাকে যেদিন বাড়িতে নিয়ে এলেন বাবা, সেদিন বরুণার মুখের দিকে অনেকক্ষণ অপলক চোখ তুলে দিয়ে তাকিয়েছিলেন নতুন মা, এবং নতুন মা'র চোখ দুটো বেশ ছলছলও করেছিল।

এসব ঘটনার ছবি বরুণার সেই দু' বছর বয়সের আরও অনেক স্মৃতির মতো বরুণার মন থেকে একেবারে মুছে গিয়েছে। বড় হয়ে বাবার কাছ থেকে সে ঘটনার গল্প শুনেছিল বলেই নিজের জীবনের সেই অতীতটাকে, শিশুকালের সেই সব সুখ আর দুঃখগুলিকে কিছু কিছু কল্পনা করতে পারে বরুণা। এবং আজও মনে পড়ে বাবার সেই করুণ মুখের ছবি, আর করুণ আক্ষেপের ভাষা। বরুণা তখন বেশ বড়টি হয়েছে। বরুণাকে আড়ালে ডেকে ফিসফিস করে কতবার বলতেন বাবা।--তোর নতুন মা আগে এমনটি ছিল না বরু, বিশ্বাস কর। কত ভালবাসতো তোকে ; আমি রাত করে অফিস থেকে ফিরে এসে দেখেছি, তোকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে রয়েছে তোর নতুন মা। সেই মানুষ আজ একবার খোঁজও নেয় না যে, তুই ভাত খেলি কি খেলি না। ছিঃ ছিঃ, কি ছিল, আর কি হলো!

আজ বরুণা তার জীবনের সবচেয়ে পুরনো অতীতের ছবি বলতে যে ছবিকে আবছায়ার মতো মনের ভিতরে দেখতে পায়, সে ছবি বরুণার পাঁচ বছর বয়সের একটা অনুভবের আবছা স্মৃতি মাত্র। নতুন মা'র কোলে ফুটফুটে একটা কচি মানুষ শুয়ে শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে, আর বরুণা সেই ছোট ছোট হাত-পা দু'হাতে জড়িয়ে ধরবার জন্য নতুন মা'র কোলের উপর ঢলে পড়েছে। নতুন মা একটু বিরক্ত হয়ে বলেছেন--আঃ, বিরক্ত করিস না বরু। সর দেখি।

সেই যে বরুণাকে সরিয়ে দিলেন নতুন মা, তারপর...তারপর আর কোনদিন নতুন মা'র কাছে এসে গা ঘেঁষে বসতে পেরেছিল বলে মনে পড়ে না বরুণার। এবং আজও বেশ স্পষ্ট করে মনে পড়ে, একদিন নতুন মা বাবার উপর ভয়ানক রাগ করে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন--ও মেয়েকে আঁতুড়ে নুন খাওয়ানো উচিত ছিল। সেদিন বরুণার জন্য একটা সিল্কের শাড়ি কিনে এনেছিলেন বাবা।

নতুন মা'র সন্দেহ ছিল যে, বাবা বরুণাকে ভালবাসে, এবং অঞ্জনাকে ভালবাসেই না। বাবা দুঃখিত হয়ে নতুন মাকে বলতেন--ছিঃ, তুমি এত মিথ্যে সন্দেহও করতে পার। তোমার

কি মাথা খারাপ হয়েছে?

মনে পড়ে বরুণার, বরুণারই বিয়ের আগের দিনে রাগ করে না খেয়ে, আর ঘরের কপাটে খিল এঁটে দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন নতুন মা। তার আগে বাবার সঙ্গে সারা সকাল ঝগড়া করেছিলেন—সর্বস্ব খুইয়ে, ধার করে আর অফিসের ফাণ্ডের সব জমা টাকা তুলে তুমি বরুর বিয়ে দিচ্ছ, আমার অঞ্জুর কি উপায় হবে তাহলে? অঞ্জু কি বানের জলে ভেসে এসেছে? অঞ্জু তোমার মেয়ে নয়?

ঘরের ভিতরে বিছানার উপর উপুড় হয়ে পড়ে সারাটা দিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন নতুন মা। নতুন মা'র সেই কান্নার করুণ স্বর আজও বরুণা যেন কানে শুনতে পায়।

এবং সেই বিয়ের দিনের একটা ঘটনার ছবিও মনে পড়ে বরুণার। সেদিন বাইরের ঘরে বরুণাকে কাঁদ-কাঁদ মুখ নিয়ে একলাটি পড়ে থাকতে দেখে অঞ্জনা ভয়ানক রাগ করেছিল।—তুই দিদি একটা ভয়ানক মুখ্খু। মা'র ওসব আবোল-তাবোল কথা শুনিসই বা কেন, আর ওসব কথা ভেবে মন খারাপ করিসই বা কেন?

সেই অঞ্জনা আজ কোথায় আছে? ভাবতে গিয়ে মন খারাপ না করে পারে না বরুণা, সোমেশ যতই রাগ করুক না কেন।

বরুণার বিয়ে হয়েছে এই তো মাত্র পাঁচটা বছর হলো। বাবা মারা গিয়েছেন বরুণার বিয়ের মাত্র দুটি বছর পরেই। আর নতুন মা মারা গিয়েছেন, এই সেদিন, এক বছরও হয়নি।

বেচারা নতুন মা'র সেই সন্দেহভরা দুঃস্বপ্নটাই সত্য হয়ে উঠেছে। আজ নতুন মা'র কথা মনে পড়লে বরুণার চোখ দুটো বার বার ভিজে যায়। সত্যিই যে, আজ সেই ভয়ানক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। নতুন মা'র সেই রাগের কথাগুলিই যেন ভয়ানক আর্তনাদের স্মৃতির মতো করুণ হয়ে বরুণার মনের ভিতর বাজছে। আমার অঞ্জুর কি উপায় হবে?

বরুণার বাবা চাকরি করতেন গয়ার পুরনো শহরের যে মারোয়াড়ীর অফিসে, সে অফিস আজও সেখানে আছে। দোকানের পিছনে যে গলির ভিতরে ছোট একটা বাড়িতে বরুণার জীবনের ষোলটা বছর পার হয়েছিল, সেই বাড়িতে এখন অন্য ভাড়াটে থাকে। অঞ্জনা থাকে ঐ গলিতেই আর একটা বড় বাড়িতে, নিবারণকাকার বাড়ি।

বাবার খুড়তুতো ভাই নিবারণকাকা। এত বড় বাড়িটা নিবারণকাকার নিজেরই বাড়ি। নিবারণকাকার অবস্থা ভাল, তামাকের আড়তদারী করেন। নিবারণকাকার বাড়িতে অনেক লোক। সব নিয়ে চল্লিশ জনেরও বেশি হবে। বড়-বউদির চারটি, মেজ-বউদির তিনটি আর ছোট-বউদির দুটি ছেলে-মেয়ে। তা ছাড়া, নিবারণকাকার দুই মেয়ে আর দুই জামাইও এই বাড়িতে থাকে। তাদেরও ছেলেপিলে আছে। এত বড় সংসারের কাজে, মাত্র একটি ঝি রেখেছিলেন নিবারণকাকা।

কিন্তু, খবর পেয়েছে বরুণা, অঞ্জনাকে বাড়িতে নিয়ে যাবার পরেই সেই ঝি-টাকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন নিবারণকাকা।

এই অঞ্জনার উপায় কি হবে? কথায় কথায় সোমেশকে বিরক্ত করে বরুণা—তুমি কি ভেবেছ, টাকা খরচ করে অঞ্জনার বিয়ে দেবেন নিবারণকাকার মতো মানুষ? কখখনো না। স্বপ্নেও এমন আশা করো না। মেয়েটাকে শুধু দু'মুঠো ভাত দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবে, আর চিরকাল খাটাবে, যতদিন না মেয়েটা মরে যায়।

সোমেশ—কিন্তু তুমিই বা স্বপ্নে কি আশা করছো? তুমি অঞ্জনার বিয়ে দেবে?

বরুণা—তুমি আশা দিলেই আশা করতে পারি।

সোমেশ ভ্রূকুটি করে।—আমি আশা দেব? আমি? যে মানুষ একটা জমিদারের সেরেস্তায় পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরি করে, সে মানুষ তোমার সৎ-বোনের বিয়ের খরচ যোগাবে? তা...সৎ-বোনের জন্য মনে মনে যত খুশি মায়া কর বরুণা, কিন্তু পাগলের মতো কথা বলে

আমাকে বিরক্ত করো না।

চুপ করে বরুণা। সোমেশেরই মুখের দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে থাকে। অভিযোগ করবার কিছু নেই ; সোমেশের যুক্তির মধ্যে একটুও ভুল নেই। কোথা থেকে টাকা দেবে বেচারা সোমেশ? নিজেরই স্ত্রী বরুণাকে আজ পর্যন্ত একটা সোনার জিনিস কিনে দিতে পারেনি যে সোমেশ, সে কেমন করে ষোল ভরি সোনার জিনিস, মোটামুটি দানসামগ্রী আর শয্যাদ্রব্য, একটা হারমোনিয়ম আর নগদ এগার'শ টাকা বরপণ দিয়ে একটা মেয়ের বিয়ে দেওয়াতে পারবে? রাজগীরে থাকে, এক পাত্রের খোঁজ পেয়েছে বরুণা। বার বার চিঠি লিখে সেই পাত্রের মা'র সঙ্গে অনেক কথা আলোচনা করেছে, অনেক অনুনয় আর মিনতি জানিয়েছে। এবং পাত্রের মা শেষ পর্যন্ত, মাত্র এই সামান্য দাবির সর্তে বরুণার বোন অঞ্জনার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন। অঞ্জনার একটা ফটোও পাত্রের মা'র কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে বরুণা।

বরুণার নিজের গায়ের জিনিসগুলির সবই যদি থাকতো, তবে নয়...তাতেই বা কি? ষোল ভরির দাবির মধ্যে মাত্র সাত ভরি যোগাড় হতো। বাকি খরচ কোথা থেকে আসতো?

বরুণারই একবার টাইফয়েড হয়েছিল, এবং টাইফয়েডের পর প্রায় পঙ্গু ধরনের একটা অবস্থা হয়েছিল বরুণার। একটা বছর হাঁটা-চলাও করতে পারেনি। এহেন একটা কঠিন রোগের চিকিৎসা করবার জন্য যে টাকা দরকার, সে টাকাও যোগাড় করবার সামর্থ্য হয়নি সোমেশের। বরুণারই গায়ের জিনিসগুলি বেচে দিয়ে ওষুধপত্র আর ডাক্তারের দাবি মেটাতে হয়েছিল। সোমেশ আজও অপরাধীর মতো মুখ করে নিজেকেই ধিক্কার দেয়—টাকা যোগাড় করবার ক্ষমতা থাকলে কি তোমার ঐ সামান্য দু-চারটে গয়না বেচে ওষুধ কিনতাম, আজ পর্যন্ত একটা দেড় ভরি জিনিসও তোমাকে...।

—ওসব কথা ছেড়ে দাও। বলতে গিয়ে বরুণার মুখটা করুণ হয়ে যায়।

সোমেশ বলে—আমিও বলি, তুমি ওসব চিন্তা ছেড়ে দাও। রাজগীরের ছেলের মা'র কাছে মিছিমিছি চিঠি লেখালেখি করো না।

বরুণা—কিন্তু...।

সোমেশ—কি?

বরুণা—গয়াতে গিয়ে অঞ্জনাকে একবার কি দেখেও আসতে পারবো না? সেটাও কি খুব খরচের ব্যাপার?

নতুন মা মারা যাবার পর সেই যে একবার গয়াতে গিয়েছিল বরুণা, তারপর আর যায়নি। নিবারণকাকা এসে গম্ভীর হয়ে অঞ্জনাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন, ব্যস্, তারপর আর নয়। সেদিনের অঞ্জনার সেই জলভরা চোখ দুটোকেই বার বার মনে পড়ে। এবং সেই অঞ্জনার চিঠি এসেছে—তোমাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে দিদি।

একবার গয়া ঘুরে আসতে ক'টা টাকাই বা খরচ করতে হবে? সে খরচও কি দিতে পারবে না সোমেশ?

সোমেশ হাসে—তা..একবার গয়াতে যাওয়া আর ঘুরে আসা, হ্যাঁ, সে খরচ যোগাড় হয়েই যাবে।

২

রফিকাবাদ নামে যে জায়গাতে একটা মাটির বাড়িতে সোমেশ ও বরুণা থাকে, সেখান থেকে গয়া যেতে হলে রোজকার ডাক-বহা মোটর সার্ভিসের বাসেই যাওয়া যায়। ভাড়া লাগে বার আনা। দুটি মানুষের যাওয়া-আসার জন্য খরচ পড়ে দেড় টাকা আর দেড় টাকা

মোট তিন টাকা।

কিন্তু সোমেশ জানে, এবং বরুণাও জানে, নিবারণকাকার বাড়িতে গিয়ে ওঠা যাবে না। ওঠা উচিতও নয়, কারণ মুখে কিছু না বললেও খুশি হবে না নিবারণকাকা। গয়াতে গিয়ে কোন হোটেলে হয়তো একটি দিনের মতো থাকবার আর দু'বেলা ভাত খাওয়ার খরচও যোগাড় করতে হবে। সে জন্য অন্তত আরও চারটে টাকা চাই। অর্থাৎ মোট দশটা টাকা হলেই হয়ে যায়।

কিন্তু আর কয়েকটা দিন দেরি করতে চেয়েছিল সোমেশ। দশটা টাকাও এখন হাতে নেই। মাইনেটা পাওয়া যাক, তারপর একদিন...।

কিন্তু বরুণা আবার সোমেশকে বিরক্ত করেছিল--না, আর দেরি করতে ভাল লাগছে না।

সোমেশ আশ্চর্য হয়--আর মাত্র পনরটা দিন পরেই বোনকে দেখতে পাবে, তবু...কি আশ্চর্য, কেন যে এত ঘ্যানর ঘ্যানর কর? এরই মধ্যে তোমার বোন মরে যাবে না।

বরুণা--কিন্তু এই পনেরটা দিন তো কষ্ট পাবে মেয়েটা। ভাববে, দিদি বুঝি আসবেই না। যাবই যখন, তখন বেচারাকে আরও পনরটা দিন চিন্তায় রেখে আর কষ্ট দিয়ে লাভ কি?

অগত্যা বাধ্য হয়ে সাহুজীর কাছ থেকে একমাসের জন্য এক টাকার সুদ স্বীকার করে দশটা টাকা ধার নিতে হয়। তিন দিনের ছুটি নিতে হয়, এবং গয়াতে এসে একটা হোটেলেও উঠতে হয়।

এবং তারপর যা হয়ে গেল, তার জন্য একবারে গম্ভীর হয়ে, মনের রাগ মনের ভিতর চেপে রেখে, আবার রফিকাবাদে ফিরে যাবার জন্য চকের বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে এসে দাঁড়ায় সোমেশ। ঝোঁকের মাথায়, একটা অদ্ভুত জেদের অহংকারে একি কাণ্ড করে ফেললো বরুনা এরকম কঠোর একটা দায় মাথায় তুলে নিতে একটুও ভয় করলো না বরুণার?

নিবারণকাকর বাড়িতে যাওয়া হলো। বোনকে বুকে জড়িয়ে একেবারে আহ্লাদে গলে পড়লো বরুণা। সবই ভাল হতো, যদি ঘটনাটা সেখানেই ফুরিয়ে যেত। কিন্তু তারপরেও কেন মিছিমিছি...।

অঞ্জনার দোষ নেই। অঞ্জনা বার বার আপত্তি করেছিল। বার বার বরুণার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আর লুকিয়ে লুকিয়ে বরুণার শাড়ির আঁচল ধরে এক একটা টান দিয়ে বরুণাকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেছিল অঞ্জনা--তুমি চুপ কর দিদি।

কিন্তু চুপ করতে পারেনি বরুণা। কাকা আর কাকিমার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত একটা ঝগড়া বাধিয়ে ফেললো বরুণা।

নিবারণকাকা ঠাট্টা করে বললেন--আঃ, কোত্থেকে আজ হঠাৎ এসে সৎ-বোনের জন্য দরদ দেখাতে শুরু করেছেন, এতদিন ছিলেন কোথায় আপনি?

কাকিমা বলেন--অঞ্জু সুখে আছে কিনা, সে খোঁজ তোমাকে নিতে হবে না। তুমি ঘরে গিয়ে নিজের সুখের খোঁজ নাও।

বরুণা তবু চেঁচিয়ে তর্ক করে--আমার বোনের সুখ-দুঃখের খোঁজ আমি নেব না তো কে নেবে?

তিন বউদি বরুণার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসে আর ফিসফিস করে--ইস্, কত বড় সুখের মানুষটি! কত ক্ষ্যামতা!

বরুণা বলে--আমি শুধু জানতে চাই, অঞ্জনার বিয়ে দেবার জন্য কি চেষ্টা আপনারা করেছেন?

নিবারণকাকা--চেষ্টা করি বা না-করি, তুমি জিজ্ঞেস করবার কে?

কাকিমা বলেন--এত বড় গলা করে কথা বলতে লজ্জা করে না তোমার?

বরুণা--কিসের লজ্জা?

কাকিমা--দাও না বোনের বিয়ে, দেখি কত মুরোদ?

বরুণা চেঁচিয়ে ওঠে--হ্যাঁ, মুরোদ আছে।

বড়-বউদি মুখ টিপে হাসে আর ফিসফিস করে।--কত টাকা মাইনে পান সোমেশবাবু?

বরুণা আবার বেহায়ার মতো চেঁচিয়ে ওঠে--পঞ্চাশ টাকা!

নিবারণকাকা--তবে চুপ কর এবং চুপচাপ চলে যাও।

বরুণা--না।

নিবারণকাকা--তার মানে?

বরুণা--অঞ্জনাকে নিয়ে যাব।

অঞ্জনাই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বরুণার কানের কাছে ফিসফিস করে--না, দিদি। তুমি চলে যাও, আমি বেশ আছি দিদি।

অঞ্জনার হাত ধরে টান দেয় বরুণা--চল।

অঞ্জনা আবার কি-যেন বলতে চেষ্টা করে। বরুণা ধমক দেয়--চুপ কর।

নিবারণকাকা সোমেশের মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে একটা হুংকার ছাড়েন--কি হে, তুমি নীরব কেন? তোমার স্ত্রীর রকম-সকম চোখে দেখতে পাচ্ছ না? তোমারও কি ইচ্ছা...?

সোমেশ বলে--আজ্ঞে...আমি তো--আমি এসব কাণ্ড ঠিক পছন্দ করতে পারছি না।

কাকিমা চেঁচিয়ে ওঠেন--তোর মতলব কি অঞ্জনা? তুইও কথা বলছিস না কেন? বড়লোক দিদির বাড়িতে যাবি?

অঞ্জনা মাথা হেঁট করে নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

তিন বউদি একসঙ্গে ভ্রূকুটি করে আর কলকল করে ওঠে--যেতে দিন, যেতে দিন। আপনি আপত্তি করবেন না, মা। গয়া শহরে কি আর...।

বরুণা পাল্টা ভ্রূকুটি করে।--ঝি পাওয়া যায় না? তাই না?

তিন বউদি একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে--হ্যাঁ, তাই।

অঞ্জনার হাত ধরে নিবারণকাকার বাড়ির দরজা পার হয়ে আর গলির ধুলোর উপর পা দিয়েই খিলখিল করে হেসে সোমেশের মুখের দিকে তাকায় বরুণা।--কেমন জব্দ করে দিলাম।

রফিকাবাদে যাবার জন্য মোটর বাসের তিনটে টিকিট কিনতে হবে। পকেটে হাত দেয় সোমেশ। এবং ভয়ানক গম্ভীর হয়ে, ছোট একটা ভ্রূকুটি করে বরুণার দিকে তাকায়--কাকে জব্দ করলে?

বরুণা হাসে--নিবারণকাকাকে।

সোমেশ--মোটেই না, কাকে জব্দ করলে, সেটা বুঝতে এখনও...।

কথা শেষ না করেই বাসের টিকিট কেনবার জন্য এগিয়ে যায় সোমেশ।

৩

অঞ্জনার কি উপায় হবে? অনেক দিন তো পার হয়ে গেল। একটা বর্ষা শেষ হয়ে গিয়ে, অনেকগুলি মাস পার হয়ে, আবার একটা বর্ষা প্রায় এসে পড়লো। রফিকাবাদের জ্বলন্ত আকাশের এদিকে ওদিকে ছোট ছোট মেঘ মাঝে মাঝে ভেসে আসে। আর ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে যায় বরুণা।

বড় গলা করে নিবারণকাকার মুখের উপর যে কথা শুনিয়ে দিয়ে এসেছে বরুণা, আজ যদি সেই কথার জের ধরে জবাব চাইতে আসেন নিবারণকাকা, তবে কি উত্তর দেবে বরুণা?

মাঝে একদিন সোমেশও ভয়ানক রুক্ষ স্বরে এবং রাগ করে একটা অভিযোগও করে

ফেলেছে।—তোমার জন্যেই আজ একটা অপমান সহ্য করতে হলো!

বরুণা ভয় পায়—অপমান?

সোমেশ—হ্যাঁ। গয়াতে আদালতের কাছে নিবারণকাকার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

বরুণা—কি বললেন নিবারণকাকা?

সোমেশ—যা বলা উচিত, তাই বললেন। বিশ্রীভাবে মুখ বেঁকিয়ে ঠাট্টা করলেন, কি হে সোমেশ, তোমার স্ত্রী বরুণা মহাশয়া লাখ টাকা খরচ করে সৎ-বোনের বিয়ে দিয়ে ফেলেছে বোধহয়?

মাথা হেঁট করে বরুণা। চোখ দুটো জলে ভরে গিয়ে ছলছল করতে থাকে। নিবারণকাকার উপর রাগ করা যায় না। ঠিকই বলেছেন, যে মেয়ের কানে সোনার গিল্টি করা এক জোড়া পিতলের কানপাশা দোলে, আর হাতে কাচের চুড়ি, যার স্বামী জমিদারের সেরেস্তায় খাতা লিখে পঞ্চাশ টাকা পেয়ে আর শুধু ডালভাত খেয়ে কোনমতে বেঁচে আছে. সে মেয়ে কোন্ মুখে সৎ-বোনের বিয়ে দেবে বলে বৃথা মুরোদের কথা বলে?

এই ক' মাসের মধ্যে বার বার অনেকবার বড় ভয়ানক রকমের গম্ভীর হয়েছে, এবং বরুণার সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বলাও বন্ধ করেছে সোমেশ।

বরুণার আনমনা মুখটাও মাঝে মাঝে বড় করুণ হয়ে যায়। ঠিকই তো, বেচারা সোমেশকেও বড় অশান্তির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে বরুণা। বরুণার একটা নতুন শাড়ির দাবি মেটাতে গিয়ে যে-মানুষ বার বার হিসেব করেছে, টাকার অভাব সহ্য করতে গিয়ে বিরক্ত হয়েছে, যে মানুষকে আজকাল মাঝে মাঝে একই সঙ্গে দুটো নতুন শাড়ি কেনবার কথা ভাবতে হয়। অঞ্জনার জন্যও যে একটা নতুন শাড়ি চাই।

অঞ্জনা যখন ঘরের বাইরে এদিক-ওদিক থাকে, তখন বরুণাকে দু' কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়ে না সোমেশ।—একজনের দাবি মেটাতেই হিমসিম খাই, কোথা থেকে আবার আর-এক জনের দাবি এসে জুটলো। তুমি শেষ পর্যন্ত আমাকেই জব্দ করলে বরুণা।

আরও উদাসভাবে কিছুক্ষণ সোমেশের সেই বিরক্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে অপরাধীর মতো মাথা হেঁট করে বরুণা। আস্তে আস্তে বিড়বিড় করে।—আমিই বা কি কম জব্দ হয়েছি?

সোমেশ চেঁচিয়ে ওঠে—তুমি ছাই জব্দ হয়েছ। লজ্জা থাকলে তবে তো জব্দ হবে?

চুপ করে বরুণা। সোমেশকে আর বিরক্ত করতে চায় না। তাই বলতে পারে না বরুণা, আমারই সব অহংকার যে জব্দ হয়ে গেল। নিবারণকাকার কাছে বড় গলা করে যে-কথা বলে এলাম, সেটা যে আমারই আশা আর প্রতিজ্ঞার কথা। অঞ্জনার বিয়ে দেবার মুরোদ হলো না, সে তো আমারই পরাজয়ের কথা।

কিন্তু অঞ্জনা যখন ঘরের দিকে এগিয়ে আসে, তখন সোমেশও সাবধান হয়ে যায়। এই দুঃসহ সমস্যার কথা ছেড়ে দিয়ে অন্য সমস্যার কথা নিয়ে বকবক করতে থাকে সোমেশ। ছোট সজনে গাছটাকে এমন করে মুড়িয়ে দিয়ে গেল কাদের গরু?...অঞ্জনা এত দেরি করে স্নান করে কেন?..তুমি কি আর চা খাবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে বসে আছ?

হেসে ফেলে বরুণা। চলে যায় সোমেশ। আর, অঞ্জনা বারান্দার উপরে ঘুর ঘুর করে দাঁড়ের টিয়া পাখিটার সঙ্গে আবোল-তাবোল ঠাট্টার কথা বলতে থাকে, ঠাট্টার হাসি হাসতে থাকে।

এবং বরুণার প্রাণটাও যেন হঠাৎ একটা দুরন্ত স্বপ্নের আবেশে বিভোর হয়ে উঠতে থাকে। জ্বল জ্বল করতে থাকে বরুণার চোখ দুটো।

অঞ্জনা ডাক দেয়—তুমি এবার খেয়ে নাও দিদি। আর কত দেরি করবে?

বরুণা বলে—আমি খাব না রে অঞ্জু।

—তার মানে!

—আমি দিনে দু'বার ভাত-ডাল গিলতে পারবো না।

—কেন?

—শরীরে সহ্য হয় না। আমি একবেলা যা পারি দুটো খেয়ে নেব।

কোথা থেকে ছুটে এসে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ায় সোমেশ। আর, রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠে।—আবার পঙ্গু হবার ইচ্ছা হয়েছে বুঝি? মনে রেখ, আবার যদি অসুখে পড়, তবে...।

বরুণা হাসে—তবে কি? চিকিৎসা হবে না এই তো?

কোন উত্তর না দিয়ে, কটমট করে বরুণার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই চলে যায় সোমেশ।

৪

সাতদিন ধরে একটানা জ্বরে ভুগে নিয়ে যেদিন দেয়াল ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে থাকে বরুণা, সেদিন বরুণার মুখের দিকে আবার কটমট করে তাকিয়ে বরুণার হাত ধরে সোমেশ। হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে বিছানার উপর শুইয়ে দেয়।—সাবধান, তোমাকে কোন কাজ করতে হবে না। তোমার আদুরে বোনটি আছে কি করতে? আরও কিছু দিন রান্নাবান্না করলে তোমার বোনের রূপ কালো হয়ে যাবে না।

বিছানার উপর বসে বরুণা বলে—কিন্তু আমি ভাবছি...।

—কি?

—মেয়েটা কি দিদির বাড়িতে এসেও দাসীর মতো শুধু খাটবে?

—তার মানে?

—অঞ্জনার একটা গতি হওয়া চাই তো।

—কি গতি?

—অঞ্জনার কি বিয়ে হবে না?

—কেমন করে হবে? কে বিয়ে করবে? ক' লাখ টাকা তোমার আছে যে বোনের বিয়ে দেবে? বলতে বলতে উগ্র হয়ে উঠতে থাকে সোমেশের চোখ দুটো।

—কোন উপায় কি নেই? বরুণার মুখটা যেন ভয়ানক একটা জেদের স্বপ্নের মধ্যে বিড় বিড় করতে থাকে।

চেঁচিয়ে ওঠে সোমেশ।—হ্যাঁ, একটা উপায় আছে।

—কি?

—আমাদের দেশ-গাঁয়ে আগে যে নিয়মটা ছিল।

—কি?

—এরকম হতভাগা মেয়েকে কাশীতে নিয়ে গিয়ে বিশ্বনাথের কাছে উৎসর্গ করে ছেড়ে দিয়ে আসা হতো।

—তারপর?

—তারপর আর কি? সে মেয়ে যা হতো তা বিশ্বনাথই জানেন।

হঠাৎ সোমেশের উগ্র চোখের দৃষ্টিটা লজ্জিত হয়ে ওঠে। বরুণার দু'চোখ থেকে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়ছে। চোখ মুছে নিয়ে বরুণা বলে—ছি ছি, তুমি এমন ভয়ানক কথাও বলতে পার! শত হোক, আমারই তো বোন, তোমারই স্ত্রীর বোন, তার ওপর তোমার কোন মায়া নেই?

সোমেশ কুণ্ঠিতভাবে বলে—অনেক দুঃখে বলছি বরুণা? সত্যিই কি আমি চাই যে, অঞ্জনার এরকম একটা ভয়ানক দশা হয়ে যাক। ও বেচারা কি দোষ করেছে বল? ওর ভাগ্যের দোষ।

চুপ করে সোমেশের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে বরুণা। সোমেশ যেন অনুতপ্ত হয়ে নিজের মনের আবেগে বলতে থাকে—এখানে থেকেও কত কষ্ট পাচ্ছে অঞ্জনা, তবু তো বেচারা সব সময় হাসে। নিজেই বলে, বেশ তো আছি, চিরকাল এখানেই থাকবো।

সেরেস্তায় যেতে হবে। সময় হয়ে এসেছে। আলনা থেকে কামিজটাকে তুলে নিয়ে গায়ে দিতে থাকে সোমেশ। আর, তেমনই মুখর হয়ে, যেন মনের একটা বদ্ধ বেদনার কাহিনীকে একেবারে অবাধ করে গিয়ে বলতে থাকে।—আমিও তো তাই বলি। বেচারার যখন কোন গতি হবেই না, কোন উপায়ই নেই, তখন এই বাড়ির কষ্টের মধ্যেই...কষ্ট হোক, তবু এখানে ওকে মায়া করবার মতো মানুষ তো আছে, এ তো আর নিবারণকাকার বাড়ির মতো একটা নিষ্ঠুর বাড়ি নয়।

রান্নাঘরের ভিতর থেকে হঠাৎ বের হয়ে এসে এই ঘরের ভিতরে ঢোকে আর হাসতে থাকে অঞ্জনা। অঞ্জনার হাতে হলুদের দাগ, শাড়ির আঁচলটা ভেজা।

বরুণা—শাড়িটা ভেজালি কেন অঞ্জু?

অঞ্জনা—ইচ্ছে করে কি ভিজিয়েছি? বাসন মাজতে গিয়ে টবের জলের উপর আঁচলটা পড়ে গেল তাই...।

বরুণার মুখের অদ্ভুত হাসির আভা ঝিকঝিক করে।—কি রান্না করছিস অঞ্জু?

অঞ্জনা—আলুর দম, পেঁয়াজ দিয়ে মুসুরির ডাল, আর...।

বরুণা—খুব হলুদ বেটেছিস বুঝি?

অঞ্জনা—হলুদ নয়, জাফরান গুলেছি।

বরুণা—জাফরান কেন?

সোমেশের দিকে ছোট একটা ভ্রূকুটি তুলে খিল খিল করে হেসে ওঠে অঞ্জনা—এই ভদ্রলোক হলুদ পছন্দ করেন না, জাফরানে খুব রুচি।...যাই হোক, আপনি এখনই সেরেস্তায় যাবেন না, একটু পরে যাবেন।

সোমেশ—কেন?

অঞ্জনা—এখনো রান্না শেষ হয়নি।

সোমেশ—আমি এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসছি।

৫

সন্ধ্যা হয়েছে। জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে আর উদাসভাবে তাকায় না বরুণা। বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে যাবার শক্তি নেই। জ্বর আর হয়নি, কিন্তু কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত শরীরটা যেন একেবারে পঙ্গু হয়ে যাবার জন্য সমস্তক্ষণ থরথর করে কাঁপে ; আর বুকের ভিতর একটা বেদনার ভারে নিঃশ্বাসটা ভারি হয়ে যায়।

কিন্তু বরুণার চোখ দুটো যেন সফল স্বপ্নের আনন্দে ঝিকঝিক করে হাসে। যেন, এই রকমই একটা অনড় হয়ে যাওয়া জীবন কামনা করেছিল বরুণা। বেশ চেষ্টা আর চিন্তা করে, অনেক হিসেব করে আর রোজ একবেলার উপোস সেধে এতদিনে একটা আশার কাছাকাছি এসে পৌঁছে গিয়েছে বরুণা।

বিছানার কাছেই একটা কাঠের বাক্সের উপর একটা ওষুধের শিশি রয়েছে। শিশির ভিতরে টলটল করছে তরল ওষুধ, যেমন গাঢ় তেমনই কালো। এই ওষুধটা বরুণার কোমরে মালিশ করতে হয়। ক'দিন ধরে নিজের হাতে আর মালিশ করতে পারে না বরুণা। সোমেশই মালিশ করে দেয়। মালিশের পর, সাবান আর গরম জল দিয়ে ভাল করে হাত ধুয়ে ফেলতে হয়। ডাক্তার বলে দিয়েছেন, সাবধান, ভয়ানক বিষাক্ত এই ওষুধ।

সাহুজীর বাড়িতে রামলীলার গান শোনবার জন্য নিমন্ত্রণ হয়েছে। গান শুনতে চলে

গিয়েছে সোমেশ আর অঞ্জনা। দু' জনের কেউ রামলীলার গান শোনবার জন্য একটুও উৎসাহিত হয়নি। কিন্তু বরুণাই বার বার বলে, অনেক সাধাসাধি করে শেষ পর্যন্ত দুজনকে রামলীলার গান শোনবার জন্য সাহুজীর বাড়িতে পাঠিয়ে ছেড়েছে।

দু' হাতে চোখ চেপে ধরে একবার ফুঁপিয়ে ওঠে বরুণা। যেন নতুন মা'র সেই করুণ কান্নার স্বর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। আমার অঞ্জনার কি উপায় হবে?

বালিশের গায়ে চোখ ঘষে ঘষে মনে মনে বিড়বিড় করে বরুণা--নিশ্চয়ই উপায় হবে নতুন মা। আমি থাকতে কেন উপায় হবে না?

নিবারণকাকা ঠাট্টা করছেন, বোনের বিয়ে দেবে বলে যে খুব বড় গলা করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দেমাক দেখিয়েছিলে, কই, কোথায় তোমার বোন? বিয়ে দিতে পেরেছ কি?

বরুণার বুকের ভিতরটা যেন খিলখিল করে হেসে ওঠে। বেশ তো আর কিছুদিন পরে একবার যেন এই ঘরের ভিতরে ঢুকে ঠাট্টা করতে আসেন নিবারণকাকা। তাহলে...কল্পনা করতে পারে বরুণা, তাহলে কি ভয়ানক জব্দ হয়ে চলে যাবেন নিবারণকাকা। অঞ্জনার সিঁথির দিকে তাকিয়ে লাল টুকটুকে সিঁদুরের চিহ্ন দেখতে পেয়েই চমকে উঠবেন, আর বোকা বনে গিয়ে সরে পড়বেন। হাড়ে হাড়ে বুঝবেন, বোনের বিয়ে দেবার মুরোদ ছিল কি না বরুণার।

টিম টিম করে জ্বলছে ছোট একটা বাতি। বাতিটাতে অনেক তেল ঢেলে দিয়ে গিয়েছে অঞ্জনা। যেন তেল ফুরিয়ে বাতিটা নিভে না যায়। দিদির তো শরীরে আর সাধ্যি নেই যে, উঠে গিয়ে বাতিতে তেল ঢালতে পারবে।

--না না না, আর দেরি করিয়ে দেওয়া উচিত নয়। চুপ করে পড়ে থাকলে আরও দেরি হয়ে যাবে। বিড়বিড় করে বরুণার শুকনো সাদা রক্তহীন ঠোঁট।

বালিশের পাশ থেকে এক টুকরো কাগজ আর একটা পেন্সিল হাতে তুলে নেয় বরুণা। আস্তে আস্তে, যেন সফল প্রতিজ্ঞার উল্লাসে চোখ দুটোকে হাসিয়ে নিয়ে কথাগুলিকে লিখে ফেলে বরুণা।—তুমি রাগ করো না। অঞ্জনাকে বিশ্বনাথেরই কাছে রেখে গেলাম।

কাগজটাকে ভাঁজ করে বালিশের তলায় রেখে দিয়েই ওষুধের শিশিটার দিকে অপলক হয়ে তৃষ্ণার্তের মতো তাকিয়ে থাকে বরুণা। কী সুন্দর দেখতে এক শিশি গাঢ় কালো ও টলটলে তরল মরণ।

শিশিটার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় বরুণা।

দেবশর্মা ও রুচি

পাষাণের প্রাচীর দিয়ে নয়, শুধু পর্ণতরুর ছায়া আর শ্যামলতা দিয়ে বেষ্টিত এক সুন্দর গৃহনীড়। তবু দেবশর্মার এই সুন্দর গৃহনীড়ই ঋষিপত্নী রুচির কাছে কারাগারের মত দুঃসহ মনে হয়। এক বনমৃগীর উদ্দাম স্বপ্নকে যেন এখানে খর কণ্টকশরের প্রাকার দিয়ে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে। রুচি মনে করে, ছায়াময় গৃহনীড় নয় দেবশর্মার এই সংসার যেন ক্ষুদ্র এক মরুখণ্ড ; শুধু জ্বালা আর উত্তাপ। নেই সজল বর্ষণ, নেই গোধূলি, নেই জ্যোৎস্না, নেই কুহেলিকার সুখমন্থর তন্দ্রা। বৃথা এই স্বর্ণবর্ণ কেতকীর সৌরভবিলাস, বৃথা মেঘমেদুর মধ্যাহ্নের এই নীপরজ ও নবজলকণার উৎসব। সন্ধ্যার মল্লিকা ফোটে অকারণে, শালনির্যাসের গন্ধভারে মন্থরিত প্রভাতবায়ু বৃথা ছুটাছুটি করে। ব্যর্থ জীবন, ব্যর্থ যৌবন। প্রতি মুহূর্তের অনাদরে সুন্দরাঙ্গনা রুচির যৌবনের অনঙ্গমাধুরী এখানে যেন অবমানিত হয়। প্রতি মুহূর্তের মরুজ্বালায় এক তরুণী নারীর শত কামনার পুষ্পদল শুকিয়ে আর পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। দুঃসহ এই নিষ্ঠুর বন্ধন। মুক্তি খোঁজে রুচি।

স্বামীকে ভালবাসতে পারেনি রুচি। কেন ভালবাসবে, তার কারণও খুঁজে পায় না। দেবশর্মার এই ক্ষুদ্র গৃহনিকেতনের বাইরে কত তরুণের মুগ্ধচক্ষুর দৃষ্টি তাকে যে অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, সেকথা জানে রুচি। রূপোত্তমা নামে এত বড় লোকখ্যাতি লাভ করেছে যে নারী, শ্রেষ্ঠ রূপবানের পাশেই তার জীবনের স্থান হওয়া উচিত। এই ধারণা শুধু রূপস্তাবক লোকসমাজের ধারণা নয়। রুচি নিজেও মর্মে মর্মে বিশ্বাস করে এই সত্য। এরই নাম বুঝি ইন্দ্রমায়া।

হ্যাঁ, রুচির হৃদয় ইন্দ্রমায়ায় অভিভূত হয়েছে। জীবনের কামনাকে ক্রীতদাসীর মত দেবশর্মার নামে ঐ রূপযৌবনহীন এক অকিঞ্চন পুরুষের পদপ্রান্তে অবনত ক'রে রাখতে চায় না রুচি। এই জীবন হবে চির অভিসারের এক অবারিত উল্লাসের বীথিকা, যার প্রতি ছায়াকুঞ্জের অভ্যর্থনায় তরুণী নারীর সত্ত্বা নিত্য নবতর মিলন অন্বেষণ ক'রে ফিরবে! প্রেমের জীবন হবে অবিরল উৎসবের মত। প্রেমের জীবনে বন্ধন বলে যদি কিছু থাকে, সে বন্ধন হবে কুসুম-মালিকার সূত্রের মত ; এবং কুসুম হবে সেই কুসুম, পুষ্পধন্বার তূণীর হতে বিহ্বল কামনার পরাগ নিয়ে ছুটে যায় আর লুটিয়ে পড়ে যে কুসুম, এই জগতের যৌবনান্বিত সকল প্রাণের উপর।

তাই, মুক্তি খোঁজে রুচি। উটজদ্বারের কাছে এক সপ্তপর্ণীর অঙ্গে অঙ্গভার সঁপে দিয়ে যেন কারও প্রতীক্ষায় দূর পথপ্রান্তের দিকে তাকিয়ে থাকে রুচি।

এই প্রতীক্ষার অর্থ জানেন দেবশর্মা। পরপ্রণয়িনী রুচির অন্তরাত্মা কেন এই পথের ধ্যানে ডুবে রয়েছে, তার রহস্য দেবশর্মার কাছে অজানা নয়। প্রভাতের কুহেলিকার অন্তরালে এই পথে এক সুন্দরদর্শন প্রণয়ী ক্ষণকালের মত দেখা দিয়ে সরে যায়। স্মিত জ্যোৎস্নার ধারাস্নাত রজনীর প্রতি প্রহরে এই পথেই তার পদধ্বনি শোনা যায় ; কিন্তু তাকে দেখা যায় না। এক অশরীরী প্রলোভ যেন অস্থির হয়ে কা'কে অন্বেষণ ক'রে ফিরছে। কত ছদ্মরূপে সে মায়াবী আসে আর যায়। ঐ নবকাশ বনে তাকে দেখা যায়, শ্বেতবাসে সজ্জিত তার অঙ্গ, দূর সপ্তপর্ণীতলে যেন সুচিত্রিত এক নারীর মূর্তির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেবশর্মা তাকে চেনেন, তার নাম পুরন্দর। তারই অনুরাগে প্রতিমুহূর্ত উন্মনা হয়ে আছে রুচি।

ক্ষমা করতে পারেননি দেবশর্মা। ইন্দ্রমায়ায় চঞ্চল এই প্রগল্‌ভ-যৌবনা নারীকে সতর্কতার এক পাষাণপ্রাচীর দিয়ে কঠোরভাবে বন্দী ক'রে রাখতে চান। প্রত্যেক মুহূর্তের উপর যেন শাসন স্থাপিত ক'রে রেখেছেন দেবশর্মা। সুযোগ পায় না মায়াবী পুরন্দর, সুযোগ পায় না

রুচি।

বনমৃগীর এই উদ্দাম স্বপ্নকে এত সতর্কতা দিয়ে বেঁধে রাখবার প্রয়োজন কি? মুক্ত ক'রে দিলেই তো পারেন দেবশর্মা। কিন্তু পারেন না, মন চায় না। তাঁর স্বামীত্বের অধিকারকেই চরম ঘৃণায় তুচ্ছ ক'রে দিয়েছে রুচি, কিন্তু হেরে গিয়েও যেন হার মানতে চান না দেবশর্মা। পুরন্দরের লালসার অভিসন্ধি প্রতিরোধ করবার জন্য যেন এক কঠোর প্রতিজ্ঞা করেছেন।

সপ্তপর্ণীর ছায়াতলে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না রুচি। দেবশর্মার কঠোর আহ্বানে কুটীরের অভ্যন্তর চলে যেতে হয়। কখনও বা সরোবরের সোপানের উপর বসে হিল্লোলিত রক্তকোকনদের দিকে তাকিয়ে থাকে রুচি। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, দেবশর্মা এসে বাধা দেন আর ডেকে নিয়ে যান। মধ্যনিশীথে স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় সুপ্তোত্থিত রুচি মুক্তকপাট বাতায়নের নিকট এসে দাঁড়ায়। দেবশর্মা উঠে এসে বাতায়ন রুদ্ধ ক'রে দিয়ে চলে যান।

রুচির অন্তরাত্মায় বিদ্রোহ জাগে। মুছে ফেলে অঙ্গরাগ, কবরীমাল্য দূরে নিক্ষেপ করে। যেন নির্মম আক্রোশের বশে এক রূপের লতিকা নিজ দেহেরই উপর কণ্টকক্ষত বর্ষণ করে। তবু বিচলিত হন না দেবশর্মা।

কিন্তু মাঝে মাঝে যেন অবসন্ন হয়ে পড়েন দেবশর্মা। বড় অর্থহীন এই সংগ্রাম। রুচি তাঁকে ভালবাসে না, ভালবাসবে না, ভালবাসতে পারে না ; কারণ প্রেমকে রূপযৌবনের উৎসব বলে মনে করেছে রুচি। তৃপ্ত কামনার সুখময় বন্ধন ছাড়া পুরুষের কাছে আর কোন বন্ধন স্বীকার করতে চায় না এই নারী।

গর্ব করবার মত রূপ নেই, যৌবনও নেই দেবশর্মার ; তবু রুচি নামে এই বিপুলযৌবনা নারীকে কেন যেন ভাল লাগে। আশ্চর্য হন দেবশর্মা, তাঁর নিজেরই মনের এই রহস্য বুঝে উঠতে পারেন না। তাই বোধহয় হেরে গিয়েও হার মানতে চান না। রুচি মুক্তি খুঁজলেও তিনি মুক্তি দিতে পারেন না।

যজ্ঞের নিমন্ত্রণে একটি দিনের মত বাইরে যেতে হবে, বিমর্ষ হয়ে বসেছিলেন আর ভাবছিলেন দেবশর্মা। প্রতি মুহূর্ত শুধু এক পরপ্রেমিকা নারীর প্রতিটি আকুলতাকে বাধা দিয়ে দিয়ে অর্থহীন জীবনের অনেকগুলি দিন কেটে গিয়েছে। বড় জ্বালা ও বড় বেশি অপমানে ভরা অনেকগুলি দিন। তবু আজ প্রবাসে যাবার সময় বুঝতে পেরে বিস্মিত হন দেবশর্মা, তাঁর সমস্ত অন্তর বেদনায় ভরে উঠেছে। দেবশর্মা জানেন, ফিরে এসে এই জ্বালাভরা দিনগুলিকেও আর ফিরে পাবেন না। মুক্তির সুযোগ পেয়ে যাবে রুচি। বনমৃগীর উদ্দাম স্বপ্ন অবাধ আনন্দে এই আশ্রমের শান্ত ও শ্যামল ছায়ার সব দুর্বল বাধা ছিন্ন ক'রে চলে যাবে। সার্থক হবে রুচির ইন্দ্রমায়া, সফল হবে পুরন্দরের অভিসার।

অনেকক্ষণ ধ'রে নিবিড় চিন্তার মধ্যে যেন একটি পথ খুঁজতে থাকেন দেবশর্মা। চলে যাবার সময়ও নিকট হয়ে আসছে। দেবশর্মা ব্যস্তভাবে ডাকলেন—বিপুল।

উপাধ্যায়ের এই ব্যস্ত আহ্বান শুনতে পেয়ে পাঠগৃহ থেকে অধ্যয়নরত শিষ্য বিপুল সম্মুখে এসে দাঁড়ায়।

দেবশর্মা বলেন—মাত্র একটি দিনের জন্য যজ্ঞের নিমন্ত্রণে আমাকে বাইরে যেতে হবে বিপুল। কিন্তু যেতে মন চাইছে না।

দেবশর্মার কণ্ঠস্বরে বড় বেশি বেদনার সুর ছিল। বিপুলও সমবেদনার সুরে প্রশ্ন করে—কেন গুরু?

চুপ করে থাকেন দেবশর্মা। যেন বহু দ্বিধা ও লজ্জার মধ্যে তাঁর মুখের ভাষা পথ হারিয়ে ফেলেছে। বিপুলেরই সাগ্রহ এবং বারংবার অনুনয়ে মনের ভার যেন একটু লঘু হয়ে ওঠে। দেবশর্মা বলেন—তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে বিপুল।

—অনুরোধ নয় গুরু, বলুন নির্দেশ।

--প্রতিশ্রুতি দিতে হবে বিপুল, আমার সেই নির্দেশ তুমি পালন করবে।

--সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েও পালন করব গুরু।

দেবশর্মা শান্তভাবে বলেন--তুমি জান বিপুল, রুচি আমাকে ভালবাসে না?

চমকে ওঠে বিপুল--না গুরু, এই প্রথম শুনলাম।

দেবশর্মা--তুমি জান, ইন্দ্রমায়ায় পড়েছে রুচি, পুরন্দরকে সে ভালবাসে?

ব্যথিতভাবে তাকিয়ে থাকে বিপুল, গুরুর এই অপমানের জ্বালা শিষ্যের অন্তরেও যেন বেদনা সৃষ্টি করে।--এই প্রথম জানলাম গুরু।

দেবশর্মা--পুরন্দরের প্রতীক্ষায় পথের দিকে তাকিয়ে আছে রুচির মনের সর্বক্ষণের ভাবনা। আমি সেই পথে পাষাণপ্রাচীরের মত শুধু বাধা তুলে দিয়ে বসে আছি। জানি না, কেন তা'কে এত বাধা দিই, কেন এত কঠোর বন্ধনে তা'কে রুদ্ধ ক'রে রাখি।

কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থেকে দেবশর্মা আবার ধীর স্বরে বলতে থাকেন--কিন্তু, আজ আমাকে প্রবাসে যেতে হবে। ফিরে এসে এই গৃহে আর যে রুচিকে দেখতে পাব, বিশ্বাস হয় না বিপুল।

বিপুল--আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম গুরু, আপনি যতদিন না ফিরে আসেন, কোন পুরন্দরের ইন্দ্রমায়া আমার গুরুপত্নীর দেহ স্পর্শ করতে পারবে না।

দেবশর্মাকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ায় বিপুল। দেবশর্মা চলে যান।

রুদ্ধ হলো বিপুলের পাঠগৃহের দ্বার। ক্ষান্ত হলো অধ্যয়ন। দেবশর্মা চলে যেতেই অপূর্ব অদ্ভুত এক দায় স্মরণ ক'রে শঙ্কিত হয়ে ওঠে তরুণ ব্রহ্মচারী বিপুল। পৃথিবীর কোন গুরুভক্ত শিষ্যকে এমন গুরুভার দায় নিতে হয়েছে, এমন কাহিনী কোন পুরাণে পাঠ করেনি বিপুল।

পরপ্রণয়িনী এক নারীর কামনাকে প্রহরীর মত সদাজাগ্রত ও সতর্ক দুই চক্ষুর শাসন দিয়ে অচঞ্চল ক'রে রাখবার দায় গ্রহণ করেছে বিপুল। পারদারিক পুরন্দরের গোপন অভিসার ব্যর্থ ক'রে দেবার দায় নিয়েছে বিপুল। তরুণ ব্রহ্মচারী বিপুল, জীবনে কোনদিন কোন নারীর যৌবনশোভার দিকে মুখ তুলে যে তাকায়নি, অনুরাগের লীলাকলা আর রীতি-নীতি যার কাছে এক অবিদিত কল্পলোকের রহস্য মাত্র, তাকেই আজ থেকে গ্রন্থ ফেলে রেখে এক ক্ষমাহীন ও কঠোর স্বামীর মত কৌতূহল সংশয় আর আগ্রহ নিয়ে এক অপতিব্রতিনী নারীর জীবনে শাসন রচনা ক'রে রাখতে হবে।

•

পর্ণতরুর ছায়া আর শ্যামলতায় বলয়িত এই গৃহনিকেতন আজ আর কারাগার বলে মনে হয় না, রুচির অবরুদ্ধ জীবনের আকাঙক্ষা অবারিত পথের আশ্বাস দেখতে পেয়েছে। যে মুক্তির লগ্নকে এতদিন ধ'রে প্রতিমুহূর্তের চিন্তায় কামনা ক'রে এসেছে রুচি, আজ আসন্ন হয়ে উঠেছে সেই মুক্তি। প্রতি কুঞ্জের নিকট গিয়ে পুষ্প চয়ন করে রুচি।

কিন্তু অন্তরাল হতে এক তরুণ ব্রহ্মচারীর সতর্ক দৃষ্টি কুঞ্জচারিণী সেই নারীর মদপুলকিত অঙ্গশোভা অনুসরণ ক'রে ফিরতে থাকে, যেন মুহূর্তের মতও দৃষ্টির বাইরে না চলে যায়। গুরুর নির্দেশ।

সরোবরসলিলে স্নান করে রুচি। যেন অনুপম এক রক্তকোকনদের অঙ্গে সলিলের হিল্লোল লাগে। অন্তরাল থেকে সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে সেই সুন্দর দৃশ্যকে নয়নে ধারণ ক'রে রাখে বিপুল। যেন ডুবে না যায় সেই রূপের কোকনদ। গুরুর নির্দেশ।

সন্ধ্যা হয়। দীপ জ্বলে রুচির ঘরে। গোপন একান্তে দাঁড়িয়ে অতি সন্তর্পণে দীপালোকে পুলকিত সেই কুটীরের অভ্যন্তরে প্রসাধনরতা এক যৌবনময়ীর মূর্তির দিকে বিস্ময়াহত দৃষ্টি

নিয়ে তাকিয়ে থাকে বিপুল। সে মূর্তির যবাঙ্কুরের কর্ণপুরে মন্দানিলের লুব্ধ পরশ ক্ষণে ক্ষণে লাগে। কেতকীরজে সুবাসিত তনু, ওষ্ঠাধরে বন্ধুক পুষ্পের অরুণতা, সায়ন্তন মল্লিকার গুচ্ছ তার বেণীপ্রান্তে দোলে। নিরঙ্ক কুসুমপঙ্কে আলিম্পিত বাহু, অলক্তে সেবিত চরণ, মৃদুচ্ছন্দে স্পন্দিত বক্ষঃপটে শ্বেতচন্দনের পত্রাবলী, ইন্দ্রমায়ার এক পরমরমণীয় অর্ঘ্যরূপে প্রস্তুত হয়েছে রুচি। সতর্ক হয়, প্রস্তুত হয় দেবশর্মার তরুণ শিষ্য বিপুল।

নিবিড়তর হয় সন্ধ্যা। গন্ধধূমে আচ্ছন্ন উটজ-প্রাঙ্গণের অলস বাতাস সৌরভে মূর্ছিত হয়। গগনপটে আঁকা রাকা হিমকর নিখিল মহীতলের রূপ আলোকাপ্লুত ক'রে শুধু সপ্তপর্ণীতলে একখণ্ড ছায়াময় অন্ধকারের নিবিড়তা রচনা করেছে। দেখতে পায় বিপুল, তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এক অভিসারচারী পুরুষের ঘনঘোর ছায়াদেহ।

ব্যস্ত হয়ে ওঠে বিপুল। বিপুলের প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ করবার জন্য সকল শক্তি নিয়ে আজ প্রস্তুত হয়ে এসেছে মায়াধর পুরন্দর। এই মুহূর্তে দেবশর্মার গৃহনিকেতনের সকল পুণ্য গ্রাস ক'রে আর দীপ নিভিয়ে দিয়ে চলে যাবে ঐ ছায়াদেহ।

কোন্ শক্তি দিয়ে আজ ইন্দ্রমায়ার এই অভিসন্ধিকে ব্যর্থ করবে বিপুল? অস্ত্রবলে? না, সম্ভব নয়। আবেদন ক'রে? না, বিশ্বাস হয় না। ঐ বনমৃগীর উদ্দাম স্বপ্নকে আজ কোন লৌহ শৃঙ্খলেও বেঁধে রাখতে পারা যাবে না।

সপ্তপর্ণী তরুতলে সেই ভয়ংকর ছায়াদেহ অস্থির হয়ে উঠেছে দেখা যায়। দেখতে পায় বিপুল, দীপ নিভিয়ে দিয়ে প্রাঙ্গণের জ্যোৎস্নালোকে এসে দাঁড়িয়েছেন গুরুপত্নী রুচি। সপ্তপর্ণীর ছায়ার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠেছে প্রণয়ব্যাকুলা রুচির নয়নদ্যুতি।

অন্তরাল হতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে প্রাঙ্গণের জ্যোৎস্নালোকের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় বিপুল।

চমকে ওঠে রুচি--একি? তুমি এখানে কেন বিপুল?

পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে বিপুল। ইন্দ্রমায়ার ছলনাকে সে আজ জীবনের এক চরম দুঃসাহসের বলে পরাভূত করতে চায়। গুরুর নির্দেশ ব্যর্থ হতে দেবে না বিপুল। তার প্রতিশ্রুতির সত্যকে সর্বস্ব দিয়েও রক্ষা করবে তরুণ ব্রহ্মচারী বিপুল।

ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টি তুলে কঠিন ধিক্কারের সুরে রুচি বলে—বুঝেছি বিপুল। গুরুভক্ত তুমি, গুরুর নির্দেশে আমার পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছ। কিন্তু ভুল করো না বিপুল, আমার অভিশাপ থেকে যদি বাঁচতে চাও, তবে দূরে সরে যাও।

মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে বিপুল। দূরে সরে যেতে পারে না বিপুল। গুরুভক্ত শিষ্য বিপুল আজ যে-কোন ভর্ৎসনা আর অভিশাপ নিজ জীবনে গ্রহণ ক'রেও গুরুপত্নী রুচিকে পুরন্দরের প্রণয়ের আকর্ষণ হতে ছিন্ন ক'রে এই কুটীরের প্রাঙ্গণে ধ'রে রাখবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু বিপুলের সকল আশা যেন হঠাৎ ভীত হয়ে বুকের ভিতরে কেঁপে ওঠে। শিষ্যের এই নত মস্তকের আবেদনে এমন কোন শক্তি নেই যে পরপ্রণয়িনী ঐ প্রগল্‌ভার অভিসার স্তব্ধ ক'রে দিতে পারে।

অকস্মাৎ শিহরিত হয় শিষ্য বিপুলের অচঞ্চল মূর্তি ; যেন অন্তরের প্রতিজ্ঞাকে সুন্দর এক ছলনায় সাজিয়ে নেবার জন্য প্রাণপণে এক দুঃসাহস আহ্বান করছে বিপুল।

ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকায় বিপুল, যেন প্রণয়ানুরাগে বিহ্বল এক প্রেমিকের মুখ। বিস্ময়ে চমকে ওঠে রুচির দুই কজ্জলিত নয়নের মদিরতাময় কৌতূহল। মনে হয় রুচির, যেন তারই রূপগরীয়সী মূর্তির কাছে ভক্ত পূজকের মত বুকভরা আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিপুল।

রুচি শান্ত স্বরে প্রশ্ন করে—কি বলতে চাও বিপুল?

বিপুল বলে--গুরুভক্ত নই আমি, তোমারই ভক্ত রুচি।

বিস্ময়ে অভিভূত দৃষ্টি তুলে বিপুলের সেই সম্মোহিত তরুণ মুখচ্ছবির দিকে তাকায় রুচি—আমার ভক্ত তুমি? কোন দিন শুনিনি একথা!

বিপুল—আজ শোন রুচি। তুমিই আমার জীবনের প্রথম বিস্ময়। আমার আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন অবরুদ্ধ হয়ে ছিল এই পাঠগৃহের কারাগারে, সে-স্বপ্নের মুক্তি এনেছ তুমি। তুমিই আমার সেই স্বপ্নলোকের প্রথম মাধুরী, প্রথম কামনার দীপ। তুমি ছাড়া আমার সব ধ্যান আর সব তপস্যা বৃথা।

প্রাঙ্গণের মৃত্তিকা যেন অদ্ভুত এক প্রণয়মন্ত্রপূত বেদিকার মত হয়ে উঠেছে। তার উপর দাঁড়িয়ে আছে এক যৌবনগর্বিতা রূপসীর প্রসাধিত মূর্তি ; এবং তারই সম্মুখে প্রসন্নতাপ্রার্থী এক তরুণ পূজক।

রুচির দুই নয়নের প্রান্তে যেন এক মোহময় হর্ষের বিদ্যুৎ স্ফুরিত হতে থাকে। এর মরুস্থলীর মধ্যে রুচির নির্বাসিত জীবনের কাছে যেন এতদিন ধ'রে এক স্নিগ্ধ উপবন লুকিয়ে ছিল। আজ হঠাৎ সেই উপবন আপনি প্রকট হয়ে বসন্ত সমীরের উচ্ছ্বাস ডেকে এনেছে। রুচির নিঃশ্বাস চঞ্চল হয়, দুই চক্ষুর দৃষ্টি নিবিড় হয়ে ওঠে।

রুচি বলে—কি চাও বিপুল?

বিপুল—অনন্তকাল আমার এই জীবনকে তোমারই মন্দির ক'রে রাখতে চাই রুচি।

বিপুলের আলিঙ্গনে লুটিয়ে পড়ে রুচি।

সপ্তপর্ণী তরুতলের সেই প্রতীক্ষায় পুরন্দর কেঁপে ওঠেন, যেন হঠাৎ এক আঘাত পেয়েছে তাঁর ছায়াদেহ। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসেন পুরন্দর। দেখতে পান, দেবশর্মার কুটীরের প্রাঙ্গণে এক নূতন ছলনার মোহে ইন্দ্রমায়ার ছলনা পরাভূত হয়ে গিয়েছে। এক তরুণ প্রেমিকের ব্যগ্র দুই বাহুর আকুল আগ্রহের নীড়ে যেন বিলীন হয়ে রয়েছে এক প্রেমের পারাবতী।

অপমানিত হয়েছে পুরন্দরের প্রতীক্ষা। একান্তে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে সেই দুঃসহ দৃশ্য দেখতে থাকেন পুরন্দর। পরমুহূর্তের জ্বালালিপ্ত চক্ষু নিয়ে ঝঞ্ঝাতাড়িত মেঘখণ্ডের মত ছুটে চলে যান।

বাহুবন্ধনে যেন এতক্ষণ রুচিকে শুধু অবরুদ্ধ ক'রে রেখেছিল বিপুল। পুরন্দরের রথচক্রের শব্দ দূরান্তে মিলিয়ে যেতেই রুচিকে সেই নিবিড় ছলনার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত ক'রে দেয় বিপুল।—ক্ষমা কর।

বিস্মিত রুচি প্রশ্ন করে—কেন বিপুল?

বিপুল—আমার অভিলাষ সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

রুচি—এ কেমন অভিলাষ বিপুল? তোমার এই সুন্দর দুই বাহু কি দৃঢ় শৃঙ্খলের মত শুধু বন্ধনে আবদ্ধ করবার জন্য নির্মিত দু'টি শুষ্ক ও কঠিন স্পৃহা?

উত্তর দেয় না বিপুল।

রুচি বলে—বল বিপুল, ভীরু কেন তোমার অধর? কুণ্ঠিত কেন তোমার বক্ষের নিঃশ্বাস?

প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় আর ছিল না, সুযোগও ছিল না। দেবশর্মা এসে কুটীরে প্রবেশ করেন। বিপুল এগিয়ে যায় ; এবং গুরুকে প্রণাম করে।

পর্ণতরুর ছায়া আর শ্যামলতায় বেষ্টিত দেবশর্মার গৃহনিকেতনে আবার প্রভাত হয়। বিপুল তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে, ইন্দ্রমায়া ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে, সবই শুনতে পেয়েছেন দেবশর্মা। শুনে শান্ত হয়েছেন। যেখানে যা ছিল, আর যেমন ছিল, সবই তেমনি ফিরে পেয়েছেন দেবশর্মা। রুচি আছে, বিপুল আছে, আছে সেই সপ্তপর্ণী।

কিন্তু সেই পুরাতন দিনগুলিকে আর ফিরে পেলেন না দেবশর্মা। সেই প্রত্যহের সংশয়

আর অপমানের জ্বালায় ভরা দিনগুলি, বনমৃগীর উদ্দাম স্বপ্নকে কণ্টকমেখলা দিয়ে রুদ্ধ ক'রে রাখবার জন্য সেই কঠোর প্রয়াসের দিনগুলি।

বনমৃগী যেন এই গৃহপ্রাঙ্গণেই তার স্বপ্নরাজ্য লাভ করেছে। সপ্তপর্ণীর ছায়ায় দাঁড়িয়ে দূর পথের ধ্যানে রুচিকে আর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় না। এই গৃহপ্রাঙ্গণেরই বক্ষে ধ্বনিত এক তরুণের পদশব্দ রুচির উৎকর্ণ আগ্রহের নূতন স্বপ্ন হয়ে উঠেছে। প্রতীক্ষার মুহূর্ত যাপন করে রুচি। কবে আসবে সেই সন্ধ্যা, যে সন্ধ্যায় রুচির দীপান্বিত কক্ষের দ্বারে ধ্বনিত হবে তারই যৌবনের ভক্ত ঐ তরুণ বিপুলের অভিসারোৎসুক চরণধ্বনির হর্ষ?

অনুভব করেন দেবশর্মা, তাঁর অন্তর যেন এক শূন্যতার গভীরে ডুবে রয়েছে। বুঝতে পারেন না, কেন। তাঁর জীবনের সকল আগ্রহ স্তব্ধ হয়ে গেল কেন? রুচি আছে, কিন্তু মনে হয় দেবশর্মার, তাঁর দুই নয়নের সম্মুখে থেকেও রুচি যেন হারিয়ে গিয়েছে।

রুচিকে প্রতিমুহূর্ত শুধু কঠোর শাসনে রুদ্ধ ক'রে রাখবার দিনগুলি আর ফিরে পেলেন না, সুখী হবারই কথা, কিন্তু যেন উদাস ও অসহায় হয়ে গিয়েছেন দেবশর্মা। শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন দেবশর্মা।

রুচি এসে স্মিতমুখে সম্মুখে দাঁড়ায়—আমার একটি অনুরোধ আছে।

দেবশর্মা—আমার কাছে?

রুচি—হ্যাঁ।

দেবশর্মা—বল।

রুচি—একটি বস্তু উপহার চাই।

দেবশর্মা—কি?

রুচি—গন্ধর্ববধূ যে দিব্যগন্ধ চম্পক কবরীতে ধারণ করে, সেই চম্পক আমি চাই।

অনুরোধ জ্ঞাপন ক'রে কক্ষান্তরে চলে যায় রুচি। অনুরোধ শুনে দেবশর্মার আননে অতি বিষণ্ণ ও বেদনার্ত এক শঙ্কার ছায়া ছড়িয়ে পড়ে, যেন আরও অসহায় হয়ে গেল তাঁর জীবন, এবং মনে হয়, তাঁর শিষ্য বিপুলও হারিয়ে গিয়েছে।

দেবশর্মা ডাকেন—বিপুল।

পাঠগৃহের নিভৃতে বসে গুরুর আহ্বান শুনে চমকে ওঠে বিপুল, যেন তার বক্ষের গভীর গোপনে সঞ্চিত এক মধুর অনুভব হঠাৎ ভয় পেয়ে চমকে উঠেছে।

কেন চমকে ওঠে বিপুল? পরপ্রণয়িনী এক অভিসারিকা নারীকে কপট আলিঙ্গনে রুদ্ধ করতে গিয়ে বিপুলের অভিলাষহীন দেহের কঠোর শুচিতা কি হঠাৎ এক মোহময় কোমলতার আঘাতে চমকে উঠেছিল? সে-নারীর অঙ্গরাগের কেতকীরেণু কি তরুণ ব্রহ্মচারীর অন্তরে ক্ষণমধুরতার কুহক সৃষ্টি করেছিল?

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পেরেছে বিপুল। গুরুপত্নী রুচিকে ইন্দ্রমায়ার গ্রাস থেকে রক্ষা করেছে। কিন্তু কেমন করে এক মোহ থেকে মুক্ত হয়েও আর এক ছলনার কাছে রুচির তৃষ্ণা নতুন ক'রে হারিয়ে গিয়েছে, সেই কাহিনীর কিছু জানেন না গুরু। সেই কাহিনী গুরুর কাছে প্রকাশ করেনি গুরুভক্ত ও সত্যনিষ্ঠ শিষ্য বিপুল। কিন্তু কেন এই গোপনতা?

গ্রন্থ ফেলে রেখে গাত্রোত্থান ক'রে পাঠগৃহ হতে ধীরপদে অগ্রসর হয়ে দেবশর্মার সম্মুখে এসে দাঁড়ায় বিপুল। কেন ডাকছেন গুরু? কি বলতে চাইছেন গুরু? দেবশর্মার শান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে অনুমান করতে পারে না শিষ্য বিপুলের অশান্ত মন। বক্ষের গভীর গোপনে সঞ্চিত এক মধুর অনুভবের স্মৃতি শুধু উদ্বিগ্ন নিঃশ্বাসের আঘাত সহ্য করতে থাকে।

দেবশর্মা বলেন—রুচি উপহার চেয়েছে বিপুল। দিব্যগন্ধ চম্পক কোথায় আছে জানি না। তুমি নিয়ে এস।

শঙ্কা দূর হয় ; শান্ত হয় বিপুলের মন।

চলে যায় বিপুল। প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে, সপ্তপর্ণীর ছায়া পার হয়ে, উটজদ্বার অতিক্রম ক'রে দূর পথের রেখার দিকে চলে যেতে থাকে বিপুল। দেখতে পান দেবশর্মা, সেই পথের দিকে নিষ্পলক নয়নের দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে আছে রুচির দুই সাগ্রহ ও সস্পৃহ নয়ন।

আবার দীপ জ্বলে রুচির ঘরে। নূতন পথের ধ্যানে ডুবে আছে রুচির মন, যে পথে এই সন্ধ্যায় আকুল হয়ে দেখা দেবে দিব্যগন্ধ চম্পকের অভিসার।

বুঝতে পারবে না কি বিপুল, কার কাছ থেকে আর কেন এই দিব্যগন্ধ চম্পক উপহার নেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে রুচির অন্তর? কল্পনা কি করতে পারবে না তরুণতরুর মত যৌবনান্বিত ঐ প্রণয়ী বিপুল, সেদিনের অসমাপ্ত উৎসবের পিপাসা তৃপ্ত করবার জন্য বিপুলকে ইঙ্গিতে আহ্বান করেছে বিপুলেরই স্বপ্নের আকাঙ্ক্ষিতা নারী?

প্রতীক্ষার মুহূর্ত গণনা করে রুচি, দিব্যগন্ধ চম্পকের উপহার নিয়ে আর কতক্ষণ পরে ফিরে আসবে বিপুল? এই কক্ষের দ্বারে কতক্ষণে দেখা দেবে প্রেমাভিলাষী বিপুলের স্মিতপুলকিত তনুচ্ছায়া?

কিন্তু সেই দিব্যগন্ধ চম্পক তখন দেবশর্মার পায়ের কাছে পড়েছিল। ফিরে এসে গুরুরই সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিল চম্পক। পরিশ্রান্ত ও বিষণ্ণ স্বরে বিপুল বলে--আপনার অভীপ্সিত বস্তু এনেছি গুরু। গ্রহণ করুন এই দিব্যগন্ধ চম্পক।

দেবশর্মা বলেন—এই দিব্যগন্ধ চম্পকের উপহার আমার জন্য চাইনি বিপুল। যে চেয়েছে তাকে দিয়ে এস।

বিপুল—কে চেয়েছে?

দেবশর্মা—রুচি।

বিপুল—কিন্তু এই উপহার গুরুপত্নীর কাছে আমি নিয়ে যাব কেন গুরু? সে কাজ আমার কাজ নয়।

দেবশর্মা—আমি জানি, রুচি তোমারই হাত থেকে এই উপহার নিতে চায়।

আর্তনাদ করে বিপুল--আমাকে ভুল বুঝবেন না গুরু।

দেবশর্মা—তোমাকে ভুল বুঝিনি বিপুল। তোমাকে মুক্তি দিতে চাই। তুমি আর আমার শিষ্য নও।

বিপুল—কেন গুরু?

দেবশর্মা—নিজের মনের কাছে এই প্রশ্ন কর বিপুল।

চমকে ওঠে বিপুলের মনের গভীরে লুক্কায়িত এক মধুর অনুভবের অপরাধ। আর্তস্বরে চিৎকার করে বিপুল—আমার একটি গোপনতার অপরাধ ক্ষমা করুন গুরু।

দেবশর্মা—কিসের গোপনতা?

বিপুলের চক্ষু বাষ্পায়িত হয়ে ওঠে। পুরন্দরের প্রণয়ের মোহ হতে গুরুপত্নী রুচিকে রক্ষা করবার সেই বিচিত্র দুঃসাহসের কাহিনী গুরুর কাছে ব্যক্ত করে বিপুল। বিচলিত স্বরে বিপুল বলে--বিশ্বাস করুন গুরু, আমি ছলনা মাত্র, তার বেশি কিছু নই। শুধু গুরুপত্নীকে রক্ষা করেছি। শুধু প্রণয়ের অভিনয় করেছি। নিতান্তই হৃদয়হীন সেই প্রণয়, তার মধ্যে আর কোন অভিলাষ ছিল না গুরু।

দেবশর্মার শান্ত মুখে অদ্ভুত এক ক্ষমাময় প্রসন্নতা দেখা দেয়।—ভালই করেছ বিপুল। বিশ্বাস করি আমি, তোমার সেই ছলপ্রণয়ের অভিনয় নিতান্তই অভিনয়। গুরুপত্নীকে রক্ষা করা ছাড়া আর কোন অভিলাষ তোমার ছিল না। কিন্তু...

বিপুল—বলুন গুরু।

দেবশর্মা—তোমার ছলনা হৃদয়হীন বটে, কিন্তু তুমি তো হৃদয়হীন নও!

কি ভয়ংকর সত্য ঘোষণা করেছেন গুরু! বিপুলের বক্ষের পঞ্জর বজ্রনাদে আতঙ্কিত বল্মীকধূলির মত কেঁপে ওঠে। সেই বক্ষঃপঞ্জরের অন্তরালে, গভীর গোপনে সঞ্চিত এক মধুর অনুভব যেন ক্রন্দন ক'রে উঠেছে—তুমি তো হৃদয়হীন নও বিপুল। আমি যে তোমার সেই ছলনারই দান। আমি যে তোমারই আলিঙ্গনে লুণ্ঠিত এক বিপুলযৌবনার ললিতকোমল ও মোহময় স্পর্শের সৌরভ।

ক্ষমা করেছেন গুরু। কিন্তু অনুভব করে বিপুল, এই আশ্রমে গুরুসন্নিধানে থাকবার অধিকার সত্যই হারিয়েছে শিষ্য বিপুলের জীবন। চলে যেতে হবে চিরকালেরই মত। কিন্তু স্মরণ করে বিপুল, গুরুপত্নী রুচিকে সত্যই রক্ষা করতে পারেনি গুরুভক্ত বিপুল। ইন্দ্রমায়ার মোহ হতে রুচিকে রক্ষা করতে গিয়ে স্বয়ং বিপুলই রুচির জীবনে নূতন এক মোহ হয়ে উঠেছে।

অকস্মাৎ যেন নূতন এক প্রতিজ্ঞার আবেগ বিপুলের নয়নে শিহরিত হতে থাকে। গুরুভক্ত শিষ্য অবশ্য তার প্রতিশ্রুতির সত্য রক্ষা করবে। গুরুপত্নী রুচিকে গুরুপ্রিয়ার গৌরবে বিভূষিত ক'রে চলে যাবে বিপুল। জয়ী হবে গুরুভক্ত শিষ্যের জীবনের অভিলাষ।

এই গুরুগৃহে শিষ্য বিপুলের জীবনে পালনীয় আর কোন ব্রত নেই। আছে শুধু একটি পরীক্ষা। শুধু একবার হৃদয়হীন হতে হবে, বক্ষের গভীরে গোপনে সঞ্চিত একটি মধুর অনুভবের উপর জ্বালাময় ভস্ম নিক্ষেপ ক'রে মুক্ত হয়ে যেতে হবে। দিব্যগন্ধ চম্পক হাতে তুলে নেয় বিপুল।

দেবশর্মার শান্ত চক্ষুর কৌতূহল হঠাৎ চমকে দিয়ে দৃপ্ত স্বরে নিবেদন করে বিপুল—আমি আপনারই শিষ্য, আমি চিরকালের গুরুভক্ত শিষ্য।

দেবশর্মাকে প্রণাম ক'রে ত্বরিত পদে চলে যায় বিপুল।

রুচির ঘরে দীপশিখা কেঁপে ওঠে। দিব্যগন্ধ চম্পকের উপহার নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে বিপুল।—এনেছি আপনার দিব্যগন্ধ চম্পক।

বিপুলের ভাষণ যেন বিচিত্র এক রূঢ়তার ধিক্কার। বিস্মিত হয় রুচি।—এই কি উপহার অর্পণের রীতি?

বিপুল—আমি আপনাকে উপহার অর্পণ করছি না গুরুপত্নী রুচি, আমি গুরুর আদেশ পালন করছি।

রুচির প্রতীক্ষার আনন্দ নির্মম আঘাতে ব্যথিত হয়ে চমকে ওঠে—গুরুর আদেশ?

বিপুল—হ্যাঁ।

রুচি—কিন্তু তুমি সত্যই কি বুঝতে পারনি বিপুল, তোমারই হাত থেকে ঐ দিব্যগন্ধ চম্পক গ্রহণ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে রয়েছে আমার অন্তর?

বিপুল—বুঝতে পারি। কিন্তু বুঝতে পারি না, গুরুপত্নী কেন তাঁর স্বামীর এক শিষ্যের কাছ থেকে এমন উপহার আশা করেন।

রুচির সুন্দর চক্ষু প্রখর সন্দেহের স্পর্শে যেন বহ্নিময় হয়ে ওঠে—ভুলে যাও কেন বিপুল, গুরুপত্নীর অন্তরে সে আশা যে তুমিই সঞ্চারিত করেছ, জ্যোৎস্নারমিত এক সন্ধ্যার পরমক্ষণে, তোমার প্রেমবিধূত সম্ভাষণে, আর ব্যগ্র আলিঙ্গনে?

বিপুল—সেই সম্ভাষণ আর সেই আলিঙ্গন নিতান্তই এক অভিনয়। পরানুরাগিণী অভিসারিকার পথরোধের কৌশল।

রুচির ভ্রূকুটিকুটিল চক্ষুর দৃষ্টিতে যেন অসহ দাবদাহের জ্বালা ঝলক দিয়ে ওঠে—তোমার যে ব্যাকুল আহ্বানের মায়ার কাছে ইন্দ্রমায়াও হার মেনে চলে গিয়েছে, সেই আহ্বান কি সকলই ছলনা?

বিপুল—হ্যাঁ।

বজ্রহতা হরিণীর মত আর্তস্বরে চিৎকার ক'রে ওঠে রুচি—যাও।

চলে যায় বিপুল।

দীপ নিভে যায়। দিব্যগন্ধ চম্পকের উপহার ভূতলে লুটিয়ে পড়ে থাকে। আর লুটিয়ে পড়ে থাকে রুচি। ছলনা, সকলই ছলনা। এই রূপ আর যৌবন জীবনের কয়েকটি প্রমত্ত বসন্তের ছলনা। একটি ধিক্কারে যেন আজ রুচির স্বপ্নরাজ্য চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তার নিরাশ্রয় প্রাণ আজ এই অন্ধকারের সমাধিতে একটুকু হৃদয়ের আশ্রয় খুঁজছে।

উষ্ণ সলিলধারায় আপ্লুত হয় নয়ন এবং সেই নয়নে যেন এক শান্ত স্বপ্নচ্ছবি ফুটে উঠতে থাকে। সন্ধ্যামেঘের রক্তিমার মত এই রূপ আর যৌবন জীবনের আকাশপট হতে মুছে গিয়েছে, তবু প্রেম আছে, সে প্রেম হৃদয়ের ডোরে বাঁধা। কামনার মায়া ফুরিয়ে যায়, তবু হৃদয় ফুরিয়ে যায় না। যে ভালবাসে হৃদয় দিয়ে, সে-ই তো ভালবাসতে পারে চিরকাল। হৃদয়েরই বন্ধনে ভালবাসা চিরন্তন হয়। তটশিলার কঠিন বন্ধন সত্য, তাই সত্য তটিনীর রূপ। আর সবই গোপনের ইন্দ্রমায়া, ক্ষণিকের ছলনা, মরীচিকার মত সুন্দর ও মিথ্যা।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় রুচি। দিব্যগন্ধ চম্পকের উপহার হাতে তুলে নেয়। আজিকার এই দীপহীন অন্ধকারে সত্যই যেন এক চিরকালের প্রেমিকের সন্ধানে নূতন অভিসারে যাত্রা করে রুচি। কক্ষদ্বার পার হয়ে প্রাঙ্গণের উপর এসে দাঁড়ায়। এগিয়ে যায়, এবং আর একটি দীপহীন কক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

দীপহীন অন্ধকারের মধ্যে সমাহিত মূর্তির মত স্তব্ধ ও নিঃশব্দ ঋষি দেবশর্মা হঠাৎ চমকে ওঠেন। জানেন না, কল্পনাও করতে পারেন না এবং বুঝতেও পারেন না দেবশর্মা, তাঁর পায়ের উপর শুধু দিব্যগন্ধ চম্পকের অর্ঘ্য নয়, পুষ্পের চেয়েও কোমল অলকস্তবকের অর্ঘ্য নিয়ে রুচির মাথাও লুটিয়ে পড়ে রয়েছে।

কিসের অর্ঘ্য? দেবশর্মা বিচলিত হয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে অর্ঘ্য স্পর্শ করতে গিয়েই রুচির মাথা স্পর্শ করেন। দুই হাত দিয়ে সাগ্রহে দেবশর্মার হাত চেপে ধরে রুচি।

দেবশর্মা বিস্মিত হন—এ কি? কে তুমি?

রুচি—আমি, তোমারই রুচি।

দেবশর্মা—এত ব্যথিত হলে কেন রুচি? যে মুক্তি তুমি চাও, সেই মুক্তি আমি তোমাকে দিয়েছি।

রুচি—চাই না মুক্তি।

দেবশর্মা—কি চাও বল।

দেবশর্মা—চাই তোমার বন্ধন, চাই তোমার দেওয়া শাস্তি, চাই তোমার বাধা, চাই তোমার শাসন।

দেবশর্মা—কোন দিন যা চাওনি, আজ তাই কেন চাইছ রুচি?

রুচি—কোন দিন যা বুঝিনি, আজ তাই বুঝতে পেরেছি ঋষি।

দেবশর্মা—কি?

রুচি—তুমি সহৃদয়, আর সবই ছলনা।

কয়েকটি মুহূর্ত শুধু স্তব্ধ হয়ে থাকেন দেবশর্মা। তারপর সান্ত্বনার সুরে বলে ওঠেন—ওঠ রুচি।

রুচি ওঠে। দীপ জ্বালে। সে দীপের আলোকে দেখা যায়, দেবশর্মার পদস্পর্শে পূত দিব্যগন্ধ চম্পক রুচির অলকস্তবকে গাঁথা রয়েছে।

জনক ও সুলভা

দূরে মিথিলা নগরী, দেখা যায় বিদেহরাজ ধর্মধ্বজ জনকের নিবিড়ধবল প্রাসাদের শিখরকেতন। যেন এই প্রভাতের নবারুণপ্রভা পান করবার জন্য জাগ্রত বিহঙ্গমের মত চঞ্চল হয়ে উঠেছে পবনাবধূত কেতনের মণিজাল। আর, মিথিলার পুরপ্রাকার হতে অনেক দূরে কাননভূভাগের এই নিভৃতে এক কুসুমিত কিংশুকের ছায়ায় অচঞ্চল নেত্রে রক্তলাজানুরঞ্জিত দিগ্‌ললাটের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কাষায়পরিহিতা এক সন্ন্যাসিনী, সন্ন্যাসিনী সুলভা।

জানে না সন্ন্যাসিনী সুলভা, শেষ নিশীথের শিশিরে অভিষিক্ত কিংশুকের একটি মঞ্জরী কখন বৃন্তচ্যুত হয়ে তারই জটাকীর্ণ রুক্ষ অলকস্তবকের উপর পড়েছে। বুঝতে পারে না সুলভা, তার ধ্যানস্তিমিত এই দেহের কাষায় আচ্ছাদনের উপর কখন বিন্দু বিন্দু পরাগচিহ্ন অঙ্কিত ক'রে রেখে গিয়েছে কুসুমরজে অন্ধীভূত চপল মধুপের দল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে বনসরসীর তটে এসে দাঁড়ায় সন্ন্যাসিনী সুলভা। তার পরেই অঞ্জলিপুটে সলিল গ্রহণ ক'রে মন্ত্রপাঠের জন্য প্রস্তুত হয়।

উপাসিকা সুলভা, মুনিব্রতে দীক্ষিতা সুলভা, সুকঠোর ব্রহ্মচর্যে অভ্যস্তা সুলভা বিগত দশ বৎসর ধ'রে এইভাবে তার কামনাবিহীন জীবনের প্রতি প্রভাতে মন্ত্রপাঠ ক'রে এসেছে। সংসারনিলয়ের সকল ভোগ স্পৃহা ও অনুরাগের বন্ধন হতে অনেক দূরে সরে গিয়েছে সুলভার জীবন। রাজর্ষি প্রধানের কন্যা সুলভা, ক্ষত্রিয়াণী সুলভা আজ এই পৃথিবীর এক বিষয়রাগরহিতা সন্ন্যাসিনী মাত্র। দশ বৎসরের তপঃক্লেশ আর বৈরাগ্যভাবনা রাজতনয়া সুলভার চক্ষুর সম্মুখে এক নূতন জগতের রূপ অপাবৃত ক'রে দিয়েছে। এই জগৎ তৃষ্ণাহীন ও বেদনাহীন এক জগৎ। এখানে সুখবোধ নেই, দুঃখবোধও নেই। উল্লাস নেই, ক্রন্দনও নেই। সর্বত্যাগের আনন্দে অভিমন্ডিত এই জগতে সুখাসুখ লাভালাভ ও প্রিয়াপ্রিয় জ্ঞানের দ্বন্দ্ব নেই। এই জীবন শুদ্ধ আত্মজ্ঞানের আলোকে ভাস্বরিত জীবন। অখণ্ড প্রশান্তির জীবন। দেহ থাকে, যৌবনও থাকতে পারে, কিন্তু দেহ ও যৌবনের কোন অভিমানের বেদনা এই জীবন্মুক্ত জীবনের প্রশান্তি ক্ষুন্ন করতে পারে না।

মোক্ষাভিলাষিণী সুলভার জীবনকে তার এই পরম এষণা অহর্নিশ ব্যাকুল ক'রে রেখেছে। পবিব্রাজিকা সুলভার জীবনের দশটি বৎসরের প্রতি মুহূর্ত এই আত্মজ্ঞানের সন্ধানে ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। অনুভব করেছে সুলভা, এতদিনে যাতনাবিহীন হয়েছে তার এই দেহ, অনেক আকাঙ্ক্ষায় ও অনেক স্পৃহায় একদিন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল যে দেহ ও দেহের কল্লোলিত যৌবন। যেমন নিদাঘ-তপনের খরকিরণের জ্বালা, তেমনি শিশিররজনীর হিমভারপীড়িত বায়ুর দংশন এই দেহে বরণ ক'রে নিয়ে ধ্যানাসনে সুস্থির হয়ে বসে থাকতে পারে সুলভা। তপ্ত রৌদ্র যেন তপ্ত নয়, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাও যেন স্নিগ্ধ নয়। তপ্ততায় আর স্নিগ্ধতায়, রৌদ্রে ও জ্যোৎস্নায় যেন কোন প্রভেদ অনুভব করে না সন্ন্যাসিনী সুলভার দেহ। এই তো সেই দেহ, কিন্তু কল্পনা করতেও বিস্ময় বোধ করে সুলভা, আজ কোথায় গেল রাজপ্রাসাদের স্নেহ ও গর্বে লালিত সেই দেহের বাসনাবিলসিত নিঃশ্বাসগুলি? কে জানে কোথায় চিরকালের মত হারিয়ে গিয়েছে সেই মঞ্জীরিত চরণের চলচঞ্চলতা! এই তো সেই দুই বাহু, কিন্তু কনককেয়ূরে শোভিত হবার জন্য আজ আর এই দুই বাহুতে কোন তৃষ্ণা নেই। শীতল সিতচন্দনের চিত্রকে চিত্রিত হতো যে বক্ষঃফলক, আজ সেই বক্ষঃফলকে তপ্ত বনভূমির ধূলি উড়ে এসে ক্ষতচিহ্ন অঙ্কিত করে। কিন্তু তার জন্য সুলভার মনে কোন ক্লেশ আর কোন দুঃখ জাগে না।

তাই আরও বিস্মিত হয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করে সুলভা, তবে সে কি আজ এতদিনে সত্যই

এই সংসারের সকল হিমাতপ ক্ষুৎপিপাসা আর কামনাকে পরাজয় করতে পেরেছে? সন্ন্যাসিনীর জীবন কি এতদিনে তার আত্মসম্বোধি খুঁজে পেল? কিন্তু কি আশ্চর্য, নিজেরই মনের এই জিজ্ঞাসার ভাষা শুনে সন্ন্যাসিনী সুলভার মন হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে যায়। যদি সত্যই তৃষ্ণাহীন হয়ে থাকে এই দেহ, তবে শান্ত হয় না কেন এই মন? এই তপঃক্লিষ্ট দেহের দিকে তাকিয়ে আজও কেন হঠাৎ ভয়ে বিহ্বল হয়ে ওঠে উপাসিকার অক্ষিতারকা?

অঞ্জলিপুটে গৃহীত সলিলের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রপাঠ করতে গিয়ে আজও আর একবার অকস্মাৎ অন্যমনা হয়ে যায় আর মন্ত্র ভুলে যায় সুলভা। অন্যদিনের মত আজও নিজের এই ক্ষণবৈচিত্র্যের রহস্য বুঝতে না পেরে বিষণ্ণ হয় সুলভা, কিন্তু পরমুহূর্তে চমকে ওঠে।

দেখতে পেয়েছে সুলভা, এইবার বুঝতেও পেরেছে সুলভা, কোথায় আর কেন তাঁর এই দশ বৎসরের কঠোর ব্রহ্মব্রত আর তপশ্চর্যায় গঠিত জীবনে, যাতনাবোধহীন এই বক্ষঃফলকের অন্তরালে একটি বেদনা অভিমানকুণ্ঠিত নিঃশ্বাসের মত লুকিয়ে রয়েছে। সন্ন্যাসিনী সুলভা তার যে হাতে মন্ত্রপূত সলিল ধারণ ক'রে রয়েছে, সেই হাতে অঙ্কিত রয়েছে অতীতের এক ক্ষতরেখার চিহ্ন, যেন কমলপত্রের উপর বিগত দিবসের এক করকাশিলার আঘাতের স্মৃতি। দশ বৎসর পূর্বে জীবনের এক আশাভঙ্গের বেদনা সহ্য করতে না পেরে রাজর্ষি প্রধানের কন্যা মানিনী সুলভার অন্তর তার নিজেরই রূপ আর যৌবনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। নিজের হাতের পুষ্পমাল্য নিজেই ছিন্ন ক'রে ভূতলে নিক্ষেপ করেছিল সুলভা! আর, সেই পুষ্পমাল্যও যেন আহত ভুজঙ্গের মত একটি চকিত দংশনে রাজতনয়ার করকমলে রুধিরবিন্দু স্ফুটিত ক'রে ভূতলে লুটিয়ে পড়েছিল। সেই ক্ষত আজ আর নেই, সেই ক্ষতের জ্বালাও কবেই মুছে গিয়েছে, শুধু আছে সেই ক্ষতের একটি স্মৃতিচিহ্নরেখা।

রাজর্ষি প্রধান তাঁর কন্যা সুলভার জন্য বার বার তিনবার স্বয়ংবরসভা আহ্বান করেছিলেন। চন্দ্রোদয়ে বিলোল সমুদ্রবেলার মত অঙ্গে অঙ্গে যৌবন-কল্লোলিত রূপ আর শোভা নিয়ে কুমারী সুলভা তার জীবনের চিরসঙ্গী আহ্বানের আশায় যে প্রসূনমালিকাকে সাদর চুম্বনে চঞ্চলিত ক'রে রেখেছিল, সেই মালিকা কণ্ঠে ধারণ করতে পারে, এমন কোন যোগ্যজন খুঁজে পেলেন না রাজর্ষি প্রধান। এসেছিল কত শত ক্ষত্রিয়কুমার, রাজর্ষি প্রধানের বিবেচনায় তাদের মধ্যে একজনও কিন্তু তাঁর কন্যা সুলভার স্বয়ংবরসভায় প্রবেশলাভ করারও যোগ্য ছিল না। সুলভার পাণিপ্রার্থী কুমারেরা সুলভার পাণি গ্রহণের অযোগ্য বলে ধিক্কৃত হয়ে স্বয়ংবরসভার প্রবেশপথ হতেই ফিরে গিয়েছিল।

সকলেই অযোগ্য, কিন্তু বিদেহরাজ জনক তো অযোগ্য নন। রাজর্ষি প্রধানের কন্যা সুলভার স্বয়ংবরসভার কথা তো তিনিও শুনতে পেয়েছেন। ফুল্লযৌবনা সুলভার সেই রূপের কাহিনী শুনতে পেয়েছেন জনক, যে রূপের প্রভায় রাজর্ষি প্রধানের প্রাসাদের সকল মণিদীপের দ্যুতিও ম্লান হয়ে যায়। সুলভার স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত হবার জন্য সাগ্রহ আমন্ত্রণের লিপিও বিদেহরাজ জনকের কাছে কতবার প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু আসেননি জনক।

জেনেছে সুলভা, জেনেছেন রাজর্ষি প্রধান, আর যে-ই আসুক, আসতে পারেন না জনক। বিষয়কামনারহিত মোক্ষব্রত নিষ্কাম ও আত্মজ্ঞানী জনক এই জগতের কোন রূপোত্তমা নারীর বরমাল্য লাভের জন্য প্রলুব্ধ হতে পারেন না।

বার বার তিনবার। বৃথাই শুধু প্রতীক্ষা কল্পনা আর হৃদয়চাঞ্চল্য সহ্য করে কুমারী সুলভার হাতের বরণমাল্য। বাষ্পাভিভূত হয় পিতা প্রধানেরও চক্ষু। কিন্তু শুধু বার বার তিনবার, তারপর আর নয়। শেষ স্বয়ংবরসভার শূন্য বক্ষে একাকিনী দাঁড়িয়ে শুধু দেখতে থাকে সুলভা, অপরাহ্ণের আকাশবক্ষ হতে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল ক্লান্ত দিবসের সৌরকরপ্রভা; সন্ধ্যার রক্তরাগ ফুটে উঠল শান্ত চিতানলদ্যুতির মত, তার পরেই পৌর্ণমাসী রজনীর পূর্ণ

শশধর। কিন্তু মনে হয় সুলভার, তার জীবনের একটি ব্যর্থতার বেদনা যেন পূর্ণকলার রূপ গ্রহণ ক'রে আকাশে ফুটে উঠেছে। বরণমাল্য ছিন্ন ক'রে ভূতলে নিক্ষেপ করে সুলভা। মাল্যসূত্রের খরস্পর্শে ক্ষতাক্ত হয় সুলভার করতল।

রাজর্ষি প্রধান এসে কম্পিতস্বরে প্রশ্ন করেন—এ কি করলে কন্যা?

সুলভা—আর এই বৃথা প্রতীক্ষার জীবন সহ্য করতে ইচ্ছা করে না পিতা।

রাজর্ষি প্রধান অশ্রুসজল চক্ষু, তুলে প্রশ্ন করেন—বৃথা প্রতীক্ষা কেন বলছ কন্যা?

সুলভা—বুঝেছি পিতা, আমার অদৃষ্টই চায় যে, আমার হাতের বরণমাল্য যেন আমার হাতেই শুকিয়ে শেষ হয়ে যায়। বার বার তিনবার ব্যর্থ হয়েছে আমার প্রতীক্ষা। আমাকে আর এই উপহাস সহ্য করতে বলবেন না পিতা?

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকেন রাজর্ষি প্রধান। তার পরেই ব্যথিত স্বরে বলেন—তবে তুমি কি চিরকুমারী হয়ে জীবনাতিপাত করতে চাও কন্যা?

সুলভা—হ্যাঁ পিতা।

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কি-যেন চিন্তা করতে থাকেন রাজর্ষি প্রধান। পরক্ষণে তাঁর বিষাদমেদুর দুই চক্ষুর দৃষ্টি হঠাৎ দীপ্ত হয়ে ওঠে। রাজর্ষি প্রধান বলেন—আমার কুলযশের কথা তুমি কি জান না কন্যা?

সুলভা—জানি পিতা, আপনি সকল ক্ষত্রিয়ের সম্মান ও শ্রদ্ধার আস্পদ। আপনি রাজর্ষি, আপনার পূর্বপুরুষের অনুষ্ঠিত যজ্ঞকর্মে স্বয়ং সুরপতি ইন্দ্রও উপস্থিত থাকতেন। আমি সেই যজ্ঞনিষ্ঠ ক্ষত্রকুলের কন্যা।

রাজর্ষি প্রধান—কিন্তু সেই বংশের কন্যা যদি চিরকুমারীর জীবন যাপন করে, তবে সর্বসমাজে সেই বংশেরই অপযশ প্রচারিত হবে না কি কন্যা?

পিতার প্রশ্ন শুনে অকস্মাৎ সন্ত্রস্তের মত চমকে উঠলেও, ধীর দৃষ্টি তুলে শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করে সুলভা—আপনি কি বলতে চাইছেন পিতা? চিরকুমারী হয়ে বেঁচে থাকার পরিবর্তে আপনার কন্যা যদি এখনি মৃত্যু বরণ করে, তবেই কি আপনার কুলখ্যাতি অক্ষুণ্ণ থাকবে?

রাজর্ষি প্রধান ব্যথাবিব্রত স্বরে বলেন—না কন্যা, তোমার পিতাকে এত নিষ্ঠুর বলে মনে করো না।

অশ্রুপ্লাবিত হয় সুলভার চক্ষু—আমার রূঢ় ভাষণের অপরাধ ক্ষমা করুন পিতা, এবং আদেশ করুন আমাকে ; বলুন, কি করলে আপনার কুলখ্যাতি ক্ষুণ্ণ হবে না।

রাজর্ষি প্রধান বলেন—তুমি আমার কুলখ্যাতি বৃদ্ধি কর কন্যা।

সুলভা—বলুন, তার জন্য কি করতে হবে।

রাজর্ষি প্রধান—তুমি ব্রহ্মব্রত গ্রহণ কর কন্যা। বিষয়সংসর্গ হতে মুক্ত হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ কর তুমি। ভবিষ্যতের মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে তোমারই পিতৃকুলের এই সুযশ কীর্তিগাথা হয়ে ধ্বনিত হবে, মোক্ষপথের পথিক হয়েছিল আর আত্মসিদ্ধি লাভ করেছিল ক্ষত্রিয় প্রধানের কুমারী কন্যা ব্রহ্মবাদিনী সুলভা। আমার ইচ্ছা, সাত্ত্বিকা হও তুমি, পরম জ্ঞানে প্রশান্ত হোক তোমার জীবন। সুখাকাঙক্ষারহিত এক জগতের পথে পরিব্রাজিকা হও তুমি।

রাজর্ষি প্রধানের মুখ হতে যেন এক নূতন জীবনের পরিচয়বাণী মন্ত্রধ্বনির মত উৎসারিত হয়ে চলেছে। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে শুনতে প্রসন্ন হয়ে ওঠে সুলভার বিষণ্ণ নয়নের দৃষ্টি। সুলভা বলে—তাই হোক পিতা।

তারপর দীর্ঘ দশটি বৎসর। ব্রহ্মচারিণী সুলভার জীবন তপস্যায় আর পরিব্রজ্যায় অতিবাহিত হয়েছে। তবু আজ বিদেহদেশের এই বনসরসীর জনহীন তটে বসে সুলভা তার অঞ্জলিপুটে গৃহীত সলিলের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখতে পায়, দশ বৎসর পূর্বের সেই

ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন ধারণ ক'রে আজও রয়েছে তার করতলের সেই ক্ষতরেখার চিহ্ন, ছিন্ন বরমাল্যের সেই চকিত দংশনের চিহ্ন।

অঞ্জলিপুটে গৃহীত সলিল বনসরসীর বক্ষে নিক্ষেপ ক'রে উঠে দাঁড়ায় সন্ন্যাসিনী সুলভা। কি ভয়ংকর এই চিহ্নের প্রাণ, যে চিহ্ন আজও তার মনের মন্ত্রমালা ছিন্ন ক'রে দেয়! সন্দেহ হয় সুলভার, এ কি সত্যই জ্ঞানার্থিকা পরিব্রাজিকার জীবন, অথবা নিজেরই মনের এক অভিমানের বেদনায় সুখের প্রাসাদ হতে পলাতকা এক বনচারিণীর জীবন?

আবার সলিল গ্রহণ করবার জন্য অঞ্জলি প্রসারিত ক'রে বনসরসীর সলিলের দিকে নমিত মস্তকে তাকাতে গিয়েই আর্তনাদ ক'রে ওঠে সুলভা—এ কি?

নিজেরই সুন্দর মুখের প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছে সুলভা। কবরীতে কিংশুকমঞ্জরীর গুচ্ছ। সন্ন্যাসিনীর তপঃক্লিষ্ট মুখের প্রতিবিম্ব নয়, যেন এক অভিসারিকার বিহ্বল মুখচ্ছবি বনসরসীর সলিলে ভাসছে। কবরীতে কিংশুকমঞ্জরীর গুচ্ছ পরিয়ে দিয়েছে কে জানে কোন্ ভুলের দেবতা। নিজের দেহের দিকে তাকাতে গিয়ে আরও বিস্মিত হয় সুলভা ; সন্ন্যাসিনীর কাষায় বসনের উপর বিন্দু বিন্দু পরাগধূলি চিত্রিত হয়ে রয়েছে।

বিষয়সংসর্গ হতে পলাতকা ও আত্মজ্ঞানসাধিকা এক ব্রহ্মচারিণীর জীবন নিয়ে আজ এই বিদ্রূপের খেলা খেলছে অদৃষ্টের কোন্ অভিশাপ? তাই কি তার জীবন আজও খুঁজে পেল না পরম প্রশান্তি? সত্যই কি, সন্ন্যাসিনী সুলভা আজও কাষায় বসনে আচ্ছাদিত একটি অভিমান মাত্র? জ্ঞানান্বেষিণীর এই দশ বৎসরের পরিব্রজ্যা কি শুধু এক কণ্টকক্ষতবিব্রত অভিসার?

বনসরসীর তট হতে উঠে, ধীরে ধীরে আবার কিংশুকতরুর ছায়ায় এসে দাঁড়ায় সুলভা। বনবিহগের কলকূজনে প্রভাতবায়ু মুখরিত হয়। মনে হয় সুলভার, এই কলকূজন যেন এক আর্তস্বর ; যেন এক শমীলতার অন্তরে সুগুপ্ত পাবকশিখার আভাস দেখতে পেয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে বনভূমি। বুঝতে পারে সুলভা দশ বৎসর পরে আজ নিজের অন্তরের দিকে তাকাতে গিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে সন্ন্যাসিনীর প্রাণ। পরিব্রাজিকা যেন নিজেরই অজ্ঞাত মনের ইঙ্গিতে অভিসারিকার মত মিথিলা নগরীর উপান্তে এই বনভূভাগের এক কিংশুকের ছায়াতলে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

এখানে কেন এসেছে সুলভা? মিথিলা নগরীর নিবিড়ধবল রাজপ্রাসাদের শিখরকেতনের দিকে নিস্পলক চক্ষু তুলে কেন তাকিয়ে থাকে সুলভা? কেন বার বার অকারণে ধ্যান ভেঙে গিয়েছে? বহু জনপদ, বহু আশ্রম, বহু ঋষিকুটীর, বহু তপোবন আর বহু তীর্থের ভূমি অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হয়েছে যে পরিব্রাজিকার জীবন, তার চরণ কেন বিদেহদেশের এক কিংশুকের ছায়াশ্রয়ে এসে ক্লান্তি বোধ করে?

দুই হাতে অশ্রুসিক্ত নয়ন আবৃত করে সুলভা। বুঝতে পারে সুলভা, মিথিলা নগরীর ঐ নিবিড়ধবল প্রাসাদের অন্তর পরীক্ষার জন্য এক অদ্ভুত তৃষ্ণা বক্ষে নিয়ে এই কিংশুকের ছায়ায় সে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ প্রাসাদে বাস করেন বিদেহাধিপতি ধর্মধ্বজ জনক, বেদজ্ঞ ক্ষত্রিয় জনক, মহাত্মা পঞ্চশিখের শিষ্য জনক। সাংখ্যজ্ঞান যোগ ও নিষ্কাম যজ্ঞ, এই ত্রিবিধ মোক্ষতত্ত্ব অবলম্বন ক'রে আর পরব্রহ্মে চিত্ত সমর্পণ ক'রে বিষয়রাগবিহীন নৃপতি জনক বিষয়াদির মধ্যেই বিশুদ্ধ বৈরাগ্য নিয়ে অবস্থান করছেন। তিনি আত্মজ্ঞানী, তিনি বিমুক্ত, তিনি নির্লিপ্ত। ভর্জিত বীজ যেমন সলিলসিক্ত হলেও অঙ্কুর উৎপাদন করে না, জনকও তেমনি বন্ধনের আয়তনস্বরূপ তাঁর এই ধর্মার্থকামসঙ্কুল রাজকীয়তার মধ্যেই মুক্তসঙ্গ অবস্থায় জীবনযাপন করছেন।

দেখতে ইচ্ছা করে, এই আত্মজ্ঞানী জনকের বৈরাগ্যভাবনায় অনুলিপ্ত দুটি চক্ষুর রূপ। জানতে ইচ্ছা করে, দিনরজনীর কোন মুহূর্তে কি মনের কোন চিন্তার ভুলে ছিন্ন হয়ে যায় না

জ্ঞানী জনকের মন্ত্রমালা? সত্যই কি লোষ্ট্রে ও কাঞ্চনে সমজ্ঞান লাভ করেছেন বিপুল রত্নের অধিপতি জনক? কেমন সেই বীতরাগ পুরুষের বক্ষ, যে বক্ষের নিঃশ্বাসে অনুরাগ নেই, ঘৃণাও নেই?

এতদিন বুঝতে পারেনি, আজ বুঝতে পারে সুলভা, আত্মজ্ঞানী জনককে দেখবার জন্য যে দুর্বার কৌতূহল তার তপঃক্লিষ্ট মনের আকাশে সুপ্রভতারকার মত গোপনে ফুটে উঠেছিল, সে কৌতূহল আজও ফুটে রয়েছে। নৃপতি জনকের জীবনকাহিনী সুলভার কল্পনায় এক অদ্ভুত মোহ সঞ্চারিত করেছে। সিক্ত চক্ষু কাষায় বসনের অঞ্চল দিয়ে মুছে নিয়ে মনে মনে আজ স্বীকার করে সুলভা, জনক নামে একটি জীবনের রূপ দেখবার জন্যই পরিব্রাজিকা সন্ন্যাসিনী আজ অভিসারিকার আগ্রহ নিয়ে বিদেহদেশের এই কিংশুকতরুর আশ্রয়ে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আর দ্বিধা করে না সুলভা। ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। পিছনে পড়ে থাকে কিংশুকের ছায়া। নিবিড়ধবল প্রাসাদের শিখরকেতনের দিকে লক্ষ্য রেখে বনপথ অতিক্রম করতে থাকে সুলভা।

যেন দূর কাননের নিভৃত হতে এক স্তবকিত কিংশুকের দ্যুতি মৃদু পবনকম্পনে সঞ্চালিতা হয়ে এই রাজসভাস্থলের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। কাষায় বসনে আবৃতদেহা এক সন্ন্যাসিনী, কিন্তু দেখে মনে হয়, যেন এক কান্তবিয়োগবিধুরা নিশিচক্রবাকীর স্বপ্ন পথ ভুল ক'রে মিথিলাধীশ জনকের এই সভাভবনের অভ্যন্তরে চলে এসেছে।

সন্ন্যাসিনী সুলভা সভাস্থলে প্রবেশ করতেই বিস্ময়াবিষ্ট নেত্রে তাকিয়ে থাকেন নৃপতি জনক। বুঝতে পারেন না, এই নারী সত্যই কি বিষয়রাগরহিতা এক সন্ন্যাসিনী, অথবা দয়িতবাহুবিচ্যুতা এক বিরহিণী প্রেমিকা? দীর্ঘকালের তপঃশ্রমের ক্লান্তি অঙ্কিত রয়েছে এই বরযৌবনা নারীর নয়নে, যেন কিরাতধাবিতা কুরঙ্গীর বেদনার্ত নয়ন। জটাকীর্ণ হয়েছে নারীর কুন্তলকলাপ ; কিন্তু এই পরিব্রাজিকার পথক্লেশে অভিভূত দুই চরণের নখমণি হতে যেন জ্যোৎস্না স্ফুরিত হয়। মনে হয়, এক আতপতাপিতা কেতকীর দেহ স্নিগ্ধ ছায়ার অনুসন্ধানে এই পৃথিবীর পথে ছুটে ছুটে ক্লান্ত হয়ে, দিশা হারিয়ে, আর ভুল ক'রে এই সভাস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে।

বিনয়নম্র বচনে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জনক। স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন ক'রে আগন্তুকার পরিচয় জানতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।—মনে হয় আপনি সকল ভোগসুখস্পৃহা বর্জন ক'রে আত্মজ্ঞানের সন্ধানে সন্ন্যাসিনী হয়েছেন। বলুন, বিদেহাধিপতি জনকের এই রাজসভাস্থলে আপনার শুভাগমনের হেতু কি?

সুলভা বলে—আপনাকে দেখবার ইচ্ছা।

বিব্রত বোধ করেন জনক—আপনার এই ইচ্ছারই বা হেতু কি?

সুলভা—আমার মনের একটি আশা সফল হবে, এই বিশ্বাস নিয়ে আপনাকে দেখতে এসেছি মিথিলেশ রাজর্ষি।

জনক বিস্মিত হয়ে বলেন—আমাকে দেখে আপনার মনের একটি আশা সফল হবে, আপনার মনে এ কেমন বিচিত্র ভাবনা সন্ন্যাসিনী!

সুলভা—আত্মজ্ঞানী জনকের, মোক্ষধর্মানুব্রত জনকের বৈরাগ্যভাবিত দুটি নয়নের দৃষ্টি দেখে শুধু বিস্মিত হয়ে আমি ফিরে যেতে চাই। আর কোন ইচ্ছা নিয়ে আপনার সমীপে আসেনি এই পরিব্রাজিকা সন্ন্যাসিনী।

নৃপতি জনক প্রশ্ন করেন—আপনার মনে কি কোন সংশয় আছে যে, মিথিলাপতি জনকের জীবন সত্যই বাসনাহীন বিমুক্তের জীবন নয়?

সুলভা—সন্দেহ করতে ইচ্ছা করে না বিদেহরাজ।

নৃপতি জনক বলেন—আপনার এই কথাই প্রমাণিত করছে যে, আপনার মনে সন্দেহ আছে।

ভাববিচলিত সাগ্রহ স্বরে অনুরোধ করে সুলভা।—সন্ন্যাসিনীর সেই সন্দেহ দূর ক'রে দিন নৃপতি জনক।

যেন ক্লান্ত জীবনের ভার নিবেদন করছে সুলভা। কি-এক গূঢ় বেদনায় বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে নৃপতি জনকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সন্ন্যাসিনী সুলভা। যেন জনকের ঐ বিশাল বক্ষঃপটের উপর লুটিয়ে পড়ে শান্ত হতে চায় সুলভার জটাজীর্ণ কুন্তলের বেদনা। কামনাবিহীন ঐ জ্ঞানীর বদনসন্নিধানে গিয়ে আত্মহারা হতে চায় সুলভার অধরসুষমা। দেখে মনে হয়, অকস্মাৎ এক প্রণয়মহোৎসবের উচ্ছ্বাস এসে শিহরিত করেছে সন্ন্যাসিনীর কাষায় বসনের অঞ্চল। দশ বৎসর পূর্বের এক পৌর্ণমাসী সন্ধ্যার একটি তৃষ্ণা যেন অদৃশ্য বরমাল্যের মত সুলভার হাতে চঞ্চল হয়ে দুলছে। স্বয়ংবরা নায়িকার মত প্রেমবিধুর নেত্রে জনকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সুলভা।

মুগ্ধ জনকের বিবশ দৃষ্টি হঠাৎ চমকে ওঠে। সন্ত্রস্তের মত বিচলিত কণ্ঠস্বর যেন প্রচ্ছন্ন এক ভর্ৎসনার ভাষা ধ্বনিত করেন জনক।—এ কি সন্ন্যাসিনী, এ কেমন আচরণ?

সুলভা—আপনি বিচলিত হলেন কেন নৃপতি জনক?

জনক—আমার সন্দেহ হয় সন্ন্যাসিনী, তুমি সন্ন্যাসিনী নও।

নৃপতি জনকের এই ভর্ৎসনাকে প্রশান্ত চিত্তে বরণ ক'রে নেবার জন্যই নীরবে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে সুলভা। নিজের হৃদয় সম্বন্ধে সুলভার মনে আর কোন সন্দেহ নেই। উপলব্ধি করেছে সুলভা, সন্ন্যাসিনী সুলভার এই জীবন এক সবাসনা অভিসারিকার জীবন মাত্র। সুলভার এই প্রাণ এক পরমার্থিকার প্রাণ নয়, জগতের এক প্রেমার্থিকা নারীর প্রাণ মাত্র। দীর্ঘ দশ বৎসর ধ'রে কাষায় বসনের বন্ধনের বেদনায় শুধু নীরবে আর্তনাদ করেছে এক ছিন্ন বরমাল্যের অভিমান। ভর্ৎসনা নয়, যেন এক অতি কঠোর সত্যেরই ঘোষণাকে অন্তরের সকল তৃষ্ণা নিয়ে স্নিগ্ধ আশীর্বাণীর মত গ্রহণ করছে সুলভা। নিজের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে সুলভা, ভালই হয়েছে। আরও ভাল লাগে, ঐ কান্তিমান সৌম্য ও সত্তম পুরুষের বিস্মিত দুটি সুন্দর চক্ষুর কাছে নিজেকে ধরা পড়িয়ে দিতে।

সুলভা বলে—আপনার সন্দেহ মিথ্যা নয় নৃপতি জনক। কিন্তু সে সন্দেহে বিচলিত হবে কেন বিমুক্ত মোক্ষধর্মানুব্রত আত্মজ্ঞানী জনকের মন?

নীরব হন জনক, তার পর শান্তভাবে সুলভার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন।—আপনি ঠিকই বলেছেন সন্ন্যাসিনী, কিন্তু আমার অনুরোধ, আপনি বিদায় গ্রহণ করুন।

সুলভার অধরে সুন্দর হাস্যরেখা শিহরিত হয়ে ফুটে ওঠে।—আমার সান্নিধ্যকে এত ভয় কেন নৃপতি জনক? লোষ্ট্রে ও কাঞ্চনে যার সমজ্ঞান, সে কেন এক প্রগল্ভা নারীর চোখের দৃষ্টিকে এত ভয় করবে? আপনার মনে এই বিকার কেন অবিকারহৃদয় আত্মজ্ঞানী?

কি কঠোর ভর্ৎসনা! সুলভার সুন্দর হাস্যবিভ্রমে শিহরিত এই প্রশ্নের আঘাতে যেন ক্ষণতরে আর্ত হয়ে যায় নৃপতি জনকের বক্ষের স্পন্দন। কে এই নারী, যে আজ বিপুল কৌতুকমদে মত্তা হয়ে নৃপতি জনকের বক্ষের নিভৃতে সঞ্চিত আত্মবিশ্বাসের তন্তুগুলি ছিন্ন-ভিন্ন করছে? কে এই নিরপত্রপা, যে আজ প্রেমাভিলাষিণী নায়িকার মত মদাঞ্চিত লাস্যে অধরদ্যুতি বিকশিত ক'রে জনকের অন্তরপটে মনোহারিণী মোহচ্ছবি মুদ্রিত ক'রে দিচ্ছে? এ কি এক মায়াবিনীর মায়াকেলি, অথবা, এক সাত্ত্বিকার যোগবলের লীলা? অনুভব করেন জনক, তাঁর দুই চক্ষুর দৃষ্টিকে মুগ্ধ করেছে, তাঁর কল্পনাকে অভিভূত করেছে, তাঁর বাসনাবর্জিত চিত্তের শূন্য গহনে কামনাময় পরাগধূলির ঝটিকা সঞ্চারিত করেছে এই নারী।

সুলভার নিকটে এগিয়ে এসে মৃদুস্বরে জনক বলেন—আমার একটি অনুরোধ রক্ষা কর

কাষায়পরিহিতা কামিনী।

সুলভা—বলুন নৃপতি জনক।

জনক—তোমার এই ভয়ংকর মায়াকৌতুক প্রত্যাহার ক'রে শান্তচিত্তে বিদায় গ্রহণ কর।

সুলভা—আপনি কি আমাকে শান্তচিত্তে বিদায় দিতে পারবেন নৃপতি জনক?

জনক বলেন—অবশ্যই পারব।

সুলভা—তবে বিদায় নিলাম নৃপতি।

চলে যেতে থাকে সুলভা। হ্যাঁ, বিশ্বাস করে সুলভা, শান্তচিত্তে সুলভাকে বিদায় দিতে পারবেন জনক, কারণ শান্তি আছে জনকের মনে। নিজেকে এখনও চিনতে পারেনি এই আত্মজ্ঞানী, এবং নিজেরই হৃদয়ের এক অন্ধকারের সান্ত্বনায় শান্ত হয়ে রয়েছেন।

জনক বলেন—তুমি বলে যাও, কোন দুঃখ রইল না তোমার মনে?

থমকে দাঁড়ায়, হেসে ফেলে সুলভা—আবার এই প্রশ্ন কেন মিথিলেশ? এ যে প্রেমিকোচিত হৃদয়ের কৌতূহল, এ যে প্রণয়ানুরাগী পুরুষের মুখের ভাষা!

নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন জনক, এবং সন্ন্যাসিনী সুলভা ধীরে ধীরে সভাস্থল হতে অগ্রসর হয়ে ভবনোপবনের বীথিকার নিকটে এসে দাঁড়ায়। নিঃশব্দে শুধু তাকিয়ে দেখতে থাকেন জনক। কাষায় বসনে আবৃতদেহা কে ঐ নারী, কিংশুকমঞ্জরীর দ্যুতি দিয়ে রচিত যার মুখরুচি? বিহ্বল নয়নভঙ্গীর মায়া বিচ্ছুরিত ক'রে চলে গেল নারী, কিন্তু জেনে গেল না, তাকে বিদায় দিতে গিয়ে মহাত্মা পঞ্চশিখের শিষ্য ও তত্ত্বজ্ঞ এই জনকের হৃৎপিণ্ডের নিভৃতে সত্যই অদ্ভুত এক বেদনা বেজে উঠেছে।

—শুনে যাও রহস্যময়ী! সভাস্থল হতে ছুটে বের হয়ে উপবনের বীথিকার দিকে তাকিয়ে আহ্বান করেন জনক। দাঁড়ায় সুলভা। যেন এই ব্যাকুল আহ্বানের অর্থ বুঝবার জন্য মুখ ফিরিয়ে তাকায়। নৃপতি জনক ব্যস্তভাবে নিকটে এসে দাঁড়িয়ে অপরাধীর মত কম্পিতকণ্ঠে বলেন—বিদায় নেবার আগে জেনে যাও নারী, তোমাকে আমি শান্তচিত্তে বিদায় দিতে পারছি না।

চকিতস্মিতা বিদ্যুল্লেখার মত খরহাস্যপ্রভায় দীপ্ত হয়ে ওঠে সুলভার নয়ন কপোল ও চিবুক। অভিসারিকার অন্তর যেন এতদিনে তার অন্বেষণার শেষ খুঁজে পেয়েছে। দশ বৎসর পূর্বের একটি দিবসের ছিন্ন পুষ্পমাল্যের দংশন যে-বেদনার চিহ্ন অঙ্কিত ক'রে দিয়েছিল কুমারী সুলভার মনে, নৃপতি জনকের বেদনাবিধুর কণ্ঠের এই একটি আবেদনের স্পর্শে সেই চিহ্ন মুছে গেল।

আশা সফল হয়েছে সুলভার। আর কোন দুঃখ নেই সুলভার মনে। নিজের এই দেহের দিকে তাকাতে আর ভয় করে না। এতদিনে পরিব্রাজিকার পথের বাধা দূর হয়ে গেল। আজ এইখানে এই জ্ঞানীর পায়ের কাছে তার অন্তরের তৃষ্ণার বোঝা নামিয়ে দিয়ে মুক্ত হতে পারবে সুলভা। এইবার একেবারে রিক্ত হয়ে সংসারবাসনার সীমা ছাড়িয়ে চিরকালের মত চলে যেতে পারবে সুলভা।

প্রশ্ন করে জনক—তোমার পরিচয় জানতে চাই রূপোত্তমা।

সুলভা—আমি রাজর্ষি প্রধানের কন্যা কুমারী সুলভা।

জনকের কণ্ঠস্বরে দুঃসহ বিস্ময় চমকে ওঠে।—তুমি!

সুলভা—হ্যাঁ জনক।

ব্যথার্তস্বরে প্রশ্ন করেন জনক—ক্ষত্রিয়াণী সুলভা, তুমি বৃথা কেন সন্ন্যাসিনীর জীবন গ্রহণ করলে?

সুলভা—সন্ন্যাসিনীর জীবন আজও গ্রহণ করতে পারিনি, কিন্তু পারব, যদি আপনি আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করেন ক্ষত্রিয়োত্তম জনক।

অপরাহ্ণের সূর্য ধীরে ধীরে অস্তাচলে অদৃশ্য হয়ে যায়। উপবনের লতাপ্রতানের উপর স্নিগ্ধ রশ্মি সম্পাত করে পৌর্ণমাসী সন্ধ্যার চন্দ্রমা। সুলভার মুখের দিকে অপলক চক্ষুর বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আহ্বান করেন জনক।--সুলভা! বল, কি তোমার অনুরোধ?

সুলভা--আপনার বক্ষের সান্নিধ্য চাই।

চমকে ওঠেন জনক--আমার বক্ষের সান্নিধ্য?

সুলভা--হ্যাঁ নৃপতি জনক। আপনার বক্ষের স্পর্শ নয়, শুধু সান্নিধ্য।

জনক--এ কি সন্ন্যাসিনীর জীবনের অভিলাষ?

সুলভা--প্রেমিকার জীবনের অভিলাষ।

জনক--সে অভিলাষ আমার কাছে নিবেদন ক'রে কি লাভ হবে তোমার?

অকস্মাৎ যেন কঠোর হয়ে ওঠে সুলভার কণ্ঠস্বর--শুধু আমার লাভ নয় মিথিলেশ, তোমারও লাভ হবে।

চকিত আঘাতে সন্ত্রস্ত হয়ে এক পদ পিছনে সরে গিয়ে কঠোরভাষিণী সুলভার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন জনক। দেখতে পান, সুলভার দুই নয়ন কৌমুদীধারার মত সুতরল জ্যোতিঃসুধা উৎসারিত ক'রে হাসছে।

সুলভা বলে--তোমারও লাভ হবে আত্মজ্ঞানের অভিমানে আবৃত হে পুরুষসুন্দর। বুঝতে পারবে, তোমার ঐ মোক্ষব্রতকঠিন অন্তরের কোনখানে বাসনার অবলেশ আছে কি না-আছে। জানতে পারবে, আত্মপর প্রভেদবুদ্ধি যদি কোন মোহ তোমার জীবনে লুকিয়ে রেখে থাকে।

উত্তর দেন না নৃপতি জনক। এই কুহকিনী নারীর ধিক্কার স্তব্ধ ক'রে দেবার মত যুক্তি আর শক্তি হারিয়ে মূক হয়ে গিয়েছেন জনক।

অকস্মাৎ উচ্ছল অশ্রুর বাষ্পে সিক্ত হয়ে যায় সুলভার নয়নজ্যোৎস্না। সুলভা বলে--শূন্য মন্দির দেখতে পেলে ভিক্ষুক যেমন ভিতরে প্রবেশ ক'রে নিশিযাপন করে, আমিও তেমনি আপনার ঐ বক্ষোনিলয়ের আশ্রয়ে এই পৌর্ণমাসী রজনী যাপন করব নৃপতি জনক।

এগিয়ে আসে সুলভা। জনকের বক্ষঃসন্নিধানে এসে প্রভাপুলকিত নয়নে অদ্ভুত এক তৃষ্ণা উদ্ভাসিত ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে সুলভা, যেন এক সৌম্য মেঘের বক্ষের কাছে সহচরী বিদ্যুল্লেখা এসে দাঁড়িয়েছে।

পৌর্ণমাসী রজনীর আকাশে হিমকর ভাসে। একে একে ক্ষয় হতে থাকে সময়ের পল অনুপল ও বিপল। সুলভার মুখের দিকে নিমেষবিহীন দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন জনক। সন্ন্যাসিনী সুলভা নয়, মোক্ষব্রত জনক নয়, যেন প্রেমিক ও প্রেমিকা এক চন্দ্রিকাস্নাত লতা-প্রতানের নিভৃতে শুভমিলন-বাসর যাপন করছে।

নেই চন্দনের অনুলেপন, নেই কুঙ্কুমের চিত্রক, তবু নববধূর মুখের মতই সুস্মিত হয়ে ফুটে উঠেছে সন্ন্যাসিনী সুলভার তপঃক্লিষ্ট মুখশোভা। সহসা, যেন বিপুল পিপাসাভারে শিহরিত হয়ে নৃপতি জনকের অধর চঞ্চল হয়ে ওঠে।

সুলভা বলে--না নৃপতি জনক, ভুল করবেন না।

নিরুত্তর জনক ব্যথিতভাবে তাকিয়ে থাকেন। সমব্যথিনীর মত নম্র কণ্ঠস্বরে সুলভা বলে --আমার এই দেহে কোন তৃষ্ণা নেই নৃপতি জনক। তৃষ্ণা ছিল মনে, সে তৃষ্ণা আজ মিটে গেল আপনার এই বক্ষের সন্নিধানে এসে, আর আপনারই চক্ষুর প্রেমবিহ্বল দৃষ্টি বরণ ক'রে।

উপবনতরুর পল্লবঘন অন্তরাল হতে কোকিলনাদ উত্থিত হয়ে নিশীথ বায়ুর তন্দ্রা ভেঙে দেয়। নৃপতি জনকের দুই বাহু সহসা যেন অসহ ঔৎসুক্যে অস্থির হয়ে সুলভার কণ্ঠে আলিঙ্গন দানের জন্য উদ্যত হয়।

পিছিয়ে সরে যায় সুলভা--ভুল করবেন না জনক।

জনকের বক্ষের নিঃশ্বাস যেন ক্ষোভিত স্বরে আর্তনাদ করে--সত্যই তোমাকে চিনতে

পারলাম না মায়াকুতুকিনী সুকঠোরা নারী।

জীবনসহচরীর মত সৌহার্দ্য-ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে শান্তস্বরে প্রশ্ন করে সুলভা—কিন্তু নিজেকে এখনও কি চিনতে পারবেন না নৃপতি জনক?

জনকের দুই বাহুর চাঞ্চল্য সহসা সন্ত্রাসিত হয়। সুলভার প্রশ্নের ধ্বনি যেন এক বজ্রের নির্ঘোষ। স্তব্ধ হয়ে নীরবে শুধু তাকিয়ে থাকেন জনক।

হ্যাঁ, এতক্ষণে জ্ঞানী জনকের ভুল ভেঙেছে। এতক্ষণে নিজেরই দুই চক্ষুর চকিতাহত দৃষ্টি দিয়ে আজ নিজেকে দেখতে পেয়েছেন জনক, শুধু মোক্ষব্রতের এক ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে মিথ্যা সন্তোষের জীবন যাপন করছেন জনক। আত্মজ্ঞানের অহংকারকেই এতদিন আত্মজ্ঞান বলে যে মোহ পোষণ করেছিলেন জনক, সেই মোহ চূর্ণ ক'রে দিল সুলভা, নৃপতি জনকের কল্যাণকারিণী বান্ধবী সুলভা।

সুলভা বলে—ঐ দেখুন নৃপতি জনক, পৌর্ণমাসী রজনীর চন্দ্র অস্তাচলে মিলিয়ে গিয়েছে।

চন্দ্রাস্তবিধুর দিগ্‌বলয়ের দিকে বিষাদালস দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন জনক। কিন্তু সুলভা তার সুন্দর অধরে যেন স্নিগ্ধ এক সান্ত্বনা সুস্মিত ক'রে বলে—এই বিষাদ বর্জন করুন জনক। ভুল ভেঙে গেল আপনার, ভুল ভেঙে গিয়েছে আমার। দু'জনেরই জীবনের পরম অন্বেষণার পথে শুষ্ক ধূলির আড়ালে একটি মায়াভীরু বাসনার কাঁটা লুকিয়ে ছিল, সেই কাঁটা আজ ভেঙে গেল নৃপতি জনক।

ধীরে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে জনকের দুই চক্ষু। সুস্মিত ও শান্ত দৃষ্টি নিয়ে সুলভার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন জনক। এবং জনকের সেই সুস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে যেন দিব্য এক প্রসন্নতায় উদ্ভাসিত হয় সুলভারও আননশোভা। হ্যাঁ, এক পরম অন্বেষণার সাধনায় দুটি জীবনের ভুল-ভাঙা মূর্তি এতক্ষণে সত্যই বান্ধব আর বান্ধবীর মত দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

সুলভা—এইবার আমাকে শান্তচিত্তে বিদায় দিন জনক।

জনক বলেন—বিদায় দিলাম বান্ধবী।

চলে গেল সুলভা। দেখতে থাকেন জনক, পৌর্ণমাসী রজনীর শেষ যামের চন্দ্রের মত ধীরে ধীরে ছায়াময় কাননের প্রান্তরেখার অন্তরালে মিলিয়ে যাচ্ছে সন্ন্যাসিনী সুলভা।

কিংবদন্তীর দেশে

মহীপালের দীঘি

আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে 'ধান ভানতে মহীপালের গীত' গেয়েছিল প্রথম এই বঙ্গভূমির পল্লীর নারী। আজও সেই গীতের অতি ক্ষীণ অবশেষটুকু বেঁচে আছে। যেন হাজার বছর আগের এক ঘটনার স্মৃতি আজও বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার কৃষকবধূর কণ্ঠে কিছুক্ষণের জন্য মুখর হয়ে ওঠে। স্মরণ করিয়ে দেয়, গৌড়ের বৌদ্ধ অধিপতি সেই মহীপালের কথা, যে মহীপালকে বাণগড়ের তাম্রশাসন 'অবনীপাল' আখ্যা দান করেছে। সারনাথের শিলালিপি বলে, এই মহীপাল অগ্নিদগ্ধ নালন্দা মহাবিহারের সংস্কার সাধন করেছিলেন। সারনাথের 'অষ্টমহাস্থান ও শৈলগন্ধকুটি'কে জীর্ণাবস্থা হতে উদ্ধার করেছিলেন এবং এক বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতিরও আহ্বান করেছিলেন সেই ধর্মনিষ্ঠ মহীপাল। ভারতের সকল সংঘারাম হতে এবং ভারতের বাইরের বহু দেশের সংঘারাম হতে শ্রমণেরা উপস্থিত হয়েছিলেন সেই সম্মেলনে। সেই বোধ হয় ভারতের শেষ বৌদ্ধ সঙ্গীতির অনুষ্ঠান। ভারতের উত্তরাপথে তখন সুলতান মামুদের তরবারির আঘাত এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সোমনাথ মথুরা আর গোপাদ্রি পুড়ছে বৈদেশিক মশালের আগুনে।

মৃত্যু হয়েছে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের এবং রাজ্যাধিকার লাভ করেছেন তাঁর পুত্র মহীপাল। কিন্তু সেই রাজ্যাধিকারে কোন গৌরব ছিল না। মলিন হয়ে গিয়েছে পাল-সিংহাসনের সম্মান। দক্ষিণের চোল আর কলচুরি রাজশক্তির শত্রুতায় ও আক্রমণে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে বিগ্রহপালের রাজ্য। পালশাসিত সমতটের অনেক অংশ গ্রাস ক'রে নিয়েছে দেব আর চন্দ্র ভূপতির দল। পরাক্রান্ত কাম্বোজ গ্রাস ক'রে ফেলেছে বরেন্দ্রভূমির উত্তরভাগ। আর, মহীপাল শুধু বরেন্দ্রভূমির দক্ষিণভাগে এক ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিকার নিয়ে অতৃপ্তচিত্তে স্বপ্ন দেখছিলেন।

হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন নয়, পালের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার আকাঙক্ষা নয়, রাজেন্দ্র চোল ও গাঙ্গেয়দেবের ঔদ্ধত্য চূর্ণ করার প্রতিজ্ঞা নয়, সুন্দরী নারীর রূপ দিয়ে গড়া প্রমোদময় এক জীবনের রাজ্য লাভের স্বপ্ন। তাঁর দুই চক্ষু শুধু অন্বেষণ ক'রে বেড়ায় যৌবনান্বিতা নারীর বিম্বাধর, নিবিড় কুন্তল আর আয়ত নয়ন। তরবারি স্পর্শ করতেও ভুলে গিয়েছেন মহীপাল। পাল গৌরবের প্রদীপ নিভে গিয়েছে, কোন খেদ নেই তার জন্য। কিন্তু এ-হেন মহীপালই একটি ঘটনায় হঠাৎ মোহমুক্ত হয়ে একদিন এই বিলাসস্বপ্নের জাল হতে নিজেকে ছিন্ন ক'রে এবং তরবারি হাতে নিয়ে ছুটে চলে গিয়েছিলেন। সেদিনও যদি তরবারি স্পর্শ করতে ভুলে যেতেন মহীপাল, তবে বাণগড়ের কোন তাম্রশাসনে আর সারনাথের কোন শিলালিপিতে পালগৌরবের মৃত্যুর কথাই বোধ হয় ঘোষিত হয়ে থাকতো।

দিনাজপুর হতে দশ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে আজ যেখানে মহীপুর নামে একটি গ্রাম দেখা যায়, সেই গ্রামেরই মাটিতে আজও রেণু রেণু হয়ে মিশে আছে মহীপালের প্রাসাদ। নিকটেই বাণগড়ের ধ্বংসস্তূপ। লোকে বলে, এই বাণগড়েই ছিল অসুররাজ বাণের রাজধানী, কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধের প্রেমিকা ঊষার পিতা সেই পৌরাণিক বাণ। কিন্তু পুনর্ভবার তীরে নিস্তব্ধ বাণগড়ের মাটিতে শত শতাব্দীর চূর্ণ কংকালের মত আজও ছড়িয়ে রয়েছে চৈত্যগৃহ মন্দির ও হর্ম্যায়তনের লুপ্তাবশেষ। এক প্রাচীন জনপদের বিপণি-বীথিকার চিহ্ন ধারণ ক'রে আজও পড়ে আছে বিক্ষিপ্ত ইষ্টক ও প্রস্তরের খণ্ড। এই বিপণি-বীথিকারই নিকটে এক ক্ষুদ্র শ্রেষ্ঠিভবনের বাতায়নের দিকে প্রলুব্ধ দৃষ্টি তুলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে একদিন প্রাসাদে ফিরে গিয়েছিলেন রাজা মহীপাল।

সেই শ্রেষ্ঠিভবনের বাতায়নপথে দাঁড়িয়েছিল শ্রেষ্ঠীর মেয়ে লীলা। যুবক মহীপালের সেই প্রলুব্ধ দৃষ্টির সম্মুখে অবিচলিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকে লীলা। শুধু বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকে এবং মনে পড়তেই আরও বিস্মিত হয়, উত্তরাপথচক্রবর্তী মহাবলী ধর্মপালের বংশের সন্তান, পালরাজমুকুটের অধিকারী ঐ যুবক আজ এই ক্ষুদ্র বণিকভবনের বাতায়নের দিকে এক নারীর মুখের দিকে তৃষ্ণাতুর চোখে তাকিয়ে আছে। ঐ চোখে কি আর কোন স্বপ্ন নেই? রাজ্যগ্রাসী শত্রুর উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য কোন মুহূর্তে কি চঞ্চল হয়ে ওঠে না ঐ বুকের নিঃশ্বাস? নিজেরই মনের এই প্রশ্নে ব্যথিত হয়ে ওঠে বণিককন্যা লীলার দুই কজ্জলিত আয়ত চক্ষু।

প্রতিদিনই প্রভাতে ও সন্ধ্যায় এই পথে একবার ভ্রমণ ক'রে যান মহীপাল। সুসজ্জিত হস্তীর পৃষ্ঠে স্বর্ণখচিত আসনের উপরে এবং বর্ণাঢ্য ছত্রের ছায়ায় উপবিষ্ট রাজা মহীপালের মুখের দিকে প্রতিদিনই এইভাবে তাকিয়ে থাকে লীলা। সেই দৃষ্টিতে বিস্ময় থাকে, বেদনাও থাকে, এবং বোধ হয় নীরব একটি ধিক্কারও মিশে থাকে। তবু দেখতে ভালো লাগে রাজা মহীপালের প্রতিদিনের এই লুব্ধ ও মুগ্ধ মূর্তিকে। এবং একদিন বুঝতে পারে লীলা, মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে তার নিজেরই মন।

ভয় পায় লীলা। কল্পনা করে, নারীরূপবিলাসী ঐ রাজার নিকট হতে যদি একদিন কোন ভয়ানক আহ্বান চলে আসে, তবে কি হবে উপায়? পালিয়ে যাবার পথ খোলা আছে, কিন্তু পালিয়ে যাবার ইচ্ছা হবে কি?

বুঝতে পারে লীলা, নারীপ্রেমের মূল্য বোঝে না ঐ বিলাসের রাজা মহীপাল। ক্ষুদ্র বণিকভবনের এক কুমারীর কণ্ঠে শুভ পরিণয়ের পুষ্পমাল্য কোনদিন পরিয়ে দেবার জন্য প্রলুব্ধ হবে না ঐ রাজকীয় গর্বের দুটি বাহু। তবে কি হৃদয়ের এই দুর্বলতার ভুলে রাজা মহীপাল নামে ঐ পুরুষের বিলাস-সহচরী হয়ে থাকবার সম্মানহীন জীবন স্বীকার ক'রে নিতে হবে?

কক্ষের নিভৃতে দীপ নিভিয়ে দিয়ে বসে থাকে লীলা। না, এমন অসম্মানে জীবন কলংকিত করতে পারবে না লীলা। এমন পরিণাম কল্পনা করতেও বুক কেঁপে ওঠে।

প্রদীপ হাতে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করেন লীলার মাতা এবং সহাস্য মুখে বলেন—তোমার বিবাহের দিন স্থির করা হয়েছে লীলা।

—আমার বিবাহ?

—হ্যাঁ।

—কোথায়, কার সঙ্গে?

—বর্ধমানপুরীর শ্রেষ্ঠী বিজয়মাধবের সঙ্গে।

লীলার মাতা সুসংবাদ জানিয়ে চলে যান, কিন্তু লীলার মনে হয়, যেন তার জীবন চূর্ণ করার জন্য একটি বজ্রাঘাতের আয়োজন করা হয়েছে। সেই দুঃসংবাদ শুনিয়ে গেলেন মাতা। ছুটে যেতে ইচ্ছা করে যার কাছে, তার কাছে এই জীবনে আর যাওয়া হবে না। কিন্তু বর্ধমানপুরের শ্রেষ্ঠী বিজয়মাধবের কাছে চলে যাওয়া যে তার নিজের হৃদয়ের কাছেই বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধ।

কক্ষের অন্ধকারে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকে লীলা। মনে হয়, যেন নিস্তব্ধ মৃত্যুর মত একটা নিষ্প্রাণ অসহায়তার মধ্যে সে বসে আছে। রাত্রি গভীর হয়। কিন্তু এই রাত্রিও যে ফুরিয়ে গিয়ে আবার ভোর হবে, আর, বাতায়নের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই আবার দেখা যাবে, শোভাযাত্রা ক'রে পথে বের হয়েছেন রাজা মহীপাল। এগিয়ে আসবে শোভাযাত্রা, আর রাজা মহীপালের দুই চক্ষুর দৃষ্টি লীলার হৃদয় বিচলিত করার জন্য আবার তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠবে। থাক, রঙ্গমঞ্চের কপট হাসি ও অশ্রু দিয়ে রচিত জীবনের মত এমন জীবনের কোন প্রয়োজন নেই। আর কোন পরিণামের জন্য অপেক্ষা না ক'রে এখনই শূন্য হয়ে যাওয়া ভালো।

যেন শেষ রাত্রির তারকাগুলিকে শেষবারের মত দেখে নেবার জন্য বাতায়নের নিকটে এসে একবার দাঁড়ায় লীলা। কিন্তু চমকে ওঠে। দেখতে পায়, পুবের আকাশে ভোরের আভাস রঙীন হয়ে উঠেছে। আর দ্বিধা না ক'রে সেই মুহূর্তে ঘর ছেড়ে পথের উপর এসে দাঁড়ায় লীলা। সুপ্তিমগ্ন জনপদের বিপণি-বীথিকা পার হয়ে শিশিরসিক্ত এক প্রান্তরের নিকটে এসে কিছুক্ষণের জন্য থামে। তারপর দূরের এক অস্পষ্ট অরণ্যরেখার দিকে লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকে।

রোদ ওঠে। কুয়াশা সরে গিয়ে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে চারদিকের রূপ। কিন্তু পথ যেন আর শেষ হয় না। দূরের অরণ্যরেখা যেন এখনো দিগ্বলয়ের কোলে ছবির মত আঁকা রয়েছে। ক্লান্ত হয়, তবু থামে না লীলা। ঐ অরণ্যের ভিতরে প্রবেশ ক'রে লতাচ্ছায়াশীতল এক তড়াগের গভীর জলের অন্তরালে চিরকালের মত এই জীবন অদৃশ্য ক'রে দিতে হবে, লোকচক্ষুর নাগাল হতে অনেক দূরে বন্য ফুল যেমন নীরবে লতা হতে সেই জলে ঝরে পড়ে আর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

সহসা প্রান্তরের নিস্তব্ধ বক্ষ যেন কতগুলি শব্দের আঘাতে উৎপীড়িত হয়। ধূলি উৎক্ষিপ্ত ক'রে ক্ষুদ্র একটি ঝড় যেন ছুটে আসছে। দেখতে পায় লীলা, ছুটে আসছেন একজন অশ্বারোহী।

চমকে আর্তনাদ ক'রে ওঠে লীলা। অশ্বারোহী কোন সৈনিক নয়, ছুটে এসে লীলার সম্মুখে দাঁড়িয়েছেন সেই দুই প্রলুব্ধ চোখের দৃষ্টি নিয়ে মহীপাল। ক্ষুদ্র এক শ্রেষ্ঠীর কন্যার সম্মুখে স্বয়ং রাজ্যাধিপতি মহীপাল।

মহীপাল ডাকেন—এসো।

লীলা—কোথায়?

—আমার সঙ্গে।

—কেন?

—মহীপালের চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে ঐ রূপ নিয়ে কোন প্রণয়ীর কাছে পালিয়ে যাবার পথ পাবে না নারী।

—আপনি ভুল বুঝেছেন রাজা।

—তবে ভুল ভেঙে দাও। এসো আমার সঙ্গে, আর আমার প্রমোদগৃহের আনন্দের নায়িকা হও।

লীলা বলে—না। লীলার কণ্ঠস্বর আর গ্রীবাভঙ্গী অদ্ভুত এক ঔদ্ধত্যে হঠাৎ কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু রাজা মহীপাল উচ্চহাস্যে সেই কুপিতা নারীর প্রতিবাদ তুচ্ছ ক'রে অপহারকের মত লোলুপ হস্ত প্রসারিত ক'রে লীলার হাত ধরেন। বন্দিনী পুষ্পলতিকার মত লীলার অভিমানভীরু সুন্দর দেহ বক্ষোলগ্ন ক'রে অশ্বে আরোহণ করেন মহীপাল এবং নির্জন প্রান্তরপথ দ্রুতবেগে অতিক্রম ক'রে চলে যান।

প্রমোদগৃহের নিভৃতে বন্দিনী পুষ্পলতার মত সুন্দরী লীলার সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করেন রাজা মহীপাল—আমি তোমার চোখের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছি, এই সৌভাগ্য স্বীকার ক'রে নাও নারী।

উত্তর দেয় লীলা—যদি সৌভাগ্য ব'লে বুঝতাম, তবে অবশ্যই স্বীকার করতাম।

ভ্রূকুটি করেন রাজা মহীপাল—বুঝতে পারছো না কেন?

লীলা—রাজগৌরব হারিয়েছেন যে রাজা, তাঁর সান্নিধ্য লাভ ক'রে আমার মত দীনাহীনাও গর্ব অনুভব করতে পারে না।

মহীপাল চমকে ওঠেন। লুব্ধ দুই চক্ষুর স্বপ্ন যেন হঠাৎ এক রূঢ় আঘাতে চমকে উঠেছে।

লীলা বলে—রাজেন্দ্র চোল আর গাঙ্গেয়দেবের তরবারিকে ভয় ক'রে মুখ লুকিয়ে রয়েছে

যে, দেখতে সুন্দর হ'লেও সে-মুখের হাসিকে সুন্দর মনে হয় না রাজা মহীপাল।

রাজা মহীপালের মুখের হাসি মিলিয়ে যায় এবং দুই ওষ্ঠ যেন দুঃসহ এক বেদনার স্পর্শে কাঁপতে থাকে।

লীলা বলে—হৃতরাজ্য উদ্ধার করার জন্য কোন প্রতিজ্ঞায় আর আকাঙ্ক্ষায় প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে না যে-রাজার চক্ষু, সেই চক্ষুর কোন প্রলুব্ধ চাহনি দেখে মন তৃপ্ত হয় না রাজা মহীপাল।

দুই চক্ষু বন্ধ ক'রে নীরবে বিষণ্ণ কাষ্ঠমূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকেন রাজা মহীপাল।

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে লীলার চক্ষু। ধীরে ধীরে এবং নিঃশব্দে কক্ষান্তরে গিয়ে একটি তরবারি হাতে নিয়ে ফিরে আসে লীলা এবং সেই তরবারিকেই উপহারের মত দুই হাতে তুলে নিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে।

রাজা মহীপাল চোখ খুলতেই নিবিড় স্বরে আবেদন জানায় লীলা—এই নিন রাজা মহীপাল, আপনারই রাজ্যের এক দীনা নারীর উপহার।

সেই আবেদন যেন এক হঠাৎ আলোর ঝলক, চমকে উঠেছে রাজা মহীপালের চোখের অন্ধকার। সাগ্রহে তরবারি হাতে তুলে নিলেন রাজা মহীপাল। তারপর আর মুহূর্ত মাত্রও বিলম্ব না ক'রে কক্ষ ছেড়ে চলে গেলেন।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে চোখের জল মোছে বণিককন্যা লীলা। তারপরেই ছুটে বের হয়ে একেবারে পথের উপর এসে দাঁড়ায়। দেখতে পায় লীলা, চলে যাচ্ছেন রাজা মহীপাল, যেন এই বিলাসের স্বপ্নপুরী হতে মুক্ত হয়ে এক বন্দী তার মুক্তির আনন্দে যোদ্ধার মূর্তি ধ'রে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাচ্ছে।

অনেক দূরে চলে গিয়েছেন মহীপাল। প্রাসাদের দুয়ার পিছনে ফেলে রেখে লীলাও ফিরে আসে জনপদের বিপণি-বীথিকার নিকটে। ভবনে প্রবেশ করতেই উদ্বিগ্ন পিতা ও মাতা সন্দিগ্ধচিত্তে প্রশ্ন করেন—কোথায় গিয়েছিলে দুরভিলাষিণী মেয়ে?

লীলা বলে—গিয়েছিলাম স্বামিভবনে।

ক্রোধে চিৎকার করেন পিতা—কে তোমার স্বামী?

লীলা বলে—রাজা মহীপাল।

মাতা ভর্ৎসনা করেন—তুমি মিথ্যাবাদিনী, তুমি চরিত্রহীনা।

বুঝতে পারে লীলা, চিরকাল এই অপবাদের বোঝা বহন ক'রেই চলবে তার জীবন। রাজা মহীপালের ভবন কোনদিনই তার স্বামিভবন হয়ে উঠবে না। হয়তো জয়ী হবেন, হয়তো হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার ক'রে আবার গৌড়েশ্বর হবেন রাজা মহীপাল, কিন্তু এই দীনা বণিককন্যাকে তাঁর হৃদয়ের কাছে কোনদিন আহ্বান করতে পারবেন না। রণোল্লাসের মত্ততার মধ্যে কোথায় হারিয়ে যাবে আজকের স্মৃতি! মনেও পড়বে না রাজা মহীপালের, তাঁরই অনুরাগিণী এক জনপদবাসিনী নারী হৃদয়ের সকল লোভ সংবরণ ক'রে, আর নিজেরই উপর নিষ্ঠুর হয়ে একদিন গৌরবের পথে পাঠিয়ে দিয়েছিল তাঁকে, আর নিজে ফিরে গিয়েছিল শূন্য হয়ে।

হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিল রাজা মহীপাল। বাণগড়ের তাম্রশাসন বলে, 'অনধিকৃত-বিলুপ্ত' রাজ্য ও 'জনকভু' বরেন্দ্রভূমি অধিকার করে রাজা মহীপাল আবার পালরাজগৌরবের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু ভুলতে পারেননি সেই নারীকে, যে নারীর ধিক্কারবাণী একদিন তাঁর মোহ ভেঙে দিয়ে তরবারি হাতে নেবার প্রেরণা দান করেছিলেন।

কিন্তু কোথায় সে নারী? আজও কি সেই নারী বিলাসী মহীপালের প্রলুব্ধ চোখের দৃষ্টিকে ঘৃণা ক'রে দূরে সরে থাকতে চায়?

জনপদের বিপণি-বীথিকার নিকট দিয়ে অনেকবার শোভাযাত্রা ক'রে চলে গিয়েছেন রাজা

মহীপাল। কিন্তু বেদনার্ত চক্ষে দেখেছেন, সেই ক্ষুদ্র শ্রেষ্ঠিভবনের বাতায়ন রুদ্ধ। যেন বিগত কালের এক রাজকীয় প্রগল্‌ভতা সহ্য করতে না পেরে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে এক নারীর হৃদয়। অপমানের রূঢ় স্পর্শের নাগাল হতে চিরকালের মত দূরে সরে থাকতে চায় সেই মানিনী।

তাই ভালো। শুধু সেই একটি দিনের স্মৃতিকেই স্মরণীয় ক'রে রাখবেন রাজা মহীপাল। বিশ্বাস নিয়ে আর শ্রদ্ধা নিয়ে সেই নারী আজ আর মহীপালের প্রেমাকুল হৃদয়ের কাছে এসে দাঁড়াতে চায় না। কিন্তু সেই নারীকেই জীবনের স্বপ্ন ক'রে রাখবেন রাজা মহীপাল।

যেখানে, প্রান্তরের যে-স্থানে পুষ্পলতিকার মত সুন্দর সেই নারীকে বক্ষোলগ্ন করেছিলেন, সেই স্থানে বিরাট এক দীর্ঘিকা খনন করলেন রাজা মহীপাল।

কে জানে কি বুঝেছিল শ্রেষ্ঠিদুহিতা লীলা, কিন্তু লীলাও যেন তার জীবনের প্রথম প্রেম ও প্রিয়পরশের অনুভব জীবনে অক্ষয় ক'রে রাখবার জন্য সেই দীঘির জলে গিয়ে স্নান ক'রে আসতো। সেই সেদিনের মতই প্রতিদিন শেষ রাতের আকাশে যখন শেষ তারকা নিভে গিয়ে ভোরের আভাস রঙীন হয়ে উঠতো, তখন ঘর থেকে বের হয়ে আর জনপদের বিপণি-বীথিকা পার হয়ে, প্রান্তরক্রোড়ের সেই দীর্ঘিকার নিকটে এসে দাঁড়াতো লীলা। আর, স্নান সমাপন ক'রে ঘরে ফিরে যেতো।

কিন্তু একদিন আর ঘরে ফিরে যেতে পারেনি লীলা এবং সেই দিনই বুঝতে পেরেছিল বণিক ও বণিকপত্নী, তাদের কন্যা মিথ্যাবাদিনী নয়।

সেদিন দীঘির জলে স্নান সমাপন ক'রে তীরে উঠবার জন্য অগ্রসর হতেই দেখতে পায় লীলা, তারই দিকে তাকিয়ে আছে এক প্রেমিকের মুগ্ধ অথচ স্নিগ্ধ দুটি চক্ষু।

হাত এগিয়ে দিয়ে রাজা মহীপাল বলেন—এসো।

লীলা প্রশ্ন করে—কোথায়?

মহীপাল বলেন—তোমার স্বামিভবনে।

স্নানসিক্ত পুষ্পলতিকার মত সেই দেহ সেই আহ্বানের আনন্দ সহ্য করতে গিয়ে ব্রীড়াভঙ্গে আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। রাজা মহীপালের হাতে হাত রাখে লীলা।

আজও আছে সেই দীঘি। শুধু মহীপালের গীতে নয়, আধুনিক দিনাজপুরের দশ ক্রোশ দক্ষিণে 'মহীপালের দীঘি'র জলেও হাজার বছর আগের এক প্রেমের স্মৃতি আজও কলনাদ জাগিয়ে তোলে।

রাণী রায়বাঘিনী

গৌতম বুদ্ধের পিতৃব্য অমৃতোদনের পুত্র পাণ্ডুশাক্য দেশভ্রমণে বের হয়ে একদিন দামোদর-তটের যেখানে শ্রান্ত হয়ে বসেছিলেন আর শান্ত দামোদরের শীতল জলে স্নান ক'রে শ্রান্তি অপনোদন করেছিলেন সেখানেই কালক্রমে গড়ে উঠেছিল সুন্দর ও সমৃদ্ধ এক জনপদ। সে জনপদের নাম ভূরিশ্রেষ্ঠ। ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীদের বসতি ভূরিশ্রেষ্ঠ।

দশম শতকের কবি কৃষ্ণ মিশ্রও ভূরিশ্রেষ্ঠের সমৃদ্ধি দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। গৌড় বিজয়ী চন্দেলরাজ যশোবর্মার সভাকবি কৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে গৌড় রাষ্ট্রের সুখ্যাতি আছে। গৌড়ং রাষ্ট্রমুত্তমং, কিন্তু নিরুপমা রাঢ়াপুরী ভূরিশ্রেষ্ঠিক হলো নামধামপরমং। এই ভূরিশ্রেষ্ঠেরই রাজা পাণ্ডুদাসের সভাপণ্ডিত শ্রীধর ভট্ট বৈশেষিক দর্শনের প্রশস্তপাদ ভাষ্যের টীকা 'ন্যায়কন্দলী' রচনা ক'রে প্রাচীন ভূরিশ্রেষ্ঠের সাংস্কৃতিক গৌরবের আর এক সাক্ষ্য চিরস্থায়ী ক'রে রেখে গিয়েছেন। সেই ভূরিশ্রেষ্ঠের স্মৃতি আজও বহন করছে দামোদর-তটের একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। তার নাম ভুরশুট। কেউ বা বলেন ভুরশো।

শতাব্দীর পর শতাব্দী, অনেক রাজনীতির ঝঞ্ঝা ভূরিশ্রেষ্ঠের ভাগ্যাকাশ মথিত ক'রে চলে গিয়েছে। স্থান হতে স্থানান্তরে গড়ে উঠেছে ভূরিশ্রেষ্ঠের নতুন রাজধানী। অনেক সিংহাসন অপসারিত হয়েছে, অনেক দুর্গের দ্বার চূর্ণ হয়েছে। আবার নতুন সিংহাসনে দেখা দিয়েছেন· নতুন অধিপতি, আর নতুন দুর্গের দুয়ারে নতুন রাজবংশের রক্ষাসৈনিকের ভিড়।

সেই প্রাচীন দামোদরের প্রবাহও পথ পরিবর্তন করেছে। কে জানে ইতিহাসের কত কঠিন পাথরের পরিচয় ভেসে গিয়েছে দামোদরের প্লাবনে। তবুও সব ভেসে যায়নি ; বহু প্রাচীন গড়ের ধ্বংসচিহ্ন আজও অঙ্কিত রয়েছে দামোদরের এই তটভূমির নানা স্থানে। গড়-ভবানীপুর, গড়-বসন্তপুর, গড়-মান্দারন, গড়-বাসডিঙা—হিন্দু মোগল ও পাঠান যুগের কত রাজ্য ও রাজার ভাঙা-গড়ার কাহিনী মূক হয়ে পড়ে রয়েছে হুগলি জেলার দামোদরের দুই পাশে। ঐ পাণ্ডুয়াই কি সেই রাজা পাণ্ডুদাসের নামের সাক্ষী? দিল্লীর পাঠান বাদশাহ ফিরোজ শাহ ও হিন্দু রাজশক্তির ঐতিহাসিক সংঘর্ষের চিহ্ন ধারণ ক'রে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে শাহ সুফির অতি জীর্ণ বাইশ দরজার মসজিদ সমাধি আর আজান-মিনার। দিল্লীর কুতুব-মিনারের মত পাণ্ডুয়ার এই মিনারেও প্রাচীন মন্দিরের ইষ্টক তার পূর্বতন স্থাপত্যের অন্তিম চিহ্ন জাগ্রত ক'রে রেখে পরাভূত এক রাজশক্তির বেদনাভিভূত শেষদিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

মোগল বনাম পাঠানে যে তরবারির সংঘর্ষে একদিন বাংলার রাজনীতি অশান্ত হয়ে উঠেছিল, তার ইতিহাসেরও বহু স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে হুগলি জেলার এই দামোদরের দুই তটে। সে ইতিহাসের নানা কাহিনী সমাধিস্থ হয়ে রয়েছে এইসব গড়েরই নীরব ভগ্নস্তূপে। ভূরশুট পরগণার সামন্ত রাজা রুদ্রনারায়ণকেও একদিন মোগলের পক্ষে আর পাঠানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে হয়েছিল।

দিল্লীর মোগল দরবারকে বৎসরে মাত্র একটি স্বর্ণমুদ্রা ও একটি কম্বল রাজকর-স্বরূপ প্রদান করতেন ভূরিশ্রেষ্ঠের রাজা রুদ্রনারায়ণ। মোগল দরবারও ভূরিশ্রেষ্ঠের নিকট হতে এর বেশি কোন আনুগত্য দাবি করতেন না। নিজের রাজ্যে বস্তুত স্বাধীনই ছিলেন রাজা রুদ্রনারায়ণ। নিজের দুর্গ, নিজের সৈন্য, আর নিজের প্রজা নিয়ে যে রাজগর্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন রুদ্রনারায়ণ, সেই রাজগর্বে কখনো হস্তক্ষেপ করেননি কূটনীতিনিপুণ বাদশাহ আকবর।

কিন্তু উড়িষ্যার পাঠান অধিপতি কতলু খাঁ-ই একদিন ভূরিশ্রেষ্ঠরাজা রুদ্রনারায়ণের মনের শান্তি নষ্ঠ ক'রে দিলেন। দিল্লীর মোগল দরবারকে অস্বীকার করেছেন কতলু খাঁ। উড়িষ্যা থেকে মোগলশক্তির আধিপত্য অপসারিত ক'রে স্বাধীন সুলতানরূপে নিজেকে ঘোষণা

করেছেন কতলু খাঁ। বাংলা দেশ হতেও মোগলশক্তিকে অপসারিত ক'রে বাংলার মসনদে আসীন হওয়ার সংকল্প তিনি গ্রহণ করেছেন। মোগলবিরোধী এই বিদ্রোহের অভিযানে তিনি রাজা রুদ্রনারায়ণের সহযোগিতা দাবি করেছেন। কতলু খাঁ'র দাবি অপমানের মতই রাজা রুদ্রনারায়ণকে আঘাত করেছে। পাঠান কতলুর এই দাবির মধ্যে যেন এক ঔদ্ধত্যের ভ্রূকুটি প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। এই আমন্ত্রণ উপেক্ষা করেছেন রুদ্রনারায়ণ।

তবু আহ্বান আসে। শেষ পর্যন্ত কতলু খাঁ'র ভ্রূকুটি একেবারে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিলো। স্বেচ্ছায় পাঠানপক্ষে যোগদান ক'রে এবং পাঠান কতলুর বন্ধু সামন্ত হয়ে মোগলবিরোধী অভিযানে সাহায্য করতে হবে, নয় বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করা হবে--রাজা রুদ্রনারায়ণের কাছে এই বার্তা প্রেরণ করলেন কতলু খাঁ। দূতের ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে একদিন এই বার্তা বহন ক'রে নিয়ে এলেন কতলু খাঁ'রই ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সেনাপতি ওসমান।

ভুরশুটের রাজধানী বসন্তপুরের দুর্গে কতলু খাঁ'র দাবির বার্তা নিয়ে প্রবেশ করলেন আগন্তুক দূত, ছদ্মবেশী সেনাপতি ওসমান। রাজা রুদ্রনারায়ণ তখন রোগশয্যায় শায়িত। আগেই বিষণ্ণ হয়েছিল বসন্তপুর, কতলু খাঁ'র দূতের আগমন সংবাদ শুনে আরও বিষণ্ণ হয়ে উঠলো।

আশংকায় বিচলিত হয়ে উঠেছে প্রজার দল, কৌতূহলে বিচলিত হয়ে উঠেছে রাজা রুদ্রনারায়ণের সৈন্যদল। সকলের চিন্তা এই প্রশ্নেই চঞ্চল হয়ে উঠেছে, রাজা রুদ্রনারায়ণ কি পাঠান কতলুর পক্ষেই যোগদান করবেন? মোগল দরবারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবার ঐ দাবি কি মেনে নেবেন রাজা রুদ্রনারায়ণ?

বসন্তপুর দুর্গের দুয়ারের বাইরে এসে ভিড় করে হাজার হাজার প্রজা। আর, কতলু খাঁ'র ছদ্মবেশী সেনাপতি ওসমান স্বয়ং এসে বসেন রোগশয্যায় শায়িত রুদ্রনারায়ণের সম্মুখে। দূত ওসমানের হাত থেকে বার্তা-লিপি নিয়ে পাঠ করেন রুদ্রনারায়ণ। অপমানে আহত রাজা রুদ্রনারায়ণ নিষ্পলক চক্ষে তাকিয়ে থাকেন আগন্তুক দূতের মুখের দিকে। রোগকাতর রুদ্রনারায়ণের বিষণ্ণ চক্ষুর দৃষ্টি যেন দুটি স্থিরশিখার মত জ্বলতে থাকে।

রুদ্রনারায়ণ বলেন—এই কি কতলু খাঁ'র শেষ কথা?

দূত বলেন—হ্যাঁ, হয় পাঠান পক্ষে যোগদান করুন, নয় এই দুর্গ পাঠানের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে যান।

হঠাৎ পার্শ্বের কক্ষ-দ্বারের আবরণ যেন কঙ্কণ ধ্বনির আঘাতে চঞ্চল হয়ে ওঠে। কক্ষের ভিতর থেকে এক দাসী বের হয়ে রাজা রুদ্রনারায়ণের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। আবেদন জানায়—রাণীমাতা একবার এই পত্র পাঠ করতে চান।

রুদ্রনারায়ণের কাছ থেকে কতলু খাঁ'র প্রেরিত পত্র নিয়ে তেমনি আবার কক্ষান্তরে চলে গেল দাসী। পরমুহূর্তে ফিরে এসে আগন্তুক দূতের হাতেই সেই পত্র ফিরিয়ে দিলো। দেখে চমকে উঠলেন দূতবেশী সেনাপতি ওসমান। টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে সেই কঠোর ভ্রূকুটিপোষিত পত্র।

—এ কি? দূতবেশী সেনাপতি ওসমান সহ্য করতে না পেরে চিৎকার ক'রে উঠলেন।

দাসী বলে—রাণীমাতা আপনার পত্রের এই প্রত্যুত্তরই দিয়েছেন।

চলে গেলেন সেনাপতি ওসমান। দুর্গদ্বারে সমবেত প্রজার দল রাজা রুদ্রনারায়ণের নামে জয়ধ্বনি তুলে উল্লাস করতে থাকে। আর, দুর্গ-ভবনের কক্ষের নিভৃতে রোগশয্যাগত রাজা রুদ্রনারায়ণের কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসেন রাণী ভবশংকরী।

ভবশংকরীর মুখের দিকে তাকিয়ে রাজা রুদ্রনারায়ণের দুই চোখের বিষণ্ণ দৃষ্টি যেন দুর্লভ এক আনন্দের স্পর্শে সুস্মিত হয়ে ওঠে। ভবশংকরীর হাত ধ'রে সাগ্রহে বলেন—এ কি করলে তুমি?

—যা করা উচিত, তাই করেছি।

ভবশংকরীর শান্ত ও সুন্দর মুখের দিকে আরও বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকেন রাজা রুদ্রনারায়ণ। তার পরেই ধীরে ধীরে অশ্রুসজল হয়ে ওঠে তাঁর দুই চোখ।

বেদনায় ব্যাকুল হয়ে রাণী ভবশংকরী বলেন—বল, আমি কি কোন ভুল করেছি?

—না, কোন ভুল করোনি।

—তবে কিসের দুঃখ?

—দুঃখ এই যে, এই হাতে আর তরবারি ধরবার সুযোগ পাবো না।

—কেন?

—আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে।

মিথ্যা বলেননি রাজা রুদ্রনারায়ণ। বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর জীবনদীপ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এই রোগশয্যা থেকে উঠে দাঁড়াবার আর সুযোগ পাবেন না।

রুদ্রনারায়ণ বলেন—কর্তব্য অসমাপ্ত রেখেই চলে যেতে হচ্ছে, একমাত্র এই দুঃখেই আমি শান্তি পাচ্ছি না রাণী।

—বল, তোমার কোন্ কর্তব্য অসমাপ্ত রইল?

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকেন রাজা রুদ্রনারায়ণ। তারপর বলেন—আগামী অমাবস্যায় আমার উপাস্য মহাদেব মণিনাথের কাছে গিয়ে রাজ্যের শান্তি প্রার্থনা ক'রে পূজা দেবো, এই ইচ্ছা ছিল মনে। কিন্তু সে অমাবস্যা তিথি দেখা দেবার আগেই বোধ হয়...।

আর্তনাদ ক'রে স্বামীর পায়ে মাথা লুটিয়ে দেন রাণী ভবশংকরী। যেন ছিন্নলতার মত অসহায় দেহ, আর কতগুলি অশ্রু দিয়ে গড়া হৃদয়ের এক নারী মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর পায়ের কাছে পড়ে থাকে।

রুদ্রনারায়ণ বলেন—আমার এই ইচ্ছা তুমি পূর্ণ কর রাণী, এই আমার অনুরোধ। মহাদেব মণিনাথের মন্দিরে গিয়ে আমার হয়ে তুমিই রাজ্যের কল্যাণের জন্য আমার মানতের পূজা দিয়ে আসবে।

শান্ত হলেন রাজা রুদ্রনারায়ণ। বিশ্বাস করেন, এই কর্তব্য পালন করতে পারবে রাণী ভবশংকরী। এমন কোন কঠিন কর্তব্য নয়। কিন্তু...।

রাজা রুদ্রনারায়ণ বলেন—কিন্তু...।

আর কিছু বলতে পারেন না। ছিন্নলতার মত অসহায় সেই নারীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ ও বেদনার্ত হয়ে ওঠে রোগজীর্ণ রুদ্রনারায়ণের মুখ। কতলু খাঁ'র ক্রোধের মশাল জ্বলে উঠবে আর ক'দিন পরেই। দামোদর পার হয়ে সেই ক্রোধের বহ্নি ছুটে আসবে বসন্তপুরের এই দুর্গের সব সম্মান পুড়িয়ে দেবার জন্য। মণিনাথ মহাদেবের নাম নিয়ে সেই সংকটে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের সম্মান রক্ষার জন্য তরবারি ধারণ করবে কে? এই তো তাঁর মনের সব চেয়ে বড় দুঃখ। কিন্তু বলতে পারেন না, বলবেন কার কাছে, বলে কি লাভ হবে?

কোন কথাই বলেননি রাজা রুদ্রনারায়ণ, কিন্তু কি আশ্চর্য, রাণী ভবশংকরী কি তাঁর স্বামীর মনের গভীরে গোপন-করা এই বেদনার ভাষা শুনতে পেয়েছেন? রাণী ভবশংকরী ধীরে ধীরে কক্ষান্তরে চলে গেলেন এবং রাজা রুদ্রনারায়ণের তরবারিকে বক্ষোলগ্ন প্রিয় উপহারের মতই দু'হাতে ধারণ ক'রে আবার ফিরে এসে দাঁড়ালেন সম্মুখে। মাথা ছুঁইয়ে সে তরবারিকে প্রণাম করেন রাণী ভবশংকরী, তার পরেই প্রণাম করেন স্বামীকে।

তাকিয়ে থাকেন রাজা রুদ্রনারায়ণ। আজ এই মুহূর্তে যেন তাঁর জীবনের সহচরী এই নারীকে নতুন ক'রে চিনতে পারলেন। ছিন্নলতার মত অসহায় মনে হয়েছিল যাকে, এখন তাকে দেখে মনে হয়, ঘুমন্ত এক বিদ্যুতের লতা। কাঁকন-পরা অভিমানের নারী নয়, ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের সব সংকটের অন্ধকারে খড়্গের দীপ্তি হয়ে ঝলসে উঠতে পারে যে প্রতিজ্ঞা, সে

প্রতিজ্ঞারই এক নারী যেন এতদিন আত্মগোপন করেছিল এই স্নিগ্ধ বেণী আর আলতা সিঁদুরের রঙীন মায়ার আড়ালে। আনন্দে হেসে ওঠে রাজা রুদ্রনারায়ণের চক্ষু। আর কোন কিন্তু নেই তাঁর মনে। রুদ্রনারায়ণ বলেন—আর কোন দুঃখ নেই আমার মনে। মনে শান্তি নিয়েই মরতে পারবো এইবার। মণিনাথ তোমার মঙ্গল করুন।

রাজা রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর রাজ্য শাসনের সব ভার নিজের হাতেই তুলে নিলেন রাণী ভবশংকরী। প্রতি অমাবস্যায় রাত্রিকালে মণিনাথ মহাদেবের মন্দিরে গিয়ে পূজা দেন, আর রাজ্যের কল্যাণ কামনা করেন ভবশংকরী। বৈধব্যের বেদনা সহ্য করতে গিয়ে গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে একাকিনী গড়-ভবনের নিভৃতে বসে যে হাতে চোখের জল মুছে ফেলতে হয়, প্রভাত হতে সেই হাতেই তরবারি ছুঁয়ে দুর্গের সৈনিকদের নির্দেশ দান করেন ভবশংকরী। কতলু খাঁ'র সেনাপতি তাঁর সেনাবহর নিয়ে বসন্তপুরের গড় আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, এই সংবাদ শুনতে পেয়েও আতঙ্কিত হয় না ভূরিশ্রেষ্ঠের কোন প্রজা। দামোদরের জল শত্রুসৈনিকের রক্তে আর একবার রঙিন ক'রে দেবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে উল্লাসে রণসজ্জা ক'রে প্রস্তুত হয় দুর্গের সৈনিক।

সতর্ক গড়-বসন্তপুরের দুর্গরক্ষী সারারাত জেগে থাকে। পাঠানবাহিনীর আক্রমণেব অপেক্ষায় দিবস ও রাত্রির প্রতি মুহূর্ত কেটে যায়। দামোদরের তীরে সারা রাত ধ'রে মশালের সংকেত জ্বলে। দুর্গদ্বারের দুন্দুভির কাছে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নিদ্রাহীন প্রহরী। কিন্তু দামোদরের তটে শত্রুবাহিনীর পদশব্দ শোনা যায় না।

আবার এক অমাবস্যার রাত্রি। মণিনাথ মহাদেবের মন্দিরে পূজা দেবার জন্য যাত্রা করলেন রাণী ভবশংকরী। সঙ্গে অল্পসংখ্যক সশস্ত্র অনুচর। বসন্তপুর হতে তিন ক্রোশ দূরে মণিনাথের যে মন্দিরে প্রতি অমাবস্যায় পূজা দিতেন স্বামী, এবং রাজ্যের কল্যাণ কামনা করতেন, সেই মন্দির ভবশংকরীর জীবনের এক নূতন মোহ হয়ে উঠেছে। পূজা করেন, রাজ্যের শান্তি এবং কল্যাণ কামনা করেন ; স্বামীর কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ভবশংকরী, সে প্রতিশ্রুতিকে এক নতুন ব্রতের মতই পালন করেন। শুধু তাই নয়, পূজার শেষে যখন মন্দিরের প্রদীপের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন ভবশংকরী, তখন তাঁর চোখে যেন ভেসে ওঠে একটি ভালোবাসার মুখ। যেন কার নিঃশ্বাসের বাতাসে মুছে যায় তাঁর চোখের জল।

সে অমাবস্যার রাত্রিতে যেন ভুল ক'রে ঘুমিয়ে পড়েছিল দামোদরের জল। জলপ্রবাহের কলশব্দ শোনা যায় না। নিথর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে ভূরিশ্রেষ্ঠের প্রান্তর।

পূজা সমাপন ক'রে আর মণিনাথের কাছে কল্যাণ প্রার্থনা ক'রে মাত্র প্রণাম করেছেন রাণী ভবশংকরী, সেই মুহূর্তে মন্দিরদ্বারে যেন একটা ঝড়ের শব্দ এসে আছাড় দিয়ে পড়লো। রক্ষী সৈনিকদের সতর্ক অস্ত্র ঝনঝন ক'রে বেজে ওঠে। শোনা যায়, যেন ভূরিশ্রেষ্ঠের আকাশ ও বাতাসকে সতর্ক ক'রে দেবার জন্য দূরে বসন্তপুরের দুর্গদ্বারে অবিরল শব্দে বেজে চলেছে দুন্দুভি। দামোদরের দুই তটে ভূরিশ্রেষ্ঠের সৈনিকের মশালের সংকেত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সৈন্যবাহিনী নিয়ে পাঠান সেনাপতি ওসমান আক্রমণ করেছেন, বসন্তপুরের দুর্গকে নয়, মণিনাথের মন্দিরকেই।

চতুর ব্যাধের মত এতদিন ধ'রে সুযোগ খুঁজছিলেন সেনাপতি ওসমান। গড়-বসন্তপুরের গর্বকে সহজে অপহরণ করবার উপায় সন্ধান করছিলেন। ভুলতে পারেননি, গড়-বসন্তপুরের রাজভবনের অভ্যন্তরে এক কক্ষদ্বারের আড়ালে দাঁড়িয়ে যে কঙ্কনধ্বনি একদিন তাঁর কঠোর দাবির পত্রকে অবহেলাভরে ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেরত দিয়েছিল। সে অপমানের প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ওসমান। চর নিযুক্ত ক'রে জানতে পেরেছিলেন, প্রতি অমাবস্যার রাত্রিতে অতি অল্পসংখ্যক রক্ষী প্রহরী নিয়ে রাণী ভবশংকরী গড়-ভবানীপুরের মণিনাথ মন্দিরে পূজা

দিতে আসেন।

জানবার পর আর দেরি করেননি ওসমান। আক্রমণ করেছেন মণিনাথের মন্দিরকে।

মন্দিরের দ্বারে এসে দাঁড়ালেন রাণী ভবশংকরী। দেখলেন, দূরে কাতার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ওসমানের সৈন্য। আর, ওসমানেরই এক দূত এসে দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরদ্বারের নিকটে, সঙ্গে আছে একটি শিবিকা।

রাণী ভবশংকরীর হাতে পত্র দিলো ওসমানের দূত।—'হরিণীর জন্য সোনার পিঞ্জর প্রেরণ করা হলো।'

হ্যাঁ, পিঞ্জরই বটে। শিবিকা পাঠিয়েছে উদ্ধত ওসমান। ওসমানের বশ্যতার শৃংখল স্বীকার ক'রে নেবার জন্য এই মুহূর্তে প্রবেশ করতে হবে ঐ শিবিকায়।

ভুল করেছিলেন এবং ভুল বুঝেছিলেন পাঠান সেনাপতি ওসমান। শিবিকার দিকে তাকিয়ে সেই মুহূর্তে সেই হরিণীরই চোখে জ্বলে উঠেছিল এক বাঘিনীর দৃষ্টি।

ভবশংকরীর নির্দেশে সেই মুহূর্তে ওসমানের দূতের সম্মুখেই শিবিকায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো। দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠলো শিবিকা। প্রস্তুত হলেন রাণী ভবশংকরী, তরবারি হাতে নিয়ে হাঁক দিলেন, এবং তাঁর রক্ষী সৈন্য নিয়ে পাঠান সৈন্যের ব্যূহের উপর এক খণ্ড শাণিত অসিফলকের মত ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন।

রাণী ভবশংকরীর তরবারির আঘাতে সচকিত শত্রু পিছনে হটে যেতেই যেন মৃত্যুর ফাঁদে পা দিলো। বসন্তপুরের দুর্গ হতে ভবশংকরীর সৈন্যবল এতক্ষণে এসে পৌঁছে গিয়েছে। ব্যর্থ হলো ওসমানের কৌশল। রণমত্তা রাণী ভবশংকরীর উৎসাহে অনুপ্রাণিত ভুরিশ্রেষ্ঠের অশ্বারোহী দীর্ণ ক'রে দিলো শত্রুব্যূহ। তাড়িত শত্রুসৈন্য ফিরে এসে দাঁড়ালো দামোদরের তটে। তারপর, দামোদর পার হয়ে ফিরে চললো পরাভূত ওসমানের সৈন্য। শুধু তটবালুকার উপর পড়ে রইল নিহত শত্রুর শোণিতের চিহ্ন।

সেই শোণিতচিহ্নও একদিন মুছে গিয়েছিল দামোদরের জলের প্লাবনে। কিন্তু দামোদর-তটের সেই অমাবস্যার রাত্রির অন্ধকারে রাণী ভবশংকরীর হাতের তরবারি ভুরিশ্রেষ্ঠের যে সম্মান রক্ষা করেছিল, তার গৌরব অবশ্য আজও মুছে যায়নি। মোগল বাদশাহ আকবরও বিস্মিত হয়েছিলেন এক বিধবা সামন্তপত্নীর সেই রণকুশলতা ও অমিত সাহসের কাহিনী শুনে। রায়বাঘিনী—বাদশাহ আকবরই রাণী ভবশংকরীকে এই উপাধি দান করেছিলেন।

রায়বাঘিনীর নামের গৌরব বেঁচে থাকলেও বসন্তপুর দুর্গের সেই গৌরব আজ আর বেঁচে নেই। মাত্র একটি ভগ্নস্তূপ হয়ে পড়ে রয়েছে রাজা রুদ্রনারায়ণের বসন্তপুরের সেই দুর্গ। লোকে বলে পেঁড়োর গড়। হাওড়াঘাট স্টেশন থেকে মাত্র দশ ক্রোশ দূরে মুন্সীরহাট, আর মুন্সীরহাট হতে কিছু দূরে পেঁড়ো-বসন্তপুর। কাণা দামোদরের কিনারায় আজ সমাধিস্থ হয়ে রয়েছে রায়বাঘিনীর সেই গর্বের দুর্গ।

আবার অমাবস্যার রাত্রি দেখা দিয়েছিল এবং রাত্রির অন্ধকারে সেই মহাদেব মণিনাথেরই কাছে গিয়ে চোখের জল ফেলেছিলেন স্বামিহারা সেই বিধবা কুলবধূ ভবশংকরী। সে মণিনাথ ও তাঁর মন্দির আজও আছে। বসন্তপুর হতে মাত্র দু'ক্রোশ দূরে গড়-ভবানীপুরের মণিনাথ মন্দির।

ফুলজানি-নামা

তিনি ছিলেন গৌড়ের ইলিয়াসশাহী সুলতান বংশেরই এক সম্ভ্রান্তের মেয়ে। এই মেয়ে যদি সেদিন তাঁর ভঙ্গীমনোহর দুটি বাঁকা ভুরু, কালো চোখের চাহনি, আর শিশির-ধোওয়া গোলাপের মত অধরের শোভা নিয়ে হজরৎ পাণ্ডুয়ার পথে বের না হতেন আর পথের মাঝেই হঠাৎ এক অপরিচিত যুবকের সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি দেখা না হতো এবং সেই অপরিচিতের মুখের দিকে তিনি যদি বিস্মিত হয়ে আর মুগ্ধ হয়ে না তাকাতেন, তবে গৌড়ের মসনদেরই ইতিহাস ভিন্নরকম হয়ে যেতো।

রিয়াজ-উস-সালাতিন জানে না আর তারিখ-ই-ফিরিশতাও বলতে ভুলেই গিয়েছে, কি নাম ছিল সেই মেয়ের। ভোলেনি শুধু পাঁচ শত বছর আগের গৌড়ের এক গ্রাম্য-কবির পুঁথি।

গ্রাম্য কবি-ঐতিহাসিকের রচিত পুঁথি সেই 'ফুলজানি-নামা'র কোন চিহ্ন আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। জীর্ণ ও বনাকীর্ণ, ধ্বস্ত ও ধূলিমলিন পাণ্ডুয়ার পথের ধুলোর মতই, কে জানে কবে কোন্ ঝড়ে সে পুঁথির জীর্ণ পাতাগুলি উড়ে গিয়ে মহানন্দার জলে পড়েছে আর ভেসে গিয়েছে। আজ গৌড়-পাণ্ডুয়ার মসনদের কাহিনী নিয়ে মুখরতা করে শুধু রিয়াজ আর ফিরিশতা। শুধু হত্যালিপ্সু তরবারির শোণিতাক্ত চমক আর অভিসন্ধির কথা। কিন্তু ফুলজানি-নামা শুধু গেঁথে রেখেছিল এক প্রেমিকার মনের কথার মালা, গৌড়ের মসনদের ইতিহাসেই ঘটনা ঘটিয়েছিল যে নারীর প্রেমের দাবী।

লুপ্ত হয়ে গিয়েছে পুঁথি ফুলজানি-নামা, কিন্তু তার রেশ যেন আজও রয়েছে মহানন্দাতটের গ্রাম-জনপদের স্মৃতিতে, ছন্নছাড়া আর টুকরো টুকরো প্রবাদের মত।

ইলিয়াসশাহী বংশের সন্তান আজিম নামে এক সম্ভ্রান্তের সেই মেয়ের নাম ফুলজানি বেগম। কে জানে, কেন কবি দিয়েছিলেন এই নাম। হয়তো সেই মেয়ের প্রেমের ইতিহাস স্মরণ করতে গিয়ে ফুলের মতই বর্ণে সৌরভে আর কোমলতায় গড়া একটি প্রাণের পরিচয় পেয়েছিলেন গাথা-রচয়িতা গ্রাম্য কবি।

পাণ্ডুয়ার ছোট দরগাহের কিছু উত্তরে সোনা মসজিদ, জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে আছে যার প্রাচীন গৌরবের গম্বুজ মিনার আর দুয়ার। শুধু একটি কষ্টিপাথরের স্মৃতিফলকে তার ঐতিহাসিক পরিচয় আজও চোখ মেলে আছে। তারই উত্তরে সুবৃহৎ সমাধিসৌধ একলাখী। লোকে বলে, একলক্ষ্মী মসজিদ। এই সমাধিসৌধের ভিতরে প্রবেশ ক'রে তিনটি কবরের দিকে তাকালেই অনুভব করা যায়, বোধ হয় নিছক কল্পনা নয় পুঁথি ফুলজানি-নামার কাহিনী। বাতাসের যদি ভাষা থাকতো, তবে এই নিস্তব্ধ একলাখী সৌধেরই পাষাণের দরজায় গভীর রাতের বাতাস হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে শুনিয়ে দিতে পারতো সেই কাহিনী, সেই ফুলজানি-নামা, এক প্রেমিকা নারীর আশা ও হতাশা, আগ্রহ ও দ্বিধা এবং আনন্দ ও আক্ষেপের কাহিনী।

যাঁর নাম ফুলজানি বেগম, তাঁরই নাম আসমানতারা। ফুলজানি-নামা হলো আসমানতারার আত্মকথা।

—আসমানের তারা নই আমি, তিনিই দিয়েছিলেন এই নাম। প্রার্থনা করি, আমার এই নামটিই শুধু বেঁচে থাকুক, নামহীন কোন কবরের মাটির আড়ালে, আর সব নাম মুছে যাক।

কোনদিনও তো ঘরের বাইরে যেতে মন চায়নি, কিন্তু সেদিন কেন যেন মনে হলো, যাই, বড় দরগায় গিয়ে পীর জলালের সমাধিতে ফুল দিয়ে আসি।

দিয়েছিলাম ফুল, আর ঘরে ফিরবার পথে পিতার অন্তিম ক্ষণের সেই কথাগুলিই মনে পড়ছিল—মসনদের চেয়ে মানুষ অনেক বড়।

পিতার সেই কথার অর্থ বুঝেছিলাম। পিতার ইচ্ছা, তাঁর একমাত্র কন্যা যেন ভুল ক'রে

একমাত্র মসনদের মানুষকেই মানুষ ব'লে না মনে করে, যেন ভালোবাসতে পারে সাধারণ মানুষকে। তাঁর একমাত্র কন্যা যেন জীবনের সাথী খুঁজতে গিয়ে ভুল ক'রে না ভালোবেসে ফেলে এমন কোন মানুষকে, গৌড়-মসনদের জন্য লুব্ধ হয়ে আর ষড়যন্ত্রের তরবারি নিয়ে ঘুরেফিরে বেড়ায় যে মানুষ। মসনদকে ঘৃণাই করতেন পিতা। বলতেন, ঐ রক্তসিক্ত ষড়যন্ত্র-বিচলিত ও অভিশপ্ত মসনদের ছায়ার কাছেও যেতে নেই, তার চেয়ে দূরে সরে গিয়ে ভিখারী হয়ে থাকাও ভালো।

ইলিয়াসশাহী ক্ষমতার গৌরবশিখা নিভে গিয়েছে। হিন্দু রাজা গণেশ দত্ত আজ গৌড়-মসনদে সমাসীন। কিন্তু তাঁর মসনদের চারদিক ঘিরে রয়েছে লোভীর চোখের নীরব অভিসন্ধি। নুর-কুতুবের ষড়যন্ত্রের কাছে একবার নতি স্বীকার করেছিলেন রাজা গণেশ। রাজপুত্র যদু ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। রাজা গণেশের পরে গৌড়ের মসনদে যিনি বসবেন, তিনি হবেন মুসলমান, এই ব্যবস্থা ক'রে তবে শান্ত হয়েছিলেন নুর-কুতুব ও তাঁর দল।

কিন্তু শুনেছি, রাজা গণেশ আবার নুর-কুতুবের দলকে উপেক্ষা করেছেন। সুবর্ণধেনু ব্রতের অনুষ্ঠান ক'রে পুত্র যদুকে আবার হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করেছেন রাজা গণেশ। অনেক ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। শুনেছি বিখ্যাত উদয়নাচার্য আর কুল্লুক ভট্টও এসেছিলেন। স্বর্ণ ও বস্ত্র দান গ্রহণ ক'রে, শাস্ত্রবাক্যের সাহায্যে এই অনুষ্ঠানের প্রতি সমর্থন জানিয়ে চলে গিয়েছেন হিন্দু সমাজের শাস্ত্রীরা। আবার ক্রুদ্ধ হয়েছেন নুর-কুতুব ও তাঁর দল।

মহানন্দার দিক থেকে ঘন বনের মাথার উপর দিয়ে একটা ঝড় ছুটে আসছিল সেদিন। পালকির দরজা দিয়ে মুখ বের ক'রে দেখছি সেই দৃশ্য। দেখে চমকে উঠলাম, ঝড়ের মতই ছুটে আসছে একটি ঘোড়া। তার উপর এক যুবক সওয়ার। কে জানে কেন, বোধ হয় মেঘের বুকে বিজলি-ঝলক দেখতে পেয়ে ভয়ে চমকে উঠলো ঘোড়া। হঠাৎ পথের উপর আছাড় খেয়ে পড়লেন যুবক। ভয়-পাগল ঘোড়া ছুটে উধাও হয়ে গেল।

দেখলাম তাঁকে। এমন ক'রে কোন দিন তাকাইনি কোন পুরুষের মুখের দিকে। ভালো লাগছিল তাঁকে দেখতে, আর সেই মুহূর্তে নিজের মনকেও চিনে ফেলতে ভুল করিনি। এই মানুষটি যদি আমার জীবনের সাথী হয়? নিজের মনের প্রশ্ন শুনেই লজ্জিত হয়েছিলাম, আর আশ্চর্য হয়েছিলাম, পীর জলালের কবরে গিয়ে যে মানত করেছিলাম, সেই মানত কি এত শীঘ্রই সফল হয়ে উঠবে?

জানতাম না, তিনি হিন্দু কি মুসলমান। জানতাম না, তিনি রাজা না সাধারণ। আমি শুধু মানুষটিকেই দেখছিলাম, আর বুঝতে পেরেছিলাম, এমন একটি মানুষকেই তো খুঁজছে আমার মন।

আহত হয়ে এক বৃক্ষতলে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। থামালাম পালকি। ভুলে গেলাম লজ্জা আর সংকোচ। কাছে গিয়ে বললাম—আসুন আমার পালকিতে।

আপত্তি করেননি তিনি। এবং এক অপরিচিতকে সঙ্গে নিয়ে একই পালকিতে পাশাপাশি বসে থাকতেও কোন লজ্জা হয়নি আমার। কিন্তু লজ্জিত হতে হলো, যখন দেখলাম, তিনি অপলক চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

তিনি শান্তভাবেই শুনলেন আমার পরিচয়। কিন্তু আমিই চমকে উঠলাম, তার পরিচয় শুনে। রাজা গণেশ দত্তর পুত্র যদু দত্ত, যিনি, গৌড়-মসনদের উত্তরাধিকারী।

ভয় পেয়েছিলাম। এ যে মসনদের মানুষ! নিজের মনকেও কঠিন ক'রে নিয়ে ভেবেছিলাম, এখানেই শেষ ক'রে দিতে হবে এই ভালোবাসার ভুল। অভিশপ্ত গৌড়-মসনদের ছায়ার কাছেও যাবো না।

ভুল করিনি। নিজের কোন দোষও দেখতে পাইনি। আমি তো এক অপরিচিতকেই মনে মনে হৃদয় দান ক'রে ফেলেছিলাম। মসনদী ঐশ্বর্যের কোন লোভ আমার এই ভালোবাসার

মধ্যে ছিল না। তিনি হিন্দু না মুসলমান, তাও ভেবে দেখবার নিয়মও যে বিস্মৃত হয়েছিলাম। মসনদের মানুষকে নয়, আমি একজন মানুষকেই আপন করতে চেয়েছি।

ভুলতেও পারিনি তাঁকে। দেখা হতো তাঁর সঙ্গে। পাণ্ডুয়া জানে না যে, এক তরুণ ফকির প্রতি সন্ধ্যায় আজিম মঞ্জিলের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন, তিনিই হলেন রাজা গণেশ দত্তের পুত্র যদু দত্ত, গৌড়বঙ্গের ভবিষ্যতের রাজা যদু দত্ত। ফকিরের ছদ্মবেশ ধরে তিনি আসেন, তাই তো তাঁর সঙ্গে দুটো কথা বলবার, আর সেই সঙ্গে মনের কথা বলবার সুযোগ পাই।

তাঁরই দেওয়া নাম—আসমানতারা।

আমিই ঠাট্টা ক'রে প্রশ্ন করতাম—কোন্ আসমানের তারা?

তিনি তাঁর বুকের উপর হাত রেখে বলতেন—এই আসমানের।

—কিন্তু ঐ আসমানের তারা আমি হবো কি ক'রে?

—কেন হতে পারবে না?

—তুমি যে হিন্দু। ওখানে আমার ঠাঁই হবে কেমন ক'রে?

—তুমি যদি আপত্তি না কর, তবেই হবে।

—আমার আপত্তি নেই, কিন্তু ভয় হয়...।

—কি?

—তুমিই পারবে না।

—কেন?

—তোমার ধর্ম কি মুসলমানের মেয়েকে আপন ক'রে নিতে পারবে? তোমার আত্মীয়, তোমার সমাজ আমাকে হিন্দুবধূ ব'লে স্বীকার ক'রে নেবে কি?

তিনি বলতেন—বৃথা এই সন্দেহ। হিন্দুর সমাজ যে অপর ধর্মের মানুষকে আপন ক'রে নিতে পারে, তার প্রমাণ আমি। জালালউদ্দীন আবার যদু দত্ত হতে পেরেছে। হতাশ হয়ো না তারা, রাজা গণেশ দত্তের প্রতাপ আর হিন্দু শাস্ত্রীর উদারতা আজ আমাদের প্রেমের সহায়।

তারা, এই নামেই সেদিন তিনি ডেকেছিলেন আমাকে। সেদিনই তিনি প্রথম আমার হাত ধরলেন। বললেন—আমি স্বপ্ন দেখেছি তারা, সীমন্তে সিঁদুর, কপালে তিলক, পায়ে অলক্তক, আর মাথায় ধানদূর্বার আশীর্বাদ নিয়ে শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তুমি বধূবেশে চলেছো আমার পাশে পাশে।

একটুও খারাপ লাগেনি, বরং শুনতে বড়ই মধুর লেগেছিল তাঁর এই স্বপ্নের কথা। মনে মনে কামনাও করেছিলাম, সফল হোক তাঁর স্বপ্ন।

মাস গেল, বছর ঘুরে বছর এল, তারপর এক দুঃসংবাদ শুনেই একদিন দু'চোখ জলে ভরে উঠলো। রাজা গণেশ দত্তের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর পুত্রবধূ হয়ে তাঁর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াবার সৌভাগ্য আর হলো না। জানতে পারলেন না তিনি, কে বসে রয়েছে এখানে এক শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষায়, তাঁরই পুত্রের বধূ হবার আশায়। ইলিয়াসশাহী বংশের মেয়ের কপালে সিঁদুর দেখে যেতে পারলেন না রাজা গণেশ দত্ত।

দেখা হয় না তাঁর সঙ্গে। শুনলাম অভিশপ্ত গৌড়-মসনদের চারদিকে আবার ষড়যন্ত্রের তরবারি অশান্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু, কি আশ্চর্য, নুর-কুতুবের দল নয়। হিন্দুর দল।

যদু দত্তের ভ্রাতা মহেন্দ্রই চাইছেন গৌড়-সিংহাসন। হিন্দু-শাস্ত্রীরা সমর্থন করেছেন মহেন্দ্রকে। যদু দত্তের হিন্দুত্বকেই অস্বীকার করেছেন হিন্দুর সমাজ আর হিন্দুর শাস্ত্রী। তাঁরা বলেছেন, সুবর্ণধেনুব্রত কেন, হীরকধেনুব্রত করলেও জালালউদ্দীন কখনো আর যদু দত্ত হতে পারেন না। হিন্দুত্ব একবার ছাড়লে চিরকালের মতই ছাড়া হয়। এর মধ্যে ফিরে আসার কোন পথ নেই, ফিরিয়ে নেবার কোন শাস্ত্র নেই।

প্রতিহিংসায় মত্ত হয়ে উঠলেন রাজা যদু দত্ত। সুলতান জালালউদ্দীন নামেই তিনি

গৌড়ের মসনদে বসলেন। তাঁর সহায় হলো নুর-কুতুব দলের শক্তি। গৌড়-পাণ্ডুয়ার মন্দির ভাঙলেন সুলতান জালালউদ্দীন। দেবালয়ে আরতি নিভে গেল, ঘণ্টাধ্বনি স্তব্ধ হলো। রাজধানী থেকে হিন্দু বিতাড়িত ক'রে নিষ্কণ্টক হলেন জালালউদ্দীন।

এই ভয়ংকর দিনগুলির মধ্যেই একটি শুভদিনও দেখা দিলো। সুলতান জালালউদ্দীনের বেগম হয়ে, তাঁরই সঙ্গে পীর জালালের কবরে প্রণাম ক'রে একদিন তাঁরই প্রাসাদে গিয়ে উঠলাম আমি, তাঁর আসমান তারা।

আমি যাকে চেয়েছিলাম তাঁকেই পেলাম। আমার মনের কোন অপরাধ হয়নি। কখনো চিন্তা করবার প্রয়োজন হয়নি, তিনি হিন্দু কি মুসলমান। কত মণ সোনা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে গৌড়-মসনদের পায়া, তারও হিসাব আমি রাখি না। সেদিন যাকে দেখে ভালোবেসেছিলাম, আজ তাঁকেই পেয়েছি। তিনি স্বামী, আমি তাঁর স্ত্রী। সফল হয়েছে আমার মুগ্ধ দৃষ্টির পিপাসা।

কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হতো, যেন জীবনের একটা মধুর স্বপ্ন হারিয়ে শূন্য হয়ে গিয়েছে তাঁর মন। আমার মুখের দিকে তাকিয়েও আনমনা হয়ে থাকেন।

শুনলাম, সেদিন তাঁরই আদেশে রাজধানীতে হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ ভস্মসাৎ করা হয়েছে। শুনে দুঃখ হয়েছিল এবং তাঁরই সম্মুখে গিয়ে আপত্তি করেছিলাম—এ কি করছো তুমি? স্বজাতির উপর কি এত ভয়ানক হতে হয়?

—স্বজাতি? কথাটি উচ্চারণ ক'রেই নিষ্পলক চক্ষে নিঃশব্দে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। আরও বিস্মিত হয়ে দেখলাম, বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে তাঁর দুই চোখ।

সেদিন তিনি আমাকে তাঁর সেই চোখের বেদনার অর্থ বুঝতে দেননি। কোথায় তাঁর জীবনের অতৃপ্তি? কি খুঁজছে তাঁর চিন্তান্বিত বক্ষের নিঃশ্বাস? তিনি বলেননি, আমিও খোঁজ করিনি, জানতেও পারিনি। জানলাম পাঁচ বছর পরে।

সুলতান জালালউদ্দীনের পুত্র এসেছে আমার কোলে। আমিই গৌড়-মসনদের ভবিষ্যতের সুলতানের মাতা। আমার ছেলের নাম আহমদ।

বড় হয়ে উঠেছে আহমদ। আহমদ আমার গর্ব। আহমদকে যখন ঘুম পাড়িয়ে শান্ত করি, তখন মনে হয় গৌড়-মসনদের আশা আনন্দ ও গর্বকে দু'হাত দিয়ে আগলে রাখছি আমি।

তিনিই হঠাৎ একদিন বললেন—আমার সঙ্গে যেতে পারবে তারা?

—কোথায়?

—এই মসনদের জঞ্জাল ফেলে রেখে, ঐ মহানন্দা পার হয়ে অনেক দূরের এক গ্রামের কুটিরে গিয়ে থাকবো আমি তুমি আর আমার ছেলে!

—দূর গ্রামের কুটিরে?

—হ্যাঁ, এক ক্ষুদ্রগ্রামের এক কুটিরে, যদু দত্ত আর তার স্ত্রী ও ছেলে।

বুঝলাম, আবার হিন্দুর জীবনে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন আমার স্বামী সুলতান জালালউদ্দীন। জীবনে প্রিয়তমার সিঁথিতে সিঁদুর আর কপালে তিলক দেখতে পাননি রাজা যদু দত্ত। তাই কি তাঁর স্বপ্ন আজও ছটফট করছে? হিন্দুদ্রোহী জালালউদ্দীনের বুকের ভিতর কি অতি স্বজাতিপ্রেমিক যদু দত্তের সত্তা আজও জেগে রয়েছে?

পারিনি, তাঁর সেই প্রস্তাবে সায় দিতে পারিনি আমি।

এই প্রস্তাব যে আমার ছেলে আহমদকে গৌড়-মসনদ থেকে নির্বাসিত করার প্রস্তাব। আমার ছেলে কুটিরবাসী হবে, এ যে কল্পনাতেও সহ্য করা যায় না।

বলেছিলাম—ক্ষমা করো।

তিনি বললেন—কেন?

—আহমদ যদি না আসতো আমার কোলে, তবে চলে যেতে পারতাম। ছেলেকে

মসনদের অধিকার হতে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। ছেলেকে ঠকাতে পারবো না।

শুনে হাসলেন তিনি। সেদিন তাঁর সেই হাসির অর্থও বুঝিনি। সেদিন মনেও পড়েনি, পিতার সেই অন্তিম উপদেশ। বুঝতেও পারিনি, আমার আকাঙ্ক্ষা মসনদের ছায়ার কাছে এসে লুব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সতেরো বছর ধ'রে গৌড়-মসনদে সমাসীন থেকে তিনি যেদিন এই জীবনের সব উদ্বেগ থেকে চিরকালের মত বিদায় নিলেন, সেদিন আমার বুক ভেঙে গিয়েছিল বেদনায়, কিন্তু উদ্বিগ্ন হইনি। সহায় আছেন নুর-কুতুবের দল। গৌড়ের মসনদে মুসলমান সুলতান জালালউদ্দীনের ছেলে আহমদ শাহ সুলতান হয়ে বসবেন। কোন সমস্যা ছিল না। কোন বাধা আপত্তি ও আশংকা ছিল না।

মসনদে বসলো আমার আহমদ। গৌড়-মসনদের নূতন সুলতান আহমদ শাহের মাতা আমি। হিন্দু দত্ত বংশের শক্তি ও ক্ষমতা চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। মুসলমান আমীর ওমরাহ আর সেনাপতির সমর্থনে নিরাপদ হয়েছে আমার ছেলের সিংহাসন। আজ মনে হয়, ভাগ্য আমাকে কৃপা করেছে।

মাত্র পাঁচটি বছর পার হলো। বুঝতেও পারিনি গৌড়-মসনদের চারদিকে আবার সেই নুর-কুতুবেরই ষড়যন্ত্র হিংস্র হয়ে ছুটোছুটি করছে। যেদিন বুঝলাম, সেদিন শংকিত চিত্তের আর্তনাদ চাপতে গিয়েই মনে পড়লো তাঁর সেই হাসি, যে হাসির অর্থ কোনদিন বুঝতে চেষ্টা করিনি।

নুর-কুতুব মুসলমান, আমার ছেলে আহমদও মুসলমান। ধর্মের মিল আছে, তবু কেন অশান্ত হয়ে উঠলেন নুর-কুতুব?

তারপর হঠাৎ একদিন আমার মনের সব প্রশ্ন আর উদ্বেগের মীমাংসা ক'রে দিলো চক্রান্তকারীর হুংকার। প্রাসাদে প্রবেশ করে আমার চোখের সম্মুখ থেকেই আমার ছেলেকে, গৌড়ের সুলতান আহমদ শাহকে বন্দী ক'রে নিয়ে গেলেন নাসিরুদ্দীন। তারপর এক সন্ধ্যায় একলাখী মসজিদের দ্বারে জনতার সমাবেশ দেখে ছুটে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম, আমার স্বামী জালালউদ্দীনেরই কবরের পাশে নতুন কবর খুঁড়ে রাখা হয়েছে। আমার ছেলে আহমদের কবর। নাসিরুদ্দীনের নির্দেশে ঘাতকের শোণিতলিপ্সু তরবারি আমার ছেলের প্রাণ শেষ ক'রে দিয়েছে। গৌড়ের মসনদে সুলতান হয়ে বসেছেন নাসিরুদ্দীন শাহ।

আর কোন উদ্বেগ রইল না জীবনে। অভিশপ্ত গৌড়-মসনদের গা ঘেঁষে থাকবার লোভ হয়েছিল, সে লোভের ভুল ভেঙে দিলেন খোদা।

এইবার চলে যেতে হবে। কিন্তু কোথায় যাবো? সেদিন তো তিনি নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন দূর এক গ্রামের কুটিরে। তাঁর স্বপ্ন যে আমিই ব্যর্থ ক'রে দিয়েছিলাম। সিঁদুর দিয়ে সীমন্ত রঙিন ক'রে আর কপালে চন্দনতিলক এঁকে হিন্দু যদু দত্তের বধূ হবার সে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারিনি।

তবু যাবো। আর এখানে নয়। যাবো সেই ভাতুড়িয়ায়, আমার শ্বশুর হিন্দু গণেশ দত্তর পিতৃপুরুষের ভিটায়। আমি হিন্দু যদু দত্তেরই বিধবা পত্নী। বধূ হয়ে সিঁথিতে সিঁদুর চিহ্ন নিয়ে যেখানে যেতে পারিনি, আজ সেখানেই যাবো হিন্দু বিধবার বেশে। ঐ ভিটাই আমার বাকি জীবনের আশ্রয়।

যাবার আগে শুধু নতুন সুলতান নাসিরুদ্দীনকে বলে যাবো, একটু জায়গা রেখো আমার স্বামী আর পুত্রের ঐ দুই কবরের কাছে...।

আসমানতারার আত্মকথার শেষ এখানেই। বাকি জীবন হিন্দু বিধবার মতই কঠোর নিয়ম আর নিষ্ঠা আর কৃচ্ছ্র পালন ক'রে ভাতুড়িয়ায় শ্বশুরের ভিটায় জীবনযাপন করেছিলেন আসমানতারা।

পাণ্ডুয়ার একলাখী মসজিদের ভিতরে আজও দেখা যায়, তিনটি সমাধি। যদু-

জালালউদ্দীন, তার পত্নী আসমানতারা ও পুত্র আহমদ শাহের সমাধি। সেই অভিশপ্ত মসনদও ধুলো হয়ে গিয়েছে। স্বামী আর পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে এখন মাটির নিচে নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছেন আসমানতারা।

সনকা ও মেনকা

বেশি দূরে নয়, সোমপুরের মহাবিহার। এই পথই সোজা চলে গিয়েছে সেই মহাবিহারের দিকে, যেখানে শত শত শ্রমণের জীবন বুদ্ধবাণীরই প্রদীপের মত আলোকিত ক'রে রেখেছে শান্ত সংঘারামের নিভৃতকে, আর সম্যক শান্তির আনন্দ প্রতিমূর্ত ক'রে রেখেছেন এক জ্ঞানী মহাস্থবির ; রত্নাকর-শান্তি।

এখানে শুধু সোমপুর মণ্ডলের অধিপতি পূর্ণপ্রভের প্রাসাদ আর সৈন্যভবন। ভারতের সকল প্রান্ত হতে আগত যাত্রিকেরা যায় এই পথে। কেউ জ্ঞানের, কেউ শান্তির এবং কেউ বা পুণ্যের অভিলাষী। সোমপুর মহাবিহারে এসে অন্তরের প্রার্থনা ধ্বনিত না করা পর্যন্ত যাত্রিকের আগ্রহ শান্ত হয় না। মাণ্ডলিক পূর্ণপ্রভের সৈনিক নির্বিঘ্ন ক'রে রেখেছে এই পথ। পথপ্রান্তের বিশ্রাম-বাটিকার প্রাঙ্গণে রত্নপেটিকা শিয়রের কাছে রেখে নিশ্চিন্ত মনে এবং অবাধ নিদ্রায় রাত্রিযাপন করতে পারে বণিক।

রাজপ্রাসাদের সম্মুখেই পথের অপর পার্শ্বে পাশাপাশি দুই উদ্যান, দুই উদ্যানেই দুটি দীর্ঘিকা এবং দুই দীর্ঘিকার কিনারায় রক্তপ্রস্তরে রচিত দুটি গৃহ। পুষ্পিত লতাজালে আচ্ছাদিত এই সুদৃশ দুই রক্তাভ গৃহকে দেখে মনে হয়, যেন দুই পক্ষিণীর দুই সুখপিঞ্জর।

কিন্তু সত্য সত্যই কোন দুই পক্ষিণী নয় ; রূপের দুই নারী বাস করে এই দুই রক্তাভ প্রস্তর আর পুষ্পিত লতাজলের অন্তরালে। রাজনর্তকী সনকা আর মেনকা।

সনকা জানে, সেই শুভদিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন নর্তকী জীবনের এই তুচ্ছ লতাজাল ছিন্ন ক'রে রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে গিয়ে সে ঠাঁই নিতে পারবে। তার প্রণয়ে মুগ্ধ হয়েছেন রাজকুমার পুণ্যরত্ন। বৃদ্ধ মণ্ডলাধীশ পূর্ণপ্রভের মৃত্যুর পর মণ্ডলাধীশের পদে অভিষিক্ত হবার পরের দিনই পুণ্যরত্ন স্বয়ং এসে নর্তকী সনকার কণ্ঠে মাল্যদান ক'রে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবেন। পুণ্যরত্নের মহিষী হবে সনকা। এই বিশ্বাসেই বিহুল হয়ে আছে নর্তকী সনকার হৃদয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘিকার সোপানে বসে জলকমলের উপর পদভার সঁপে দিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে তাকিয়ে থাকে সনকা। দুঃসহ তৃষ্ণায় চঞ্চল হয়ে ওঠে তার দুই চোখের তারকা। আর কতদিন? বৃদ্ধ মণ্ডলাধীশ পূর্ণপ্রভের আয়ু যে ফুরিয়ে যেতে চায় না। আর কতকাল এইভাবে শুধু প্রতীক্ষায় দিনরাত্রির মুহূর্তগুলি সহ্য করবে সনকা? কবে সোমপুর মণ্ডলের অধিপতির আসনে উপবেশন করবেন রাজকুমার পুণ্যরত্ন? সনকার রূপমুগ্ধ প্রণয়ী রাজকুমার পুণ্যরত্ন।

নর্তকী মেনকাও বিশ্বাস করে, সোমপুর মণ্ডলের ভবিষ্যতের অধিপতি পুণ্যরত্নের মহিষী হয়ে ঐ রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে গিয়ে দাঁড়াবার সৌভাগ্য তারই জীবনে দেখা দেবে একদিন। মেনকা জানে, রাজকুমার পুণ্যরত্ন, মুগ্ধ হয়েছে তারই রূপের মায়ায়। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রাজকুমার পুণ্যরত্ন—সেদিন আমি নিজের হাতে তোমার কবরীর ঐ তুচ্ছ পুষ্পসজ্জা ছিঁড়ে দিয়ে পরিয়ে দেবো স্ফটিকের মালা!

রাজসভায় সান্ধ্য প্রমোদের উৎসব হতে ক্লান্তপদে নিজ নিজ গৃহে ফিরবার সময় বৃদ্ধ রাজা পূর্ণপ্রভের প্রতি অভিবাদন জানাতে গিয়ে মনে মনে রাজার আয়ুকে ধিক্কার দেয় নর্তকী সনকা আর মেনকা। কিন্তু কল্পনাও করতে পারে না যে, রাজকুমাব পুণ্যরত্ন তখন অন্তরালে দাঁড়িয়ে মিথ্যা স্বপ্নের ছলনায় প্রলুব্ধ রূপের নারীকে দেখে হাসছেন। রাজকুমার পুণ্যরত্নের এক নিষ্ঠুর কৌতুকে মুগ্ধ হয়েছে আর লুব্ধ হয়ে উঠেছে দুই রূপের নাগিনী। প্রণয় নয়, প্রণয়ের অভিনয় করেন রাজকুমার পুণ্যরত্ন। দুই নর্তকীর আকাঙক্ষা আর উচ্চাভিলাষ পুণ্যরত্নের মিথ্যা কথার বাঁশি শুনে নেচে ওঠে। দেখে কৌতুক অনুভব করেন রাজকুমার

পুণ্যরত্ন। কিন্তু সনকা আর মেনকা রাজকুমার পুণ্যরত্নের সেই কৌতুকোচ্ছল হাসিকে লুব্ধ মনের মোহে আর ভুলে এক প্রণয়ধন্য পুরুষের আনন্দিত হৃদয়ের হাসি বলেই মনে করে। সন্দেহ করে না, সন্দেহ করার কথা মনেও হয় না।

অপরাহ্ণ বেলা, যখন গৃহনিভৃতে সুন্দর দেহের শোভা অবারিত ক'রে মুকুরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকে সনকা, তখন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ ক'রে সনকার অঙ্গে রঙ্গভরে গন্ধরেণু নিক্ষেপ করেন পুণ্যরত্ন। সুস্মিত হয়ে ওঠে নর্তকী সনকার সুন্দর চক্ষু।

অভিযোগ করে সনকা—এই প্রতীক্ষা যে আর সহ্য হয় না।

পুণ্যরত্ন—বল, কি প্রতিকার করতে পারি?

সনকা—পিতা পূর্ণপ্রভের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা না ক'রে তাঁরই অনুমতি নিয়ে কি আমাদের বিবাহ হ'তে পারে না?

পুণ্যরত্ন বলেন—না, পিতা কখনই অনুমতি দেবেন না।

চুপ ক'রে এবং বিষণ্ণ মুখে তাকিয়ে থাকে সনকা।

পুণ্যরত্ন বলেন—একটি উপায় আছে।

সনকা—কি উপায়?

পুণ্যরত্ন—বৃদ্ধ পূর্ণপ্রভকে যদি গোপনে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা যায়, তবেই...।

চমকে আর্তনাদ ক'রে ওঠে সনকা—এমন ভয়ানক উপায় কল্পনাও করবেন না রাজকুমার।

পুণ্যরত্ন বলেন—তাহলে কি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, আর বৎসরের পর বৎসর এইভাবে শুধু প্রতীক্ষার বেদনা সহ্য করবো?

সজল চক্ষে সনকা বলে—না, তাও যে দুঃসহ।

পুণ্যরত্ন—তবে আমার প্রস্তাবে সম্মত হও সনকা। বৃদ্ধ পূর্ণপ্রভ আমাদের মিলনের পথে কণ্টক হয়ে রয়েছে। সে কণ্টক অপসারিত করতে হবে। বল, সম্মত আছো?

আর্তনাদের সুরে সনকা বলে—আছি।

অকস্মাৎ হেসে ওঠেন রাজকুমার পুণ্যরত্ন। মুগ্ধ এক নাগিনীকে কি ভয়ংকর এক লোভে লুব্ধ ক'রে তুলেছেন পুণ্যরত্ন! আশ্চর্য হয় নর্তকী সনকা, রাজকুমার পুণ্যরত্নের দুই চক্ষুতে কৌতুকের হাসি ফুটে ওঠে কেন? বুঝতে পারে না যে, নাগিনীর বিষাক্ত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আর একটু বিষ ঢেলে দিয়ে দেখছেন পুণ্যরত্ন, কেমন দেখায় সে নাগিনীর রূপ।

সনকার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজকুমার পুণ্যরত্ন তেমনই কৌতুকের খেলায় মত্ত হয়ে নর্তকী মেনকার গৃহদ্বারে এসে দাঁড়ান।

অভিমানে আপ্লুত স্বরে প্রশ্ন করে মেনকা—সনকার সঙ্গে আপনার এই অন্তরঙ্গতার অর্থ কি রাজকুমার?

রূপের নাগিনীর দুই চক্ষু ব্যথিত হয়ে উঠেছে। দেখে কৌতুক অনুভব করেন রাজকুমার পুণ্যরত্ন। সন্দেহ করেছে মেনকা, তারই প্রেমাস্পদ রাজকুমারকে কপট অনুরাগের জালে বন্দী করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সনকা। দেখেছে মেনকা, প্রতি মধ্যাহ্নে উদ্যানের নিভৃতে বসে মালা গাঁথে সনকা। কার জন্য, কার কণ্ঠে সমর্পণের জন্য?

প্রশ্ন করে মেনকা—আমি সন্দেহ করি রাজকুমার, সনকা আপনারই প্রেম লাভের জন্য মাল্য রচনা করে প্রতিদিন, আর আপনি...।

পুণ্যরত্ন বলেন—আমি সনকার হাতের পুষ্পমালাকে ঘৃণা করি মেনকা, কিন্তু...।

মেনকা—বলুন।

পুণ্যরত্ন—কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, সনকা তোমাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা ক'রে তার প্রণয়পথ নিষ্কণ্টক ক'রে নিতে চায়।

চিৎকার ক'রে ওঠে মেনকা—এ সন্দেহ আপনি এখনো কেমন ক'রে সহ্য করছেন

রাজকুমার?
পুণ্যরত্ন—বল, কি প্রতিকার করতে পারি?
মেনকা—দুরভিলাষিণী সনকাকে এই রাজ্য থেকে বিতাড়িত করুন।
পুণ্যরত্ন বলেন—তুমি যদি বল, তবে এই জগৎ থেকেই ঐ ঈর্ষার সর্পীকে চিরকালের মত বিতাড়িত ক'রে দিই।
চমকে ওঠে মেনকা—বুঝলাম না রাজকুমার।
পুণ্যরত্ন—বিষপ্রয়োগে সনকাকে হত্যা করা ছাড়া সনকার অভিসন্ধি থেকে মুক্ত নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হবার আর কোন উপায় নেই মেনকা।
বেদনার্ত মুখে চুপ করে শুধু তাকিয়ে থাকে মেনকা।
পুণ্যরত্ন বলেন—উত্তর দাও মেনকা।
মেনকা কম্পিত কণ্ঠে বলে—কি ভয়ংকর প্রস্তাব করেছেন রাজকুমার!
পুণ্যরত্ন—তবে আমাদের মিলনের আশা ছেড়ে দাও মেনকা। যে-কোন মুহূর্তে সনকার চক্রান্তের বিষে মৃত্যু বরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকো।
মেনকা বলে—না, তা-ও সহ্য করতে পারবো না রাজকুমার। আপনি ব্যবস্থা করুন।
পুণ্যরত্ন—তাহলে আমার প্রস্তাব সমর্থন করছো?
মেনকা—কি প্রস্তাব?
পুণ্যরত্ন—আমি গোপনে বিষপ্রয়োগ ক'রে সনকার হিংসুক জীবন স্তব্ধ ক'রে দিতে চাই।
মেনকা বলে—তাই হোক।
অকস্মাৎ অট্টহাস্যে চঞ্চল হয়ে ওঠেন রাজকুমার পুণ্যরত্ন। তাঁরই কৌতুকের ছলনায় ভয়ানক এক পাপ-প্রস্তাবের বিষ গিলেছে নাগিনী। এই কৌতুককে একটু সন্দেহ করারও শক্তি নেই নাগিনীর।
দুই নাগিনীকে এইভাবে মিথ্যা প্রণয়ে মুগ্ধ আর লুব্ধ ক'রে আনন্দ লাভ করেন রাজকুমার পুণ্যরত্ন। শুধু আনন্দ নয়, গর্বও অনুভব করেন। তাঁর প্রণয় লাভের জন্য, তাঁরই জীবনসঙ্গিনী হবার জন্য কি ভয়ানক ব্যাকুল হয়ে উঠেছে দুই রূপসী নারীর চিত্ত! ঘৃণ্যতম পাপের পথেও এগিয়ে যেতে দ্বিধা নেই, যদি সে পথে এগিয়ে গিয়ে রাজকুমার পুণ্যরত্নের প্রেম লাভ করা যায়। রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরের অধীশ্বরী হবার জন্য লুব্ধ হয়ে উঠেছে দুই রাজনর্তকী, দুই রূপের নাগিনী। হাস্য লাস্য ও ভ্রূভঙ্গীর দুই কুহকিনী এক মিথ্যার কুহকে অভিভূত হয়েছে। বহু বিলাসে অভ্যস্ত রাজকুমার পুণ্যরত্নের এই এক অভিনব বিলাস।
দিন যায় এবং নর্তকী সনকাই একদিন বুঝতে পেরে বিস্মিত হয়, বিষপ্রয়োগের প্রস্তাব সত্যই কোন প্রস্তাব নয়, রাজকুমার পুণ্যরত্নের মনের এক বিচিত্র কৌতুকের বিলাস মাত্র।
প্রশ্ন করে সনকা—তবে কেন বৃথা এমন ভয়ানক কথা বলেছিলেন রাজকুমার?
পুণ্যরত্ন বলেন—শুধু পরীক্ষা ক'রে দেখলাম, আমার প্রেমের লোভে তুমি কত হীন হয়ে যেতে পারো।
যেন হঠাৎ অভাবিত ও অতি কঠোর এক আঘাতের বেদনায় স্তব্ধ হয়ে যায় সনকার চোখের হাসি আর মুখের ভাষা। তারপর বলে—আমার মনের হীনতা ক্ষমা করুন রাজকুমার। স্বীকার করি, আপনার প্রণয়ের লোভে মূঢ় হয়ে গিয়েছে আমার মন। ভালোমন্দ বিচার করার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছি।
বাষ্পায়িত হয়ে ওঠে সনকার চক্ষু।
পুণ্যরত্ন বলেন—দুঃখ করো না সনকা। একটি নতুন প্রস্তাব আছে, শোনো।
সনকা—বলুন।
পুণ্যরত্ন—তুমি কি জানো যে, নর্তকী মেনকাও আমার প্রণয় কামনা করে।

সনকা—জানি না, সন্দেহ করি।

পুণ্যরত্ন—সন্দেহ নয়, সত্য কথা। কিন্তু আমি এখনো বুঝতে পারছি না, তোমাদের উভয়ের মধ্যে কার ভালোবাসা বেশি আন্তরিক।

সনকা—জেনে কি লাভ?

পুণ্যরত্ন—যার ভালোবাসা বেশি আন্তরিক, সে-ই হবে আমার জীবনসঙ্গিনী। আমি আমারও মনের দ্বন্দ্ব দূর ক'রে দিতে চাই সনকা।

সনকা—কি করতে হবে বলুন।

পুণ্যরত্ন—সেই প্রস্তাবই নিয়ে এসেছি। তুমি আর মেনকা, দু'জনেই দুটি পুষ্পমাল্য রচনা ক'রে কাল প্রভাতে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবে। যার রচিত পুষ্পমাল্য দেখতে বেশি সুন্দর হবে, তারই মাল্য আমি কণ্ঠে গ্রহণ করবো, আর সে-ই হবে আমার জীবনসঙ্গিনী।

প্রস্তাব শুনে চুপ ক'রে বসে রইল নর্তকী সনকা।

চলে গেলেন রাজকুমার পুণ্যরত্ন।

নর্তকী মেনকাও শুনলো প্রণয়ের এই নতুন পরীক্ষার প্রস্তাব, এবং রাজকুমার পুণ্যরত্ন তাঁর এই নতুন কৌতুকের আনন্দ মনের মধ্যেই গোপন ক'রে রাজপ্রাসাদে চলে গেলেন।

সারারাত জেগে পুষ্পমাল্য রচনা করে নর্তকী সনকা ও নর্তকী মেনকা। কিন্তু কী আশ্চর্য, আজ এতদিন পরে যেন ক্লান্ত হয়ে উঠেছে মনের সব লোভে আগ্রহ আর আকাঙ্ক্ষা। আনন্দ নেই এমন মাল্য রচনায়। মন দেখেও ভালেবাসা চিনতে পারে না যে, ফুলের মালার মধ্যে সে দেখবে ভালোবাসার পরিচয়?

সন্দেহ হয়, এই প্রস্তাব বোধ হয় রাজকুমার পুণ্যরত্নের আর এক কৌতুক। কে জানে, কাল প্রভাতে হয়তো পুষ্পমাল্য হাতে নিয়ে আর এক অপমানের সম্মুখে গিয়ে মাথা নত ক'রে দাঁড়াতে হবে।

প্রভাত হয়। পুষ্পমাল্য নিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে যেতেই পথের পাশে সরে দাঁড়ায় নর্তকী সনকা আর মেনকা। দেখতে পায়, প্রসন্ন প্রভাতের স্নিগ্ধতাকে যেন আরও স্নিগ্ধ ক'রে দিয়ে পথ হেঁটে চলেছেন এক সৌম্যমূর্তি জ্ঞানী, সঙ্গে কতিপয় শ্রমণ।

চলেছেন সোমপুর মহাবিহারের মহাস্থবির রত্নাকর-শান্তি। অপলক চক্ষে এবং বিস্ময়াপ্লুত অন্তরের সকল কৌতূহল শান্ত ক'রে দুই রাজনর্তকী দাঁড়িয়ে থাকে পথের এক পাশে। দেখতে থাকে, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন সেই সৌম্যমূর্তি। কী গভীর ও স্নিগ্ধ শান্তি উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে ঐ মুখমণ্ডলে!

পুষ্পমাল্য হাতে নিয়ে দুই নারী দাঁড়িয়ে আছে পথের পাশে। মহাস্থবির রত্নাকব-শান্তি নিকটে এসেই একবার থামলেন। দুই নারীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিনম্র ভঙ্গীতে হাত তুলে শান্তি প্রার্থনা করলেন এবং তার পরেই সোমপুর মহাবিহারের পথ ধ'রে এগিয়ে চললেন মহাস্থবির রত্নাকর-শান্তি।

পুষ্পমাল্য হাতে নিয়ে পথের উপর স্থির-পুত্তলিকার মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রাজনর্তকী সনকা ও মেনকা। যেন এক স্নিগ্ধ ও শান্তিময় জীবনের শোভাযাত্রা এই পথের ধূলিকে পবিত্র ক'রে দিয়ে চলে গেল। রৌদ্র প্রখর হয়, বাদ্যরবে মুখর হয়ে ওঠে রাজা পূর্ণপ্রভের সৈন্যভবন আর রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার। কিন্তু নর্তকী সনকা ও মেনকা তাকিয়ে থাকে দূরান্তরের পথরেখার দিকে।

ধীরে ধীরে যেন অবসন্নের মত সেই পথের ধূলির উপরেই উপবেশন করে সনকা ও মেনকা। ভুল হয়েছে, মস্ত ভুল হয়ে গেল জীবনে। ঐ সৌম্যমূর্তির পায়ের কাছে জীবনের সব প্রশ্ন নিবেদন ক'রে দিয়ে আর শান্তিবাদ গ্রহণ ক'রে এই উদ্‌ভ্রান্ত আকাঙ্ক্ষার জীবন হতে চিরকালের মত দূরে চলে যাওয়াই যে ভালো ছিল। পথের ধূলির উপরেই পুষ্পমাল্য রেখে

দিয়ে প্রণাম করে নর্তকী সনকা আর মেনকা। চোখের জলে সিক্ত হয় পথের ধূলি। যেন জীবনের অন্ধতা ঘুচে গেল এতদিনে। সব লোভ ভুল, অপমান আর হীনতার স্পর্শ হতে মুক্তি লাভের পথ এতদিনে দেখতে পেয়েছে নর্তকী সনকা ও মেনকা।

মেনকার দিকে তাকিয়ে সনকা সহাস্যমুখে বলে—পথ দেখতে পেয়েছি আমি। বিদায় দাও ভগ্নী।

মেনকা উত্তর দেয়—আমিও যে পথ দেখতে পেয়েছি ভগ্নী। চল এক সঙ্গে যাই।

সোমপুর মহাবিহারের পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকে নর্তকী সনকা আর মেনকা। পথের ধূলির উপর পড়ে প্রখর রোদে শুকিয়ে শীর্ণ হয় দুটি পুষ্পমাল্য, দুই রূপের নাগিনীর কামনাময় জীবনের পরিত্যক্ত দুটি নির্মোকের মত।

রাজকুমার পুণ্যরত্নের নির্দেশ অনুযায়ী দুই খঞ্জ ভিখারী সেই প্রভাতে এসে রাজপ্রাসাদের প্রবেশপথে বসেছিল। রাজপ্রাসাদের দ্বারে যেন কঠোর এক কৌতুক বসিয়ে রেখেছেন পুণ্যরত্ন। প্রহরীকে আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন পুণ্যরত্ন, দুই রাজনর্তকীর হাত থেকে পুষ্পমাল্য গ্রহণ করার জন্য যেন প্রণয়ীর ভঙ্গীতে কণ্ঠ অর্পণ করে এই দুই খঞ্জ ভিখারী। রাজপ্রাসাদেরই এক বাতায়নপথের অন্তরালে প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন পুণ্যরত্ন। দেখে আর হেসে হেসে তৃপ্ত হবে পুণ্যরত্নের অহংকার, ঐ কৌতুকের আঘাতে লাঞ্ছিত হয়ে দুই আকাঙ্ক্ষার নাগিনী পুষ্পমাল্য বুকে জড়িয়ে ধরে কেমন ক'রে ছুটে পালিয়ে যায়।

কিন্তু রাজপ্রাসাদের দুয়ারের কাছে গিয়ে পুষ্পমাল্য হাতে নিয়ে আর রাজকুমার পুণ্যরত্নের প্রণয়প্রার্থিনী হয়ে সেদিন আর দেখা দিলো না দুই প্রতিদ্বন্দ্বিনী নারীর মূর্তি। রাজপ্রাসাদের বাতায়নপথে দাঁড়িয়ে শুধু বৃথা প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে পড়লেন রাজকুমার পুণ্যরত্ন। মধ্যাহ্নের সূর্যও ক্রমে অস্তাচলের দিকে এগিয়ে চললো, কিন্তু মিথ্যা স্বপ্নের আহ্বানে মুগ্ধ দুই লোভবিহ্বলা নারীর বিব্রত মূর্তির দিকে তাকিয়ে কৌতুক অনুভব করবার সুযোগ পেলেন না পুণ্যরত্ন।

তবে, তবে কি পুষ্পমাল্য রচনা করতে ভুলে গিয়েছে সনকা আর মেনকা? তবে কি এখনো পুষ্পমাল্য রচনাই সমাপ্ত হয়নি? কৌতূহলী হয়ে এবং একটু বিস্মিত হয়েই রাজপ্রাসাদ হতে বের হলেন রাজকুমার পুণ্যরত্ন।

কিন্তু বেশি দূর যেতে হয়নি। দেখলেন, পথের উপরেই তপ্তধূলির মধ্যে শুষ্ক ও শীর্ণ হয়ে পড়ে রয়েছে দুটি পুষ্পমাল্য। চমকে উঠলেন পুণ্যরত্ন। তবে কি দুই রূপের নাগিনী পরস্পরের দংশনে বিক্ষত হয়ে পথ থেকে ফিরে চলে গিয়েছে, আর প্রাণহীন হয়ে পড়ে রয়েছে ঐ দুই উদ্যানের লতাজালের অন্তরালে? কোথায় আছে সনকা আর মেনকা?

উদ্যানে ঘুরে ফিরে সন্ধান করলেন পুণ্যরত্ন। কিন্তু শ্মশানের মত স্তব্ধ হয়ে আছে উদ্যানের নিভৃত। রক্তপ্রস্তরের গৃহ নীরব। পুষ্পহীন লতাজালে ম্লান হয়ে গিয়েছে। মুকুরে কোন প্রতিবিম্ব হাসে না। নূপুরের শিঞ্জন আর কঙ্কণের ধ্বনি যেন চিরকালের মত অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে এই দুই গৃহের সুরভিত বাতাসের বক্ষ হতে।

সন্দেহ করেন পুণ্যরত্ন। এবং তারপরেই ছুটে এসে দাঁড়ান অদূরের এক ক্ষুদ্র চৈত্যগৃহের কাছে। বুঝতে পারেন, মিথ্যা নয় তাঁর অনুমান। চৈত্যগৃহের নিকটে পথের ধূলির উপরেই পড়ে রয়েছে ক্ষুদ্র দুটি রত্নাভরণের স্তূপ। রাজনর্তকী সনকা আর মেনকা পথের ধূলির উপর সব রত্নালংকার ফেলে রেখে চলে গিয়েছে। কিন্তু এমন ক'রে রিক্ত হয়ে কোথায় চলে গেল দুই লোভের নারী?

সন্ধান করতে করতে সোমপুর মহাবিহারের নিকটে এসে দাঁড়ালেন রাজকুমার পুণ্যরত্ন। তখন সংঘারামের সন্ধ্যার দীপ জ্বলে উঠেছে। সংঘারামে প্রবেশ ক'রেই দেখতে পেলেন পুণ্যরত্ন, স্তূপপাদমূলে প্রদীপের আলোকে দাঁড়িয়ে ত্রিশরণ মন্ত্র উচ্চারণ করছে দুই ভিক্ষুণী।

হ্যাঁ, সনকা ও মেনকাই বটে। কিন্তু আরও নিকটে এগিয়ে গিয়ে সেই দুই নারীর ছায়ার কাছেও আর দাঁড়াবার সাহস হলো না পুণ্যরত্নের। নিঃশব্দে এবং ধীরে ধীরে ফিরে চলে এলেন রাজকুমার পুণ্যরত্ন।

কে জানে, সেদিন রাজপ্রাসাদে ফিরে যাবার সময় রাজকুমার তাঁর নিজের মনের অহংকারের ভার সহ্য করতে পেরেছিলেন কি না। পুণ্যরত্নের সেই অহংকার আর মিথ্যার আর কৌতুকের নিষ্ঠুরতা মাটি হয়ে গিয়েছে এক হাজার বছর আগে।

সোমপুর বিহারের ধ্বংসাবশেষ ধারণ ক'রে আজও রয়েছে রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর। পাহাড়পুরের নিকটেই আক্কেলপুর নামে একটি রেল স্টেশন হতে পাঁচ ক্রোশ উত্তর-পূর্বে আছে একটি গ্রাম। সে গ্রামের নাম ক্ষেতলাল। পুণ্যরত্নের প্রাসাদ আজ এই ক্ষেতলাল গ্রামের মাটির সঙ্গে ধূলি হয়ে মিশে গিয়েছে। কিন্তু আজও আছে পাশাপাশি দুটি দীর্ঘিকা, মেঘের ছায়ায় কালো হয়ে ওঠে আর চাঁদের আলোকে সাদা হয়ে ওঠে যার জল। হাজার বছর আগের দুই রাজনর্তকীর নাম আজও জাগিয়ে রেখেছে পাশাপাশি দুই দীঘি, একটির নাম সনকা এবং অপরটির নাম মেনকা।

বিলি বাঘিনীর দুঃখের কারণ কি?

কাঁকুলিয়া। পয়লা শ্রাবণ। স্নেহের পুতুল।

তুমি আবার জিজ্ঞেস করেছ, গল্পগুলি কি সবই সত্যি? বুঝতে পারছি, তোমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছে। কিন্তু আমার হাসি পাচ্ছে। তোমার ইচ্ছা, গল্পের দুঃখগুলি সব মিথ্যে হয়ে যাক, আর মজাগুলি সব যেন সত্যি হয়! তা ছাড়া, তুমি গল্পের অনেক ভুল ধরেছ। তুমি লিখেছ—"বাংলা স্কুলের ছেলেরা কেন আরও এক ঘণ্টা আগে স্কুল থেকে পালিয়ে গয়ারোডের কাছে চলে যায়নি? তাহলেই তো সবাই গান্ধীজীকে দেখত পেত।" তুমি লিখেছ—"ধরণী পণ্ডিত মশাই আর চিত্তদার সঙ্গে আর একবার ভাব হয়ে গেলেই তো বেশ হতো। ভাব হলো না কেন?"

কিন্তু এসব আমার গল্পের ভুল নয়, পুতুল। এসব লোকের জীবনের ভুল। সত্যি সত্যি বাংলা স্কুলের ছেলেরা বুদ্ধি করে এক ঘণ্টা আগে স্কুল থেকে পালিয়ে যেতে পারেনি। সত্যি সত্যি চিত্তদা আর ধরণী পণ্ডিতের মধ্যে কিছুতেই আর ভাব হয়নি। আমি কি করবো বল?

এখন শ্রাবণ মাস। আকাশ ছাপিয়ে বর্ষা নেমেছে। আজ কিসের গল্প বলি? বাঘটাঘ? ভূতটুত? তুমি বলবে, হ্যাঁ বাঘটাঘের গল্পই আজ বেশ জমবে। বেশ মজা লাগবে। হাজারিবাগের সন্ধ্যে বেলায় বাইরে ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়বে। দরজা বন্ধ করে, আলো জ্বালিয়ে বিছানার ওপর বসে সবাই মিলে বাঘের গল্প পড়তে খুব ভাল লাগবে। গল্পের বাঘ দূর জঙ্গলের ভেতর ভীষণ গর্জন করবে, ভীতু হরিণের ঘাড় মটকাবে। ঘরের ভেতর বিছানার ওপর বসে মিথ্যে ভয় ভয় করবে। বেশ মজা লাগবে, না?

বেশ, বাঘের গল্পই বলবো। কিন্তু আমার বাঘ যদি হালুম হালুম না করে, যদি ভীতু হরিণের ঘাড় না মটকায়, তবে আমাকে দোষ দিও না। কিন্তু আমি গল্পে ফাঁকি দেব না। কেননা, ফাঁকির গল্প আমি জানি না।

আমারও এখন বাঘটাঘের কথা মনে পড়ছিল। এখন আকাশের দিকে তাকিয়ে বড় বড় মেঘের টুকরোগুলিকে দেখে আমার তাই মনে হয়। মেঘগুলি আকাশের কিনারা দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। কোনটার চেহারা সিংহের মত, কোনটা হাতীর মত, কোনটা বাঘের মত। এক একটা মেঘের দলকে দেখাচ্ছে যেন একটা শিংওয়ালা নীল গাইয়ের দল, স্রোতের টানে ভেসে চলেছে। মনে হয়, আকাশের কোথাও একটা চিড়িয়াখানার ফটক ভেঙে গেছে। দলে দলে জন্তু জানোয়ার ছাড়া পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে যারা বাঘ তারাই শুধু মাঝে মাঝে ধমক দিচ্ছে গর্জন করে। তার পরেই বৃষ্টি ঝরে পড়ছে ঝরঝর করে!

তবে শোন—বিলির জীবনকাহিনী।

কে এই বিলি?

এই বিলিই আমার গল্পের বাঘ। জাতে সোনাচিতা। দেশ চাতরার জঙ্গল।

বিলির জীবনীর প্রথম অধ্যায় শোন। চাতরা থেকে মোটর বাসে হাজারিবাগ আসছিলাম। খুব ভোরে এক নদীর কাছে কিছুক্ষণের জন্য মোটর বাস থামলো। এখানে সড়কের দু'পাশে মাঠের মত বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তারপরেই জঙ্গল। আমরা মোটর বাসে বসেই দেখছিলাম, একটু দূরে মাঠের ওপর এক মহুয়ার গাছের নীচে ছোট্ট একটি জীব খেলা করছে। মোটর বাসের খালাসীটা কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে দেখলো, তার পরেই দৌড়ে গিয়ে মহুয়া তলা থেকে ছোট্ট জীবটাকে কোলে তুলে নিয়ে ফিরে এল! আমরা সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখলাম—একটা সোনাচিতার বাচ্চা।

বাঘের বাচ্চা। বাঘিনী মা নিশ্চয় কাছে কোথাও আছে। এখুনি ফিরে আসবে। তারপর?

না. আমরা আর এক মুহূর্ত দেরী করিনি। তখুনি মোটর বাস ছেড়ে দিল। কিছু দূর যাবার পর বাসের জানালা দিয়ে একবার পিছন ফিরে মহুয়া তলার দিকে তাকালাম। মনে হল, মহুয়া তলায় সাদা কুয়াশার মধ্যে যেন একটা ছায়াময় দুরন্ত জন্তুর মূর্তি হুটোপুটি করছে, মাটি শুঁকে শুঁকে কিছু খুঁজছে। আমাদের মোটর বাস আরও জোরে দৌড়তে আরম্ভ করলো।

খালাসীর কাছ থেকে সোনা চিতার বাচ্চাটাকে নিয়ে একবার আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। ডাকলাম- বিলি! হঠাৎ নামটা মুখে এসে গেল।

খুব সপ্রতিভ হয়ে শান্তভাবে আমার কোলের ওপর বসেছিল বিলি। ড্রাইভার হর্ণ বাজাচ্ছিল, স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছিল। বিলি চুপচাপ বসে স্থিরদৃষ্টি তুলে সব কাণ্ডকারখানা দেখছিল। দেখলাম বিলির গাটা তখনো শিশিরে ভিজে রয়েছে। রুমাল দিয়ে মুছে দিলাম। আরামে মাথাটা কাত করে শুয়ে রইল বিলি। মাত্র আধ ঘন্টার মধ্যে একেবারে নতুন দেশের জীব হয়ে গেল বিলি। দেখে মনে হচ্ছিল, বিলি যেন কতদিন ধরে এই মোটর বাসে নিয়মিত যাওয়া আসা করছে। এখন মহুয়া-তলায় কুয়াশার ভেতর যে বাঘিনী মায়ের স্বপ্ন ছটফট করছে, বিলির সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক নেই। জঙ্গলের ঘনছায়া আর একটা পাথুরে গুহার অন্ধকারের স্নেহ থেকে বিলির প্রাণ যেন একেবারে মুক্ত হয়ে গেছে। কলের গাড়ির ওপর চড়ে বিলি তখন আমাদের সঙ্গে চল্লিশ মাইল বেগে ছুটে চলেছে শহরের দিকে। জঙ্গলের সীমা শেষ হতে চলেছে।

আমাদের মোটর বাস কোম্পানীর অফিসে দই আর হলুদ-জলে সেদ্ধ মাংস খেয়ে বড় হতে লাগলো বিলি। এক বছরের মধ্যে দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠলো। ছোটখাট্ট এক পালোয়ানের মত দেখাতো বিলিকে। বক্সিং গ্লাভ্‌সের মত চওড়া থাবা, আঁটসাঁট শরীরে চকচকে চামড়ার আড়ালে মাংসের পেশীগুলি গোল গোল বলের মত যেন নাচানাচি করতো। গায়ের ওপর কালো-হলুদে মেশানো ছোপগুলি দেখে মনে হতো বিলিকে যেন এক খেলোয়াড়ের ইউনিফর্ম পরিয়ে রাখা হয়েছে।

একটা খুঁটোর সঙ্গে লম্বা শেকল দিয়ে বাঁধা থাকতো বিলি। সারাদিন ঘুমিয়ে আর লাফঝাঁপ করে বিলির সময় কেটে যেত। সারা রাত বিলি ঘুমতো না। মনের সুখে চিৎকার আর লাফালাফি করতো। লাফালাফি করার জন্য যেন একটা নেশা ছিল বিলির। একদমে, একটানা, ক্লান্তিহীন ও ক্ষান্তিহীন ভাবে বিলি অকারণে লাফাতো, থাবা ঘসতো, পাঁয়তাড়া করতো। বিলির খেলার হরেক রকম কায়দা দেখে আমরা অবাক হয়ে যেতাম। বিলির জীবন থেকে শৈশবেই তো তার জঙ্গল মুছে গেছে। তবে এত জংলী পাঁয়তাড়ার দরকার কি? কোথা থেকে এসব কৌশল শিখলো বিলি? শিকার মেরে খাবার কোন প্রয়োজন কখনো হয়নি বিলির, ভবিষ্যতেও হবার কোন কারণ নেই। তবু বিলি এত চেষ্টা করে সেই হিংস্র জীবিকার কৌশল মক্স করে কেন?

গয়লা যখন দুধ দোয়, বিলি গরুটার দিকে একদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে ধীরে ধীরে থাবা লুকিয়ে কুঁকড়ে বসে পড়ে। আস্তে আস্তে লেজ নাড়ে। তার পরেই প্রচণ্ড একটা লাফ দেয়। কিন্তু শেকলে বাঁধা বিলির আক্রমণ শূন্যে ব্যর্থ হয়ে মিলিয়ে যায়।

দূরে পথ দিয়ে ঘোড়াগাড়ি যায়, দু'চারটে খেঁকি কুকুর পথ ভুলে বাগানের দিকে বেড়াতে আসে। বিলি চোরের মত নিঃশব্দে ঘোড়া আর কুকুরগুলোর দিকে জ্বলন্ত লক্ষ্য রেখে থাবা দিয়ে মাটি আঁচড়াতে থাকে। ঘোড়া আর কুকুরেরা চলে যায়। বিলি কিছুক্ষণ উদাস হয়ে বসে থাকে। তারপরেই অস্থির ভাবে লাফাতে থাকে বিলি। শুধু লম্বা শেকলটা আছাড় খেয়ে ঝনঝন করে বাজতে থাকে।

বিলির মতিগতি দেখে আমার সন্দেহ হতো—বাঘ কি কখনো পোষ মানে? ওর রক্তের ভেতর জঙ্গল রয়েছে। একদিন না একদিন...।

কিন্তু কে বলবে পোষ মানেনি বিলি? যখন বড় বেশী দুরন্তপনা করতো বিলি, তখন সত্যিই একটু বিরক্ত বোধ করতাম। তা ছাড়া, কুকুর আর ঘোড়া দেখলেই বিলির ঐ সব হিংসুটে চালিয়াতি দেখলেই আমার বড় রাগ হতো, তখনি উঠে গিয়ে জোরে হাঁক দিয়ে ডাকতাম--বিলি! কানের ওপর জোরে এক গাঁট্টা মারতাম। বিলি তখুনি মাটির উপর একেবারে চার পা তুলে চিৎ হয়ে ভয়ে ভয়ে শুয়ে পড়তো। আস্তে আস্তে কঁকিয়ে কঁকিয়ে একটা কাতর শব্দ করতো। দেখে মনে হতো, যেন তার অপরাধ বুঝতে পেরেছে বিলি। তাই মাপ চাইছে।

আমি ছিলাম বিলির শাসক। বিলি আমার বাধ্য ছিল। বিলি আমাকে ভয় পেত। কিন্তু আর একজন ছিল, যার কাছে বিলি আদরে ও আহ্লাদে আটখানা হয়ে যেত। এক নেপালী বুড়ো, তার নাম পোহাল সিং, সেই মোটর কোম্পানীর অফিসের দারোয়ান। নেপালী বুড়ো পোহাল সিংয়ের কাছে বিলির কোন শাসন ছিল না। শুধু আদর আর আদর। কে যে কাকে বেশী আদর করতো বোঝা যেত না।

বিলি যখন খেয়েদেয়ে টান হয়ে শুয়ে ঘুমতো, পোহাল সিং পাশে বসে বিলির গায়ে হাত বুলিয়ে দিত। লক্ষ্য করতাম, পোহাল সিংয়ের ছোট ছোট চোখের মোটা ভুরু দুটো আনন্দে কুঁচকে উঠছে। বিলির মোটা গর্দানটাকে আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে চুলকিয়ে দিত পোহাল সিং। তারপর যেন নিজের মনের আহ্লাদেই গদগদ হয়ে বলে উঠতো--আহা! পশু হ্যায়, পশু হ্যায়!

জেগে উঠতো বিলি। এইবার বিলির পালা। নেপালী বুড়োর ঘাড়ের ওপর থাবা রেখে টান হয়ে বিলি দাঁড়াতো। বুড়োর মাথার টুপিটা কামড় দিয়ে মাটিতে নামাতো। খিল খিল করে ছোট ছেলের মত হেসে উঠতো নেপালী বুড়ো পোহাল সিং। বিলি তখুনি আর একদফা আক্রমণ করতো, নেপালী বুড়োর গরম কোটের আস্তিনটাকে কামড়ে ধরতো। একটি ঝাঁকুনি দিয়ে ফর ফর করে ছিঁড়ে ফেলতো। পোহাল সিং তবু হি-হি ক'রে হেসে শুধু মজা দেখতো আর বলতো--আহা! পশু হ্যায়! পশু হ্যায়!

পোহাল সিংয়ের জামার আস্তিন ছিঁড়ে ফেলা বিলির যেন প্রতিদিনের খেলা ছিল। পোহাল সিংয়ের বউ রোজই জামার আস্তিন সেলাই করতো। এই ব্যাপার নিয়ে বুড়ো-বুড়ীতে রোজই একটা ঝগড়া হতো। কিন্তু পোহাল সিং গ্রাহ্য করতো না। জামার আস্তিন রোজই সেলাই হতো, রোজই বিলি একবার করে ছিঁড়ে ফেলতো।

বিলিকে শাসন করার সময়ে চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখতাম, পোহাল সিং আছে কি না। একদিন দেখলাম, একটা ভিখারী ছেলের দিকে তাকিয়ে বিলি আবার থাবা ঘসছে আর গোঁপ চাটছে। ভয়ানক রাগ হলো। মানুষের সংসারে থেকেও মানুষ চিনতে শিখলো না জানোয়ারটা। উঠে গিয়ে বিলির কানের ওপর জোরে একটা গাঁট্টা বসিয়ে দিলাম। বিলি তার অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে মাটির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে ক্ষমা চাইতে লাগলো। পরমুহূর্তেই দেখলাম, বারান্দায় থামের আড়াল থেকে এক জোড়া জ্বলন্ত নেপালী চোখ তাকিয়ে আছে। সমস্ত ঘটনাটাকে দেখছে। তাড়াতাড়ি সরে এলাম।

কিছুক্ষণ পরেই পোহাল সিং এসে সামনে দাঁড়ালো। দেখলাম, রাগ চাপতে গিয়ে পোহাল সিংয়ের মুখটা লাল হয়ে আছে। কিছুক্ষণ আমতা আমতা করে পোহাল সিং বললো--বাবু, বিলিকে আপনি মিছামিছি মারেন। এটা উচিত নয়।

জিজ্ঞাসা করলাম--কেন?

পোহাল সিং উত্তর দিল--পশু হ্যায়! ওকে মেরে কি লাভ হবে?

পোহাল সিংয়ের মুখে ঐ এক কথা--পশু হ্যায়! পশু হ্যায়! এর মানে কি? কি বলতে চায় নেপালী বুড়ো? পশু হ্যায়, অর্থাৎ ওর সাত খুন মাপ। ওকে শুধু দই মাংস খাওয়াতে

হবে আর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে হবে। পোহাল সিং চায়, বাঘের বাচ্চা বাঘই হয়ে উঠুক। কিন্তু তা কি করে হয়? তবে জঙ্গল থেকে বিলিকে নিয়ে এলাম কেন? আমরা বাঘের বাচ্চাকে পোষ মানাতে চাই, মানুষ করতে চাই।

একটা ঘটনায় বিলির ওপর বড় খুশী হয়ে উঠলাম। বিশ্বাস হলো, বিলি সত্যিই মানুষ হয়ে উঠবে। সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল।

বিলেত থেকে করিন্থিয়ান ফুটবল খেলোয়াড়ের দল ভারতবর্ষে ম্যাচ খেলতে এল সেই বছর। আমাদের শহরেও একটা ম্যাচ খেলা হয়ে গেল। খেলার মাঠে এত লোকের ভীড় কোনদিন হয়নি। লাট সায়েবও এসেছিলেন। খেলা আরম্ভের আগে করিন্থিয়ান দল আর ভারতীয় দলের ফটো তোলা হলো। ষণ্ডা ষণ্ডা চেহারার করিন্থিয়ানেরা সার বেঁধে দাঁড়ালো। করিন্থিয়ান দলের ক্যাপ্টেন সগর্বে একটা সিংহকে কোলে নিয়ে দাঁড়ালো।

তুমি বোধ হয় শুনে একটু আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছো পুতুল। সিংহ কোথা থেকে এল? কিন্তু সত্যিকারের সিংহ নয়। ফ্লানেলের কাপড় দিয়ে তৈরী একটা লিকপিকে সিংহ। দেখেই ঘেন্না হয়। কিন্তু ঘেন্না হলে হবে কি, ঐ ফ্লানেলের সিংহ কোলে নিয়েই করিন্থিয়ানেরা সগর্বে দাঁড়িয়েছিল।

এখন আমরা কি করি? ভারতীয় দল কি শুধু এই সসিংহ সাহেব খেলোয়াড়ের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে? তা হয় না। আমাদের বিলি, পোহাল সিংয়ের প্রিয় পশু আমাদের হাতের কাছেই আছে! একেবারে জলজ্যান্ত জোয়ান সোনা চিতা।

বিলিকে তখুনি ময়দানে আনা হলো। আমাদের ভয় হলো, অবাধ্য দুরন্ত বিলি ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেনের কোলে চড়বে কি না। হয়তো হুটোপুটি করে আর একটা হাস্যকর তছনছ কাণ্ড করে বসবে।

বিলির গলার শেকল খুলে দিলাম। ভারতীয় দলের সামনে এগিয়ে দিলাম। ক্যাপ্টেন সামাদ বিলিকে কোলে তুলে নিল।

আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বিলি একটুও দুষ্টুমি করলো না। ক্যাপ্টেন সামাদের কোলে উঠে শান্ত হয়ে বসে রইল বিলি। মোটা গর্দান উঁচিয়ে একবার করিন্থিয়ানদের লিকপিকে সিংহটার দিকে দৃপ্তভাবে তাকালো। সমস্ত গ্যালারিতে হাততালির শব্দ বাজতে লাগলো।

বাঃ রে বিলি বাঃ! সেই দিন প্রথম সত্যি করে আদর করলাম বিলিকে। এত নির্বোধ দুরন্ত বিলি, কিন্তু আমাদের সম্মানের সমস্যাটা বুঝতে একটুও দেরি হয়নি বিলির।

মাত্র দু'দিন পরেই এই বিশ্বাস নিষ্ঠুরভাবে ভেঙে দিল বিলি। জংলী হিংসুক বুনো বিলি।

একটা ছোট ছেলে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বিলিকে দেখছিল। হঠাৎ বিলি একটা লাফ দিয়ে উঠে ছেলেটাকে থাবা মেরে মাটিতে ফেলে দিল। তারপরেই ছেলেটার ঘাড়ের কাছে কামড়ে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে লোকজন দৌড়ে এসে ছেলেটিকে উদ্ধার করে সরিয়ে নিয়ে গেল। তেমন সাংঘাতিক কিছু ঘটেনি। ছেলেটির ঘাড়ের ওপর বিলির দাঁত বসে গিয়ে একটু জখম হয়েছিল।

ব্যাস্, আর নয়। বাঘের বাচ্চা বাঘই হবে। বাঘের বাচ্চা কখনো মানুষ হতে পারে না। বুঝলাম, দই মাংস খাইয়ে একটি মানুষের শত্রুকে আমরা বড় করে তুলেছি।

জনমতের আদালতে বিলির বিচার হয়ে গেল। সবাই একমত হলো—এই হিংস্র জীবকে এখুনি বিদায় করে দেওয়া উচিত। তথাস্তু। কিন্তু কি ভাবে বিদায় করা হবে? জেল না নির্বাসন?

করিন্থিয়ানদের সঙ্গে ম্যাচের দিনে বিলি যে মস্ত বড় একটা মানুষী কীর্তির সার্টিফিকেট পেয়েছিল, তারই জোরে জেল থেকে বেঁচে গেল বিলি। সবাই বললেন—চিড়িয়াখানায়

পাঠিয়ে কোন লাভ নেই। তার চেয়ে ভাল...।

তার চেয়ে ভাল কি? নির্বাসন? তা হলে কি কোন মরুভূমিতে নিয়ে গিয়ে বিলিকে ছেড়ে দিয়ে আসবো?

না, তাও নয়। সবাই বললেন—ঐ বনের পশুকে বনেই ছেড়ে দেওয়া হোক।

তাই ঠিক হলো। কিন্তু আমার মনে একটা রাগ রয়ে গেল। এ তো ঠিক শাস্তি হলো না। এ যে বিলির মুক্তি। সেই মহুয়াতলার কুয়াশা, ঘন বনের ছায়া আর পাথুরে গুহার অন্ধকার আবার ফিরে পাবে বিলি। বেশ, তাই হোক।

বিলিকে গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে আমরা রওনা হবার বন্দোবস্ত করছি, নেপালী বুড়ো পোহাল সিং গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালো। ছটফট করে গাড়ির চারদিকে ঘুরতে লাগলো।— পশু হ্যায়! পশু হ্যায়! পোহাল সিং শুধু ব্যর্থ আক্রোশে গজ গজ করতে লাগলো।

জায়গাটার নাম কুসুমভা। ঘন জঙ্গল। জ্যোৎস্না রাত্রি। বিলির গলার শেকলটা আমি শক্ত করে ধরে আছি। আমার সঙ্গে আরও দুটি বন্ধু আছেন বন্দুক নিয়ে। জঙ্গলের একটু গভীরে নিয়ে বিলির শেকল খুলে দেব। বিলিকে ধরে রাখতে পারছিলাম না। জঙ্গলের জ্যোৎস্না আর গন্ধের নেশায় বিলি যেন ফূর্তিতে উন্মত্ত হয়ে ছুটতে চাইছে। বিলি যেন আমাকেই হেঁচড়ে নিয়ে চলেছিল।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একটা বুনো বটের ছায়ার অন্ধকারে আমরা দাঁড়ালাম। এইখান থেকে জঙ্গলটা আরও ঘন হয়ে একেবারে হিংস্র হয়ে গেছে। এইখানে বিলিকে এইবার ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

জ্যোৎস্না রাত্রের জঙ্গলে আরেক রকমের ভয় আছে। একটা নিঃশব্দ আলোছায়ার ষড়যন্ত্র। অতি প্রাচীন পৃথিবীর হিংসাগুলি দল বেঁধে লুকিয়ে আছে প্রতিটি পাতার আড়ালে। সামান্য একটু হাওয়া লাগলেই যেন ফিস ফিস দুর দুর, মর মর, খা খা, যা যা শব্দ করতে থাকে। চোখে বিভ্রম লাগে। পথ ভুল হয়ে যায়। দিক ঠাহর হয় না।

বিলির শেকল খুলে দিলাম। একটা লাফ দিয়ে বিলি শুকনো পাতার স্তূপের ওপর গিয়ে পড়লো। তারপরেই ঘাড় তুলে সামনের আলোছায়ায় ঠাসাঠাসি বনের রহস্যের দিকে যেন বিস্মিত ভাবে তাকিয়ে রইল। পরমুহূর্তে আর একটা লাফে একেবারে আমাদের পাশে চলে এল বিলি। পা ঘেঁসে সুবাধ্য পোষা জীবের মত শান্ত হয়ে বসে রইল।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, বিলি নড়ে না। একটা ঢিল ছুঁড়ে মারলাম দূরে শুকনো পাতার ওপর। বিলি শুধু শব্দটা শুনলো, কিন্তু এক পা নড়লো না।

কি হলো বিলির? বিলির দিকে ভাল করে তাকালাম। শুনতে পেলাম, বিলি আস্তে আস্তে কুঁই কুঁই করে বেড়ালের মত শব্দ করছে। বিলি ভয় পেয়েছে। বিলিকে নিয়ে শহরে ফিরে গেলাম।

নিজের মুক্তিকে নিজেই মিথ্যে করে দিল বিলি। অগত্যা ওকে চিড়িয়াখানাতেই যেতে হবে।

কলকাতার চিড়িয়াখানাতেই বিলির জন্য বাসা ঠিক করা হলো। কিন্তু বার বার মনে একটা খটকা লাগছিল আমার। জঙ্গল দেখে ভয় পেল কেন বিলি? জঙ্গলকে ভয় পাবে, অথচ মানুষের মাঝখানে থেকে জংলীপনা করবে, এ কোন ধরনের প্রাণী?

বিলির খাঁচা তৈরী করা হচ্ছিল। আর দুদিন পরেই বিলি কলকাতায় রওনা হবে। এই দুদিন পোহাল সিং শুধু তার ছোট ছোট চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে সবার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকতো। তারপরেই চিৎকার করতো—পশু হ্যায়। পশু হ্যায়!

আমরা বুঝতে পারতাম, পোহাল সিং আজকাল আমাদেরই দিকে তাকিয়ে এই কথাটা বলে। বিলির উদ্দেশ্যে বলে না।

বিলি চিড়িয়াখানায় চলে গেল।

বিলির জীবনকাহিনী আর কি শুনতে চাও পুতুল? বিলি বাঘ হতে পারেনি, মানুষও হতে পারেনি। তাই ওকে আমরা চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দিলাম।

বিলির সঙ্গে মাত্র আর একবার দেখা হয়েছিল। মাসখানেক পরে। কলকাতায় এসে চিড়িয়াখানায় বিলিকে দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম, লোহার গরাদ দিয়ে ঘেরা একটা নতুন ঘরের মেঝেতে বালির ওপর শুয়ে আছে বিলি।

অনেক ডাকাডাকির পর বিলি একবার গরাদের কাছে এল।

একেবারেই চিনতে পারলো না আমাকে। নাক ফুলিয়ে গরগর শব্দ করতে লাগলো। থাবা দিয়ে বালি খুঁড়তে লাগলো। শুধু এই গরাদের বাধা, নইলে তখুনি এক লাফে আমার ঘাড়ের ওপব লাফিয়ে পড়তো বিলি। দেখলাম, বিলির কপালের ওপর রোঁয়াগুলি ঘসা খেয়ে উঠে গিয়েছে। লোহার গরাদে মাথা ঠুকে ঠুকে এই দশা হয়েছে বিলির।

কেন হলো বলতে পার পুতুল? কিসেব জন্য? কেন লোহার গরাদে মাথা ঠুকেছে বিলি?

তিনটে উত্তর মনে এসেছে আমার।

এক, বিলির মন কাঁদছে এখানে। নেপালী বুড়ো পোহাল সিংয়ের জামার আস্তিন ছিঁড়তে না পেরে ওর সব জীবনের আনন্দ মাটি হয়ে গেছে। তাই পালিয়ে যাবার জন্য দিনরাত গরাদে মাথা ঠুকছে বিলি।

দুই, কুসুমভার জঙ্গলে সেই জ্যোৎস্নারাত্রির আস্বাদ আর একবার পেতে চায় বিলি। পালিয়ে যাবাব সুযোগ পেয়েও পালিয়ে যায়নি, সেই ভুল বুঝতে পেরে আপসোসে মাথা ঠুকছে বিলি। আর একবার সুযোগ খুঁজছে।

তিন, কিম্বা হঠাৎ ঘুমের মধ্যে একটা আবছা স্বপ্নে আবার এক মহুয়াতলার কুয়াশা দেখতে পেয়েছে বিলি। এক বাঘিনী-মায়ের খসখসে জিভ তার গায়ের শিশির চেটে মুছে দিচ্ছে। সব ভুলে সেইখানে আবার ফিরে যেতে চাইছে বিলি।

আজকের গল্প এইখানে শেষ করলাম পুতুল। কোন উত্তরটা সত্যি মনে হয় চিঠিতে জানাবে। বাঘের গল্পটাও মানুষের গল্পের মত হয়ে গেল, তার জন্যে আমায় দোষ দিও না।

খরগোসের ভয়ে বাঘ পালায় কেন?

পয়লা পৌষ। কাঁকুলিয়া। স্নেহের পুতুল!

একটা গল্প বলি শোন। সে অনেকদিন আগের কথা, আমরা তখন খুব ছোট। ছোট আমাদের বাংলা স্কুল, ছোট আমাদের ক্লাসের বেঞ্চ আর ডেস্ক, ছোট আমাদের খেলার মাঠে ছোট একটি ফুটবল!

অদ্ভুত একটা কাণ্ড হয়েছিল। ছ-সাতটা ছোট ছোট খরগোসের তাড়া খেয়ে একদিন একটা প্রকাণ্ড বাঘ মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। তখন সূর্য ডুবছে, দূরে পশ্চিমের শালবনের ভেতর একটা অভ্রখনির মুখ থেকে বয়লারের কালো ধোঁয়া আকাশে উঠে ডুবন্ত রোদের ছোঁয়ায় লাল হয়ে উঠছে। আর পূবে, আরও অনেক দূরে, পাহাড়তলীর আবছায়ার মধ্যে একটা গির্জার ঘণ্টা বাজছে—ঢং ঢং ঢং। ঘণ্টার শব্দটা সেদিন বড় করুণ হয়ে বাজছিল।

মাত্র ছ-সাতটি ছোট ছোট কোমল চেহারার খরগোস একটা নিদারুণ মজবুত চেহারার বাঘকে ধরবার জন্য মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছিল। বাঘের দুরন্ত মূর্তিটাও প্রাণপণে ছুটে যাচ্ছিল শালবনের দিকে, খোলামেলা মাঠের আলোবাতাস থেকে পালিয়ে গিয়ে বোধ হয় জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে পড়তে। বাঘটা এক একবার পেছু ফিরে তাকায়, তারপর আরও জোরে দৌড়তে থাকে, ঊর্ধ্বশ্বাসে, ভয়ে ভয়ে, লেজ গুটিয়ে...।

না, ঠিক লেজ গুটিয়ে নয়। গল্পটা বলতে গিয়ে প্রথমেই একটু ভুল হলো পুতুল, কিছু মনে করো না! এই গল্পে যে বাঘের কথা বলছি, সত্যি তার লেজ ছিল না। আর ছ'সাতটি যে ছোট ছোট খরগোসের কথা বলছি, তাদেরও সত্যি সত্যি চারটি করে পা আর দুটো করে খাড়া খাড়া কান ছিল না। এই গল্পের বাঘ সত্যি করে বাঘই নয়, আর এই গল্পের খরগোস সত্যি করে খরগোসও নয়।

তবে তারা কি?

তারা কি, সেই কথাই বলছি।

এখনো তুমি বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারছো না পুতুল। লেজ নেই এ কেমন বাঘ? চার পা নেই, এ কেমন খরগোস? গল্পটা নিশ্চয় মিথ্যে!

না পুতুল, গল্পটা মিথ্যে নয়। সত্যি সত্যি একদিন মাঠের ওপর দিয়ে খরগোসের মতন ছোট ছোট ছ'সাতটি ছেলে, প্রকাণ্ড বাঘের মত একটা মানুষকে ধরতে তাড়া করেছিল। আর সেই বাঘের মত মানুষটা ভয় পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। সেই যে গেল তো গেলই, আর ফিরে এল না। আর তাকে কোনদিন আমরা দেখতে পাইনি। কিন্তু আজ অনেকদিন পরে তারই কথা আমার মনে পড়ছে। তার নাম বাসুদেব।

কুস্তিগীর বাসুদেব, বাড়ি গোরখপুর জেলায়, লম্বায় প্রায় ছ ফুট, বুকের বেড় আটচল্লিশ ইঞ্চি, গর্দানটা বাঘের ঘাড়ের মত। বাসুদেব যখন দম টেনে শরীর ফুলিয়ে টান হয়ে দাঁড়াতো, তখন তাকে কেমন দেখাতো জান? মহাবলীপুরমে অতি পুরনো যুগের একটা মন্দিরের ভগ্নস্তূপে আজও একটা দ্বারপালের পাথুরে মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। বাসুদেবকে দেখাতো ঠিক এই রকম পাথুরে প্রহরীর মত। ওর সমস্ত শরীরটাই যেন একটা গায়ের জোরের মূর্তি, কারও সাধ্য নেই যে ওকে ধাক্কা দিয়ে একটুও নড়িয়ে দিতে পারে।

এই বাসুদেবের সঙ্গে কি করে আমাদের পরিচয় হলো, তারপর কি হলো, এবং তারপর আরও কি একটা অদ্ভুত রকমের কাণ্ড হয়ে গেল, সেই গল্পই বলছি।

আমাদের ছোট একটা কুস্তির আখড়া ছিল। বাংলা স্কুলের মালী শিবুর ঘরের পেছনে

ছোট একটা ঝিঙে ক্ষেতের পাশে, ছোট একটা একচালার নীচে আমরা আখড়া তৈরী করেছিলাম। আমাদের ছোট আখড়া, একজোড়া ছোট ছোট মুগুর ছিল। আর ছিল শিবুমালীর দেওয়া একজোড়া পুরনো খড়ম, বুক ডন দেবার জন্য। দেড় পয়সা দামের একটা মাটির ধূপদানও ছিল আমাদের। গন্ধমাদনধারী শ্রীহনুমানজীর একটা চার পয়সা দামের ছোট ছবিও রেখেছিলাম আখড়াতে, কুস্তির আগে হনুমানের ছবিটাকে ধূপের ধোঁয়া দিয়ে আমরা পূজো করতাম।

আমাদের কুস্তির আখড়ার বর্ণনা শুনে তোমার বোধ হয় হাসি পাচ্ছে পুতুল। কিন্তু জান না তো, আমাদের আখড়া আর মুগুর যতই ছোট হোক না কেন, আমাদের ওস্তাদেরা কেউ ছোট ছিলেন না। কুস্তির সময় আখড়ার একদিকে থাকতেন বিশ্ববিখ্যাত কুস্তিগীর গামা কাল্লু ও কিক্করসিং, আর একদিকে থাকতেন হেকেনস্মিট ও গচ। প্রত্যেকদিন সকাল বেলায় তাল ঠোকার শব্দে পৃথিবীর এই সব বিখ্যাত কুস্তিগীরদের চমকে দিয়ে আমরা বেদম কুস্তি লড়তাম!

কথাটা একটু পরিষ্কার করেই বলি, নইলে তুমি আবার অবিশ্বাস করবে। কথাটা হলো, আমাদের আখড়ার একচালাটার খুঁটোতে ঐ সব বিশ্ববিখ্যাত কুস্তিগীরদের এক একটা ছবি ঝুলতো। খবরের কাগজ থেকে কেটে ঐ সব ছবি আমরা যোগাড় করেছিলাম। আমাদের তাল ঠোকার শব্দে আর হুটোপুটির বাতাসে ছবিগুলি সত্যিই এক একবার নড়ে উঠতো। হলোই বা ছবি ; আমরা ওঁদের সবাইকে আমাদেরই আখড়ার সদস্য বলে মনে করতাম। তবে নীরব সদস্য, এই যা দুঃখ। নইলে আমাদের ফূর্তিভরা কুস্তি দেখে ওঁরাও নিশ্চয় তারিফ করে উঠতেন--সাবাস বাহাদুর।

কাজেই আমাদের আখড়া যতই ছোট হোক, আমাদের ভরসা আর বিশ্বাস ছোট ছিল না। মোলায়েম ময়দার মত আখড়ার সেই মাটিকে আমরা মাসে একবার করে পাঁচ আনার দই মাখিয়ে আরও অপার্থিব করে তুলতাম। সেই মাটি গায়ে মেখে দশটা বুক ডন দিতেই আমাদের নিঃশ্বাস কেমন যেন দুরন্ত হয়ে উঠতো। মনে হতো, এই ভাবে একটা বছর কুস্তি করতে পারলেই আমরা এক একটি লৌহভীম হয়ে যাব, যা কোন ধৃতরাষ্ট্র চূর্ণ করতে পারবে না।

হ্যাঁ, আমাদের শহরে একটা লোক ছিল যাকে আমরা ধৃতরাষ্ট্র বলে মনে করতাম। অন্ধ নয়, তবে চোখ দুটো ছোট ছোট। মিটমিট করে আমাদের দিকে তাকাতো, যেন আমরাই ওর সবচেয়ে বড় শত্রু।

এঁর নাম দুবেজী, রাজাবাহাদুরের পোষা পালোয়ান। রাজা রহিস আর জমিদারের ছেলে ছাড়া আজেবাজে কোন মানুষের ছেলেকে দুবেজী কুস্তি শেখাতেন না। তিনি তো আর যে-সে পালোয়ান ছিলেন না। তাঁর আখড়াটাও যা-তা ছিল না। আমরা শুনেছিলাম, রাজাবাহাদুরের আখড়ার মাটি রোজ দু সের ঘি দিয়ে মাখা হয়। দুবেজী স্বয়ং রোজ এক পোয়া গাওয়া ঘি চুমুক দিয়ে খান, মোষের দুধ এক বালতি, পেস্তা ও বাদাম এক সের ; তাছাড়া দিস্তা দিস্তা রুটি তো আছেই। তাঁর প্রকাণ্ড বুকটা সর্বদা ফুলে থাকতো, যেন একটা পালোয়ানী অহঙ্কারের ঢাক, ভুঁড়িটা যেন চর্বির জয়ঢাক, আর গাল দুটো ভাইটামিনের ডুগডুগি। প্রতিদিন সকাল বেলা রাজাবাহাদুরের ঘি-খেকো আখড়ার সামনে দুবেজী লেংটি পরে জবুথবু হয়ে বসে থাকতেন, আর চারজন চেলা তাঁকে তেল মাখাতো। তখন তাঁকে মনে হতো, ভুবনেশ্বরের খণ্ডগিরির শুঁড়কাটা পাথুরে হাতীটার মত--যেমন অতিকায়, তেমনই নিরেট আর তেমনই ভোঁতা!

কিন্তু আমরা যা-ই মনে করি না কেন, তাতে কি আসে যায়? পালোয়ান দুবেজীর খ্যাতিও ছিল প্রকাণ্ড। তাঁর নানারকম কেরামতী আর কীর্তির গল্প শহরময় সবাই জানতো।

তিনি নাকি জীবনে একশো পালোয়ানকে হারিয়েছেন, কিন্তু নিজে আজ পর্যন্ত হারেননি। তিনি নাকি একবার শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় পথে একটা ভালুককে টেলিগ্রাফের খুঁটি তুলে পিটিয়ে পিটিয়ে হালুয়া করে দিয়েছিলেন।

আশ্চর্যের বিষয়, এ হেন ভল্লুকসূদন দুবেজী প্রতি রবিবার দু'চারজন চেলা নিয়ে আমাদের আখড়ায় উপস্থিত হতেন আর ঠাট্টা করে হেসে হেসে একেবারে অস্থির হয়ে বলতেন--বাহ্‌বা বাহ্‌বা! যৈসা আখড়া তৈসা কুস্তি!

দুবেজী পালোয়ান আমাকে ডাকতেন--বেঙ বাবাজী। হরিশকে ডাকতেন--মক্ষি মহারাজ। আর কানুকে ডাকতেন--পতঙ্গ পালোয়ান। দুবেজী এই ভাবে এক একবার এসে আমাদের শুধু বেঙ মাছি আর পোকামাকড়ের সঙ্গে তুলনা করে, ঠাট্টা করে, তুচ্ছ করে, চলে যেতেন।

হরিশ এক এক সময় সহ্য করতে না পেরে দুবেজী পালোয়ানকে মুখের উপর শুনিয়ে দিত--আপ তো গোদা হাতী হ্যায়।

দুবেজী তখুনি রেগে কটমট করে তাকাতেন--কেয়া বোলা রে মক্ষি? হাড্ডি তোড় ডালুঙ্গা, খবরদার!

রেগে উঠলেই আমাদের হাড্ডি গুঁড়ো করে দিতে চাইতেন দুবেজী, আমরা সবাই চুপ করে যেতাম। দুবেজী মাঝে মাঝে আমাদের গায়ে পড়ে এই ভাবে অপমান করে চলে যেতেন। আমাদের আখড়াটাকে কেন জানি তিনি সহ্য করতে পারতেন না। আমরা শুধু ভাবতাম--দুবেজীর এই অহঙ্কার কবে চূর্ণ হবে?

কিছুদিন পরে, আজকের মতই শীতের একটি সকালবেলায় আমরা রাঁচী রোডের ওপর দাঁড়িয়ে একটা দৃশ্য দেখছিলাম। কলিয়ারীর এক সাহেবের মোটরগাড়িটা হঠাৎ ড্রাইভারের ভুলে রাস্তার পাশে একটা ছোট খাদের মধ্যে নেমে গিয়েছিল। ড্রাইভার বার বার ইঞ্জিন স্টার্ট করে, সব রকম গীয়ার দিয়েও গাড়িটাকে নড়াতে পারছিল না। সাহেব, ড্রাইভার আর আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে গাড়িটাকে ঠেলে ঠেলেও রাস্তার ওপর ওঠাতে পারলাম না।

এমন সময় একটি লোক উপস্থিত হলো। ধুলোয় ঢাকা খালি পা, ছেঁড়া চাদর গায়ে জড়ানো। মুখটা শুকনো। কিন্তু দেখতে লম্বা চওড়া। কোন কথা না বলে লোকটা এগিয়ে এল। মোটর গাড়ির বাম্পারটা ধরে দুটো হ্যাঁচকা টান দিয়েই গাড়িটাকে একেবারে রাস্তার ওপর উঠিয়ে দিল। আমরা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সাহেব তাকে থ্যাঙ্কস্ জানিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন।

আমরা তাকে সশ্রদ্ধ ভাবে জিজ্ঞেস করলাম--আপ কোন হ্যায় মহারাজ?

লোকটি বললো--আমার নাম বাসুদেব, কুস্তি করি, রাঁচি থেকে হেঁটে হেঁটে আসছি।

এত বড় শক্তিধর বাসুদেব, কিন্তু তার মলিন মূর্তির দিকে তাকিয়ে বড় দুঃখ হচ্ছিল। এ দশা কেন?

বাসুদেবের কাছেই তার দুঃখের ইতিহাস শুনলাম। আজ তিন দিন বাসুদেব কিছু খায়নি। বেচারা বড় গরীব, গোরখপুরে তার বাপ মা ভাই বোন সবাই আছে। তারাও বড় কষ্টে আছে, বাসুদেব আজ দু মাস হলো বাড়িতে একটা পয়সা পাঠাতে পারেনি। অনেক চেষ্টা করে একটা দারোয়ানী চাকরিও পাচ্ছে না বাসুদেব।

আমরা বললাম--আপনি আমাদের এই শহরে খুঁজলে নিশ্চয় একটা কাজ পেয়ে যাবেন।

বাসুদেব বললো--কিন্তু যতদিন না পাই, ততদিন...?

আমরা বললাম--ততদিন আমরা চাঁদা করে আপনাকে রোজ দু সের করে আটা দেব, আপনি আমাদের কুস্তি শেখাবেন।

বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা! বাসুদেব পালোয়ানের শুকনো মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

বাসুদেবকে ওস্তাদ পেয়ে আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে কুস্তি-চর্চা শুরু করে দিলাম। বাসুদেবের কাছে আমরা কত নতুন নতুন প্যাঁচ আর কাট্ শিখলাম. ঢাক কুলা সখি কালাজঙ্গ, বাহিরালি বগ্লি আর ধোবিয়া আছাড়. ঘিস্সা রদ্দা উখাড়--এক কুস্তিময় স্বর্গের অজস্র আশীর্বাদে আমরা ধন্য হয়ে গেলাম, সার্থক হলো আমাদের আখড়া।

বাসুদেব পালোয়ানকে পেয়ে আমাদের গর্বের অন্ত ছিল না। এই বার আমরা দুবেজীর অহঙ্কার চূর্ণ করবো. নিশ্চয় করবো। একদিন সটান রাজাবাহাদুরের আখড়ায় গিয়ে আমরা কুস্তির চ্যালেঞ্জ নিয়ে উপস্থিত হলাম--বাসুদেব ভার্সাস দুবেজী।

দুবেজী নাক সিঁটকে বললেন--ঝিঙে ক্ষেতের আখড়ার একটা বাজে পালোয়ানের সঙ্গে আমার মত পালোয়ান লড়বে না। ভাগো হিঁয়াসে।

আমরা দল বেঁধে সারা শহর বাসুদেব ওস্তাদের গুণ গেয়ে আর দুবেজীকে দুয়ো দিয়ে ঘুরে বেড়ালাম--বাসুদেব ওস্তাদ গুর্ রে! দূর রে দুবেজী দূর্ রে! শহরের চকের ওপর এসে আমরা আরও জোর গলায় ছড়া গেয়ে ঘটনাটা প্রচার করে দিলাম ঃ--

ডর্কে মারে ঘরমে ঘুসা
হাত্থি দুবেজী হো গিয়া মূসা

হাতীর মত দুবেজী ইঁদুর হয়ে গেছে, ভয় পেয়ে ঘরে ঢুকে আছে।

সত্যি সত্যি সারা শহরে একদিনের মধ্যেই দুবেজীর দুর্নাম ছড়িয়ে পড়লো। সবাই জানলো, বাংলা স্কুল আখড়ার বাসুদেব নামে এক নতুন ওস্তাদের চ্যালেঞ্জ নিতে পারেনি ভীতু দুবেজী, রাজাবাহাদুরের আখড়ার জরদ্গব পালোয়ান!

বোধ হয় এই শহরময় ধিক্কারে অতিষ্ঠ হয়েই রাজাবাহাদুরের লোক এসে একদিন জানিয়ে গেল--চ্যালেঞ্জ নেওয়া হলো। আগামী ষষ্ঠীর দিনেই ধর্মশালার আঙিনায় বাসুদেবের সঙ্গে দুবেজী লড়বেন।

রাজাবাহাদুরের লোক চলে যেতেই বাসুদেব ওস্তাদ আমাদের হাসতে হাসতে বললো--ঘাবড়াও নেহি খোকাবাবু, ঐ হাতীকে আমি কুমড়োর মত তুলে নিয়ে আছাড় দেব। দেখে নিও।

এই দৃশ্যটা দেখবার জন্যই আমরা দিন গুনছিলাম। কবে ষষ্ঠী আসবে? কবে দেখতে পাব, অহঙ্কারের হাতী দুবেজী ফাটা কুমড়োর মত চিৎ হয়ে পড়ে আছে আখড়ার ওপর, আর আমরা নেচে নেচে হুর্‌রে দিচ্ছি বাসুদেব ওস্তাদকে। ষষ্ঠীর দু'দিন আগে রাজাবাহাদুরের লোক এসে কুস্তির তারিখ পিছিয়ে দিতে বললো, কারণ দুবেজী অসুস্থ।

বাসুদেব বললো--আচ্ছা। আমরাও বললাম--আচ্ছা। ঠিক হলো চতুর্দশীর দিন কুস্তি হবে।

কিন্তু চতুর্দশীর দিনেও কুস্তি হলো না। আমরা আশ্চর্য হয়ে বাসুদেবকে জিজ্ঞেস করলাম --কি ব্যাপার ওস্তাদ?

বাসুদেব ওস্তাদ বললেন--ও হ্যাঁ, আমাকে দুবেজী খবর পাঠিয়েছে, মাঘের দশ তারিখে কুস্তি হবে।

বারবার তারিখ পিছিয়ে যাচ্ছে। আমরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছিলাম। কয়েক দিনের মধ্যে আরও বেশী করে নিরুৎসাহ হয়ে পড়লাম, বাসুদেব ওস্তাদ আগের মত আর প্রতিদিন আমাদের কুস্তি শেখাতে আসছেন না। তিন চার দিন পর পর আসেন, কিছুক্ষণ থেকেই চলে যান। মুখে মুখেই আমাদের বাহ্‌বা দিয়ে চলে যান, আগের মত আখড়ায় নেমে আমাদের সঙ্গে আর কুস্তি করেন না।

আমরা আরও আশ্চর্য হলাম, বাসুদেব ওস্তাদ আর আমাদের কাছে দু সের আটার জন্য পয়সা দাবি করেন না। বরং একদিন এসে উল্টো আমাদেরই সকলকে বরফি আর কিসমিস খাইয়ে গেলেন।

এরপর একদিন সন্ধ্যাবেলা দেখলাম, চকের ওপর পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বাসুদেব ওস্তাদ অনেকের সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করছেন, তাঁর মাথায় একটা নতুন রঙীন কাপড়ের পাগড়ী।

বাসুদেব ওস্তাদের উন্নতি হোক আমরা সবাই সেটা চাই। কিন্তু এই হঠাৎ উন্নতির রহস্য আমরা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এখনও কোথাও কোন চাকরি পাননি বাসুদেব ওস্তাদ, তবুও বেশ সুখে আছেন মনে হচ্ছে। অথচ দুবেজীকে কুমড়োর মত তুলে আছাড় দেবার প্রতিজ্ঞা এখনো পূর্ণ হয়নি।

শেষ পর্যন্ত একটা দিন পাকাপাকি ভাবে স্থির হলো। ধর্মশালার আঙিনার মাটি খুঁড়ে নতুন আখড়া তৈরী হলো। ঢেঁড়া পিটিয়ে শহরে প্রচার করা হলো—আগামী রবিবার বাসুদেব বনাম দুবেজীর কুস্তি, বিকাল সাড়ে চারটা।

কুস্তির দিন আমাদের মনের অবস্থা বুঝতেই পারছো, পুতুল। দুবেজীর দর্প এত দিনে চূর্ণ হবে, ভাবতে ভাবতে আগের রাতটা আমাদের ঘুমই হলো না। সকাল বেলা গিয়ে আমরা ধর্মশালার আখড়ার মাটি থেকে সব কাঁকড় বেছে দিয়ে এলাম।

ঠিক বিকাল সাড়ে চারটায় কুস্তি আরম্ভ হলো। ধর্মশালার আঙিনায় লোকে লোকারণ্য, রাজাবাহাদুর একটা জরীর পাগড়ী নিয়ে এসে বসেছেন। যিনি জয়ী হবেন তাঁকে এই উপহার দেওয়া হবে।

জয় মহাবীর বলে প্রচণ্ড হাঁক দিয়ে তাল ঠুকে আখড়ায় প্রথমে নামলেন হস্তিকায় দুবেজী। অন্য দিক থেকে একটু বিষণ্ণভাবে আস্তে আস্তে কি একটা কথা উচ্চারণ করে আখড়ায় নামলেন বাসুদেব ওস্তাদ। আমরাই জোরে হাঁক দিয়ে বাসুদেব ওস্তাদকে উৎসাহ জানালাম।

ধস্তাধস্তি, ঝাপটাঝাপটি, তাল ঠোকা, আর পাঁয়তারাই চললো অনেকক্ষণ। কুস্তিটা মোটেই জমছিল না। দুবেজী আর বাসুদেব, দুজনেই কেমন যেন অনর্থক বার বার গায়ে মাটি মাখেন, আর বার বার তাল ঠোকেন। আমরাও দেখে দেখে হাঁপিয়ে উঠছিলাম।

হঠাৎ একবার দেখলাম দুবেজীর গর্দানটা অসাবধানে একেবারে বাসুদেব ওস্তাদের বগলের কাছে চলে এসেছে। এমন সুন্দর সুযোগ! আমাদের আর তর সইছিল না। সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলাম—মারো ধোবিয়া বাসুদেব ওস্তাদ।

বাসুদেব ওস্তাদ একটা হুংকার দিয়ে দুবেজীর গর্দানটা বগলে চেপে সেই মারাত্মক ধোবিয়া আছাড়ের একটি ঝাঁকুনি দিলেন। কিন্তু হায়, হঠাৎ হাতটা যেন পিছলে গেল, নিজের ঝাঁকির টাল সামলাতে না পেরে বাসুদেব ওস্তাদ যেন একটা গুলিবিদ্ধ বাঘের মত ছিটকে গিয়ে আখড়ার মাঝখানে চিৎ হয়ে পড়ে গেলেন। জয় মহাবীর গর্জন করে দুবেজী বাসুদেব ওস্তাদের বুকের ওপর বুক দিয়ে মাটিতে চেপে রাখলেন। বাসুদেব ওস্তাদ হেরে গেলেন।

জয় মহাবীর! জয় মহাবীর! রাজাবাহাদুরের দল আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। বিজয়ী ধুলো-মাখা শরীর নিয়ে হাসিমুখে রাজাবাহাদুরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাজাবাহাদুর দুবেজীকে জরীর পাগড়ী পরিয়ে দিলেন। আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে যেন একটা অন্ধকার দেখছিলাম, সত্যিই লৌহভীম চূর্ণ হয়ে গেল। পরাজিত লৌহভীমের ব্যথার রক্ত যেন আমাদের চক্ষের অন্ধকারের ভেতর নিঃশব্দে গড়িয়ে চলেছে, আমাদের চোখে জল আসছিল।

রাজাবাহাদুরের দল তখন দুবেজীকে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাবার আয়োজন করছিল। আমরা দেখলাম, বাসুদেব ওস্তাদ ধর্মশালার আঙিনা থেকে একটু দূরে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়ছেন আর মাঝে মাঝে আমাদের দিকে করুণ ভাবে তাকাচ্ছেন।

ধর্মশালার দারোয়ান হঠাৎ কোথা থেকে আমাদের কাছে এসে চুপ চুপে সান্ত্বনা দিয়ে

বললো--দুঃখ করবেন না, খোকাবাবু। এটা মিলি কুস্তি হয়েছে। ব্যাটা বাসুদেব দুবেজীর কাছ থেকে মোটা টাকা ঘুস খেয়ে ইচ্ছে করে হেরেছে।

চমকে উঠলাম আমরা। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমাদের বাসুদেব ওস্তাদ কি কখনো এরকম ছোট কাজ করতে পারে?

তবু আমরা সবাই একসঙ্গে বাসুদেব ওস্তাদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলাম--বাসুদেব ওস্তাদ, আপনি কি দুবেজীর কাছে টাকা নিয়ে...।

বাসুদেব ওস্তাদ চমকে উঠলেন। তাড়াতাড়ি জামা গায়ে দিয়ে বললেন--কে বললে? বিলকুল মিথ্যে কথা। মিথ্যে কথা...।

বলতে বলতে বাসুদেব ওস্তাদ হনহন করে হেঁটে চলে গেলেন। আমরা পেছু পেছু যেতে যেতে ডাকলাম--বাসুদেব ওস্তাদ!

বাসুদেব ওস্তাদ মুখ ফিরিয়ে বললেন--মিথ্যে কথা!

বাসুদেব ওস্তাদ রাস্তার ওপর দিয়ে খুব জোরে জোরে হেঁটে চললেন। আমরাও পেছু পেছু ডাকতে ডাকতে চললাম--শুনুন বাসুদেব ওস্তাদ, শুনুন, শুনুন...।

চলতে চলতে শহরের বাইরে এসে পড়লেন বাসুদেব ওস্তাদ। আর একবার মুখ ফিরিয়ে আমাদের দেখতে পেয়েই ব্যস্তভাবে মাঠের ওপর নেমে পড়লেন। তারপর দৌড়তে আরম্ভ করলেন। আমরাও পেছু পেছু তাড়া করে দৌড়ে চললাম। কানু বলে উঠলো--ধর ধর ধর।

বাসুদেব ওস্তাদ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে আরম্ভ করলেন। একটা বাঘ যেন সাংঘাতিক ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, আর আমরা ছ-সাতটি ছোট ছোট খরগোস তাকে তাড়া করে চলেছি। তখন পশ্চিমে সূর্য ডুবছে, আর পুবে অনেক দূরে পাহাড়তলীর আবছায়ার মধ্যে একটা গির্জায় ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং ঢং, বড় করুণ সুরে।

বলতে পার পুতুল, কেন বাসুদেব ওস্তাদ এত ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলেন?

দানবী মানবী দেবী!

পয়লা মাঘ। কাঁকুলিয়া। স্নেহের পুতুল।

এবার তুমি একটা রূপকথা শুনতে চেয়েছ। কিন্তু রূপকথা কাকে বলে আমি ঠিক বুঝতে পারি না, পুতুল। দেব দানব যক্ষ রক্ষের গল্প? দেবী দানবী পরী অপ্সরার গল্প?

যেসব শুক আর সারী, সাতভাই চাঁপা আর পারুলদিদি, বেঙ্গমা আর বেঙ্গমী মজার মজার কথা বলে, তাদের আমি কোন দিন দেখতে পাইনি। তারা কোথায় থাকে আমি জানি না। হয়তো তারা কোথাও থাকে না, তারা কোথাও নেই। তাই বোধ হয় তাদের রূপ আর কথা দুই-ই এত সুন্দর।

কিন্তু ওরকম শুধু কল্পনার রূপকথা নয়। আমি যাদের স্বচক্ষে দেখেছি, তাদেরই রূপের কথা বলতে পারি। বানিয়ে বানিয়ে একটা মিথ্যে রূপকথা আমি বলতে পারবো না!

তবে শোন। আমি একদিন একটা দানবীকে দেখেছিলাম, আজকের মতই মাঘ মাসের এক কুয়াসা ভরা ভোর বেলায়। আর একবার একটি দেবী দেখেছিলাম, আজকের মতই হিমভরা মাঘের এক জ্যোৎস্নামাখা রাত্রিতে। সে অনেকদিন আগের একটা ঘটনা, আমরা তখন হাজারিবাগের জেলা স্কুলে পড়ি।

সিংডিহি হাই স্কুলকে হকি ম্যাচে তিনটি গোল ঠুকে দিয়ে দয়াময় মেমোরিয়াল শীল্ড জয় করে আমরা হাজারিবাগ ফিরছিলাম। সিংডিহি থেকে আমরা খুব ভোরেই রওনা হয়েছিলাম। আমাদের মোটর লরিও খুব আস্তে আস্তে হেড-লাইট জ্বালিয়ে চলছিল। কুয়াশার জন্যে সামনের পথ ঠাহর হচ্ছিল না। তার ওপর দু'পাশে ঘন শালের জঙ্গল, আর রাস্তাটাও এবড়ো খেবড়ো উঁচু নীচু আর নুড়িতে ভরা। আমরা বসেছিলাম লরির ভেতর দয়াময় শীল্ডকে বুকে জড়িয়ে। মাত্র দু সের পেতল দিয়ে তৈরী দয়াময় শীল্ড, কিন্তু তাতে কি আসে যায়? আমাদের মনটা তখন বিজয় গর্বে সোনা হয়েই ছিল।

একটা পাহাড়ী নদীর ভেজা বালির ওপর দিয়ে চলতে চলতে মোটর লরিটা হঠাৎ হেড-লাইট নিবিয়ে দিয়ে থেমে গেল। কি ব্যাপার?

গাড়ি থেকে নেমে দেখি একটা পুলিসের লরি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। বন্দুক হাতে নিয়ে কয়েকজন পুলিসও তৈরী হয়ে আছে। শালবনের মাথার ওপর দিয়ে সূর্যের আলো কুয়াসা ভেদ করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। একটু দূরেই নদীর বালিয়াড়ির ওপর একটা জায়গায় চিতার মত করে কুল গাছের শুকনো শুকনো ডালপালা সাজানো রয়েছে। তারই সামনে একটা সিঁদুর মাখানো পাথর।

জঙ্গলের ভেতর একটা হৈহৈ চিৎকার আর ঢাকের শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। শত শত লোক যেন ছুটে আসছে। পুলিসেরা কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো, হাবিলদার গম্ভীর হয়ে বললেন—তৈয়ার রহো।

পুলিসেরা যেন কার প্রতীক্ষায় ওৎ পেতে আছে। প্রথমে না বুঝলেও, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ব্যাপারটা বুঝলাম। ঐ যে কুল গাছের ডালপালা চিতার মত সাজিয়ে রাখা হয়েছে, সেখানে আজ গাঁয়ের লোকেরা এক ডাইনীকে পুড়িয়ে মারবে। এক ডাইনী নাকি অনেকদিন থেকেই লুকিয়ে ছিল ঐ গাঁয়ে। এই ডাইনীর জন্যেই নাকি এবছর গাঁয়ের ক্ষেতে সব মকাই অকালে শুকিয়ে গেছে। গাঁয়ের তিনটি ছেলে বসন্তে মারা গেছে। গাঁয়ের ওঝা অনেক তুকতাক করে শেষ পর্যন্ত এই ডাইনীকে চিনে ফেলেছেন।

আসছে, আসছে, ডাইনী আসছে। গাঁয়ের লোক তাকে তাড়া করে নিয়ে আসছে। দুম্ দুম্ দুম্ দুম্, ঢাকের শব্দ। হৈহৈ মার মার, চিৎকারের শব্দ।

জঙ্গলের ভেতর থেকে চিৎকার আর ঢাকের শব্দ যত কাছে এগিয়ে আসছিল, ততই

ভয়ে আর কৌতূহলে আমাদের বুক দুরদুর করছিল। কোন্ এক ভীষণা দানবীকে গাঁয়ের লোক নিয়ে আসছে ঐ কুলকাঠের আগুনের সঙ্গে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে! কে জানে কেমন তার রূপ!

চিৎকার আর ঢাকের শব্দটা জঙ্গল ভেদ করে নদীর ওপর এসে পড়লো। আমরা দেখলাম, শত শত লোক ঢাক বাজিয়ে আর নিম গাছের ডাল হাতে নিয়ে সত্যিই এক দানবীকে পিটিয়ে পিটিয়ে তাড়া করে নিয়ে আসছে—মার্ মার্ মার্ ডাইনী মার্! মার মার্ মার্...।

পুলিস দলকে দেখতে পেয়ে ডাইনীটা প্রাণপণে দৌড়ে আসতে লাগলো। নিম গাছের ডাল হাতে নিয়ে লোকগুলিও হিংস্র চিৎকার করে আরও জোরে দৌড়ে আসতে লাগলো পেছু পেছু, ডাইনীকে ধরবার জন্য। কিন্তু ডাইনীকে তারা ধরতে পারলো না। নদীর ভেজা বালি আর নুড়ির উপর দিয়ে খেঁকশিয়ালীর মত ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে ডাইনীটা একেবারে পুলিসের গাড়ির সামনে আছাড় খেয়ে পড়লো।

পুলিস দলও তৈরী ছিল। নিম গাছের ডাল হাতে নিয়ে মারমুখী জনতা আর একটু এগিয়ে আসতেই পুলিস বন্দুক তুলে হাঁক দিল—খবরদার! চিৎকার, ঢাকের বাজনা আর নিম ডালের আস্ফালন হঠাৎ থেমে গেল।

সকলেই কিছুক্ষণের মত চুপচাপ। ডাইনীটা পুলিস লরির সামনে ভেজা বালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, পুলিস নিঃশব্দে বন্দুক তুলে দাঁড়িয়ে আছে, আমরা দম বন্ধ করেই দাঁড়িয়ে দেখছি। গাঁয়ের জনতার ভেতর হঠাৎ একটা লোক ভয়ানক কর্কশ স্বরে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলো—মার্! মার্! মার্! লোকটার চোখ দুটো ভয়ানক লাল, মাথার চুল ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া আর গলায় একটা ভেলা ফলের মালা। এই লোকটা হলো গাঁয়ের ওঝা।

হাবিলদার লাফ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ওঝাকে একটা ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে চেপে ধরলেন। দ্রুম্ দ্রুম্ দ্রুম্—পুলিসেরা বন্দুক তুলে কয়েকবার ফাঁকা আওয়াজ করলো। সঙ্গে সঙ্গে জনতা তেমনি মার মার চিৎকার করে পেছু ফিরে ছুটে গিয়ে জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। হাবিলদার বললেন—জলদি কর। ওরা তীর ধনুক আনবার জন্যে গাঁয়ের দিকে গেছে, এখুনি আবার ফিরে আসবে।

পুলিসেরা সঙ্গে সঙ্গে ওঝার হাতে হাতকড়া লাগিয়ে আর কোমরে দড়ি বেঁধে লরিতে তুলে নিল। আমরাও তাড়াতাড়ি আমাদের লরিতে উঠে দয়াময় শীল্ড বুকে জড়িয়ে বসলাম। কেমন ভয় ভয় করছিল, তার ওপর গাঁয়ের লোকগুলি ক্ষেপে উঠেছে, এখুনি ফিরে আসবে। এবার আর নিম গাছের ডাল নিয়ে নয়, বিষ মাখানো তীর আর ধনুক নিয়ে। এখানে আর একটু দেরি করলেই একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বেধে যাবে, নদীর ভেজা বালি মানুষের রক্তে লাল হয়ে উঠবে।

কিন্তু ডাইনীটা কি পড়েই রইল? আমাদের মোটর লরি ছাড়বার আগে একবার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, একটা চৌকীদার ডাইনীকে হাত ধরে পুলিসের লরিতে তুলছে।

কী ভয়ঙ্কর দানবী মূর্তি! আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। পাকা চুলের জটায় ভরা মাথা, কালো কুচকুচে মুখের চামড়াটা শুকিয়ে কুঁচকে রয়েছে। দু কষ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। একটা চোখ কানা। পাকা চুলের জটার সঙ্গে ছেঁড়া ছেঁড়া নিমপাতা লেগে রয়েছে।

ডাইনী একবার হাই তুলে হাঁ করে কাঁপতে লাগলো। মুখের ভেতর থেকে আরও অনেকখানি রক্ত গড়িয়ে পড়লো গলগল করে। ডাইনীটা বললো—জল!

আর কিছু দেখতে পেলাম না, আমাদের লরি রওনা হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, পুলিসের লরিও আসছে।

শহরে ফিরে এলাম আমরা। স্কুলে হাফডে ছুটি পেয়ে দয়াময় শীল্ড নিয়ে সারা বিকেল শোভাযাত্রা করে বেড়ালাম।

সন্ধ্যাবেলা নিতাই বিশু হরিদাস আর আমি খুব খুশী মনে বাড়ি ফিরছিলাম পুলিস লাইনের মাঠের ওপর দিয়ে। আবছা অন্ধকার, কাছেই একটা বেলবাগান, আর তারই মধ্যে কাঁচের তৈরী ময়না ঘর, যেখানে সার্জন স্মিথ মানুষের লাশ চিরে চিরে পরীক্ষা করেন।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল--জল! দু কষ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, একটা ডাইনীর মুখ হাঁ করে বলছে--জল?

কী বিপদের কথা বল তো পুতুল! এত সময় থাকতে ঠিক এই সন্ধ্যার সময়ে, আর এক জায়গা থাকতে এই নির্জন বেলবাগানে ময়না ঘরের কাছে, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সেই ভয়ঙ্কর বিশ্রী কথাটা--জল!

কে জানে সেই দানবী এখন কোথায়? হয়তো জল খেয়ে বেঁচে উঠেছে, হয়তো এতক্ষণে এই শহরেই কোথাও এসে লুকিয়ে রয়েছে। এই সময় যদি হঠাৎ সামনে এসে জল চায়, তাহলেই তো গেছি। আমরা একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে বাড়ি চলে এলাম।

যাক, মাত্র এই একটি দিনই আমরা ভয় পেয়েছিলাম, পুতুল। তার পর আর কিছু নয়। কদিন পরে সকালবেলা ঠিক এই বেলবাগানের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে আমাদের খুব হাসি পাচ্ছিল।

বিশু বললো--এখন যদি সেই দানবীটা এসে জল খেতে চায়?

হরিদাস বললো--শুধু জল নয়, দানবীকে আচ্ছা করে বেলও খাইয়ে দেব।

মাগো! কে যেন আমাদের পেছন থেকে হঠাৎ যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলো। আমরা একটু চমকে তাকিয়ে দেখি, এক কাঠকুড়ুনী বুড়ী কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে।

নিতাই বললো--বুড়ীটার পায়ে কাঁটা বিঁধেছে।

হরিদাস এগিয়ে গিয়ে বুড়ীর পা থেকে একটা মস্ত বড় কাঁটা তুলে ফেলে দিল। বুড়ী বললো--আঃ, বেঁচে থাক বাবা!

বড় দুঃখিনীর মত চেহারা এই বুড়ীর, মাথার পাকা চুলগুলি রুক্ষ জটার মত হয়ে গেছে, মুখটা শুকিয়ে কুঁচকে গেছে, একটা চোখ কানা। দুটো ভাত খেয়ে বেঁচে থাকার জন্যে এই বুড়ো বয়সে কত কষ্টে কাঠ কুড়িয়ে দিন কাটাচ্ছে।

বুড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে পরমুহূর্তে আমরা আরও চমকে উঠলাম। বিশু গর্জন করে বললো--এই, তুমি কে?...সত্যি করে বলো। কে তুমি?

বুড়ী এক চোখ দিয়ে আমাদের দিকে করুণভাবে তাকিয়ে বললো--আমি ভিকুর মা।

নিতাই ধমক দিয়ে বললো--মিথ্যে কথা, সিংডিহির জঙ্গলে তোমায় দেখেছি! তুমি সেই...।

হরিদাস বললো--তুমিই সেই ডাইনী?

বুড়ী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো--হ্যাঁ বাবা।

সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে ফেললো বুড়ী। চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়লো। আমরা স্বচক্ষে দেখলাম পুতুল, এ তো মোটেই দানবী নয়। পায়ে কাঁটা বিঁধলে কষ্ট পায়, অসহায় ভাবে কেঁদে ফেলে, চোখ দিয়ে আবার জলও গড়িয়ে পড়ে। এ যে একটি দুঃখিনী মানবী।

আমি জিজ্ঞেস করলাম--তোমার ভিকু কই?

বুড়ী বললো--কোথাও নেই। অনেকদিন আগে, তোমার চেয়েও সে তখন দেখতে ছোট ছিল, একদিন তাকে বাঘে খেয়ে ফেললো। সেই দিন থেকে গাঁয়ের লোক আমাকে বলে ডাইনী।

বুড়ী আবার অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলো। বুড়ীর কাহিনী শুনে একটু দুঃখিত হয়েই আমরা চলে এলাম।

বুড়ীও সত্যি সত্যি আর গাঁয়ে ফিরে যায়নি। এর পরেও বুড়ীকে কয়েকবার দেখেছি। যখনই দেখতাম, তখনই ভাবতাম--যে ছিল জঙ্গলের এক দানবী, সেই-ই হয়ে গেল এক কাঠকুড়ুনী মানবী! কী আশ্চর্য!

দয়াময় শীল্ড জয় করার জন্যে হেড মাস্টার খুশী হয়ে আমাদের একদিন পুরস্কার দিলেন, পাঁচটি টাকা। আমরাও খুশী হয়ে ঐ টাকা দিয়ে চাল ডাল ঘি আর রাবড়ি কিনে সবাই মিলে একদিন বিকেলে চলে গেলাম সীতাগড় পাহাড়ের কাছে একটা ডাক বাংলাতে, পিকনিক করবার জন্য। হরিদাস তার ছোটকাকার বন্দুকটাও লুকিয়ে লুকিয়ে নিয়ে চলে এল। কে জানে আমাদের রাবড়ির লোভে আর ঘিয়ের গন্ধে যদি দু-একটা লোভী নেকড়ে-টেকড়ে একেবারে কাছে এসে হাই তুলতে থাকে, তবে?

যেতে যেতে হলো সন্ধ্যা, উনুন ধরাতে ধরাতে হলো রাত্রি, খিচুড়ি রাঁধতে রাঁধতে হলো মাঝরাত্রি। আর খাওয়াদাওয়া সেরে ডাক বাংলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাতেই দেখি শালবনের মাথার ওপর ভাঙা চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

মাঘ মাসের কুয়াশা, অল্প অল্প হিমেল হাওয়া, বনফুলের গন্ধ, তার ওপর জ্যোৎস্না। সমস্ত শালবনটা মায়াপুরীর মত মনে হতে লাগলো। তুমি না দেখলে বুঝতে পারবে না পুতুল, নিঝুম রাতের শালবন জ্যোৎস্নার ছোঁয়ায় কী সুন্দর আলোছায়ার স্বপ্নের মত হয়ে ওঠে। ডাক বাংলার বারান্দায় আর আমাদের চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে মন চাইছিল না। একটা নিশির ডাক যেন আমাদের মনকে সেই তরুলতার মায়াপুরীর দিকে অনবরত টানছিল।

ডাক বাংলার জমাদারেরও বোধ হয় আমাদের হল্লায় ঘুম হচ্ছিল না। উঠে এসে বললো --আপনাদের সঙ্গে বন্দুক আছে?

হরিদাস বললো—হ্যাঁ।

জমাদার—তবে চলুন জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে বসি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কেন?

জমাদার—এই রকম চাঁদনী রাতে চিত্রা হরিণের দল শিশির ভেজা দুব্‌বো খেতে বের হয়। শিকার করতে যদি সখ থাকে তবে চলুন।

শিকারের লোভে মোটেই নয়, আমরা দল বেঁধে জমাদারের সঙ্গে সেই নিঝুম রাতের মায়াবনে যেন মায়াহরিণ স্বচক্ষে দেখবার জন্যে জঙ্গলের ভেতর গিয়ে ঢুকলাম।

জঙ্গলের ভেতর বেশী গভীরে আমরা যাইনি। এক জায়গায় কতগুলো হরীতকী গাছ গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়েছিল, সামনে ছোট একটা জলভরা দহ, তার কিনারায় যেন কচি কচি দুব্‌বো ঘাসের চাদর পাতা রয়েছে। আমরা সেখানে বসে শুধু মায়াহরিণের অপেক্ষায় চোখ মেলে তাকিয়ে রইলাম।

কিন্তু কোথায়? না মায়াহরিণ, না সজারু, না খরগোস, কিছুই যে আসে না। তবু তার জন্য একটুও দুঃখ হচ্ছিল না। আমরা অবাক হয়ে সেই বনময় আলোছায়ার অদ্ভুত খেলা দেখছিলাম।

অনেকক্ষণ পরে জমাদার বললো—আর নয়, এবার ফেরা যাক, আর এখানে থাকা ঠিক হবে না।

জিজ্ঞেস করলাম—কেন?

জমাদার—ভয়ের কারণ আছে।

বিশু জিজ্ঞেস করলো—এখানে বাঘটাঘ আসে নাকি জমাদার?

জমাদার--বাঘ এলে তো ভালই ছিল বাবু, ভাল শিকার করা হতো। তা নয়...।

জমাদার যেন ভয় পেয়ে ফিসফিস করে বললো--শেষরাত্রির জঙ্গলে এমন একটি জীব ঘুরে বেড়ায় যাকে বন্দুক দিয়ে গুলি করলেও মরে না। ধরতে গেলেও ধরা দেয় না।

হরিদাসও ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো--এ আবার কেমন জীব জমাদার?

জমাদার বললো--বনদেবী।

বনদেবী? বনদেবী? তাতে ভয় করবার কি আছে? আমরা জমাদারের কথায় একটুও ভয় পাইনি, পুতুল। এই মায়াবনে এসে মায়াহরিণ দেখতে পেলাম না, কিন্তু যদি একবার বনদেবীকে দেখতে পাই তাহলেই তো আমরা ধন্য হয়ে যাব।

কিন্তু সত্যিই কি বনদেবী আছেন? জমাদারের কথা আমাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না। আমরা জঙ্গলের ভেতর একটা সরু পথের দিকে মাঝে মাঝে উৎসুক হয়ে দেখছিলাম, পথটা এঁকেবেঁকে আলোছায়ার ভেতর দিয়ে যেন কোন্ সুদূর প্রহেলিকার দেশে চলে গেছে।

বাপ্ রে বাপ্! ঐ আসছে! জমাদার হঠাৎ একটা আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠে হরিদাসের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো! আমরাও চমকে চারদিকে তাকালাম।

জমাদার আমাদের মিথ্যে ভয় দেখায়নি, পুতুল। জঙ্গলের সরু পথ ধরে, আলোছায়ার হাজার হাজার তোরণ ভেদ করে, দূর থেকে কে যেন আসছে! ধীরে ধীরে, ছন্দে ছন্দে, দুলে দুলে। তার শরীরটা যেন কুয়াশার মতই নরম, শাদা ফুলের মালা দিয়ে জড়ানো বড় বড় দুটি বিনুনী দুলছে। মাথায় একটা মুকুটও আছে মনে হলো।

ধীরে ধীরে বনদেবী এগিয়ে আসছেন, আমরা আরও ভাল করে তাকিয়ে রইলাম। আরও কাছে এগিয়ে এলেন বনদেবী, এবার তাঁকে আরও স্পষ্ট করে দেখলাম। তাঁর মুখের ওপর পাতার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো পড়ছে। ঝকঝক করে উঠছে একটা হাসি হাসি মুখ।

আরও কাছে। আরও কাছে। বনদেবী হঠাৎ থেমে গেলেন। বোধ হয় আমাদের দেখতে পেয়েছেন। অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন বনদেবী।

আমাদের আর একটুও ভয় করছিল না। এ বনদেবীকে এমনি চলে যেতে দেব না। তাকে আরও ভাল করে না দেখে, দুটো কথা না বলে কোনমতেই ছেড়ে দেব না। আমরাই এগিয়ে গিয়ে একেবারে বনদেবীর সামনে দাঁড়ালাম! বনদেবীর শরীরটা থরথর করে কাঁপতে আরম্ভ করলো।

বনদেবীর মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে যা দেখলাম, তা আর বলবার কথা নয়, পুতুল। পাকা চুলের জটায় ভরা মাথা, কুচকুচে কালো মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে, একটা চোখ কানা, মাথার ওপর একটা হাড়ের বোঝা।

হরিদাস ধমক দিয়ে বললো--কে তুমি? সত্যি করে বল?

বনদেবী বললো--আমি ভিকুর মা।

হ্যাঁ, সত্যিই ভিকুর মা। দিনের বেলা জঙ্গল আফিসের গার্ডদের ভয়ে সে জঙ্গলের ভেতর ঢুকতে পারে না, তাই লুকিয়ে লুকিয়ে রাত্রিবেলা ঢোকে। আর, মরা জন্তুর হাড় কুড়িয়ে নিয়ে চলে যায়, রমজান মিঞার আড়তে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে।

জমাদার গর্জন করলো--চোর কাঁহাকা!

ভিকুর মা কেঁদে ফেললো--কি করবো বাবা! দুটো ভাতের জন্য বাবা! কোন উপায় নেই বাবা!

ভিকুর মা কাঁদতেই লাগলো, আমরাও ডাক বাংলায় ফিরে এলাম।

আমার গল্পও আজকের মত এইখানে শেষ করি, পুতুল। তুমি বলবে, এটা তো রূপকথা হলো না, এ যে ভিকুর মার কথা হয়ে গেল। যাই হোক, তিন রকম রূপেই তো তাকে দেখেছিলাম। সেই কথাই এতক্ষণ বললাম। এখন তুমি বল, কোন্ রূপটা সত্যি? ভিকুর মা কি দানবী? না মানবী? না দেবী?

রবীন্দ্রনাথ

কবিকথায় চতুর্থ আয়তন

আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন (Einstein) গণিতে ও পদার্থতত্ত্বে যে বিস্ময়কর আবিষ্কার করেছেন, তাতে বিজ্ঞান ও দর্শন উভয় ক্ষেত্রেই একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ—বস্তুর আয়তনের এই তিনটি মাত্রার সঙ্গেই আমরা পরিচিত ছিলাম। কিন্তু এর মধ্যেই বস্তুধর্মের বা আয়তনের সবটুকু পরিচয় নেই। আইনস্টাইনের আবিষ্কৃত উপহার হলো—চতুর্থ একটি মাত্রা অর্থাৎ কাল (Time as the fourth dimension)।

আইনস্টাইনের এই আবিষ্কারের কিছুদিন আগে এইচ্ জি ওয়েলস্ (H.G. Wells) তাঁর এক উপন্যাসে 'Time Machine' নামে একটি বিষয়কল্পনার উল্লেখ করেন। এটা অবশ্য গল্পকারের কল্পনাপ্রসূত আখ্যায়িকা মাত্র। কিন্তু কেউ কেউ এমন কথাও বলে ফেলেছেন যে, সময়কে (Time) আয়তনের চতুর্থ মাত্রা (dimension) হিসাবে প্রথম ওয়েলস্ সাহেব কতকটা আঁচ করেছিলেন।

কবি ও শিল্পীরা কার্লাইলের এর মতে দ্রষ্টা ; সহজ অনুভূতির জোরে তাঁরা সময় সময় দিব্য তত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করে ফেলেন। এবার দেখা যাক্ বাংলা সাহিত্য। বর্তমান বাংলার শ্রেষ্ঠ কবির রচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হলো। ১২৯১ সালে ভারতী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের লেখা,—

"এ জগতে সকল বস্তুরই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ—এই তিন প্রকারের আয়তন দেখা যায়। কিন্তু এই সকল আয়তনের অতীত আর এক প্রকার আয়তন আছে, তাহাকে কি বলিব খুঁজিয়া পাইতেছি না। তাহা অসীমায়তনতা বা আয়তনের অসীম অভাব। একটি বালু কণাকে আমরা যদি জড়ভাবে দেখিতে পাই, তাহা কতগুলি পরমাণুর সৃষ্টি। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই?...তাহা কি অনন্ত সময়ের সমষ্টি নহে?"

এর মধ্যে কাব্যোচ্ছ্বাস নেই, হেঁয়ালী নেই। যে কোন বিজ্ঞানী আজও এই ভাষাতেই Time theoryর ব্যাখ্যা করবেন। তবে বিস্ময়ের বিষয় এই যে, একজন কবি এই কথা এত স্পষ্ট লিখে গেছেন ৫৬ বৎসর আগে।

মৃত্যুং তীর্ত্বা

ভোর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। ৩২শে শ্রাবণের অশান্ত বাতাসে তখন শান্তিনিকেতন আশ্রমের তরুলতা গুল্ম বীথিকা হঠাৎ এক আক্ষেপে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সমস্ত রাত্রি ধরে আকাশজোড়া মেঘ গলে গলে পড়েছে অশ্রান্ত ধারায়। সুপ্তি শেষে যেন কোন বিগলিত বেদনায় সজলা পৃথিবীর এক প্রত্যুষে আধা আলো অন্ধকারের মধ্যে শুনলাম--"ভেঙেছো দুয়ার, এসেছো জ্যোতির্ময়।" সমস্ত নিসর্গ যেন মন্ত্রপুত হয়েছে। আশ্রমের বাতাসে এই আর্ত আলোড়ন, বৃষ্টির শব্দ ও জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ, তার সঙ্গে বৈতালিক দলের সুস্বর। মনে পড়লো, এক মহাকবি মর্তের বন্ধন ক্ষয় করে কালের যাত্রায় বিদায় নিয়েছেন। 'মৃত্যুং তীর্ত্বা' যে কবিসত্তা যাত্রীর বেশে অদৃশ্য হয়েছে, তাঁরই যাত্রাপথে মর্ত্যবাসীর এই অভিনন্দন।

'হে কবি দিবে না সাড়া'—এ দুঃখ অবশ্য আজ আমাদের কাছে সত্য। কিন্তু আজ আর শোকের বাসর নয়। আজ এক স্থিতপ্রজ্ঞ, সম্বুদ্ধ মহাকবির শ্রাদ্ধবাসর, যিনি অন্তরে মহা অজানার নির্ভর পরিচয় পেয়েছেন, বিরাট বিশ্ব বাহু মেলে তাঁকে নিয়ে গেছে আপন কক্ষে।

* * * *

পূর্ণকুম্ভ, আম্রপল্লব, কদলীবৃক্ষে সজ্জিত শ্রাদ্ধমণ্ডপ। প্রজ্জ্বলিত ঘৃতপ্রদীপের সারি। ধূপের ধোঁয়ায় সুরভিত বাতাস। কাষ্ঠমঞ্চের ওপর অজস্র শ্বেতপুষ্পের স্তবক। পুরোহিতের প্রার্থনায় ধ্বনিত হলো--'মনের দ্বারা আজ তোমার মনকে আহ্বান করি।' সহস্র নরনারীর হৃদয়ের মৌন শ্রদ্ধার আবেশে সেই ক্ষণে পরম অনুভবের মধ্যে কবি যেমন নূতন রূপে মূর্ত হলেন।

পুরোহিত আবার উচ্চারণ করলেন--"সকলেই আজ তৃপ্ত হউক। দেব যক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া দীনহীন সর্বপ্রাণী আজ তৃপ্তি লাভ করুক। ক্ষুধিত তৃষিত পাপরত ধর্মরত সবারই আজ তৃপ্তি লাভ হউক।" এই বাণীর আশ্রয়ে কবির জীবনের সাধনা অগ্রসর হয়েছিল, এই বাণী তাঁর জীবনে সকল রূপেতে ও ধ্বনিতে সার্থকতায় প্রসারিত হয়েছিল।

আমরা উপলব্ধি করেছি কবির লোকোত্তর রূপ। তাই এখন আর শোক করবার কিছু নেই। অজস্র দানে তিনি ভরে দিয়ে গিয়েছেন জাতির ভাণ্ডার। পৃথিবীকে তিনি মধুর করে গিয়েছেন সুরের সুরধনীর প্রবাহে। মানবতাকে সকল অপমানের ঊর্ধ্বে তুলে রেখে গেছেন অমিত মমতার শক্তিতে।

আমরা কবির জীবনে ভাববৈভব দেখে বিস্মিত হয়েছি। শতাব্দীর দুঃখ বেদনা, আশা আকাঙক্ষা তাঁর জীবনে বিচিত্র ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পেয়েছে বাণীরূপে। 'ছোট ছোট জন্মমৃত্যুর সীমানায়, নানা রবীন্দ্রনাথের একখানি মালা'। জীবনকে তিনি এইভাবে দেখেছেন, নিত্যবহমান এই অনিত্যের স্রোতে তিনি চঞ্চল জীবনের সদ্য মুহূর্তের দানে সত্যকে দেখেছেন। তাই সব চেয়ে আগে মনে পড়ে বিচিত্রের উপাসক কবির বাণী। তাঁর ভাববাদের এই নির্বিশেষত্ব তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রূপকথার শিল্পী করে তুলেছিল। তিনি বিশেষ কোন জাতীয় সংস্কৃতি, বিশেষ কোন যুগসংস্কৃতি, বিশেষ কোন সমাজ বা রাজনীতিঘটিত মতবাদের ব্যাখ্যাতা ছিলেন না। ভাবের দিক দিয়ে, চিন্তানুশীলনের দিক দিয়ে তাঁর প্রতিভা বিশেষ কোন পরিধির ভিতর সমাহিত ছিল না। মানুষের প্রত্যেক মোহকে, লোভ ও নিষ্ঠুরতাকে তিনি সতর্কবাণী শুনিয়ে গেছেন।

* * * *

আমাদের গর্ব করবার ও খুশী হবার কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে সম্মানিত করতে বিশ্ববাসী কার্পণ্য করেনি। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন আজ পৃথিবীবাসীর কর্মময় জীবনে সার্থক হয়নি সত্য ; নানা বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া, মূঢ়তা বঞ্চনায় আজ সমাজের স্বাস্থ্য বিকল। অক্ষমতার

অভিমানে মানুষ কাতর ; তবু কবির বাণীকে তারা বরণ করে নিয়েছে সত্যরত্নের মত। সমস্ত অশুভ আবিলতার মধ্যেও কবির বাণী জ্বলদর্চিরেখার মত ফুটে উঠেছে। আজ হউক, কাল হউক, সেই বাণী একদিন সার্থক হবে, যুগের সাধনাকে মৈত্রীর পথে টেনে নিয়ে যাবে। আমাদের দেশেই দেখেছি, যাঁরা কবির সমসাময়িক, তাঁরা অনেকে কবিকে বুঝতে পারেননি। দেশেরই প্রবীণ পণ্ডিত সমাজে কোথাও কোথাও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিতে কুৎসিত কুণ্ঠা দেখা গেছে, এই গ্লানি লজ্জাকর হলেও সত্য। ঠিক রবীন্দ্র-পরবর্তী পুরুষে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা অবশ্য স্বীকৃত হয়েছিল, কিন্তু তাঁর আদর্শের প্রশ্ন নিয়ে অজস্র বিরুদ্ধ সমালোচনা এমনকি কটূক্তিও করা হতো। তাঁর ভাববাদের প্রগতিশীলতাকে সে যুগের শিক্ষিত সমাজে সর্বত্র সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হয়নি। এমনকি, তাঁর মতবাদকে ভারতীয় সংস্কৃতির বিরোধী বলেও ঘোষণা করা হতো। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্য, দর্শন ও মতবাদকে শ্রেষ্ঠ সমাদর ও শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ ও মনন করেছে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী তৃতীয় পুরুষের অর্থাৎ পৌত্র-পুরুষের দল। রবীন্দ্রনাথের মনীষার মহত্ত্ব এই সুধীবৃন্দ উপলব্ধি করেছে প্রথম।

জাতির মনস্তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও আদর্শ পুরুষানুক্রমে এই ভাবে সাড়া দিয়েছে। এটা খুবই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয় যে, যত সময় যাচ্ছে, গুরুবাদের অত্যুগ্র স্তাবকতার ভ্রান্তি পরিহার করে রবীন্দ্র-প্রতিভার ঠিক ঠিক মূল্য আমাদের যেন ততটা বেশী করে বোধগত হচ্ছে। আরও একটা বিষয় স্মরণে রাখা উচিত। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা হঠাৎ-অভ্যুদিত কোন জ্যোতিষ্কের মত আসেনি। দীর্ঘকাল ধরে ধীর সাধনা ও অনুশীলনের বলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পের রাজ্যে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। প্রতিভা যে—'capacity for taking infinite pains'—এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনার মধ্যে। তিনি ভারতের নৈতিক ঐতিহ্য ও বাংলার প্রাক্তন কাব্যসাধকদের প্রতিভার উত্তম বিকাশ।

* * * *

রবীন্দ্রনাথর ভাববাদের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো আশাবাদিতা (optimism)। আশ্চর্যের বিষয়, জীবনের বন্ধনের সহস্র দুঃখ, আচারের সঙ্কীর্ণতা, মূঢ়তা ও 'বিরাট মৃত্যুর গুপ্তসঞ্চার' তাঁর কাছে অপ্রত্যক্ষ ছিল না। তিনি জানতেন, সুখ দুঃখের সমস্ত পরিণাম রেখে যেতে হবে এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী, সকল পরিচয়গ্রাসী নিঃশব্দ ধূলিরাশির মধ্যে। তবু শুভে অশুভে স্থাপিত জীবনের এই পাদপীঠে, জীবনের এই প্রচণ্ড মহিমার উদ্দেশে তিনি প্রণতি রেখে গেছেন। এ সত্ত্বেও কবির চক্ষে জীবনের জয়ন্ত রূপ সকল মোহ নিরাশার বাষ্প যবনিকা ভেদ করে এক একবার প্রত্যক্ষ হয়েছিল। এই সৃষ্টিমঞ্চে নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথিবীর ক্রোড়ে জীবনের নিত্য প্রসারতাকে তিনি অভিনন্দিত করে গেছেন ঃ—

দেখিতেছি আমি আজি—
এই গিরিরাজি,
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে,
অজানা হইতে অজানায়।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।
শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিতে পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট
সুদূর যুগান্তরে।

আমরা দেখেছি জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন লৌকিক সংস্কার, কোন আচারগত সঙ্কীর্ণতা,

জাতীয় অহমিকা, আভিজাত্যের ঔদ্ধত্যকে তিনি সর্বদা পরিহার করে গেছেন। কোন পদ্ধতির প্রতি প্রশ্নহীন নিষ্ঠা তিনি দেখাতে পারেননি। মনের ভীরুতা, চিন্তার জড়তাকে তিনি পাপ বলে মনে করেছেন। শিল্প সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি প্রায় অনেক ক্ষেত্রে বিপ্লবী ছিলেন। চিত্রে ও সংগীতে তিনি দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর মত নূতন নূতন জগতের রূপ, বর্ণ, গন্ধ, আলোক আহরণ করে এনেছেন। এ বিষয়ে কোন জাতীয় বা বিজাতীয় প্রশ্ন তাঁর সাধনাকে বিড়ম্বিত করেনি। সতত গতিময় এই জীবনের গানই তাঁর কাব্যের প্রাণ। তিনি দেখেছেন আকাশ পাথারে আলোক ও আঁধারের মধ্যে অবিরাম জোয়ার ভাঁটা চলেছে। দুরন্ত জীবন নির্ঝরিণী ছুটে চলেছে সহস্র ধারায়।

অজানার সুরে
চলিয়াছি দূর হতে দূরে
মেতেছি পথের প্রেমে।

* * * *

মহাকবির অধ্যাত্মকৃত্য। আশ্রমের গায়ক গায়িকার মিলিত কণ্ঠের সংগীতে শুনলাম-- 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে, যত দূরে আমি ধাই।' সেখানে বিচ্ছেদ বলে কোনও কিছু নেই। সেই কবিসত্তাকে আমরা আজ অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজ আর বিচ্ছেদের শোক নয়, কবির বাণী মনে মনে উচ্চারণ করে আজ আশ্বস্ত হব—

যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে, রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।

বিজ্ঞানী কবি রবীন্দ্রনাথ

কবি রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক নন। তিনি আসলে কবি ও দার্শনিক। কিন্তু তাঁর দর্শনে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বনিষ্ঠার অভাব নেই। বিষয়-বিচারের ক্ষেত্র থেকে তিনি বিজ্ঞানগত যুক্তিকে বর্জন করেননি। কবিকে শুধু কল্পনাশ্রয়ী যাঁরা বলেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাঁদের ধারণার সমর্থন পাবেন না। এটাই বড় সায়েন্সের খুঁটিনাটি, ফরমূলার ঘনঘটা ও টেস্টটিউবের কথা ও কাহিনী রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে স্থান পায়নি ঠিকই। কিন্তু তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধে, যা নিছক সাহিত্য নামে পরিচিত, তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তা, বিশ্লেষণ পদ্ধতি, তথ্য সন্নিবেশ অজস্রভাবে ছড়িয়ে আছে।

অল্পদিন হলো রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে 'বিশ্ব পরিচয়' লিখেছেন। এখানে তিনি স্পষ্টভাবে বৈজ্ঞানিক তথ্য বর্ণনা করবার প্রয়াস করেছেন এবং তার জন্য প্রামাণ্য সব গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। 'বিশ্বপরিচয়' বাংলা সাহিত্যের একটি সম্পদ সন্দেহ নেই। এই পুস্তক লেখার পেছনে কবির যে উদ্দেশ্য তা আরও মহৎ। তিনি বাংলাভাষী পাঠকের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা উজ্জ্বলতর ও আরও প্রখর করবার সদুদ্দেশ্য নিয়েই 'বিশ্বপরিচয়ে' তার উপক্রমণিকা লিখেছেন। সেইদিক দিয়ে এইখানি সার্থক হয়েছে।

শুধু 'বিশ্বপরিচয়' লেখার জন্য রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে ৪০/৫০ বৎসর পূর্বে রচিত কতকগুলি বিষয়াংশ উদ্ধৃত করা গেল। এর মধ্যে দুটো জিনিস লক্ষ্য করার বিষয়। প্রথম, রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক চিন্তার অগ্রগামিতা। দ্বিতীয়, কত প্রাঞ্জল ভাষায় বৈজ্ঞানিক থিওরিগুলিকে তিনি অপূর্ব স্বাচ্ছন্দ্যে গেঁথেছেন। সেদিনকার লেখা 'বিশ্বপরিচয়ে'র এক একটি অংশ উদ্ধৃত করে দেখাতে পারা যায় যে, তার ভাষা রবীন্দ্রনাথের এই পূর্বতন প্রজন্মের ভাষাকে প্রাঞ্জলতার গুণে খুব বেশি ছড়িয়ে যেতে পারেনি। কবি স্বয়ং নিজের স্বভাসুলভ সৌজন্যে বিশ্বপরিচয়ের ভূমিকায় তার 'অক্ষমতার' কথা তুলেছেন। কিন্তু অক্ষমতার কথা দূরে থাক, তিনি ৪০/৫০ বৎসর পূর্বে যে সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কবিতার চেয়েও মধুর ও মনোজ্ঞ করে লিখে গেছেন, তা পৃথিবীর সাহিত্যে বিরল।

আধুনিক কালে ফ্রয়েডীর মনোবিজ্ঞান ও আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব অথবা নব্য সমরবাদ মানুষের চিন্তাজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ইভলিউশন তত্ত্ব ও নব্য পরমাণুবাদ আধুনিক বিজ্ঞানীর গবেষণায় নতুনভাবে পরিপুষ্ট হয়েছে ; অনেক বিচিত্র তত্ত্বের রহস্য প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্য সমুদ্রে জাল ফেললে কৌতূহলী পাঠক এমন অনেক জ্ঞানশুক্তির সাক্ষাৎ পাবেন, যা তাঁকে বিস্ময়ে অভিভূত করবে। যে সব দুরূহ নতুন বৈজ্ঞানিক মতবাদ, মাত্র সেইদিন সুধীমহলে গোচরীভূত ও গ্রাহ্য হয়েছে, অনাবিল গদ্যে ও পদ্যে তারই পরিপ্রকাশ রবীন্দ্র-সাহিত্যের এক একটি অধ্যায়কে জ্যোতির্লিপ্ত করে রেখেছে। পরিভাষার বাহুল্য হয়তো তার মধ্যে নেই, গাণিতিক সংহতির অভাব হয়তো তার মধ্যে আছে, কিন্তু থিওরিগুলির বৈজ্ঞানিক রূপ অভ্রান্তভাবে তাতে ফুটে উঠেছে।

আধুনিক মনোবজ্ঞিানে 'নির্জ্ঞান মনের' থিওরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ডাঃ ফ্রয়েড ও তাঁর সমসাময়িক আরও কয়েকজন মনোবিজ্ঞানীর গবেষণাই এ থিওরীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। মনের গঠন সম্বন্ধে অনেক নতুন রহস্য আজ আমরা জানতে পারছি। রবীন্দ্রনাথের পুরাতন প্রবন্ধের একটি অংশ উদ্ধৃত করা হলো, যাকে Unconcious মনের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা হিসাবে ৪৭ বৎসর আগে লেখা।

—"স্বভাবত আমাদের মনের মধ্যে বিশ্বজগতের প্রতিবিম্ব এবং প্রতিধ্বনি ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা বিচিত্র রূপ ধারণ করে এবং অকস্মাৎ প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে গিয়া উপনীত হয়। যেমন বাতাসের মধ্যে পথের ধূলি, পুষ্পের রেণু, অসংখ্য গন্ধ, বিচিত্র শব্দ বিচ্ছিন্ন

পল্লব, জলের শিকড, পৃথিবীর বাষ্প--এই আবর্তিত আলোড়িত জগতের বিচিত্র উৎক্ষিপ্ত উড্ডীন খণ্ডাংশ সকল সর্বদাই নিরর্থকভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে ; আমাদের মনের মধ্যেও সেইরূপ, সেখানেও আমাদের নিত্য প্রবাহিত চেতনার মধ্যে কত বর্ণ, গন্ধ, শব্দ, কত কল্পনার বাষ্প, কত চিন্তার আভাস, কত ভাষার ছিন্ন খণ্ড, আমাদের ব্যবহার জগতের কতশত পরিত্যক্ত বিস্তৃত বিচ্যুত পদার্থসকল অলক্ষিত অনাবশ্যকভাবে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়।

যখন আমরা সচেতনভাবে কোন একটা বিশেষ দিকে লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করি তখন এই সমস্ত ছায়াময়ী মরীচিকা মুহূর্তের মধ্যে অপসারিত হয়, আমাদের কল্পনা, আমাদের বুদ্ধি একটা বিশেষ ঐক্য অবলম্বন করিয়া একাগ্রভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। আমাদের মন নামক পদার্থটি এত অধিক প্রভুত্বশালী যে, সে যখন সজাগ হইয়া বাহির হইয়া আসে, তখন তাহার প্রভাবে আমাদের অন্তর্জগতের এবং বহির্জগতের অধিকাংশই সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়--তাহারই শাসনে, তাহারই বিধানে, তাহারই কথায়, তাহারই অনুচর পরিচয়ে নিখিল সংসার আকীর্ণ হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখো আকাশে পাখীর ডাক, পাতার মর্মর, জলের কল্লোল, লোকালয়ের মিশ্রিত ধ্বনি, ছোট-বড় কত সহস্র প্রকার কলশব্দে নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে, এবং আমাদের চতুর্দিকে কত কম্পন, কত আন্দোলন, কত গমন, কত আগমন ছায়ালোকের কতই চঞ্চল লীলাপ্রবাহ প্রতিনিয়ত আবর্তিত হইতেছে—অথচ তাহার মধ্যে কতই যৎসামান্য অংশ আমাদের গোচর হইয়া থাকে ; তাহার প্রধান কারণ এই যে, ধীবরের ন্যায় আমাদের মন ঐক্য-জাল ফেলিয়া একেবারে এক ক্ষেপে যতখানি ধরিতে পারে সেইটুকুই গ্রহণ করে, বাকি সমস্তটাই তাহাকে এড়াইয়া যায়। সে যখন দেখে তখন ভালো করিয়া শোনে না, যখন শোনে তখন ভালো করিয়া দেখে না এবং সে যখন চিন্তা করে তখন ভালো করিয়া দেখেও না শোনেও না। তাহার উদ্দেশ্যের পথ হইতে সমস্ত অনাবশ্যক পদার্থকে সে অনেকটা পরিমাণে দূর করিয়া দিতে পারে। এই ক্ষমতাবলেই সে এই জগতের অসীম বৈচিত্র্যের মধ্যেও আপনার নিকটে আপনার প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারিয়াছে। আমাদের মনের ইচ্ছান্ধতা ইচ্ছাবধিরতার শক্তি আছে ; এবং এই শক্তি তাহাকে প্রতি পদেই ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত জগতের অধিকাংশই তাহার চেতনার বহির্ভাগ দিয়া চলিয়া যায়। সে নিজে বিশেষ উদ্যোগী হইয়া যাহা গ্রহণ করে এবং নিজের আবশ্যক ও প্রকৃতি অনুসারে গঠিত করিয়া লয় তাহাই সে উপলব্ধি করে, চতুর্দিকে এমনকি মানস-প্রদেশেও যাহা ঘটিতেছে, যাহা উঠিতেছে তাহার সে ভালোরূপ খোঁজ রাখে না।" ছেলে ভুলানো ছড়া (১৩০১) আইনস্টাইন প্রতিষ্ঠিত বস্তুর চতুর্থ আয়তন ও নব্য সময়বাদ এবং আধুনিক পরমাণু তত্ত্বের কথা অনেকেই পড়েছেন। প্রায় সাতান্ন বৎসর পূর্বে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে নিম্নোদ্ধৃত অংশ তার সঙ্গে তুলনা করা যাক।

"এ জগতে সকল বস্তুরই দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ এই তিন প্রকারের আয়তন দেখা যায়। কিন্তু এই সকল আয়তনের অতীত আর একপ্রকার আয়তন আছে, তাহাকে কি বলিব খুঁজিয়া পাইতেছি না। তাহা অসীমায়তনতা, বা আয়তনের অসীম অভাব।

"আমরা যাহাকে সচরাচর ক্ষুদ্রতা বা বৃহত্তর বলি, তাহা কোন কাজের কথা নহে, আমাদের চক্ষু যদি অনুবীক্ষণের মতো হইত তাহা হইলেই এখন যাহাকে ক্ষুদ্র দেখিতেছি তখন তাহাকেই অতিশয় বৃহৎ দেখিতাম, এই অনুবীক্ষণতা শক্তি কল্পনায় যতই বাড়াইতে ইচ্ছা কর ততই বাড়িতে পারে। অত গোলে কাজ কি, পরমাণুর বিভাজ্যতা তো আর কোথাও শেষ হয় নাই, অতএব একটি বালুকাকণার মধ্যে অনন্ত পরমাণু আছে, একটি পর্বতের মধ্যেও অনন্ত পরমাণু আছে, ছোট-বড় আর কোথায় রহিল? একটি পর্বতও যা পর্বতের ক্ষুদ্রতম অংশও তাই, কেহই ছোট নহে। কেহই বড় নহে, কেহই অংশ নহে সকলেই সমান। বালুকণা কেবল যে জ্ঞেয়তায় অসীম, দেশে অসীম তাহা নহে, তাহা কালেও অসীম,

তাহারই মধ্যে তাহার অনন্ত ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান একত্রে বিরাজ করিতেছে; তাহাকে বিস্তার করিলে দেশেও তার শেষ পাওয়া যায় না, তাহাকে বিস্তার করিলে কালেও তাহার শেষ পাওয়া যায় না। অতএব একটি বালুকণা অসীম দেশ, অসীম কাল, অসীম জ্ঞেয়তার সংহত কণিকা মাত্র। চোখে ছোটো দেখিতেছি বলিয়া একটি জিনিস সীমাবদ্ধ নাও হইতে পারে। হয়তো ছোট বড়র উপর অসীমতা কিছু নির্ভর করে না। হয়তো ছোটও যেমন অসীম হইতে পারে বড়ও তেমনি অসীম হইতে পারে, হয়তো অসীমকে ছোটই বল আর বড়ই বল সে কিছুই গায়ে পাতিয়া লয় না।"

যাহা কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত সকলি,
বালুকার কণা, সেও অসীম অপার,
তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ
কে আছে, কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে
বড় ছোট কিছু নাই সকলি মহৎ।

(ভারতী, ১২৯১ বৈশাখ)

বস্তুর Dimension সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ৫৭ বৎসর পূর্বে এই কথা লিখে গেছেন। তুলনামূলক বিচারের জন্য বিশ্বপরিচয়ের ভাষার নমুনা দেওয়া হলো ঃ

"একদা জগতের সকলের চেয়ে মহাশ্চর্য বার্তা বহন করে বহু কোটি বৎসর পূর্বে তরুণ পৃথিবীতে দেখছিল আমাদের চক্ষুর অদৃশ্য একটি জীবকোষের কণা। কী মহিমার ইতিহাস সে এনেছিল কত গোপনে। দেহে দেহে অপরূপ শিল্প সম্পদশালী তার সৃষ্টিকর্ম নব নব পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অনবরত চলে আসছে।"

—"নক্ষত্র জগতের দেশকালের পরিমাপ পরিমাণ গতিবেগ দূরত্ব ও তার অগ্নি-আবর্তের চিন্তনাতীত প্রচণ্ডতা দেখে যতই বিস্ময় বোধ করি, একথা মানতে হবে বিশ্বে সকলের চেয়ে বড় আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষ তাদের জানছে এবং নিজের আশু জীবিকার প্রয়োজন অতিক্রম করে তাদের জানতে চাচ্ছে।"

প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে 'বিশ্বপরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, পুরাতন রচনা থেকে উদ্ধৃত করা গেল। ইভল্যুশন মতবাদও এ প্রসঙ্গে তুলনা করে দেখতে পারা যায়।

(সোনার তরী, ১৭ই চৈত্র, ১২৯৯)

"এক সময় যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠতো, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত...আমার এই মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে—সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর করে কাঁপছে।" (ছিন্নপত্র)

বিশ্বপরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ মাত্র প্রবন্ধকারের কর্তব্য নিয়ে নেমেছেন। নিঃসন্দেহ সাফল্যও অর্জন করেছেন। কিন্তু যে অন্তর্দৃষ্টির বলে, সূক্ষ্ম চিন্তাপরায়ণতার বলে তিনি স্বয়ং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উপলব্ধি করে অত্যদ্ভুত প্রাঞ্জল ভাষায় গদ্যে ও পদ্যে পরিবেশন করে গেছেন, তাকেই আমরা রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণতার ও পরম সাহিত্যিকতার নিদর্শন বলে মনে করি। এর তুলনা নেই। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী কবি।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ

আজ থেকে প্রায় একশত বৎসর আগে বিখ্যাত ভারতশাস্ত্রজ্ঞ ম্যাক্সমূলার মহারানী ভিক্টোরিয়ার কাছে লিখিত এক পত্রে জানিয়েছিলেন, "আপনাকে আমি এমন একটা দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে-দেশে মানুষের জ্ঞানের প্রথম ঊষা দেখা দিয়েছিল। সে দেশের নাম ভারত।"

ম্যাক্সমূলার যে সময় এই উক্তি করেছিলেন, সে সময় ভারত সম্বন্ধে অন্যান্য দেশের মানুষের মনের ধারণা স্পষ্ট ছিল না এবং অস্পষ্টভাবে যা ছিল সেটা ভারতের পক্ষে গৌরবজনক নয় এবং ঐতিহাসিকভাবে নির্ভুলও নয়। বাইরের মানুষের ধারণার কথা ছেড়ে দিই ; ভারতীয় জনসাধারণেরই মনে নিজের দেশের সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য সম্বন্ধে ধারণার অভাব ছিল। ভারতের জীবনে সাংস্কৃতিক তত্ত্বের চর্চা এবং চেতনা অবনতির কোন্ স্তরে নেমে গিয়েছিল, সেটা অনুমান করতে পারি, যখন শুনি যে, ব্রিটিশ আগমনের পূর্বের কয়েকশত বৎসরে ভারতে এমন একজনও ব্যক্তিকে দেখা যায়নি, যিনি ব্রাহ্মী ও মরেস্টি অক্ষরে উৎকীর্ণ ভারতীয় শিলালিপিগুলি পড়তে পারেন। ভারত-ইতিহাসের এটা একটা দুঃখকর অথচ বাস্তব সত্য যে ভারতবাসী অনেকবার তার নিজের ঐতিহাসিক পরিচয় ভুলেছে, রাজনৈতিক দুর্বিপাকের কারণেই হোক বা নিজেরই অন্য কোনও সামাজিক ও মানসিক হানির কারণেই হোক। ভূ-তত্ত্বের ইতিহাসের এমন এক একটি অধ্যায় দেখা গিয়েছে যখন বিগত লক্ষ বৎসরের সৃষ্টি প্রাণীজীবন বা উদ্ভিদ জীবন এক কঠিন তুষারের আবরণে চাপা পড়ে গিয়েছে প্রাণের উৎসব স্তব্ধ করে দেয় এরকম এক একটা তুষার যুগ এই পৃথিবীর ভূ-তত্ত্বে যেমন দেখা গেছে তেমনি এক একটি দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসও দেখা দিয়েছে। ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনেও যেন এক একবার সাময়িক তুষার যুগের প্রকোপে অভিভূত হয়েছিল। বিস্মৃতির সমাধিতে স্তব্ধীভূত হয়েছিল জাতির চিন্তাগত প্রাণের স্পন্দন।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বের শতাব্দীতে বিশেষ করে প্রাক্-রামমোহন একটি শতাব্দীকে, ভারতীয় সংস্কৃতির একটি তুষার যুগ বললে খুব বেশি অত্যুক্তি করা হবে না। ম্যাক্সমূলার যেদিন জ্ঞানের প্রথম ঊষার কথা বলেছিলেন প্রায় ঠিক সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। এবং সেই রবীন্দ্রনাথেরই এক ভারত-বন্দনায় ম্যাক্সমূলারের সেই উপলব্ধিরই নতুন প্রতিধ্বনি একদিন শুনতে পাওয়া গেল। ভুবন মনমোহিনী ভারতভূমিকে উদ্দেশ্য করে কবি বললেন ঃ

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে।

কবির এই বাণীতে যেন ভারতভূমিরই আদিম ইতিহাসের পরিচয় ধ্বনিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, সুদূর অতীতে টেথিস সমুদ্র নামে আদিম সমুদ্রের বক্ষে মৃত্তিকার যে প্রথম অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছিল তাই বোধহয় আদি ভূমি। অভ্রভেদী হিমালয়ের পাষাণ পস্তরে আজিও সেই আদিম সমুদ্রের শঙ্খশুক্তির অস্থি সমাহিত রয়েছে দেখা যায়। সুতরাং অনুমান করতে বাধা নেই যে এই প্রথমা ভূমির বক্ষেই প্রাণীজীবনের প্রথম অভ্যুদয় এবং লক্ষ লক্ষ বৎসরের সংসারলীলা সম্পন্ন হয়েছে। আজিও শিবালিক গিরিভূমিতে যে প্রাচীন প্রাণীদেহের এক মহাশ্মশান দেখা যায় সেইসব প্রাণী জীবদেহের বিবর্তনের এক অত্যুন্নত পরিণামের সাক্ষ্য। বৈজ্ঞানিকরা এখানে আরও এক বিস্ময়কর আবিষ্কার করেছেন—প্রাচীনতম নরদেহের নিদর্শন। নৃতাত্ত্বিকের ভাষায় তার নাম "শিবপেথিকাস"। নামটি তাৎপর্যময়। 'নমি নরদেবতারে'—যে ভারতকবির বাণীতে এ ঘোষণা আমরা শুনেছি তাঁরই মাতৃভূমি ভারতের মাটিই কি নরদেবতার কায়া লাভের আদি পীঠস্থান? শিবকে আমরা 'মহাকাল' আখ্যা

দিয়েছি। এই মহাকালই হলেন এক যোগী, যিনি কল্পনাতীত যুগ হতে এই জড় ও প্রাণের পৃথিবীতে বস্তুর যোগসাধন করে আসছেন,--অঙ্গে অঙ্গে, অস্থিতে অস্থিতে, তন্তুতে তন্তুতে সম্মিলিত ও সমন্বিত হয়ে জড় ও জীবনের রূপ এক অবিরাম এভল্যুশনের প্রবাহে রূপান্তরিত হয়ে আসছে। সেই রূপান্তরের এক বিরাট ইতিহাসের আধার এই ভারতভূমি, যার আদিকালের সাক্ষ্য এ ভূমির শিলায়, উদ্ভিদে ও প্রাণীজীবনে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

বৈজ্ঞানিকভাবে সত্যই হোক আর কল্পনাই হোক, ভারতের ভূমির ইতিহাসের একটা অতিদূর অতীত আছে। অতীতের সে ভূমিতে রূপ রস গন্ধ স্পর্শের বৈচিত্র্যকে আহ্বান করে, চেতনার রঙে রাঙা করে দিয়ে দেখা দিয়েছিল একটি প্রভাত ; সে প্রভাতকে পৃথিবীর প্রথম প্রভাত বললে ভুল হয় না। কিন্তু 'ভারতবর্ষ' তখন দেখা দেয়নি। এ শুধু ভারতের ভৌম কায়ার পরিচয়। আমাদের প্রশ্ন হলো, কবে পেলাম ভারতবর্ষকে? এবং সেই ভারতবর্ষ বলতেই বা কি বুঝি? এই হিমালয়ের কোলে লালিত ভূমিই তো শুধু ভারতবর্ষ নয়। কলনাদিনী গঙ্গায় সলিলধৌত উপত্যকা ভূমিই তো শুধু ভারতবর্ষ নয়। ব্রহ্মপুত্র থেকে আরম্ভ করে পশ্চিম মরুপ্রান্তর পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষের সুখ-দুঃখের এই আঙিনাটি তো শুধু ভারতবর্ষ নয়। এর ওপরেও আছে ভারতবর্ষ, এর গভীরে আছে ভারতবর্ষ এবং সেই ভারতবর্ষকেই কবির ভাষায় বলা যায়--আমাদের 'সনাতন স্বদেশ'। ভূমির রূপ বদলাতে পারে, কিন্তু সনাতন উপলব্ধির সত্যটি নিয়ে মানুষের যে অন্তর্জগৎ গড়ে উঠেছে সেই জগৎ বদলায় না। ভারত নামে এই ভূমির যে মানুষটির মনে মানবীয় জীবনেরই এক পরম সত্যোপলব্ধির প্রসন্নতা দেখা দিয়েছিল, তিনিই প্রথম ভারতীয় এবং তারই চিত্তভূমিতে ভারতবর্ষের সৃষ্টি।

আজিকার অথবা অতীতের ভারতবাসীর চিন্তায় আচরণে এবং আগ্রহে যা কিছু দেখা গিয়েছে, তার সবই যথার্থ ব্যাপার, এমন ধারণাকে কবি রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই প্রশ্রয় দেননি। ভারতবাসীর আচরণে অভারতীয়তা বহুবার ঘটেছে, এবং আজও ঘটছে। পণ্ডিত নেহরু সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলেছেন—পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষ হলো সেই দেশ, যে দেশে মানবজীবনের সর্বোত্তম আদর্শ ঘোষিত হয়েছে। এবং ভারতবর্ষই হলো একমাত্র দেশ, যেখানে আদর্শ ও আচরণের মধ্যে বৃহত্তম পার্থক্য ঘটতে দেখা গেছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমাদের প্রকৃতির অন্তরতম কক্ষে যে ভারতবর্ষ রহিয়াছেন—।" এই উক্তি হইতেই বোঝা যায় ভারতবর্ষ বলতে তিনি আন্তরিক কোন বস্তুকে বুঝেছিলেন। অন্যভাবে বলা যায়, কবি যাকে ভারতবর্ষ বলেছেন সে হলো একটি তত্ত্ব। কবিরই আর এক বাণীতে যখন শুনি—'মিশেছে মোর দেহের সনে--মিলেছ মোর প্রাণে মনে' তখন স্পষ্টই বোঝা যায় ভারতবর্ষ একটি দেশমাত্র নয়, ভারতবর্ষ একটি 'আইডিয়া'। এই আইডিয়ারও একটি ইতিহাস আছে ; বহু শত বৎসরের সন্ধানের ইতিহাস। ভারতশাস্ত্রজ্ঞ স্যার জন উডরফের উক্তি এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে—'ভারত একটি ভৌগোলিক সত্তা নয়, ভারত হলো জ্ঞানের প্রতীক।'

প্রাচীন ঋষি কবি এই ভারতভূমিকেই ধরিত্রীরূপে বন্দনা করেছিলেন। ভারতকবি রবীন্দ্রনাথও বিংশ শতাব্দীর ভারতভূমিতে দাঁড়িয়ে তাঁর উপলব্ধিকে প্রকাশ করলেন—'হেথায় নিত্য হের পবিত্র ধরিত্রীরে।' বেদের বসুন্ধরা সূক্ত হতে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর ভারততীর্থ কবিতা পর্যন্ত কয়েক সহস্রব্যাপী ভাবনার যুগ একই উপলব্ধির সূত্রে যেন যুক্ত হয়ে রয়েছে। কল্পনা করতে পারি, সরস্বতীর তীরে যাযাবর জীবন হতে কৃষকজীবনে প্রথম দীক্ষিত যে মানুষ পর্ণকুটীরের আঙিনায় দাঁড়িয়ে এই বিরাট ভারতীয় নিসর্গের রূপ এবং বৈচিত্র্য দেখে বলে উঠলেন, "কুতো ইয়ং বিসৃষ্টিঃ", কোথা থেকে এল এই সৃষ্টি, তিনিই হলেন পৃথিবীর প্রথম জিজ্ঞাসু। সেই মানুষের মনে এক পরম জিজ্ঞাসার সূত্রপাত। এই জিজ্ঞাসাই মানুষের মনের প্রথম অ্যাডভেঞ্চার। প্রথম বিস্ময় এই জিজ্ঞাসারূপেই মানুষকে এক উপলব্ধি থেকে

আর এক উপলব্ধিতে এগিয়ে নিয়ে এসেছে এবং সরস্বতী তীরের সেই আর্য একদিন আর এক বিস্ময়কর সত্য আবিষ্কার করলেন, এই আকাশ এক মহাপ্রাণে বিধৃত। সকল জড় ও জীবনের বাহির ও অন্তর ছাপিয়ে রয়েছে এক প্রাণ, সে প্রাণও অখণ্ড। বিশ্বের সকল প্রাণ এক দিব্য প্রাণ হতে উদ্ভূত, এই তত্ত্বের সাক্ষাৎ সেই আর্য ভারতের চিত্তভূমিকে যে উর্বরতা দান করেছিল তার সুফল ফলতে বেশি দেরী হয়নি। জিজ্ঞাসার অভিযান একদিন এক অতি মহৎ উত্তরালাভের সার্থকতায় মণ্ডিত হয়ে উঠলো ঃ

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে দিব্যানি ধামানিতস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষম মহান্তম
আদিত্যবর্ণং তমসৎঃ পরস্তাৎ।।

শোনো বিশ্ব, দিব্যধামবাসী আমরা অমৃতের পুত্র। তমিস্রার ওপারে আদিত্যবর্ণ যিনি বিরাজমান সেই মহান পুরুষকে আমরা জেনেছি। এই উপলব্ধির মধ্যে এতকালের সেই জিজ্ঞাসার একটি পরিসমাপ্তি দেখা যায়। ভারতের আবির্ভাব এই উপলব্ধির মধ্যেই। "প্রকৃতির অন্তরতম কক্ষে" যে ভারত সেই ভারতকে প্রথম পাওয়া গেল এই অমৃততত্ত্বের মধ্যে। এখানেই ভারতের সূচনা, ভারতের পথ পরিক্রমার ইতিহাসের আরম্ভ তার নতুন সন্ধানের যাত্রা শুরু। আমরা কে, এই পরিচয় পেয়ে গেলেন ভারতের প্রথম ব্রহ্মবিদ। মানবজীবনের সঙ্গে সেই অনন্ত মহাপ্রাণতার সম্পর্কই বা কি, তারও রহস্য জানা হয়ে গেল।

ভারতবর্ষের মানুষের ইতিহাসে একটা বৈশিষ্ট্য বেশি করেই চোখে পড়ে। ভারতীয় মানুষের প্রথম প্রয়াস হলো তার অন্তর্গঠনের দিকে। প্রথম জিজ্ঞাসাও অন্তরতম রহস্যেরই দিকে। সে যুগের আর্য ভারত বৈষয়িক সম্পদে এমন কিছু অগ্রসর ছিল না। বরং জানা যায় যে, কোনও কোনও আর্যোত্তর সমাজের মানুষ নগর প্রতিষ্ঠায় বা অন্যান্য বৈষয়িক কৃতিত্বে আর্যের তুলনায় বেশি অগ্রসর ছিল। কিন্তু আর্যের প্রতিভা প্রথম হতেই ছিল অন্তর্মুখী। এবং এই অন্তর্মুখী সাধনার ফলে সে আর্যে যে ঐশ্বর্য লাভ করেছিল যে ঐশ্বর্যকে আজিকার পৃথিবীও মানবীয় প্রজ্ঞার চরমোৎকর্ষ বলেই মনে করে।

ভারতের আন্তরিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে ঐশ্বর্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আগে, বৈষয়িক ঐশ্বর্যের প্রতিষ্ঠা পরে। ভারতীয় ইতিহাসের এই এক বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা জাতির প্রকৃতি প্রভাবিত হয়ে থাকে, এ সত্য তিনি অন্য জাতির ইতিহাসেও লক্ষ্য করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা জিওপলিটিক্স-এর আলোচনা করেছিলেন। দ্বীপবাসী মানুষ সহজেই সমুদ্রযাত্রায় অভ্যস্ত হয় এবং বাণিজ্যিক প্রবণতা লাভ করে। মরুবাসী মানুষের মনেও তেমনি দিগ্বিজয়ের আগ্রহ দেখা গেছে। ভৌগোলিক কারণে প্রাচীন ভারতের মানুষ এমন এক নিরাপদ জীবনের আশ্রয়লাভ করেছিল, যেটা তার চিত্তকে অন্তর্মুখী করে তুলবার সহায়ক হয়েছে। দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্ন ও নিরুদ্বিগ্ন অবস্থায় লালিত প্রাচীন ভারতীয় তার চিত্তের নিভৃতলোকে জিজ্ঞাসার অভিযান চালিত করে মানবজীবনেরই দুরূহ আত্মিক তত্ত্বের সন্ধান লাভ করতে পেরেছিল। সেই উপলব্ধিকে বলতে পারি 'চিন্ময়' ভারতের আবিষ্কার।

কিন্তু একথা সত্য নয় যে, ভারতবাসী চিরকাল তার জীবনযাত্রার. সামাজিক জীবনের অথবা সংস্কৃতির ক্ষেত্রের এই উপলব্ধির এই মর্যাদা রক্ষা করতে পেরেছে। আজিকার ভারতের দিকে তাকিয়েও একথা বলতে পারি না যে, এ ভারত তার ঐতিহাসিক আত্মিক উপলব্ধির মর্যাদা রক্ষা করে চলেছে। ভারতীয় ইতিহাসে সেইসব যুগ ও যুগের অধ্যায়গুলিকে আমরা গৌরবের যুগ বলে মনে করি, যে যুগে ভারতীয় জীবনে তার উপলব্ধিগত সত্যকে

মর্যাদা দেবার প্রয়াস সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারতীয় ইতিহাসের এবং ভারতীয় জাতীয় জীবনের বহু ভ্রান্তির, ত্রুটির এবং তত্ত্বহীনতার দুঃখকর পরিণাম লক্ষ্য করেও একটি সত্য উপলব্ধি করা যায় যে, সে আত্মিক উপলব্ধির কিছুটা প্রভাব জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভারতজীবনে সফল হয়েছে। দৃষ্টান্ত, ভারতীয় মানুষ কোনওদিন পরদেশ আক্রমণে প্রলুব্ধ হয়নি এবং পররাজ্যকে রূঢ় শক্তির দ্বারা প্রপীড়িত করেনি। পররাজ্যে ভারতীয় প্রভাব বলতে বিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক প্রভাবই বোঝায়।

অমৃত তথা অনন্ততার সত্য উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয়ের উপলব্ধি আকাশ শত শত তত্ত্বের জ্যোতিষ্কে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেই ভারতীয় উপলব্ধি করলেন, এক সদ্বিপ্রা বহুদা বদন্তি। তিনি এক, কিন্তু জ্ঞানীরা তাঁর বহু পরিচয় প্রচার করেন। আরও মহৎ উপলব্ধি এই যে, সেই এক হলেন সর্বানুভু, তিনি জলেও আছেন, অগ্নিতেও আছেন। যস্য ছায়ামৃত যস্য মৃত্যু--যাঁর ছায়া অমৃত, তাঁরই ছায়া হলো মৃত্যু। তিনি আনন্দস্বরূপ, সর্বপদার্থ সেই আনন্দ হতে উদ্ভুত। "ভূমা", রূপবহুল এক পরম প্রকাশ, বিরাট এক পরমেশী ইচ্ছার তরঙ্গ যেন নিখিল সৃষ্টিকে অভিষিক্ত করে রেখেছে। এই সব উপলব্ধির সম্মিলিত সুরকে বলতে পারি মানবহৃদয়ের মহান ওঙ্কার এবং কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তার স্বীকৃতি শোনা যায়-- 'হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা ওঙ্কারধ্বনি।' একদিন সত্য সত্যই ভারতীয় জ্ঞানের উপলব্ধির জগতে পরম সত্যের পরিচয় আরও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল--

'ওঁ পিতা নোঽসি, ওঁ পিতা নোবোধি।' পিতা তুমি আছো, পিতা, তুমি আমাদিগকে এই বোধি দাও যে তুমি আছো। অনন্ত স্বরূপকে 'পিতা' রূপে উপলব্ধি করা ভারতীয় ঋষির আর এক বিরাট ভাবের আবিষ্কার। বোধি তথা অধ্যাত্ম সত্যের উপলব্ধির দ্বারা মণ্ডিত হয়ে অতি শ্রেয়স্কর এক হিউম্যানিজমের উদ্ভব। এখানে মানবীয় অনুভবের সিংহদ্বার যেন হঠাৎ খুলে গেল, 'পিতা' কল্পনায় তত্ত্বও সহজ মানবিকতায় পরিণতি লাভ করেছে। এখানেই ভারতীয় হৃদয়ে প্রার্থনার সূত্রপাত। দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়রে দেবতা, এই সরল ভক্তিবাদ, প্রেম সম্পর্ক ও সত্যের সঙ্গে আপন হবার আকুলতা প্রথম দীক্ষা। কি চাই? কি চাই? মানবজীবনেরই পরম প্রাপ্তব্যের পরিচয় উদঘাটিত হয়ে গেল। চাই বোধি।

এই অনুভব ভারতের শিল্পকলা ও কাব্য-সঙ্গীত ইত্যাদি সাংস্কৃতিক সাধনার উৎস হয়ে উঠল। ভারতীয় সাংস্কৃতিক সৃষ্টির সকল অনুশীলন এই দিব্য অনুভবেই অনুপ্রাণিত হয়েছে। তাই ভারতীয় শিল্পের যা প্রকৃত লক্ষ্য, সেই 'রস' বস্তুত ব্রহ্মস্বাদসহোদর। ভারতীয় স্থাপত্য ভাস্কর্যের মতো শিলাশিল্পেও যে রূপতত্ত্ব ভারতের হাতে ফুটে উঠেছে, তার মধ্যে হাতের চেয়েও মনের পরিচয় বেশি করেই পাওয়া যায়, সে পরিচয় হলো রসসৃষ্টির প্রয়াস, দিকে দিকে দেখা যায়, বিদর্ভ, বিরাট ভারতীয় ইতিহাসে বৈষয়িক ঐশ্বর্যেও উন্নত কত রাজ্য দেখা দিল, আর অন্তর্হিত হলো। শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতীয়ের কর্মবহুল সাধনায় বহু সফল কীর্তির সাক্ষাৎ পেলাম। এই বৈষয়িক জীবনকেও ভারতীয় জ্ঞানী কয়েকটি মূলমন্ত্রে গঠিত করবার চেষ্টা করেছেন। সহ নৌ ভুনক্তু, সহ নাববতু, সহবীর্যং কারবাবহৈ। অথবা, সমানোমন্ত্রঃ সমিতির সমান সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্। সহযোগিতাই সমাজের ধারক এবং সমান প্রাপ্তিই সামাজিক মর‍্যালিটির শ্রেষ্ঠ সূত্র। সামাজিক আচরণে এই মূল মর‍্যালিটির প্রতিষ্ঠা ভারতীয় জ্ঞানীর আর এক মহৎ কীর্তি। আজ ভেদবাদে ও বৈষম্যে মানুষের প্রীতির জীবন কুণ্ঠিত ও শান্তি বিড়ম্বিত। এই অপ্রীতির ও সামাজিক অসূয়ার প্রধান কারণ যে বৈষম্য ও 'প্রতিযোগিতা' হতে উদ্ভূত সেই কারণ অপসারণের প্রথম নীতিটি ভারতীয় মনীষায় প্রাচীন ঐতিহ্য থেকেই আমরা পেয়েছি, যদিও সব সময় কিংবা সর্বক্ষেত্রে তার মর্যাদা ভারতবাসী রাখতে পারেনি। ভারতের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করে ডাঃ হাটনের মতো বৈদেশিকও বুঝতে পেরেছেন যে, ভারত জীবনে--

'Individualism is a laterday growth,
Ancient India was more socialistic.'

আজকাল কো-একজিসটেন্স নামে একটা কথার চল হয়েছে। কথাটা কিন্তু ভারতীয় চিন্তাশীলের কাছে কিছুই অভিনব নয়। ভারত যে একত্বের সাধনার কথা বলে থাকে, সে একত্ব হলো বৈচিত্র্যকে সমন্বিত করা, বৈচিত্র্যকে বিনাশ করা নয়। 'তারা সবাই বিরাজে।' পশ্চিমী ঐক্যের তুলনায় ভারতীয় ঐক্যবাদের বৈশিষ্ট্য এখানেই। সহ নাববতু, এই নির্দেশের মধ্যেই অপরকে স্বীকার করা, অপরের সহযোগিতা গ্রহণ করা এবং অপরকে সহযোগিতা দান করার সামাজিক ধর্ম ব্যক্ত হয়েছে। সেই সামাজিক ধর্মেরই জয় ঘোষিত হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় মনীষার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথেরই বাণীতে—'কেহ নহে নহে দূর' অথবা 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে' কিংবা 'ধরো হাত সবাকার' এবং 'হেথায় সবারে হবে মিলিবারে'। ভারত সেই সত্যকে (?) স্বীকার করে না যে—সত্য খণ্ডকালের পরিধির মধ্যেই সত্য অথবা, যে নীতি মানুষে মানুষে ভেদের প্রাচীর বড় করে তোলে। বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু সাহিত্য ও বহু ধর্ম—মানব-সংসারের জীবনচর্চার এই বহুত্বকে জীবনেরই বৈচিত্র্যরূপে স্বীকার করেছে ভারত। তাই রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে নতুন করে ভারতের মর্মবাণীর ঘোষণা শুনতে পাই—'বিশ্বজনের কল্যাণে আজ ঘরের দুয়ার খোলো গো'। বিশ্বের সঙ্গে যোগ, ভারতীয় ভাবনার এই এক বৈশিষ্ট্য এবং চিন্তার ক্ষেত্রে এই বিশ্বতোমুখী দৃষ্টি অথবা অনুভবকে ভারতীয়তার প্রধান লক্ষণ বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথ বলেন—পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষ 'নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে।' রবীন্দ্রনাথের সকল চিন্তা ও বাণীর মধ্যে এই বিশ্বভারতীয়তার সুর নতুন করে ধ্বনিত হয়েছে। তাই কবি সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন, এ ভারত মহামানবের সাগরতীরের এক পুণ্যতীর্থ। এ ভারত মিলনধর্মেরই জয়গান করে। সমগ্র জড় ও জীবনের আধার প্রকৃতিকে এক মহামিলনের রঙ্গ-ভূমি বলে মনে করতে পারে, ইংরেজ কবি শেলীর চোখেও এই প্রাকৃতিক সত্যটিও ধরা পড়েছিল যে—All things by a law divine in one another being single.

সৃষ্টির সমগ্র পদার্থই এক মহামিলনের অথবা যৌগিক সমন্বয়ের পরিণাম। বিভেদটাই এ জগতে অস্বাভাবিক, স্বাভাবিক হলো মিলন। ভারতে একটি অভিনব শিল্প দেখা যায়, যেটা অন্য কোনও দেশে দেখা যায় না অথবা তার অল্পই পরিচয় পাওয়া যায়। ছন্দোবদ্ধ কাব্য অথবা মহানাট্য রচনার মতোই ভারতের শিল্পী-মন ভারতভূমির সর্বত্র এক একটি তীর্থ স্থাপন করেছে, যেগুলিকে বলা যায় প্রকৃতির সাহায্যে কাব্য সৃষ্টি। যেখানে চিরন্তনতার সাক্ষ্য বেশি স্পষ্ট, যেখানেই মিলনের ধর্ম সার্থক, সেইখানেই ভারতীয়ের তীর্থ। বিশাল হিমালয়ের ক্রোড়ে স্থাপিত হয়েছে ভারতের বদরী বিশালের বিগ্রহ। জাহ্নবী যেখানে মহাসাগরের সঙ্গে মিলেছেন, সেখানে ভারতীয়ের তীর্থ।

মহাসমুদ্রের কল্লোল যেখানে অনন্তের ঢেউ পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে, সেখানে স্থাপিত হয়েছে জগন্নাথ। এই মিলনধর্মের প্রেরণায় ভারতীয় ধার্মিক এবং ভারতীয় সামাজিক এমন পেট্রিয়টিজমের সূত্র ঘোষণা করেছেন, যার তুলনা পাওয়া যায় না। ভারতীয়ের এই জাতীয়তা বা স্বাদেশিকতার সংজ্ঞা বিশ্বজনীন তাৎপর্য ও মহত্ত্ব লাভ করেছে। এমন উপলব্ধি ছিল বলেই ভারতীয় সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বলতে পেরেছেন—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ। ভাগবৎ পুরাণ বলেছেন—এ ভারত হলো বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণ, ঋষি বলেছেন—দিব্যধাম এবং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—মহামানবের পুণ্যতীর্থ।

এই ভারততত্ত্ব এমনইভাবে কবি রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিতে সহজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল যে, ভারতীয় নিসর্গের রূপের ভেতর দিয়েই তিনি অনন্ততার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। এই ভারতের আকাশের দিকে তাকিয়েই সাধিকা মীরাবাঈ বলেছিলেন—গগনমণ্ডল সেজ পিয়াকি।

এ আকাশ যে প্রিয়ের বাসরশয্যা। সাধক নানকজী এই ভারতের আকাশের দিকেই তাকিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন, ঐ গগনের থালায় সাজানো রবিচন্দ্রদীপক ধবমণ্ডলের আরতি করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই সাধকোচিত কাব্যস্ফূর্তির পরিচয় পাই। ভারতের যমুনা কবিরই হৃদয়-যমুনা হয়ে গিয়েছিল। অভ্রভেদী হিমগিরির মধ্যে তিনি দেখেছিলেন--'অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত ভারতের অনন্তসঞ্চিত তপস্যার মতো'। এবং এই হিমবান পর্বতের 'মৌনীশৃঙ্গে শান্তম শিবম ও অদ্বৈতম-এর সন্ধান' করেছিলেন।

ভারতীয় প্রকৃতির ষড়-ঋতুর বিচিত্র রঙ্গলীলার মধ্যে তিনি এক মহাসুন্দরের আসা-যাওয়ার পদধ্বনি শুনেছিলেন, ভারতের বৈশাখ যেমন এক দীপ্তচক্ষু সন্ন্যাসী, বিশাল বৈরাগ্যের গৈরিক ছড়িয়ে দিয়ে তপস্যায় মগ্ন হয়ে রয়েছেন। ঈশানের পুঞ্জমেঘের উদাত্ত ধ্বনিকে তিনি 'বেদগাথামন্ত্রসম' বোধ করেছিলেন।

এ ভারতবর্ষে রাজসিকতারও চরম বিকাশ দেখা গিয়েছে। ঐশ্বর্যের বিলাস, রাজশক্তির বৈভব এবং আড়ম্বর ও সমারোহও ভারতজীবনে দেখা দিয়েছিল। রোম্যাণ্টিক ভারতেরও পরিচয় আমরা পেয়েছি, সেই শ্যামজম্বুবনচ্ছায়ে দশার্ন গ্রাম, প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা। ঐশ্বর্যের ভারতবর্ষকে দেখেছি--যেথা শিপ্রা নদী নীরে হেরে উজ্জয়িনী স্ব-মহিমচ্ছায়া। প্রতাপী রণপতির রণাশ্বের হ্রেষা শোনা গেছে। শোনা গেছে দৃপ্তহস্তের অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে এ ভারত ভারতের প্রকৃত রূপ নয়, প্রকৃতিও নয়, প্রকাশও নয়। কবির মতে প্রকৃত ভারত রয়েছেন এই রাজসিক সমারোহ এবং বৈষয়িক বৈভবের নেপথ্যে। ভারতীয়ত্বের সন্ধান পাই সেখানে, যেখানে নৃপতিদল রাজ্যের ভাঙা-গড়ার খেলায় প্রমত্ত হয়ে ওঠেননি, বরং মুকুটদণ্ড ও সিংহাসন ত্যাগ করেছেন, চীর ধারণ করে সন্ন্যাসীর বেশে দাঁড়িয়েছেন রাজধানীর প্রাসাদের শিলাসোপানে, মানবকল্যাণের প্রেরণায়। এইখানে প্রকৃত ভারত এবং এই ভারততত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিষ্ঠতম ব্যাখ্যা লাভ করেছে। এই সব শক্তি ও ঐশ্বর্যের সম্পর্শমোহ হতে দূরে ও একান্তে যে "ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছেন।" সেই ভারত হলো কবি বর্ণিত সনাতন স্বদেশ, তত্ত্বের ভারত, ত্যাগের ভারত, মানবতার ভারত, বিশ্বৈকবোধের ভারত এবং অনন্ততার সন্ধানী ভারত।

তাই দেখতে পাই ভারতের সমগ্র শিল্প, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে এক বিরাট অন্বেষণের সুর। ভারতের মন যেন চিরতীর্থযাত্রী এক সন্ধানী। সন্ধানের এবং পথ চলারও এক ধর্ম আবিষ্কার করেছে ভারত। লক্ষ্য ও পন্থার নৈতিক সমন্বয়। সৎপথেই সৎ লক্ষ্য লাভ করতে হয়। এই নীতিটি ভারতীয় মনীষার গঠনতন্ত্রেরই মূল নীতি। এ বিষয়ে ভারতীয় চিন্তার উৎকর্ষ লক্ষ্য করলে বিস্মিত হতে হয়। ভারতীয় মন শেষ পর্যন্ত পন্থায় ও লক্ষ্যের কোনও প্রভেদ স্বীকার করেনি। পন্থাও লক্ষ্যেরই মতন মহৎ এবং পথিক হয়ে থাকাই লক্ষ্যলাভ।

যাওয়া সে যে তোমার পথেই যাওয়া
পথে চলাই সেই তো তোমার পাওয়া।

ভারতীয় চিন্তার সৃষ্টি এই "পথের ধর্ম", ভারতীয়রাই একটি প্রধান অবলম্বন। ভারতে আগত ইরাণী কবিও একদিন এই ভারতীয় উপলব্ধির পরিচয়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁর আনন্দ ঘোষণা করেছিলেন--

বুবদ বিসালে খুদা, দূর বিসালে নামে খুদা।

পথ চলার শেষ নেই, এবং লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় না। মানবজীবকে এইভাবে চিরচলার এবং চিরসন্ধানীর জীবন বলেই গ্রহণ করেছে ভারত। ভারতীয় প্রজ্ঞার এই এক মহৎ আবিষ্কার। "কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব পেয়েছি আমার শেষ?" উত্তর হলো, কোনদিনই না। 'শেষ'কে কখনই পাওয়া যাবে না। কারণ এই শেষের যে সত্যিই শেষ নেই। তাই চিরকালের অন্বেষণ, চিরপ্রতীক্ষা, চিরপ্রার্থনা এবং চির-আকুলতাই মানব-সত্তাকে এক অফুরান

প্রেরণা দিয়ে যেন এগিয়ে নিয়ে চলেছে। কবি এই সত্য উপলব্ধি করেই ভারতীয় জীবন-তত্ত্বের আর এক পরিচয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় ব্যাখ্যা করেছেন সবচেয়ে সরলভাবে, অক্সফোর্ড প্রদত্ত তাঁর হিবার্ট বক্তৃতায়। 'হওয়া'ই (To Be) মানুষের ধর্ম। সন্ধানের পথে যারা চিরপথিক, যাঁরা তমিস্রার পরপারে মহান পুরুষের সান্নিধ্যপ্রয়াসী তাঁদের প্রয়াসই হলো সেই পরমের সান্নিধ্য লাভ, অথবা পরমের একাত্ম হওয়া। ভারতীয় জীবনদর্শনের এই সরল তত্ত্বই অপূর্ণ মানুষকে পূর্ণতার অভিমুখী আগ্রহ দান করেছে। কর্মযোগের মূল সূত্রটি এরই মধ্যে পেয়েছে ভারত। আমরা বলতে পারি, ভারত-তত্ত্বেরও তথা ভারতীয়তারও সংজ্ঞা এখানে পূর্ণত্ব লাভ করেছে।

সন্ধান ও অন্বেষণই হলো ভারত-জীবনের প্রকৃতি। 'বলাকার পাখার বাণী' জীবনকে এক অন্তহীন লক্ষ্যের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। প্রত্যেক জড় ও জীবনের এই সীমার বাঁধন ছিন্ন করে নিরন্তর অসীম হতে চাইছে। হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে। তৃণদল মাটির আকাশ পরে ঝাপটিছে ডানা, অন্বেষণ ও চলার আবেগে সবই অস্থির। ভারতীয় ঋষির, ভারতীয় কবির চিত্তলোক হতে এই যে পরম প্রোগ্রেসের তত্ত্ব উৎসারিত হয়েছে তার চেয়ে বেশি বাস্তব ও মহৎ কোনও প্রোগ্রেসের তত্ত্ব আজ পর্যন্ত অন্য কোথাও আবিষ্কৃত হয়নি। এ তত্ত্ব ভারতের সাধারণ লোকজীবনেও বিস্ময়কর প্রভাব সৃষ্টি করেছে। তাই দেখতে পাই, ভারতীয় সাধক হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে ডুবে কিসের যেন সন্ধান করেন ; ভারতের গ্রাম্য বাউল দেশ-বিদেশে 'তার উদ্দেশে' ঘুরে বেড়ান, যে তাঁর 'মনের মানুষ' ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর। যুগে যুগে অভিসার পাগলিনী রাধিকার। ক্ষান্তিহীন সন্ধানই ভারতীয় সাহিত্যকে প্রকৃত ক্লাসিক রূপদান করেছে এবং তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রবীন্দ্র-সাহিত্য। ব্রহ্মা ব্যাসদেবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনার রচিত মহাভারতে আপনি কি তত্ত্ব প্রতিপালিত করেছেন?—ব্যাসদেবের উত্তর হলো,--যত্তু সর্ববস্তুর মধ্যে রয়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যকেও বলতে পারি ভারতের দ্বিতীয় 'মহাভারত'। রবীন্দ্রসাহিত্যের অজস্র বৈচিত্র্যের অন্তরালে একটি মহাসঙ্গীতেরই সুর রয়েছে, অনন্তের সন্ধানী মানুষের বিশ্বৈকবোধের সুর।

প্রাচীন হিন্দী কবি নিশ্চল দাস বহু তত্ত্বের আলোচনা করে শেষে নিজেকেই প্রশ্ন করেছিলেন—কাকু কার প্রণাম? কাকে প্রণাম করি? শেষ পর্যন্ত তিনি প্রণাম করলেন সেই ভারত তত্ত্বকে যে তত্ত্বে এমন বাণীও সহজে ধ্বনিত হয়েছিল—"বিশ্ব ভরণ-পোষণ কর জোই, তাকর নাম ভারত অস হোই।" বিশ্বকে যে ভরণপোষণ করে তারই নাম ভারত।

বিংশ শতাব্দীর ভারতে এই "তত্ত্বে"র আধার হলো রবীন্দ্র-সাহিত্য। তাই আমরা আজ পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায় বলতে পারি, প্রণাম করি সেই বিশ্বময়ীর আঁচল পাতা ভারতকে, বিশ্ব জাগতিক সত্যের ধারয়িত্রী ভারতভূমিকে। প্রণাম করি রবীন্দ্র-ভারতকে।

রবীন্দ্র প্রতিভার অনুধাবন

প্রসঙ্গটা ঠিক কবি-প্রতিভার বিচার নয় ; কবি-প্রতিভার বিচার সম্বন্ধে মনের কয়েকটি প্রশ্ন ও আগ্রহ। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের বার্ষিকী দিবসটি দেশবাসীর মনে যে উৎসাহ উদ্দীপিত করে, সেটা নিতান্তই এক আমুদে উৎসব সৃষ্টির মত্ততা, এত বড় অভিযোগ মেনে নিতে মন চায় না। কবি স্মরণের অনুষ্ঠানরূপে বৎসরের বিশেষ একটি বা কয়েকটি দিবসের ব্যস্ততা যদি শুধু হর্ষ ও উল্লাসের রূপেই আত্মপ্রকাশ করে, তাহলেই বা দুশ্চিন্তান্বিত হবার কি আছে? উৎসব জাতির প্রাণবত্তার লক্ষণ এবং সঙ্গীত অভিনয় নৃত্য ও অন্যান্য রুচিরম্য আনন্দের শিল্প দিয়ে যে উৎসব রচিত হয়, তার প্রেরণা ঐ প্রাণবত্তারই একটি সুস্থ স্বরূপের সত্যতা প্রমানিত করে। কবির জন্মদিবসে জাতির মন উৎসব অন্বেষণ করে, এই আগ্রহ উৎসবকেই একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যে বিশেষিত করার আগ্রহ। জাতীয় ইতিহাসের একটি গৌরবের স্বীকৃতির উৎসব। যদি বলা হয় যে, পঁচিশে বৈশাখ একটি উপলক্ষ মাত্র এবং লক্ষ্য হলো উৎসব, তা হলে সেই সঙ্গে এই সত্যও স্বীকার করে নিতে হয় যে, এমন উপলক্ষের চেয়ে খুব বেশি ভালো উপলক্ষ আর হতে পারে না।

আধুনিক ইংলণ্ডের এক বিশিষ্ট ও বিখ্যাত ইতিহাস রচয়িতা ট্রেভেলিয়ান ইংলণ্ডের ইতিহাসের যুগনির্ণয় করতে গিয়ে ইতিহাস রচনার প্রচলিত রীতির বিশেষ একটি ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন। ইতিহাসের যুগগুলি এক একজন রাজার বা রাজবংশের শাসনপর্বের কাল নয়, তাঁর লেখা ইংলণ্ডের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়টি হলো—চসারের যুগ, এজ অব চসার। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের একটি অধ্যায়কে কবি চসারের যুগ বলে স্বীকার করে নিয়ে ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ান এতদিনের ইতিহাস সাহিত্যেরই একটি দৃষ্টিভঙ্গির ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন। শুধু রাজা আর রাজবংশের শাসনিক ঘটনাগুলিই জাতির জীবনকে গড়ে থাকে, এটা একটা অধ্রুব সত্য মাত্র। আর, সিংহাসনের ইতিহাসই জাতির একমাত্র অথবা প্রকৃত ইতিহাসও নয়। বরং এই সত্যই লক্ষ্য করা যায় যে, জাতির মনের আগ্রহের রূপান্তরই জাতীয় ইতিহাস রূপান্তরিত করে এসেছে। এই আগ্রহ গড়েন কবি শিল্পী সাধক এবং মনস্বী। সম্রাট অশোকের কালের ইতিহাসকে আপাতদৃষ্টিতে অশোকেরই কীর্তিকারিতার ইতিহাস বলে মনে হতে পারে। কিন্তু কে অস্বীকার করতে পারে যে, ঐ কীর্তিকারিতার মূলে রয়েছে বৌদ্ধ চিন্তার প্রেরণা? যে আগ্রহ গৌতম বুদ্ধের উপলব্ধির দান, যে মৈত্রী ও করুণার বাণী সঙ্ঘারামের প্রার্থনার অনুষ্ঠানে নিত্য ধ্বনিত হতো সেই বাণীই অশোক-কালের ইতিহাসকে গড়েছে। এক্ষেত্রে সম্রাট ও তাঁর ব্যক্তিত্ব ইতিহাসের মূল প্রেরণা নয়। মনস্বীর চিন্তার প্রেরণাই হলো মূল প্রেরণা।

রাজারা ইতিহাস সৃষ্টি করেননি, ইতিহাস রাজাদের সৃষ্টি করেছে, এবং সে ইতিহাস হলো জাতির ভাবনাময় জীবনের ইতিহাস। সুতরাং চসারের যুগ বললে ইংলণ্ডীয় ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের রূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সত্য কথাই বলা হয়। ইতিহাসের সব ঘটনার উত্থান-পতনের অবিরাম ক্রিয়াকলাপের অন্তরালে জাতির একটি মনোময় রূপ এবং প্রকৃতি কাজ করে চলেছে। জাতির এই মনোময় সত্তার ইতিহাস হলো সাধক কবি শিল্পী ও মনস্বীর প্রচারিত বাণী ও রূপকলা এবং ব্যক্তিত্বের ইতিহাস। অস্বীকার করা যায় না, ভারতের ইতিহাসের রূপ ও প্রকৃতির রচনায় রামায়ণ ও মহাভারত নামক দুটি মহাকাব্য যে প্রভাব সত্য হয়েছে, কোন মহামহিমান্বিত রাজন্যের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব জাতির জীবনে সে প্রভাব সঞ্চারিত করতে পারেনি।

পঁচিশে বৈশাখের উৎসব পরোক্ষভাবে এই সত্যই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ভারতের

ইতিহাসেও রবীন্দ্র-প্রভাবিত একটি অধ্যায় আছে। রবীন্দ্রসাহিত্য জাতির জীবনের বিশেষ একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়ের মর্মরূপ। কবি-প্রতিভার বিচারের একটি দিক আছে, সেটি হলো কবিত্বের বিচার। আর একটি দিক, কবি-প্রতিভার ঐ ঐতিহাসিক সত্যস্বরূপটির বিচার। কবি-প্রতিভাব সাহিত্যগত বিচার অর্থাৎ কবিত্বের রীতিনীতি ও রূপের বিচার নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু কবি-প্রতিভার ঐ ঐতিহাসিক সত্য স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ থাকবার কথা নয়। কবি তাঁর স্বদেশের ভাবধারার সঙ্গে বৃহৎ বিশ্বের ভাবধারার অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, এটি তাঁর চিন্তারীতির একটি মূল সত্য, এবং এ বিষয়ে কোন মতভেদের উদ্ভব ঘটতে পারে না। রবীন্দ্র-চিন্তার এই সত্য কেউ হয়তো পছন্দ না করতে পারেন, কিন্তু সত্যনিষ্ঠা রাখতে হলে তাঁকে স্বীকার করতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের এক সম্বন্ধ রচনা করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্র-চিন্তার এই রকম অজস্র উপলব্ধির তত্ত্ব স্মরণ করতে পারা যায়, যেগুলি ভারতের ইতিহাসকে বিশেষ একটি পরিণামের দিকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছে।

দুঃখের বিষয়, কবি-প্রতিভার বিচারের নামে মাঝে মাঝে অবিচারের ব্যাপারও ঘটে চলেছে। কবি স্মরণের অনুষ্ঠানগুলির সবই কবি-প্রতিভার প্রকৃত বোদ্ধা সমঝদার ও সুরসিকের সম্মেলন হয়ে উঠবে, এমন আশাও দাবি করা যায় না। কিন্তু অবশ্যই দাবি করা যায় যে, কবি স্মরণের নামে সম্মেলনগুলি যেন নিজেদেরই কতগুলি অভিরুচি ও মতবাদের সম্মেলন না হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও আদর্শ সম্বন্ধে কিছুই না জেনেও যে বেচারা কবির ছবিকে ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে উৎসব করে, তার পৌত্তলিকতা জগতের কারও ক্ষতি করে না, যদিও বেচারা স্বয়ং তার নিজের মনের অনেক ক্ষতি করে থাকে। এই ধরনের উৎসবের মধ্যে অন্য যে কোন ত্রুটি দুর্বলতা ও ভুলের ভয় থাকুক না কেন, কবি-প্রতিভার সম্পর্কে অবিচারের ও অপবিচারের ভয় নেই, না জানা থাকলে না বলাটাই সত্যনিষ্ঠার পরিচয়। অজ্ঞ যখন বিচার করে তখনই ভুলের ভয় দেখা দেয়, কিন্তু এর চেয়েও বেশি ভয়ের ব্যাপার ঘটে থাকে, যেটা হলো এক ধরনের বিজ্ঞতাজনিত অবিচার। কবি-স্মরণের জন্য আহূত অনেক অনুষ্ঠানে উৎসাহী বিজ্ঞদেরই বাচনে ও ভাষণে কবি-প্রতিভার প্রতি বিশেষ এক ধরনের অবিচার ঘটে, যার জন্য শুধু স্মরণ অনুষ্ঠানের মর্যাদা নয়, জাতির ইতিহাসের ও সত্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে। এই ভুলটিই সবচেয়ে বেশি ক্ষতির হেতু।

এই কলকাতাতেই বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে উদ্‌যাপিত এক কবি-স্মৃতি সম্মেলনে এক বক্তা রবীন্দ্রনাথর ফিলসফি সম্বন্ধে বৃহৎ এক তত্ত্বমুখর ভাষণে অজস্র কথা বলেও শুধু একটি কথা বললেন না, যেটি রবীন্দ্রনাথ কথিত জীবনদর্শনের প্রথম কথা ও সারকথা অর্থাৎ ঈশ্বর বিশ্বাস। বক্তা নিজে নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী এবং তাঁর সমস্ত বক্তব্যের মধ্যে এই সত্যই প্রমাণিত করবার চেষ্টা দেখা গেল যে, রবীন্দ্রনাথ প্রায় নাস্তিকই ছিলেন। আরও কৌতুককর ব্যাপার হলো, সংবাদপত্রের রিপোর্টে দেখা গেল যে, শ্রোতারা নাকি ঐ বক্তার ভাষণকেই সবচেয়ে বেশি তারিফ করেছেন। কারণ, বক্তা এক 'নতুন দৃষ্টিভঙ্গি' নিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন বিচার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনকে মাত্র একটা অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করে বক্তা তাঁর নিজেরই বক্তব্য প্রচার করলেন। এই হলো নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা, রিভ্যালুয়েশন। কবি-প্রতিভার প্রতি এই রকমের অবিচারের প্রকোপে কোন কোন সময়ে অসত্য নিষ্ঠার উৎসব হয়ে উঠেছে বলেই বিশেষভাবে সাবধান হবার প্রয়োজনও দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই অংশ আর সেই অংশ উদ্ধৃত করে এমন গবেষণা ভাষণ এবং আলোচনা জমে উঠতে দেখা যায় যে, যার যুক্তিবাদের জোরে কবি একজন মার্কসবাদী বিপ্লবের উদ্গাতা বলে প্রমাণিত হয়ে যান। যিনি ভারতের অতীতের সব কিছুকেই একেবারে দিব্য সত্যের এবং চরম

উৎকর্ষের নিদর্শন বলে বিশ্বাস করেননি, এমন পণ্ডিতের ভাষণ কবি-প্রতিভার বিচার আর এক দশা লাভ করে। ভারত ইতিহাসের যে কোন ভুল, চিন্তা ও আচরণের যে কোন কুসংস্কার এবং জীর্ণ গলিত ও কীটদৃষ্টে যে কোন সামাজিক রীতি হলো ভারত-জীবনের সনাতন সত্য এবং রবীন্দ্রনাথকে এই এইরকম সনাতন সত্যের পূজারী বলে প্রমাণিত করে তবেই পণ্ডিতের গবেষণা শান্ত হয়।

বিস্মিত হয়ে আক্ষেপ করতে হয়, এই রকমের আলোচনা ও ভাষণের উৎসব কি কবি-প্রতিভা স্মরণের অথবা নিজ নিজ প্রতিভা স্মরণের উৎসব? এ কি রবীন্দ্র-চিন্তার সত্যগুলিকে বুঝবার প্রয়াস, অথবা নিজ নিজ চিন্তা ইচ্ছা আর বিশ্বাসের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করবার প্রয়াস?

এক কথায় বলা যায়, কবি-প্রতিভার সম্পর্কে এই অবিচার জাতীয় ইতিহাসের বাস্তব সত্যের প্রতি অমর্যাদার আঘাত। রাজনৈতিক দলের উদ্যোগে আয়োজিত স্মরণ অনুষ্ঠানগুলি কবি-প্রতিভার অপব্যাখ্যাতা হিসাবে আরও ভয়ানক। কবির চিন্তা ও আদর্শের ব্যাখ্যা করে এইসব অনুষ্ঠানে যে আলোচনা সরব হয়ে ওঠে, তা শুনলে মনে হবে এইসব দলীয় রাজনীতিকের প্রচার প্রয়োজনের সত্যগুলিকেই কবি তাঁর চিন্তার শ্রেষ্ঠ উপলব্ধির সত্য বলে প্রচার করে গিয়েছেন। কবির আদর্শের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা তবুও ভালো, অর্থাৎ কবি-স্মৃতির অনুষ্ঠানে কবির চিন্তাদর্শন ও সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে বিশ্লেষণী আলোচনা তবুও সাজে, কিন্তু কবির আদর্শকে নিজের ইচ্ছা আহ্লাদ ও মতবাদের আদর্শরূপে ব্যাখ্যা করা এক গ্লানিকর অপরাধের উৎস মাত্র।

কবি-প্রচারিত আদর্শের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করবার অধিকার সবারই আছে। সে আদর্শের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন না করতে পারলেই যে সেটা অপরাধ হয়ে যাবে, এমন কোন কথা নেই। কিন্তু কবি যা মানতেন না, তাই কবির মনের সবচেয়ে বড় কথা ও সত্য ছিল বলে প্রমাণ করা ও প্রচার করা ঐতিহাসিক সত্যের উপর ঘাতকতা মাত্র।

কবি-প্রতিভার বিচার করতে গিয়ে সাহিত্য-চিন্তকের আলোচনা এবং বক্তব্যের মাঝে মাঝে অনুরূপ ভুলের প্রকোপ দেখা যায়। দেখে মনে হয়, সমালোচক মহাশয় কবির চিন্তার সত্যগুলিকে বুঝবার চেষ্টা না করে যেন নিজের চিন্তার মহিমাটি কবিকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন। বলা হয়, নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকপাত করে কবি-প্রতিভার বিচার করা হচ্ছে। নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ভালো, যদি সেটা সত্যিই দৃষ্টি হয়ে থাকে, এবং তার মধ্যে ভঙ্গি থেকে থাকে। আর, যদি ঠিক ঠিক কবির চিন্তার প্রকৃত সত্যগুলির উপর আলোকপাত করা হয়, তবে সমস্যাটা অনেকখানি 'অন্ধ হস্তিনায়' সমস্যার অনুরূপ। রবীন্দ্র-চিন্তা ও আদর্শকে তার সমগ্রতার রূপের মধ্যে রেখে বিচার না করে খণ্ড খণ্ড বক্তব্যের উপর ধারণা নির্মাণ করলে ভুল করা হয়। সেক্সপীয়রের বিশেষ একটি উক্তি উদ্ধৃত করে প্রমাণ করা যায় যে, তিনি জীবনপ্রেমিক ছিলেন ; তেমনই আর একটি উক্তি বিশেষ উদ্ধৃত করে প্রমাণ করা যায়, তিনি জীবনবিদ্বেষী ছিলেন। কিন্তু এর কোনটিই সত্য বিচার এবং সুবিচারের পন্থা নয়। বড় প্রতিভার সৃষ্টি বৈচিত্র্যও বিশাল না হয়ে পারে না এবং সেই সৃষ্টির বিশেষ একটি খণ্ডচিত্রের মধ্যে সেই প্রতিভাধর শিল্পীর বক্তব্যের রূপ ও তাৎপর্য অবাধ হয়ে থাকে না। পুষ্পমাল্যের খণ্ড হিসাবে শুধু একটি ফুলকেই পাওয়া যায়, তার মাল্যরূপ পাওয়া যায় না। মালার ফুল তার একাকিত্বের মধ্যেও সত্য, সেটা খণ্ড সত্য, একান্তভাবে তার নিজ অস্তিত্বের রূপ হিসেবে সত্য। কিন্তু মাল্য হতে বিচ্ছিন্ন ফুলের মধ্যে মাল্যের রূপগত সত্যের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। রবীন্দ্র-প্রতিভার যথার্থ বাস্তব সত্য এবং সার্থক বিচার সেখানেই সম্ভব, যেখানে তাঁর চিন্তার সমগ্রতার রূপ সম্মুখে রেখে বিচার করা হয়। মালা ছিঁড়ে ছিঁড়ে অ্যানালিসিস করার রীতিটা ঠিক মানুষী রীতিও নয়।

চিত্রকলায় রবীন্দ্রনাথ

কবি রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকেন। তাঁর ছবির একমাত্র মর্যাদা এই নয় যে তা' এক মহাকবির তুলিকাবিলাসের সৃষ্টি। এরকম কোন অভিমত পোষণ করা প্রকারান্তরে চিত্রকলাক্ষেত্রে কবির অধিকারিত্বকেই সবিনয় অস্বীকার করা হয়ে দাঁড়ায়। আবার কবির কাব্যকীর্তির কারণে একটা অতিশ্রদ্ধার বাষ্প মান পুষে নিয়ে তাঁর চিত্রকার্যের বিচার করতে বসলে তাতেও অবিচার হবার আশঙ্কাই বেশী, কারণ, এতে সমালোচকের দৃষ্টির নিরপেক্ষতা খর্ব হয়। যুক্তিহীন বিচারে নগণ্যও যেমন অতিরঞ্জনের প্রলেপে নিজেকে অসাধারণ করে তোলে, তেমনি সত্যিই যা অসামান্য তাকেও সামান্যের দীনতায় নেমে আসতে হয়। কাজেই কবি রবীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পী হিসাবে কতদূর কৃতী ও সফল, তার সঠিক যাচাই হতে পারে একমাত্র তাঁর চিত্রকার্যের শিল্পোৎকর্ষের বিচারে।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে, চিত্রাঙ্কনে রবীন্দ্রনাথ সব রকম ঐতিহ্যের আনুগত্য সোজাসুজি এড়িয়ে গেছেন। এ বিষয়ে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই। তাঁর ছবি ভাল বা মন্দ, গোড়াতেই এ নিয়ে প্রশ্ন বা বিতর্ক বাদ দিয়ে এটুকু নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, ছবিগুলি এমন কতকগুলি বিশিষ্টতায় ওতপ্রোত যা চোখের দেখার কৌতূহলকে টেনে নিয়ে দূর মনোলোকে পৌঁছে দেয়। এত সহজ ও সরল বলেই বোধ হয় তা এত বেগবান। মোট কথা রবীন্দ্র-চিত্রকলা যেন, 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত, তাই তাকে বিচার করাও এত কঠিন। কেন না, নিয়মের ব্যতিক্রমে যার জন্ম, তার পরিচয় ও পরিমাপ নিয়মের মাপকাঠিতে সম্ভব নয়।

এই অপূর্ব-রীতির চিত্রকলার উৎস কি? কবি নিজেই এর পরিচয়সূত্রে বলেছেন—

আমারো খেয়াল ছবি মনের গহন হতে
ভেসে আসে বায়ু স্রোতে
নিয়মের দিগন্ত পারায়ে
যায় সে হারায়ে
নিরুদ্দেশে
বাউলের বেশে।

খেয়াল ছবি—তার উৎস হ'ল মনের গহন এবং সে ছবি ভেসে আসছে প্রকাশের প্রবাহ ধরে নিয়মের দিগন্ত পারায়ে।

পুরাতন শিল্পরীতি ও অনুশাসনকে না মেনে, তার পরিবর্তে চিত্রকলার কোন নতুন রীতির প্রবর্তন রবীন্দ্রনাথ করেননি। কারণ না-মানার আবার রীতি কি? রীতির ভেতর একটু না একটু সীমাবদ্ধতা ও অনুদারতা থেকেই যায়। রীতির হাতে পড়ে শিল্প যেমন কোথাও অপরূপ হয়ে ওঠে তেমনি কোথাও আবার নিঃশেষে হারিয়ে বসে তার আপন রূপ।

শিল্পী রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন খেয়াল-ছবি। তিনি এখানে রূপকারের ভূমিকায় তুলি হাতে নিয়ে আসরে অবতীর্ণ হননি। মনের গহন থেকে মুক্তধারায় যে অশান্ত কল্পনার পুঞ্জ ভেসে আসছে তারই অবিকার ভাবরূপটিকে কবিশিল্পী বর্ণে ও রেখায় ধরবার প্রয়াস করেছেন।

শিল্পীর কর্তব্যে এইটুকু যথেষ্ট নয় যে, সে যা আঁকবে তাই নয়নাভিরাম হবে ; তার কাজ নয় শুধু চিত্রে মূর্তিতে ও আলেখ্যে রূপের সৌকর্য সাধন। শিল্পীকে আসলে হতে হবে প্রকাশকুশল ; রীতির ওপর শ্রদ্ধা রাখতে গিয়ে তাঁকে তার মনোচ্ছবিটির প্রতি নিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ করলে চলবে না। এ মতলব সকল বিতণ্ডা উত্তীর্ণ হয়ে বহুদিন আগেই য়ুরোপে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। মধ্যযুগীয় দৃশ্যদাসত্ব হ'তে য়ুরোপীয় চিত্রকলা মুক্তি পেল সেইদিন, যেদিন শিল্পীকুল এই তত্ত্বটিকে বরণ করে নিয়েছিল। পিকাসো (Picasso) ও গগ্যাঁর

(Gaugine) নিদারুণ বিদ্রোহ য়ুরোপের শিল্পপ্রগতিকে ব্যাহত তো করেইনি বরং তাকে আরো সৃষ্টিপ্রবণ ও গতিশীল করে তুলেছে।

"যেমন তেমন এরা বাঁকা বাঁকা
কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আঁকা।"

তাঁর চিত্রকলায় টেকনিকের সম্পর্কে কবিশিল্পী এই পরিচয় দিচ্ছেন। শিল্পী স্পষ্ট স্বীকার করে নিচ্ছেন যে তাঁর চিত্রের সবটাই তুলি দিয়ে গড়া নয়--তার কিছুটা আবার ভাষা দিয়ে গড়া। তুলি দিয়ে যেটুকু গড়া তার সবটাই দর্শকের কাছে প্রত্যক্ষ, তাকে সহজেই চিনতে ও বুঝতে পারা যায়। যেটি প্রত্যক্ষ নয়, যেটি প্রচ্ছন্ন, সেইটিই হ'ল ভাষা দিয়ে আঁকা এবং এই ভাষার অর্থভেদ যিনি করতে সমর্থ হবেন তাঁরই কাছে রবীন্দ্র-চিত্রকলার রূপভেদ করা সহজ হয়ে উঠবে।

এখন সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব। রবীন্দ্র চিত্রকলা কোন্ গুণে বিশিষ্ট? এই অপ্রত্যক্ষতা, যা ভাষা দিয়ে আঁকা--এইটিই হল তার বৈশিষ্ট্য। চোখের দেখার বদলে মনের দেখাই এখানে বড় সহায়। কবিশিল্পীর 'ঝাঁকড়া চুল" ও "একাকিনী" এ দুটি ছবির দিকে দৃষ্টি দিলে চোখের কর্তব্য শীঘ্র ও সহজে সারা হয়ে যায়, তারপর সুরু হয় সমস্ত মন জুড়ে জানাজানির সাড়া--"কিছু তার বুঝি না বা, কিছু পাই অনুমানে।"

অলঙ্কার শিল্পকে একটি রূপ দান করে সত্য। কিন্তু অলঙ্কারকে সরিয়ে দিলে শিল্পের কোন প্রাণান্তিক হানি হয় না, জলুসই শুধু কমে যায়। রূপ যায় কিন্তু শ্রী থাকে। পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পী এই কারণে চিত্রে অতি-পারিপাট্যকে (Prettiness) বর্জন করে লাভবানই হয়েছেন। রবীন্দ্র-চিত্রকলায়ও আমরা রূপসাধনার নিদর্শন পাই না, পাই অপূর্ব শ্রীসাধনার পরিচয়।

অনেকে রবীন্দ্রনাথের আঁকা কতকগুলি চিত্রকে গ্রোটেস্কধর্মী (Grotesque) বলে মনে করেন। এ অভিমতকে নিতান্ত উপেক্ষা করা চলে না। কবিশিল্পীর আঁকা "ঘণ্টাকর্ণ" "খাসা-লেজুড়ী" প্রভৃতি ছবিগুলিকে গ্রোটেস্ক বলে স্বীকার না করে পারা যায় না। শিল্পী যদি চান তাঁর মনোচ্ছবির যথাযথ প্রকাশ, তবে তাঁকে খানিকটা বিরূপের আশ্রয় গ্রহণ করতেই হবে। অন্তশ্চেতনা জুড়ে যেমন ছড়িয়ে আছে রূপের মায়াজাল তেমনি রয়েছে বিরূপের কুয়াসা। গজানন, গণেশ, নৃসিংহ, ফিংক্স ও ড্রাগন যে-কল্পনার সৃষ্টি সে-কল্পনাই জন্ম দিয়েছে 'ঘণ্টাকর্ণকে'। কেউ কেউ মনে করেন গ্রোটেস্ক-এর পেছনে থাকে শিশু বা আদিমমানবসুলভ অপ্রবীণ ও অকৃত্রিম কাঁচা মনের কৌতূহল ও প্রেরণা। কেউ কেউ এর পেছনে একটা ব্যঙ্গ কৌতুকের ছায়া দেখতে পান। এই গ্রোটেস্ক চিত্রে গুহা মানবের দানও কিছু কম নয়। সুতরাং গ্রোটেস্ক অর্থে উদ্ভট কিছু বোঝায় না--এও মনের রুচির কীর্তি যার পেছনে রয়েছে একটা হেতুর ভিত্তি ; যুগের শিল্পী অদ্যাবধি তাকে রচনা করে আসছে। আশ্চর্যের বিষয় বিরূপের ছবি এই গ্রোটেস্কই গথিক সৌন্দর্যের একটা বড় অবলম্বন। শোনা যায় যে, সুরশিল্পী ভাগনার (Wagner) বাদ্যযন্ত্রে এমন এক একটি সুর আলাপ করতেন যাতে নিস্তরঙ্গ একটি হ্রদের নিঃশব্দতা ফুটে উঠতো। সুতরাং শব্দ যদি নিঃশব্দরসকে বহন করে আনতে পারে, তবে বিরূপও রূপকে বহন করে আনবে, এতে বিস্ময়ের কি আছে? এ কীর্তিতে রবীন্দ্রনাথের তুলিকাও পূর্ণ সাফল্যের দাবী করতে পারে।

"গেছোবাবা", "জিব-বের-করা কাঁটাওয়ালা"--এ দুটি এবং এই ধরনের তুলির খেয়ালে রচিত আরো কয়েকটি ছবি ঠিক গ্রোটেস্ক পর্যায়ে পড়ে না। সত্যি কথা বলতে গেলে, এরা কোন পর্যায়েই পড়ে না। ফ্যাণ্টাসির (Phantasy) লঘু মেঘে গড়া এদের দেহ--অবচেতনার পটে ক্ষণে ক্ষণে যেসব অপূর্ব অদ্ভুত মূর্তির উত্থান লয় চলেছে। গেছোবাবার অ্যানাটোমির কোন বালাই নেই ; নিখুঁত রেখায়িত স্পষ্টতার আলোকে তাকে গোচরীভূত করার উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথের আঁকা অবচেতন মনের বিগ্রহ এই প্রতীক-চিত্রগুলির পক্ষে এই পরিচয়

যুক্তিযুক্ত মনে করা যেতে পারে।

'কাছের মূর্তির চেয়ে দূরের মূর্তিতে তুমি বড়—' রবীন্দ্রনাথের সমস্ত চিত্রকলা-সাধনার পেছনে এই ইঙ্গিতটি সত্য হয়ে উঠেছে। নির্বন্ধন তাঁর ছবি, সব অবান্তর সেখান থেকে বিদূরিত—শিল্পীর তুলিকা একান্তভাবে শুধু সর্দ্ধমের (Fundamental) প্রকাশেই তৎপর। বুদ্ধি দৃষ্টির দাপটে তার অর্থ আড়ালে লুকিয়ে যায়। পরের হাসিকান্না লোকে যেমন হেসে কেঁদেই প্রকৃত উপভোগ করে—তেমনি কবিশিল্পীর এই ছবিগুলি—এই 'দূরের মূর্তিকে' একমাত্র বোঝা যায়, উপভোগ করে, মনের পটে মুদ্রিত করে।

শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

মাঝে মাঝে দেখতে পাই, কোন এক সমালোচক শরৎ-সাহিত্যের জনপ্রিয়তার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে অনেক কথা বলছেন। জানি না, কোন সমালোচক শরৎ-সাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্যের একটি বিশুদ্ধ ও আদর্শোচিত প্রতিচ্ছবি বলে অভিহিত করেছেন কিনা। একদা সমালোচনার ক্ষেত্রে এই ধারণার প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল যে, দেশ ও জাতির সামাজিক অথবা রাজনীতিক কিংবা অর্থনীতিক কোন অভ্যুদয়ের আকাঙক্ষা ও প্রয়াসের ভাবানুপ্রাণিত প্রতিবেদন হলো সার্থক 'জাতীয়' সাহিত্যের পরিচয়। আজও বোধহয় সমালোচক অথবা সাহিত্যরসিক সমাজের সকলে মনস্বী রাজনারায়ণ বসুর ব্যাখ্যাত নীতি অনুযায়ী 'জাতীয়' সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয় করতে চাইবেন না। কিন্তু মনে হয়, মনস্বী রাজনারায়ণ বসুর বিচারিত অভিমত মান্য করে নিয়ে এই সাধারণ সত্যটি স্বীকার করা যায় যে, দেশপ্রেমের প্রেরণা সঞ্চারিত করবার কাব্য-কাহিনীই সার্থক 'জাতীয়' সাহিত্যের নমুনা নয়। অন্য লেখকের রচনার সঙ্গে তুলনা না করে শরৎচন্দ্রের নিজেরই রচনার দুই নমুনার মধ্যে তুলনা করে বলা চলে যে, 'পথের দাবি'র তুলনায় 'পল্লীসমাজ' জাতীয় সাহিত্যের গুণ লক্ষণ ও তাৎপর্য বেশি বহন করে। কিন্তু প্রশ্ন করে ও বিচার করে বুঝবার প্রয়োজন হয়, শরৎচন্দ্রের মন কালিকলমের কোন্ কৃতিত্বে তাঁর রচিত সাহিত্যকে সত্যিকারের এবং সার্থক 'জাতীয়' সাহিত্য হিসাবে গুণান্বিত করেছে।

একটি সত্য স্বীকার না করলে উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যের আঙ্গিক সৌকর্য এবং মর্মগত অনুবেদনার যথার্থ নির্ণয় সম্ভব হতে পারে না। স্বীকার করতে হয় যে, ঐ কালের মধ্যে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে এমন কিছু অতি সুফলপ্রসূ প্রতিভার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাদের পক্ষে যথার্থ 'জাতীয়' সাহিত্যের মহৎ দৃষ্টান্ত বলে দাবি করবার কোন যুক্তি নেই, অথচ সাহিত্য হিসাবে তাদের অন্য আবেদন ও মনোজ্ঞতার যথেষ্ট চমৎকারিতা আছে। মনস্তাত্ত্বিক বলবেন, এটা বিদেশীয় সাহিত্যের রূপ ও রীতির ঐশ্বর্য আত্মস্থ করবার চমৎকার সফলতার উদাহরণ। এই কৃতিত্ব নিতান্ত পরানুকৃত ভাবনার ক্রিয়াফল বলে নিন্দিত হতে পারে না। মনোজ্ঞতার কারণে, কিংবা আঙ্গিক সৌষ্ঠবের অভিনবতার কারণে জনসমাদরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এহেন সাহিত্য যে কোন দেশের কিংবা জাতির সাংস্কৃতিক পরিতৃপ্তির একটি বড় সম্বল বটে, কিন্তু জাতির যথার্থ হৃদয়সংবেদ্য সম্বল নয়। শরৎসাহিত্যের সবচেয়ে বড় মহত্ত্ব নিশ্চয় এই যে, এ সাহিত্যের ভাব অনুভব ও প্রসাদ বৈষ্ণব কবির প্রিয় শ্যামনামের মতো কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ লাভ করে। মাথা ঘামিয়ে কিংবা বুদ্ধি-বিচার ও তাত্ত্বিক বিজ্ঞতা নিয়ে এ কাহিনীর তাৎপর্য বুঝে নেবার চেষ্টা করতে হয় না। শরৎ-রচিত গল্প ও উপন্যাসের আবেগ ঝর্ণার জলের মতো আপন মর্মরোলে উদ্বেলিত। পিপাসী জনের পক্ষে স্বচ্ছ-শীতল তৃপ্তির অঙ্গীকার।

রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের প্রতিভা ও কৃতিত্বের প্রশংসাময় অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন যে, শরৎ বাঙালীর হৃদয়ে ডুব দিয়েছিলেন, তাই তাঁর গল্প-উপন্যাস (বাঙালী) পাঠকজনের মনের পক্ষে প্রিয়তার আস্পদ এবং সহজগ্রাহ্যতার ও সমাদরের বস্তু। কবির উক্তির সত্যতা স্বীকার করে নিয়েও এক্ষেত্রে ব্যক্তির পক্ষে শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে ধারণা গ্রহণ করবার বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হবার দরকার হবে। অনুমান করতে হয়, কবি নিশ্চয় একথা বলতে চাননি যে, শরৎচন্দ্র বাঙালীয়ানার হৃদয়ে ডুব দিয়েছিলেন। সাহিত্যের সৃষ্টি ও নির্মাণের ইতিহাসে একটি নিয়ম বস্তুত সার্থক ও সফল কৃতিত্বের একটি চিরায়ত অভিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। সেই অভিজ্ঞান এই যে, তথ্য-সাহিত্যের কথা বাদ দিয়ে প্রত্যেকটি ভাব-সাহিত্যের

ক্ষেত্রে বড় স্রষ্টার প্রতিভা ও মেধার বড় লক্ষণ এই যে, তিনি জনজীবনের হৃদয়ে ডুব দিয়ে রূপ অন্বেষণ করে থাকেন। সামাজিক পরিবেশ, স্থানিক ঘটনা, অর্থনীতিক জনসমস্যার আবর্ত, সবই কথাশিল্পীর দরকারের উপচার বটে, কিন্তু সৃষ্টি নিশ্চয়ই নয়। সৃষ্টি একান্তভাবে এবং নিতান্ত রূপে হৃদয়ের যাবতীয় ইচ্ছা কামনা ও আবেগের পরাগে সমাকীর্ণ একটি ফুলবন। বিস্তারিত করে বললে বলতে হয়, হৃদয়ের অগ্নিস্ফুলিঙ্গও একটি স্বাভাবিক প্রয়োজনের উপচার। তত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা নিবেদিত উপন্যাস এবং আঙ্গিক অভিনবতার আতিশয্যে সমুৎকীর্ণ কোন কাহিনীময় আলেখ্য কখনই জনসাধারণের কাছে এবং বৃহত্তর কালের কাছে হৃদয়ের জিনিস বলে অনুভূত হতে পারে না। আদর্শিক মহত্বের বিপুল বিস্তার এবং বিবাদ থাকলেও চিত্তবিনোদক রম্যতায় উত্তীর্ণ না হয়ে কোন গল্প-উপন্যাস সাধারণের মর্মগত পরিতৃপ্তির সম্বল বলে বিবেচিত ও স্বীকৃত হবে না।

শরৎচন্দ্র এজন্য বাংলা সাহিত্যের আঙিনাতে একটি সার্থক পুষ্পমালঞ্চের রচয়িতা বলে মনে করা যায়, এবং এক্ষেত্রে তিনি অন্য মহান কৃতীদের তুলনায় বর্ণ-সৌরভের অনেক বেশি সুষমা সঞ্চারিত করেছেন। একথা বিশ্বাস করবার যুক্তি আছে যে, বাঙালীর হৃদয়ে যিনি ডুব দিয়েছিলেন, সেই শরৎচন্দ্র মানবীয় জীবনের বিশ্বজনীন প্রকৃতির উদাত্ত সমতা ও ঐক্য সম্পর্কে কিছু কম রূপের ঐশ্বর্য পরিবেশন করেননি। রুশ হৃদয়ে ডুব দিয়েছিলেন তুর্গেনিভ ও ডস্টয়েভস্কি, ফরাসী হৃদয়ে ডুব দিয়েছিলেন ভিকটর হিউগো, ইংরাজ হৃদয়ে ডুব দিয়েছিলেন চার্লস্ ডিকেন্স—কিন্তু কেউ কি অস্বীকার করতে পারবেন যে, এঁদের রচিত উপন্যাস বিশ্বজনেরও হৃদয়ে ভাব-অনুভবের ব্যাকুলতা উদ্বেলিত করে তুলেছিল? হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে ডুব দিলে মণি-মাণিক্যই পাওয়া যায়। এবং সেটা বিশ্বজনীন আনন্দ ও প্রসন্নতারই একটি রূপময় সম্বল। বরং বলা চলে, এবং বিখ্যাত ইউরোপীয় সমালোচকদের অভিমত সংকলিত করলেও প্রমাণিত হবে যে, তাঁরা 'সিনসিয়ার' তথা উপলব্ধির অনুগত নিষ্ঠাশীল সাহিত্য বলতে সেই সাহিত্যকেই বুঝেছেন, যে-সাহিত্য মানবীয় হৃদয়বত্তার সমগ্র বিস্ময় বেদনা ও সৌন্দর্যের পুষ্পমালঞ্চ। স্বদেশ ও স্বজাতির হৃদয় ছাড়া এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির পক্ষে হৃদয়বত্তার শিল্পী হওয়া সম্ভব নয়। এবং কোন সন্দেহ নেই যে, ঐতিহাসিক রূপে ও প্রকৃতিতে হৃদয়বত্তা বিশেষ কোন একটি ভৌগোলিক সীমায়তনের মধ্যে বিশেষ কোন জনজীবনের আত্যন্তিক পরিচর্যার সম্পদ নয়। বিশ্বজনীন অনুভবের যত বিস্ময়ের অথবা ব্যাকুলতার স্বাদ ব্যক্তির আপন সমাজজীবনেরই মানুষগুলির হৃদয়ে নিহিত আছে।

মনস্বী রাজনারায়ণ বসুর অভিমতের একটি কথা আর একবার স্মরণ করে নিয়ে বলা যায়, আমাদের বাংলা সাহিত্যের অনেক সুন্দর ও সুনির্মিত স্থাপত্য বস্তুত সুন্দর ও সুনির্মিত পরানুকরণ। অর্থাৎ বিদেশীয় তথা পাশ্চাত্য ভাব-সাহিত্যের কায়া অনুকরণ করে নবরূপের গল্প এবং উপন্যাসের রচনা। ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে একটি বৃহৎ নীতির অনুমোদন এই যে, শুধু তুলিকা ও বর্ণিকাভঙ্গের সাফল্যের দ্বারা ছবি এবং মূর্তির রূপন্যাস সম্পূর্ণ হয় না। চাই 'লাবণ্য যোজনা'। শরৎচন্দ্রের কথা-সাহিত্যের বিচারে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের এই নীতিটিকে প্রযুক্ত করলে এই সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক সূত্রে এসে পড়ে যে, শরৎচন্দ্র ছিলেন কাহিনীতে এই 'লাবণ্য যোজনা'র কৃতিত্বে সবচেয়ে বড় সফলতার অধিকারী। সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসাবে শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাস নিখুঁত বাস্তবতানিষ্ঠ কৃতিত্বের নিদর্শন। সামাজিক ন্যায়-অন্যায়ের সংঘাত এবং নর-নারীর প্রণয় ও পরিণয়ের নানা মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণও তাঁর উপন্যাসের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এহ বাহ্য; এর আগে এগিয়ে গিয়ে বলতে হয়, তিনি নিতান্ত সামাজিক ভাবনার মানচিত্রের বর্ণসম্পাত করে তাঁর কাহিনীর আয়তন নির্মাণ করেননি। তিনি মানবতার বিশ্বজনীন আবেদন রূপান্বিত করেছেন।

শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের রচনা ও নির্মাণের রীতিনীতি সম্পর্কে কোন বিজ্ঞ

সমালোচকেব কোন বিস্ময়ের কথা প্রচারিত হয়েছে যে, শরৎচন্দ্রের লিখনভঙ্গির মধ্যে বিশেষ কোন অভিনবতার প্রমাণ পরিস্ফুট নয়। খুবই সরল ও প্রাঞ্জল বলে শরৎচন্দ্রের লিখনভঙ্গির প্রশস্তি করা হয়ে থাকে। বলতে হয়, এই প্রশস্তি বস্তুত লেখনীর প্রতিভার পক্ষে সর্বোচ্চ অভিনন্দন। এই প্রশস্তি নিম্নকণ্ঠে উচ্চারিত হলেও বুঝতে হবে যে, শরৎচন্দ্র কোন বিদেশীয় সাহিত্যকৃতিত্বের তথ্য ও তত্ত্বের দ্বারা একটুও প্রভাবিত হননি। তাঁর প্রতিভা যেন স্বতঃ-উৎসারিত আবেগে কল্লোলিত হয়ে জীবনের সঙ্গীত শুনিয়েছে। জীবনের সত্যকে ধরে রাখে, মমতাকে মধুময় করে রাখে এবং প্রীতিকে ত্যাগযুত করে রাখে মানবীয় হৃদয়বৃত্তির যে অণু-পরমাণু, শিল্পী শরৎচন্দ্র তাই নিয়ে ও তাই দিয়ে কাহিনীর প্রাণ মন কায়া ও আত্মার প্রধান রূপণা সুসম্ভব করেছেন। বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্যর বিষয় এবং সম্মানের বিষয় এই যে, শরৎচন্দ্রকে বাংলার ডিকেন্স কিংবা হিউগো বলে আখ্যাত হবার বিড়ম্বনায় আক্রান্ত হতে হয়নি। তিনি 'সিনসিয়ার' সাহিত্যের, যথার্থ জাতীয় সাহিত্যের এক মহান শক্তিধর স্রষ্টা। শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব ও জনপ্রিয়তার ব্যাপ্তিতে এই সত্যই প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে শুধু একজন আদর্শোচিত 'দরদী' কথাশিল্পী নন, তিনি তাঁর ভাবে-অনুভবে কল্পনায় ও উপলব্ধিতে একজন, এবং সম্ভবত একমাত্র, আত্মপ্রতিভায় আশ্রিত এবং স্ব-মহিমান্বিত সাহিত্যিক।

সামাজিক চেতনা সত্যিই মানবিক চেতনার একটি আনুষঙ্গিক প্রকার। তাই খুবই স্বাভাবিক আকর্ষণে কথাশিল্পীর মন সমাজের ভালো-মন্দ অবস্থা এবং পরিণামের বিচার করেছেন। সামাজিক সমস্যা অবলম্বন করে সার্থক উপন্যাস রচিত হয়েছে, একথাও সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যও স্মরণ করতে হয় যে, যুগের জীবন এক জায়গায় এবং একই সমস্যার ভারে মন্থর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না। সমস্যার শেষ সীমা অতিক্রম করে মানবীয় জীবনের আগ্রহ নতুন অন্বেষার পথে এগিয়ে যায়। সমস্যাটি আর থাকে না। কিন্তু জীবন নামক নির্বিশেষ সত্যটি থেকে যায়। সার্থক কাহিনী-সাহিত্যের গুণ-লক্ষণের সবচেয়ে বড় কথা এই যে, সমস্যার চমৎকার ভূষণ অপসারিত হয়ে গেলেও কাহিনীর ভূষণ থেকে যায়। সমস্যার গুরুত্ব শূন্য করে দিয়েও কাহিনীতে নিহিত জীবনের রম্য নিবেদন একটি সুচিরস্থায়ী সম্পদ হয়ে কাহিনীকে অমরতা প্রদান করে, এবং সেই অমরতা চন্দ্র-সূর্যের মতো চিরায়ু না হয়েও যুগ থেকে অন্য যুগের প্রদীপ হয়ে সাংস্কৃতিক জীবন ভাস্বরিত করে তোলে। শরৎচন্দ্রের কাহিনী-সাহিত্য সম্পর্কেও বলা যায়, যুগজীবনের সমস্যাগুলি যখন আর থাকবে না, তখনও নতুন দিনের ভোরে শরৎচন্দ্রের রচিত কাহিনীর অন্তর্নিহিত মানবতার শাশ্বত আবেদনের প্রভাবে পাঠকজনের অনুভবের আকাশ অরুণিত করে রাখবে।

শরৎ-সাহিত্যের সমীক্ষাতে আরও একটি সত্য ধরা পড়ে, যাকে একটি শিক্ষার সত্য বলে আখ্যাত করা চলে। বিশেষ করে ভারতীয় কথাশিল্পের পরিচর্যা ও প্রয়োজনের বিষয়টি স্মরণে রেখে এই সিদ্ধান্ত মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করা চলে যে, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য ভারতীয় সুধী ও শিল্পীর প্রতিভাকে বাইরের কোন বিশাল কৃতিত্বের প্রতি উদাসীন না হয়েও একটি 'বৈধ অহংকারে' ঋজু হয়ে থাকবার শিক্ষা দিয়েছে। শক্তিসম্পন্ন প্রতিভাধরের সাংস্কৃতিক চিন্তা এবং আচার-বিচারে অ্যারিস্টটল যে বৈধ অহংকারের প্রশ্রয় অনুমোদন করেছেন, সেই অহংকার। সাহিত্য অবশ্যই নিকৃষ্ট পরিণামের আবর্তে পড়ে মিথ্যার সম্ভারে পরিণত হবে, যদি স্রষ্টা লেখক ও শিল্পীর আন্তরিক স্বভাবের মধ্যে আত্মিক স্বাধীনতার প্রকর্ষ না থাকে। কবি কামিনী রায় হেমচন্দ্রের কার্যকলার আলোচনা করতে গিয়ে আক্ষেপের সুরে এক ধরনের আধুনিক রীতিশীলতার প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর অভিমতের কথা : আধুনিককালের কাব্যের বিচার করতে ভাব রূপ ও তাৎপর্যের সৌষ্ঠব ততটা বিবেচিত হয় না, যতটা বিবেচিত হয় কাব্যের আঙ্গিক রীতির অভিনবতা। এক্ষেত্রে রীতির শাব্দিক মুখরতা, যেটা শুধু কানের উপর প্রভাব

বিস্তার করে, তারই সমাদর বেশি। শরৎচন্দ্রের রচিত কাহিনী-সাহিত্য মহিলা কবি কামিনী রায়ের প্রস্তাবিত তত্ত্বটিরই একটি সার্থক সত্যতার নিদর্শন। শরৎচন্দ্রের কাহিনী-সাহিত্য ভাষাতে ও ভঙ্গিতে অচ্ছোদ-সরসীনীরের মতো নিগূঢ় অথচ স্বচ্ছতায় প্রাঞ্জল। তিনি টেকনিকের বৈভব প্রদর্শিত করবার জন্য চেষ্টাকৃত কোন সাধনা স্বীকার করেছিলেন বলে মনে হয় না। এমন বিখ্যাত গল্প ও উপন্যাসের সংখ্যা কম নয়, যারা নিতান্ত ভঙ্গি তথা টেকনিকের বৈভব সম্ভব করবার ইচ্ছাকৃত অধ্যবসায়ের বড় নমুনা। সন্দেহ করতে হয়, খ্যাতির সম্বল থাকলেও এ ধরনের কারিগরী কারুতায় সমৃদ্ধ কাহিনীগুলির ভাগ্য বড়ই নশ্বর। আমাদের সৌভাগ্য, আমাদেরই ঘরের কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ঘরোয়া হৃদয়ের সহস্র বর্ণসুষমা দিয়ে সরল ও প্রাঞ্জল যে কাহিনী-সাহিত্য রচনা করেছেন সেটা ভারতীয় শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী নগর নির্মাণের আদর্শোচিত স্থাপত্যের মতো রূপে ও গুণে সর্বতোভদ্র, বাংলার সমাজজীবনের সুখ-দুঃখ প্রতিচ্ছবিত করেও বিশ্বজনীন আবেদনে চিরপ্রসন্ন।

প্রবন্ধ / রম্যরচনা

মধুসূদনের দান

কলিকাতার রাজপথ সার্কুলার রোড ; তার এক পাশে একটি ছায়াশীতল শান্ত খৃষ্টীয় সমাধি-উদ্যান। সারি সারি শ্বেত মর্মরে গড়া বেদিকা ফলক ও স্তম্ভ—ক্রুশচিহ্ন আঁকা সব মৃতের নিশানা। আইভিলতা ক্রোটনকুঞ্জ ও হলদে গোলাপের ভীড় ঠেলে হঠাৎ চোখে পড়বে একটি স্তম্ভে উৎকীর্ণ এই নিবেদন—দাঁড়াও পথিকবর! বাঙালী পথিককে দাঁড়াতে হবে ক্ষণকাল। এইখানে মাটির নীচে ঘুমিয়ে আছে বাংলার মহাকবি শ্রীমধুসূদনের দেহাস্থি। প্রায় সত্তর বছর আগে ২৯শে জুন তারিখে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা মাইকেল মধুসুদন দত্তের শেষ নিঃশ্বাস আলিপুরের এক দাতব্য হাসপাতালে বাতাসে মিলিয়ে যায়।

মধুসূদন প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—"কাল প্রসন্ন, ইউরোপ সহায়, সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও ; তাহাতে নাম লেখ শ্রীমধুসূদন।" এই হ'ল এক কথায় মধুসূদনের পরিচয়। কাশী-কৃত্তিবাস ও গুপ্তগুণাকর-দাশরথি রসে জীর্ণ বাংলার কাব্য-সাহিত্য যে পরমক্ষণে য়ুরোপীয় কাব্যিক সাধনার সঙ্গে পরিচিত হয়, সেই অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য ও অপূর্ব ভাবরসায়নের প্রথম সৃষ্টিরূপে আবির্ভূত হলেন মধুসূদন।

* * * *

আমাদের বাংলা কবি-বিরল দেশ নয়। সেকেলে ভক্ত ও সাধক কবিদের কথা বাদ দিলে এমন কবি কিন্তু সহজে মেলে না, যাঁরা কবিতাকে জীবন দিয়ে যাপন করেন। কাগজে কলমে অনেক কবির আমরা যে পরিচয় পাই, তাদের নিত্য দিনের চলাফেরা, হাসি অভিমান ও বেদনার মধ্যে সে পরিচয় পাই না। বাস্তব জীবনে তারা নিছক বাজারের লোক—সহস্র নগণ্যতায় বাঁধা। কিন্তু মধুসূদন? তিনি এ অভিযোগের বাইরে, বহু ঊর্ধ্বে। মানুষ মধুসূদন, কবি মধুসূদনের কাছে বাঁধা। মানুষ ও কবি—দুজন দুরকম, এটা তাঁর মধ্যে হয়নি। একই সত্তায় একই ব্যক্তিত্বে মিলিয়ে ছিল মানুষ ও কবি মধুসূদন। মধুকরী কল্পনার গুঞ্জনে সতত মাতোয়ারা মধুসূদনের চিত্তফুলবন। বৈষয়িক ব্যাপারে এই ত্রুটির জন্য তাঁকে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। মানুষ মধুসূদনের হিসাবনিকাশ কখনো সঠিক হতে পারতো না—এই কাব্যপ্রমত্তার দরুন, তাঁকে পদে পদে বিভ্রান্ত হতে হয়েছে। মধুসূদন তাঁর মৃত্যুর মধ্যেই রেখে গিয়েছেন এক অলিখিত মহাকাব্য।

২৯শে জুন তাই স্মরণীয়। স্মরণ করা উচিত আধুনিক বাংলা সাহিত্য কতভাবে মধুসূদনের কাছে ঋণী। এই স্মরণ করার মধ্যেই আমরা সেই সত্যের হদিস পাব—সত্যিকারের প্রতিভা কি? কি কারণে—কেমন করে যুগে যুগে কোন দুর্ভাগা দেশের রিক্ত নভাঙ্গনে হঠাৎ একটা বড় জ্যোতিষ্কের উদয় সম্ভব হয়? এর পেছনে থাকে কিসের প্রেরণা? কোন কালোচিত প্রয়োজন সিদ্ধি, না কোন নবতর শক্তির ব্যঞ্জনা, না ভাববিপ্লব? এই সত্যই আমাদের ভবিষ্যতের পক্ষে অমূল্য পাথেয়।

* * * *

বাংলা গদ্যসাহিত্য ক্ষেত্রেও এমনি এক বিরাট প্রতিভার অভ্যুদয় হয়েছিল—বিদ্যাসাগর। মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরের প্রবেশ উৎসবে কবি রবীন্দ্রনাথ যে বাণী পাঠ করেন, তার মধ্যে মাইকেল মধুসূদনের উল্লেখ ও নিন্দা করা হয়েছে।—"মাইকেল মধুসূদন ধ্বনি-হিল্লোলের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিস্তর নূতন সংস্কৃত শব্দ অভিধান থেকে সংকলন করেছিলেন। অসামান্য কবিত্বশক্তি সত্ত্বেও সেগুলি তাঁর নিজের কাব্যের অলংকৃতিরূপেই রয়ে গেল, বাংলা ভাবার জৈব উপাদানরূপে স্বীকৃত হলো না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দান বাংলা ভাষার প্রাণ-পদার্থের সঙ্গে চিরকালের মতো মিলে মিশে গেছে, কিছু ব্যর্থ হয়নি।" বিদ্যাসাগরের স্মৃতি-

সভায় মাইকেলকে অভিযুক্ত করা হয়েছে, তাঁর সাহিত্য সাধনার কোন একটা ব্যর্থতার দিকে ইঙ্গিত করে। মধুসূদনের স্মৃতিদিবসে তাই এই অভিযোগের বাস্তবতা সম্বন্ধে একটা আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

* * * *

প্রথমে স্বতই প্রশ্ন ওঠে সাহিত্যক্ষেত্রে মধুসূদন ও বিদ্যাসাগরের কীর্তির তুলনা কেমন করে সম্ভব? মধুসূদন লিখেছেন কাব্য ও নাটক, তিনি প্রবন্ধ ও আখ্যায়িকা লেখেননি। বিদ্যাসাগর লিখেছেন প্রবন্ধ ও আখ্যায়িকা ; কাব্য ও নাটক লেখেননি। মধুসূদন ও বিদ্যাসাগর উভয়েই অভিধান থেকে বিস্তর নূতন সংস্কৃত শব্দ সংকলন করেছিলেন। মধুসূদনের এই প্রচেষ্টার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর কাব্য ও পদ্যকে সমৃদ্ধ করা। বিদ্যাসাগর প্রণোদিত হয়েছিলেন, তাঁর গদ্যকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে।

অতএব এঁদের দুজনের সঙ্কলিত শব্দ বাংলা ভাষার প্রাণপদার্থের মত মিলে মিশে গেছে কিনা বুঝতে হলে, একজনের বিচার হবে পদ্যসাহিত্য ক্ষেত্রে—আর একজনের গদ্যসাহিত্য ক্ষেত্রে। দেখতে হবে মধুসূদনের সঙ্কলিত নূতন শব্দ কি সবই আজও আমাদের কাব্য সাহিত্যে অপাংক্তেয় হয়ে আছে? দেখতে হবে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্কলিত নূতন শব্দ সবই কি 'প্রাণপদার্থের' মত আমাদের গদ্যসাহিত্যে দেহীভূত হয়ে গেছে?

মধুসূদনের চয়িত নূতন শব্দ অনেক আছে, যা ভাষায় চালু হতে পারেনি। চালু অর্থে অবশ্য এই বোঝায় যে সমসাময়িক ও কিয়ৎপরবর্তীকালের লেখার মধ্যে উক্ত শব্দগুলির ব্যবহার। মধুসূদনের ইরম্মদ, মদকল, কাকোদর, প্রক্ষ্বেড়ন, তেঁই, হায়রে যেমতি, হর্যক্ষ ও কর্বুর ইত্যাদি শব্দ একান্তভাবে তাঁরি কাব্যের পাতায় আবদ্ধ। কাব্যের বা পদসাহিত্যের দরবারী ভাষার মধ্যে মাইকেলের সঙ্কলিত এই শব্দগুলি ঠাঁই পায়নি।

* * * *

এ সঙ্গে প্রশ্ন উঠবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্কলিত চয়িত ও গঠিত নূতন শব্দগুলি কি সত্যিই প্রাণপদার্থের মত গদ্যভাষায় মিলিয়ে গেছে, 'কিছুই ব্যর্থ হয়নি'? বিদ্যাসাগরের খড়্গী, নবোঢ়াচেষ্টিত সমুদয়, অহো! অহে! হা হতোহস্মি, নিবেদিল, জিজ্ঞাসিল, বিচেতন ইত্যাদি শব্দ আজ বাংলা গদ্যের ত্রিসীমানায় আসবার সম্ভাবনা নেই। কোন চক্ষুষ্মান একথা বলতে পারবেন না যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চয়িত নূতন শব্দ সবই বাংলা গদ্যভাষায় চালু হতে পেরেছে।

বস্তুত তা হয় না এবং হতে পারে না। প্রত্যেক বড় প্রতিভার সৃষ্টির মধ্যেই এ দৃশ্য দেখা যায়, এটা ঐতিহাসিক সত্য। কোন বড় প্রতিভা তার সৃষ্টির আবেগে অজস্রভাবে দান করে যায়, কিন্তু গ্রহীতা তার সবটাই বিন্দু-বিসর্গ সমেত গ্রহণ করে না। কিছুটা প্রয়োজনের বাইরে পড়ে থাকেই এবং সেটাই হয় অবজ্ঞাত। সাহিত্যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। বিদ্যাসাগর অজস্র নূতন শব্দ পরিবেষণ করে গেছেন, তার কতক গেছে কতক আছে।

কবি মধুসূদনের ক্ষেত্রেও এই অভিমত গ্রাহ্য। এ কখনই সত্য নয় যে, তাঁর আমদানী শব্দ সবই ঝাড়েবংশে বহিষ্কৃত হয়েছে সাহিত্যের আসর থেকে।

মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম পাতায় পাই তিনটি শব্দ, যা সত্যিই বাংলা পদ্য বা গদ্য উভয় ক্ষেত্রেই একেবারে অচল। যথা—যেমতি, তেমতি, উর।

'সীতার বনবাসের' প্রথম পাতায় পাই এই কটি শব্দ, যা বাংলা গদ্যে বর্তমানে কোথাও সমর্থন পায়নি—যথা প্রার্থয়িতব্য, ভূয়োভূয়ঃ, অনিষ্টাপাত, ত্বরায়, যাদৃশ, তাদৃশ।

এই কটি শব্দ সমর্থন পায়নি ঠিক, কিন্তু এছাড়া অন্য কত শত শব্দ যে সমর্থন পেয়েছে তাকে অস্বীকার করবে কে? আমরা মধুসূদনের সপক্ষে কোন অতিশ্রদ্ধার বিহ্বলতার অবকাশ না দিয়েও এই কথা বলতে পারি যে, তাঁর চয়িত শত শত নূতন শব্দ ও সমাসগঠন বাংলা

সাহিত্যের ভাষাকে ধনী, শক্তিপ্রবণ ও প্রকাশকুশল করেছে!

* * * *

মাইকেল মধুসূদন পদ্যের টেকনিক, ভাষার কারুকলা, সমাসগঠনের বৈচিত্র্য ও শব্দ চয়নের যে আদর্শ প্রথম ভিত্তিজাত করেন তা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয়নি। যে বস্তু প্রকৃতই প্রতিভাসঞ্জাত তার ধর্ম এই যে সে যুগের চিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠা করে নেবে এবং তার জের পরবর্তীকালের ভাবধারার মধ্যে বর্তিয়ে থাকবে। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রতিভা বহু সাধারণ প্রতিভার পরিস্ফুরণের পথ সুগম করে দেয়, নব সৃষ্টির সম্ভাবনাকে সহজ ও আশু-সাধ্য করে, যতদিন না সেই নবলব্ধ বস্তুটি লোকময়তা পায়।

মাইকেলের প্রতিভার সমগ্রগ্রাহিতার উদাহরণস্বরূপ তাঁর কাব্যের একটি টুকরা ও আধুনিক মহাকবির একটি কাব্যাংশ উদ্ধৃত করা যাক।

যেদিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নব কুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে—ভাসিল যেন আনন্দ সলিলে!

—বীরাঙ্গনা কাব্য

যেদিন প্রথমে তুমি আসিলে হেথায়
কিশোর ব্রাহ্মণ, তরুণ অরুণ প্রায়—
গৌরবর্ণ তনুখানি স্নিগ্ধ দীপ্তি ঢালা
চন্দনে চর্চিত ভাল, কণ্ঠে পুষ্পমালা
পরিহিত পট্টবাস, অধর নয়নে
প্রসন্ন সরল হাসি,

—কচ ও দেবযানী

বিনাইনু যত্নে বেণী, তুলি ফুলরাজি,
(বন-রত্ন) রত্নরূপে পরিনু কুন্তলে।
চির পরিধান মম বাকল ; ঘৃণিনু
তাহায়! চাহিনু কাঁদি বনদেবী পদে
দুকূল কাঁচলি সিঁতি কঙ্কণ কিঙ্কিণী
কুন্তল মুকুতাহার কাঞ্চী কটিদেশে।

—বীরাঙ্গনা কাব্য

পরদিন প্রাতে দূরে ফেলে দিনু
পুরুষের বেশ। পরিলাম রক্তাম্বর
কঙ্কণ কিঙ্কিণী কাঞ্চী। অনভ্যস্ত সাজ—
লজ্জায় জড়ায়ে অঙ্গ রহিল একান্ত
সসঙ্কোচে।

—চিত্রাঙ্গদা

কুশাসন তলে
হে বিধু সুরভিফুল কভু কি দেখিতে?
পূজাহেতু ফুলজালে তুলিবারে যবে
প্রবেশিতে ফুলবনে, পাইতে চৌদিকে
তোলা ফুল।...
নিশীথে ত্যজিয়া শয্যা পশিত কাননে
এ কিঙ্করী, ফুলরাশি তুলি চারিদিকে
রাখিত তোমার জন্য। নীরবিন্দু যত
দেখিতে কুসুমদলে, হে সুধাংশুনিধি
অভাগীর অশ্রুবিন্দু।

—বীরাঙ্গনা কাব্য

ছাড়ি অধ্যয়নশালা বনে বনান্তরে
ফিরিতে পুষ্পের তরে—গাঁথি মাল্যখানি
সহাস্য প্রফুল্ল মুখে কেন দিতে আনি
এ বিদ্যাহীনারে? এই কি কঠোর ব্রত?
এই তব ব্যবহার বিদ্যার্থীর মতো!
প্রভাতে রহিতে অধ্যয়নে, আমি আসি
শূন্য সাজি হাতে লয়ে দাঁড়াতাম হাসি
তুমি কেন গ্রন্থ রাখি উঠিয়া আসিতে
প্রফুল্ল শিশির-সিক্ত কুসুমরাশিতে
করিতে আমার পূজা?

—কচ ও দেবযানী

১৮৬০ খৃঃ অব্দে রচিত বীরাঙ্গনা কাব্যের শব্দ ও ছন্দের রূপ অনাহত প্রবাহে চল্লিশ বৎসর পরে আর এক মহাকবির লেখনীমুখে উৎসারিত হয়েছে। মাইকেলের ঊষা বন্দনায় পাই—

"কনক উদয়াচলে, তুমি দেখা দিলে হে সুরসুন্দরি!"
"মুকুতামণ্ডলে তুমি সাজাও ললনে কুসুম কামিনী!"
"ভালে তব জ্বলে দেবি আভাময় মণি বিমল কিরণ।"

'উর্বশী'র শব্দ-লালিত্য ও ছন্দ-গরিমার পূর্বাভাষ উক্ত পদগুলিতে পাওয়া যায় না কি?

* * * *

নাটকে মাইকেলের কীর্তি অসাধারণ। তার প্রথম নিদর্শন নাটকীয় চরিত্রগুলির মুখে সংলাপের ভাষায়। কথিত অর্থাৎ চল্‌তি ভাষা তখনো কোন কুলীনরূপ পায়নি। প্রতিভাবান্ সাহিত্যরথীদের কয়েকজনের হাতে সবেমাত্র তার পরীক্ষা সুরু হয়েছে। ভাবপ্রকাশের বাহন হিসাবে অ-সাধু বা চলতি ভাষা তখন গ্রাহ্য হয়নি। কিন্তু মধুসূদন নিঃসঙ্কোচে চলতি ভাষাকেই বরণ করে নিয়েছিলেন এবং তাঁর হাতে সে ভাষা যেমন খেলেছিল, তাও একদিক দিয়ে তাঁর অদ্ভুত সৃষ্টিকুশলী প্রতিভার প্রমাণ। মাইকেলের গদ্যের একটি নমুনা উদ্ধৃত করা গেল, পাঠক এর প্রাঞ্জলতা ও সরল কারুমিতি লক্ষ্য করবেন।

—"দেবি! দেখুন দেখি! এই যে সুগন্ধ গন্ধবহের সহকারে আকাশে ভাসছে, এর যে কোন্ ফুলে জন্ম, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমাদের বিলক্ষণই প্রতীতি হচ্ছে যে, ফুলটি অতীব সুন্দর। এ যেন নীরবে আমাদের কাছে আপন জন্মদাতা কুসুমের সুচারুতার ব্যাখ্যা কচ্চে।"

নাটকের ভাষার আর একটি ভঙ্গীর আদি প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন। মাইকেলোত্তর কালে গিরিশ প্রমুখ বহু নাট্যকার এই ভঙ্গীর রচনার উপর ভিত্তি করে তাঁদের রচনার সৌষ্ঠব বিধান করেছেন। ভাঙাচোরা অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটকের নরনারীর মুখে ভাষা দিয়েছেন তিনি। যথা পদ্মাবতী নাটকে—

"আমি কলি!
এ বিপুল বিশ্বে কে না কাঁপে
শুনিয়া আমার নাম?
সতত কুপথে গতি মোর।
নলিনীরে সৃজেন বিধাতা—
জলতলে বসি আমি মৃণাল তাহার
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজ বলে।"

আমরা ২৯শে জুনের দিনে আবার স্মরণ করি সেই বাংলার কবীশ শ্রীমধুসূদনকে—বঙ্গীয় রেণেসাঁসের প্রথম মহাকবিকে ; যিনি ছিলেন নূতনত্বের মন্ত্রগুরু, যিনি বাংলা ভাষার তৃণাদপি সুনীচ কমনীয়তাকে উন্নীত করেছিলেন শ্রী ও শক্তির সংযুক্ত ভূমিকায়।

মধুসংহিতা

ওঁ মধু! মধু! মধু!

মন্ত্রোচ্চারণ করছি না। নিছক পেটুকে আহ্বানে মধু নামে একটি খাদ্যবস্তুকেই অভিনন্দন জানাই। পৃথিবীর যাবতীয় খাদ্যের মধ্যে মধুর চেয়ে রোমাণ্টিক খাদ্য আর কি হতে পারে? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাসায়নিকের জ্ঞানের অহংকারকে খর্ব করে দিয়ে একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গ আজও পৃথিবীর কুঞ্জে কাননে যে রসাল কীর্তি রচনা করে চলেছে, তারই দানের গুণে যুগ যুগ ধরে মানুষের গলা মিষ্টি হয়েছে। কবি সেক্সপীয়ারের কাছে আমাদের এই ক্ষুদ্র পতঙ্গটি শ্রদ্ধা আদায় করে ছেড়েছে

......So work the honey bees,
Creatures that, by rule in nature, teach
The art of order to a peopled Kingdom.

মধুপ্রীত কবি ভার্জিল হুলায়ুধ মৌমাছিকে 'কালো আঙুর' ব'লে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।

* * * * *

জীবনের সর্ব আচরণে আমরা আন্তরিকভাবে মধুরতাকে কামনা করি। ওঁর স্বভাব মধুর, তাঁর দৃষ্টি মধুর, ছোট ছেলেটির হাসি কী মধুর! মানুষের জীবনের যত প্রাপ্য ও কাম্যের প্রকৃতিকে অজস্র ভাষা দিয়েও যখন বুঝিয়ে উঠতে পারি না, তখন একটি মাত্র উপমা দিয়ে তাহা প্রকাশ করে ফেলি—মধুর! সকল মনের মাধুরী মিশায়ে মানুষ একমাত্র তাকেই রচনা করতে চায়, জীবনের ঊর্ধ্বলোকে যা অপ্রত্যক্ষের রহস্য হয়ে আছে। চরন্ ইব মধু বিন্দতি— যুগ যুগ ধরে আমরা যে এগিয়ে চলেছি তার প্রাপ্তি ও আনন্দ একমাত্র মধুর সঙ্গেই তুলনীয়।

মধু আমাদের জীবনের মাঙ্গলিক উপচারের মধ্যে একটি। রাজ অভিষেকের কাজে মধু চাই, শিশুর জাতকৃত্যে মধু চাই। কবি ভার্জিল মধুর বন্দনা ক'রেছেন। মধু ও মধুপতঙ্গ আরিস্টটলের প্রিয় ছিল, মেটারলিঙ্ক জীবনের দর্শনকেই মধুময়রূপে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন।

সারা পৃথিবীর আয়ুঃশাস্ত্রী পণ্ডিত ও চিকিৎসকের দল মুক্তকণ্ঠে মধুর মহিমাকে স্বীকার করে গেছেন। আয়ু কান্তি মেধা—জীবনের স্বরূপকে সুন্দর করার আয়োজনে মধুর চেয়ে মধুরতমর কিছু আর হতে পারে না। আমাদের ভাষায় 'মধু' আজও নিরুপম হয়ে রয়েছে, মধুর সঙ্গে আমরা অন্যকে তুলনা করি, মধুকে কারও সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

* * * * *

মধুকে নিছক খাদ্য আখ্যা দিলে যেন এর গৌরবকে ছোট করা হয়। আধুনিক রাসায়নিকের লেবরেটরীতে হাজার টন নকল শর্করা তৈরী হতে পারে, কিন্তু 'মধু' হবে না। মানুষের বুদ্ধির চেয়ে একটি ছোট পতঙ্গের প্রবৃত্তি যে সূক্ষ্মতায় ও দক্ষতায় এখনো কত বেশী উন্নত হয়ে আছে, তার প্রমাণ এই মধু। দিনের আলো দেখা দিতে না দিতে এই কোটি কোটি পতঙ্গ-কেমিস্টের ঘুম ভেঙ্গে যায়। চাক ছেড়ে উড়ে চলে যায় দূরে ও সুদূরে—বনে উপবনে। ডি-এস-সি ডিগ্রী নেই, তবুও ফুলের বুকে কোথায় তার মধুময় আত্মাটি লুকিয়ে আছে, তার সন্ধান বিনা মাইক্রোস্কোপে খুঁজে বার করে। নিরাস্বাদ জগত থেকে এক বিচিত্র স্বাদুতা আহরণ করে নিয়ে যায়। জড় ও জঙ্গমের জগতে এক গোপন পদার্থলীলাকে সে বন্দী করে, সুললিত করে, তাকে মধুতে পরিণত করে। মধুর মধ্যে তাই যেন মহাকাব্যের আস্বাদ আছে।

* * * * *

একটা আশঙ্কার বিষয়, আমাদের মধ্যে তবুও মধু সম্বন্ধে একটা উদাসনীতা এসেছে।

আগে ছিল না, এটা বর্তমানের লক্ষণ। এই লক্ষণটা যেন পরোক্ষভাবে আমাদের বর্তমান সাংস্কৃতিক দীনতাটুকু স্মরণ করিয়ে দেয়। মধুকে খাদ্য হিসাবেও আহ্বান করতে আমরা আজ ভুলে গেছি। স্যাকারিন-উপাসনার যুগে আমাদের এ ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু এ ভুল বড় ভয়ানক ভুল। মধু কাল্‌চার ঠিক ঔদরিক কালচার নয়। এর সঙ্গে ফুলের বন জড়িয়ে আছে। কমল বন আছে। শিল্পীর সৃষ্টির পক্ষে সবচেয়ে কোমল উপকরণ নবনীত সদৃশ মোম এর সঙ্গে সঙ্গে আছে। মৌমাছির জীবনে জৈব প্রবৃত্তির এক বিরাট প্রকাশ রয়েছে। মৌচাকের গঠনে জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি। মৌচাকের অভ্যন্তরে সমাজ রয়েছে, যে সমাজের রীতিনীতিতে কত বিচিত্র সত্য কাজ করছে। দেখবার, শিখবার ও বুঝবার মত এক পরম গবেষণার আধার এই মৌচাক।

* * * * *

গান্ধীজী বলেছেন মানুষের শ্রমের আদর্শ হবে মৌমাছির মত। মানুষের তৈরী পণ্য হবে মধুর মত—পৃথিবীর কোন ফুলের প্রাণকে আঘাত না করেও তারই ভেতর থেকে প্রয়োজনের পণ্য সৃষ্টি হতে পারে। একমাত্র এই পণ্যই নিষ্কলঙ্ক পণ্য। মানুষের শ্রম হবে মধুকরের শ্রম—এই শ্রমের মধ্যে শিল্পীর সাধনা, গানের গুঞ্জন, কাব্য, বিজ্ঞান বিচিত্রতা, সামাজিকতা শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও সাম্য—একই বিধানে মিশে আছে। একটি অখণ্ড পরিপূর্ণ কাজের জীবনের আদর্শ। কাজের মধ্যেই গান, কাজের মধ্যেই শিল্পসৃষ্টি, কাজের মধ্যেই রোমান্স।

* * * * *

গান্ধীজী প্রবর্তিত গ্রাম-উদ্যোগের মধ্যে মৌমাছি পালন অন্যতম বিষয়। এই নূতন শিল্পটির একটি বড় অর্থ আজ আমরা নতুন করে উপলব্ধি করতে পারি। একটি পুষ্টিকর খাদ্যবস্তুকে শুধু বেশী করে পাওয়ার জন্যই এই প্রচেষ্টা নিশ্চয় নয়। শ্রম ও রুচির একটি বড় আদর্শকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার সুযোগ এর মধ্যে রয়েছে। সব খেয়ালের বড় খেয়াল, সবচেয়ে সুন্দর Hobby, বিজ্ঞানে ও কবিত্বে মণ্ডিত এই একটি খেলা যদি ঘরে ঘরে সত্য হয়ে ওঠে, জাতির মন কী মধুর ঐশ্বর্যে ভরে উঠবে, তা অনুমান করতে পারি।

জানি না, চৌষট্টি কলার মধ্যে মৌমাছি পালনের স্থান আছে কি না। কিন্তু মানুষের মনের ধর্মের উপযোগী এর চেয়ে বড় আর্ট আছে বলে মনে হয় না। মৌমাছির মত হুলবিলাসী রাগী পতঙ্গও তার প্রবৃত্তি ভুলে যায় যে মমতার খেলায়, যে খেলার প্রয়োজনে ঘরের আঙ্গিনায় যূঁই, গন্ধরাজ ও গাঁদা ফুলের বর্ণ ও সৌরভকে আমন্ত্রণ করতে হয়, এ হলো সেই খেলা। অ্যালসেসিয়ান আর টেরিয়ার পুষে অনেক ফ্যাশানের পরীক্ষা আমাদের হয়ে গেছে। একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি—Bee-Culture আমাদের কালচারকে ছোট করে না বড় করে?

বানর ও বাবুই পাখি

এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকা এই খবরটি প্রচার করেছেন--"সেণ্ট চার্লস (ভার্জিনিয়া), ৩০শে জুলাই--গতকল্য ভার্জিনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের পাঁচ হাজার রেড ইণ্ডিয়ান গলায় র‍্যাটল স্নেক এবং কপারহেড প্রভৃতি বিষধর সাপ জড়াইয়া সর্প-পূজা করিতেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া এই অদ্ভুত অনুষ্ঠানে বাধা দেয়। তখন সর্প-পূজক রেড ইণ্ডিয়ানেরা উন্মত্তভাবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করে। সর্পগুলিকে গলায় জড়াইয়া লইয়া উহারা আদর করিতে থাকে। সৈন্যগণকে উহাদের গলা হইতে সাপগুলিকে মাটিতে ফেলিয়া দিতে বাধ্য করে এবং সাপগুলি মারিয়া ফেলে।"

সংবাদদাতা ঘটনাটিকে 'অদ্ভুত' আখ্যা দিয়েছেন।

*　　*　　*　　*

এই সংবাদটির মধ্যে আমরা তথাকথিত সভ্য মনোবৃত্তিরও একটি উদাহরণ দেখতে পাই ; সেণ্ট চার্লসের সংবাদদাতার লেখা উচিত ছিল--সৈন্যদল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া এই অদ্ভুত অনুষ্ঠানে কিম্ভুতের মত বাধা দেয়।"

ঐ অনুষ্ঠানের দৃশ্যটা একবার কল্পনা করা যাক্। পাঁচ হাজার রেড ইণ্ডিয়ান গলায় সাপ জড়িয়ে শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে পূজাসনে বসে আছে। তাদের দক্ষিণে টেনেসির দেবদারু অরণ্যের সীমাহীন শোভা, বামে কেণ্টাকির গিরিমালা। সারা উপত্যকার গায়ে প্রভাত সূর্যের আলোক ছড়িয়ে পড়েছে, উৎসবের আকুলতায় সাড়া দিয়ে বনান্তের বাতাস ভেসে আসে। পূজারীদের কণ্ঠলগ্ন হাজার হাজার কপারহেড ফণা তুলে বিহ্বল শ্বাসবায়ুর গর্বে হিস্‌হিস্ শব্দ করে। তারই সঙ্গে সুর মিলিয়ে হাজার হাজার র‍্যাটল স্নেকের দেহভঙ্গীর উৎফুল্লতায় ঝুম্‌ঝুম্ মন্দিরা বাজে। ফণিমালায় বিভূষিত মহাযোগীরূপী পাঁচ হাজার শিব বসে আছেন ধ্যানস্থ হয়ে।

*　　*　　*　　*

চার্জ! ডিসপার্স! হঠাৎ এক রূঢ় হুংকার শোনা যায়। রাইফেলধারী কয়েকশত সৈনিক, কয়েক শত শ্বেতসভ্যতার পাহারাওয়ালা, পূজারী রেড ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণ করে। সন্ত্রস্ত পূজারীদের গলা থেকে হাজার হাজার ফণিমালা খসে পড়ে। সৈনিকেরা সাপগুলিকে তাড়া করে হত্যা করতে থাকে। ভীত ও আহত সাপগুলিকে গলায় জড়িয়ে রেড ইণ্ডিয়ানেরা আদর করে, সান্ত্বনা ও সোহাগে শান্ত করে তোলে। পর মুহূর্তে আবার আক্রমণ হয়। তাদের উৎসব-সহচর হাজার হাজার সৃঞ্চারিণী জীবল্লতার শবের দিকে তাকিয়ে থাকে। শোকার্ত পূজারীদের কান্নায় ভার্জিনিয়ার উপত্যকা করুণ হয়ে ওঠে।

*　　*　　*　　*

এই যদি সভ্য আচরণের উদাহরণ হয়, তবে আজ আবার নতুন করে একটা পুরানো প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায়। তবে শুধু ভ্যাণ্ডালেরা (Vandal) কেন ইতিহাসে এত কুখ্যাত হয়ে আছে? কালাপাহাড় তাহলে একাই দোষী হবেন কেন? যাকে বুঝাবার মত শক্তি নেই, যা নিতান্তই অভিনব, যা অপরিচিত--তাকে ভেঙে দেওয়া এবং মেরে ফেলাই বোধ হয় সভ্যতার রীতি। বাঁদর বাবুই পাখীর বাসা ছিঁড়ে ফেলে দেয়। যে উন্নত জৈবিক প্রবৃত্তির অনুগ্রহে বাবুই পাখী শিল্পী হতে পেরেছে, বাঁদরের তা নেই। বানরীয় সভ্যতায় তাই বাবুই পাখীর বাসার কোন মূল্য নেই। সেটা সম্পূর্ণ 'অদ্ভুত'—অতএব নিষ্প্রয়োজন।

২৯শে জুলাই তারিখে যে সৈনিকেরা রেড ইণ্ডিয়ানদের গৃহপালিত সাপগুলিকে মেরে ফেললো, একশো বছর আগে এই সৈনিকদের প্রপিতামহের দল ঐ রেড ইণ্ডিয়ান পূজারীদের প্রপিতামহের দলকেই ঠিক এই ভাবেই সভ্যতার অহঙ্কার নিয়ে এবং সভ্যতার দাবীতেই মেরে

ফেলতো। একটি রেড ইণ্ডিয়ানের খুলি কলোনি অফিসে জমা দিলে আড়াই পাউণ্ড পুরস্কার পাওয়া যেত। সেই পুরাতন শিকারী মনোবৃত্তি আজ স্কাই স্ক্রেপারের লিফ্‌ট বেয়ে ওপরে উঠলেও 'উন্নত' হতে পারেনি।

*   *   *   *

র‍্যাট্‌ল স্নেক এবং কপারহেড বিষধর সাপ। কামড়ালে মৃত্যু ঘটে। কিন্তু ঐ যে আদরিণী গৃহপালিত গাভীটি আঙিনায় কচি ঘাস খেয়ে ফিরছে, তার শিং আছে এবং গুঁতিয়ে দিলে মৃত্যু হতে পারে। আপনার নিত্য বৈকালের পোলো খেলার সঙ্গী ঐ আদুবে ঘোড়াটি চাট্‌ মেরে মৃত্যু ঘটাতে পারে। আর কী ভয়ানক হিংস্র আপনার পোষা অ্যালসেসিয়ানটি, যে কোন জীবেব টুঁটি ছিঁড়বার জন্য ছটফট করছে। তবু এরা আপনার ঘরের জীব। এই সব গোধন আর কুকুরধন আপনার গর্বের সম্পদ।

অস্বীকার করা যায় না, এরা সত্যিই সম্পদ। মানুষের সংসারে এরা কাজের জীব হয়ে উঠেছে। কাজের সম্পর্কে এসেই এই সব পশুও কমবেশী সামাজিক জীব হয়ে উঠেছে। গরু, ঘোড়া, কুকুরকে মানুষ আদর করে। এই আদরের কোমল করস্পর্শের গুণে গরু ঘোড়া ও কুকুরের মেজাজ থেকে হিংসা-ধর্ম মুছে গেছে। মেজাজ খারাপ না হলে এরাও হিংসা করে না।

তা ছাড়া শুধু আদরের দাবীতেই অনেক জীব মানুষের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। বনের কাকাতুয়াকে ধরে এনে মানুষ দাঁড়ে বসিয়ে রেখেছে, এটা নিশ্চয় অর্থকরী বিলাস নয়। কাকাতুয়াকে দেখতে ভাল লাগে, পোষ মানাবার মধ্যেই একটা আনন্দ আছে। এটা একটা সখ, একটা শিল্প, একটা রুচি। আদিম সমাজের ভাষায়, এটাই হলো 'যাদু'।

*   *   *   *

পাঁচ হাজার র‍্যাট্‌ল স্নেক ও কপারহেড! ভাবতেই সভ্য মানুষের গা সির্‌ সির্‌ করে উঠে। কি সাংঘাতিক দৃশ্য! পাঁচ হাজার অপমৃত্যুর বিষ, পাঁচ হাজার শীতল শোণিতের লতা কিল-বিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখা মাত্র মেরে ফেলতেই ইচ্ছে করে।

হ্যাঁ, তাই হয়। কারণ ঐ রেডইণ্ডিয়ান পূজারীদের মনের মত মন আধুনিক আমাদের নেই। শ্বেতসভ্যতার পাহারাওয়ালাদের আরও বেশী করে নেই। যে আদরের আর্ট ও কৌশলে মানুষ একদিন বনের পশু, গরু, ঘোড়া ও কুকুরকে বশ করতে পেরেছিল, সেই আর্টেরই উৎকর্ষ রেড-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এক উচ্চস্তরে পৌঁছেছে ; আমরা পিছিয়ে আছি। আমরা তার খবরও রাখি না। রেড-ইণ্ডিয়ানের চক্ষে কপারহেড ও র‍্যাট্‌ল স্নেক নিশ্চয় সুন্দর। রেড-ইণ্ডিয়ানের আদর সাপেরা বুঝতে পারে—বিষধর ভুজঙ্গের দল মন্ত্রশান্ত হয়ে থাকে। এই যাদুকরের গুণ, এই শিল্পীর গুণই সভ্যতার বিজ্ঞানে সব চেয়ে বড় গুণ, যে গুণের কারণে পশু ও মানুষ তার নিজ নিজ জৈব প্রবৃত্তি বদলে দিতে পারে—এক নতুন সামাজিক প্রবৃত্তি রচনা করে—মিলন ধর্ম।

এই পোষ-মানার গুণে, এই আদরের আর্টের প্রভাবে আধুনিক সভ্য মানুষের সংসারেই একটি প্রবৃত্তি-রূপান্তরের পরীক্ষা কিছুকাল হলো সফল হয়েছে। মৌমাছি পালনের কথা সবাই শুনেছেন। এই রাগী হিংসুক পতঙ্গটিও আজ গৃহস্থের ঘরের সম্পদ, গর্ব ও লক্ষ্মীশ্রী হয়ে উঠেছে।

*   *   *   *

তবে সাপের সম্পর্কে এত হতাশা কেন? পাঁচশো সাতশো বা এক হাজার বছর পরে সভ্য মানুষের সংসারেই গোয়াল আস্তাবল আর মৌচাকের মত এক একটি সাপুড় বা সাপশালা থাকবে, এটা নিছক কল্পনা নয়। শুধু একটা ঘটনার অপেক্ষায় আমরা রয়েছি। অর্থাৎ সাপের বিষের কোন একটা বড় গুণ সদ্ব্যবহার বা উপকারিতা একবার আবিষ্কার হয়ে যাক্‌।

অচিরেই এই ঘৃণাভাজন জীবটিই সবাকার প্রিয় হয়ে উঠবে, সকাল সন্ধ্যা পোষা সাপের বিষ দোহনের জন্য এক নতুন শ্রেণীর 'গয়লা' দেখা দেবে পৃথিবীতে, এ কল্পনাও অবাস্তব নয়।

* * * *

আধুনিক সৈনিকের কোমরে পিস্তল ঝুলছে। এটা কি রকম ব্যাপার? যদি বলা যায়, কোমরে তারা এক একটি লোহার সাপ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে? যে কোন ক্ষণিক প্ররোচনা ও উত্তেজনায় অপরের মৃত্যু ঘটাতে পারে। আধুনিক মানুষের মোটর গাড়িও এক একটি সাপ। যে কোন সময় যে কোন পথিকের প্রাণ নিতে পারে। এক কলকাতা সহরে বছরে যত লোক মোটর চাপা পড়ে মরে কোন জেলায় তত লোক সাপের কামড়ে মরে কিনা সন্দেহ।

পূজারী রেড ইণ্ডিয়ানের র‍্যাটল্ স্নেক হত্যা করে শ্বেতসভ্যতার পাহারাওয়ালারা যে কি পরম তত্ত্ব প্রমাণ করতে চান, তা বোধগম্য হয় না। একটি মাত্র যুক্তি, এই বিষধর সাপ যে-কোন মুহূর্তে কাউকে কামড়ে দিয়ে মৃত্যু ঘটাতে পারে। কিন্তু এই সভ্যদের একবার চ্যালেঞ্জ করা হোক্, মৃত্যু ঘটাবার কাল্চার তাঁরাই বা কি কম করেন? মোটর রেসে অপঘাত মৃত্যু হয় না কি? সার্কাসের যে সব বড় বড় লাফ ঝাঁপের কেরামতির মধ্যে যত বেশী মৃত্যুর আশঙ্কা আছে, সেই সব খেলাগুলিই সভ্যদের কাছে বড় মধুর। এই সভ্যদের বুকে পিঠে আজও সাপের ছবি উল্কি করে আঁকা আছে। সাপ, বিছা, মাকড়শা ও কাঁকড়া প্যাটার্ণের গহনা সভ্যেরা তো খুব বেশী করেই ভালবাসেন।

* * * *

যত দোষ করেছেন রেড ইণ্ডিয়ানেরা। কারণ তারা শিল্পীর গুণে ও যাদুকরের গুণে সমৃদ্ধ। তারা বিষধর সাপকে আদর করে বশ করতে শিখেছে। সভ্যেরা আজও এই আর্ট আয়ত্ত করতে পারেনি, তাই এই বনেদী মানুষ গোষ্ঠীর কীর্তিকে তারা হয়তো সইতে পারে না। বাবুই পাখির বাসা ছিঁড়ে নষ্ট করে দেওয়াই বানর সভ্যতার গর্ব।

কবি ও বিজ্ঞানী

"মোর উত্তরীয়ে--
রঙ লাগায়েছি প্রিয়ে"

কবি তাঁর উত্তরীয়ের প্রান্তখানি যদি নানা রঙে রঙীন করেই রাখেন, সেটা কি তাঁর অপরাধ? রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করেছেন--কবিকে মাত্র এই কারণেই নিছক রোমাণ্টিক বলো না, কবিরাও বাস্তবিক, কবিরা নিছক কল্পনাবাদী নন। বস্তুর গায়ে যদি তাঁরা রঙ ছিটিয়ে দেন, তাতে বস্তুর ধর্ম ক্ষুন্ন হয় না। বস্তু বস্তুই থাকে। মাঝখান থেকে মানুষ একটি নতুন জিনিস লাভ করে--রূপ।

জল মাটি আকাশ জুড়ে জড় ও জীবনের লীলায় কত সহস্র বস্তু ছড়িয়ে রয়েছে। এ সবই আমাদের নিসর্গের দান, স্বাভাবিক পাওয়া। বাস্তবিকেরা এই স্বাভাবিক পাওয়ার ওপরে উঠতে চান, তাঁরা বিজ্ঞানের বলে জড় জীবনের নানা নতুন প্রকরণ আবিষ্কার করেন। শুধু পথে কুড়িয়ে পাওয়া স্ফটিক নিয়ে বাস্তবিকেরা তৃপ্ত হন না। তাঁরা নতুন স্ফটিক তৈরী করেন। বাস্তবিকের সহায় বিজ্ঞান, ল্যাবরেটরী, বুদ্ধি।

* * * *

কিন্তু কবিই বা কিসে কম যায়? আকাশে ভূধরে জীবনের আঙিনায় শুধু পড়ে-পাওয়া রূপ, বর্ণ-গন্ধ-শব্দ নিয়েই শিল্পী ও কবিরা তৃপ্ত থাকেন না। তাঁরাও নতুন রূপ সৃষ্টি করেন। একই বেদনার চোখে তাঁরা নতুন অশ্রু আনেন, একই আনন্দের হর্ষধ্বনিতে তাঁরা নতুন সুর সঞ্চার করেন। বস্তুকে কখনো অবাস্তব করেন না কবিরা, বস্তুর রূপ ফিরিয়ে দেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন--

এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি
দিল পাড়ি
কামরায় গাড়ি ভরা ঘুম
রজনী নিঝুম।

কবিরাই বা কম বস্তুবাদী। প্রাণকে রাতের রেলগাড়ির সঙ্গে তুলনা করলেন। রেলগাড়ির মত একটা নিতান্ত আধুনিক কৃত্রিম সৃষ্টি, লৌহ কাষ্ঠ ও বাষ্পের একটা প্রচণ্ড পদার্থকীর্তির জিনিসকে উপমা হিসাবে প্রাণের মত এক দুর্জ্ঞেয় বিচিত্র ও অপার রহস্যেব পাশে বসিয়ে দিলেন? রেলগাড়িকে প্রাণ পবনের ডিঙ্গা নাম দিতে পারতেন কবি, কিন্তু দেননি। কবিরা রূপবাদী বাস্তবিক, কবিরা বস্তুবাদী রূপস্রষ্টা।

* * * *

কবিরা এইখানে এসে হঠাৎ হয়তো একটু গর্ব করে ফেলতে পারেন, বাস্তবিকেরা নাকি নেহাৎ বিরূপবাদী, বিজ্ঞানী বাস্তবিকেরা নিছক গদ্যময় মানুষ। তাঁরা শুধু জড়ধর্মকেই পূজা করেন। পদ্মফুল দেখলেই তাঁদের পদ্মমধুর কথা মনে পড়ে, বকফুল দেখলে ভাজা করে খাবার বাসনা লালায়িত হয়ে ওঠে, সূর্যরশ্মির আভা তাঁদের মনে কোন পুলক জাগায় না, তাঁরা নাকি শুধু হিলিয়মের কথা ভাবেন।

* * * *

ভিত্তিহীন অভিযোগ। রোমাণ্টিক আর বাস্তবিকের এই বিবাদে কোন পক্ষের অহমিকাকেই প্রশ্রয় দেবার কোন কারণ নেই। রোমাণ্টিক বা ভাবুক কবি ও শিল্পীরা যেমন বস্তুবাদী, বাস্তবিকেরাও তেমনি রোমাণ্টিক ভাবুক ও রূপবাদী।

এইবার বাস্তবক্ষেত্রেই এসে একটু তুলনা করা যাক্।

স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির রূপকে শত শত কবি শত ছন্দে স্তোত্রে বন্দনা করে গেছেন। প্রত্যেকেই দেশ জাতি ও ভূমিকে এক একটি নতুন রূপে প্রকাশ করেছেন। আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক্। ভারতভূমির ইতিহাসকে কবিরা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। ভারতভূমির এক একটি রূপকে তাঁরা কল্পনা দিয়ে গড়েছেন। সুনীল জলধির হৃদয়োত্থিতা ভারতভূমিকে মানবতার শতদলরূপে কবি দেখতে পেয়েছিলেন। কেউ বা দেখেছেন তুষারকিরীট ভূষিতা ভারতভূমির রাজেশ্বরী মূর্তি। কেউবা দেখেছেন সারা জাহানের চেয়ে নয়নাভিরাম গুলিস্তান রূপে। মাতৃভূমির পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গাকে মুকুতা হার রূপেই কেউ চিনতে পেরেছেন। কেউ অন্নদারূপে, কেউ দশপ্রহরণধারিণী রূপে।

কবিরা বিশ্বাস করেন—মেঘ কেটে যাবে, ভারতভূমির ললাটে আবার নতুন গরিমার ছটা ফুটে উঠবে।

* * * *

কবিদের ধ্যানে ভারতভূমির রূপ সত্য হয়ে আছে। কিন্তু বাস্তবিকেরা কি বলেন? বাস্তবিকের কাছে ভবিষ্যতের পটে কোন্ ভারতবর্ষের ছবি আঁকা হয়ে আছে? বাস্তবিকের এই ভারতভূমি কি কবিদের ধ্যানের ভারতভূমির চেয়ে কম রূপময়?

বাস্তবিকেরা হলেন প্ল্যানার। তাঁরাও ভারতভূমিকে গড়ে তুলতে চান। কিন্তু প্ল্যানারের চোখে স্বপ্ন নেই, প্ল্যানারেরা রূপবাদী নয় একথা বললে অন্যায় করা হবে।

দুটি বাস্তবিকের দুটি প্ল্যানের কথা মাত্র এখানে উল্লেখ করা গেল। রূপময়তার গুণে বাস্তবিকের বুদ্ধি দিয়ে গড়া এই ভারতবর্ষ কোন কবির ধ্যানলব্ধ ভারতভূমির চেয়ে বড় না ছোট, এই তুলনামূলক বিচার করে আমরা বাস্তবিক ও রোমান্টিকের বিবাদ নিষ্পত্তি করে দিতে পারি।

* * * *

মার্কিন সাংবাদিক লুই ফিসারের কাছে গান্ধীজী বলেছিলেন—ভারতের সাত লক্ষ গ্রামে ইলেকট্রিসিটি চালু করতে হবে।

দীপান্বিতা ভারতভূমি। সত্যিই আমরা অনাগত সেই ভারতবর্ষের ললাটের নবীন গরিমার ছটা দেখতে পাচ্ছি। বস্তুর এক পরমা শক্তির প্রসন্নতাকে সাত লক্ষ গ্রামের হৃদয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষের মাটি ও বাতাসের প্রতি পরমাণুর তন্দ্রাভঙ্গ হয়েছে। বিজ্ঞানের বৈভব বিগ্রহের মত ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। নতুন গতি, নতুন বেগ, নতুন শব্দ, নতুন আলোকে ভারতভূমির সংসার ভরে গেল। নিজের ক্ষেতের ধানের মত, নিজের বাগানের ফুলের মত, গৃহপালিতা সুশীলা কপিলার মত কোটি বিদ্যুল্লতা ভারতের ঘরে ঘরে বিরাজ করবে। ভারতভূমির এক নতুন সুখদা বরদা ও অন্নদা মূর্তি।

* * * *

ডাক্তার পট্টভি সীতারামিয়া এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেছেন—জাতীয় গবর্ণমেন্ট সারা ভারতবর্ষের খাল কাটার (Irrigation) বন্দোবস্ত করবে, গঙ্গাকে কাবেরীর সঙ্গে যুক্ত করে দেবে।

বাস্তবিকের প্ল্যান রোমান্টিকের স্বপ্নকেও ছাড়িয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ মুকুতা হারের মত লক্ষ প্রবাহিকা সারা ভারতভূমির বুকে ছড়িয়ে থাকবে। প্রাচীন আর্যাবর্তের হৃদয় প্রাচীনতর দ্রাবিড়ের সঙ্গে এক ধমনীতে যুক্ত হয়ে যাবে। লক্ষ বছরের এক একটি পিয়াসী প্রান্তর আর উদাস মৃৎকণিকা রসিত হয়ে উঠবে। রেল লাইন দিয়ে বাঁধা ভারতভূমির শৃঙ্খলিত মূর্তির বিষণ্ণতা ঘুচে যাবে। প্রতি নহরের জলে গ্রামের ছায়া টলমল করবে। ভারতের পুঞ্জীভূত বেদনা ও দারিদ্র্যের কলুষকে লক্ষ নবগঙ্গার জলে ধুয়ে নিয়ে যাবে। গাঁয়ের মন্দির মসজিদের মত, গাঁয়ের ছায়াগুরু বটবৃক্ষের মত গ্রামের আত্মীয় হয়ে শুচিতা ও তৃপ্তির পসরা নিয়ে ছোট

ছোট সলিলস্রোত গ্রামের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যাবে। নতুন ভারতের এই লক্ষ জললতার দল প্রতি গ্রামের সই হয়ে থাকবে। সারা ভারতভূমির সেই এক বিগলিত করুণা সুজলা সুফলা মূর্তি।

এবং, হয়তো এক কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রে গ্রামবালিকার দল নহরের জলে লক্ষ লক্ষ প্রদীপ ভাসিয়ে ঘরে ফিরে যাবে। কোন এক উৎসবের প্রত্যূষে গ্রামবালকের দল লক্ষ কাগজের নৌকায় নাগকেশরের কুঁড়ি ভাসিয়ে দেবে।

কবি এবং প্ল্যানার, রোমাণ্টিক ও বাস্তবিক, ধ্যান এবং প্ল্যান--রূপ সৃষ্টিতে কেউ কারও চেয়ে কম নয়। কেউ কারও প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। গঙ্গা ও কাবেরীর স্বপ্ন এক হয়ে মিশে যাবে।

ইতিহাসের উপেক্ষিত

ভারতবর্ষে নাকি অনেকগুলি সম্প্রদায় আছে। জাতীয় শাসনতন্ত্রে এই সব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব থাকা চাই। এই নিয়ম অনুসারে সিমলাতে একটা বৈঠক হয়ে গেল। সম্প্রদায়গুলির নাম শোনা গেল--হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ, পার্শি, অনুন্নত তপশীলী হিন্দু ইত্যাদি।

এই সব সম্প্রদায় নিয়েই ভারতবর্ষ। এই সব ভিন্ন ভিন্ন এবং বড় বড় সম্প্রদায়গুলিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব দিলেই নাকি-গণতান্ত্রিকতা সার্থক হয়।

সিমলা আসরের চেহারাটা মনে মনে একবার কল্পনা করা যাক্। সব সম্প্রদায়ের লোক আছেন এর মধ্যে। সকলেই আসন গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তবু মনে হয়, কোথায় যেন একটা অপূর্ণতা রয়ে গেছে। ভারতবর্ষ বলতে আমরা যা বুঝি, সেই ধারণার মধ্যেই একটা গলদ রয়ে গেছে। এই আসরে একটি সমাদরের আসন পাতা হয়নি।...একটি যোগ্য অতিথি অনাহুত রয়ে গেছে।

হিন্দু-মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, পার্শী ও অনুন্নত হিন্দুকে একত্রিত করে বসিয়ে দিলেও আমার ভারতবর্ষের আসর পূর্ণ হয় না। এরা ছাড়াও আর একজন আছেন, যার অনুপস্থিতি এই ভারতের রাষ্ট্রীয় খসড়াকেও অসম্পূর্ণ করে রেখেছে।

* * * *

ইনি ভারতের আদিবাসী। আদিবাসীরা সংখ্যায় আড়াই কোটি। এই আড়াই কোটি মানুষের সংসারের সুখ দুঃখ বেদনার বাণী শোনাবার জন্য কোন প্রতিনিধিকে আহ্বান করা হয়নি। তারা অরণ্যের ছায়ার আড়ালে সরে রয়েছে, শিক্ষিত ভারতীয়ের জাতিবাদ ও রাষ্ট্রীয়তা হয়তো ভুল করে আজও তাদের কথা স্মরণ করে উঠতে পারছে না। কিন্তু ভারতের মানবতার ইতিহাসে যার প্রথম আবির্ভাব, ভারতের গভীর অরণ্যের কাঁটাগাছের গায়ে প্রথম কুঠারাঘাত করে যারা মানুষের বসতি স্থাপন করেছে, ভারতের শোন গঙ্গা সিন্ধু বিন্ধ্যাচলের জল আর পাথরকে যারা প্রথম স্পর্শ করেছে, শুধু তারাই কি অপাংক্তেয়?

ভারতের অধিবাসীদের সম্বন্ধে শিক্ষিত ভারতীয়ের ধারণা অনেক ভুল সংস্কারে আবিল হয়ে আছে। অনেকে আদিবাসীদের নিছক জংলী বলে মনে করেন। অনেকে মনে করেন, আদিবাসীরা আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটা মানবগোষ্ঠী। একটি নির্বাসিত জাতি। ধর্মে আচারে সামাজিকতায় ও ভাষায় আদিবাসীরা ভিন্নতর। তারা অনার্য।

* * * *

ভারতের একজাতীয়তা বা সাংস্কৃতিক সংগঠনের যে কোন প্রস্তাবের মধ্যে অজ্ঞাতসারে এক ধরনের আর্যামি দেখা যায়। আধুনিক ভারতীয়েরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে চিন্তা করার সময় এই প্রবীণতম ভারতীয়দের কথা অন্যমনস্ক ভাবে ভুলে যান।

আমরা ভুলে যাই যে, আমাদের বহু দেবদেবীর প্রতিমাকে আমরা এই আদিবাসীর সংস্কৃতি থেকেই ধার করে এনেছি! আমরা ভুলে যাই যে, ভারতীয় সভ্যতার প্রথম প্রস্তরবিগ্রহটি আদিবাসী পুরোহিতের দ্বারাই স্থাপিত হয়েছিল। আমরা ভুলে যাই যে, আদিবাসীর নৃত্যগীতের বহু আঙ্গিক ও পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করেছি। আদিবাসীদের বহু উৎসব এবং গাথাকেই আমরা একটু রকমফের করে আমাদের নানা যাগযজ্ঞ ব্রত ও পুরাণ তৈরী করে নিয়েছি। আদিবাসীর সংস্কৃতি ও আধুনিক ভারতীয়ের সংস্কৃতি মধ্যে বহুদিন আগে থেকেই ঐতিহাসিক নিয়মে দেনার সম্পর্ক হয়ে গেছে। আদিবাসীরা মহাজন এবং আধুনিকেরা অধমর্ণ, এই দেনা আজও শোধ হয়নি।

আধুনিক ভারতীয়েরা যে এই সাংস্কৃতিক ঋণ পরিশোধ করেননি, তার প্রমাণ আদিবাসীরা আজও তাদের আরণ্য দীনতার মধ্যে রয়ে গেছে। যারা ভারতের প্রকৃত ভূমিজ, তারাই অন্ত্যজ অবস্থা লাভ করেছে। মনের দিক থেকে শিক্ষিত আধুনিক ভারতীয়েরা এখনো কি ভারতবর্ষকে তাঁদের উপনিবেশ মনে করেন?

টাটানগর একশত বৎসর আগে জঙ্গল ছিল। আজ সেখানে ব্লাস্ট ফার্নেসে বিংশ শতাব্দীর ইস্পাত সভ্যতা চোখ ঝল্‌সে দিয়ে জ্বলছে। কিন্তু এখনো এই টাটানগরের আশেপাশে, সিংভূমের জঙ্গলে নগ্নদেহ বির্‌হোর ঘুরে বেড়ায় পাথরের কুড়ুল কাঁধে নিয়ে। বিংশ শতাব্দীর গা ঘেঁসেই প্রস্তরযুগ এখনো অব্যাহতভাবে চলছে। অদ্ভুত দৃশ্য।

আদিবাসীদের ভাষা গান উৎসব সমাজ শিল্প সবই আছে। তাঁদের বাঁশীর সুরটি বিশিষ্ট, তাদের আঙ্গিনায় আলপনার রঙ ও রীতি বিশিষ্ট। ভারতের আদি সংস্কৃতির পসরা আজও তারা বহন করে চলেছে। কিন্তু অন্য বিষয়ে তাদের সংসার দীনতর হয়ে গেছে। আধুনিক যুগের আইন তাদের জীবনে কোন নতুন অর্ঘ্য পৌঁছে দেয়নি, কিন্তু তাদের জীবনযাত্রার পাথেয় অন্নপথ্যের ওপর শাসন বিস্তার করতে কুণ্ঠিত হয়নি। তাদের হাজার বছরের পরিচিত বনস্পতিকে আইনের নির্দেশে পর করে দেওয়া হয়েছে। গাছের পাতাটুকুও কুড়িয়ে নিতে পারে না তারা, ফরেস্ট আইন ভ্রূকুটি করে ওঠে।

ভারতের বনময় প্রদেশের গভীরে আজও সেই শবরী প্রতীক্ষায় রয়েছে। মহাজাতির পদধ্বনির সাড়া কবে তার কানে পৌঁছবে কে জানে! ভারতীয় সাংস্কৃতিকের উপেক্ষিত আদিভারতের তিন কোটি পুত্রকন্যার আরণ্য সংসারে জাগৃতির সাড়া যদি না জাগে, তবে নতুন ভারতের মূর্তি বিষণ্ন হয়ে থাকবেই।

* * * *

আদিবাসী মানুষেরা নির্বাসিত হয়ে আছে। ঠিক এইভাবেই নির্বাসিত হয়ে আছে আর একজন। প্রসঙ্গক্রমে তারই কথা মনে পড়ছে। ভারতীয় সংস্কৃতির দরবারে ইনিও অগ্রাহ্য হয়ে আছেন। জাতি গঠনের অনেক সেবকদেরও মনে এই উপেক্ষিতের আবেদন এখনো পৌঁছয়নি।

ইনি মানুষ নন, ইনি হলেন ভাষা। পোশ্‌তু ভাষার কথা মনে পড়ে।

মনে পড়ে, উত্তর পশ্চিম সীমান্তের ওপারে মেষপালক পার্বত্য পাঠানদের একটি উপত্যকা। ছোট পাথুরে কেল্লার মাথায় বৈকালী রোদের প্রলেপ লেগে আছে। দূরে রাজমাক রোডের ধাবমান মোটরবাসের উৎক্ষিপ্ত ধোঁয়া আর ধুলো দেখা যায়। চেনার গাছের তলায় বসে এক বৃদ্ধ পাঠান কবি বেহালা বাজিয়ে গাথা গাইছেন। যেমন মিষ্টি সুর, তেমনি মিষ্টি গলা। কঠিন পাথরের ওপর জলস্রোতের কোমলতাটুকু যেমন বেশী করে চোখে পড়ে, গিরিবহুল উপত্যকার রুক্ষ কঠিন রূপ ও স্তব্ধতার মধ্যে দরবেশের পোশতু ভাষার গান তেমনি কান্তকোমল ললিত পদাবলীর মতই মনে হয়।

পোশ্‌তু ভাষা ধ্বনি গুণে খুবই ঐশ্বর্যময়। পোশ্‌তু ভাষার লোকপ্রচলিত কাব্য কাহিনী ও রূপকথার প্রাচুর্য যে কোন ভারতীয় ভাষার সমতুল্য। সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয়, পোশ্‌তু লোককাব্যে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের অজস্র পদাবলী ছড়িয়ে আছে।

এই পোশ্‌তু দুই কোটি লোকের মাতৃভাষা। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুর একাংশ, পাঞ্জাবের কিয়দংশ এবং আজাদ উপজাতীর এলাকার সমস্ত জুড়ে পোশ্‌তু ভাষীর দেশ।

কংগ্রেস ভাষা হিসাবে ভারতের প্রদেশ বিভাগ করেছে। সরকারী ভূগোলের রীতি কংগ্রেস গ্রহণ না করে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু তবু একটা কথা দুঃখের সঙ্গে মনে পড়ে, চেনার গাছের ছায়ায় পাঠান কবির সেই পোশ্‌তু গানের ভাষাকে। তার আবেদন এখনো কংগ্রেসেরও কানে পৌঁছয়নি। পোশ্‌তু এখনো

প্রাদেশিক ভাষা হিসাবে গৃহীত হয়নি।

কিন্তু ভারতের জাতি গঠনের সাধনায় আজ আবার একটা নতুন সুর জেগে উঠেছে। এই সাধনায় কোথাও অপূর্ণতা থাকবে না। গান্ধীজীর আঠার দফা গঠনমূলক কাজের মধ্যে আদিবাসীরা যোগ্য আসন লাভ করেছে। সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেস নেতা ডাঃ খাঁ সাহেব পার্বত্য পাঠানের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন সংগঠনের পরিকল্পনা করছেন। মহাজাতির আবির্ভাব সকল লক্ষণ নিয়ে ভারতের চিন্তার আকাশে ফুটে উঠেছে। নতুন ভারতের আঙিনায় নানা হর্ষ কলরবের মধ্যে আমরা এক নতুন দরবারী রাগ শুনতে পাই—আদিবাসীর নির্বাসিত মাদল আর পার্বত্য পাঠান কবির উপেক্ষিত বেহালা নিজ নিজ সুরের বৈভবে যোগ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চলছে।

পথের পরিচয়

কলকাতা সহরে রাজপথ আছে। কিন্তু পুরাতন ভারতবর্ষের তক্ষশীলা পাটলিপুত্র বা উজ্জয়িনীর ধ্বংসস্তূপ থেকে কোন সমাহিত কঙ্কাল যদি হঠাৎ রক্তমাংসে সজীব হয়ে উঠে কলকাতার পথের ওপর এসে দাঁড়ায়, যদি প্রশ্ন করে--রাজকতা কই? এই সোজা সরল প্রশ্নের উত্তরটি উঠে তখুনি দিতে পারবে না। কিছুক্ষণ তাকে ভাবতে হবে। ভয়ে ভয়ে, ক্ষোভে, লজ্জায় চারদিকে তাকাতে হবে। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে শুধু আঙুল তুলে দেখিয়ে দিতে হবে—ঐ মনুমেন্ট।

এর পর কি ব্যাপার হবে, তা'ও অনায়াসে অনুমান করতে পারা যায়। উজ্জয়িনীর কঙ্কাল সেই মুহূর্তে লজ্জায় শিউরে উঠবে, তারপর মাটির ভেতর লুকিয়ে পড়বে। আর কোন সাড়া পাওয়া যাবে না।

* * * *

সত্যিই তো, রাজকতা কই? শোভা কই? হর্ষধ্বনি কই? ভারতবর্ষের মানুষ তার চোখে পাটলিপুত্র তক্ষশীলা ও উজ্জয়িনীর রাজকতার ছবি স্বপ্নময় আবেশ নিয়ে এখনো দেখা দেয়। বহু শতাব্দীর সুশ্রী নাগরিকতার চেতনা এখনো ঐতিহ্যের সূত্রে তারই সত্তায় মিশে আছে। তার পথের দু'পাশে বর্ণের আলিম্পন চাই। ভূষণে আভরণে ও সুখী-জীবনের কলহাস্যে সুন্দর নরনারীর শোভাযাত্রা পথ ধরে চলেছে—তার দু'চোখ উৎসুক হয়ে শুধু এই দৃশ্যই দেখতে চায়। নগরের পথেই দাঁড়িয়ে সে কপোত ও ময়ূরের কলালাপ শুনতে চায়। তরুচ্ছায়ার তলেই ক্লান্ত শরীর জুড়িয়ে নিতে চায়। নগরের পথে দাঁড়িয়ে সে মাটির দিকে তাকিয়ে তৃণের শ্যামলতা ও আকাশের দিকে অপার নীলিমার বিস্ময় দেখতে চায়। ভারতবর্ষের নাগরিক চায় না, আঁস্তাকুড়ের ধুলো ও ধোঁয়ায় তার আকাশের রামধনু ঢাকা পড়ে যাক্।

রাজপথে দাঁড়িয়ে রাজকতা আশা করাই স্বাভাবিক। পথের পাশে মণিকুট্টিম, মরকত শিলার বেদী ও স্ফটিকময় ধারাযন্ত্র শীকর উৎক্ষেপ—এই রাজসিক রূপের ছবিই ভারতের রাজপথের পথিক দাবী করে। বৈভবেরও একটা ভারতীয় আদর্শ আছে।

* * * *

তাইতো কলকাতার বড় বড় কংক্রীটের বাড়ীগুলিকে 'ভবন' বলতে কুণ্ঠা বোধ হয়। বাড়ীগুলির বিরাটত্ব আছে, বড়মানুষী আছে, আকার এবং প্রকার আছে—কিন্তু বৈভব নেই। কলকাতা সহর যেন একটি সুবিস্তৃত দুর্গ। খাঁচায় ভাগ করা এক একটি জীবনের মহল্লা। পীচঢালা ও মেটালগাঁথা পথগুলি যেন কঠিন ও মসৃণ বধ্যভূমির মত। শত রকম মৃত্যুর যান ও যন্ত্র এই পথের ওপর অবাধে পিচ্ছিল আনন্দে ছুটে চলে। শুধু অবাধে ছুটে চলতে পারে না মানুষ। মানুষের ভাষা মুখচোরা হয়ে আছে। আশে পাশে সংশয়। প্রতিটি ন্যায়ের দাবীর সম্মুখে ঘুসের অপচ্ছায়া হাত পেতে আছে। প্রতি ন্যায্য মূল্যের প্রতিদান ভেজালের ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। এখানে মানুষ আইন চালায় না, আইন মানুষকে চালায়।

* * *

শোভা নেই, দৃশ্য নেই, রাজকতা নেই—তবু কলকাতার রাজপথে আমরা শোভা খুঁজি, আশ্বাস খুঁজি, স্বস্তি খুঁজি। সারা মনুষ্যত্বই যেন খুঁজতে খুঁজতে সন্ধানহীন শিকারীর মত দিশেহারা ও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

তবু এই কলকাতা শহরে বসেই বর্ষার দিনে আকাশের আশীর্বাদের মত জলঝরা গান শুনতে পাওয়া যায়। নিভৃত কল্পনার পথে সাড়া শুনতে পাই, কবি কালিদাস যেন মেঘদূত

আবৃত্তি করে আমাদের হৃদয়ের কাছ ঘেঁষে চলেছেন। পরমুহূর্তে চোখে পড়ে, কলকাতার রাজপথে নোংরা পঙ্কিল জলের প্লাবনে ভিখারীর ছেঁড়া কাঁথা ভেসে চলেছে।

কালিদাসের মেঘদূতের সাড়া তখুনি স্তব্ধ হয়ে যায়। শুধু মনে পড়ে আমরা কলকাতায় আছি। লক্ষ দুঃখীর কাঁথা জলে ভাসিয়ে দিয়েই যেন কলকাতা শহর এইভাবে নিরেট লোভের কংক্রীটে কঠিন হয়ে উঠেছে। এই সহরের রাজপথে অনেক কিছু বাঁচাবার জন্য অনেক আইন আছে। কিন্তু ভিখারীর কাঁথাটুকু বাঁচাবার সামর্থ্য কোন আইনের নেই।

* * * *

গঙ্গাপুলিনের সৌন্দর্য যুগ যুগ ধরে ভারতের কাব্যের এবং কাব্যিকের চেতনার সম্পদ হয়ে আছে। কলকাতার অদৃষ্টের অভিশাপ, এই গঙ্গাপুলিনও তার কাছে ব্যর্থ হয়ে গেছে। গঙ্গাতটের অপমান, পশ্চিমী সভ্যতার অনুগ্রহে এই একটি বড় অবদান লাভ করেছি। কলকাতার গঙ্গা বণিকের চোখে অববাহিকা মাত্র। গঙ্গার প্রতি ঢেউয়ের ওপর লুব্ধ বাণিজ্যপোতের ছন্দোহীন আঘাত। চটকলের পুরীষ আজ গঙ্গোদকের স্বচ্ছতাকে ছাপিয়ে কলকাতার কাল্‌চারকে বড় করে তুলেছে। গঙ্গার সৈকতে ভোর বেলার পূজারীকে সসঙ্কোচে আসনখানি সরিয়ে আর একটু দূরে বসতে হয়—অপহৃত মনুষ্যত্বের ভ্রূণপিণ্ড তার পাশেই হয়তো নারকীয় আবেশ সৃষ্টি করে। এসবই কলকাতার কৃপা।

* * * *

সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে বিকেল, তারপর সন্ধ্যা। কলকাতার রাজপথ দিয়ে আমরা ভারতবর্ষের মানুষ বিদেশীর মত ছন্নছাড়া হতাশা আর পুঞ্জীভূত ব্যর্থতার বোঝা নিয়ে ঘুরে বেড়াই। অন্ধকার ঘনায়, আলো জ্বলে। শুধু সরে যেতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোন খানে।

কলকাতার রাজপথের পথিক, ভারতের মানুষ, এইভাবে প্রতিদিন পথে বের হয়, কিন্তু ঠিক পথ-চলার আনন্দ যেন তার নেই, পলাতক বন্দীর মত পথ খুঁজে বেড়ায়। হঠাৎ একদিন পথ-ভোলা ঝড়ের মত একটা ঘটনা দেখা দেয়, কলকাতার পথিকের শোভাযাত্রার উপর সৈনিকের রাইফেল ঝলকে ঝলকে বারুদগন্ধী মৃত্যুময় আগুন বর্ষণ করে।

সন্ধ্যা হয়ে আসে, টালিগঞ্জের টিপু সুলতান রোড, যেন শ্রীরঙ্গপত্তনের দুর্গের স্বপ্ন দারুণ অভিমানে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পথের খোয়া হয়ে পড়ে আছে। সেই স্বপ্ন মথিত করে বিদেশী মিলিটারী রথের চাকা উদ্দাম বেগে দৌড়ে যায়।

এমনি এক নবেম্বরের সন্ধ্যায় ভারতের পথিককে টালিগঞ্জের এক ছোট পথের অন্ধকারে ক্ষণিকের জন্য থম্‌কে দাঁড়াতে হয়। এক রিক্সা থেকে গুলিবিদ্ধ আহত ছাত্র-যুবক নামে। পথের ওপর কপালে হাত চেপে বসে পড়ে। কেউ তাকে চেনে না, জানে না।

তেমনি অচেনা এক পথিক তরুণী পথে যেতে যেতে হঠাৎ সেখানে থম্‌কে দাঁড়ায়। আহত যুবকের দিকে তাকিয়ে থাকে। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে নাম-না-জানা ভাইয়ের হাত ধরে।

আহত যুবকের হাত ধরে টালিগঞ্জের ছোট রাস্তার অন্ধকারে পথ দেখিয়ে ভারতের চিরকালের ভগ্নীহৃদয় যেন এগিয়ে যেতে থাকে। দূরে দাঁড়িয়ে ভারত পথিক সেই দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। সব হতাশা, সব ব্যর্থতা, সব নিঃস্বতা মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যায়।

টালিগঞ্জের ছোট রাস্তার অন্ধকার। অচেনা আহত যুবক। তারই পাশে এক অচেনা তরুণী। ধীরে ধীরে এই ছবি দূরে সরে যেতে থাকে। শুধু পথিক তরুণীর কবরীতে দুটি জোনাকী বন্দী হয়ে ঝিক ঝিক আলো ছড়ায়। অন্ধকার ভয়ে শিউরে ওঠে।

দানবিক ও আণবিক

প্রায় পঁচিশ বছর আগে মিঃ এইচ জি ওয়েল্‌স্ একখানি উপন্যাস লিখেছিলেন, তার নাম--দি ওয়ার্লড সেট ফ্রী (The World Set Free)। এই উপন্যাসের কাহিনীগত ব্যাপারটুকু সংক্ষেপে এই ঃ--"সেবায় প্রাচ্যদেশীয়েরা অনেকখানি সাধনা করে ফেলেছে। জাতিতে জাতিতে বিরোধিতা লেগেই রয়েছে। হঠাৎ একদিন দেখা গেল লণ্ডন সহরের ওপর বায়ুমণ্ডলের এক অতি উচ্চস্তরে একটি বিচিত্র বিমান উড়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে দুটি অত্যন্ত প্রতিভাবান বাঙালী বৈজ্ঞানিক আছেন, একজনের নাম 'দাস' অপর জনের নাম 'টাটা'। এই দুই বৈমানিক লণ্ডন সহরের ওপর একটি আণবিক বোমা নিক্ষেপ করলেন। লণ্ডন রসাতলে গেল। তারপর প্যারিস, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রাচ্যদেশীয়ের বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্রের আঘাতে য়ুরোপের চৈতন্য সায়েস্তা হলো। জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হলো।"

* * * *

এইচ জি ওয়েলসের কল্পনার বোমা সত্যিই এতদিন পরে ফেটেছে। জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি রসাতলে গেছে।

দেখা যাচ্ছে মিঃ ওয়েলসের কল্পনায় একটা বড় ভুল হয়েছিল—পশ্চিমীরাই প্রাচ্যের ওপর আণবিক বোমার খেলা প্রথম দেখিয়ে দিল।

যাই হোক, সবচেয়ে বড় কথা হলো--আণবিক বোমা ফেটেছে। চার্চিল সাহেব বলেছেন-- 'এই আবিষ্ক্রিয়া মানব প্রতিভার বিরাটতম সাফল্যের নিদর্শন।' ধ্বংসের প্রতি এত বিরাট অভিনন্দন বোধ হয় আজ পর্যন্ত কোন ভদ্রলোক জানাতে পারেন নি। মানবের 'দুষ্প্রতিভার' এত বড় নিদর্শনের গলায় প্রথম বরমাল্য দিতে পারেন তিনিই যাঁর অভিধানে 'প্রতিভা' 'বিরাট' 'সাফল্য' ও 'নিদর্শন'--এই চারটি কথারই অর্থ উল্টো করে লেখা আছে।

* * * *

কিন্তু য়ুরোপের জনমত আর চার্চিল সাহেবের মতে অনেক পার্থক্য যে আছে তার নিদর্শন আমরা পাচ্ছি সংবাদপত্রের বিবরণে। নানা মুনি নানা মত দিচ্ছেন, কিন্তু খুব অল্পসংখ্যক ধ্বংসবাদী ছাড়া কেউ আণবিক বোমার আবির্ভাবকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করতে পারছেন না।

কেন পারছেন না?

এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর নয়। য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক, রাজনীতিক ও চিন্তাশীল, সবারই বক্তব্যের সার হলো 'আণবিক বোমার মত এত ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রের সমর্থন করা যায় না।'

অর্থাৎ লক্ষ নরনারীর ও শিশুর প্রাণ সংহার করার এই যে নতুন আগুনটি দেখা দিল, তা চিরকাল কোন জাতির ঘরের লক্ষ্মী হয়ে থাকবে না। আজ আমেরিকার ঘরে আছেন, কাল তুরস্কের ঘরে চলে যেতে পারেন। কে কখন এই গোপন অগ্নিমন্ত্রটি শিখে ফেলে ঠিক নেই। এ আশঙ্কাও আছে যে, তিন চারজনে মিলে একটা প্রাইভেট কোম্পানী করে গোপনে একটা আণবিক বোমার কারখানা তৈরী করে ফেলতে পারে। তখন কী হবে উপায়?

* * * *

আণবিক বোমাকে এইভাবে তাঁরা বিচার করছেন। কিন্তু হঠাৎ একটা বেয়াড়া প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে—হঠাৎ আণবিক বোমা সম্বন্ধে এতটা চিন্তা সাবধানতা কেন? এত বিচার কেন? আণবিক বোমা খুব বেশী ধ্বংস করতে পারে, তার জন্য এত দুঃখ করার কি আছে?

যাঁরা রাইফেল সমর্থন করেন, যাঁরা টমিগান সমর্থন করেন, যাঁরা ইনসেনডিয়ারী বোমা

সমর্থন করেন, আণবিক বোমাকেও তাঁদের সমর্থন করা উচিত। লাঠির চেয়ে রাইফেল বেশী মানুষ মারতে পারে, রাইফেলের চেয়ে বেশী ইনসেনডিয়ারী বোমা। যদি লাঠিবাদ নির্দোষ হয়, যদি রাইফেলবাদ গ্রহণীয় হয়, তবে আণবিক বোমাকে আপত্তি করার কিছু নেই। কারণ রাইফেল ও আণবিক বোমার মধ্যে নীতিগত বা গুণগত পার্থক্য কিছু নেই। পার্থক্য যা কিছু তা হলো মাত্রার পার্থক্য (difference in degree)।

মারণযন্ত্রের সাধকেরা বছরের পর বছর এই উচ্চতর মারণতার জন্যই চেষ্টা করে আসছিলেন। আজ তা সফল হয়েছে। সুতরাং রাইফেলবাদীরা যদি আণবিক বোমাকে নিন্দে করেন, তবে সেটা নিছক ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়।

* * * *

অণোরণীয়ান—এই অণুই নানারূপে ও রূপান্তরে বিশ্ব-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। মহতোমহীয়ান হয়ে উঠেছে। মহত্তম এক দুর্নিরীক্ষ্য শক্তির রহস্য শুধু সৃষ্টির আবেগে তার প্রচণ্ড স্পন্দনকে ছন্দোপাত করে অণুরূপে গড়ে উঠেছে। সৃষ্টির মূলাধারে পৌঁছে তার বিধানকে চূর্ণ করার সাধ আজ সফল হয়েছে। পরমাণু চূর্ণ হয়েছে। এ যেন এক দৈত্যের উপাসনা। সৃষ্টির নিয়মকে তপোবলে ধরতে পেরেও, তাকে ধ্বংসের সাধনায় ঘুরিয়ে দিল।

এর পর বৈজ্ঞানিকেরা আর কোন্ নতুন 'আবিষ্ক্রিয়া' সফল করবেন কে জানে? চাঁদের আলো নিভিয়ে দিতে হবে, অথবা আকাশের তারাগুলিকে কক্ষভ্রষ্ট করতে হবে, এই রকম একটি বিরাটতর সাধনা হয়তো আরম্ভ হবে।

তিব্বতী চিকিৎসা

'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ'ং—কলকাতায় বসে জ্বরের ঘোরে আজও এই মন্ত্রধ্বনি কানে শুনতে পাই। এটা বহুদিনের আগের একটা অভিজ্ঞতা, যা অবস্থা বুঝে বিস্মৃতির বাধা ঠেলে মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে।

বুদ্ধগয়ার ধর্মশালা। সাতদিন জ্বরে অচেতন অবস্থায় শুয়ে ছিলাম। ঘরের ভেতরটা মশালের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ; তার সঙ্গে সুগভীর মন্ত্রধ্বনি--ওঁ মণিপদ্মে হুং'। ধর্মশালার দারোয়ানের কথায় চমক ভাঙ্গল—'তিব্বতী বাবারা এসেছেন আপনাকে দেখতে আর জ্বর সারাতে।'

চার পাঁচজন লামা। তাদের হাতে ধর্মচক্র আর বজ্র। একজন একটি বহু পুরাতন ত্রিপিটকের পুঁথির পাতা ছিঁড়ে গুলির মত পাকিয়ে ইশারায় জানালেন খেয়ে ফেলতে। আর একজন একটি নরকরোটি থলি থেকে বের করে বুকের ওপর রেখে বজ্র ছুঁইয়ে আবার আওড়ালেন—'ওঁ মণিপদ্মে হুং'। সমস্ত রাত ধরে এই চিকিৎসা চললো, তবু জ্বরের উপশম হলো না কিছু। শেষে মাতব্বরগোছের লামা মশায় বললেন,—'চিক-শেষ-গুণ-দ্রোল'।

এ একটি ওষুধ। অপূর্ব সব উপাদান থলের ভেতর থেকে বের করে তৎক্ষণাৎ ওষুধ প্রস্তুত হলো। কটি উপাদানের কথা মনে আছে—শিলাজতু, শূকরের বিষ্ঠা, হলুদ ও নেকড়ের ঘাড়ের রোঁয়া। এক সঙ্গে পিষে যে জ্বরহর চূর্ণ তৈরী হলো, সেটা জলের সঙ্গে গুলে গলাঃধকরণ করতে হলো।

তারপর আর কিছু জানা যায়নি। জ্ঞান হলে বুঝলাম গয়ার হাসপাতালে শুয়ে আছি। কিন্তু এখনও জ্বর হলে শুনতে পাই লক্ষ মশার গুঞ্জন ধ্বনির মত—'ওঁ মণিপদ্মে হুং'।

ভারতের বাইরে হিন্দুতীর্থ

ভারতের বাইরে হিন্দুতীর্থ। জনৈক পুণ্যার্থী হিন্দু যিনি ভারতের শত শত তীর্থরজঃ গায়ে মেখে এখনও তৃপ্ত হননি, তিনি বড় আগ্রহে জানতে চেয়েছেন—কেদারবদরী থেকে সেতুবন্ধ আর দ্বারকা থেকে কামাখ্যা--এই মহাভারত ভূখণ্ডের বাইরে হিন্দুর আর কি কোন তীর্থস্থান নেই?

যত পুরানো তীর্থপরিক্রমার পুঁথি হাতড়ে এমন একটিও স্থানের উল্লেখ পেলাম না, যা ভারতের চতুঃসীমার বাইরে। কিন্তু তবুও এ ধারণা ঠিক নয়। ভারতের বাইরে হিন্দুর বহু অখ্যাত ও অল্পখ্যাত তীর্থস্থান আছে ; কিন্তু রেল কোম্পানীর পাঁজিতে বা গেজেটিয়ারে তার পরিচয় কেউ পাবেন না। যদি জানতে হয়, তবে তাঁকে যেতে হবে কোন অর্ধোদয় যোগের কুম্ভমেলায়। এখানে এমন সব সন্ন্যাসীর দলের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হবে, যাঁরা আপনাকে ভারতের বাইরে বহু তীর্থস্থানের হদিস দেবে।

বছর পাঁচেক আগে কুম্ভমেলায় একজন বড় সন্তজী—রামবাবার আখড়ায় সন্ন্যাসীর ভিড় দেখেছিলাম। নূতন শিষ্য ভর্তির পালা চলেছে। রামবাবা আগামী ফাল্গুনে সদলবলে রওনা হবেন কাশ্মীরের গিরিপথ ধরে দূর কাস্পিয়ানের উপকূলে জ্বালামুখী তীর্থে। পাঞ্জাবেও একটি জ্বালামুখী তীর্থ আছে, তবে কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলে যেটি আছে, সেইটিই নাকি মাহাত্ম্যে শ্রেষ্ঠ।

নামে কিবা আসে যায়

মানুষের নামকরণে সব দেশেই একটা রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু রীতিগত হোক বা রীতিবিরুদ্ধ হোক—নামের অর্থ সব সময় বুঝে ওঠা দায়। নামের আসল প্রয়োজন একটি মাত্র--মানুষের সামাজিক পরিচয়। কিন্তু এই নাম দেখে পরিচয়টা সব সময় সত্য হয় না। মেয়েরা 'সবিতা' নাম গ্রহণ করে থাকে বলে অনেক ঠাট্টা করা হয়, কারণ সবিতা স্ত্রীবাচক শব্দ নয়। পুরুষেরাই বা কি কম? যামিনী রায় ও কামিনী দত্ত—এ রকম নাম প্রায়ই দেখা যায়। এ ট্র্যাজেডির মূল কারণ নামের মধ্যশব্দটি বাদ দেওয়া। এ রীতি সম্প্রতি দেখা দিয়েছে--দুটি শব্দে নাম লেখার রেওয়াজ বেড়েই চলেছে দিন দিন। 'চন্দ্র' 'চরণ' 'কুমার'কে নামের মাঝখান থেকে সরিয়ে দিতে অনেকে প্রস্তুত। শুধু পারেন না পশুপতি ও ভূতনাথ বাবুরা।

* * * *

নাম থেকে পরিচয় পাওয়া সত্যই দুষ্কর। আরবের গোঁড়া মুসলমান 'ইবন সাউদ'। এর অর্থ দাউদের পুত্র অর্থ যীশুখৃষ্ট। বাংলায় ভোলা সরকার হিন্দু না মুসলমান, নাম থেকে ধরার উপায় নেই। পার্শীদের রুস্তমজী চশমাওয়ালার ছেলের নাম ফিরোজসা মার্চেণ্ট হতে পারে।

লাট্টুলাল প্রিয়লাল চ্যাটার্জি--এমন উদ্ভট নাম কি সম্ভব? শুধু সম্ভব নয়—এমন নামের এক ভদ্রলোক আছেন, যিনি খাঁটী বাঙালী ব্রাহ্মণ। তবে চারপুরুষ ধরে থাকেন সাতারায়। নামকরণের এই মহারাষ্ট্রীয় রীতি তাঁদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ভদ্রলোকের নাম লাট্টুলাল আর পিতার নাম প্রিয়লাল। নিজের নামের মধ্যে পিতার নামের পরিচয় থাকবে এটা তামিল, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের রীতি। যথা--মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, চিরভূরি যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণি, বা বিনায়ক দামোদর সাভারকর।

ঐতিহ্যের রক্ততিলক

কপালে রক্তচন্দনের তিলক লাগিয়ে দারোয়ান চৌবেজী গুন্‌গুন্ ক'রে দোঁহা আওড়াচ্ছেন--
"তুলসীদাস প্রভু চন্দন রগ্‌ড়ে, তিলক কাটত রঘুবীর।"

চৌবেজী অতি সাত্ত্বিক মানুষ। মাছ মাংস স্পর্শ করেন না। কপালের তিলকটি তাঁর ধর্মাচরণের অঙ্গবিশেষ। অথচ, চৌবেজী নিজেই জানেন না ঐ তিলকটির অর্থ কি? এর কোন ইতিহাস আছে কি না? তাঁর কাছে তিলকধারণ একটা সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে। তবু এর একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে নিশ্চয়। চেষ্টা করলে তা খুঁজে বের করাও অসাধ্য নয়।

সংস্কার ছাড়া সামাজিক মানুষ দেখা যায় না। যাঁরা রক্ষণশীল তাঁরা সংস্কারগুলিকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন ও সমর্থন করে থাকেন। তবে বুদ্ধির প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সংস্কারগুলির উপর প্রশ্ন সংশয় না এনে পারে না। তখন বৈজ্ঞানিক বিচারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

*   *   *   *

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুসুলভ সংস্কারগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। সে ব্যাখ্যা আদৌ বৈজ্ঞানিক কি না, তা বৈজ্ঞানিকেরাই বলতে পারেন। চন্দ্রগ্রহণের সময় খাবার জিনিষে একরকম দুষ্ট জীবাণু জন্মলাভ করে, ত্রয়োদশীতে বেগুনের শাঁসের ভেতর একরকম খারাপ গ্যাস জন্মে, টিকিতে বৈদ্যুতিক শক্তি আশ্রয় গ্রহণ করে--এইরকম ব্যাখ্যাও অনেকের মুখে শোনা গিয়েছিল। এই ধরনের ব্যাখ্যা দিয়ে সংস্কারগুলির প্রকৃত অর্থভেদ হয় কি না, জানি না। তবে প্রত্যেক সংস্কারের একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, এ কথা বিশ্বাস করি। চৌবেজী যে তিলক ধারণ করেন তার সার্থকতা সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু এককালে এর মূলে একটা সত্যের ভিত্তি ছিল, তা অস্বীকার করি না।

*   *   *   *

এক বন্ধুর মুখে শোনা গল্প মনে পড়ে। তাদের গাঁয়ে মহাষ্টমীর বলিদানের মধ্যে অদ্ভুত একটা প্রথা পালন করা হত। বলিদানের সময় হাড়িকাঠের কয়েক হাত দূরে একটা লোক দাঁত মুখ খিঁচিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটো আকাশে তুলে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই অদ্ভুত প্রথার অর্থ সে গাঁয়ের কেউ বলতে পারেনি। সকলেই বলে, তারা শিশুকাল থেকে এই নিয়ম দেখে এসেছে। অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের ফলে এই রহস্যভঞ্জন হল--এক অতিবৃদ্ধ তাঁর পিতামহের মুখে শোনা ঘটনা জানিয়ে দিলেন। আগে ঐ হাড়িকাঠের নিকটে একটি নেবুগাছ ছিল। বলিদানের সময় গাছের ডালে খাঁড়া বেধে যেত। সেই কারণে বলিদানের সময় একজন লোক ডালটাকে দড়ি বেঁধে টেনে সরিয়ে রাখত। কালের প্রকোপে নেবুগাছটি ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু সেই প্রথার এখনও লোপ হয়নি। এখনও কাউকে রীতিমত নিষ্ঠার সঙ্গে হাড়িকাঠের কাছে দড়িটানার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

*   *   *   *

সংস্কারের প্রসঙ্গে এই গল্পটির কথা মনে পড়ে। আজ যা নিছক অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয়, অতীতে তাই হয়ত কত সার্থক ও প্রয়োজনীয় ছিল।

মনে পড়ে দূর অতীতের অর্বাচীন আরণ্য নরসমাজের কথা। সে সময় নাকি নরমাংস ভোজনের প্রচলন ছিল। অতীতের বর্বর মানুষের নামে যেসব অকারণ অপবাদ প্রচার করা হয়েছে, মনে হয় এই 'cannibalism' এর গল্পও তার মধ্যে একটি। অতীতের মানুষ মানুষকে হত্যা করেছে, আজও করে থাকে। তবে নিছক উদরপূর্তির জন্য বর্বর মানুষ অপর মানুষকে হত্যা করেছে ইতিহাসে সেরকম কোন বিশ্বাস্য প্রমাণ পাই না। বরং অনেক

বিশেষজ্ঞের মতে প্রাচীন মানুষ নিরামিষাশীই ছিল, আমিষ ভোজন অপেক্ষাকৃত পরের যুগের প্রথা। ক্ষুধাশান্তির জন্য কোন হিংস্র জানোয়ারও স্বজাতিকে বধ করে না। বর্বর মানুষই কি পৃথিবীর হিংস্রতম জীব ছিল যে তার ক্ষুধার সম্মুখে স্বজাতি বিজাতির বাছবিছার ছিল না? জীববিজ্ঞানেও এমন কথা বলে না।

* * * *

তবে মানুষ মানুষের মাংস খেয়েছে অন্য কারণে অর্থাৎ ধর্মাচরণ হিসাবে। এ প্রথা অতীতে ছিল, বর্তমানেও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়নি। কোন কোন বন্য জাতির মধ্যে নরবলি প্রথা এখনও লুপ্ত হয়নি। সভ্যদেশেও বর্তমানে নরবলি বা নরমাংস ভোজনের উদাহরণ বিরল নয়। কারও কপালে রক্তচন্দনের তিলক দেখলে যদি কোন ইতিহাস পাঠকের মনে অতি প্রাচীন নৃমুণ্ডবিলাসী বর্বর মানবগোষ্ঠীর কথা মনে পড়ে যায়, তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। আন্দামানীরা নরহত্যা করে নিহত ব্যক্তির রক্তপান করতো। ভারতের উত্তরপশ্চিমে কাফিরিস্থানের কাফিরেরা (এরা মুসলমান নয়) যুদ্ধে নিহত শত্রুর রক্তপান ও ফুসফুসের একটি টুকরো প্রসাদস্বরূপ খেত। উত্তরপূর্বের লুসাই পাহাড়ের জংলী যোদ্ধা নিহত শত্রুর যকৃৎ ও রক্তমাখা বল্লমের ফলক জিভ দিয়ে চেটে শুধু আস্বাদ গ্রহণ করতো। আসামে পার্বত্য মুণ্ডশিকারীদের মধ্যে এখনও একটি প্রথার চল আছে—শত্রু বধ করার পর তারা রক্তমাখা হাতে খাবার খেয়ে থাকে।

ইতিহাস ঘেঁটে যত নজীরই খোঁজা হোক না কেন, কোথাও এ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে প্রমাণ নেই যে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য নরমাংস ভোজন করা প্রাচীন নরসমাজে প্রচলিত ছিল। সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সেসব নরবলির মূলে ছিল একটি লৌকিক ধর্মাচরণের তাগিদ। রাজপুত রাজাদের অভিষেকের সময় এখনও কোন ভীল প্রজার রক্ত নিয়ে তিলক ধারণ করার নিয়ম রয়েছে। সমাজতাত্ত্বিকের মতে এই ধরনের নরমাংস ভোজন, নরশোণিত পান অথবা কপালে রক্ততিলক ধারণের পেছনে একটা "আধ্যাত্মিক" প্রেরণা আছে। নিহত মানুষের জীবসত্তা (Mana) আত্মস্থ করে নিজেকে শক্তিমান করা—এই থেকেই নাকি আত্মা থিওরির উদ্ভব। এ প্রসঙ্গে আরও দৃষ্টান্ত মনে পড়ে—খৃষ্টানদের ইউখারিস্ট ভক্ষণ (Eucharist) ও বৈদিক মানুষের পুরোডাশ।

সেকেলে ডাকাতদের মধ্যেও এই ধরনের বর্বর সংস্কারের প্রকোপ ছিল। ঘোর জঙ্গলে বুড়ো বটের নীচে ডাকাতে কালী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও বাংলার এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। ডাকাত সাধক বলি-প্রদত্ত মানুষের রক্তের তিলক কপালে ধারণ করে হত্যাধর্মে শক্তি ও সিদ্ধিলাভ করতো। ১৯৩০ সালে নানা ফেরারী নামে যে প্রসিদ্ধ ডাকাত ধরা পড়ে, তার অভ্যাস ছিল নিজের ছুরিকাঘাতে নিহত মানুষের রক্তের ফোঁটা কপালে ও জিভে স্পর্শ করা।

ফসল পূজার জন্য নরবলি দেওয়া এককালে সকল বর্বর সমাজে প্রচলিত ছিল। ভারতের খোন্দদের মধ্যে সেদিন পর্যন্ত এই প্রথা ছিল। কিন্তু উদরতৃপ্তির জন্য মানুষের মাংস কোনদিনই মানুষ খায়নি। মানুষ নরহত্যা করেছে সামাজিক ও ধার্মিক কারণে, শক্তি ও সিদ্ধিলাভের জন্য, আত্মিক বলে বলীয়ান হবার জন্য।

চৌবেজীর কপালে রক্তচন্দনের তিলক দেখে তামস যুগের অজ্ঞ মানুষের এই সব নিষ্ঠুর রীতিনীতির কথাই স্মরণ হচ্ছিল এবং সেইটাই যে আধুনিক পবিত্র ও সাত্ত্বিক তিলকের ঐতিহাসিক ভিত্তি নয়, তা কে বলতে পারে?

কস্মৈ দেবায়

শব সৎকারের প্রথা নানা দেশে নানা রকমের। দাহ ও সমাধি ছাড়া আরও বিচিত্র সৎকারের প্রথা আছে। জরথুস্ত্রীয় পার্শীরা শব দাহও করে না, সমাধিও দেয় না। তারা খোলা জায়গায় শবকে শুইয়ে রাখে। মহেঞ্জোদড়োর যুগে বড় বড় জালার মধ্যে শবদেহ ভরে রাখা হতো।

সব চেয়ে অদ্ভুত শব সৎকার প্রথা ছিল ছোটনাগপুরের বিরহোরদের মধ্যে। মৃত আত্মীয় স্বজনের দেহকে এরা তত সহজে পঞ্চভূতে মিলিয়ে দিত না। কর্ণেল ডালটনের রিপোর্টে পাওয়া যায়, বিরহোরেরা মৃত আত্মীয় স্বজনের মাংস খুবই ভক্তিভরে চেটেপুটে খেয়ে শেষ করতো। এটাও তাদের কাছে ধর্মাচরণের বিষয় ছিল অর্থাৎ মৃতের আত্মাকে আত্মস্থ করা। উত্তরপূর্ব আসামের লোকদের আর অমর-কণ্টক মালভূমির আদিম উপজাতিদের মধ্যে শবভক্ষণ প্রথা প্রচলিত ছিল।

এ'তো গেল আদিম জাতিদের কথা। ভারতে সভ্য মানুষের মধ্যেও ধর্মের অজুহাতে শব ভক্ষণের প্রথা দেখা যায়। অঘোরপন্থী সাধকদের কথা সকলেই জানেন। ১৯৩১ সালে বাঁকুড়ার দুজন ব্রাহ্মণ সদ্যপ্রোথিত একটি শিশুর মৃতদেহ খুঁড়ে বার করে তাদের আশ্রমে নিয়ে যায় আর রান্না করে খায়। আদালতে ব্রাহ্মণ দুজনের বিচার হয়।

* * * *

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম! কোন দেবতার পূজা করি? বৈদিক ঋষির কবিমন সৃষ্টির বৈচিত্র্যে দিশেহারা হয়ে একদিন এই প্রশ্নে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু সত্য সত্য মানুষ কত কিছুর যে পূজা করে তা গুণে বলা সম্ভব নয়।

পূজা থেকে আসে বিগ্রহ। বিগ্রহ থেকে মন্দির বা দেবায়তন। দেবায়তন থেকে তীর্থ। সমস্ত পৃথিবী ছড়িয়ে নানা জাতির নানা তীর্থ রয়েছে ; কেউ না কেউ এই সব তীর্থভূমির পত্তন করে গেছে। কাশী, দ্বারকা, সেতুবন্ধ, মক্কা, মদিনা ও আজমীর সরিফ বা জেরুসালেম —প্রসিদ্ধ নানা তীর্থস্থানের নাম আমাদের জানা আছে। রেড ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি আদিম জাতিরা এখনও সুগম্ভীর প্রতিধ্বনির আশ্রয় বড় বড় গুহাকে দেবাধিষ্ঠান মনে করে পূজার্চনা করে থাকে।

১৯৩০ সালে দিল্লীতে অপূর্ব এক তীর্থস্থানের পত্তন হয়। চারিদিক থেকে যাত্রী আর পুণ্যার্থীর ভীড় ও মেলা বসে যায় সেখানে।

ঘটনাটা এই। সহরের বিষ্ঠা পুরীষ আবর্জনা ফেলার জন্য মাঠের মধ্যে একটা ট্রেঞ্চ করা হয়। ক'দিন পরে এই ট্রেঞ্চের পচা আবর্জনা থেকে কার্বন ডায়ক্সাইড আর মিথেন গ্যাস বার হ'য়ে মাঠের ওপর আলোকশিখার মত জ্বলতে থাকে। এই 'অলৌকিক' দৃশ্যে জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। লোকের ধারণা হয়, স্থানটি নিশ্চয় দেবতার বিহারভূমি। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে যাত্রী সমাগম হ'তে থাকে।

দাক্ষিণাত্যের তিনেভেলিতে আরও একটি অপূর্ব তীর্থস্থান আছে। এখানে ত্রিবাঙ্কুর যুদ্ধে নিহত কোন সাহেবের প্রেতাত্মার বিগ্রহ স্থাপিত আছে। এই বিগ্রহের ভোজ্য উপচারও তেমনই অদ্ভুত। এখানে গন্ধপুষ্প বাতাসা চালকলা অচল। পূজার্থীর দল বিগ্রহের সম্মুখে পাউরুটী, মুর্গী, চুরুট আর ব্র্যাণ্ডির নৈবেদ্য সাজিয়ে দেয়।

মানসকূট

কম্‌প্লেক্স নামে একটা কথার খুব প্রচলন হয়েছে মনোবিজ্ঞান সাহিত্যে। এর যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দের প্রচলন এখনও হয়নি। কেউ কেউ কম্‌প্লেক্স অর্থে 'জটিল' কথাটি ব্যবহার করেন। মনে হয় 'মানসকূট' কথাটি তাৎপর্যের দিক দিয়ে ঠিক। যাই হোক, এমন লোক নেই যাঁর মধ্যে অল্পবিস্তর মানসকূট নেই। বিভিন্ন মানুষের কম্‌প্লেক্সও বিভিন্ন। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে মানুষের কম্‌প্লেক্সের ইতিহাস গ্রথিত করেছেন। শত সহস্র রকম কম্‌প্লেক্সগুলিকে মোটামুটি ভাগ করে কতকগুলি পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। Superiority অথবা Inferiority complex নামে যে দুটো কথা আজকাল লোকের মুখে মুখে শোনা যায়, তাও মনোবিজ্ঞানের ভাষা। বিজ্ঞানী Adler মানুষের মনে এই দুটি মূল কম্‌প্লেক্স দেখতে পেয়েছিলেন। তারই উপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর মনস্তত্ত্বের থিওরী গড়ে তুলেছেন।

* * * *

আর একটি কথার খুব প্রচলন দেখা যায়—Sadism। অনেকদিন হলো এই শব্দটি সাহিত্যগত হয়েছে। এই শব্দটির বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—নিগ্রহামোদ ; এই কমপ্লেক্সের প্রকোপে মনের অজ্ঞাত বা সংজ্ঞাত সকল রুচির মধ্যে এমন এক ধরনের আবেগ আশ্রয় গ্রহণ করে, যার ফলে সে অপরের পীড়নের মধ্যে পুলক আহরণ করে। কায়েন মনসা বাচা—তার সকল আচরণ নিগ্রহমূলক হয়ে ওঠে।

এই Sadism কথাটিরও ইতিহাস আছে। ইংরাজী Sad শব্দের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। ফরাসী দেশে সম্রাট লুইয়ের আমলে Marquis De Sade জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। এই ভদ্রলোক অন্যদিকে বেশ গুণী সুরুচিসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু একটা রুচি ছিল—সেটা যেমন নিষ্ঠুর তেমনি বীভৎস। এই মার্কুইস প্যারিস শহর থেকে নিরীহ যুবতী মেয়েদের নিয়ে সহরের বাইরে তাঁর একটি বাড়ীতে জড়ো করতেন। তারপর, সেই সব যুবতীদের চাবুক দিয়ে প্রহারে জর্জর করতেন। এই ছিল তাঁর আনন্দ। তাঁরই নাম থেকে Sadism কথাটি উদ্ভূত হয়েছে।

* * * *

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে প্রাচীন কলকাতার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জব চার্নকের কথা। জব চার্নকের নামে যে সব কিম্বদন্তী শুনতে পাওয়া যায়, তার সঙ্গে ঐ ফরাসী মার্কুইসের রুচিগত কোন পার্থক্য নেই।

জব চার্নক যখন ভোজনে বসতেন, তখন চাকরদের ওপর অদ্ভুত একটা কাজ করার নির্দেশ ছিল। প্রত্যেক দিনই একজন না একজন লোককে ভোজনের সময় সাহেবের খাবার টেবিলের কিছু দূরে এনে রাখা হতো। চাকরেরা সেই লোকটিকে ধরে চড় ঘুষি লাথি মেরে আধমরা করে ছাড়তো। মার খেয়ে লোকটা পরিত্রাহি চীৎকার করতো। এই আর্তনাদ না শুনলে জব চার্নকের ভোজনে রুচিই হতো না। প্রহৃত লোকটার আর্তরব কানে শুনছেন আর ডিনার খেয়ে চলেছেন, এই ছিল জব চার্নকের নিয়ম। একটি সতীদাহের সময় এক ব্রাহ্মণ বিধবা জ্বলন্ত চিতা থেকে পালিয়ে গিয়ে চার্নক সাহেবের বাগানে আশ্রয় গ্রহণ করে। জব চার্নক সাহেব সেই বিধবাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন।

* * * *

"আপনি হইয়া শ্রীনন্দের নন্দন, তোমারে করিব রাধা।" এ তো গেল বৈষ্ণব কাব্যের কথা। নারীর মনে পুরুষ হবার কামনা কখনও কখনও দেখা দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই মনোভাব এত প্রখর হয়ে ওঠে যে, তখন সেটা কমপ্লেক্সে পরিণত হয়।

পরিচ্ছদের ব্যবহারের ভেতর দিয়েও এক ধরনের কম্‌প্লেক্স আত্মপ্রকাশ করে। এর নাম—transvestism। যে পুরুষের স্ত্রীলোকসুলভ বেশভূষায় রুচি এবং যে স্ত্রীলোকের পুরুষালী পরিচ্ছদই বেশী প্রিয়, তাদেরই এই কম্‌প্লেক্সের ভাগী বলা যেতে পারে। বহু লোকের মধ্যে এই transvestist কম্‌প্লেক্স দেখা যায়। কি কারণে এ কম্‌প্লেক্স সৃষ্ট হয় তাও অবশ্য মনোবিজ্ঞানীদের অজ্ঞাত নয়।

*　　*　　*　　*

আর একটি অদ্ভুত কম্‌প্লেক্স আছে—Pygmallionism। কোন কোন লোকের মানসিক রুচির এমনই একটা বিপ্লব ঘটে যায় ফলে সে রক্তমাংসের মানুষের চেয়ে প্রস্তর বা মৃন্ময় মূর্তির অনুরাগী হয়ে পড়ে। রোমাণ্টিক কাব্যের নায়কের মত কোন কোন লোক প্রস্তর মূর্তির প্রণয়ানুরাগী হয়েছে, এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া গেছে।

Flagellation বা কশাঘাত দিয়ে আনন্দ সঞ্চয় করা, এরকম নিষ্ঠুর বিলাস পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা গেছে। এমন অনেক Flagellete-এর নাম করা যায়—যাঁরা গুণে ও জ্ঞানে অনন্যসাধারণ। তবুও তাঁরা এই ধরনের উৎকট একটা রুচির বশীভূত ছিলেন।

চাবুকের প্রহারে অপরকে জর্জর করে আনন্দ পাওয়া, এই সাদীয় কম্‌প্লেক্সের কথা বলা হয়েছে। সাদীয় কম্‌প্লেক্সের প্রকাশ বিচিত্র। এই যুদ্ধের ব্যাপারকেও অনেক বিজ্ঞানী মানুষের মনে অন্তর্নিহিত সাদীয় অপরুচির ব্যাপক ও সামাজিক প্রকাশ বলে মনে করেন। প্রণয় ভালবাসার ব্যাপারে সাদীয় রুচির দৃষ্টান্ত খুব বেশী।

শুধু নিগ্রহ দিতে নয়, নিগ্রহ পেতেও কেউ কেউ আনন্দিত হন। মনোবিজ্ঞানীর ভাষায় একে মাসখীয় (Masochist) কম্‌প্লেক্স বলা হয়। প্রাচীন ও আধুনিক কাব্য ও উপন্যাসে প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে নায়ক নায়িকার আচরণে সাদীয় ও মাসখীয় কম্‌প্লেক্সের আধিক্য খুব বেশী দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়ের এলা অন্তুকে বলছে—"না গো, তুমি আমার নরসিংহ, তোমার হাতে মরণেই আমার মুক্তি।"

*　　*　　*　　*

চৈতন্য-সাহিত্যে আমরা একজনের নাম পাই, যিনি সে যুগের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ও জ্ঞানী ছিলেন। এঁর নাম অভিরাম গোস্বামী। ইনি শ্রীচৈতন্যের দ্বাদশ অন্তরঙ্গের অন্যতম। এঁর হাতে সব সময় একটি চাবুক থাকতো। বৈষ্ণবগ্রন্থে এই চাবুক 'জয়মঙ্গল' নামে পরিচিত। কাউকে কৃপা করতে হলে তিনি এই চাবুক মেরে প্রেম সঞ্চার করতেন।

"ঘোড়ার চাবুক নাম জয়মঙ্গল
তাহা মারি লোকে করে
প্রেমায় বিহ্বল।"

ডাইন-সংস্কৃতি

আজকের দিনে ডাইন কথাটা শুনলেই স্বতঃ মনে পড়ে মিলটনের কাব্যের একটি পংক্তি-- From what a height to what a pit! আজকের দিনে যে হতভাগ্য ডাইন নামে পরিচিত, সমাজে তার স্থান নেই, সে অপশক্তির আধার, সর্বনাশের বাহন ; বর্তমান ডাইনসমাজ সাধারণ মানুষের পক্ষে শুধু আশঙ্কার বিষয়। মানুষ তাকে ভয় পায়, আর বাগে পেলে তার ইহলীলা ঘুচিয়ে দেবার অবকাশ খোজে। তাই পৃথিবীতে সভ্য অসভ্য সকল সমাজে আজও ডাইন নির্যাতন দেখতে পাওয়া যায়। ডাইন নির্যাতনের সমগ্র অনুষ্ঠানটি যেভাবে সম্পন্ন করা হয়, তাকে ঠিক নরমেধ যজ্ঞ বলা যেতে পারে। সাধারণ সংসারী মানুষ, যারা স্নেহ মায়া মমতা নিয়ে জীবন যাপন করে, তারাই ডাইন নির্যাতনে কতখানি ক্রুর হতে পারে, তা না দেখলে সহজে বিশ্বাস হয় না।

অথচ এই ডাইন একদিন মানুষের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ গৌরবের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই ছিল সমাজের পরম পূজনীয় অধিকর্তা ও শুভাশুভের বিধাতা। কিন্তু মানুষের সামাজিক ইতিহাসে, যে বিপ্লবের পথে আবর্তিত হয়ে মানুষ আজ যে মনোভাবের অধিকারী হয়েছে, তাতে তার দৃষ্টি-বিচারের রূপও সমূহ বদলে গেছে। অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের কাছে যে ভগবানের মর্যাদা পেয়েছে, তাকেই মানবেতর জীব বলে অর্বাচীন প্রপৌত্রেরা জীবন্ত পুড়িয়ে বা পুঁতে ফেলতে উদ্যত। তাই বেচারা ডাইনদের জন্য দুঃখ হয়। সেই সনাতন ভূত প্রেত যক্ষ পরী--যত সব লৌকিক বা অলৌকিক দেব দেবী, সবই তো আজও একাধারে ভীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে বেঁচে আছে। তাদের বিরুদ্ধে মানুষের মন আজও বিরূপ হয়ে ওঠে নি। শুধু ডাইনরাই কি এমন অপরাধ করলো! সমাজ বিজ্ঞানের ইতিহাসে ডাইনের এ অধঃপতন শোচনীয়।

*   *   *   *

একদিন ডাইনরাই ছিল সমাজের পুরোহিত। সকল সামাজিক ও পারিবারিক মঙ্গলাচরণের ভার ছিল ডাইনের ওপর। ডাইনের মুখে আবৃত্ত মন্ত্রকেই প্রাচীন মানুষ একদিন মুগ্ধ বিস্ময়ে ভক্তি-আপ্লুত চিত্তে অবধান করেছে। ডাইনের মন্ত্র, তুকতাক, ও নানা occult অনুষ্ঠান একদিন মানুষকে দুর্গতি থেকে রক্ষা করে এসেছে। সুদূর অতীতে, যখন পর্জন্যদেবকে আবাহন করতে ঋক মন্ত্রের উদ্গাতা বৈদিক ঋষি সিন্ধু নদের তীরে আবির্ভূত হননি, তখন আরণ্য মানুষের ঋষি ও গুরু, Friend, Philsopher and Guide, এই ডাইন মন্ত্রের জোরে মেঘ এনেছে, বৃষ্টি এনেছে, গাছে গাছে ফল ধরিয়েছে ও হিংস্র পশু তাড়িয়েছে। আজ সমস্ত সভ্যসমাজের পুরোহিতমণ্ডলী মানুষের মঙ্গলের জন্য যে কাজ করেন, প্রাচীন ডাইন ঠিক সেই কাজই করতো। সেদিনের ডাইনের হাতের সিদ্ধিকাঠি সংসারে যে শক্তির খেলা দেখাতো, আজকের কোন ধর্মগুরুর হাতের ধর্মদণ্ড তাই দেখাবার চেষ্টা করে।

*   *   *   *

মানব সমাজের আদি বৈদ্য এই ডাইনরাই। যত আধি ব্যাধি উপশম করার প্রক্রিয়া একমাত্র তাদেরই অধিগত ছিল। আশ্চর্যের বিষয়, এত বড় সেবাব্রতের যারা পাণ্ডা ছিল একদিন, তারা কি করে মানুষের আতঙ্কের আস্পদ হয়ে দাঁড়ালো। রোগহরণ, মারীনাশ ও জ্বর জ্বালা দূর করার চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রথম পত্তন করে ডাইন মানব। সে বিজ্ঞান যতই রূঢ় ও অপ্রাকৃত হোক না কেন, সেবার আদর্শই ছিল তার পিছনের প্রেরণা। প্রাচীন ডাইন চিকিৎসক পরের রোগ শান্তির জন্যে নিজেও যে কৃচ্ছ্র উপবাস ও আত্মনিগ্রহ বরণ করে নিতো তা আধুনিক কোন সেবাব্রতীর চেয়ে তুলনায় নগণ্য তো নয়ই, বরং ঢের বেশী

স্বার্থশূন্য ও আন্তরিক।

*　　*　　*　　*

ডাইন মানব পৃথিবীর আদি কবি। আধুনিক মার্জিতরুচি মানুষ রসে, উপমা ও অলঙ্কারে রচিত যে কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করে আনন্দ উপভোগ করে, প্রাচীন মানব সমাজে 'মন্ত্র' সেই আনন্দ পরিবেশন করতো। তারও আগে ডাইনের মুখে আবৃত্ত তুকতাক, ঝাড়ফুঁক ও নানা দুর্বোধ্য শব্দ আলাপ ও বিলাপ প্রাচীনতম কবিতার নমুনা।

ডাইনরাই মানব সমাজের আদি চিত্রশিল্পী। কেউ কেউ বলেন, প্রস্তর যুগের শিকারী মানুষই চিত্রশিল্পের প্রথম সাধক। স্পেনের দুর্গম গুহার অভ্যন্তরে তার নিদর্শন আজও বেঁচে আছে। এ অনুমান সত্য। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণায় জানা গেছে যে, প্রাচীন শিকারী মানুষ মাত্রই চিত্রশিল্পী ছিল না, আর এই চিত্রসাধনা তাদের কাছে মারণ উচাটন ব্রতের মত বা যাদুবিদ্যার মত ব্যাপার ছিল। প্রাচীন ডাইনই ছিল চিত্রকর। ছবি এঁকে সে বিরুদ্ধা প্রকৃতি ঝড় ঝঞ্ঝা ও তুষার অথবা হিংস্র পশুর শত্রুতা থেকে আত্মরক্ষার শক্তি লাভ করতো। পৃথিবীর প্রথম তান্ত্রিক এই ডাইন মানব। আধুনিক সাধকের মত তারাও 'সিদ্ধাই' লাভ করতো, অন্ততঃপক্ষে সেই বিশ্বাসটা তারা লাভ করতো, তাতে সন্দেহ নেই।

প্রাচীন ডাইন মাটিতে ছক কেটে তুকতাক্ করেছে ; পাথর, ধাতু ও অস্থি দিয়ে তার হাতের সিদ্ধিকাটি তৈরী করতে হয়েছে। এই সিদ্ধাইয়ের প্রেরণা তাকে বাধ্য করেছে শিল্পী হতে।

*　　*　　*　　*

যুদ্ধ বিগ্রহে ও উৎসবে ডাইনরাই ছিল প্রধান নিয়ন্তা। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, বর্বর রাজনীতির নেতৃত্ব এই ডাইনদেরই হাতে ছিল।

কিন্তু এতখানি ক্ষমতাসম্পদে যে ডাইন মানব একদিন প্রচুর মহিমায় সমাজে সমাসীন ছিল ইতিহাসে তার এতটা অধঃপতন হলো কেমন করে? আজ ডাইন নাম শুনে নিরীহতম মানুষের মনও ক্রূরতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

এখানে আসে সমাজবিজ্ঞানের প্রশ্ন। ডাইনদের এই অধঃপতনের মূল হলো গোঁড়ামি। সমাজের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তারা নূতনত্বকে গ্রহণ ক'রে, সনাতন রীতি নীতির কিছুটা পরিহার ক'রে, ইতিহাসের সঙ্গে পা ফেলে চলতে চায়নি। কোন্ কুক্ষণে জানি না, ডাইন মানব একদিন তার ক্ষুদ্র অতীতকেই বড় বলে গণ্য করতো, নূতনত্বকে সম্বর্ধনা করার প্রবৃত্তি তার হলো না। এই গোঁড়ামিই রচনা করলো তার গৌরবের মৃত্যুবাণ। নইলে, আজও ডাইনজাতীয় সমাজ ও ধর্মের নেতা আছে, কিন্তু তাদের রীতিনীতি ও সংস্কৃতির ওপর আছে নূতনত্বের আবরণ। তারা সমাজে শ্রদ্ধা পায়।

আচার, ব্যবহার, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি সাংস্কৃতিক যে-কোন বিষয়ে গোঁড়ামি ঢুকলে ইতিহাসে তার কি নিদারুণ অধঃপতন হয়, ডাইনদের শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যয় তার একটা বড় প্রমাণ।

আত্মজীবনী

সেদিনের আলোছায়া

লোকের কাছে আজ আমার পরিচয় এই যে, আমি একজন লেখক। কিন্তু লেখক হওয়ার জন্য আমার জীবনে কোন আকাঙ্ক্ষার তাগিদ কোনদিনও ছিল না। আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে, যখন আমার বয়স ত্রিশ-একত্রিশ, তখন আমি প্রথম একটি গল্প লিখেছিলাম। সেই গল্প পত্রিকাতে প্রকাশিতও হয়েছিল। তার আগে আমি কোনদিন গল্প লিখতে চেষ্টা করিনি। হঠাৎ দরকার হয়েছিল, তাই হঠাৎ লিখে ফেলেছিলাম। এছাড়া আমার গল্প লেখার ঘটনা অন্য কোন কার্য-কারণ সম্বন্ধের ক্রিয়াফল নয়। ঘটনাটা বস্তুত আকস্মিক, কোন অনুশীলিত প্রয়াসের পরিণাম নয়। মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত দরকারে বাংলা ভাষায় চিঠি-পত্র লিখতে হতো ; এছাড়া বাংলা-লেখার কোন চেষ্টা ও চর্চার অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। সদাগরী অফিসের কেরানী হিসাবে ইংরেজী ভাষায় অনেক কারবারী চিঠি অবশ্য লিখতে হয়েছে। বলাবাহুল্য, এধরনের বাংলা ও ইংরেজী চিঠি লেখবার সামান্য সাধারণ বৃত্তির মধ্যে ভাষার ও লেখার কোন সৌকর্যের ছায়াও ছিল না, সুযোগও ছিল না। হাজার হাজার সাধারণ মানুষের হাতের কলমের যে অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে, আমার অভিজ্ঞতা তার চেয়ে বেশী কিছু ছিল না। তাই আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে প্রথম একটি গল্প লিখে আমি নিজেই প্রথম বুঝতে পেরেছিলাম এবং বিস্মিত হয়েছিলাম যে, আমি সেই লেখাও লিখতে পারি, যাকে সাহিত্যের রূপ ও রীতির অনুমোদিত লেখা বলে স্বীকার করা হয়ে থাকে।

আমার প্রথম লেখা, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি ছোট নিবন্ধ। দ্বিতীয় লেখা, একটি গল্প ; নাম 'অযান্ত্রিক'। পাঠক ও সমালোচক অনেকেরই এই প্রশংসার গুঞ্জন শোনা গেল, 'অযান্ত্রিক' গল্পে বিলক্ষণ অভিনবতার স্বাদ আছে। আমার লেখা দ্বিতীয় গল্পটির নাম 'ফসিল'। 'ফসিল' গল্প প্রকাশিত হবার পর পাঠকের প্রশংসার কলরোল শোনা গেল। আনন্দবাজার পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় 'অযান্ত্রিক' প্রকাশিত হয়েছিল। 'অগ্রণী' নামের একটি মাসিক পত্রিকায় 'ফসিল' প্রকাশিত হয়েছিল। কয়েকটি পত্রিকায় 'ফসিল' গল্পটিকে উদ্ধৃত করা হয়েছিল। গণনাট্যের ব্রতী তরুণদল ফসিল গল্পটিকে নাটকরূপে প্রচারিত করে ও 'অঞ্জনগড়' নাম দিয়ে অভিনীত করলেন। সেই অভিনয় আমি দেখিনি। শুনেছি ওভারটুন হলে 'অঞ্জনগড়' নাটকের উদ্বোধন করেছিলেন প্রবীণ সুধী শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত। লেখক হিসাবে আমার সেদিনের বিস্ময়ের স্মৃতি আজ অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে গেলেও একেবারে মুছে যায়নি। পাঠকজনের পরিতৃপ্ত মনের বিপুল সমাদরের হর্ষে ফসিল গল্পের যে সুখ্যাতি উচ্ছ্বসিত হয়েছিল, সেটা যেন স্থিরনীর নদীর আকস্মিক উচ্ছলতার মতো একটা ঘটনা। চিন্তাতে কল্পনাতে ও আকাঙ্ক্ষাতে আমি এমন ঘটনা দেখবার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। তাছাড়া, প্রথম প্রয়াসের ফল একটি-দুটি গল্প পাঠকজন ও সমালোচকের কাছ থেকে বড় রকমের কোন অভ্যর্থনা পাবে, এটাও নিতান্ত বিরল, বস্তুত প্রায়-অসম্ভব ঘটনা বলে ধারণা ছিল। কিন্তু যেটা আশা করতে পারিনি সেটাই পেলাম। বেশ-একটু বেশী করেই পেলাম। সেদিনের স্মৃতির মধ্যে আমার নিজের মনের প্রসন্নতার ছোট একটি ছবি দেখতে পাই। সেই প্রসন্নতার মধ্যে যেন একটা ভয়ও মুখঢাকা দিয়ে লুকিয়েছিল। ভয়টা দুরু-দুরু একটা প্রশ্নের ভয়। তবে কি আমি সত্যিই একজন লেখক হয়ে গেলাম? আরও লিখতে হবে? সাহিত্যকে যদি একটি মন্দির বলে কল্পনা করি, তবে বলতে পারি, মন্দিরের খোলা দ্বার দেখতে পেয়েই সেদিন ভয় পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, দ্বার বন্ধ দেখতে পেলেই ভাল ছিল। ভিতরে-প্রবেশ করলেই তো ধূপ-দীপ জ্বালতে হবে। সেটা আমার যোগ্যতায় সম্ভব হবে কি হবে না, কে জানে।

ভেবেছিলাম, না, আর নয়। এই প্রথম সোপান থেকেই ফিরে চলে যাওয়া উচিত। আর কখনও কোন গল্প লিখবো না। কিন্তু আমার এই সংকল্পের জোর ভেঙে দিলেন আমারই পরিচিত ও অন্তরঙ্গ কয়েকজন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক বন্ধু। এক স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ছাড়া সেই বন্ধুদের সবাই আজও আছেন। মন্মথনাথ সান্ন্যাল, অরুণ মিত্র, বিনয় ঘোষ, পুলকেশ দে সরকার, সাগরময় ঘোষ ও বিজন ভট্টাচার্য। আমার লেখা গল্পের সুখ্যাতিতে আমি আর কী এমন খুশি হয়েছিলাম। আমার চেয়ে শতগুণ বেশী খুশি হয়েছিলেন তাঁরা, আমার ওই ছয়-সাত জন অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমার লেখা গল্পের সুখ্যাতি যেন তাঁদেরই একটি প্রিয় আকাঙক্ষার সফল কৃতিত্বের পরিণাম। কারণ তাঁদেরই ইচ্ছা ও অনুরোধের নির্দেশে আমি গল্প লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম। বাধ্য হওয়ার ছোট একটি ইতিবৃত্ত আছে, যা উল্লেখ না করলে আমার গল্প লেখার প্রথম চেষ্টার ইতিকথাটি অনুক্ত থেকে যায়। বন্ধুরা প্রতি মাসের দুই রবিবারে কোন এক বন্ধুর বাড়িতে সমবেত হতেন। উদ্দেশ্য, সাহিত্যের আলোচনা ও নিজের নিজের লেখা পাঠ করা। সেই লেখার ভাল-মন্দ গুণের বিচার করা হতো। এই সমাবেশের একটা নাম ছিল, অনামী সঙ্ঘ। আলোচনা শেষ হলে অনামীরা আর-একটি আনন্দের স্বাদে পরিতুষ্ট হতেন, ভোজনানন্দ। পালা করে বন্ধুদের বাড়িতে অনামী সঙ্ঘের বৈঠকী সমাবেশ হতো। অনামী সঙ্ঘের সদস্য হয়েও আমার আচরণে রীতিগত একটি ব্যতিক্রমের ব্যাপার ছিল। বৈঠকে আমার উপস্থিতি ছিল নিতান্ত একটা উপস্থিতি, শুধু অপরের লেখা মন দিয়ে শোনা, ও মন দিয়ে খাওয়া-দাওয়ার আনন্দ গ্রহণ করা। আমি কোনদিনও সাহিত্যের মতো করে কোন লেখা লিখিনি, সুতরাং অনামী সঙ্ঘের বৈঠকে আমার নিজের কোন রচনা পড়বার প্রশ্ন থাকতে পারে না। আমার এই অভিমতের যুক্তিকে আমল না দিয়ে স্বর্ণকমলবাবু প্রথম একটি কড়া অনুরোধের চাপ দিলেন ঃ সাহিত্যের মতো করে লিখতে পারুন বা না-পারুন যা ইচ্ছা হয় এবং যা পারেন, যেমন-তেমন কোন একটা নিজের লেখা অনামী সঙ্ঘের বৈঠকে আপনাকে পড়তেই হবে। নইলে ভাল দেখায় না। বুঝতে দেরি হয়নি আমার, নিজের কোন লেখা পাঠ না করে শুধু খাওয়া-দাওয়া করা ভাল দেখায় না। বুঝেছিলাম, যেটা অনুরোধের চাপ সেটা বস্তুত একটা অভিযোগের চাপ। সুতরাং অনামী সঙ্ঘের পরবর্তী দুই বৈঠকে নিজের লেখা দুটি গল্প পড়লাম। দুটিই গল্প, অযান্ত্রিক ও ফসিল। সন্ধ্যাবেলাতে বৈঠক, আমি দুপুর বেলাতে অর্থাৎ বিকেল হবার আগেই মরিয়া হয়ে সাত-তাড়াতাড়ি গল্প দুটি লিখে ফেলেছিলাম। আশা ছিল, এইবার অনামীদের কেউ আর আমার সম্পর্কে রীতিভঙ্গের অভিযোগ আনতে পারবেন না। কিন্তু একটুও আশা করিনি যে, বন্ধু অনামীরা আমার লেখা ওই দুই গল্প শুনে প্রীত হতে পারবেন। পঁয়ত্রিশ বছর আগের ঘটনা হলেও, অনামী বন্ধুদের সুপ্রীত চিত্তের সেই হর্ষধ্বনি আমি আজও শুনতে পাই, তাঁদের দুই চোখের সেই উজ্জ্বল পরিতৃপ্তির দৃষ্টি আজও আমার স্মৃতির মধ্যে যেন একটি দ্যুতিচ্ছবির মতো মাঝে-মাঝে জেগে ওঠে। অনামী বন্ধুদের আন্তরিক আনন্দের প্রকাশ ও উৎসাহবাণী আমার সাহিত্যিক কৃতার্থতার প্রথম মাঙ্গলিক ধান-দূর্বা। আমার নিজের অনুভবের মধ্যেও সেদিন অনেক বিস্ময় গুঞ্জরিত হয়েছিল, সে বিস্ময়ের মধ্যে একটি বড় প্রশ্নও নিহিত ছিল। আমার মতো অনভিজ্ঞ এক আনাড়ীর পক্ষে এক চেষ্টাতেই গল্প লেখা সম্ভব হলো কী করে? ব্যক্তির জীবনে যোগ্যতাও কি একটা আকস্মিক আবেগের সৃষ্টি?

সেদিন আমার মনের বিস্ময়ের মধ্যে যে প্রশ্ন ছিল, আমার গল্প লেখার এই ইতিবৃত্ত পাঠ করে অনেকের মনে সেই প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। কোন ব্যক্তির আকস্মিক কৃতিত্বের ব্যাপারটা কি বিনা চেষ্টার একটা ম্যাজিক? সেদিন যে বাস্তব সত্যতার নিয়মটাকে স্পষ্ট করে ধরতে ও বুঝতে পারিনি আজ সেটা খুব স্পষ্ট করে ধরতে ও বুঝতে পেরেছি বলেই বলতে পারি, না, আমার গল্প লেখার কৃতিত্বটা বিশুদ্ধ আকস্মিকতার একটা ইন্দ্রজালের জাল নয়। ভাবনা কল্পনা

ও অনুভবের মধ্যে জীবন-বৈচিত্র্যের যে ছবি আগেই রূপান্বিত হয়েছিল, তারই প্রতিচ্ছবি একদিন গল্পরূপে বিমূর্ত হয়েছিল।

প্রসঙ্গত আর-একটি ঘটনার খুব ছোট একটি ইতিবৃত্ত স্মরণ করতে পারি, সেটা আমার প্রথম গল্প লেখার দু'তিন মাস আগের একটি অভিজ্ঞতার। আনন্দবাজার পত্রিকা রবিবাসরীয় সাহিত্য বিভাগের একজন কর্মী হয়ে কাজ করতে গিয়ে বহুজনের প্রেরিত গল্পের ফাইল হাতড়ে একটি যোগ্য গল্প বাছতে হতো। যে-সব লেখকের কম-বেশী নাম-ডাক ছিল, শুধু তাদের লেখা নয়, অখ্যাত লেখকের গল্পও রবিবাসরের আনন্দবাজারের সাহিত্য-পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা হতো। অখ্যাত লেখকের গল্পকে আমার বুদ্ধিবিচার অনুযায়ী মাজা-ঘষা ও ওলট-পালট করে, এমন কী গল্পের মধ্যে নতুন বর্ণনা ও নতুন সংলাপও যুক্ত করে দিতাম। এই রকম কয়েকটি গল্প প্রকাশিত করবার পর লেখকের ধন্যবাদ এবং পাঠকজনের প্রশংসার চিঠিও এসেছিল। লেখকের ধন্যবাদের চিঠিতে মন্তব্য থাকতো ঃ আপনারা আমার লেখা গল্পটির চমৎকার সংশোধন করেছেন। পাঠকজনের প্রশংসা ও চিঠিতে মন্তব্য থাকতো ঃ এই রবিবারের আনন্দবাজারে প্রকাশিত গল্পটি খুবই সুন্দর হয়েছে। এই রকম আরও গল্প ছাপুন। ব্যাপার দেখে আমার মনে একটি দুঃসাহসিক বাসনার প্রশ্ন কয়েকবার ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছে করলে ও চেষ্টা করলে আমিও কি একটা আস্ত ভাল গল্প লিখে ফেলতে পারি না? বাস্, ওই পর্যন্ত, প্রশ্নটা এর বেশী কোন মানসিক চঞ্চলতা সৃষ্টি করতে পারেনি। অনামী বন্ধুদের তাগিদে বাধ্য না হবার আগে আমি কোন গল্প লিখতে চেষ্টা করিনি।

কবি বলেছেন—ছিন্ন তুষারের প্রায়, বাল্য বাঞ্ছা দূরে যায়। এটা কিন্তু মনোবিজ্ঞানের মনঃপূত ধারণার কথা নয়। বাল্য বাঞ্ছার আবেদন ব্যক্তির অন্তশ্চেতনায় সঞ্চিত হয়ে থাকে। ব্যক্তির কল্পনা ভাবনা ও অনুভবের স্বভাব তৈরী করে দেবার ব্যাপারে বাল্য বাঞ্ছারও হাত থাকে। কবি কালিদাস 'প্রাক্তনজন্মবিদ্যার' কথা বলেছেন। পূর্বজন্মের অধিগত বিদ্যা পরজন্মের ব্যক্তির জীবনে সঞ্চারিত হয়ে সহজ প্রতিভা সৃষ্টি করে কিনা, সেটা নিগূঢ় এক বিবাদীয় দার্শনিক তত্ত্বের প্রশ্ন। জন্মান্তরবাদও বাদ-প্রতিবাদের সংঘাতে অভিভূত একটি তত্ত্ব। ওই প্রশ্নের জবাবে আমার বিশ্বাস ও ধারণার কথার মধ্যে হ্যাঁ কিংবা না, দু'য়ের কোনটিই নেই। আমার বিশ্বাস এই যে, শুধু বাল্য বাঞ্ছা নয়, কৈশোর ও যৌবনেরও ভাবসঞ্চয় ব্যক্তির চিন্তার সৃষ্টিশীল প্রকৃতি নির্মাণ করে। এটা কবি কলা-শিল্পী ও কথা-শিল্পীদের সম্পর্কে আরও বেশী প্রযোজ্য একটি সত্য। জীবনের বিচিত্র রূপ রহস্য ও বিস্ময়ের সঙ্গে যার যেমনতর মায়িক সম্বন্ধ ঘটে, তার মনের বৃত্তি ও প্রকৃতি ঠিক তেমনতর মায়িক সৌকর্য লাভ করে। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ আকস্মিক প্রকারে সম্ভব হতে পারে, কিন্তু নির্ঝর স্বয়ং একটি আকস্মিক সৃষ্টি নয়। তার ইতিহাস আছে। খুব সরল করে বলা চলে, সেটা অভিজ্ঞতারই ইতিহাস। লেখক হবার আগে জীবনের আলো-ছায়া ও অন্ধকারের অনেক রূপ ও অনেক ঘটনা দেখবার অভিজ্ঞতা আমারও ছিল। শ্মশানের ভয়ানক ধোঁয়ার কুজ্ঝটিকা ও শালবনের মাথার উপর পূর্ণ চাঁদের জ্যোৎস্নাবিস্তার, দুইই দেখবার অভিজ্ঞতা। পনেরো বছর বয়সের জীবনে রোজ সকালে এক মাইল পথ হেঁটে উকিলবাবুর বাচ্চা ছেলেদের পড়াতে গিয়ে কঠোর এক সাংসারিক সত্যের স্বাদ পেতে হয়েছে। দশ টাকা মাইনের মাস্টারের একদিনের গরহাজির ক্ষমা করতে পারলেন না বিত্তবান ও সম্ভ্রান্ত উকিলবাবু। পাঁচ আনা কেটে রেখে ন' টাকা এগার আনা দিলেন। আবার অন্য ঘটনায় এর বিপরীত সত্যের প্রকাশও দেখতে হয়েছে। ক্ষুদ্র এক ধর্মশালার পাঁচ টাকা মাইনের দারোয়ান তার দুপুরবেলার আহারের দুটি মোটা-মোটা বজরা রুটির একটি আমার হাতে তুলে দিয়ে বলে গেল—আপনি আজ এখনও কিছু খাননি বলে মনে হচ্ছে, তাই আমিও খেতে পারছি না। রুটিটা এখনই খেয়ে নিন। আমার বিশ্বাস, এ রকম অনেক ঘটনার ভিতরে ও নিকটে থাকবার অভিজ্ঞতা আমার অনুভব ও প্রত্যয়ের সম্বল সৃষ্টি করেছে।

কৈশোর কালের আর একটি প্রাপ্ত সম্বলের কথা মনে পড়ে, যার রূপটা বস্তুত রূপকথারই মতো একটি আবেশ দিয়ে গড়া। পিতামহের বন্ধু রায়বাহাদুর পার্বতীনাথ দত্ত, যিনি ভারতের জিওলজিক্যাল সার্ভের প্রথম ভারতীয় ডিরেক্টর, তিনি নদী পাহাড় সমুদ্র ও পাথরের অনেক মজার-মজার গল্প বলতেন, বড়-বড় প্রাণীর হাড় পাথর-চাপা পড়ে ফসিল হয়ে যায়। মহিলা কবি কামিনী রায় আমাদের বাড়িতে আসতেন। তিনি তাঁর লেখা দুটি বই, 'গুঞ্জন' ও 'অশোক সঙ্গীত' উপহার দিয়েছিলেন। অর্থ বুঝতে পারিনি, কিন্তু কবিতার কথাগুলি মনের মধ্যে যে ঝংকার জাগিয়ে তুলতো, তার মধুরতা অনুভব করতে কোনই অসুবিধা হতো না। আমরা দীক্ষিত ব্রাহ্ম না হলেও আমাদের বাড়িতে ব্রহ্মোপাসনা প্রায়ই হতো। আচার্যের প্রার্থনার ভাব ও ভাষার অনেক কিছু বুঝতে না পেরেও মুগ্ধ হতাম। পিতামহের টেবিলের উপরে রাখা একখণ্ড 'ব্রহ্ম সঙ্গীত' আদ্যোপান্ত বারবার পড়েছি। বয়সটা তখন যদিও সেইসব সঙ্গীতের তত্ত্ব ও তাৎপর্য বুঝবার মতো যোগ্যতার বয়স নয়, তবু একটা নতুন রকমের তৃপ্তি বোধ করতাম। আমার ধারণা, আচার্যদের প্রার্থনার ভাষা ও ব্রহ্মসঙ্গীতের ভাষা আমার সেই কিশোর মনের মধ্যে একটি সুষ্ঠু ভাষার সম্বল তৈরী করে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে দার্শনিক মহেশচন্দ্র ঘোষের লাইব্রেরী ছিল আমার নিজের ইচ্ছানুচালিত শিক্ষার একটি বড় সহায়। আমার এই আত্মনির্ভর শিক্ষার সিলেবাসে কাহিনী-সাহিত্যের কোন স্থান একরকম ছিলই না বললেই চলে। ইতিহাস ও দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের বই পড়বার দিকে আমার বেশী ঝোঁক ছিল। রাঁচী নিবাসী বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায়ের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে উপস্থিত হবার কোন সুযোগ হয়ে ওঠেনি, তাঁর লেখা আদিবাসী-জীবনের বৃত্তান্ত পাঠ করে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কৌতূহল উদ্বোধিত হয়েছিল। আমি তখন হাজারিবাগ সেণ্ট কলাম্বাস কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায়ের ছেলে রমেশ ছিল আমার সহপাঠী কলেজ-বন্ধু। রমেশের মুখ থেকে তার পিতার গবেষণা ও নৃতাত্ত্বিক নিদর্শনের সংগ্রহ সম্পর্কে কিছু পরিচয়ের কথা শুনেছিলাম। যে-টুকু শুনেছিলাম তারই মধ্যে যেন আবেদনময় একটি সঙ্কেত ছিল। কৃতী নৃতাত্ত্বিক হবার একটি আকাঙ্ক্ষার সঙ্কেত! যা-ই হোক, আকাঙ্ক্ষা থাকলেও নৃতাত্ত্বিক হতে পারিনি। ভূতাত্ত্বিক কিংবা সঙ্গীত-রচয়িতা কবি হতেও পারিনি। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি, সেদিনের সেইসব আবেশ আগ্রহ ও কৌতূহলের সঞ্চয় আমার গল্প-লেখা ও উপন্যাস-লেখা প্রয়াসেরই একটি সহায়ক সম্বলে পরিণত হয়েছে।

মাইকেল মধুসূদনের একটি কবিতার বাণীর মধ্যে কান্ত সাহিত্যের মনস্তাত্ত্বিক নির্মাণের রীতি সংজ্ঞায়িত হয়েছে বলে মনে করা চলে। ফুটি যেন স্মৃতিজলে, মানসে মা যথা ফলে, মধুময় তামরস...।' ভৌগোলিক মানস হ্রদের সঙ্গে তুলনা না করে বলা চলে যে, মানুষের মনের রূপায়তনও একটি হ্রদ, এবং স্মৃতি তার জল। কান্ত সাহিত্যের প্রত্যেকটি সৃষ্টি, কবিতা ও কাহিনী, বস্তুত স্মৃতিজলে ফুটে ওঠা তামরস। গল্পলেখক হিসাবে আমার অভিজ্ঞতারও আবিষ্কার এই যে, স্মৃতি যেন আপন আগ্রহের বেদনায় একটি কান্তি সৃষ্টি করে পরিতৃপ্ত হয়। গল্প-লেখা তাই সাহিত্যিক জীবন নামে স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর একটা জীবনের কাজ নয়। এবং কান্ত সাহিত্য সৃষ্টি করবার যোগ্যতা নিছক পাণ্ডিত্যের অধিগম্য কোন কৃতিত্ব নয়। এই যোগ্যতার ষোল-আনা ভাগের বারো-আনা ভাগই বস্তুত আন্তরিক সংবেদনার কোন জিজ্ঞাসার সৃষ্টি, বুদ্ধিবৃত্তির কোন তাগিদের সৃষ্টি নয়। নিজের ইচ্ছার তাগিদে হোক, কিংবা পত্র-পত্রিকার সম্পাদকের অনুরোধের চাপে হোক, যখনই গল্প লিখেছি তখনই বুঝতে পেরেছি যে, বিশেষ একটি জিজ্ঞাসার প্রেরণা ছাড়া গল্প লেখা সম্ভবই নয়, যদিও গল্পের মতো চেহারার একটা বাক্-সামগ্রী নির্মাণ করা সম্ভব। আমি জানি, এবং আমার স্বীকার করতে একটুও আপত্তি নেই যে, আমার লেখা কিছু গল্পও বস্তুত গল্পের মতো চেহারার বাক্-সামগ্রী মাত্র, বিশেষ কোন আন্তরিক জিজ্ঞাসার রূপ নয়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমার লেখা এ ধরনের কয়েকটি

অযথার্থ গল্প বিজ্ঞ সমালোচকের উচ্চকণ্ঠ প্রশস্তি লাভ করেছে, যদিও সাধারণ পাঠকের কাছ থেকে পাওয়া চিঠির ভাষাতে তার আশাভঙ্গের দুঃখ বিবৃত হয়েছে যে ঃ আপনার লেখা এই গল্পটিকে পড়ে কোন সুখ পেলাম না। গল্পটি কেমন যেন খাপছাড়া।

আমার গল্পের গুণাগুণ নির্ণয় করবার যে পদ্ধতিকে আমি সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল বলে মনে করি, সেটা হলো সাধারণ পাঠকের কাছ থেকে পাওয়া একগুচ্ছ চিঠির অভিমত। সাধারণ পাঠকের অভিমতের উপর আমার এই আস্থার একটি বড় কারণ হলো বারো বছর বয়সের একটি বালকের প্রশ্ন--আপনার 'ঠগিনী' আর 'পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা' কিন্তু একই গল্প, দুরকম করে লিখেছেন, তাই না? এ রকম প্রশ্ন, বিশেষ করে এত অল্প বয়সের এক বালক-পাঠকের মুখে উচ্চারিত হতে পারে বলে ধারণা ছিল না। শুনে চমকে উঠেছিলাম, কারণ আমি লেখক হয়েও কোনদিন ভেবে দেখিনি কিম্বা বুঝতেই পারিনি যে, ওই দুই গল্প জীবনের একই অনুভব ও হৃদয়বৃত্তির দুই ভিন্ন সাজের দুই রূপ। সেদিন থেকে আমার এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে যে, পাণ্ডিত্যময় প্রবীণতার দুই চোখের দৃষ্টিতে স্বচ্ছতার অভাব থাকে, ভাব অনুভব ও রসের সহজ সত্যের প্রতিভাস সেই চোখে ফুটে উঠতে পারে না। কিন্তু যাদের আন্তরিক বৃত্তির সহজ সৌষ্ঠবের কোন বিকার ঘটেনি, কান্তকলার যথার্থ রূপের বিচার করবার মানসিক যোগ্যতা তাদেরই বেশী। এটা আমার দীর্ঘকালের তথাকথিত সাহিত্যিক-জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা। সাহিত্যের সমালোচক বলে পরিচিত ও খ্যাত তিন গুণী ব্যক্তির ভিন্ন-ভিন্ন তিন নিবন্ধে আমার লেখা একটি গল্পের তিন রকম অদ্ভুত তাৎপর্যের পরিবেষণ দেখে আতঙ্কিত হয়েছিলাম, যেন তিনটি ভয়াবহ কুজ্ঝটিকা কথা বলছে। একদিন প্রাথমিক স্কুলের এক শিক্ষিকার চিঠি পেলাম ঃ আপনার গল্পটির অর্থ কি এই নয় যে, মানুষের জীবন একবিবাহের (মনোগেমি) সম্বন্ধের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সুখী হয়? ঠিক প্রশ্ন, মনোগেমি অর্থাৎ একবিবাহ প্রথা বলে আখ্যাত সামাজিক শীলাচারের মনস্তত্ত্ব এই গল্পে মর্মায়িত হয়েছে। এই চিঠির প্রশ্নে এক মুহূর্তেই আমার সেই আতঙ্কের ঘোর কেটে গিয়েছিল।

সমালোচনার এইসব বিচিত্র ও অদ্ভুত রকম-সকমের অনেক নমুনার উল্লেখ করতে পারি। কিন্তু না, অলমতি বিস্তরেণ। শুধু বলতে হয় যে, অক্ষম ও স্থূল প্রকারের সমালোচনা, প্রশস্তি হোক বা ভর্ৎসনা হোক, সাহিত্যের পরিবেশ আবিল করে। আমার উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার স্মৃতি যদি কথা বলে, তবে এই কথাই বলবে যে, অক্ষম সমালোচনা হলো ক্লিন্ন এক জঞ্জাল, সাহিত্যের সুস্থতার একটি বড় ভয়। সমালোচনার দীনতা রিক্ততা ও কৌতুককর প্রগল্‌ভতার এই রকম কয়েকটি নমুনা আমার স্মৃতিলোকের কয়েকটি সামান্য বিষাদের নমুনা ছাড়া আর কিছু নয়। সত্যিকারের গুণান্বিত সমালোচনার অনেক নমুনা আমার স্মৃতিলোকের প্রসন্নতার মধ্যে শুভাবহ সংকেতের মতো মুদ্রিত হয়ে রয়েছে। সাহিত্যের সুহৃদ হবার মতো গুণ ও শক্তি এমন অনেক সমালোচনার সাক্ষাৎ পেয়েছি।

এই পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে মাঝে-মাঝে একটানা অনেক বৎসর এবং অনেক মাস বাদ গিয়েছে, গল্প লেখবার ইচ্ছা ও চেষ্টা দুই-ই স্তব্ধ হয়ে যেন সাময়িক বিরাম উপভোগ করছে। একবার একটানা পুরো চার বছর, এবং একবার একটানা পুরো দু'বছর একটিও গল্প লিখিনি। কিন্তু সেই সময় সমালোচকের নিবন্ধে খিন্ন মেজাজের মন্তব্য ধ্বনিত হয়েছে ঃ সুবোধ ঘোষ আজকাল বড় বেশী লিখছেন। এত বেশী লেখালেখি ভাল নয়, এতে লেখার উৎকর্ষের হানি হয়।

সাহিত্যের লেখক হিসাবে আমার বিশেষ একটি সৌভাগ্যের সত্য এই যে, আমাকে কোনদিনও নিজের ইচ্ছার তাগিদে কোন পত্রিকা-সম্পাদকের বরাবরেষু আমার কোন লেখা পাঠাতে হয়নি। নিজের লেখা গল্প ও উপন্যাস বই করে বের করবার ইচ্ছায় আমাকে কোন

দিন কোন প্রকাশকের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয়নি। প্রকাশক স্বয়ং আগ্রহী হয়ে আমার গল্পগ্রন্থ অথবা উপন্যাস প্রকাশ করবার প্রস্তাব করেছেন, তবেই আমি সাড়া দিয়েছি কিংবা দিইনি। কিন্তু উপযাচক হয়ে কোন প্রকাশকের কাছে বই ছাপাবার কোন অনুরোধ আমাকে কখনও করতে হয়নি। বন্ধু সাহিত্যিক খুশি হয়ে বলেছেন ঃ আপনিই ভাল আছেন। আপনার বই বিক্রী হোক বা না হোক, বইয়ের বাজারের ধুলো আপনাকে গায়ে মাখতে হয়নি। জানবেন, এটা আপনার সাহিত্যিক জীবনের একটি বিশেষ পুরস্কার। বলা বাহুল্য, বন্ধু সাহিত্যিকের এই ধারণার সঙ্গে আমার নিজের ধারণার একটুও অমিল নেই।

আমার স্মৃতিকথার এই প্রসঙ্গটি কারও কারও কাছে অহমিকার প্রকাশ বলে বোধ হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে এটা স্নিগ্ধ একটি উপলব্ধির বিনীত নিবেদন। ভাবতে সত্যিই আনন্দ পাই যে, বাজারের ধুলো গায়ে মাখবার দুর্ভাগ্য আমার হয়নি। অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য একদিন বলেছিলেন--আপনার দাম্ভিক বলে দুর্নাম আছে। থাকতে পারে। সেদিন যেমন ছিল আজও বোধহয় তেমনই আছে। ঝলমলে আসরের মধ্যে প্রবেশ না করে এক পাশে একটু আবছায়ার মধ্যে আল্‌গা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, কিংবা ভিড়ের চক্র দেখে দূরে সরে থাকা যদিও বস্তুত একপ্রকারের নিরীহ নির্লেপ তবু সেটা দম্ভ বলে অপবাদিত হয়ে থাকে। শুনেছিলাম, যে ব্যক্তি কোন দলে থাকে না, যে ব্যক্তি কোন সঙ্ঘবদ্ধ স্বার্থের পক্ষভুক্ত নয়, তাকে সকলেই পছন্দ করে। আমার অভিজ্ঞতার যে-কথা আজও স্মৃতির ঘরে একটি অদ্ভুত ও অভাবিত বিস্ময়ের কলরবের মতো বাজে, সেটা এই যে, এহেন দলহীন ও অপক্ষভুক্ত ব্যক্তিকে সবাই অপছন্দ করে, তার সম্পর্কে কারও কোন মমতার কর্তব্য নেই, তার সম্পর্কে যথেচ্ছ অপবাদ রটনা করাই একটা লোকাচার। এ ধরনের লৌকিক অমান্যতার অপঘাতে আমার সাহিত্যিক-জীবনের শান্তি মাঝে মধ্যে ব্যথিত হলেও বিচলিত হয়নি। শুধু বিস্মিত হয়েছি কিন্তু বিদ্বিষ্ট হতে পারিনি। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী একবার আমার সম্পর্কে এক ব্যক্তির উদ্দীপ্ত রোষের কথা জানিয়ে দিয়ে আমাকে সভয় একটু সতর্ক হতে বলেছিলেন। উচ্চপদস্থতার বিক্রমে মোহান্বিত সেই ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা, তিনি আমার চাকরি খাবেন এবং আমার সাহিত্যিক আকাঙ্ক্ষার ছটফটানি একেবারে ঠাণ্ডা করে ছেড়ে দেবেন। প্রমথবাবুকে আমি বলেছিলাম, তিনি ক্ষতি করুন, সেজন্য আমি ভীত নই। কেন? জিজ্ঞাসা করেছিলেন প্রমথবাবু। আমি বলেছিলাম ঃ জীবনে আমি কোনদিনও কারও ক্ষতি করিনি, তাই আমি ক্ষতিচারী কোন ক্ষমতাবানকেও ভয় করি না। কারও কারও মনে হতে পারে যে, স্মৃতিকথা লেখবার ছলে আমি বেশ কিছুটা আত্মগরিমার কথা বলে নিচ্ছি। না, তা নয়। আমি আমার এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের লেখকতার জীবনে কোনদিনও আমিত্বে চিহ্নিত করে কিংবা আমিত্ব প্রসারিত করে কোন নিবন্ধ লিখিনি। নির্ভয়ের ওই তত্ত্ব আমার একটি অভিজ্ঞতার উপহার, একটি ঘটনার শিক্ষা। সেই ঘটনার স্মৃতিচ্ছবির মধ্যে আজও স্পষ্ট করে দেখতে পাই, ধবধবে ফর্সা ও অত্যন্ত রোগা চেহারার এক পাঠকজী ঘন-সন্ধ্যার অন্ধকারে তুলসী-মণ্ডপের চাতালের উপর একটি বাতি রেখে রামায়ণ পড়ছেন। সহসা এক ব্যক্তি ছুটে এসে চেঁচিয়ে উঠলো, ভাগিয়ে পাঠকজী, ওরা রওনা হয়েছে, ওরা আজ রাত্রিতেই আপনাকে খুন করবে। ওরা মানে, পাঠকজীর দেশ-গাঁয়ের তিন জ্ঞাতি-ব্যক্তি, যারা পাঠকজীকে তাদের ভূসম্পত্তির একটি সমস্যা বলে মনে করে। পাঠকজী বললেন--আসুক ওরা। আমি এখান থেকে নড়বো না। প্রশ্ন করেছিলাম ঃ আপনার ভয় করছে না? পাঠকজী বললেন ঃ শোন বাবা, আমি জীবনে কারও কোন ক্ষতি করিনি। তাই আমি কাউকে ভয় করি না। হ্যাঁ, শুধু এক ভগবানকে ভয় করি ; যদিও ভালবাসি। তোমারও কোনদিন কাউকে ভয় করবার দরকার হবে না, যদি জীবনে কারও কোন ক্ষতি না কর। মনে পড়ে, পাঠকজীর কথার আবেশ যেন আমার প্রাণের উপর সঞ্চারিত হয়ে সেদিন আমাকে একটি পরম বিশ্বাসে দীক্ষিত করে দিয়েছিল। চোখ নিষ্পলক

হয়েছিল, গা শিউরে উঠেছিল, যেন একটা আলোর স্রোত বুকের ভিতরে সঞ্চারিত হয়েছে। আমার লেখা একটি উপন্যাসে এই পরম সন্তুষ্ট ও পরম নির্ভয় পাঠকজী আছেন। শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় একদিন খুশী হয়ে বললেন—উপন্যাসটি পড়েছি ; প্রার্থনা করি, পাঠকজীর মতো মানুষের সন্তোষ ও নির্ভয়ের পুণ্যকথা শোনাবার জন্য ভগবান আপনাকে দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখুন।

জীবনে বহু ঘটনা যেমন আপনি দেখা দিয়ে সত্য-মিথ্যার নির্ণয় স্পষ্টতর করে দিয়েছে, তেমনই মাঝে-মাঝে, যেন প্রাণের এক-একটি জিজ্ঞাসার আহ্বানে ঘটনা এসেছে ও শিক্ষা দিয়ে দিয়েছে। মনুষ্যত্ব মহত্ত্ব ও মরালিটি, এই তিনটি সুকৃতি একই সূত্রে গাঁথা, কোনটিও কারও সম্বন্ধে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিছক এককতায় সত্য হয়ে উঠতে পারে না। দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের প্রত্যেকটি মৃদু অথবা কঠিন অনুজ্ঞা এই শিক্ষাই দিয়ে থাকে। আমিও গুরু চিন্তার অনেক বই লঘু প্রকারে পাঠ করেও এই সুদৃঢ় প্রত্যয় লাভ করেছিলাম যে, হ্যাঁ, ওই মরালিটি ও মনুষ্যত্ব এবং মহত্ত্ব একই সম্বন্ধিত ত্রিভুজের তিন বাহু। একটি ছাড়া অন্য দু'টির কেউই সত্য হতে পারে না। মরালিটি বলতে সাধারণ অর্থে চারিত্রিক শুচিতা বোঝায়। এবং চারিত্রিক শুচিতা বলতে বিশেষভাবে কী বোঝায়, সেটা অজ্ঞ অদার্শনিক জনেরও অজানা নয়। চল্লিশ বছর আগের একটি ঘটনার স্মৃতিচ্ছবির মধ্যে হাজারিবাগের যে সুরেশদা'কে আজও দেখতে পাই, তাঁর মাথায় টাক ছিল, আর গায়ে ছিল আধ-ময়লা একটি টুইল কাপড়ের কামিজ। কামিজের দুই আস্তিন গোটানো থাকতো বলেই স্পষ্ট করে দেখতে পেতাম, ত্রিশ বছর বয়সের সুরেশদার হাত দুটি একটু রোগা হলেও বেশ মজবুত। চলতি মতের সাধারণ অর্থে যাকে চারিত্রিক শুচিতা বলে, তার সামান্যতম খ্যাতিও সুরেশদার জীবনে ছিল না। মদের একটি পাঁইট বোতলের ভারে তাঁর কামিজের একটা পকেট ঝুলে থাকতো। রাতের পাহারাদার পুলিশ সুরেশদাকে প্রায়ই পতিতা-পল্লীর আনাচে-কানাচে হল্লা করে ঘুরে বেড়াতে দেখতে পেত আর ধরে নিয়ে গিয়ে থানার হাজত ঘরে ঢুকিয়ে দিত। এহেন সুরেশদার চিমড়ে মুখটাকেই একদিন পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর পুরুষের মুখ বলে মনে হয়েছিল। সে-রাতে কুমোরপাড়ার একটা বাড়ির চালাতে আগুন লেগেছিল। বাঁশের ঠাট দিয়ে তৈরী চালাটা দাউ-দাউ করে জ্বলছিল। কুমোরপাড়ার আর্ত চিৎকারে মাঝরাতের ঘুম আর স্তব্ধতা ভেঙে গিয়েছিল বলেই শহরের অনেক মানুষ ছুটে এসে কুমোরপাড়ার আগুন-লাগা বাড়িটার কাছে, তার মানে নিরাপদ ব্যবধান রেখে একটু দূরে এসে ভিড় করেছিল। সেই ভিড়ের মধ্যে কে না ছিলেন? বিদ্বান অধ্যাপক, সেবা মিশনের সন্ন্যাসী, উকিলবাবু ও ডাক্তারবাবু, কলেজের ছাত্র, লাঠিয়াল বলে সুখ্যাত ডোম ও গয়লা, এবং থানার দারোগা ও সাত-আটজন পুলিশ কনেস্টবল। নৈষ্ঠিক ভক্তি ও সাত্ত্বিক বিশ্বাসের জন্য শহরের সবাকার শ্রদ্ধান্বিত তিন যুবক-ভদ্রলোকও ছিলেন। আমিও ছিলাম। সকলেরই মনে ও মুখে একটি প্রশ্ন হায়-হায় বিলাপের রব তুলে ছটফট করছিল, আগুন-লাগা ওই বাড়ির একটা ঘরের ভিতরে সব্জীওয়ালা সেই বুড়ো ও তার বুড়িকে পুড়ে মরবার দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করবে কে? আগুন যে কুমোরপাড়াকে প্রায় ঘিরে ফেলেছে। উদ্বিগ্ন অথচ অলস সেই বিলাপমুখর জনতার বিলাপ আরও একটু প্রবল হতেই দেখা গেল, এক ব্যক্তি দুরন্ত বেগে ছুটে এসে আর চেঁচিয়ে হাঁক দিচ্ছে—আমার হাতে একটি টাঙি দাও। আর-কিছু চাই না, শুধু একটা টাঙি। ভিড়ের একটি লোক দৌড়ে গিয়ে, ভিন্‌পাড়ার এক বাড়ি থেকে একটি টাঙি যোগাড় করে আবার ফিরে এল। সুরেশদা সেই টাঙির তিন কোপে জ্বলন্ত ঘরের দরজার কপাট তিন টুকরো করে ভেঙে দিলেন। ধোঁয়া-ভরা ঘরের ভিতরে ঢুকলেন সুরেশদা ; বেহুঁস এক বুড়ো ও তার বুড়ির দুই দেহভার দুই কাঁধের উপর তুলে নিয়ে সুরেশদা আবার বের হয়ে এলেন। বেহুঁস বুড়ো-বুড়িকে খাটিয়াতে তুলে নিয়ে হাসপাতালে চলে গেল পুলিশ। আর সুরেশদা সড়কের পাশে

নালার কিনারার ঠাণ্ডা ঘাসের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে রইলেন অনেক্ষণ। আমরা ডাক দিলাম —সুরেশদা বলুন, আপনার কি কোন কষ্ট হচ্ছে? সুরেশদা উঠে বসলেন আর বললেন—ওরে তোরা আমার জন্যে ভাবছিস কেন? আগে বল, বুড়োটা আর বুড়িটা বেঁচে আছে কিনা। আমরা বললাম, হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু বললেন, বেঁচে আছে। সুরেশদা বলেন, ব্যাস্, তাহলেই হলো।

আমার লেখা গল্প ও উপন্যাসের অনেক ঘটনাতে এই সুরেশদা সামান্যভাবে কিংবা বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। প্রশ্ন জেগেছে মনে, মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের গৌরবে সুরেশদাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন, এমন পূতচরিত্র মানুষ এই সাধারণ মানবতার সংসারে কতজন আছেন? সেই প্রশ্নের এই উত্তর পেয়েছি যে ওই মরালিটি, অর্থাৎ তথাকথিত ওই চারিত্রিক শুচিতা সত্যিই একটি শুচিতা এবং ব্যক্তিত্বের একটি বৈভব বটে, কিন্তু মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব অন্য কোন সত্যের দান।

সুরেশদাকে যেমন মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের একটি গূঢ় রহস্যের প্রতিনিধি-পুরুষ বলে মনে হয়েছে, তেমনই জীবনের নানা ঘটনার পথে এমন কিছু চোখের জলের ও স্মিতহাসির সাক্ষাৎ পেতে হয়েছে, যার রূপ ও বিচিত্রতা নিয়মের শাসনবন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি রহস্যের প্রকাশ বলে মনে হয়েছে। পরেশনাথ পাহাড়ের কাছে প্রখ্যাত ট্রাঙ্ক রোডের উপর ডুমরির ডাক বাংলার সামনে গিরিডি-ধানবাদ সার্ভিস বাস ক্ষণবিরামের জন্য থেমেছে ; বিশ বছর বয়সের বাস-কণ্ডাক্টর জেলা-বোর্ডের ছোট্ট হাসপাতাল ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবুর মেয়ের কাছে এক গ্লাস জল চেয়েছে। ডাক্তারবাবুর মেয়ে পাটনার কলেজে পড়ে, এখন গ্রীষ্মের ছুটি, তাই সে এখন ডুমরিতে আছে। দু'জনের কেউই আগে কখনও কাউকে দেখেনি। আজ এই প্রথম সাক্ষাৎ। জল খেয়ে নিয়ে বিশ বছর বয়সের বাস কণ্ডাক্টর আরও পাঁচটা মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, আর, ডাক্তারবাবুর সেই কলেজে-পড়া মেয়েও পাঁচ মিনিটকাল শূন্য গেলাস হাতে নিয়ে, কিন্তু নীরব হয়ে ও অন্যদিকে তাকিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। সার্ভিস বাসের হর্ণ বেজে ওঠে ; চলে যাবার সময় হয়েছে। কাজেই বিশ বছর বয়সের সেই বাস কণ্ডাক্টরকেও তখন হাসপাতালের বারান্দা ছেড়ে ও ব্যস্ত হয়ে চলে যেতে হলো। কী আশ্চর্য, ডাক্তারবাবুর মেয়ের দুই চোখ জলে ভরে গিয়ে ঝাপসা হয়ে গেল। না, এটা তো নিয়ম নয়, নিতান্ত অনিয়ম। কিন্তু স্বীকার না করে উপায় নেই যে, মানুষের অন্তর সত্যিই একটি রহস্যের জগৎ, তার হাসি অশ্রু বিষাদ ও উল্লাস সব সময় নিয়ম মেনে চলে না।

জীবনে এ রকম অনিয়মের বিস্ময় অনেক দেখেছি বলেই আমার লেখা অনেক গল্পের মধ্যে সেই বিস্ময়ের আবেগ খুবই সহজে সঞ্চারিত হয়েছে। ডাক্তারবাবুর সেই মেয়েকে হৃদয়বৃত্তির যে বিস্ময় বলে মনে করা চলে, সে বিস্ময় আমি আমার গল্পের অনেক নায়িকার ভালবাসার প্রাণে সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করেছি। অনিয়মের বিস্ময় অথবা বিস্ময়কর এই অনিয়ম অদ্ভুত হয়েও জীবনের যত নিয়মিত মধুরতার চেয়ে অনেক বেশী মধুর। জঙ্গলের মাথার উপর চাঁদ হাসছে, জঙ্গলের ভিতরে গাছের পাতার ফাঁকে-ফাঁকে ছেঁড়া-ছেঁড়া জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে, মাঝ রাতের নিরেট নীরবতার মধ্যে বাতাসের শব্দ যেন জঙ্গলের বুকের ভিতরে লুকিয়ে-থাকা একটা অপার্থিব মায়ার মদবিহ্বল ইচ্ছার উচ্ছ্বাস। এহেন পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে একদিন বুঝতে হয়েছিল, হ্যাঁ, এও এক অনিয়মের বিস্ময়। মানুষের গা ঘেঁষে আর স্তব্ধ হয়ে বসে রইল বাঘ, চেনা-জানা একটি পোষা বাঘ। জঙ্গলের মায়ার আহ্বান তাকে টেনে নিতে পারলো না। শিকল-বাঁধা ও খাঁচা-বন্দী জীবনের বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত করে দেবার ইচ্ছায় সেই পোষা বাঘকে জঙ্গলের ভিতরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই মুক্তি মেনে নিতে পারলো না বাঘ, বলিষ্ঠ এক প্যান্থার। তার গায়ের উষ্ণ স্পর্শটা আমার স্মৃতির বুকে আজও লেগে আছে। একটি গল্প লিখে এই অনুভূতির তর্পণ করেছি।

নবীনচন্দ্র লিখেছেন—ধন্য আশা কুহকিনী তোমার মায়ায়, অদ্ভুত মানবচক্র ঘোরে নিরবধি। কবির উক্তি বস্তুত বিষাদ-বিজল্পিত একটি দার্শনিক উপলব্ধির প্রতিধ্বনি। কিন্তু সামান্য রকমের একটা আর্থিক রোজগার ঘটিয়ে দিতে পারে, এ রকম একটি জীবিকার আশাও যে কী-ভয়ানক কুহকিনী হতে পারে, সেটা ত্রিশ বছর বয়সের কোঠায় পা দেবার আগেই হাড়ে-হাড়ে বুঝতে হয়েছিল। কিন্তু দেখে নিজেই আশ্চর্য হয়েছি, হাড়গুলি ভাঙেনি। কর্মভাগ্যটা যেন নিদারুণ এক হেঁয়ালির আহ্বানে চঞ্চলিত হয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে ও দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরেছে। কিন্তু নিশ্চিন্ত হবার মতো কোন স্থিতি পায়নি। সেই দুরন্ত জীবিকা-সংগ্রামের মধ্যে অনেক জ্বালাকর দুঃখ ক্লেশ আর কষ্ট ছিল, কিন্তু খুবই স্নিগ্ধ একটি শিক্ষাও ছিল। ভাগবতের অবধূতের সাতাশ গুরু ছিল, সাতাশটি মানবেতর প্রাণী। সেইসব মানবেতর প্রাণীর সহজ প্রবৃত্তি ও জৈবিক আচরণের রূপ থেকে নৈতিক সত্যের শিক্ষা আহরণ করেছিলেন অবধূত। আমিও নিতান্ত সাধারণ মানুষের সহজ মহত্ত্বের এক-একটি আত্যন্তিক পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়েছিলাম। উপমা দিয়ে বলা চলে, বৈশাখ মাসের জঙ্গলের পথে ক্লান্ত কাঠুরিয়ার তেষ্টা হঠাৎ একটা ঝরনা দেখতে পেয়ে যেমন বিস্মিত হয়। শত শত যে-সব মানুষের সংসর্গে আমার নানা রূপের ও রকমের জীবিকা-কর্মের দিনগুলি কেটেছে, তারা সমাজবিজ্ঞ পণ্ডিতের ভাষায়, নিম্ন-সাধারণ মানুষ। আমার শিক্ষায় ও অভিজ্ঞতায় বলে, তারা উচ্চ-সাধারণ মানুষ।

আমার 'ফসিল' গল্প সুখ্যাত হলেও কোন প্রকাশক ফসিল ও অন্য কয়েকটি গল্পকে বই করে ছাপতে ও প্রকাশ করতে আগ্রহ বোধ করেননি। তাঁদের অনাগ্রহের যুক্তি এই যে, গল্পের বই বিকোয় না। 'ফসিল' গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন একজন অ-প্রকাশক ভদ্রলোক, বন্ধু ক্ষেত্রনাথ রায়ের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ পাল। অ-প্রকাশকের দ্বারা প্রকাশিত 'ফসিল' বইটির প্রথম সংস্করণ কিন্তু দু'তিন মাসের মধ্যেই বিকিয়ে গিয়ে নিঃশেষ হয়েছিল।

ছেলেবেলা থেকে শালবন পাহাড় আর জংলী ঝরনা-নদীর সঙ্গে মেলামেশার আনন্দ আমার জীবনের একটি মহৎ সঞ্চয়। সে আনন্দের মধ্যে যে কঠিন একটি জিজ্ঞাসা নিহিত ছিল, তার পরিচয় বয়স না বাড়বার আগে ঠিক বুঝতে পারিনি। শালবন পাহাড় আর জংলী ঝরনা-নদীকে চমৎকার এক রহস্যের মায়াচ্ছবি বলে বোধ হতো। এ কিসের মায়া? বয়স বাড়লে এই জিজ্ঞাসার কথাটা ভাবনার ঘরে মাঝে মাঝে একটু বেশী সরব হয়ে উঠতো। ওয়াড়সোয়ার্থের কবিতা পাঠ করবার ও তার অর্থ বোঝবার অনেক আগেই অনেকদিন ও অনেকবার মনে হয়েছিল, শালবনের বাতাস আর ঝরনার নদীর শব্দ যেন কথা বলছে। কে জানে কী কথা! সেদিনের অনুভবের আবেশ কিন্তু বয়স বাড়তেই ঠিক তেমন করে ফুরিয়ে যায়নি, রোদ বাড়লে ঘাসের শিশির যেমন শুকিয়ে যায়। তত্ত্বের গ্রন্থে এই জিজ্ঞাসা ও আবেশের সরল অর্থ-পরিচয় পাওয়া যায় ঃ সৃষ্টির বিস্ময় অনুভব করে স্রষ্টাকে জানবার ইচ্ছা। কিন্তু বাস, ওইটুকু বুঝেই জীবনের কৌতূহল যেন লুকিয়ে গিয়েছিল। ব্রহ্মোপাসনা ও হরিসংকীর্তন শুনতে অভ্যস্ত ছেলেবেলার জীবনে যে ঈশ্বর-বিশ্বাস খুবই সহজ ও স্বাভাবিক একটি প্রাপ্তি হয়ে কাছে এসেছিল, সেই ঈশ্বরবিশ্বাসকে একটা যুক্তিহীন প্রত্যয় বলে ধারণা করে খুব খুশি হয়েছিল জীবনের যৌবনকাল। বিবেকানন্দ-সাহিত্য অতি আগ্রহ ও নিষ্ঠা নিয়ে পাঠ করে করে যে ঈশ্বর-বিশ্বাস আবার অন্তরতর ভাবনায় বিমূর্ত হয়েছিল, তাও আবার নানা সন্দেহে ভঙ্গুর হয়ে শেষে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েই গিয়েছিল। বিশ্বাসের এরকম সঙ্কট অথবা বিপর্যয়ের ঘটনা অন্য অনেকের জীবনেও দেখতে পেয়েছি। নানা মুনির নানা মতের তত্ত্ব থেকে শেষ পর্যন্ত এই শিক্ষা পাওয়া গেল যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সত্য বলে প্রমাণিত করবার যুক্তি, আর মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করবার যুক্তি, দুই-ই সমান ভারী। না, যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিনাস্তি করা সম্ভব নয়। সংশয়াপন্ন মনটা দীর্ঘকাল এই সিদ্ধান্ত পুষে রেখেছিল যে, যদি কোন অলৌকিক ঘটনা দেখতে পাই তবেই বুঝবো যে, লৌকিক প্রত্যয়ের ওপারে সত্যিই

কেউ একজন নিশ্চয়ই আছেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন আমার ইচ্ছার এই দাবিটা যেন নিজেরই অট্টহাসির ঠাট্টায় চূর্ণ হয়ে গেল। ঠাট্টা করেছিল একটা ঘটনা, ঝড়ের হাওয়ায় যেমন বন্ধ কপাটের কড়া নেড়ে ঠাট্টা করে। বিখ্যাত দার্শনিক যেমন বলেছেন, আমার নতুন উপলব্ধির বিস্ময়টাও প্রায় তেমনই করে বলেছিল মিরাকেল কাকে বলে? তোমার তুচ্ছতার ঠেলায় কেঁদে ফেলেও শিশুটি দুই হাত বাড়িয়ে তোমার গলা জড়িয়ে ধরে, আর অন্ধকারের পথে তোমার পায়ের কাছ্ থেকে সাপটা নিজেই সরে যায়--এইসব নিতান্ত লৌকিক ঘটনা কি বিস্ময় হিসাবে কম অলৌকিক? ফুল ফোটে, পাখি ডাকে, ভালবাসার আবেগ ওষ্ঠপুটের রক্তিমা আরও নিবিড় করে তোলে, এইসব নিতান্ত লৌকিক সত্যের রূপ দেখে কেউ মুগ্ধ হতে পারতো না, যদি এর মধ্যে অলৌকিক বিস্ময়ের প্রকাশ না থাকতো।

সাহিত্যিক জীবনের স্মৃতিকথার মধ্যে ঈশ্বর-বিশ্বাসে পুনর্বাসিত হবার কথা কেন? পাঠকজনের এই প্রশ্নের জবাবে আমার কথা এই যে, আমার সাহিত্যকর্মের সাধ আজ ঈশ্বর-বিশ্বাসের নতুন প্রদীপের কাছে এসে নতুন আলোর অভিষেক খুঁজছে। তাই থমকে থাকতে হচ্ছে। যদি সেই অভিষেক পাই, তবেই রূপে গুণে ভাবে ও প্রকারে নতুন বলে বোধ হবে, এমন গল্প ও উপন্যাস লিখতে পারবো, নইলে পারবো না। মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় শক্তি ও আনন্দের সম্বল যে ঈশ্বর-বিশ্বাস, তার সুমহিম প্রেরণার অনুগত বিস্ময় ও বৈচিত্র্যের পরিচয় রূপায়িত করে এতদিন কেন অনেক গল্প ও উপন্যাস লিখিনি, নিজের সম্পর্কে এই অভিযোগ আজ একটি কষ্টকর আক্ষেপ হয়ে মনের ভিতর বাজে। গল্প ও উপন্যাস লেখার সাহিত্যিক কর্ম এক ধরনের রিচুয়াল তথা বিশ্বাসের তর্পণ বলে মনে হয়েছে। গল্প উপন্যাস ও কবিতা, জীবনের অভিজ্ঞাত সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাময় বিশ্বাসের নৈবেদ্য। কল্পনা করতে পারি, ঈশ্বর-বিশ্বাসের অনুগত প্রেরণার সৃষ্টি হয়ে আগামীকালের কান্তসাহিত্য ও রম্যকলা কী বিপুল আনন্দের নিবেদন সত্য করে তুলবে!

আমার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'তিলাঞ্জলির' ইতিকথার মধ্যে আকস্মিকতার কোন বিস্ময় নেই। বিশেষ উদ্দেশ্যে এবং বিশেষ অবস্থার একটি দুর্বার প্রয়োজনের তাগিদে তিলাঞ্জলি লিখতে হয়েছিল। তিলাঞ্জলি যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সেটা ছিল বিকট নিন্দা ও বিপুল প্রশস্তির সংঘাতে উদ্বেলিত একটা উত্তেজনার আবর্ত। ব্রিটিশের শাসকীয় প্রভুত্ব তখন ভারত-রক্ষা আইনের তূণীর থেকে প্রায় একশো অর্ডিন্যান্সের বাণ বের করে ভারতীয় জনজীবনের ক্লিষ্ট কপালটাকে আরও ক্ষতাক্ত করে চলেছে। ডিনায়াল পলিসি, অর্থাৎ শত্রুপক্ষকে কোন সুবিধার সম্বল সংগ্রহ করবার সুযোগ না দেবার নীতি অনুযায়ী ধান-চাল অপসারিত করে বাংলার পূব ও দক্ষিণ প্রান্তের জেলায় জেলায় একটা দুঃসহ রিক্ততা সৃষ্টি করা হয়েছে। মুনাফাখোর এক শ্রেণীর দেশীয় ব্যবসায়িক সুযোগ বুঝে ধান-চাল মজুদ করে দরের ফাট্‌কা খেলতে মেতে উঠেছে। ধান-চালের এই অবরোধের ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। জাতীয় কংগ্রেস বে-আইনী বলে ঘোষিত ও নিষিদ্ধ হয়েছে। জাতির রাজনীতিক-স্বাধীনতা দাবি করে সংগ্রাম করবার পরিকল্পনা করেছিলেন যাঁরা, জননেতা এবং আরও কয়েক লক্ষ কর্মী সাধারণ, তাঁরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। ব্রিটিশরাজ বলছেন, এ সময় কেউ স্বাধীনতার দাবি করো না। যুদ্ধ প্রচেষ্টায় মন প্রাণ ও অর্থ দিয়ে সাহায্য কর। এই সময় ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টিও বললেন, যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা দিতে নেই, বরং সাহায্য করাই উচিত। কারণ, এটা হলো জনযুদ্ধ। এ সময় স্বাধীনতার দাবি করে ব্রিটিশরাজকে বিড়ম্বিত করা উচিত নয়। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা, যার সম্যক্ অর্থ হলো, সেদিনের স্বাধীনতার দাবি ও সংগ্রামের বিরোধিতা করা, এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সাহায্য করবার জন্য একটি নৈষ্ঠিক, আনুগত্যের তত্ত্ব প্রচার করা।

আগস্ট সংগ্রামের জ্বালামুখীর আগুন তখন নিবু-নিবু হলেও তার ধোঁয়াতে যথেষ্ট জ্বালা

ছিল। সেই সময়ে লেখা আমার প্রথম উপন্যাস 'তিলাঞ্জলি' হলো জাতির জীবনের বেদনাক্রান্ত রূপ ও অবস্থার একটি প্রতিচ্ছবিত পরিচয়। উপন্যাসে ব্রিটিশরাজ ও কম্যুনিস্ট পার্টির কথা কাজ ও নীতির প্রতিবাদ আছে। জাতির স্বাধীনতার দাবি ও সংগ্রামের সমর্থন এবং প্রশস্তি আছে। সুতরাং কম্যুনিস্ট পার্টির মানুষ এবং যাঁরা পার্টির অনুগতজন, তাঁরা তিলাঞ্জলির প্রতি বিদ্বিষ্ট হবেন, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এঁরা ছাড়া আর সকলেই 'তিলাঞ্জলি'কে বিপুল আগ্রহে অভিনন্দিত করেছিলেন।

'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসের লেখা শুরু করবার কয়েক মাস আগে আমার লেখা 'নতুন শালিক' নামের একটি গল্পের প্রতিবাদ করেছিলেন শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিবাদের পদ্ধতিতে অভিনবতা ছিল। মানিকবাবু পাল্টা জবাব কিংবা প্রতিবাদ হিসাবে একটি গল্প লিখলেন—হ্যাঁলা। কবির লড়াইয়ের মতো এধরনের গাল্পিকের লড়াইয়ের দ্বিতীয় কোন ঘটনার নমুনা আছে কি না, জানি না। যা-ই হোক, আমি বুঝতে পারিনি এবং আজও বুঝতে পারি না, আমার 'নতুন শালিক' গল্পের প্রতিবাদ কেন করেছিলেন মানিকবাবু। 'নতুন শালিক' গল্পটি দীন সাধারণের শ্রেণী-স্বার্থের একতাযুক্ত সংহতির সমর্থন, এবং সংগ্রামের পুরোভাগে কপট-বিপ্লবী বুর্জোয়ার চতুর অনুপ্রবেশের প্রতিবাদ। এমন বক্তব্যের গল্প মানিকবাবুর পক্ষে ভাল না লাগবার কথা নয়। জানি না, তিনি কী ভেবে ও কী কারণে আমার লেখা ওই গল্পটির প্রতিবাদ করেছিলেন।

যেমন আমার প্রথম লেখা গল্পের বই 'ফসিল' (ও অন্যান্য) প্রকাশ করেছিলেন অ-প্রকাশক ভদ্রলোক, তেমনই আমার লেখা প্রথম উপন্যাস 'তিলাঞ্জলি'ও প্রকাশ করেছিলেন এক অ-প্রকাশক ভদ্রলোক, বন্ধুবর সাগরময় ঘোষ। কিন্তু একই প্রকারের দুই ঘটনার মধ্যে দুই ভিন্ন কারণ নিহিত ছিল। ইংরাজের ভারত-রক্ষা আইন তিলাঞ্জলির ইংরাজ-বিরোধী আর যুদ্ধবিরোধী মুখরতা সহ্য করবে না এবং কড়া রকমের শাস্তি দেবে, এই ভয়ের কারণে উদ্যোগী প্রকাশকের উৎসাহ বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাই উপন্যাসটি সাগরবাবুকে প্রকাশক বলে ঘোষণা করে প্রকাশিত হয়েছিল। তিলাঞ্জলির ইতিকথা এখানেই সমাপ্ত করে দিয়ে লেখকের অদৃষ্টের একটি সমস্যার কথা উল্লেখ করতে হয়। আনন্দবাজার পত্রিকার স্বত্বাধিকারী, আমার বিশেষ শ্রদ্ধার আস্পদ সুরেশবাবু একদিন হঠাৎ আমাকে ডাকলেন, বিষণ্ণভাবে কয়েকটি মুহূর্ত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, তুমি এখনই গিয়ে মিস্টার রাওয়ের সঙ্গে দেখা কর। মিস্টার রাও আই সি এস. তাঁর পুরো নামটা আজ আর স্মরণে নেই। আলিপুরে গিয়ে তাঁর বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য উপস্থিত হতেই, তিনি একটি ফাইল হাতে নিয়ে ও কাছে এসে বসলেন। তাঁর স্ত্রী, বাঙালী মহিলা মনোরমাও একটি চেয়ার নিয়ে কাছে বসলেন।

মিস্টার রাও বললেন—আপনার সম্পর্কে সরকারের কাছে অভিযোগ এসেছে, আপনি আসামে গিয়ে শত্রুপক্ষ জাপানের সামরিক গোয়েন্দাদের সাহায্য করেছেন, অনেক খবর যুগিয়েছেন। সত্যিই যদি এরকম কাজ করে থাকেন, তবে...!

আমি বললাম—আমি জীবনে কোনদিনও আসামে যাইনি।

মিস্টার রাও—অ্যাঁ? ঠিক বলছেন?

আমি—হ্যাঁ, ঠিক বলছি। আমি প্রমাণ দিতে পারি যে, আমি আসামে কোনদিনও যাইনি।

উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন মিস্টার রাও, তার চেয়ে বেশী উৎফুল্ল হলেন মনোরমা। ফাইলের কাগজে তখনি মন্তব্য লিখে দিলেন মিস্টার রাও, সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ।

মনোরমা উঠে গিয়ে চা নিয়ে এলেন, আমার লেখা কয়েকটি গল্পের প্রশংসা করলেন। বললেন : আমি ওঁকে অনেকবার বলেছি যে, ওই ফাইলের সবই মিথ্যে কথা।

রাও বললেন—আমারও তাই মনে হয়েছিল। তবু...যাক্, এখন আর আপনার ভয় করবার

কিছু নেই।

মনোরমা বললেন--নিশ্চয় আপনার কোন ভয়ানক শত্রু আপনার বিরুদ্ধে এরকম সাংঘাতিক একটা চুগলি করেছে।

চা খেয়ে নিয়ে ও রাও-দম্পতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন আবার পথের উপর এসে দাঁড়ালাম, তখন আলিপুরের গাছের মাথার উপর বিকেলের রোদ .মিইয়ে এসেছে। কার্জন পার্কের কাছে এসে একটি নিরালার ঠাণ্ডা ঘাসের উপর অনেকক্ষণ বসে রইলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠলো। তিলাঞ্জলিরই মন্তব্যের কয়েকটি কথা বারবার মনের ভিতরে যেন চেঁচিয়ে উঠছে—ওই যে, ওই তো, সন্ধ্যার অন্ধকারে লালবাজার থানার ফটকের কাছে যেন নতুন এক জুডাসের প্রেতাত্মার ছায়া ঘুরঘুর করছে। শত্রুচরকে হাতে পেলে সামরিক কম্যাণ্ড কী করে, সেটা জানা ছিল। চটপট সংক্ষিপ্ত বিচার, আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফাঁসি। কাজেই মনের চিন্তাটা উত্তপ্ত হয়ে মাথাটকেও বেশ উত্তপ্ত করে তুলছিল। বুঝতে দেরি হয়নি, এটা দুঃসহ একটা অস্বস্তির উত্তাপ। ছা-পোষা একটা সংসার আছে, বুড়ো বাপ-মা আছে, এহেন এক মানুষের ভাবনাতে দুঃসহ রকমের একটা অস্বস্তি এভাবে উত্তপ্ত না হয়ে পারে না। বোধ হচ্ছিল, চুগলিটা শুধু একা আমাকে নয়, এদেরও সবাইকে ফাঁসি দিতে চাইছে। এই উত্তপ্ত অস্বস্তির প্রকোপ ক্রমশ শান্ত হতে হতে যেদিন ঘুম-ভাঙা দুঃস্বপ্নের মতো মরে গিয়ে একেবারে বাতাসে মিশিয়ে গেল, সেই দিনটা হলো ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট।